ইতিহাস কথা বলে

['স্মৃতির প্রদীপ জ্বালি' ও 'সেই মরুপ্রান্তে'
দুটি ঐতিহাসিক উপন্যাসের অমনিবাস]

নীহাররঞ্জন গুপ্ত
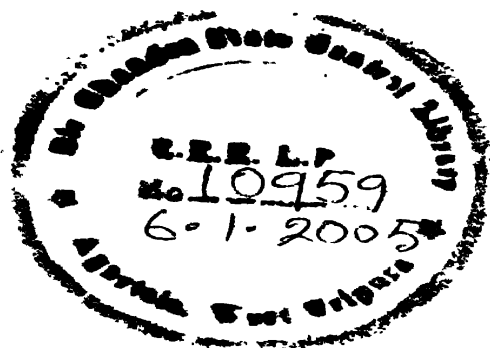
মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ
১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩

—একশো পঁচিশ টাকা—

প্রচ্ছদপট

অঙ্কন—সুব্রত চৌধুরী
মুদ্রণ—চয়নিকা প্রেস

'ITIHAS KATHA BALEY'
An omnibus of two historical novels based on Rajasthan by Niharranjan Gupta. Published by Mitra & Ghosh Publishers Pvt. Ltd. 10 Shyama Charan Dey Street, Kolkata-700 073.

Price Rs. 125/-

ISBN : 81-7293-729-6

মিত্র ও ঘোষ পাব্লিশার্স প্রা: লি:, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০ ০৭৩ হইতে এস. এন. রায় কর্তৃক প্রকাশিত ও পি. এম. বাগচী এন্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯ গুলু ওস্তাগর লেন, কলকাতা ৬ হইতে জয়ন্ত বাগচী কর্তৃক মুদ্রিত

সূচীপত্র

নীহাররঞ্জন গুপ্তের
উপন্যাস অমনিবাস
ভাগীরথী অমনিবাস

স্মৃতির প্রদীপ জ্বালি

ইতিহাস কথা বলে—১

বাব্লু—দীপু—সীপু—টুকুকে
আশীর্বাদক—বাবা

উল্কা
২৬এ গড়িয়াহাট রোড
কলকাতা ১৯

প্রথম পর্ব : দীপনির্বাণ

॥ ১ ॥

রম্ভা, কাঁদিছো কেন ? কি হয়েছে রম্ভা ? কেন অমন করে মধ্যরাত্রির অন্ধকারে তাঁবুর একধারে বসে নিভৃতে সকলের অলক্ষ্যে অশ্রুমোচন করছো ? কেন তোমার ইন্দীবরতুল্য দুটি চক্ষু অশ্রুতে টলমল ? চক্ষু তো নয়, যেন সত্যিই দুটি নীলপদ্ম।

সত্যিই রম্ভা, সুন্দরী ষোড়শী তন্বী রম্ভা, তার তাঁবুর মধ্যে এক কোণে বসে দু'হাতে মুখখানি ঢেকে ফুলে ফুলে কাঁদছিল। মহারাজা যশোবন্ত সিংহ তাঁর তাঁবুতে মৃত্যুশয্যায়—অথচ এই সময় হতভাগিনী রম্ভার সেখানে যাবার অধিকার নেই।

সত্যিই তো। কে সে ? কি তার পরিচয় ? কোন্ অধিকারে সে মহারাজার তাঁবুর মধ্যে প্রবেশ করবে ? সে মহারাজার সামান্যা এক পরিচর্যাকারিণী—অনুগৃহীতা পার্শ্বচারিণী নর্মসহচরী বই তো নয়—সামান্যা—অতি নগণ্যা এক নারী। এক নগণ্যা রাজপুতানী। রাঠোর কুলতিলক শ্রীল শ্রীমান মহারাজাধিরাজের তার প্রতি অনুকম্পা সে তো তার নিজস্ব অতি গোপন ধন।

কেউ জানে না। কাউকে বলবারও নয় সে কথা। মহারাজের তাঁবুর মধ্যেই সে ছিল। প্রায় তার শয্যার পাশটিতেই ছিল কিন্তু হঠাৎ কবিরত্ন এসে একমাত্র মহারানীকে ও সর্দার মুকুন্দকে ছাড়া সকলকেই মহারাজের তাঁবু থেকে বের করে দিয়েছে।

অনুমানে অবিশ্যি কিছুটা বুঝেছিল রম্ভা। পরে অবিশ্যি ভ্রাতা রতন সিংহের মুখে দ্বিপ্রহরে যে মুহূর্তে ঐ নিদারুণ সংবাদটি সে শুনেছে তখন থেকেই কাঁদছে রম্ভা। রতন সিংহও যে তাকে সংবাদটি দিয়ে কোথায় চলে গেল—আর দেখাই নেই।

একবারও যদি ভাই রতন সিংহের সঙ্গে দেখা হতো—কিন্তু উপায় নেই—মহারাজের অসুস্থতার জন্য এখন সবাই ব্যস্ত। এই দুর্গম প্রদেশে অসুস্থ মহারাজকে নিয়ে চিন্তার অবধি নেই সকলের। সকলেরই বিষণ্ণ ম্লানমুখ।

মুকুন্দ দাসের ইচ্ছা ছিল না দিল্লী থেকে পত্রবাহক আনীত দুঃসংবাদটা মহারাজের কর্ণগোচর করে কিন্তু সে গোপন রাখতে পারেনি সংবাদটা।

দিল্লী থেকে দ্রুতগামী অশ্বারোহী কেন হঠাৎ এলো কাবুল-প্রান্তে সন্দিগ্ধ মহারাজের কাছ থেকে, সে সংবাদটা গোপন রাখা যায়নি, কে যেন কেমন করে পূর্বেই পৌঁছে দিয়েছিল। এবং তার পর তিনিই মুকুন্দকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন তাঁর তাঁবুর মধ্যে।

প্রশ্ন করেছিলেন, আমার কাছে সত্য বল মুকুন্দ, গোপন করার চেষ্টা করো না—কেন হঠাৎ এ সময় দ্রুতগামী অশ্বারোহী দিল্লী থেকে এলো।

—ও কিছু নয় মহারাজ—

—মুকুন্দ।

—মহারাজ—

—আমি জানি কোন অমঙ্গল নিশ্চয়ই ঘটেছে—ঐ চিরদিনের নৃশংস হিন্দুদ্বেষী সম্রাট্ ঔরংজীবকে আমি বিশ্বাস করি না—

মাথা নীচু করে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে থাকে মুকুন্দ দাস।

যশোবন্ত বলেন, কয়দিন থেকেই আমার বাম চক্ষুর পাতা নাচছে—তখনই বুঝেছিলাম কোন অমঙ্গল আসছে, বল—আর গোপন করো না—

—মহারাজ আপনি অসুস্থ—

—তা হোক মুকুন্দ—বল কি সংবাদ দিল্লী থেকে এসেছে। যত দুঃখেরই হোক না—যত মর্মান্তিকই হোক না বল আমায়। আমি শুনবো—

—মহারাজ আপনি সুস্থ হয়ে উঠুন তারপর শুনবেন—

—না। এখনই শুনব। তুমি বল—

নিঃশব্দে অনন্যোপায় মুকুন্দ তখন কুর্তার জেব থেকে ভাঁজকরা পত্রটা বের করে কম্পিত হাতে তুলে দিয়েছিল যশোবন্তর হাতে।

এবং সেই পত্র পড়তে পড়তেই হঠাৎ মহারাজ জ্ঞান হারিয়ে শয্যার ওপরে ঢলে পড়ে যান। দু'দিন বাদে সে জ্ঞান ফিরে এলো বটে কিন্তু বোঝা গেল মহারাজের অবস্থা আশঙ্কাজনক।

দু'দিন পরে জ্ঞান ফিরে আসাটা চিরদিনের জন্য প্রদীপ নিভে যাবারই পূর্বসূচনা মাত্র। মর্মান্তিক আঘাতে মহারাজ যশোবন্ত সিংহ আজ মৃত্যুপথ-যাত্রী।

কাবুল-প্রান্তে হিন্দুকুশ পর্বতের সানুদেশ। শীতের মধ্যরাত্রি। বাইরে তুষার ঝরছিল। কয়দিন থেকেই অবিশ্রাম তুষার ঝরছিল। চারিদিকের পর্বতশীর্ষ, পর্বতগাত্র ও পর্বতসানুদেশ শুভ্র তুষারের চাদরে যেন একেবারে ঢেকে গিয়েছে, আর সেই সঙ্গে বরফের চাবুকের মত তীক্ষ্ন হাড়জমানো হাওয়া সোঁ সোঁ করে বইছে সর্বক্ষণ।

তাঁবুর মধ্যে লৌহপাত্রে আগুন জ্বলছে দাউ দাউ করে কিন্তু প্রচণ্ড শীতের কোনও কমতি নেই তাতে করে। মধ্যে মধ্যে আবার তাঁবুর ভারী কাপড়ের দরজার ফাঁক দিয়ে হিমকণাবাহী হাওয়ার ঝাপটা তাঁবুর মধ্যে এসে প্রবেশ করছিল। যোধপুরাধিপতি যশোবন্ত সিংহ তাঁর তাঁবুর মধ্যে মৃত্যুশয্যার উপরে শুয়ে ছটফট করছিলেন। শিয়রের ধারে বসে তাঁর পট্টমহাদেবী, আর পায়ের কাছে বসে তাঁর দীর্ঘদিনের সহচর চিরবিশ্বস্ত বন্ধু পরমাত্মীয় রাঠোর সর্দার মুকুন্দ দাস—নাহুর খাঁ। নাহুর খাঁ সম্রাটের দেওয়া অভিধা।

আর পাশে অন্য একটি আসনে বসে মহারাজ জয়সিংহ মেবার কুলতিলক।

ক্ষীণকণ্ঠে যশোবন্ত বললেন, একটু জল—

পট্টমহাদেবী পার্শ্বস্থ রৌপ্যনির্মিত পাত্র থেকে একটু জল নিয়ে মহারাজের মুখে ঢেলে দিলেন।

ক্ষীণকণ্ঠে এবার ডাকলেন যশোবন্ত, মুকুন্দ—

—মহারাজ—

—সামনে এসো, এগিয়ে এসো।

রাঠোর সর্দার এগিয়ে আসে, খুব কি কষ্ট হচ্ছে মহারাজ ?

—না মুকুন্দ—সম্রাট আমার শেষ বংশধরটিকে ছিনিয়ে নিয়ে যে নিষ্ঠুরতম কষ্ট যে যন্ত্রণা আমায় দিয়েছেন এ শারীরিক কষ্ট তো তার কাছে কিছুই নয়—কুমার—আমার নয়নের মণি কুমার পৃথ্বী সিংহ—

—ওসব কথা এখন থাক মহারাজ—

—উঃ কি পাষণ্ড, কি নিষ্ঠুর, কি শয়তান—অথচ আমি আমার সর্বস্ব দিয়ে সেই সম্রাটের—

মহারাজ যশোবন্তকে আবার বাধা দেয় কুম্পাবৎ শিরোমণি মুকুন্দ দাস, মহারাজ, আপনি শীঘ্র সুস্থ হয়ে উঠুন তারপর সেই যবনের নিষ্ঠুর ঔদ্ধত্যের সমুচিত শাস্তি দেবো আমরা—

—পার যদি তোমরা দিও মুকুন্দ—আমার আর সময় নেই—

—ও কথা কেন বলছেন—কবিরাজ তো বললেন—বাধা দেয় মুকুন্দ কুম্পাবৎ সর্দার।

—কোন ভয় নেই, তাই না ? কবিরাজ কি বলবে—আমি যে বুঝতে পারছি আমার সময় হয়ে এসেছে—

—অম্বররাজ,

জয়সিংহ জবাব দেন—

—বলুন মহারাজ ?

—সাবধান—যবন সম্রাটের মনোগত বাসনা হচ্ছে সমগ্র রাজস্থানকে কুক্ষিগত করা—

—আমি তা জানি মহারাজ—

—হ্যাঁ—বিপদ কেবল আমারই নয়—আপনাদেরও আসবে—উঃ আজ কি মনে হচ্ছে জানেন মহারাজ—কার মুখখানা আমার বার বার মনে পড়ছে জানেন আজ এই অন্তিম মুহূর্তে—

—কার মহারাজ ? সর্দার মুকুন্দ দাসই জিজ্ঞাসা করে।

—সম্রাট সাজাহাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র হতভাগা দারা শিকোর—তার প্রতি আমি অন্যায় করেছি, সে অযোগ্য ভেবে তাকে আমি অন্যায়ভাবে ত্যাগ করেছিলাম—

—মহারাজ—

—না মুকুন্দ, তুমি জান না—অসুস্থ হবার পর সম্রাট্ সাজাহাঁ দারাকে যখন তাঁর প্রতিনিধিত্বে বরণ করলেন তখন দারা আমাকেই সর্বপ্রথম বিশ্বাস করে 'পাঁচহাজারী' মনসবী পদ দিল—সেই দারার হয়ে ঔরংজীবের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে গেলাম—

সহসা ঐ সময় মুকুন্দ দাস বাধা দিয়ে বলে, সবই আমার মনে আছে মহারাজ, আমি তো তখন আপনার সঙ্গে সঙ্গেই ছিলাম। সেদিন তো ভেবেছিই—পরেও

ভেবেছি। আজও ব্যাপারটা আমার কাছে দুর্বোধ্যই রয়ে গিয়েছে—কেন যে সেদিন নর্মদার তীরে আপনার ত্রিশ হাজার দুর্ধর্ষ রাজপুত সৈন্য ও অসংখ্য মোগল সৈন্য থাকা সত্ত্বেও ঐ শয়তান ঔরংজীবকে আক্রমণ করলেন না—

ক্লান্ত ও বিষণ্ণ কণ্ঠে থেমে থেমে বললেন মহারাজ, ভুল—মহা ভুল করেছিলাম আমি সেদিন মুকুন্দ। নিজের বলে মত্ত হয়ে সেদিন মনে মনে ভেবেছিলাম—আসুক তার আর দু'ভাই, মুরাদ আর সুজা—একত্রে তিন তিনটে শয়তানকে শেষ করব—আর সেই ভুল, সেই অহংকারই হলো আমার কাল। আমার পতন—

—থাক মহারাজ—ওসব কথা আজ থাক—মুকুন্দ আবার বাধা দেয়।

—না মুকুন্দ। বলতে দাও আমায়—ইতিহাস জানবে আমি দারার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিলাম আর সেই কারণেই আমি ঔরংজীবকে আক্রমণ করিনি আমার সামনাসামনি আসা সত্ত্বেও, কিন্তু তা নয়—আমি—আমি সেদিন অপূর্ব এক সুযোগের অপেক্ষায় ছিলাম। ভ্রাতৃবিরোধের ঐ কুটিল গলিপথে আমি ভেবেছিলাম আবার মোগলদের এদেশ থেকে বিতাড়িত করে অখণ্ড অচ্ছিন্ন এক বিশাল হিন্দুরাজ্য গড়ে তুলবো। কিন্তু পরে বুঝেছিলাম ভাগ্যবিধাতার ইচ্ছা তা নয়। নচেৎ আমার সেই ক্ষণিক ভুলের সুযোগ নিয়ে কুশলী চতুর ঔরংজীব সিংহাসনের ভাঁওতা দিয়ে মূর্খ বিলাসপ্রিয় মুরা আর সুজাকে দলে তো টেনে নিলই সেই সঙ্গে শয়তান কুলী খাঁকে গোপনে রাত্রির অন্ধকারে আমার মোগল সৈন্যের ছাউনিতে পাঠিয়ে উৎকোচ দিয়ে নিজের দলে টেনে নিল—কিন্তু তাতেও হয়ত শেষ পর্যন্ত আমার পরাজয় ঘটতো না মুকুন্দ যদি না ওদের দলে দুর্ধর্ষ ফরাসী গোলন্দাজরা থাকত—তাদের ভয়াবহ কামানের মুখে সব আশা ভরসা আমার চুরমার হয়ে গেল—

হাঁপাতে লাগলেন মহারাজ।

—একটু জল—

মহারানী মেওয়ার দুহিতা সুবর্ণপাত্রে মহারাজের মুখে একটু একটু করে জল ঢেলে দিলেন।

—আঃ আর একটু—

মহারানী বললেন, এবার একটু ঘুমোবার চেষ্টা করুন মহারাজ—

—এবারে একেবারেই ঘুমোবো মহাদেবী—আর দেরি নেই—মহারাজ জয়সিংহ—

জয়সিংহ ইতিপূর্বেই মহারাজের তাঁবু থেকে প্রস্থান করেছিলেন, মহারাজের ঐ কষ্ট আর যেন সহ্য করতে পারছিলেন না। চোখে দেখতে পারছিলেন না।

মহারানীই বললেন, তিনি চলে গেছেন—

—মুকুন্দ—মুকুন্দ কোথায়?

—এই যে মহারাজ—আমি আপনার পাশে—

—মুকুন্দ, আর এখানে এক মুহূর্তও দেরি করো না। আমার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করো। এদের ভার তোমার হাতেই দিয়ে গেলাম—

মহারানী ঐ সময় মুকুন্দদাসের দিকে চেয়ে বললেন, এবার কবিরাজকে ডাকুন সর্দার—

—কবিরাজকে আর কেন? সে আর কি করবে? মহারাজ বললেন, হাত পা আমার ঠাণ্ডা হয়ে আসছে তাই ভয় পেয়েছো, কিন্তু ও যে অবশ্যম্ভাবী অনিবার্য মৃত্যু, ওকে তুমি রোধ করবে কেমন করে? আজ পর্যন্ত কেউ ওকে তো রোধ করতে পারেনি—ওর গতি বন্ধ করতে পারেনি—একটা কথা মহাদেবী—

—বল—মহারানী কাঁদতে কাঁদতে বলেন।

—মনে রেখো আমার শেষ আশা—যোধপুরের রাঠোরদের শেষ আশার ক্ষীণ সম্ভাবনাটুকু তোমারই গর্ভে—সেই আশার—

মহারাজা যশোবন্তর কথাটা শেষ হলো না—একটা দমকা ঝোড়ো হাওয়া এসে তাঁবুর ভারী পর্দা উলটিয়ে তাঁবুর মধ্যে প্রবেশ করে মুহূর্তে সব ওলোটপালোট বিশৃঙ্খল করে দিয়ে, তাঁবুর মধ্যস্থিত একটি মাত্র প্রদীপশিখাকে নির্বাপিত করে চারিদিক নিশ্ছিদ্র আঁধারে সব ডুবিয়ে দিয়ে গেল।

দীর্ণ চাপাকণ্ঠে মহাদেবী আর্তনাদ করে উঠলেন—সর্দার—

আরো এক ঘণ্টা পরে। মহারাজ যশোবন্ত সিংহের মৃত্যু হয়েছে।

তাঁর মৃতদেহের চারপাশে বসে মহারাজের মহিষীরা অশ্রুমোচন করছেন। সর্দাররা উষ্ণীষহীন নতমস্তকে শোকাভিভূত হয়ে চারিদিকে দাঁড়িয়ে। সকলেরই চোখে জল। আর দাঁড়িয়ে পরিচর্যাকারী ও পরিচর্যাকারিণীর দল।

পারলেন না—মহারাজ তাঁর একমাত্র বংশধর কুলপ্রদীপ কুমার পৃথ্বী সিংহের মর্মান্তিক মৃত্যুসংবাদটা সহ্য করতে পারলেন না। সুদূর দিল্লী থেকে দুইদিন পূর্বে দ্রুতগামী অশ্বারোহী পত্র মারফত ঐ মর্মান্তিক সংবাদটা বহন করে এনেছিল। সত্যিই মর্মান্তিক।

চতুর ঔরঙ্গজীবের কিন্তু বুঝতে আদৌ কষ্ট হয়নি রাঠোরবীর মহারাজ যশোবন্ত সিংহের মনের গোপন কথাটি। আর তাইতেই একান্ত অনন্যোপায় হয়ে তাঁকে সর্বসমক্ষে উচ্চ ও সম্মানজনক সেনাপতির পদে বরণ করে নিলেও মনেপ্রাণে এতটুকুও বিশ্বাস করেনি কোনদিন তাঁকে।

সে ভালভাবেই জানত রাঠোররাজ সাক্ষাৎ কালসাপ। এবং তার সর্বদাই ভয় ছিল রাঠোর নৃপতি সুবিধা পেলেই তার অর্থাৎ ঔরঙ্গজীবের সমূহ অনিষ্ট করতে—এমন কি তাকে কীটের মত টিপে শেষ করে ফেলতে এতটুকু দ্বিধাও করবে না।...অথচ খোলাখুলি শত্রুতা করারও তার সাহস ছিল না রাঠোররাজের সঙ্গে।

সেই নর্মদাতট থেকেই চতুর ঔরঙ্গজীব রাঠোররাজকে সর্বক্ষণ তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চোখে চোখে রেখে এসেছে।...আর কোন রাজপুত রাজাকেই বোধ করি ঔরঙ্গজীব অতখানি ভয় করেনি জীবনে। দুজনেই সমান চতুর। এবং দীর্ঘদিন ধরেই পরস্পরের মধ্যে চাতুর্যের খেলা চলছিল।

দাক্ষিণাবর্তে মহারাষ্ট্রীয় বীর শিবাজীর সঙ্গে ষড়যন্ত্র—যার ফলে ঔরঙ্গজীবের

প্রতিনিধি শায়েস্তা খাঁ নিহত হলো।

সেদিন ঔরংজীবকে একপ্রকার অনন্যোপায় হয়েই যশোবন্তকে সেনাপতির পদে বরণ করতে হয়েছিল।

দুর্বার আক্রোশে জ্বলে উঠেছিল সেদিন ঔরংজীব কিন্তু তবু সে চুপ করেই ছিল—এতটুকু অসন্তোষও প্রকাশ করেনি সম্রাট্। বরং যশোবন্তর ব্যবহারে খুশীই হয়েছে সে পত্র মারফত সেই কথাই জানিয়ে দিয়েছিল।···বলেছিল, সাবাস খুতান—ঠিক করেছো—

দুটো বৎসর চুপ করে ছিল ঔরংজীব, তারপরই যশোবন্তকে সরিয়ে অম্বররাজ জয়সিংহকে সেখানে বসিয়ে দিল সুযোগ হাতে আসার সঙ্গে সঙ্গেই।

জয়সিংহ শিবাজীকে কৌশলে বন্দী করে আনল বটে কিন্তু শেষ পর্যন্ত আবার জয়সিংহের নিষ্ক্রিয়তার জন্যই শিবাজী তার চোখে ধুলো নিক্ষেপ করে পালিয়ে গেল।

বাধ্য হয়েই একান্তভাবে তখন আবার জয়সিংহকে সরিয়ে যশোবন্তকেই নিজ প্রতিনিধিত্বে বরণ করল ঔরংজীব, কিন্তু দু'দিনও গেল না আবার যশোবন্ত নিজমূর্তি ধারণ করলেন।

ঔরংজীবের বিরুদ্ধে তারই পুত্র মোজামের সঙ্গে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হলেন হাতে হাত মিলিয়ে।

নিরুপায় আক্রোশে ঔরংজীব নিজের মধ্যে ফুঁসতে লাগল রুদ্ধবীর্য একটা সাপের মত।

তারপর দেলহীর খাঁর ঘটনা। কুকুরের মত বিতাড়িত হলো সে।

ঠিক এমনি সময় কাবুল রাজ্যে আফগানদের বিদ্রোহের সংবাদ এলো।

ঔরংজীব আর একটি মুহূর্ত কালক্ষেপ করল না—বিদ্রোহীদের দমন করবার জন্য যশোবন্তকে সেই বিপদসংকুল দেশে প্রেরণ করল সঙ্গে সঙ্গে অম্বররাজ—

তারপরই সেই হীন জঘন্য কাজ।

যশোবন্তর একমাত্র বংশধর রাঠোর রাজকুমারকে এবারে ঔরংজীব তার সভায় আমন্ত্রণ জানাল পিতার অবর্তমানে তাঁর প্রতিনিধি হিসাবে।

এতটুকুও সন্দেহ করেনি হতভাগ্য সরলমতি পৃথ্বী সিংহ। সম্রাটের মনের মধ্যে যে হীন কূট অভিসন্ধি গোপন করে আছে কেমন করেই বা তা সে জানবে। নিঃশঙ্ক চিত্তে সম্রাটের আহ্বানে সে দিল্লীর রাজসভায় এসে প্রবেশ করল।

শুধু পত্র আনেনি পত্রবাহক দিল্লী থেকে।

সে স্বয়ং প্রত্যক্ষদর্শীও সমস্ত ঘটনার।

মুকুন্দ দাস প্রশ্ন করে, তারপর?

দূত বলতে লাগল ঃ একদিন দু'দিন তিন দিন গেল—চতুর্থ দিনে—

সম্রাট্ ঔরংজীবের রাজসভা। আমীর ওমরাহ—সামন্ত রাজগণ—মন্ত্রী ভাষ্যকার—রাজপুত সর্দার ও সেনানায়করা যে যার নিজ নিজ পদমর্যাদানুযায়ী আপন আপন আসনে উপবিষ্ট—সম্রাট্ সভায় প্রবেশ করল।

নকীব হাঁকল—শাহেনশা বাদশা আলমগীর—

সম্রাট্ সভায় প্রবেশ করে আজ কেন না। জানি অদূরে নিজাসনে উপবিষ্ট পৃথ্বী সিংহের দিকে তাকাল।

মৃদু হাসল সম্রাট্। তারপরই বলে ওঠে সম্রাট্, রাঠোর রাজকুমার, তোমাকে দেখে আমার কি মনে হচ্ছে জান—

সসম্ভ্রমে ততক্ষণে পৃথ্বী সিংহ উঠে দাঁড়িয়েছে।

—বসো বসো—সম্রাট্ বলে, তোমাকে দেখে তোমার পিতা রাঠোর বীরশ্রেষ্ঠ খুত্তুনের কথাই মনে পড়ছে আর সেই সঙ্গে মনে হচ্ছে তুমি বুঝি দ্বিতীয় খুত্তান।...

—ঈশ্বর দিল্লীশ্বরের মঙ্গল করুন, সসম্ভ্রমে বলে পৃথ্বী সিংহ, সম্রাট্ স্বয়ং যখন আমার প্রতি প্রীত আমার চাইতে ভাগ্যবান দুনিয়ায় আর দ্বিতীয় কে?

সঙ্গে সঙ্গে সম্রাট্ তার একজন পার্শ্বচরকে কি যেন চোখের ইঙ্গিত করলে।

পার্শ্বচরের ইঙ্গিতে একজন ভৃত্য বহুমূল্যবান ও কারুকার্যখচিত সূক্ষ্ম মসলিনে ঢাকা সুবর্ণথালি বহন করে এসে সসম্ভ্রমে সম্রাটের সামনে দাঁড়াল কুর্নিশ করে।

সম্রাটের ইঙ্গিতে সুবর্ণথালির আবরণ উন্মোচিত হলো আর সঙ্গে সঙ্গে সভাস্থ সকলের চোখে পড়ল সুবর্ণথালির উপর সোনা রূপা ছোট ছোট পাথর ও জরির সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম কাজ করা চোখঝলসান একটি পোশাক।

ঔরংজীব ওমরাহর দিকে তাকিয়ে বললে, খাঁসাহেব, রাঠোরকুমার মহারাজ যশোবন্তর যোগ্য প্রতিভূ দ্বিতীয় খুত্তান পৃথ্বী সিংহকে আমার হয়ে ঐ পোশাকটি উপহার দিন—

সসম্ভ্রমে হাত পেতে সেই সুবর্ণথালি গ্রহণ করে পৃথ্বী সিংহ : সম্রাটের জয় হোক—

সম্রাট্ এবারে বলে, যাও কুমার পার্শ্বস্থ কক্ষে যাও—ঐ পরিচ্ছদ পরিধান করে এসো—আমি স্বচক্ষে দেখতে চাই।

—শিরোধার্য আপনার আদেশ সম্রাট্—

পৃথ্বী সিংহ সভাকক্ষ সংলগ্ন পার্শ্বের একটি ক্ষুদ্র কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করে আহ্লাদে ও আনন্দে গদগদ হয়ে এবং সম্রাট্‌প্রদত্ত সেই পোশাক তৎক্ষণাৎ পরিধান করে। অনতিবিলম্বে সভামধ্যে ফিরে এসে সম্রাট্‌কে অভিবাদন জানায়—

—তারপর? মুকুন্দ দাস পুনরায় রুদ্ধকণ্ঠে প্রশ্ন করে।

উল্লাসে গদগদ কুমার পৃথ্বী সিংহ সভা থেকে ফিরে এলো নিজ গৃহে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সে কী ভীষণ যন্ত্রণা সমস্ত দেহের প্রতিটি রোমকূপে-কূপে যেন বিষাক্ত যন্ত্রণার প্রদাহ। জ্বলে গেল—সর্বশরীর জ্বলে গেল। যন্ত্রণায় কাতর কুমার চিৎকার করে উঠলো—একি অগ্নিদাহ—একি অসহ্য জ্বালা— পাগলের মতই পৃথ্বী সিংহ কক্ষময় দৌড়াদৌড়ি করতে থাকে—দেহ থেকে সেই মূল্যবান পোশাক পাগলের মতই টেনে খুলে ফেলে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলেছে—

সম্পূর্ণ উলঙ্গ। সর্বাঙ্গ লাল, দাগা দাগা হয়ে ফুলে উঠেছে। দু'চোখে

অস্বাভাবিক রক্তিম উন্মাদ দৃষ্টি। আর সেই যন্ত্রণাকাতর চিৎকার।

দেখতে দেখতে সেই স্বর্ণকান্তি ঢলঢল কমনীয় দেহ ভয়াবহ বিষে জর্জরিত নীল, ম্লান বিবর্ণ হয়ে গেল। কণ্ঠস্বর ধীরে ধীরে বুজে এলো। তারপর ভূতলে পতিত হলো।

দাঁতে দাঁত চেপে মুকুন্দ দাস বলে—শয়তান—নীচ—কালকূটনিষিক্ত পরিচ্ছদ দিয়ে ফুলের মত আমাদের কুমারকে হত্যা করল।

সত্যিই সেই বহুমূল্য রত্নখচিত পোশাকের সূত্রে সূত্রে তীব্র ভয়ংকর কালকূট মিশ্রিত ছিল।

নিজের তাঁবুর মধ্যে পায়চারি করছিল মুকুন্দ দাস আর ঐ কথাই ভাবছিল।

প্রত্যূষের আর বেশী বিলম্ব নেই। মহারাজের অন্ত্যেষ্টির সমস্ত ব্যবস্থা করবার জন্য দুর্জন সিংহকে আদেশ দিয়েছে মুকুন্দ দাস।

অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া শেষ হওয়ার সংগে সঙ্গেই এখানকার তাঁবু উঠিয়ে মাড়বারের দিকে যাত্রা।

সহসা একটা চাপা কান্নার ধ্বনি শোনা যায়। এই শীত রাত্রির শেষ প্রহরে সেই কান্নার ধ্বনি যেন মর্মন্তুদ একটা হাহাকারের মত গুমরে গুমরে উঠেছে।

কে? কে কাঁদে—

মহারানীর তাঁবু তো এখান থেকে অনেকটা দূর। সেখান থেকে কান্নার আওয়াজ তো এতদূর পর্যন্ত আসবে না।

তবে? মনে হচ্ছে যেন ঠিক কাছাকাছি কেউ কাঁদছে।

নিঃশব্দে মুকুন্দ দাস তাঁবু থেকে বের হয়ে এলো। এবারে আরো স্পষ্ট সেই কান্নার আওয়াজ শোনা যায়।

ঝুরঝুর করে পেঁজা তুলোর মত নরম হালকা তুষার ঝরছে। বাতাস থেমে গিয়েছে। রাত শেষ হয়ে এলো—পূর্বাশার প্রান্তে রক্তিমাভা।

রম্ভার তাঁবুর সামনে এসে দাঁড়ায় মুকুন্দ দাস। কান্নার ধ্বনি আরো স্পষ্ট।

রম্ভার তাঁবু থেকে কান্নার ধ্বনি আসছে কেন?

কৌতূহলী মুকুন্দ সর্দার তাঁবুর মধ্যে প্রবেশ করল। তাঁবুর মধ্যে মৃদু দীপালোকে নজর পড়ে মুকুন্দর—শয্যার উপরে লুণ্ঠিতা আলুলায়িতকুন্তলা রম্ভা—রম্ভা কাঁদছে। কয়েক মুহূর্ত নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে থাকে মুকুন্দ দাস তারপর মৃদুকণ্ঠে প্রশ্ন করে, রম্ভা, কাঁদছো কেন?

॥ ২ ॥

—আঃ ছাড়ো—আমাকে যেতে দাও—

—রানীমা—শুনুন—দয়া করে শুনুন—

—না, না—যেতে দাও আমায়—কেন তোমরা আমার পথ রোধ করছো। আমার স্বামীর অনুগামিনী আমাকে হতে দাও—

মাত্র হাত দশেক দূরে দাউ দাউ করে লেলিহ শিখায় চিতা জ্বলছে। মহারাজ

যশোবন্তর নশ্বর দেহ ধীরে ধীরে পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে।

মহারাজের চার রানী ইতিপূর্বেই সেই চিতার অনলে দেহত্যাগ করে স্বামীর অনুগামিনী হয়েছে, সর্বশেষে পট্টবস্ত্রপরিহিতা মহারানী পট্টমহাদেবীকে সেই চিতার দিকে এগিয়ে যেতে দেখে মুকুন্দ তাঁর পথ রোধ করে দাঁড়ায়।

—রানীমা—এ আপনি কি করতে চলেছেন?

—আমাকে ডাকবেন না সর্দার।

রম্ভাও এসে পথ রোধ করে, রানীমা—

—আঃ ছাড়ো—আমাকে যেতে দাও—

—না রানীমা, না—রম্ভা বাধা দেয়।

—আঃ রম্ভা—হতভাগী এ সময় আমাকে বাধা দিস না—যা, সরে যা—দু'হাতে রম্ভাকে একপ্রকার ঠেলে দেয়ে মহারানী দৃঢ় শান্ত পদে আবার প্রজ্বলিত চিতার দিকে অগ্রসর হন।

কিন্তু দু'পাও মহারানী অগ্রসর হননি কুম্পাবৎ সর্দার মুকুন্দ দাস সামনে এসে দাঁড়াল মহারানীর পথ আগলে—না—

থমকে দাঁড়ালেন মহারানী এবং স্থির জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তাকালেন সর্দারের দিকে—সর্দার—পথ ছাড়ুন—

—না রানীমা। আপনাকে আমি কিছুতেই চিতায় আত্মোৎসর্গ করতে দেব না—

—কি বললেন?

—আপনি ভুলে যাচ্ছেন মহারানী—মহারাজের দুই পুত্রের আগে অকালে মৃত্যু হয়েছে—একমাত্র আশা ভরসা ছিলেন কুমার পৃথ্বী সিংহ কিন্তু পাপাত্মা ঔরংজীব তাঁকেও ছলে হত্যা করেছে—এখন আমাদের শেষ আশা আপনার গর্ভস্থ শিশু—

—তাই বলে আপনার কথায় আমি সতীধর্ম থেকে পতিত হবো?

—তাই যদি মনে করেন—মুকুন্দ দাস বলে, তো জানবেন দেশ ধর্মের জন্য সে ধর্ম বলি দিতে হবে—

—কিছুতেই না—সরে দাঁড়ান আমার পথ থেকে—

—না—

—কুম্পাবৎ সর্দার—

—না—

—রাঠোর সর্দার মুকুন্দ দাস—আজো যোধপুরের মহারাজের পাটরানী আমি জীবিত—ভুলে যাবেন না—আপনার ঔদ্ধত্য—

—ক্ষমা করবেন—আপনার যা খুশি আপনি করতে পারেন—যে শাস্তি আপনি আমায় দিতে চান দেবেন কিন্তু তবু জানবেন রাঠোরদের শেষ আশাটুকু আমি নির্মূল হতে দেব না—

—রক্ষী—চিৎকার করে ডাকলেন মহারানী—এই দুর্বিনীত রাঠোর সর্দারকে বন্দী—

কিন্তু রানীর কথা শেষ হলো না, চকিতে নিজ কটিদেশ থেকে অসি মুক্ত করে জলন্ত বাঘের মত সোজা হয়ে দাঁড়াল মুকুন্দ সর্দার—খবরদার, কেউ এক পা এদিকে এগুবে তো তাকে আমি টুকরো টুকরো করে ফেলব। তার পর পট্টমহারানীর দিকে তাকিয়ে বলে—ক্ষমা করবেন মহারানী—যোধপুর আর সমগ্র রাঠোরকুলের মঙ্গল চিন্তা করে একান্ত অনন্যোপায় আমি আপনাকে আজ থেকে নজরবন্দিনী করলাম। রম্ভা—

—সর্দার—

—তুমি আর চৈতী আজ থেকে সর্বক্ষণ মহারানীর প্রহরায় থাকবে।

পাষাণমূর্তির মত পট্টমহাদেবী দাঁড়িয়ে রইলেন—অদূরে মহারাজ যশোবন্তর নশ্বর দেহ চিতাগ্নিতে পুড়ে ভস্ম হয়ে যেতে লাগল। দিনমণি অস্তাচলমুখী হলেন। আর একটি হিমরাত্রি তার কালো পক্ষ বিস্তার করে পৃথিবীর বুকে নেমে আসতে লাগল। কালরাত্রি—অমারাত্রি।...

রম্ভা ধীরে ধীরে এগিয়ে এলো মহারানীর সামনে।—রানীমা—

মহারানী বারেকের জন্য কেমন যেন অসহায় শূন্যদৃষ্টিতে একবার তাকালেন রম্ভার মুখের দিকে, তারপরই সহসা জ্ঞান হারিয়ে ছিন্নমূল তরুর মত মাটিতে পড়ে গেলেন।

রম্ভা একটা চিৎকার করে ওঠে।

মহারানীর পরিচারিকারা সবাই ছুটে আসে যারা এতক্ষণ পুতুলের মত দূরে দাঁড়িয়ে সমস্ত ব্যাপারটা দেখছিল।

তাঁবু সব তুলে ফেলা হয়েছিল—যাত্রার জন্য সবাই প্রস্তুতও ছিল কিন্তু কি জানি কি ভেবে কুম্পাবৎ সর্দার মাড়বার যাত্রা আপাততঃ স্থগিত রাখল।

সর্দার দুর্গাদাস সিংহ প্রশ্ন করে, আপাততঃ তাহলে আমরা যাত্রা করছি না মুকুন্দ দাস?

—না। ভেবে দেখলাম সেটা উচিত হবে না দুর্গাদাস। মহারানী সাত মাস অন্তঃসত্ত্বা তার উপর মহারাজের বিয়োগে শোকাতুর, এ অবস্থায় দীর্ঘ দুর্গম পথে অগ্রসর হওয়া উচিত হবে না।

—তাহলে, দুর্গাদাস বলে, তাঁবু আবার লাগান হোক—

—তাই আদেশ দাও।

সেই দুর্গম হিন্দুকুশ পর্বতের সানুদেশে জনমানবহীন সেই উপত্যকায় মুকুন্দ দাস আরো তিন মাস অপেক্ষা করল।

শীতের শেষে এলো বসন্ত। তুষার গলে গেল। পাহাড়ের গায়ে গায়ে সবুজ আস্তরণ দেখা দিল আর সেই আস্তরণের মধ্যে মধ্যে সরু রুপালী পাড়ের মত ঝর্ণাধারা দেখা দিল।

চারিদিকে নানাবর্ণের পুষ্পসমারোহ। নয়নাভিরাম।

তারও পরে এলো গ্রীষ্ম—আর সেই গ্রীষ্মেরই এক প্রত্যূষে যশোবন্তর বিধবা মহিষীর নবজাত শিশুর ক্রন্দনে আশপাশ মুখরিত হয়ে উঠল।

ছুটে আসে মুকুন্দ দাস, দুর্গাদাস ও অন্যান্য রাঠোর সর্দারেরা—কি, কি হলো? ছেলে না মেয়ে?

হাস্যোৎফুল্ল মুখে মহারানীর তাঁবুর ভিতর থেকে প্রধানা পরিচারিকা বের হয়ে এসে জানাল, ছেলে—

মহারানী একটি পুত্রসন্তান প্রসব করেছেন।

—আঃ—রাঠোর সর্দার মুকুন্দ দাস মনে মনে দেবতাকে প্রণাম জানায়। দেবতা, তুমি আমার মুখ রেখেছো—

আর সেই দিন—সেই দিনই রাত্রে রম্ভা মহারানীর তাঁবু থেকে বেরুতে গিয়ে হঠাৎ মাথা ঘুরে পড়ে গেল।

কবিরত্ন সংবাদ পেয়ে তাড়াতাড়ি ছুটে আসে।

নাড়ি ধরে। এবং নাড়ির গতি পরীক্ষা করতেই তার মুখখানা থমথমে কালো হয়ে ওঠে। পাশেই ছিল ভাই রতন সিংহ দাঁড়িয়ে—উৎকণ্ঠিত রতন সিংহ প্রশ্ন করে, কি—কি হলো কবিরত্ন? রম্ভা সুস্থ হবে তো?

কবিরত্ন ভ্রূকুটি করে তাকাল রতন সিংহের দিকে।

রতন সিংহের বুকের ভিতরটা যেন কি এক অজ্ঞাত ভয়ে কেঁদে ওঠে।

সে পুনরায় প্রশ্ন করে, বলুন কবিরত্ন। চুপ করে থাকবেন না—

ধীরে ধীরে কবিরত্ন উঠে দাঁড়াল রম্ভার শয্যার পাশ থেকে।

—কবিরত্ন—রতন সিংহ উৎকণ্ঠিত কণ্ঠে প্রশ্ন করে।

—কি?—বৃদ্ধ কবিরত্ন তাকাল রতন সিংহের দিকে ভ্রূকুটি করে।

—রম্ভার কি হয়েছে কবিরত্ন?

—ভয় নেই—মরবে না। যা হয়েছে তাতে মেয়েমানুষ মরে না—

—কি হয়েছে?

—ন্যাকামি করছো কেন? হঠাৎ যেন বৃদ্ধ কবিরত্ন বিদ্রূপ করে ওঠে, কি হয়েছে নিজের বোনের তা জান না? মা—মা হতে চলেছে। বুঝলে, তোমার কুমারী বোনটি মা হতে চলেছে—

—সে কি?

—হ্যাঁ—পার তো এসো আমার সঙ্গে—বিষ দেবো ঐ অজ্ঞান অবস্থাতেই—

—কবিরত্ন। চিৎকার করে ওঠে রতন সিংহ।

বাপ-মা-মরা বোন। বুকে-পিঠে করে মানুষ করেছে রতন বোনটির যখন মাত্র দেড় বছর বয়স তখন থেকে। কত আদরের কত প্রিয় বোনটি!

মেবারের এক সম্ভ্রান্ত ঘরের ছেলে রতন সিংহ। সাক্ষাৎ না হলেও রানাদের রক্তের সঙ্গে একটা ক্ষীণ সম্পর্ক ছিল। আর সেই সম্পর্কের সূত্র ধরেই যাতায়াত ছিল রতন সিংহের রাজপ্রাসাদে।

এক হোলি উৎসবে পরিচয় হয় সেদিনকার যুবতী কুমারী মহারানীর সঙ্গে। এবং ক্রমে সে পরিচয় গাঢ় হয়ে দুজনার মধ্যে ভাই বোনের সম্পর্ক গড়ে ওঠে।

মেবারের রাজকুমারীর যশোবন্ত সিংহের সঙ্গে বিবাহ হলো—হলেন তিনি

মাড়বারের পাটরানী। পট্টমহাদেবী। সঙ্গে এলো রতন সিংহ ও তার সঙ্গে ত্রয়োদশবর্ষীয়া বোনটি রম্ভা। মেবারের রাজ-অন্তঃপুরে স্থান পেল রম্ভা।

পাটরানী স্থান করে দিলেন রম্ভাকে রাজঅন্তঃপুরে এবং রতন সিংহ নিযুক্ত হলো মহারাজ যশোবন্তর বিশেষ দেহরক্ষী। আর সেই প্রিয়দর্শিনী রম্ভাই যৌবন সমাগমে হলো একদিন মহারাজ যশোবন্তর নর্মসহচরী।

তাঁবুর দরজাটা হাওয়ায় উড়ছে পতপত করে। গ্রীষ্মের মধ্যরাত্রির হাওয়া।

কবিরত্ন প্রস্থান করেছে।

রম্ভা ঔষধের প্রভাবে শয্যার উপরে অঘোরে ঘুমোচ্ছে তখনো। রতন সিংহ তাকাল রম্ভার দিকে। বিষণ্ণ করুণ মুখখানি। মাথার কেশরাশি বিপর্যস্ত। বড় আদরের বাপ-মা-হারা বোনটি। এতটুকু বয়স থেকে কোলেপিঠে করে মানুষ করেছে। আর ঐ বোনটির জন্যই আজও নিজে সে বিবাহ করল না।

কিন্তু এ কি শুনল সে। এ কি নিদারুণ সংবাদ দিয়ে গেল কবিরত্ন।

রম্ভা—ফুলের মত কোমল, নিষ্পাপ রম্ভা—সে কলঙ্কিনী। সে কুমারী অবস্থায় মা হতে চলেছে। সে অন্তঃসত্ত্বা।

না, না—এ অসম্ভব। নিশ্চয়ই এর মধ্যে কোথায়ও কোন ভুল আছে। না হয় সে-ই ভুল শুনেছে। এ হতে পারে না। এ কখনই হতে পারে না। তাকাল আবার রতন সিংহ অদূরে শয্যার উপর শায়িতা রম্ভার দিকে।

বড় আদরের বোনটি তার। মুদ্রিত দুটি চক্ষু, চক্ষের কোণে কালি। শীর্ণ বিষণ্ণ মুখখানা—যেন মনে হয় প্রখর রৌদ্রতাপে ঝলসে গিয়েছে পদ্মকলিটি। নির্নিমেষে চেয়ে থাকে তাঁবুর মধ্যস্থিত প্রদীপের মৃদু আলোয় অদূরে শয্যার উপরে শায়িতা রম্ভার মুখখানির দিকে রতন সিংহ। দেড় বছরের মাতৃহারা শিশুকে সে কোলে-পিঠে করে এত বড়টি করে তুলেছে। চোখের সামনে ধীরে ধীরে যাকে সে বেড়ে উঠতে দেখল সেই রম্ভা কলঙ্কিনী।

হতে পারে না। এ কখনই হতে পারে না।

কিন্তু বৃদ্ধ কবিরত্ন। তার তো ভুল হয় না। সাক্ষাৎ ধন্বন্তরী সে—তার ভুল আজ পর্যন্ত কখনো হয়নি। অদ্ভুত বিচিত্র অবিশ্বাস্য নাড়িজ্ঞান তার।...দেহের মধ্যে কোথায় কতটুকু বিকল হয়েছে—কি সামান্য পরিবর্তন হয়েছে নাড়ি ধরেই সে বলে দেয়। একেবারে নির্ভুল ঠিক-ঠিক।

মাত্র দুইদিন আগে মহারাজ যশোবন্তর নাড়ি ধরেই বলে দিয়েছিল তাঁর অবশ্যম্ভাবী মৃত্যুর কথা। বলে দিয়েছিল নির্ভুলভাবে—তাঁর শেষ মুহূর্ত ঘনিয়ে এসেছে। মৃত্যুর দ্বারে মহারাজ যশোবন্ত। চব্বিশ ঘণ্টা থেকে আটচল্লিশ ঘণ্টা মাত্র সময়ের বেশী নয়।

কেউ অবিশ্যি সেদিন কবিরত্নের অমোঘ ভবিষ্যৎবাণী বিশ্বাস করেনি। মুকুন্দ দাসও করেনি—বিকানীর অধিপতি অনুপ সিংহও করেনি। অনুপ সিংহ তো হেসেই উঠেছিল এবং কবিরত্ন মহারাজের তাঁবু ত্যাগ করে যাবার সঙ্গে সঙ্গে ব্যঙ্গভরে বলেছিল, হ্যাঁ—একেবারে সাক্ষাৎ ঈশ্বর এসেছেন—বলে গেলেন মৃত্যু শিয়রে। হামবড়া মুর্খ—

কিন্তু মুকুন্দ দাস বিশ্বাস করুক বা নাই করুক—অনুপ সিংহ যাই বলুক, রতন জানত কবিরাজের নাড়িজ্ঞান কি তীক্ষ্ন—কি নির্ভুল। আর তাই সে রম্ভার নাড়ি পরীক্ষা করেও নিষ্ঠুর ইঙ্গিত দিয়ে গেল যাবার সময়। সাত্ত্বিক ব্রাহ্মণ—অনাচারে শিউরে উঠেছে।

রতন মনে মনে ভাবে—কিন্তু তারই বা প্রয়োজনটা কি? বিষপ্রয়োগের প্রয়োজন কি?…তার কটিবন্ধেই তো তীক্ষ্ন ছুরিকা গোঁজা রয়েছে—সেই ছোরাটা টেনে নিয়ে আমূল—

সঙ্গে সঙ্গে কটিদেশ থেকে তীক্ষ্ন ছুরিকাটা টেনে বের করল রতন সিংহ। হ্যাঁ—সেই ভাল—ঘুমুচ্ছে নিশ্চিন্তে…এই অবসরে…পড়ুক. একেবারে চিরদিনের মত ঘুমিয়ে পড়ুক। ছুরিকা হাতে এগিয়ে যায় রতন সিংহ পায়ে পায়ে—শক্ত মুঠি করে ছোরাটা ধরে সামান্য ঝুঁকে পড়ে শায়িতা রম্ভার বুকের কাছে।

মুদ্রিত চক্ষুদুটি ঐ সময় ধীরে ধীরে খুলে গেল রম্ভার—রম্ভা তাকাল। রতন সিংহের মুখের দিকে তাকাল।

সঙ্গে সঙ্গে কেঁপে ওঠে রতন সিংহের হাতটা। শিথিল হয়ে আসে দৃঢ় মুষ্টি।

—কে?—ক্ষীণ কাঁপা কণ্ঠে ডাকে রম্ভা।

—রম্ভা—

—দাদা—

হলো না, কম্পিত হাত থেকে—শিথিল মুষ্টি থেকে ছোরাটা মাটিতে পড়ে গেল। তবু স্থাণুর মত রম্ভার শয্যাপার্শ্বে দাঁড়িয়ে থাকে রতন সিংহ।

—দাদা—

কিন্তু সাড়া নেই রতন সিংহের। সে যেন প্রস্তরমূর্তির মত নিবাত নিষ্কম্প দাঁড়িয়ে আছে। রক্তোচ্ছ্বাসে লাল দুটো চক্ষু।

—দাদা—

—চুপ—হঠাৎ গর্জন করে ওঠে রতন সিংহ, ডাকিস না হতভাগী আমাকে—ডাকিস না। আমি তোর দাদা নই—নই—নই—আমি তোর কেউ নই—যেন যন্ত্রণায় একটা আর্তনাদ করে ওঠে রতন সিংহ।

বিস্ময়ে বিমূঢ় রম্ভা ততক্ষণে শয্যার উপর উঠে বসেছে। কাঁপছে তার সর্বশরীর বেতসপত্রের মত। ফ্যালফ্যাল করে বোবা দৃষ্টিতে চেয়ে আছে সে তখন রতন সিংহের মুখের দিকে।

হতভাগী আমাকে এমনি করে তুই অন্ধ করলি! পূর্বের মতই আবার যন্ত্রণাকাতর কণ্ঠে যেন বলে ওঠে রতন সিংহ।

ছলছল করে ওঠে নীলপদ্মর মত দুটি চক্ষু। বলে, কি হয়েছে দাদা—কি করেছি আমি—

—থাম সর্বনাশী! আবার জিজ্ঞাসা করছিস কি করেছিস? চাপা গর্জন করে ওঠে রতন সিংহ।

—দাদা—

—বিষ এনে দিচ্ছি—বিষ খেয়ে মর তুই—মর্, মর্—

—দাদা—কেন আমি বিষ খাবো ? কি করেছি আমি ?

—জানিস না সর্বনাশী তুই কি করেছিস। জানিস কবিরত্ন একটু আগে কি বলে গেল।

—কি বলে গিয়েছে কবিরত্ন ?

—তুই—তুই—কথাটা শেষ করতে পারে না রতন সিংহ।

—দাদা—বলতে হবে না—বুঝেছি আমার সম্পর্কে কবিরত্ন তোমায় কি বলে গেছে—আমি—

—রম্ভা—তীক্ষ্ণ চাপা একটা আর্তনাদের মত যেন শোনায় রতন সিংহের ডাকটা।

কথাটা যেন শান্ত—অত্যন্ত শান্ত গলায় বলে গেল রম্ভা। এতটুকু কাঁপল না, এতটুকু বিচলিত হলো না। যেন নতুন কিছুই সে বলছে না।

অত্যন্ত পুরাতন—অত্যন্ত জানা একটা কথা সে বলছে, আমি নিজেই ভাবছিলাম দাদা কথাটা তোমায় কেমন করে জানাব—কবিরত্ন যখন বলে গেল—

—এ তুই কি করলি—এ তুই কি করলি রম্ভা—বাধা দিয়ে বলে ওঠে রতন সিংহ বোনকে।

রম্ভার নীলপদ্মর মত দুটি চোখের কোল বেয়ে নিঃশব্দে দু'ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ল, এবং শান্ত কণ্ঠে এতক্ষণে বলে, জানতাম আমি দাদা তুমি হয়ত শুনে দুঃখ পাবে, কিন্তু—

—রম্ভা—

—হ্যাঁ দাদা, কিন্তু জেনো আমি সত্যিই নিষ্পাপ—

—কি বলছিস রম্ভা। বিস্ময়ের যেন অবধি থাকে না রতন সিংহের। বিস্ফারিত দুই চোখের দৃষ্টি দিয়ে রম্ভার দিকে তাকায় রতন সিংহ।

এর পরও এতবড় কথাটা রম্ভা বলতে পারছে—

—হ্যাঁ দাদা, আমি কোন অপরাধ করিনি। শান্ত কণ্ঠে রম্ভা বলে আবার।

—রম্ভা। চিৎকার ওঠে রতন সিংহ পুনরায়।

—হ্যাঁ কোন পাপ করিনি। আমি বিবাহিত—

—বিবাহিত। কি বলছিস তুই—

—হ্যাঁ দাদা। বিবাহিত আমি। আমার গর্ভের সন্তানের কোন পাপ কোন অন্যায় নেই—নিষ্পাপ শুভ্র অকলঙ্ক সে—পৃথিবীর সবার মত—সব শ্রেষ্ঠ মানুষের মত সে তার সত্যকারের দাবি নিয়েই পৃথিবীতে আসছে—

—রম্ভা—

—বিশ্বাস করতে পারছো না তুমি বুঝতে পারছি আমি, কিন্তু আমি যা বলছি তার একটি বর্ণও মিথ্যা নয় জেনো। আমার গর্ভের সন্তান নিষ্কলঙ্ক—

—কে—কে তোর স্বামী ?

—আমার স্বামী—

—হ্যাঁ—বল, বল। সত্যিই যদি হয় তোর কথা—তাকে আমি জিজ্ঞাসা

করবো—জিজ্ঞাসা করবো তাকে এত বড় কথাটা গোপন রেখেছে কেন সে।···

—আমিই গোপন রাখতে বলেছিলাম তাঁকে দাদা।

—তুই—

—হ্যাঁ, আমি। নচেৎ তিনি সর্বসমক্ষে প্রকাশ করতেই তো চেয়েছিলেন। আমি দিইনি—আমিই তাঁকে প্রকাশ করতে দিইনি।

—কিন্তু এখন—

—যা অপ্রকাশ আছে তা অপ্রকাশই থাকবে দাদা—

—কি—কি বললি।

—তাই দাদা। কারণ আজ আর কোন উপায় নেই—

—অসম্ভব। প্রকাশ আজ তাকে করতেই হবে। নচেৎ আমি তাকে খুঁজে বের করবই তারপর এই অসি-মুখে—বলতে বলতে কোষ থেকে ধারাল অসিটা টেনে বের করে রতন সিংহ।

—কিন্তু তাকে তো আজ আর খুঁজে পাবে না দাদা—শান্ত কণ্ঠে বলে রম্ভা।

—খুঁজে পাবো না।

—না—

—কে—কে সে? কি নাম তার? কি তার পরিচয়?

—তাও তুমি জানতে পারবে না। পূর্ববৎ শান্ত কণ্ঠেই আবার রম্ভা জবাব দেয়।

—জানতে আমাকে হবেই—

—দাদা।

—হ্যাঁ—যেমন করে হোক জানবই আমি।

—বলতে পারি আমি তাঁর নাম—

—রম্ভা।

—কিন্তু এক শর্তে—

—কি? কি শর্ত?

—সে নাম কোনদিন কোন কারণেই দ্বিতীয়বার আর কারো কাছে তুমি উচ্চারণ পর্যন্ত করতে পারবে না এই শর্তে—

—রম্ভা—তার পরিণাম তুই জানিস। জানিস কি কলঙ্ক—

—জানি দাদা। তবু—তবু ঐ একটিমাত্র শর্তেই তাঁর নাম তোমাকে আমি বলতে পারি।

কিছুক্ষণ চুপচাপ পাথরের মতন দাঁড়িয়ে রইল রতন সিংহ, তারপর বোনের মুখের দিকে চেয়ে বলে, বেশ—বল।

—আবারও বলছি—তাঁর নামটা না শুনলেই বোধহয় তুমি ভাল করতে দাদা—

—না, না—শুনবোই আমি। বল, বল কি নাম তার?

—পরম ভট্টারক মহারাজা যশোবন্ত সিংহ।

নামটা উচ্চারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে একটা আর্ত চিৎকার রতন সিংহের কণ্ঠ চিরে বের হয়ে এলো পুনরায়, কি—কি বললি ?

মহারাজা যশোবন্ত সিংহ ! শান্ত কণ্ঠে আবার নামটা উচ্চারণ করল রম্ভা।

যোধপুর অধিপতি—রাঠোর কুলতিলক পরম ভট্টারক মহারাজাধিরাজ যশোবন্ত সিংহ। এও বিশ্বাস করতে হবে তাকে, মহারাজের মত একজন বয়স্থ বিজ্ঞ লোক তার মত এক সামান্য রাজপুতের সম্মান গৌরবকে এমনি করে লুণ্ঠন করেছেন চোরের মত নিজের আয়ত্তের মধ্যে পেয়ে।

সর্বক্ষণ দিবসে নিশীথে দুই চক্ষু মেলে যে তার দেহকে রক্ষা করেছে—যার জন্য সে প্রাণ পর্যন্ত দিতে সর্বক্ষণ প্রস্তুত ছিল সেই কিনা তার বুকে এমনি করে শেল হানল। এমনি করে তার মান সম্ভ্রম ইজ্জত সব কিছুকে ধুলোয় লুটিয়ে দিল। একটা নিরুপায় আক্রোশে, সীমাহীন বেদনায়—মর্ম-জ্বালায় হতভাগ্য রতন সিংহের বুকের ভিতরটা যেন পুড়ে ছাই হয়ে যেতে থাকে।

রক্তচক্ষে আর একবার তাকাল রতন সিংহ রম্ভার দিকে—বুকের মধ্যে অবরুদ্ধ পশুটা যেন গর্জন করে ওঠে—কে জানে এখানে দাঁড়িয়ে থাকলে হয়ত নিজেকে সামলাতে পারবে না—ক্রোধ দমন করতে পারবে না। ছুটে বের হয়ে যায় তাঁবুর মধ্যে থেকে রতন সিংহ। দুটো দিন দুটো রাত তারপর নিদারুণ একটা যন্ত্রণায় পাগলের মতই যেন ছটফট করে বেড়ান রতন সিংহ। কি করবে, এখন সে কি করবে! এ কি হলো তার, এ কি হলো!

এদিকে মুকুন্দ দাস মহারাজের নবজাত শিশুকে নিয়ে যোধপুর যাত্রার আয়োজন করতে থাকে। আর দেরি নয়—এবারে যত শীঘ্র সম্ভব মাড়বারে ফিরে যেতে হবে।

ধূর্ত শয়তান ঔরংজীবকে বিশ্বাস নেই।

কে জানে এত দিনে সব সংবাদ তার কানে পেঁছে গিয়েছে কিনা। যদি গিয়ে থাকে তাহলে সেই শয়তান সর্বতোভাবে তাদের বাধা দেবে। তারা যোত নিরাপদে মাড়বারে না পেঁছাতে পারে মহারাজের শেষ বংশধর—রাঠোরকুলের শেষ আশাটুকু বুকে নিয়ে, তার জন্য সর্বপ্রকার বাধাই সে দেবে।

অনুপ সিংহ—বিকানীর অধিপতি অনুপ সিংহ কিছুদিন পূর্বে ফিরে গিয়েছে রাজধানীতে। সে বিকানীর যাওয়ার পথে দিল্লীতে সম্রাট ঔরংজীবের সঙ্গে দেখা করে গোপনে সব সংবাদ যদি দিয়ে যায় তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই আর দেবেও হয়ত সে।

উদ্ধত উন্নাসিক ঐ বিকানীর অধিপতি মুঘলের অনুগ্রহকে জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ বলে মনে করে। ওর আর আর ভাই—পদ্ম সিংহ, কেশরী ও মোহন সিংহের একেবারে বিপরীত।

দুর্ভাগ্য বিকানীরের—দুর্ভাগ্য দেশের যে পদ্ম সিংহ কেশরী সিংহের পরিবর্তে

বিকানীরের সিংহাসনে আজ উপবিষ্ট যবনপদলেহী অনুপ সিংহ।

সত্যিই বিকানীরের দুর্ভাগ্য—না হলে—

শাহজাদা শাআলমের শ্যালকের সঙ্গে শিকারে গিয়েছিল মোহন সিংহ। একটা মৃগশিশু নিয়ে দুজনের মধ্যে মতানৈক্য—বিবাদ।

সহসা শাআলমের শ্যালক অশ্লীল একটা শব্দ প্রয়োগ করে মোহন সিংহের প্রতি—সঙ্গে সঙ্গে স্বাধীনচেতা বিকানীর-কুমার অপমানে অগ্নিশর্মা হয়ে ওঠে। কোষ থেকে অসি মুক্ত করে শাআলমের শ্যালকের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে হিংস্র একটা বাঘের মত।

কিন্তু দুর্ভাগ্য, যবনের হাতে মোহন সিংহেরই মৃত্যু হলো।

সঙ্গে সঙ্গে সেই দুঃসংবাদ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পদ্ম সিংহের কর্ণগোচর হলো। দাবাগ্নির মত জ্বলে ওঠে পদ্ম সিংহ ভ্রাতার আকস্মিক মর্মান্তিক মৃত্যুসংবাদে। কি—যবনের এতদূর স্পর্ধা। ভায়ের মর্মান্তিক মৃত্যুশোকে পদ্ম সিংহের বুকের ভিতরটা দাউ দাউ করে যেন জ্বলতে থাকে।

একটি মুহূর্তও আর বিলম্ব করে না পদ্ম সিংহ। কয়েকজন সামন্ত সর্দারকে সঙ্গে নিয়ে তখুনি ঘোড়া ছুটিয়ে সোজা গিয়ে যবনের শিবিরে খোলা তরবারি হাতে প্রবেশ করল।

কে?

পরিশ্রান্ত যবন তখন উৎফুল্ল মনে জয়ের আনন্দে সুরার পাত্রটি হাতে নিয়েছে এবং সামনে তখনো রক্তাক্ত হতভাগ্য মোহন সিংহের প্রাণহীন দেহটা পড়ে আছে।

পদ্ম সিংহকে উন্মুক্ত তরবারি হাতে শিবিরমধ্যে প্রবেশ করতে দেখে সঙ্গে সঙ্গে যবনের হাত থেকে সুরার পাত্রটি খসে পড়ে এবংর সে প্রাণভয়ে ছুটে গিয়ে ঢোকে আমখাসে একেবারে। পদ্ম সিংহও তাকে অনুসরণ করে খোলা তরবারি হাতে এসে ঢোকে আমখাসে।

চারিদিকে হই-চই পড়ে যায়।

যবন গিয়ে তাড়াতাড়ি বিরাট একটা স্তম্ভের আড়ালে দাঁড়ায়। ক্রোধে জিঘাংসায় উন্মত্ত পদ্ম সিংহ সেই স্তম্ভের উপরই প্রবলবেগে গায়ের সমস্ত শক্তি একত্র করে হাতের তরবারি দিয়ে আঘাত হানে।

প্রচণ্ড সেই তরবারির আঘাতে স্তম্ভ ও সেই সঙ্গে যবনের দেহ দ্বিখণ্ডিত হয়ে রক্তাক্ত অবস্থায় ছিটকে মাটিতে পড়ে।

স্তম্ভিত নির্বাক সব ভয়ে ও ঘটনার আকস্মিকতায়।

তারপর আর সেদিকে ফিরেও তাকাল না পদ্ম সিংহ, আমখাস থেকে ছুটে আবার যবনশিবিরে ফিরে গেল—ভায়ের রক্তাক্ত মৃতদেহটা সেখান থেকে বক্ষে তুলে নিয়ে অশ্বারূঢ় হলো।

পদ্ম সিংহের অপমানে সেদিন সমস্ত রাজোয়ারা তার পাশে এসে অসি হাতে দাঁড়িয়েছিল। জয়পুর, যোধপুর, হারাবতী—সমস্ত সামন্ত রাজারা তার পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল সেদিন। যবনের সঙ্গে আর আমাদের কোন সম্পর্ক নেই।

মোজাম—শাহজাদা দেখলে বেগতিক। তাড়াতাড়ি বিশ্বস্ত ওমরাহ মুনিম

খাঁকে ডেকে পাঠায়, খাঁসাহেব—আপনি দ্রুতগামী অশ্বে এখুনি বিকানীরে যান—যেমন করে যে ভাবেই হোক পদ্ম সিংহকে প্রতিনিবৃত্ত করতেই হবে। বলবেন—শাহজাদা বিশেষ লজ্জিত দুঃখিত—ক্ষমাপ্রার্থী—যা ঘটে গিয়েছে তার উপর তো আর হাত নেই—রাজকুমার যেন তাকে ক্ষমা করেন, তাছাড়া দোষী তো উপযুক্ত শাস্তিই পেয়েছে।

মুনিম খাঁ গেলেন বটে কিন্তু কৃতকার্য হলেন না—এদিকে পদ্ম সিংহ তার সমস্ত বাহিনী ও অন্যান্য সামন্ত রাজাদের বাহিনী নিয়ে সম্রাটের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে রাজোয়ারার দিকে এগিয়ে চলেছে তখন।

অনন্যোপায় মোজাম তখন স্বয়ং এগিয়ে গেল বিরোধের মীমাংসা করার জন্য—পদ্ম সিংহ তখনো অপমানে জ্বলছে।

মোজাম পদ্ম সিংহের হাতে ধরে ক্ষমা ভিক্ষা করে, বিকানীর-রাজ শান্ত হোন। আমি আমার শ্যালকের অন্যায় দুর্ব্যবহারের জন্য ক্ষমা চাইছি—

মোজাম বিনীত কণ্ঠে বার বার ক্ষমা ভিক্ষা করতে থাকে।

—না—আপনার সঙ্গে—আপনার পিতা আলমগীরের সঙ্গে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই।

—বলছি তো অন্যায় হয়েছে, ক্ষমা চাইছি—মোজাম আবার বলে—আপনারাই আমাদের প্রকৃত বন্ধু, বল, সহায়—আপনারা যদি বিমুখ হন তো আমরা কোথায় দাঁড়াই—এবারকার মত ক্ষমা করুন।

অনেক অনুনয়-বিনয়ের পর তবে শান্ত হয়েছিল বিকানীর অধিপতি পদ্ম সিংহ।

প্রকৃত রাজপুত পদ্ম সিংহ। স্বাধীনচেতা—বলিষ্ঠ-চরিত্র। বিকানীর-রাজের দ্বিতীয় পুত্র পদ্মর ভাই কেশরী সিংহও জ্যেষ্ঠের মতই ছিল—কিন্তু দুর্ভাগ্য বিকানীরের সম্রাটের হয়ে যুদ্ধ করতে গিয়ে দুজনাই যুদ্ধস্থলে প্রাণ দেয়। ফলে বিকানীরের সিংহাসনে বসলো অপদার্থ যবনের উচ্ছিষ্টলোভী অনুপ সিংহ।

হিন্দুর কলঙ্ক—রাজপুতের কলঙ্ক।

মুকুন্দ দাসের মনে হয়—অনুপ সিংহ যশোবন্তর মৃত্যুর কয়েকদিন পরেই তার সৈন্যবাহিনী নিয়ে দিল্লী হয়ে বিকানীরে প্রত্যাবর্তন করেছে। যাওয়ার আগে নিশ্চয়ই সে জেনে গিয়েছে যশোবন্তর পাটরানী অন্তঃসত্ত্বা। সাতমাসের গর্ভিণী। এতবড় একটা সংবাদ কি ঐ রাজপুতকলঙ্ক অনুপ সিংহ এতদিনেও সম্রাট্ ঔরঙ্গজীবকে দেয়নি। নিশ্চয়ই দিয়েছে।

কেবল মুকুন্দ দাসই নয়—রতন সিংহর মনের মধ্যেও সে ভয় দেখা দিয়েছিল।

কাল প্রত্যুষেই যাত্রা।

নিজের তাঁবুর [illegible] কুম্পাবৎ সর্দার মুকুন্দ দাস চিন্তিত মনে বসে ছিল।

[illegible] দিল্লী হয়ে তাদে[illegible]তেই হবে কিন্তু সম্রাটের অজ্ঞাতে দিল্লী অতিক্রম করে [illegible]ওয়া-দুরূহ হবে। [illegible] যদি কোনমতে জানতে পেরে থাকে যশোবন্তর একটি

পুত্রসন্তান হয়েছে তাহলে সহজে তাদের দিল্লীনগরী থেকে বের হতে দেবে না।

—সর্দার—

—কে?

কুম্পাবৎ সর্দার চমকে তাকায় সামনের দিকে।

মুকুন্দ দাসের অতি বিশ্বস্ত ও প্রিয় সৈনিক রামদাস আর মুখ বাঁধা ও হাত বাঁধা মৃত মহারাজের সুপকার বহ্লান তার সঙ্গে।

—একি বহ্লানকে অমন করে বেঁধে এনেছো কেন রামদাস?

—ঐ নরাধম—ঐ পিশাচকেই জিজ্ঞাসা করুন সর্দার—মেঘমন্দ্র স্বরে রামদাস বলে। তারপর একটু থেমে বলে, ও বহ্লান নয়—

—সেকি?

—হ্যাঁ—ও বহ্লানের ছদ্মবেশ নিয়েছে মাত্র—

—সেকি! তবে বহ্লান কোথায়?

—ওকেই শুধান!

—দাও, ওর মুখের বাঁধন খুলে দাও—সর্দার বলে।

রামদাস বহ্লানের মুখের বাঁধন খুলে দেয়।

—কে তুই—রাজস্থানের কোথায় তোর বাস—

—ও রাজস্থানী আদৌ নয় সর্দার—

—মানে?

—হ্যাঁ—ও একজন যবন। মীর খাঁ—

—যবন! মীর খাঁ! এসব কি বলছো তুমি রামদাস?

—হ্যাঁ সর্দার—যা বলছি তার একবর্ণও মিথ্যা নয়। সত্যিই ও যবন—সম্রাট্ আলমগীরের একজন গুপ্তচর মাত্র—

—গুপ্তচর—সম্রাট্ আলমগীরের? আমরা তাহলে যা সন্দেহ করছিলাম মনে মনে সকলে—

—হ্যাঁ—আমাদের মহারাজার মৃত্যুটা—আমরা যা সন্দেহ করেছিলাম সকলে —শুধু পুত্রশোকে স্বাভাবিক মৃত্যু নয়—যবন সম্রাট্ কৌশলে ঐ শয়তানটাকে দিয়ে বিষপ্রয়োগে আমাদের মহারাজকে হত্যা করেছে—

—কিন্তু তুমি, তুমি সে কথা জানতে পারলে কি করে রামদাস?

—এই পত্র থেকে—একটা ভাঁজকরা পত্র এগিয়ে দেয় ঐ সময় রামদাস তার প্রভুর দিকে।—

ওর কাপড়ের ভাঁজে এই পত্রটা ছিল—পড়ুন—পড়লেই সব বুঝতে পারবেন।

ভাঁজকরা পত্রটা খুলে ফেলে মুকুন্দ দাস।

ধূর্ত সম্রাটের ষড়যন্ত্র।

ঐ পত্রে মীর খাঁর প্রতি নির্দেশ রয়েছে কি ভাবে মহারাজের সুপকার বহ্লানের ছদ্মবেশ নিয়ে খাদ্যের সঙ্গে কৌশলে মহারাজকে বিষপ্রয়োগ করতে হবে।

প্রথমে পত্র মারফত মহারাজ পাবেন তাঁর একমাত্র জীবিত বংশধর নয়নের মণি পৃথ্বী সিংহের মৃত্যুসংবাদ দূতের হাতে—তারপর সেই দুঃসংবাদে মহারাজ

স্বাভাবিকভাবে একেবারে যখন ভেঙে পড়বেন—চারিদিকে একটা শোকের বিষণ্ণ ছায়া নামবে—সেই অবসরে করতে হবে বিষপ্রয়োগ।

কি কূট কৌশল!

—হুঁ। তা এর কাছে যে এই পত্র আছে এবং এ আসলে রাজস্থানী নয় সম্রাটের একজন গুপ্তচর তুমি সে সন্দেহই বা করলে কি করে রামদাস? মুকুন্দ দাস প্রশ্ন করে।

—লোকটা পালাচ্ছিল—আমাদের সীমান্ত প্রহরীর হাতে ধরা পড়েছে—পরশু রাত্রে একটা ঘোড়ার পিঠে চেপে পালাচ্ছিল কিন্তু অশ্বারোহণের ব্যাপারে বিশেষ পারদর্শী না হওয়ায় খাইবার গিরিবর্ত্মের ভিতর দিয়ে পালাবার সময় ঘোড়ার পিঠ থেকে পড়ে গিয়ে চিৎকার করে ওঠে আঘাতের যন্ত্রণায়—সেই চিৎকার সীমান্ত-প্রহরীর কানে যায়—

সত্যিই লোকটার চেহারায় আশ্চর্য মিল আমাদের সুপকার বহ্লানের সংগে।
কিন্তু বহ্লান কোথায়?

—সে সংবাদ ওর কাছ থেকে কিছুতেই বের করতে পারলাম না। আমার স্থির ধারণা তাকে হত্যা করা হয়েছে—

—তা যেন হলো কিন্তু ও কাজ হাসিল হবার পরও এতদিন পালায়নি কেন কিছু জানতে পেরেছো ওর কাছ থেকে?

—না—একেবারে বোবা হয়ে আছে শয়তানটা—তবে আমার ধারণা আমাদের রানীমার প্রসবের জন্যই এতদিন অপেক্ষা করছিল—রানীমার সন্তান হওয়ার পরই ও পালাচ্ছিল—

—তাহলে ওর রীতিমত দুঃসাহস বলতে হবে—যাই হোক এই ভয়াবহ ষড়যন্ত্রের কথা যেন তুমি আমি ছাড়া আর তৃতীয় কোন প্রাণী না জানতে পারে—আর এক কাজ কর রামদাস—

—আজ্ঞা করুন!

—আগে ওর জিহ্বাটা কেটে নাও তার পর ওর হাত পা বেঁধে আজই গভীর রাত্রে পাহাড়ের চূড়া থেকে নীচে নিক্ষেপ করবে—যাও, নিয়ে যাও।

আশ্চর্য।

লোকটা—মীর খাঁ কিন্তু এতবড় নিষ্ঠুর দণ্ডাদেশ শোনার পরও কোন রকম ভীত হয়েছে বা কিছু বোঝা গেল না।

পাথরের মত চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল।

রামদাস লোকটার মুখ বেঁধে তাকে নিয়ে মুকুন্দ দাসের তাঁবু থেকে নিঃশব্দে বের হয়ে গেল।

মুকুন্দ দাস আবার পড়া পত্রটা আলোর সামনে মেলে ধরল দ্বিতীয়বার।

পড়বার জন্যই বোধ হয়। কিন্তু পত্রটা মুকুন্দ দাসের পড়া হলো না—বাধা পড়ল।

নিঃশব্দে প্রায় লঘুচরণে—সর্বাঙ্গ একটা কালো কাপড়ে আবৃত এক মূর্তি মুকুন্দ দাসের তাঁবুর মধ্যে এসে প্রবেশ করল এবং চাপা কণ্ঠে ফিসফিস করে

ডাকল, কুম্পাবৎ সর্দার—

নারী কণ্ঠ।

চকিতে মুখ তুলে সেই সর্বাঙ্গ কালো কাপড়ে আবৃত মূর্তির দিকে তাকাল মুকুন্দ দাস।

—কুম্পাবৎ সর্দার।

—কে ? কে তুমি—

মৃদু হাসির একটা শব্দ যেন জলতরঙ্গের মত উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেই থেমে গেল।

—কে—কে তুমি ?

—আমার পরিচয়ে তোমার কোন প্রয়োজন নেই কুম্পবাৎ সর্দার—বলতে বলতে সহসা যেন অতর্কিতে চিলের মত ছোঁ দিয়ে বিমূঢ় স্থাণুর মত দণ্ডায়মান কুম্পাবৎ সর্দারের শিথিল মুষ্টি হতে ধৃত পত্রটা সেই সর্বাঙ্গ কালো কাপড়ে আবৃতা নারীমূর্তি ছিনিয়ে নিল।

—এই—এই—

কিন্তু ধরতে পারল না মুকুন্দ দাস সেই রহস্যময়ী নারীমূর্তিকে—যেমন চকিতে ক্ষণপূর্বে তাঁবুর মধ্যে এসে প্রবেশ করেছিল, ঠিক তেমনিই চকিতে যেন তাঁবুর বাইরে চলে গেল সেই কালো বস্ত্রে আবৃতা রহস্যময়ী নারীমূর্তি।

মুহূর্তের জন্য বিমূঢ় বিহ্বল হয়ে গিয়েছিল কুম্পাবৎ সর্দার তারপরই এক লাফে তাঁবুর বাইরে গিয়ে পড়ে।

॥ ৪ ॥

কিন্তু কোথায় তখন সেই সর্বাঙ্গ কালো কাপড়ে আবৃতা রহস্যময়ী নারীমূর্তি। হাওয়ায় যেন সে মিলিয়ে গিয়েছে।

মধ্যরাত্রি প্রায়—আকাশে দূর পাহাড়ের শীর্ষ ছুঁয়ে বোধকরি ক্ষণপূর্বে দেখা দিয়েছে কৃষ্ণা চতুর্দশীর একফালি চাঁদ—তারই মৃদু আলোয় সমস্ত প্রকৃতি যেন অপূর্ব রহস্যময়ী। আলো-ছায়ার এক অপূর্ব রহস্য।

ব্যাকুল তীক্ষ্ন দৃষ্টিতে তাকায় মুকুন্দ দাস এদিকে ওদিকে—চতুর্দিকে—বহুদূর পর্যন্ত, যতদূর দৃষ্টি চলে তাকিয়ে দেখে কিন্তু কোথায় সেই ক্ষণপূর্বের রহস্যময়ী নারীমূর্তি—নেই—কোথাও নেই। মিলিয়ে গিয়েছে।

আবার ফিরে এলো মুকুন্দ দাস নিজের তাঁবুর মধ্যে। বুঝতে বাকী থাকে না তার একটা গভীর ষড়যন্ত্র তাদের চারপাশে মাকড়সার জালের মত বুনে চলেছে। এবং ষড়যন্ত্র যে কার এবং কিসের তাও বুঝতে বাকী থাকে না কুম্পাবৎ সর্দারের, মহারাজ যশোবন্ত সিংহের নবজাত পুত্র অজিত সিংহের জন্যই এই ষড়যন্ত্র।

চতুর সম্রাট্ আলমগীরেরই এই ষড়যন্ত্র।

অজ্ঞাত একটা ভয়ে বুকটার মধ্যে কাঁপতে থাকে মুকুন্দ দাসের।

মহারাজের মৃত্যু স্বাভাবিক নয়—ষড়যন্ত্র—নির্মম নিষ্ঠুর ভাবে বিষ প্রয়োগে

তাঁকে হত্যা করা হয়েছে, এমন কৌশলে এমন বিষ প্রয়োগ করা হয়েছে যে বিষের ক্রিয়া পর্যন্ত পরিস্ফুট হয়নি—যার ফলে বিষ প্রয়োগের ব্যাপারটা কেউ সন্দেহ পর্যন্ত করেনি। এমন কি বিচক্ষণ কবিরাজও নয়।

এতদিনে তাহলে ঔরংজীবের বাসনা চরিতার্থ হলো। সিদ্ধ হলো তার কামনা। এ জগতে তার সব চাইতে বড় শত্রুকে সে পথ থেকে সরিয়ে দিল।

আর কে আছে রাজোয়ারায়। আর তো কেউ রইল না।

অজিত সিংহ দশ দিনের শিশু মাত্র—কি ভরসা তার উপরে।

ধূর্ত ঔরংজীবের শ্যেনদৃষ্টি এড়িয়ে সেই শিশু বাঁচবে, তারপর একদিন বড় হবে—সুদূরপরাহত। কিন্তু তার চাইতেও বড় চিন্তার বিষয় কে ঐ কালো কাপড়ে আবৃতা দুঃসাহসিনী রহস্যময়ী নারীমূর্তি যে চকিতে তার তাঁবুর মধ্যে এসে তার নিজের হাত থেকে তার জাগ্রৎ অবস্থায় ঔরংজীবের পত্রটা ছিনিয়ে নিয়ে গেল। কি সাহস, কি ক্ষিপ্রতা, কি চাতুর্য।

ধূর্ত সম্রাট্ ঔরংজীব তাহলে বেশ ভালভাবেই তার জাল বিস্তার করেছে।

করবেই তো—জানা কথা। যে একদিন মুঘোলের তক্ততাউস লাভের জন্য নিজের সহোদর ভ্রাতাদের এমন কি জন্মদাতা বৃদ্ধ অথর্ব পিতাকে ও নিজের সন্তানকে পর্যন্ত নিষ্কৃতি দেয়নি—জঘন্য হীন চক্রান্তে একে একে সকলকে হত্যা বা বন্দী করেছে, সে তার এতবড় শত্রু মহারাজ যশোবন্তর মত মানুষকে যে ছলে বলে কৌশলে হত্যা করবে সে আর এমন বিচিত্র কথা কি।

কাবুলে বিদ্রোহ দমন করতে পাঠান মাড়বার-রাজকে সেও তো দুরাত্মার একটা ছল মাত্র—শয়তান ভেবেছিল যায় শত্রু যদি পরে পরে—দুর্ধর্ষ বিদ্রোহী আফগানদের হাতে যদি মহারাজের মৃত্যু হয় তাহলে লাঠিও ভাঙবে না সাপও মরবে। কিন্তু যখন তা হলো না, সে কূট চাল ব্যর্থ হয়ে গেল, তখনই তো বোঝা উচিত ছিল সম্রাটের বাঁকান নখর অন্যদিক দিয়ে এবারে এগিয়ে আসবে। এত সহজে ঐ শয়তান তাদের নিষ্কৃতি দেবে না—মরীয়া সে।

তবে ওর পথের সব কাঁটা ও একে একে উপড়ে ফেলতে বদ্ধপরিকর। আর মুকুন্দ দাস জানে তা ও ফেলবেও একদিন একটি একটি করে। কোন দিক দিয়েই আর কোন আশা নেই। কোন আশার আলোই আর মুকুন্দ দাস দেখতে পাচ্ছে না।

সমগ্র রাজোয়ারায় আর কে রইল ঐ দুর্ধর্ষ যবন সম্রাটের সঙ্গে যুঝবে। যে হয়ত একদিন পারত সেই মাড়বারের মহারাজা যশোবন্ত—তাকে কৌশলে বিষ-প্রয়োগে হত্যা করল শয়তানটা—ক্ষীণ আশা এখন অম্বরাধিপতি একমাত্র রাজা জয়সিংহ—মির্জা রাজা জয়সিংহ। আর তো সব সমগ্র রাজস্থান জুড়ে ভেড়ুয়ার দল।

মেবারের উদয়পুরের রাজসিংহ—হারাবতী বুন্দীর রাও ভাও সিংহ, কোটার রাম সিংহ, বিকানীর অধিপতি অনুপ সিংহ।

ওদের কিনে নিতে ঔরংজীবের কতক্ষণই বা লাগবে।

না আছে ওদের মধ্যে কারো ব্যক্তিত্ব, না আছে আত্মমর্যাদাবোধ।

—সর্দার—

—কে ?

—সর্দার আমি রামদাস—

—কি খবর ?

—আপনি যেমন যেমন বলেছিলেন তেমনি করা হয়েছে—পর্বতচূড়া থেকে হাত পা মুখ বেঁধে নিক্ষেপ করা হয়েছে বিশ্বাসঘাতককে—

—কিন্তু এদিকে আর এক ব্যাপার ঘটে গিয়েছে রামদাস—মুকুন্দ দাস বলে।

—কি ?

—সম্রাটের সেই পত্রটি আমার হাত থেকে একজন ছিনিয়ে নিয়ে গিয়েছে কিছুক্ষণ পূর্বে—

—সেকি—বিস্ময়ে যেন হতবাক হয়ে যায় রামদাস।

—হ্যাঁ রামদাস, একটু—সামান্য একটু অন্যমনস্ক হয়েছিলাম, এক কালো কাপড়ে আবৃতা নারীমূর্তি সহসা আমার তাঁবুর মধ্যে এসে আমার হাত থেকে পত্রটা ছিনিয়ে নিয়ে চলে গিয়েছে—

—কিন্তু কে সে ?

—বুঝতে পারছো না ঔরংজীবেরই কোন দুঃসাহসিনী গুপ্তচর হয়ত আমাদের মধ্যে স্বচ্ছন্দে বিচরণ করছে—

—ঔরংজীবের গুপ্তচর ?

—হ্যাঁ—ধূর্ত সম্রাট্ আমাদের দলের মধ্যে কাকে কাকে যে উৎকোচে বশীভূত করে তার গুপ্তচরবৃত্তিতে নিযুক্ত করেছে কিছুই বুঝতে পারছি না।

—উপায় ? সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকায় রামদাস কুম্পাবৎ সর্দারের দিকে।

—উপায় আর কি, আমাদের আরো সাবধান হতে হবে, সতর্ক থাকতে হবে সর্বক্ষণ, কারণ যে কোন মুহূর্তে যে কোন পথে বিপদ আসতে পারে।

—কিন্তু এ যে সত্যিই রীতিমত তাহলে চিন্তার কারণ হলো। কাকে বিশ্বাস করবো—কাকে করবো না—

—কাউকে বিশ্বাস করবে না রামদাস—আমাকে না—এমন কি তোমাকে, নিজেকেও না। যাক শোন—যাত্রার সব আয়োজন সম্পূর্ণ তো ?

—হ্যাঁ—কাল সূর্যোদয়ের পরই আমরা যাত্রা করবো—

সেই রাত্রে দিল্লীতে। লাল কিল্লায় নিজের মহলে বাদশা আলমগীর অস্থির-ভাবে পায়চারি করছিল। পশ্চাতে দুটি হাত নিবন্ধ।

একাকী চিন্তার সময় সম্রাট্ ঔরংজীবের ঐ একটি বিশেষ ভংগী। নিঃস্ব একক সম্রাট্ যেন। কপালে চিন্তার কুঞ্চন। নিজের মনের মধ্যে যেন নিজে তলিয়ে আছে।

মুকুন্দ দাসের অনুমান মিথ্যা নয় সত্যিই—ইতিমধ্যেই লাল কিল্লায় সম্রাটের কাছে সংবাদ পেঁৗছে গিয়েছে মৃত মাড়বার অধিপতি যশোবন্তর বিধবা মহিষী একটি পুত্র-সন্তানের জন্ম দিয়েছে।

নবজাতক—অজিত সিংহ।...সংবাদটা এনেছে অনুপ সিংহ।

যথোচিত পুরস্কারে পুরস্কৃত করেছে তাকে সম্রাট্। এবং সেই সংগে সত্যিকারের মনের ভাবটা তার ঐ মুহূর্তে যাই হোক মুখে মৃদু হাস্য সহকারে বলেছে, যাক—মাড়বারের একটা দুঃখের সান্ত্বনা হলো, কি বলেন বিকানীর-রাজ?

বিকানীর-রাজ অনুপ সিংহ একটু যেন কেমন থতমত খেয়ে বলেছিল, আজ্ঞে কি বললেন সম্রাট্—

—আচ্ছা বিকানীর-রাজ—আলমগীর মুখ তোলে—ভ্রূদুটো পূর্ববৎ কুঞ্চিত।

—বলুন সম্রাট্?

সম্রাট্ পায়চারি করছিল নিজের নিভৃত মহলে—অনুপ সিংহের নিকট হতে সংবাদটা শোনবার পর থেকে হঠাৎ পায়চারি থামিয়ে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে বলেছিল, রাঠোরদের নিশ্চয়ই একটা বিশ্বাস হয়েছে ইচ্ছা করেই আমি বিষযুক্ত পরিচ্ছদ কুমার পৃথ্বী সিংহকে উপহার দিয়ে তাকে হত্যা করতেই চেয়েছিলাম। কিন্তু বিশ্বাস করুন বিকানীর-রাজ—আল্লার দোহাই—সে ধরনের কোন হীন অভিসন্ধি সত্যিই আমার ছিল না—সমস্ত ব্যাপারটা পৃথ্বী সিংহের দুর্ভাগ্য ছাড়া আর কিছুই নয়—

বিস্ময়ে অভিভূত অনুপ সিংহ সম্রাটের দিকে তাকিয়ে বলে, দুর্ভাগ্য পৃথ্বী সিংহের!

সম্রাট্ বলেছিল, তা ছাড়া আর কি বলি বলুন বিকানী-রাজ—মহারাষ্ট্র মূষিকের জন্য পোশাকটি আমি তৈরি করেছিলাম এবং সেটা পরিচ্ছদ কক্ষে ছিল—কেমন করে কখন যে সেই বিষাক্ত পোশাকটির সঙ্গে পৃথ্বী সিংহের পোশাকটি অদলবদল হয়ে গেল—সত্যি মাড়বারের কাছে মুখ দেখাবারও আজ আর আমার উপায় নেই—কি লজ্জা, কি লজ্জা—সত্যিই দেখুন পৃথিবীতে কলঙ্কের ভাগীই চিরদিন কেবল আমি হলাম, কলঙ্কের ভাগী হলাম আর অভিশাপ গালমন্দ কুড়িয়েই গেলাম। চিরদিন সবার ধারণা আমার মত ধূর্ত অসৎ শয়তান দুনিয়ায় দ্বিতীয়টি আর নেই। স্বার্থের জন্য আমি হীনতম জঘন্য কাজও করি—দারাকে হত্যা করেছি—মুরাদ ও সুজাকে হত্যা করেছি—পিতাকে বন্দী করে কৌশলে হত্যা করেছি—কিন্তু বিশ্বাস করুন রাজা ওর একটাও আমি করিনি—একটার জন্যও আমি দায়ী নই। আমি চিরদিন চেয়েছি আল্লার ইচ্ছানুযায়ী তাঁরই নির্দিষ্ট পথ ধরে এগিয়ে যেতে এবং পবিত্র ইসলাম ধর্মের গৌরবকে জগতে প্রতিষ্ঠা করতে কিন্তু আমার শরীরের মধ্যে যে দুর্ধর্ষ তুর্কীর রক্ত সে রক্তের প্রভাব যাবে কোথায়? অবিমিশ্র তুর্কীর রক্ত আমার শরীরের ধমনীতে ধমনীতে—বেপরোয়া দুর্মদ যাযাবর ক্ষমতালোভীর রক্ত—বাবুরের পরে আমার পূর্বপুরুষরা—আকবর জাহাঙ্গীর পিতা সাজাহাঁ সব মিশ্র রক্তে জন্ম—কিন্তু আমার রক্তের মধ্যে ভেজাল নেই—আমি পুরোপুরি তুর্কী আর সেই রক্তই মাঝে মাঝে আমার—হয়ত আমার ইচ্ছারই বিরুদ্ধে আমাকে দিয়ে আপনাদের বিচারে যা নৃশংস সেই সব করিয়েছে—

সত্যিই অনুপ সিংহকে সেদিন কথাচ্ছলে কথাগুলি বলেছিল সম্রাট্।

কিন্তু সত্যিই কি তাই—সত্যিই কি যা কিছু আজ পর্যন্ত ঘটে গিয়েছে তার ইচ্ছারই বিরুদ্ধে—তাই যদি হবে তো রাতের পর রাত এমন বিনিদ্র কাটে কেন সম্রাটের? চোখ বুজলেই কেন দুঃস্বপ্নের মিছিল? রাত্রির নিঃসঙ্গ অন্ধকারের নিদারুণ এক মর্মদাহ যেন তাকে চারিদিক থেকে নিষ্পেষণ করতে থাকে—অসহ্য এক জ্বালায় যেন ছটফট করতে থাকে সে।

যেন মনে হয় তার মত অসহায়, তার মত দুর্বল সারা দিল্লী শহরে আর দ্বিতীয় একটি প্রাণী নেই।

সহসা রাত্রির স্তব্ধতাকে বিদীর্ণ করে করুণ একটা কান্নার সুর শোনা গেল। চমকে ওঠে আলমগীর।

ঐ সেই করুণ কান্না—কেবল আজই নয়—প্রায়ই মধ্যে মধ্যে রাত্রির স্তব্ধতায় দিল্লীর লাল কিল্লার দেওয়ালে দেওয়ালে ইষ্টকে ইষ্টকে ঐ কান্না গুমরে গুমরে মরে। কত দিন মনে হয়েছে সম্রাটের—কার এতবড় দুঃসাহস সম্রাটের রাত্রির নিঃসঙ্গ বিশ্রামের ব্যাঘাত ঘটায় অমনি করে কেঁদে কেঁদে। টুঁটি টিপে ঐ কান্নার শব্দ চিরদিনের মত থামিয়ে দেবে। মুছে দেবে চিরদিনের মত কিন্তু—আশ্চর্য। পারে না—দুর্বার ক্রোধ যেন দেখতে দেখতে জল হয়ে যায়—হাত-পা শিথিল হয়ে আসে—কণ্ঠের স্বর বুজে আসে। অসহায় সম্রাট্ পাথরের মত দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে একাকী সেই কান্নার মত সুর শুনতে থাকে।

আজ—আজও ঠিক তাই হয়—শিথিল হয়ে আসে হাত-পা—কণ্ঠস্বর বুজে আসছে। কৌন্ হ্যায়—

সম্রাটের সে ডাকে একজন খোজা প্রহরী কক্ষমধ্যে প্রবেশ করে আভূমি-নত হয়ে কুর্নিশ জানায়, খোদাবন্দ্!

বেগম মহলের বাঁদী রৌশন—

খোজা প্রহরী সেলাম জানিয়ে কক্ষ হতে বের হয়ে গেল।

কক্ষের জাফরিকাটা দেওয়ালের সামনে এসে দাঁড়াল সম্রাট্। জাফরির ফোকর দিয়ে তারার আলোয় ঝিকিমিকি যমুনার জলের কালো স্রোত দেখা যায়।

কাঁদছে—এখনো কাঁদছে—আর সেই কান্না যেন শাহানশাহ্ আলমগীরের সমস্ত সংবিৎকে একটু একটু করে গ্রাস করছে।

মৃদু শব্দ শোনা গেল। মৃদু পদশব্দ।

সমস্ত লাল কিল্লার মধ্যে ঘুমের প্রশান্ত স্তব্ধতা নেমেছে—তার মধ্যে ঐ মর্মভেদী কান্না—

—কে?

—মালেক-এ-আলম্—বাঁদী রৌশন—

—রৌশন?

—হ্যাঁ—আলম্‌পনাহ—

—রৌশন—শুনতে পাচ্ছিস?

—কি মালেক-এ-আলম্—

—শুনতে পাচ্ছিস না—কে যেন কাঁদছে—লাল কিল্লায়?

সম্রাটের নির্দেশে রৌশন কয়েক মুহূর্তের জন্য কান পেতে শোনে—তারপরই মৃদু কণ্ঠে বলে, ও তো সেই গান গাইছে আলমপনাহ—

—গান গাইছে? বিস্ময়ের যেন অবধি নেই সম্রাটের। পুনরায় কথাটা বলে, গান গাইছে?

—হ্যাঁ—মালেক-এ-আলম্।

—না না, কাঁদছে—কে যেন কাঁদছে—ভাল করে শোন! কান পেতে শোন—

—না—মালেক-এ-আলম্—ও গান গাইছে।

—কে—কে?

—সেই শাহজাদা দারার হতভাগিনী বেগম।

—বেগম?

—হ্যাঁ—সেই নর্তকী বেগম রানাদিল।

কতকটা যেন সংশয়ে এবং ভয়ে ভয়েও মৃদু, অত্যন্ত মৃদু কণ্ঠে শেষের কথাগুলো উচ্চারণ করে বাঁদী রৌশন।

॥ ৫ ॥

রানাদিল। দারার সর্বাপেক্ষা প্রিয় বেগম রানাদিল।...

ঔরংজীবকে সবাই দোষ দেয়—সবাই বলে তাকে হীন কুটচক্রী কৃতঘ্ন এক হত্যাকারী—হত্যার রক্তে কলঙ্কিত তার ময়ূর সিংহাসন—তার তক্তেতাউস—কিন্তু ঔরংজীবের কি দোষ। তার ভাগ্য—তার নিয়তিই তাকে হাত ধরে এনে তক্তে-তাউসে বসিয়ে দিয়েছে। মেবারের রানা রাজসিংহের এবং মাড়বার অধিপতি মহারাজ যশোবন্তের মত দুই প্রবল পরাক্রান্ত রাজপুত বীর দারার পক্ষাবলম্বন করা সত্ত্বেও ভাগ্যদেবী দারার প্রতি সুপ্রসন্না হননি।

সবই ভাগ্যদেবীর অঙ্গুলিসংকেত। নির্মম নিয়তির নির্দেশ। নচেৎ কেনই বা দারা সম্রাট্ সাজাহাঁর মনোনীত উত্তরাধিকারী হওয়া সত্ত্বেও—জয়সিংহ ও যশোবন্তের সর্বপ্রকার পৃষ্ঠপোষকতা পাওয়া সত্ত্বেও দুনিয়া থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল।

তবু ইতিহাস বলবে চম্বলের যুদ্ধ তো বিশ্বাসঘাতকতা—হীন চক্রান্ত। বলুক, ক্ষতিবৃদ্ধি নেই তাতে সম্রাট্ আলমগীরের এতটুকু। ইতিহাস তো এও বলবে, সম্রাট্ আকবরের মতই দারারও সত্যকার অনুরাগ ছিল না ধর্মবিশ্বাসে। আকবর প্রবর্তিত ধর্মমত "দীন-ই-ইলাহী"র উপযুক্ত শিষ্য দারা, মূর্তির পূজক ও পবিত্র মোহম্মদীয় ধর্মের পরম শত্রু, যার জন্য কাজীর বিচারে তার প্রতি মৃত্যু-দণ্ডাদেশ দেওয়া হয়েছে।

—আলমপনাহ—

—কে?

উত্তোলিত ভ্রূকুঞ্চিত দৃষ্টি, সম্রাট্ তাকায় সামনের দিকে।

—খোদাবন্দ্—বাঁদী রৌশন—

—এখনো এখানে দাঁড়িয়ে আছিস—যা।

আভূমিনত হয়ে কুর্নিশ জানিয়ে রোশন কক্ষ ত্যাগ করে গেল।

জাফরির ছিদ্রপথে আবার দৃষ্টিপাত করে সম্রাট যমুনার ওপরে। রাত্রির যমুনা—মধ্যরাত্রির যমুনা—কালো যমুনার জলে তারার আলোর মৃদু ঝিলমিল। কাঁপছে যেন বিন্দু বিন্দু আলোর কণিকা।

তাহলে অমনি করে রানাদিল কাঁদে। না না, রোশন বলে গেল, কাঁদে না—গান গায় সে।

নারীর কাছে পরাজয়—দুবার জীবনে মাত্র ঘটেছে ঔরংজীবের। প্রথম যৌবনে—বুরহানপুর—হ্যাঁ, সম্রাট ঔরংজীব নয়, বাদশাহ আলমগীর নয়, দাক্ষিণাত্যের সুবাদার শাহ্‌জাদা ঔরংজীব।

আওরঙ্গাবাদ ছিল তার কর্মস্থল। বুরহানপুর হয়ে প্রায়ই তাকে আওরঙ্গাবাদে যাতায়াত করতে হতো। সেই বুরহানপুরে তার মৌসী সলিহাবানুর স্বামী সুবাদার সারফ খাঁর রক্ষিতা তন্বী সুধাকণ্ঠী বেহেস্তের হুরী হীরাবাঈ—তার কণ্ঠস্বর, তার রূপ প্রথমটা তাকে মোহাবিষ্ট করেছিল সত্য, কিন্তু তারপর সেই মোহের অবসান ঘটিয়ে কখন যে প্রেমের শতদল পাপড়ি মেলল। আর সেই প্রেমের কাছে সর্বপ্রথম সেদিন জীবনে ঔরংজীবের ঘটল পরাজয়। দুর্দান্ত বেপরোয়া অবিশ্বাসী এক পুরুষ প্রথম সেদিন নারীর মোহিনী প্রেমিকা রূপের কাছে মাথা নোয়াল।

সেই প্রথম পরাজয় নারীর কাছে, দ্বিতীয় পরাজয় তাঁর ঐ দারার নর্তকী বেগম রানাদিলের কাছে। নারীর আর এক রূপের কাছে। নারীর ঐশ্বর্যময়ী গরবিনী নারীত্বের কাছে।

কি সে মর্মান্তিক পরাজয়! সে নাকি সম্রাট? ঔরংজীব বাদশা নাকি দীনদুনিয়ার মালিক? বিরাট এক মরু-পর্বত-সাগরচুম্বিত হিন্দুস্থানের একাধীশ্বর?

পয়গম্বর ঔরংজীব—বলে আলমগীর জিন্দাপীর। দিল্লীশ্বরোবা জগদীশ্বরোবা। তাই তার পাশে কেউ নেই—সে একা—অবিশ্বাস আর কৃতঘ্নতার কালো ছায়া তার চারপাশে—চাপা দীর্ঘশ্বাস আর অভিশাপের কটু হলাহল সর্বক্ষণ ফেনিয়ে উঠছে তাকে ঘিরে। একি দারার অভিশাপ—সুজা, মুরাদের অভিশাপ—না আগ্রা দুর্গে বন্দী পিতা সাজাহাঁর অভিশাপ?

কেন এই রাত্রির পর রাত্রির নিদ্রাহীন যন্ত্রণার পাষাণভার? উঃ, কক্ষের হাওয়া কি উত্তপ্ত—আগুনের হল্‌কা যেন। অস্থির অশান্ত পায়ে ঔরংজীব কক্ষ থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে এসে দাঁড়াল সামনের উন্মুক্ত পাষাণ অলিন্দে। সামনেই অদূরে প্রবাহিত যমুনা। মধ্যরাত্রির যমুনা।

কেল্লার পদচুম্বন করে বহে চলেছে যমুনার কালো জল। রাত্রির ঐ যমুনা সম্রাটের যেন বড় পরিচিত। নিদ্রাহীন রাত্রে এই পাষাণ-অলিন্দে এসে দাঁড়ালেই চোখে পড়ে রাত্রির যমুনা।

ইচ্ছা করে সম্রাটের দেহের এই মূল্যবান পোশাক ছেড়ে সোজা নেমে যায় ঐ ঠাণ্ডা জলে।

আবার সেই সুর। রাতের মৃদুমন্দ বাতাসে ভেসে আসছে।

রোশন বলে, রানাদিল বেগম নাকি গান গায়। মিথ্যা, রোশন জানে না, রানাদিল গান গায় না। কাঁদে—বিনিয়ে বিনিয়ে রানাদিল বেগম আজো রাতের অন্ধকারে তার নিভৃত মহলের এক কোণে বসে কাঁদে, দারার জন্য কাঁদে। ভাগ্যবান দারা শিকো।

আজো তার জন্য রানাদিল কাঁদে, অশ্রুমোচন করে।

আশ্চর্য নারী। নামগোত্রপরিচয়হীনা রাস্তার এক নর্তকী। শাহ্‌জাদা দারা শিকোর মন জয় করে নিয়েছিল।

প্রথম যেদিন সংবাদটা পায় ঔরংজীব, ঘৃণায় নাসা কুঞ্চিত করেছিল। মনে মনে দারাকে ব্যঙ্গোক্তি করেছিল। যেমন হীন মন তেমনি রুচি। শাহ্‌জাদার রাস্তার এক নর্তকীকে সাদি করে একেবারে বেগমের পদমর্যাদা দেওয়া।

কিন্তু হীরাবাঈ? সেদিন ঔরংজীবের কথাটা তো কই একবারও মনে হয়নি। আজ এতকাল পরে আলমগীর বাদশার মনে হচ্ছে এত বড় ভুলটা সে কেমন করে করেছিল সেদিন, হীরাবাঈই বা কি—তার সত্য পরিচয়টাই বা কি?

অবিশ্যি সেও রানাদিলের একটি দিক—একটি পরিচয়। অন্য যে পরিচয়—যার কাছে সে পরাভূত হয়েছে, মাথা নত করেছে—রানাদিলের সে পরিচয় তো পেল সে দারা শিকোর মৃত্যুর পর। রানাদিল বেগম তখন ঔরংজীবের হারেমে বন্দিনী।

নর্মদার যুদ্ধে মহারাজা যশোবন্তের বিশ্বাসঘাতকতায় হতভাগ্য দারা শিকো পরাভূত হয়ে আজমীরের অদূরে এসে তার অবশিষ্ট বাহিনী নিয়ে শিবির স্থাপন করেছে। চারিদিকে সুরক্ষিত পরিখা খনন করে আত্মরক্ষার ব্যবস্থা সুদৃঢ় করেছে। ঔরংজীব দেখলো সম্মুখযুদ্ধে ন্যায়যুদ্ধে দারাকে পরাভূত করা এবারে অসম্ভব। অতএব সে কৌশলের আশ্রয় নিল। আর যুদ্ধে কেই বা কৌশলের, চাতুরীর আশ্রয় না নেয়।

বিশ্বস্ত অনুচর দিলওয়ার খানকে দারার শিবিরে প্রেরণ করল সে। ধর্মে বিশ্বাসী সরলমতি দারা অভিভূত হয়ে গেল যখন দিলওয়ার খান পবিত্র কোরান স্পর্শ করে তাকে আশ্বাস দিল শাহ্‌জাদা ঔরংজীবের দলে থাকলেও প্রকৃতপক্ষে আমি চাই আপনিই সম্রাট্ হোন।

সরলমতি ধার্মিক দারা শিকো অভিভূত হয়ে যায়। বলে, খানসাহেব, সত্যি বলছেন?

—মিথ্যা হলে যেন বজ্রাঘাতে আমার মৃত্যু হয়। আমি এই পবিত্র কোরান স্পর্শ করে প্রতিজ্ঞা করছি, কাল প্রত্যূষে যখন যুদ্ধ শুরু হবে আমি আমার সমস্ত সৈন্যদের নিয়ে ঐ শঠ শয়তান ঔরংজীবকে পরিত্যাগ করে আপনার দলে এসে ভিড়বো। আপনি শুধু আপনার সৈন্যদের বলে রাখবেন, তারা যেন আমাকে, আমার সৈন্যদের ভুল করে শত্রু ভেবে না স্পর্শ করে—

মূর্খ দারা ঔরংজীবের কূটনীতিতে সম্পূর্ণ পরাভূত হলো। নিজের সর্বনাশ নিজেই ডেকে নিয়ে এলো পরের দিন।

ঔরংজীব শঠ চতুর হীন চক্রান্তকারী লোকে বলে। কিন্তু তার কি দোষ। ও তো রাজনীতি, যুদ্ধনীতি। রাজনীতি নির্মম নিষ্ঠুর—সেখানে ভাই নেই, বন্ধু নেই, পিতা নেই, মাতা নেই, স্ত্রী নেই—রাজনীতির প্রয়োজনের কাছে আর কোন প্রয়োজন আছে নাকি! পরাভূত পর্যুদস্ত দারা দ্বিতীয়বার অনন্যোপায় হয়ে ছুটে গেল আশ্রয়ের সন্ধানে গুজরাটে। কিন্তু সেখানেও আশ্রয় পেল না।

পশ্চাতে ঔরংজীব তার বিরাট বাহিনী নিয়ে দারাকে তাড়া করে চলেছে তখন।

দারা শিকোর সঙ্গে তখন তার তিন বেগম ও কন্যা সুন্দরী জানি বেগম আর পুত্র শিপার শুকো।

তিন বেগম—নাদিরা বেগম, উদিপুরী বেগম ও রানাদিল বেগম।

দারা শিকো ছুটে যায় আফগানের দিকে—তার শেষ আশা আফগান-রাজ নিশ্চয়ই তাকে আশ্রয় দেবে। কিন্তু দারা জানত না যে মনে মনে আফগান-রাজ ঔরংজীবকে ভয় করত এবং সে তারই দলে। ঔরংজীবের বিরুদ্ধাচরণ করবার দুঃসাহস তার হবে না। আর হবেই বা কেন। আফগান-রাজ তো মূর্খ ছিল না।

কি আছে তখন দারার। পলাতক—পর্যুদস্ত—হৃতসর্বস্ব। যশোবন্তর আশ্বাস নেই—জয়সিংহের আশ্বাস নেই—বিশাল সৈন্যবাহিনী প্রায় বলতে গেলে নির্মূল—আর ঔরংজীব তখন ধাপের পর ধাপ এগিয়ে চলেছে তক্তেতাউসের দিকে।

কে এমন মূর্খ আছে জগতে যে সেদিন ঔরংজীবের নিশ্চিত জয়কে অগ্রাহ্য করে অস্তগমনোন্মুখ দারা শিকোর হাত ধরবে, তার পাশে এসে দাঁড়াবে—

রাজনীতি। নির্মম রাজনীতি। নিষ্ঠুর রাজনীতি। আফগান-রাজ দারা শিকোকে সপরিবারে বন্দী করে কৌশলে তার অবশিষ্ট বিশ্বস্ত অনুগামী সৈন্যদের স্থানান্তরিত করে দিল।

ততক্ষণে ঔরংজীব আফগানের কাছে ধনুরাজ্যে এসে তার বিরাট বাহিনী নিয়ে প্রবেশ করেছে।

নাদিরা বেগম বুঝতে পেরেছিল সর্বনাশকে আর ঠেকিয়ে রাখা যাবে না। তাই সে নিজের হাতেই তীব্র কালকূট-ভরা হীরকাঙ্গুরীয় লেহন করে প্রাণবিসর্জন দিল ধনুরাজ্যে ঔরংজীবের প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গেই।

সংবাদটা পেয়ে ঔরংজীব হঠাৎ যেন স্বম্ভিত নির্বাক হয়ে গিয়েছিল। পরবর্তী কালে মুঘল রাজপরিবারে যে রক্তক্ষরা ইতিহাস ঔরংজীবকে কেন্দ্র করে রচিত হয়েছে হতভাগিনী নাকি সেই রক্তক্ষরা ইতিহাসের প্রথম বলি।

দারা বন্দী হলো ঔরংজীবের কৌশলে—যুদ্ধে নয়। চারটি বিরাট হস্তী বাহিত হয়ে বন্দী দারা শিকোর পরিবারের দল ঔরংজীবের নির্দেশে চলল এবার দিল্লীর পথে।

দীর্ঘ চল্লিশ দিন পরে বন্দীর সেই দল দিল্লীতে গিয়ে পৌঁছোল গোপনে।

কাজীর বিচারে অতঃপর দারা শিকো মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হলো।

মূর্তির পূজক ও মোহম্মদীয় ধর্মের শত্রু দারা শিকো।

সম্রাট্ সাজাহাঁ তার পূর্বেই বন্দী হয়ে আগ্রার দুর্গে রয়েছেন—দিল্লী থেকে দূরে। দারার ছিন্নমুণ্ড পাঠিয়ে দেওয়া হলো সম্রাট্ সকাশে।

ইতিপূর্বেই মুরাদ বন্দী হয়েছে এবং ঔরংজীবের ভয়ে পলায়িত শাহ্জাদা সুজা গুপ্তঘাতকের হাতে নিহত হয়েছে ব্রহ্মদেশের জঙ্গলে।

তক্তেতাউসে উপবেশন করল আল্লার প্রতিভূরূপে ঔরংজীব নিষ্কণ্টক হয়ে।

দারা শিকোর দুই বেগম—উদিপুরী ও রানাদিল বেগম—তাদের কী হবে? কি আবার হবে, ঔরংজীবের হারেমেই তারা আশ্রয় পাবে।

আমন্ত্রণ পাঠাল তাদের ঔরংজীব।

দিল্লীশ্বর. হিন্দুস্থানের বাদশাহ ঔরংজীব। জর্জিয়া দেশের খেরেস্তান কন্যা উদিপুরী বেগম—অতবড় সৌভাগ্য থেকে নিজেকে সে বঞ্চিত করতে চাইল না। সঙ্গে সঙ্গে সে ঔরংজীবের হারেমে এসে প্রবেশ করল। ঔরংজীবের উদিপুরী বেগম।

কিন্তু এক দিন গেল দু'দিন গেল—আরো দিন গেল, রানাদিল এলো না।

বিস্মিত ঔরংজীব। সম্রাট্ আলমগীর। লোকচক্ষে নীচজাতীয়া—প্রথম জীবনে যে দিল্লীর চাঁদনী চকের পথে পথে ঘাগরা আর কাঁচুলি পরে পায়ে ঘুঙুর বেঁধে শত শত পথিকের লালসাসিক্ত দৃষ্টির সামনে নেচে নেচে গান গেয়ে ভিক্ষা করে বেড়িয়েছে এবং যে একান্তই দৈবক্রমে শাহ্জাদা দারা শিকোর নজরে পড়ে সম্রাটের হারেমে মুঘল বাদশাহের ঘরে স্থান পেয়েছিল, সে আলমগীরের আহ্বানকে উপেক্ষা জানায় কোন্ দুঃসাহসে। এতবড় দুঃসাহস তার কোথা থেকে হলো।

প্রথমটায় দুর্নিবার ক্রোধে সম্রাটের ব্রহ্মরন্ধ্র জ্বলে উঠেছিল। ইচ্ছা হয়েছিল বেতমিজ ঐ কুত্তীকে জিন্দা মাটিতে গোর দিয়ে কুত্তা দিয়ে খাওয়াবার হুকুম দেয়। কিন্তু হঠাৎ কি ভেবে কি জানি সম্রাট্ দুর্নিবার ক্রোধকে দমন করে।

মনের কোণে কোথায় একটা কুতূহলও বুঝি উঁকি দেয়ঃ ব্যাপারটা কি। সামান্যা এক ভিক্ষুণী—পথের নর্তকী—স্বয়ং সম্রাটের কাছ থেকে এত বড় সম্মানের আহ্বান পাওয়া সত্বেও কেন সাড়া দিচ্ছে না। এ যে রীতিমত অবিশ্বাস্য ব্যাপার।

পত্র পাঠাল ঔরংজীবঃ তোমার প্রত্যাশা করে আছি বেগমসাহেবা—তুমি এসে আমার মনের শূন্য আসনটি পূর্ণ কর।

একটু স্তুতি।

জবাব এলো পত্র মারফত। মুক্তার মত স্পষ্ট হরফ। জাঁহাপনা, আমি আজ সম্পূর্ণ রিক্ত, শাহেনশা, আপনাকে দেবার মত আমার যে কিছুই আজ আর অবশিষ্ট নেই—

মেঘের মত ঘন কালো পৃষ্ঠব্যাপী কুঞ্চিত রেশমের মত মসৃণ নরম কেশদাম ছিল রানাদিলের। ঔরংজীব রানাদিলের সেই কেশদামকেই স্মরণ করে লিখল, তোমার ঐ ঘন কৃষ্ণ কেশরাশি আমার অন্তরে অন্তরে আনন্দের লহরী তোলে

সুন্দরী, মুগ্ধ আমি—বিস্মিত, বাক্যহারা—ক্ষণিকের জন্য দূর হতে একদিন দেখেছিলাম তোমার সেই কৃষ্ণ কেশদাম—আজো মর্মে মর্মে গাঁথা রয়েছে। ভুলতে পারিনি—

পরের দিনই ঔরংজীবের সেই পত্রের জবাব এলো এবং সঙ্গে এলো সুবর্ণ-থালিতে কাটা গুচ্ছ গুচ্ছ সেই ঘন কৃষ্ণ কেশদাম। নিজের হাতে কেটে মাথার সমস্ত কেশ সম্রাটের নিকট পাঠিয়ে দিয়েছে রানাদিল। সঙ্গে ছোট্ট অনুরোধ—সম্রাট্, এই নিন সেই কেশদাম। এবারে একটু শান্তিতে আমায় থাকতে দিন—

স্তম্ভিত—নির্বাক সম্রাট্।

কিন্তু প্রত্যাখ্যানে প্রত্যাখ্যানে মনের মধ্যে একটা ভয়াবহ জিদ দেখা দিয়েছে তখন সম্রাটের। যা পাওয়া যায় না, মুঠোর মধ্যে ধরা যায় না তার জন্যই মানুষের যত আকাঙ্ক্ষা—তীব্র বেদনাবোধ। ঔরংজীব লিখল—এবারে স্পষ্টাস্পষ্টিই—খোলাখুলিভাবে : হে অনন্যা—হে অনিন্দিতা—হে বরেণ্যা—তোমার হুরী-বিনিন্দিত অপূর্ব দেহবল্লরী আমায় পাগল করেছে—এসো প্রেয়সী কৃপা করো—তোমায় আমি অপমান করতে চাই না, সাদি করে আমার অন্যতমা সম্রাজ্ঞীর আসন দিয়ে আমি ধন্য হতে চাই—

দু'দিন পরে এলো সেই পত্রের জবাব। বড় মর্মান্তিক—বড় করুণ। সম্রাট্ বজ্রাহত।

তীক্ষ্ণ এক ছুরির সাহায্যে নিজের সেই অনিন্দ্যসুন্দর দেহবল্লরী নিজের হাতে ক্ষতবিক্ষত করে—এবং একটি বস্ত্রখণ্ড সেই রক্তে রঞ্জিত করে রানাদিল ঔরংজীবকে পাঠিয়ে লিখেছে ঃ দীন দুনিয়ার মালিক শাহানশাকে এই হতভাগিনীর যে রূপ মুগ্ধ করেছিল সেই রূপ আজ আর নেই জাঁহাপনা—তবে এই অভাগিনীর রক্তে যদি আপনার তৃষ্ণা থাকে তাহলে এতেই কি তিনি তৃপ্ত হবেন না ?

পরাজিত—সম্পূর্ণ পরাজিত হলো সম্রাট্। নারীর কাছে ঔরংজীবের এই দ্বিতীয় বার মর্মান্তিক পরাজয়।

—কে ?

মৃদু সতর্ক পদশব্দে ফিরে তাকায় সম্রাট্, কে ?

—মালেক-এ-আলম্—

—কে ?

সম্রাট্ যেন স্বপ্নের ঘোরে।

—মালেক-এ-আলম্, উজির—

—কি চাও ?

—জরুরী সংবাদ আছে—

—আসুক—

খোজা প্রহরী চলে গেল। অন্ধকার ফিকে হয়ে আসছে—থিরথির করে কাঁপছে যমুনার কালো জল।

—মালেক-এ-আলম্‌—
—কি সংবাদ উজির ?
—মুকুন্দ দাস আর এক দিন মাত্র পথ দিল্লী থেকে—
—গুণগন খাঁকে আমি বলেছি কি করতে হবে।
ঔরংজীব কথাটা বলে আর দাঁড়াল না, নিজের কক্ষের দিকে পা বাড়াল।

॥ ৬ ॥

দীর্ঘ পনের দিন ধরে দীর্ঘ বিপদসংকুল পথ অতিক্রম করে মুকুন্দ দাস সকলকে নিয়ে দিল্লীর প্রান্তে এসে উপস্থিত হলো একদিন এক গ্রীষ্মতপ্ত অপরাহ্নে। এবং দিল্লীর প্রান্তসীমায় এসে উপস্থিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সম্রাট্‌ ঔরংজীবের অনুচর ওমরাহ গুরগন খাঁ এসে মুকুন্দ দাসের সামনে দাঁড়াল।

গুরগন খাঁ সসম্ভ্রমে মুকুন্দ দাসকে সেলাম জানিয়ে বললে, শাহানশা সম্রাটের নির্দেশে আমি আপনাদের সকলকে রাজধানীতে সাদর আহ্বান জানাচ্ছি।

মুকুন্দ দাসের ভ্রূযুগল কুঞ্চিত হয় কিন্তু সে কোন কথা বলে না।

—পথশ্রমে আপনারা ক্লান্ত, রাঠোর সর্দার—সম্রাট্‌ আপনাদের সকলের থাকবার জন্য বিরাট একটি গৃহ সুসজ্জিত করে রেখেছেন—চলুন আমি সেখানে আপনাদের পেঁছে দেবো—

মুকুন্দ দাস একে একে তার চারপাশে দণ্ডায়মান সৈন্যাধ্যক্ষ ও সর্দারদের দিকে তাকাল—মনে হলো কেউ যেন খুশী মনে নিঃসংকোচে আমন্ত্রণটা গ্রহণ করতে পারছে না।

বিচক্ষণ তীক্ষ্নবুদ্ধিসম্পন্ন মুকুন্দ দাস কিন্তু ব্যাপারটা তাড়াতাড়ি সামলে নেয়। সম্রাট্‌ ঔরংজীব অতীব চতুর—ধূর্ত—তাদের মনের মধ্যে সত্যিকারের যাই থাক সম্রাট্‌কে সেটা ঘুণাক্ষরেও জানতে দেওয়া যেতে পারে না। তার অনুচরকে সেটা বুঝতে দেওয়া উচিত হবে না। অন্যথায় তাদের সমস্ত পরিকল্পনা বানচাল হয়ে যাবে।

নবজাতক অজিত সিংহকে হয়ত তখন তারা আর কোনক্রমেই ঐ চতুর শয়তান সম্রাটের হাত থেকে রক্ষা করতে পারবে না।

মুকুন্দ দাস তাড়াতাড়ি বলে, বিলক্ষণ। চলুন খাঁসাহেব কোথায় যেতে হবে—

—চলুন—

আগে আগে গুরগন খাঁ পথ দেখিয়ে চলে, পশ্চাতে মুকুন্দ দাস সকলকে নিয়ে অগ্রসর হয়। রাজধানীর একেবারে মধ্যস্থলে যমুনার তীর ঘেঁষে বিরাট একটা বাগানবাড়ি—গুরগন খাঁ সকলকে নিয়ে এসে সেখানেই তোলে।

বাড়ির চতুর্দিকে সুউচ্চ প্রাচীর, এবং প্রবেশ নির্গমনের একটা মাত্র দরওয়াজা। দরওয়াজা অতিক্রম করে ভিতরে পা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই কেন না জানি মুকুন্দ দাসের বুকের ভিতরটা হঠাৎ কেঁপে ওঠে।

আর কেঁপে ওঠে কি এক অজ্ঞাত আশঙ্কায় যেন মহারাজা যশোবন্তের বিধবা

মহিষীর বুকের ভিতরটা। অজ্ঞাতে সম্রাটের কোন ভয়াবহ সর্বনাশা ফাঁদে তারা সকলে পা দিল না তো।

গুরগন খাঁ বিদায় নেবার আগে বলল, একটা কথা ছিল সর্দার।

—বলুন খাঁসাহেব? তাকায় মুকুন্দ দাস গুরগন খাঁর দিকে।

—বুঝতেই তো পারছেন মহামান্য সম্রাটের বহুসম্মানিত অতিথি আপনারা—বিশেষ করে আপনাদের সঙ্গে শাহানশার অন্যতম শ্রেষ্ঠ সুহৃদ মহারাজা যশোবন্তের মাননীয়া বিধবা মহিষী রয়েছেন—তাই—

তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে মুকুন্দ দাস তাকাল গুরগন খাঁর মুখের দিকে, শুধাল, তাই কি খাঁসাহেব?

—তাই সম্রাট্ বিশেষ করে সেই মহিষীর জন্য বিশেষ প্রহরার ব্যবস্থা করেছেন এই বাড়ির দরওয়াজায়—কয়েকজন সুদক্ষ তাতার সৈন্য দরওয়াজার সামনে দিবারাত্র পাহারা দেবে—

নিজের অজ্ঞাতেই মুহূর্তে মুকুন্দ দাসের ভ্রূদুটো কুঞ্চিত হয়। মুখখানা লাল টকটকে হয়ে ওঠে এবং বলে, কিন্তু তারও কোনই প্রয়োজন ছিল না খাঁসাহেব। আত্মরক্ষায় আমরা—রাজপুতেরা সম্পূর্ণ সমর্থ।

—তা কি আর সম্রাট্ অবগত নন—কিন্তু এখানে কথা হচ্ছে মাননীয়া অতিথি মাড়বারের মহারানী—তাঁর একটা কিছু ঘটলে সম্রাটের কি আপসোসের সীমা থাকবে মনে করুন কুম্পাবৎ সর্দার?···সে লজ্জা সে আপসোস তিনি রাখবেন কোথায় বলুন তখন?

মুকুন্দ দাস ততক্ষণে নিজেকে সামলে নিয়েছে—আর শব্দমাত্র করে না। বরং মৃদু হেসে বলে, বেশ—সম্রাট্‌কে বলবেন খাঁসাহেব, সম্রাটের ইচ্ছাই পালিত হবে। তাঁর ইচ্ছার অমর্যাদা করবো না আমরা।···

—আমি তাহলে এখন আসি—গুরগন খাঁর মুখে প্রসন্ন হাসি।

—আসুন—মৃদুকণ্ঠে প্রত্যুত্তর দেয় মুকুন্দ দাস।

গুরগন খাঁ প্রস্থান করার সঙ্গে সঙ্গেই রতন সিংহ বলে, তাহলে আজ থেকে আমরা সম্রাট্ ঔরঙ্গজীবের নজরবন্দী হলাম সর্দার?

—আপাতদৃষ্টিতে তাই বটে—শান্ত ধীর কণ্ঠে জবাব দেয় কুম্পাবৎ সর্দার।

—তাহলে অতঃপর?

—ব্যস্ত হয়ো না রতন সিংহ। বুঝতেই পারছো আমাদের প্রতিপক্ষ অত্যন্ত ধূর্ত শয়তান এবং সদাজাগ্রত—খুব সাবধানে স্থিরভাবে বিচার করে আমাদের পা ফেলতে হবে।

—কিন্তু সর্দার—

—অধীর হয়ো না রতন সিংহ! সম্রাটের কূট অভিসন্ধিকে ব্যর্থ করে এতদূর পর্যন্ত আমরা যদি আসতে পেরে থাকি, যোধপুরেও আমরা পৌঁছাব সুনিশ্চিত। যাও—সবাই পথশ্রমে ক্লান্ত, বিশ্রাম করগে। তবে একটা কথা—সর্বদা প্রত্যেকে তোমরা সতর্ক থাকবে।

মুখে মুকুন্দ দাস যাই বলুক মনে মনে সত্যিই সে রীতিমত শঙ্কিত হয়ে

ওঠে। রীতিমত চিন্তিত হয়ে ওঠে। ঔরংজীবকে সে খুব ভাল করেই চেনে। শুধু ধূর্ত ও শয়তানই নয়, কেউটের মত হিংস্র। এবং যা সে চিরদিন করে স্থির মস্তিষ্কে ভেবেচিন্তেই করে।

আজ তো নয় অনেক বছর ধরে মুকুন্দ দাস দেখে আসছে ঔরংজীবকে। তার স্বার্থের কাছে সে যেমন নিষ্ঠুর তেমনি কঠিন। কি নির্মমভাবেই না তক্তেতাউসের জন্য দারাকে হত্যা করল—বৃদ্ধ পিতাকে আগ্রা দুর্গে বন্দী করল—গোয়ালিয়র দুর্গে ওদের সব সন্তানদের একটি একটি করে দুই বছর ধরে হত্যা করল।

—সর্দার ?

—কে ?

—আমি চৈতী—

—কি খবর চৈতী ?

—মহারানী একবার আপনাকে স্মরণ করেছেন সর্দার—

—তুমি যাও গিয়ে বলো মহারানীকে আমি এখুনি আসছি—

চৈতী চলে গেল।

মুকুন্দ দাস বুঝতে পারে রাজমহিষী কেন তাকে স্মরণ করেছেন। নবজাত কুমার অজিতের ভবিষ্যৎ ভেবে নিশ্চয়ই তিনি চিন্তিত হয়ে উঠেছেন। মুকুন্দ দাস আর দেরি করে না—রানীর মহলের দিকে অগ্রসর হয়।

মিথ্যা নয়। বুদ্ধিমতী রানী বুঝতে পেরেছিলেন। মেবারদুহিতা মহারানী শুধু রূপে নয় সর্বতোভাবে রাজমহিষী হবার উপযুক্ত। বুদ্ধিতে সাহসিকতায় চারিত্রিক দৃঢ়তায় ও ঔদার্যে সর্বতোভাবেই যেন মহাদেবী রাজরানী হবার উপযুক্ত ছিলেন।

দিল্লীর সীমান্তে পৌঁছাবার পর গুরগন খাঁর আহ্বানে ঔরংজীবের আশ্রয়ে পা ফেলতে মন তাঁর আদৌ সায় দেয়নি তাই। সঙ্গে সঙ্গে মনটা যেন কেমন বিরূপ হয়ে উঠেছিল। অজ্ঞাত অমঙ্গল আশঙ্কায় বুকটার মধ্যে কেঁপে উঠেছিল। কিন্তু তথাপি কুম্পাবৎ সর্দারের কথার উপর কথা বলেননি। সর্দারের উপর যে তাঁর অগাধ শ্রদ্ধা—অসীম বিশ্বাস। ভেবেছিলেন সর্দার নিশ্চয়ই ভুল করবে না। কিন্তু বাগান-বাড়িতে পা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই কি এক অজ্ঞাত আশঙ্কায় যেন বুকের ভিতরটা তাঁর কেঁপে ওঠে। এবং রীতিমত চিন্তিত হয়ে পড়েন। অবশেষে আর স্থির না থাকতে পেরে চৈতীকে প্রেরণ করেন মুকুন্দ দাসের কাছে।

সেদিন মহারাজ যশোবন্তের আকস্মিক মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে হঠাৎ বুকের ভিতরটা যেন খালি হয়ে গিয়েছিল মহারানীর। মনে হয়েছিল সমস্ত জগৎটা যেন শূন্য হয়ে গেল। একেবারে ফাঁকা হয়ে গেল।…এবং সেই শূন্যতা নিয়ে বেঁচে থাকা অসম্ভব জেনেই স্বামীর চিতানলে প্রাণ বিসর্জন দেবার জন্য ছুটে গিয়েছিলেন।

মুকুন্দ দাস যখন সামনে এসে পথরোধ করে দাঁড়িয়েছিল, তাকে সরে যেতে

বলেছিলেন, প্রাণবিসর্জনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ তখন তিনি। কিন্তু মুকুন্দ দাস তাঁকে প্রাণ বিসর্জন দিতে দেয়নি। উম্মাদিনী তাঁকে অসিমুখে প্রতিনিবৃত্ত করেছিল মুকুন্দ দাস। অসহ্য রোষে সর্বাঙ্গ তখন তাঁর জ্বলে যাচ্ছিল।

তারপর কটা মাস কি ভাবে কি দুঃসহ মনঃপীড়ায় যে তাঁর কেটেছে তো একমাত্র তিনিই জানেন—শূন্য জীবনের সে দুর্বিষহ ভার, প্রতিমুহূর্তের সেই বিরহবেদনা। অথচ সব—সব যেন কোথায় কর্পূরের মত উবে গেল যে মুহূর্তে অজিত জন্মাবার পর তার চাঁদমুখখানি প্রথম তিনি দেখলেন। মুহূর্তে যেন সব কিছু তাঁকে ভুলিয়ে দিল।

একমাত্র পুত্র পৃথ্বী সিংহের মৃত্যুব্যথা—স্বামীর আকস্মিক মৃত্যুবেদনা যা বরফের মত সমস্ত বুকটার মধ্যে জমাট বেঁধে ছিল এতদিন সব যেন কেমন করে মুহূর্তে গলে গেল। মাতৃত্বের মন্দাকিনী সমস্ত অন্তর যেন প্লাবিত করে তাঁকে ভাসিয়ে নিয়ে গেল। সকল দুঃখ যেন ধন্য হয়ে গেল মাতৃত্বের মন্দাকিনীর শীতল স্বগীয় স্পর্শে। তারপরই আবার জাগল বুকের মধ্যে নতুন করে বাঁচবার আশা।

হায় রে মানুষের মন—কি বিচিত্র। যার কাছে দুদিন আগেও সব মিথ্যা ছিল, জীবন শুধু ভার বহে বেড়ানো ছিল তার কাছে জীবন যেন আবার নতুন রূপে দেখা দিল।

দু'হাতে নিবিড় স্নেহে নবজাতককে বুকের মধ্যে টেনে নিলেন মহারানী—সোনা আমার, জাদু আমার—ওরে আমার দুলাল—অবিরল আনন্দাশ্রু দু'চোখের কোল প্লাবিত করে বহে যেতে লাগল। বাঁধ যেন মানে না সে অশ্রু।

ধীরে ধীরে তারপর একদিন ঐ নবজাত অসহায় শিশুর মুখখানির দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে প্রতিশোধের স্পৃহা জেগে ওঠে তাঁর বুকের মধ্যে। পুত্র পৃথ্বী সিংহের হত্যার প্রতিশোধ—স্বামী হত্যার প্রতিশোধ।

হ্যাঁ, নিতে হবে তাঁকে। মরলে তো তাঁর চলবে না। মুকুন্দ দাস ঠিকই বলেছে ঃ যেমন করে হোক অন্যায়ের প্রতিশোধ নিতেই হবে আমাদের।

আর প্রতিশোধ নেবে একদিন ঐ শিশুই—ঐ জাতক—অজিত সিংহ।

অজিত সিংহের মা তিনি। মেবারের শিশোদীয় বংশের রক্তধারা তাঁর ধমনীতে—রানা প্রতাপের রক্ত তাঁর শরীরে—মহারাজ যশোবন্ত সিংহের মহিষী তিনি—প্রতিশোধ তাঁকে নিতেই হবে। অজিত—অজিতই প্রতিশোধ নেবে। রক্তের বদলে রক্ত।

—মহারানী—

—কে? ফিরে তাকালেন মহারানী। চৈতী ঘরের মধ্যে কখন এসে ঢুকেছে টেরও পাননি।

—কি রে?

—কুম্পাবৎ সর্দার—

—যা—পাঠিয়ে দে—

চৈতী বের হয়ে গেল এবং একটু পরেই ঘরের মধ্যে এসে প্রবেশ করল কুম্পাবৎ সর্দার মুকুন্দ দাস—

প্রণাম জানায় সসম্ভ্রমে মুকুন্দ দাস, আমায় স্মরণ করেছেন মহারাণী—

—সর্দার।

—বলুন রানীমা—

—এখানে ঐ ধূর্ত সম্রাটের আশ্রয়ে এসে এভাবে ওঠাটা বোধহয় আমাদের সমীচীন হয়নি। সর্দার—

—কিন্তু এছাড়াও তো আমাদের দ্বিতীয় আর কোন পথ ছিল না রানীমা—

—বুঝলাম, কিন্তু—

—দিল্লীশ্বরের সঙ্গে যুঝতে হলেও সামনাসামনি যুঝতে পারব না আমরা রানীমা—কৌশলের আশ্রয় নিতে হবে। শঠে শাঠ্যং—

—কিন্তু এখান থেকে আপনি কি মনে করেন আর সহজে আমরা বেরুতে পারব?

—সহজে বেরুতে আমরা পারব না নিশ্চয়ই, তবু বেরুতেও যে আমাদের হবেই তাও তো সুনিশ্চিত—

—কিন্তু সর্দার—

—আমাকে ভাবতে দিন রানীমা—তারপর দেখি—অন্যান্য সর্দারদের সঙ্গেও পরামর্শ করি—

—একটা কথা সর্দার—

—বলুন।

—আচ্ছা, আপনার কি মনে হয় সর্দার সম্রাট্ অজিতের জন্মের কথাটা জানতে পেরেছে?

—নিশ্চিন্ত থাকুন আপনি—সম্রাট্ জানে—

—জানে?

—নিশ্চয়ই। আর জানে বলেই তার এই কৌশল—কিন্তু আপনি এত ভাবছেনই বা কেন রানীমা, আমরা তো এখনো জীবিত।

—সর্দার—

—রানীমা—আমাদের সর্দার ও সৈন্যদের দেহে যতক্ষণ একবিন্দু রক্ত থাকবে জানবেন কারো সাধ্য নেই দুনিয়ায় আমাদের কুমারের দেহ জীবিত স্পর্শ করে। আপনি ক্লান্ত রানীমা, এখন বিশ্রাম করুন।

মুকুন্দ দাস বিদায় নেয়।

কিন্তু ভেবে ভেবে সর্দাররা কোন পথই খুঁজে পায় না।

ধূর্ত সতর্ক সম্রাটের দৃষ্টি এড়িয়ে কি করে যে তারা এখান থেকে বের হয়ে যাবে বুঝে উঠতে পারে না। হতাশ হলেও চলবে না। অজিত সিংহকে বাঁচাতেই হবে।

সম্রাট্ ঔরংজীবের মনের হদিস পাওয়া এত সহজ নয়, অতি ধীরে এবং সন্তর্পণে সে তার জাল বিস্তার করে। অক্টোপাশের মত অষ্টবাহু দিয়ে ঔরংজীব তার শত্রুকে কুক্ষিগত করে তারপর সম্পূর্ণ নিঃশেষ করে তাকে।

এবারে কিন্তু অত্যন্ত অধৈর্য হয়ে তার চালে ভুল করে বসল।

পাছে সর্দাররা সময় পেয়ে অজিত সিংহকে সরিয়ে ফেলে গোপনে কোন পথে, তাই সে আর কালক্ষেপ না করে সর্দারদের একদিন আমখাসে ডেকে পাঠাল।

সম্রাট্‌কে বিশ্বাস নেই।

সকলের একত্রে একই সময়ে বাড়ি ছেড়ে আমখাসে যাওয়া ঠিক হবে না তাই মুকুন্দ দাস উদাবৎ সর্দার ভরমল ও সুজাবৎ সর্দার রাঠোর বীরশ্রেষ্ঠ রঘুনাথকে বাড়ির প্রহরায় রেখে নিজে, সর্দার রণচর, গোবিন্দ দাস, রঘুপুত্র দারাবৎ চন্দ্রভন ও রতন সিংহকে সঙ্গে নিয়ে আমখাসে সম্রাটের দরবারে গিয়ে হাজির হলো।

সাদর আহ্বান জানায় ঔরংজীব সর্দারদের, আসুন—আসুন—

সকলে সম্রাট্‌কে কুর্নিশ জানায়।

সম্রাট্ শাহানশা আমাদের স্মরণ করেছেন—মুকুন্দ দাস সকলের মুখপাত্র হয়ে কথা বলে।

—রাঠোর সর্দার—আপনাদের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ আছে—

—গুরুতর অভিযোগ?

—হ্যাঁ—রাজদ্রোহিতা—

—কিন্তু কথাটা তো আপনার ঠিক বুঝতে পারছি না শাহানশা—মুকুন্দ দাস বলে: আমরা রাজদ্রোহিতার অপরাধে—

—একটি বিশেষ সংবাদ কি আপনারা আমার কাছে গোপন করেননি—

চকিতে ব্যাপারটা বুঝতে পারে মুকুন্দ দাস কিন্তু কিছুই যেন বোঝেনি এমনি ভাব করে শান্ত কণ্ঠে বলে, সংবাদ গোপন করেছি।

—তাই—

—কি সংবাদ গোপন করেছি জানতে পারি কি সম্রাট্?

—আমার একান্ত সুহৃদ ও দক্ষিণহস্তস্বরূপ মৃত মহারাজা যশোবন্তের পাটরানী কিছুদিন আগে একটি পুত্রসন্তানের জন্ম দিয়েছেন—

—এ অলীক সংবাদ কোথা থেকে পেলেন সম্রাট্!

ঔরংজীবের শান্ত স্বর সহসা কঠিন ও ঋজু হয়ে ওঠে। বলে, কুম্পাবৎ সর্দার—

—যেই দিয়ে থাক আপনাকে সত্যিই সে ভুল সংবাদ দিয়েছে সম্রাট্—তাছাড়া আমাদের মহারানী মহারাজার সঙ্গে চিতানলে আত্মাহুতি দিয়েছেন—

—না—একমাত্র মহারানীই আপনাদের আত্মাহুতি দেননি, যেহেতু ঐ সময় তিনি সন্তানসম্ভাবিতা ছিলেন। শুনুন সর্দার—আপনারা আপনাদের নবজাত কুমারকে আমার হাতে দিন—আমি আপনাদের পুরস্কৃত করবো। সমগ্র মরুস্থলী আপনাদের সামন্ত সর্দারদের মধ্যে আমি ভাগ করে দেবো—

ধক্ করে মুকুন্দ দাসের চোখের তারাদুটো জ্বলে ওঠে। সর্বাঙ্গ দিয়ে যেন আগুন ছুটতে থাকে। শান্ত ধীর কণ্ঠে কুম্পাবৎ সর্দার বলে, আপনি একটু ভুল করেছেন, সম্রাট্।

—সর্দার—

—হ্যাঁ সম্রাট্—রাজপুত্তদের বিচার করতে আপনি একটু ভুল করেছেন। প্রথমতঃ মহারাজার কোন বংশধর জীবিত নেই আর যদি জীবিত থাকতও তুচ্ছ মরুস্থলী—সসাগরা ধরণীর বিনিময়েও আমরা তাকে আপনার হাতে সমর্পণ করতাম না।

—তাহলে এই আপনাদের শেষ কথা ?

—শেষ কথা।

—বেশ—আপনারা যেতে পারেন—সম্রাট্ আর দাঁড়ায় না—আমখাস পরিত্যাগ করে অন্তঃপুরে চলে যায়।

॥ ৭ ॥

বুকের মধ্যে যেন আগুন জ্বলতে থাকে সর্দারদের। আমখাস থেকে বের হয়ে তারা যে যার অশ্বোপরি আরোহণ করে কেল্লা পরিত্যাগ করে। কি নীচ! কি শয়তান!

রতন সিংহ বলে, সর্দার, একটু তাড়াতাড়ি ঘোড়া ছুটিয়ে চলুন—

—কেন বল তো? মুকুন্দ দাস ঘোড়ার লাগাম একটু টেনে ধীর কদমে এগুতে এগুতে পার্শ্ববর্তী রতন সিংহের দিকে তাকাল সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে।

—আমার কেন জানি সম্রাটের শেষের কথাগুলো শোনার পর থেকে মনটা যেন কেন ভাল লাগছে না—।

মুকুন্দ দাসও যে নিজে বিশেষ চিন্তিত হয়ে উঠেছিল সে কথাটা সে প্রকাশ করল না। কেবল রতন সিংয়ের মুখের দিকে তাকাল। মৃদু কণ্ঠে প্রশ্ন করল ?
—কেন রতন ও কথা বলছো কেন ?

কেন কি—একটা কথা কেন বুঝতে পারছেন না সর্দার। ও নিশ্চয়ই জানত যে ওর প্রস্তাবে আমরা কোনমতেই সম্মত হবো না।…তাই ও নিশ্চয়ই প্রস্তুত হয়েই আমাদের কাছে ওর প্রস্তাবটা পেশ করেছিল।

—কি সন্দেহ করছো তুমি রতন ?

—ঠিক বলতে পারছি না তবে সম্রাট্ যে অতঃপর কুমারকে আমাদের হাত থেকে ছিনিয়ে নেবার জন্য সমস্ত রকম কৌশল ও চাতুরীই প্রয়োগ করবে সে সম্পর্কে আমি একেবারে স্থিরনিশ্চিত সর্দার।

আমিও যে বুঝতে পারছি না রতন সিং তা নয়—ও তা করবেই—তবে এটাও সে নিশ্চয়ই জানে যে আমরাও প্রাণ থাকতে কুমারকে তার মত একটা শয়তানের হাতে তুলে দেবো না।

—সর্দার, একটা কথা বলি মনে কিছু করবেন না। অবিশ্যি এটা ঠিকই কুমারের জন্য আমরা সকলেই প্রাণ দেবো—আর দেশের লোক সে কথা স্মরণ করে একদিন হয়ত ধন্য ধন্যও করবে আমাদের, কিন্তু তার চাইতেও বড় কথা হচ্ছে আজ যদি কুমারকে আমরা ঐ শয়তান চক্রী সম্রাটের কবল থেকে দূরে না নিয়ে যেতে পারি তাহলে জানবেন মরুস্থলীর সমস্ত আশা ভরসা নিঃশেষ হয়ে

যাবে—এবং আমাদের উপর সম্রাট্ যে জঘন্য অত্যাচার করেছে তার কোন প্রতিকারই আর হবে না—এবং সব কিছু নির্মূল হয়ে যাবে। আমাদের তাই এখন প্রধান ভাবনাই হচ্ছে কি ভাবে কুমারকে আমরা ঐ শয়তানের গ্রাস থেকে বাঁচাতে পারি—কি করে আমরা বাঁচতে পারি—

—আমি তো কিছুই ভেবে পাচ্ছি না রতন সিংহ—

—কিন্তু আমার মাথায় একটা মতলব এসেছে সর্দার—

—মতলব। কি ?

—রাস্তায় না—চলুন আগে গৃহে পেঁছাই, সেখানে নিভৃতে আপনাকে সব বলব।···কিন্তু যে মতলব আমি ঠাওরেছি তাতেও অনেকখানি ঝক্কি নিতে হবে আমাদের—এবং আমরা যে সফল হবোই তারও কোন নিশ্চয়তা নেই যেহেতু এখন সম্রাট্ আমরা যা কিছুই করি না কেন সব কিছুতেই, আমাদের সমস্ত ব্যাপারেই সন্দেহ করবে। আমাদের প্রতিটি পদক্ষেপ তার মনে এখন সন্দেহের উদ্রেক করবে।

রতন সিংহের সন্দেহটা যে মিথ্যে নয় সেটা ওদের বাগানবাড়ির কাছাকাছি আসতেই ওরা টের পায়। দ্বারে মাত্র জনা কয়েক রক্ষী নয়, সমস্ত বাড়িটাই চারিদিক থেকে সম্রাটের সশস্ত্র যবন বাহিনী ইতিমধ্যে ঘিরে ফেলেছে তাদের ওখানে এসে পেঁছাবার আগেই।

সকলেরই মুখ গম্ভীর হয়। রতন সিংহ মৃদু কণ্ঠে বলে, দেখুন সর্দার—চেয়ে দেখুন আমার আশঙ্কা মিথ্যা নয়।

কুম্পাবৎ সর্দার মুকুন্দ দাস রতনের সে কথার কোন জবাব দেয় না। ঘোড়ার রাশটা আর একটু টেনে আরও মন্থর গতিতে দরওয়াজার দিকে অগ্রসর হয়।

ইসমাইল খান ওমরাহ্ সৈন্যদলের অধিনায়ক হয়ে এসেছিল, তার সঙ্গে চোখোচোখি হতেই মুকুন্দ দাস প্রশ্ন করে ঘোড়ার রাশ ঈষৎ টেনে ঘোড়ার গতিরোধ করে, খানসাহেব, কি ব্যাপার খানসাহেব— ?

—রাঠোর কুমারের প্রাণ অমূল্য তাই তার প্রহরায় আমাদের সম্রাট্ এখানে দিবারাত্র প্রহরা দিতে নির্দেশ দিয়েছেন—কত দিকে কত শত্রু বুঝতেই তো পারছেন।

—কুমারের জীবন রক্ষার জন্য—হেসে ওঠে মুকুন্দ দাস।

—হাসছেন কেন সর্দার—

—তা ছাড়া আর কি করি বলুন খাঁসাহেব—যার কোন অস্তিত্ব নেই তারই রক্ষণাবেক্ষণের জন্য সম্রাট্ এত ব্যাকুল।

—অস্তিত্বই নেই—

—নিশ্চয়ই—মহারাজের কোন বংশধরই নেই—মিথ্যে সম্রাট্ সন্দেহ করছেন।

—মিথ্যে বুঝি।

—তা ছাড়া কি—মহারাজের যদি কোন বংশধর থাকতই আমরা গোপন করবো কেন—এ কত আনন্দের কথা।

—সম্রাট্ শিশু নন সর্দার—

—তা বুঝতে পারছি বৈকি !···মুকুন্দ দাস মৃদু কণ্ঠে কথাটা বলে দরওয়াজা দিয়ে ভিতরে প্রবেশ করে।

পাশ থেকে একজন সর্দারকে নিম্নকণ্ঠে শুধায়, সম্রাট্ তাহলে সত্যি সত্যিই আমাদের ছল করে বন্দী করল !

—ও কথা বলছেন কেন—সঙ্গে সঙ্গে ইসমাইল খান ওমরাহ্ বলে, আপনারা শাহানশাহের সম্মানিত অতিথি, আপনাদের স্বাচ্ছন্দ্যদান ও নিরাপত্তাই তাঁর একমাত্র উদ্দেশ্য !

মুকুন্দ দাস আর কথা বাড়াল না, অন্দরে প্রবেশ করল।

সেই দিন গভীর রাত্রে উদ্যানগৃহের এক নিভৃত কক্ষে সর্দারদের পরামর্শসভা বসল।

অতঃ কিম্ ?

রতন সিংহই তখন বলে, শুনুন কুম্পাবৎ সর্দার, আমার মনের মধ্যে একটা মতলব এসেছে—

—কি রতন সিং ?

—আগামী পরশু হোলি উৎসব—সেই উৎসবকে কেন্দ্র করে আমরা যদি এখানকার স্থানীয় উচ্চপদস্থ ও সম্মানিত হিন্দুদের মধ্যে মিষ্টান্ন উপঢৌকন দিই—বলে নিম্নকণ্ঠে রতন তার আসল পরিকল্পনাটা ব্যক্ত করল।

কুম্পাবৎ, রণচর, গোবিন্দ দাস, রঘুপুত্র দারাবৎ চন্দ্রভন ও ভরমল প্রভৃতি সর্দাররা সংগে সংগে সোল্লাসে বলে ওঠে, অতি চমৎকার উপায় ভেবেছে রতন সিং—ঠিক আছে আমরা তাই করব।

শঠে শাঠ্যং। আর একজন বলে।

কুম্পাবৎ আরও বলে, ওরা আমাদের সন্দেহমাত্র না করতে পারে এমনি ভাবে আমাদের অগ্রসর হতে হবে—

সর্দার গোবিন্দ দাস বলে, কিন্তু কুম্পাবৎ সর্দার যে উপায় আমরা অবলম্বন করতে চলেছি তা সত্যিই অত্যন্ত বিপদজনক মনে রাখবেন—

কুম্পাবৎ সর্দার মুকুন্দ দাস বলে, বিপদজনক বৈকি—কিন্তু তা ছাড়া আর উপায়ই বা কি—সম্রাটের বিরুদ্ধে মুখোমুখি যখন আমরা দাঁড়াতে পারব না—

অবশেষে রতন সিংহের প্রস্তাবটিই গ্রহণ করা হলো।

গৃহের চারপাশে ইসমাইল খানের সৈন্যরা সর্বক্ষণ প্রহরা দিতে লাগল। একটি মাছিও যেন তাদের অজ্ঞাতে ঐ গৃহের মধ্যে প্রবেশ করতে বা গৃহের বাইরে যেতে না পারে।

আর রাজপুতরাও চুপচাপ। তারাও বেশ নিষ্ক্রিয়। সর্বক্ষণ আনন্দ উৎসবে মেতে আছে—হৈ হল্লা।

তারপর একদিন কুম্পাবৎ ওমরাহ্ ইসমাইল খানকে ডেকে তার হাতে সম্রাট্ ঔরংজীবকে দেবার জন্য এক পত্র দিল।

আশ্চর্য—ঔরংজীব রাজপুতদের এত বড় অভিসন্ধিটা কিন্তু ধরতে পারল না। কোন সন্দেহই জাগল না তার মনের মধ্যে।

ঔরংজীব সানন্দে সর্দারদের মিষ্টান্ন বিতরণের আদেশ দিল। এবং পরের দিন থেকেই রাজপুত সর্দাররা তৎপর হয়ে ওঠে।

দিল্লীর সব পদস্থ ও সম্মানিত হিন্দুদের ঘরে ঘরে বাহকগণ কর্তৃক করণ্ডকে বাহিত হয়ে উদ্যানবাটি থেকে রাশি রাশি সন্দেশ ও নানাবিধ পক্কান্ন বিতরণ শুরু হয়ে গেল। এক দিন দু'দিন তিন দিন ক্রমান্বয়ে ভারে ভারে মিষ্টান্ন প্রেরিত হতে লাগল উদ্যানবাটি থেকে।

প্রথম প্রথম রক্ষীরা সন্দিগ্ধ হয়ে করণ্ডকগুলো পরীক্ষা করে দেখছিল কিন্তু ক্রমে তারাও ক্লান্ত হয়ে পরীক্ষা বন্ধ করে দেয়। তারা নিশ্চিন্ত হয়—এবং মধ্যে মধ্যে তাদের মধ্যেও রাজপুতরা কিছু কিছু মিষ্টান্ন বিতরণ করতে থাকে। তারা মিষ্টান্ন পেয়ে খুশীই হয়।

দ্বিতীয় পর্ব : পলায়ন

॥ ১ ॥

মিষ্টান্ন বিতরণ। দীর্ঘ দশ দিন ধরে ক্রমান্বয়ে দিল্লী নগরীর ঘরে ঘরে করণ্ডক বোঝাই হয়ে মিষ্টান্ন বিতরিত হতে লাগল। সকাল থেকে গভীর রাত্রি পর্যন্ত বিরাম নেই বিশ্রাম নেই—করণ্ডক ভরে ভরে মিষ্টান্ন বিতরণ চলে। মিষ্টান্নভরতি করণ্ডকের পর করণ্ডক বাহকেরা রাজপুতদের প্রাসাদ থেকে বহে নিয়ে চলেছে।

গৃহের চতুষ্পার্শ্বে সদাজাগ্রত সশস্ত্র মোগল প্রহরীরা—ক্রমশঃ তারাও যেন করণ্ডকগুলো প্রত্যেকবার সকাল থেকে গভীর রাত্রি পর্যন্ত পরীক্ষা করতে করতে ক্লান্ত হয়ে পড়ে, এবং তাদের প্রহরা ক্রমশঃ যত দিন যেতে থাকে তত যেন শিথিল হয়ে আসে।

প্রথমদিকে প্রহরীদের মধ্যে কেউ কেউ করণ্ডকগুলো পরীক্ষা করবার সময় তা থেকে মুঠো করে মিষ্টি তুলে নিত। মিষ্টি মুখে পুরে দিয়ে চোখ বুজে স্বাদ আস্বাদন করতে করতে বলত, বহুৎ আচ্ছা মিঠাই তুম হিন্দুলোগ বানাতা—বহুৎ বড়িয়া মিঠাই—

পরে আর বলত না কিছু, মুঠো করে তুলে নিত কিছু মিঠাই করণ্ডক থেকে কেবল।

কেউ কেউ জিজ্ঞাসা করে প্রহরীদের মধ্যে—আরো কেতনা রোজ তোমরা এমনি করে মিঠাই বিলাবে সর্দার?

রাজপুত মিষ্টান্নবাহকেরা জবাব দেয়, পুরো মাহিনা চলবে।

সাচ্?

হ্যাঁ।

লেকেন কিউ—কিউ তুম হিন্দুলোগ সবকোইকো মিঠাই খিলাতা হ্যায়?

পরব হ্যায় না—

পরব—কিসকো পরব?

হিন্দুদের মিঠাই পরব—বাহকেরা হাসতে হাসতে জবাব দেয়।

মোগল সৈন্য গোঁফে তা দিতে দিতে বলে, বহুৎ আচ্ছা পরব—চালাও—

লাল কেল্লায় মোগল সম্রাট্ আলমগীর নিশ্চিন্ত। রাজপুত ব্যাটাদের খুব যাহোক জব্দ করা গেছে। থাক এখন নজরবন্দী হয়ে ঐ গৃহে।

চারিদিকে সতর্ক অস্ত্রধারী সুশিক্ষিত মোগল প্রহরা। সর্বক্ষণ তারা চোখ মেলে রয়েছে।

মহারাজ যশোবন্তের একটি নবজাত পুত্র আছে সে সম্পর্কে ঔরংজীব স্থির নিশ্চিত। ঐ সতর্ক প্রহরা ভেদ করে ওদের পক্ষে কিছুতেই সম্ভবপর হবে না মহারাজের পুত্রকে অন্য কোথায়ও সরিয়ে নিয়ে যাওয়া।

গোপন হুকুম আছে তাদের সেনাপতির ওপরে—এতটুকু সন্দেহ কিছু হলে—এতটুকু বেচাল দেখলে সঙ্গে সঙ্গে খতম করে দেবে।

বড় চালাকি খেলতে চেয়েছিল তার সঙ্গে কাফেররা। এখন কোন্ পথে পালাবে পালাও। কতদিন নজরবন্দী হয়ে থাকবে থাক।

কিন্তু যখন দশ দিন পার হয়ে গেল অথচ রাজপুতদের দিক থেকে কোন রকম বিদ্রোহ বা পালাবার এতটুকু চেষ্টাও দেখা গেল না—করণ্ডক ভরে ভরে দিল্লী শহরের ঘরে ঘরে কেবল মিষ্টান্ন বিতরণ করতেই তারা ব্যস্ত—সম্রাটের মনের কোণে কোথায় যেন একটা সন্দেহের কালো মেঘ উঁকি দেয়।

সর্বদা সমস্ত ব্যাপারে সন্দিহান আলমগীর—যে জীবনে কাউকে কোনদিন মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতে পারেনি। তার মনের মধ্যে যেন একটা সংশয়ের সন্দেহের মেঘ দেখা দিতে শুরু করে ক্রমশঃ। কাফেরদের ঐ নিষ্ক্রিয়তা যেন কেমন স্বস্তি দিচ্ছে না সম্রাট্কে।

আর তাইতেই হঠাৎ মনে হয় ঔরংজীবের, বিকানীর অধিপতি অনুপ সিংহ তার কৃপালাভের আশায় কথাটা তাকে মিথ্যা বলে গেল না তো—

আশ্চর্য নয়—তার অনুগ্রহ লাভের গোপন বাসনায় হয়ত একটা মিথ্যাই আগাগোড়া বানিয়ে বলে গিয়েছে, মৃত মহারাজা যশোবন্তের পট্টমহিষী একটি পুত্রসন্তানের জন্ম দিয়েছেন—কুমার পৃথ্বী সিংহকে কৌশলে হত্যা করলেও সম্পূর্ণ নিষ্কণ্টক হতে পারেনি সম্রাট্ এখনো, যশোবন্তের এখনো একজন উত্তরাধিকারী রয়েছে—আর তা থাকা মানেই ভবিষ্যতের জন্য মাড়বারে দুর্ভাবনা—একটা অদৃশ্য কণ্টক—কখন কিভাবে আহত করবে কে জানে।

না, না—ঐ জাত্যাভিমানী উন্মাদ কাফেরগুলোকে বিশ্বাস নেই—ওরা ওদের দেশ রাজা ও তার মঙ্গলের জন্য হাসতে হাসতে নিজেকে কোরবানি করে।

অবিশ্যি আবার মনে হয় সম্রাটের—নিহত মহারাজা যশোবন্তের সর্বাপেক্ষা বিশ্বস্ত অনুচর কুম্পাবৎ সর্দার নিশ্চয়ই মিথ্যা বলেছে।

মাড়বারের ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারীকে তার আক্রোশ থেকে বাঁচানর জন্য মিথ্যা বলে গেছে সেদিন মুকুন্দ দাস সুনিশ্চিত।

অনুপ সিংহ কখনো মিথ্যা বলেনি—মিথ্যা বলতে পারে না—

কিন্তু সে যাই হোক এখন নিঃশব্দে ওই কাফেরদের সমস্ত গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করা ছাড়া আর কোন উপায় নেই। তাছাড়া চট্ করে একটা জিদ করা হয়ত যুক্তিসংগত হবে না।

যে বড়ের চালটি ঔরংজীব দিয়েছে তাতেই কাফেররা মাত্ হবে। ওয়াল্লাহ্ ইসমাইল খাঁ তীক্ষ্নবুদ্ধি এবং নির্ভরযোগ্য—তার ওপরে যখন ভার দেওয়া আছে, সে নিশ্চয়ই কাফেরদের কোন সুযোগ দেবে না।

লাল কেল্লায় নিজের নিভৃত কক্ষে পায়চারি করতে করতে গভীর নিশীথে সম্রাট্ যখন ঐ কথাগুলো ভাবছিল ঠিক সেই সময়, উদ্যানবাটির একটি নিভৃত কক্ষে সর্দারদের মধ্যে গোপন বৈঠক বসেছিল।

অতঃ কিম্? এবার কোন্ পথে কী ভাবে তারা অগ্রসর হবে?

উদাবৎ সর্দার ভরমল—যেমন দুঃসাহসী বীর তেমনি একটু একরোখা ও জেদী। বয়েস খুব বেশী নয়—চল্লিশ বিয়াল্লিশের মধ্যে। দীর্ঘ লম্বা চেহারা। চোখে মুখে একটা প্রতিজ্ঞার দৃঢ়তা যেন সুস্পষ্ট।

ঘরের মধ্যে এক কোণে প্রদীপাধারে প্রদীপ জ্বলছিল—তারই মৃদু আলোয় আলোকিত কক্ষটি। মধ্যখানে কুম্পাবৎ সর্দার মুকুন্দ দাস—তাকে চতুর্দিক থেকে ঘিরে বসেছে, মাড়বারের অন্যান্য সর্দাররা—

উদাবৎ সর্দার ভরমলই বলে, কিন্তু এবারে বলুন দেখি সর্দার, কুমারকে ঐ যবন দস্যুর হাত থেকে বাঁচাবার জন্য কি স্থির করলেন?

স্থির একটা করেছি বৈকি ভরমল, তবে আমরা সেটা কতটুকু কার্যকরী করতে পারব জানি না—কতটুকু সফল হবো আমরা জানি না।

রতন সিংহ বলে, সফল আমাদের হতেই হবে কুম্পাবৎ সর্দার—জীবন পণ—

ভরমল সায় দেয়, হ্যাঁ—আমাদের এই হাতের তলোয়ার—

সর্দার চন্দ্রভন বলে, উত্তেজিত বা অসহিষ্ণু হয়ে কোন লাভ নেই ভরমল—আমাদের খুব সতর্কতা ও বিবেচনার সঙ্গে এগুতে হবে।

কিন্তু অত ভাবাভাবিরই বা কি আছে, অসহিষ্ণু ভরমল চাপা আক্রোশে বলে ওঠে, আমরা যদি অসিহাতে রুখে দাঁড়াই—

না—মুকুন্দ দাস বলে, তাতে কোন ফল হবে না উদাবৎ সর্দার—ভুলে যাবেন না সম্রাটের অগণিত বাহিনী—তা ছাড়া ইসমাইল খাঁ সত্যিকারের একজন যোদ্ধা—সেটা সুবিধা হবে না—

তবে কি করতে চান আপনি সর্দার মুকুন্দ দাস?

সেই কথা বলবো বলেই এই রাত্রে মন্ত্রণাকক্ষে আপনাদের সকলকে আমি ডেকেছি—শুনুন, আমি কি স্থির করেছি—

কী বলুন। চন্দ্রভন প্রশ্নটা করে মুকুন্দ দাসের মুখের দিকে তাকাল।

ধীরে ধীরে মুকুন্দ দাস আবার মুখ তুলল এবং ঘরের মধ্যে উপস্থিত সকলের মুখের দিকে যেন একবার চোখের দৃষ্টি বুলিয়ে নিল।

ঘরের কোণে রক্ষিত প্রদীপের আলোয় মুকুন্দ দাসের মুখের ডান দিকটা স্পষ্ট দেখা গেলেও বাঁদিকটা ঝাপসা ঝাপসা। সবাই মুকুন্দ দাসের মুখের দিকেই চেয়ে ছিল—সবাই উৎকর্ণ।

হঠাৎ মুকুন্দ দাস কণ্ঠে যথোচিত সম্ভ্রম এনে দ্বারের দিকে তাকাল—ইতিমধ্যে কখন যে নিঃশব্দে পট্টমহাদেবী ভেজান দরজা ঠেলে ঘরে প্রবেশ করে আবার দরজা ভেজিয়ে দিয়েছেন কেউ তা টের পায়নি।

রানীমা—

হ্যাঁ সর্দার!

মৃদু কণ্ঠে পট্টমহাদেবী কথাটা বলে এগিয়ে এলেন।

মুকুন্দ দাস আগেই উঠে দাঁড়িয়েছিল, অন্যান্য সর্দাররাও সসম্ভ্রমে উঠে দাঁড়ায়।

পট্টমহাদেবী বলেন, বসুন সর্দাররা—আপনারা বসুন।

একটি উচ্চ আসন মুকুন্দ দাস এগিয়ে দেয় পট্টমহাদেবীর দিকে।

বসুন মা—

পট্টমহাদেবী উপবেশন করলেন—আমাকে ডেকেছিলেন কেন সর্দার?

মুকুন্দ দাসের মুখের দিকে তাকিয়ে প্রশ্নটা করলেন পট্টমহাদেবী এবারে।

সময় উপস্থিত হয়েছে এবারে রানীমা—মৃদু কণ্ঠে মুকুন্দ দাস বলে, কাল রাত্রি তৃতীয় প্রহরে বলবন্ত সিংহ রাজমুকুট নিয়ে মাড়বারাভিমুখে যাত্রা করবে—

সবাই কেমন যেন বিস্ময়ের সঙ্গে মুকুন্দ দাসের দিকে তাকায়। তার কথার তাৎপর্য যেন ঠিক কেউ তখনো উপলব্ধি করে উঠতে পারেনি।

আপনি সেই মতই ব্যবস্থা রাখবেন। আর রানীমা—আপনি—

আর আমি?

আপনি—মাথাটা নীচু করে মুকুন্দ দাস বললে, আপনি এই উদ্যানবাটিতেই থাকবেন?

কিন্তু তা কেমন করে হবে সর্দার—

তাই করতে হবে রানীমা—আপনি চিন্তা করবেন না—সঙ্গে অবিশ্যি রম্ভা যাবে।

রম্ভা। প্রশ্নটা করে পট্টমহাদেবী কুম্পাবৎ সর্দারের মুখের দিকে তাকালেন।

হ্যাঁ রম্ভা, পুনরাবৃত্তি করল কথাটা সর্দার মুকুন্দ দাস।

সর্দারদের আড়ালে একটি পাশে রতন সিংহ চুপটি করে বসে ছিল—কথাটা তারও কানে গিয়েছিল। সেও ব্যাপারটা বুঝতে না পেরে নাহুর খাঁ (মুকুন্দ দাস)-র দিকে চেয়ে থাকে। কারণ মুকুন্দদাসের পরিকল্পনা শোনার পরই প্রথম যে কথাটা তার মনের মধ্যে উদয় হয়েছিল—তাহলে রম্ভার কি হবে? রম্ভার গর্ভে যে মহারাজ যশোবন্তেরই বংশধর।

কুমার অজিত সিংহের কথা খল দুরাচার যবন সম্রাট্ ঔরংজীব জেনে গিয়েছে এবং তাকে ধ্বংস করতে সে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, এবং যতক্ষণ না অজিত সিংহকে তারা কোন নিরাপদ আশ্রয়ে নিয়ে গিয়ে তুলতে পারে ততক্ষণ তার জীবনের আশা সামান্যই।

কিন্তু রম্ভার ব্যাপারটা কেউ জানে না এবং স্বপ্নেরও অগোচর সকলের।

আর একটা কথাও পূর্বে মনে হয়েছিল রতন সিংহের। তার ভগিনী রম্ভা যে মহারাজ যশোবন্তের গন্ধর্বমতে বিবাহিতা স্ত্রী সে কথা সে আজ কেমন করে প্রমাণ করবে। আর কেমন করেই বা প্রমাণ করবে তার গর্ভে আজ যে সন্তান রয়েছে সে মহারাজ যশোবন্তেরই ঔরসজাত।

এ কাহিনী কে বিশ্বাস করবে। আর তাইতেই চিন্তিত রতন সিংহ প্রশ্নটা করেছিল ভগিনীকে।

রম্ভা তখন বলেছিল, সেজন্য তুমি ভেবো না দাদা—এ সন্তান যে তাঁরই সেটুকু প্রমাণ করতে আমার কষ্ট হবে না—আমার সন্তানের প্রয়োজন হলে তার জন্ম-পরিচয়কে স্বীকৃতির ব্যবস্থা মহারাজই করে গিয়েছেন—

সত্যি—সত্যি বলছিস বোন ?

হ্যাঁ, দাদা—

আঃ তুই আমাকে বাঁচালি—কিন্তু সে প্রমাণটা কি ?

যখন প্রয়োজন হবে তখন সকলেই জানতে পারবে—এখন আমাকে আর কিছু তুমি প্রশ্ন করো না—আমার পক্ষে আর বেশী কিছু বলা সম্ভবপর নয়। রম্ভা চুপ করে গিয়েছিল।

রতন সিংহও অবিশ্যি আর কোন পীড়াপীড়ি করেনি ভগিনীকে।

কিন্তু আজ রতন সিংহ ঠিক বুঝতে পারল না। নাহুর খাঁ বললে—সঙ্গে রম্ভা যাবে—

পট্টমহাদেবী এবারে জিজ্ঞাসা করলেন, কি ব্যবস্থা আপনি করেছেন সর্দার ?

ক্ষমা করবেন মহারানী—আমার পরিকল্পনা সম্পর্কে বিশদ আলোচনা সর্বসমক্ষে আমি করতে পারছি না—তবে এইটুকু বলছি—

মুকুন্দ দাস একটু থেমে রাঠোর সর্দার দুর্গাদাসের দিকে তাকিয়ে বললে, বলবন্ত সিংহ ও রম্ভা দুটি মিষ্টান্ন ও সন্দেশ ভর্তি করণ্ডক নিয়ে কাল রাত্রি তৃতীয় প্রহরে এই উদ্যানবাটি থেকে বের হয়ে যাবে—

তারপর ?

রাজধানী থেকে অর্ধ ক্রোশ দূরে যমুনার তীরে ওদের দুজনার জন্যে দুটি দ্রুতগামী অশ্ব নিয়ে প্রস্তুত থাকবে আমীর খাঁ—

আমীর খাঁ—দুর্গাদাস প্রশ্ন করে।

॥ ২ ॥

সুজাবৎ রঘুনাথ বলে, যবন—এক যবনকে এই ব্যাপারের মধ্যে আপনি টেনে আনছেন সর্দার—

উপায় নেই সুজাবৎ সর্দার—যে দুর্গম পথ দিয়ে করণ্ডকে মাড়বারের রাজ-মুকুট বাহিত হবে সে পথের সন্ধান একমাত্র আমীর খাঁ ব্যতীত কেউ জানে না —আর আমীর খাঁকে আমি বন্ধু বলেই গ্রহণ করেছি।

বন্ধু—হিন্দুর বন্ধু যবন—যবন সম্রাটের এই হীন জঘন্য আচরণের পরও আপনি একজন যবনকে বিশ্বাস করছেন ?—বললে এবারে গোবিন্দদাস।

কিন্তু আপনাদের আমার জানান দরকার সর্দারগণ, আমীর খাঁর কাছ থেকেই প্রথমে আমি সম্রাটের দুরভিসন্ধির কথা জানতে পারি—এবং আজ আমীর খাঁকে না পেলে এই মিষ্টান্ন বিতরণ উৎসবও সফল হতো না।

এবারে প্রশ্ন করে দুর্গাদাস, কিন্তু কে ঐ আমীর খাঁ—আর তার কি পরিচয় আছে—এবং কি করে এবং কোথায়ই বা তার সন্ধান পেলেন ?

বলতে পারেন সর্দার দুর্গাদাস, শঙ্করের কৃপাতেই তার সঙ্গে আমার পরিচয় ঘটেছে।

রঘুনাথ ঐ সময় বলে, যবন সম্রাটের কোন গুপ্তচর নয় তো সর্দার ?

না—বরং বলতে পার সম্রাটের একজন শত্রু।

শত্রু!

হ্যাঁ—এক নিষ্ঠুর জঘন্য অত্যাচারের প্রতিহিংসায় সে আজ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

কে—কে সে?

তার পরিচয় হচ্ছে সম্রাট্ সাজাহাঁর হতভাগ্য জ্যেষ্ঠ পুত্র দারা শিকোর শ্যালক।

শ্যালক!

হ্যাঁ—বেগম রানাদিলের ভাই—আর কিছু জিজ্ঞাসা করবেন না—জবাব দিতে পারব না—তারপর একটু থেমে বললে, যাক—যা বলছিলাম—মাড়বারের অমূল্য রাজমুকুট ঐ আমীর খাঁ-ই যথানির্দিষ্ট স্থানে পেঁছে দেবে।

শেষবারের মত রঘুনাথ বলে, তবু কি জানি কেন কুম্পাবৎ সর্দার, মাড়বারের সমস্ত ভবিষ্যতের মধ্যে এক যবনকে টেনে আনতে মন আমার সায় দিচ্ছে না—

কিন্তু এ ছাড়া তো আর অন্য কোন পথ আমাদের সামনে খোলা নেই রঘুনাথ, নাহুর খাঁ বলে, রাজস্থানের দিকে যে সোজা পথ গিয়েছে সে পথ দিয়ে গেলে সম্রাটের তীক্ষ্ণ শ্যেনদৃষ্টি থেকে মাড়বারের মুকুটকে আমরা রক্ষা করতে পারব না। তাই অন্য আর একটি দুর্গম পথ ধরে আমাদের মাড়বারে পেঁছাতে হবে কিন্তু সে পথ বলবন্ত চেনে না—এ ঝক্কিটুকু আমাদের নিতেই হবে—

রঘুনাথ তখন পট্টমহাদেবীর দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করে, আপনি কি বলেন রানীমা?

আমার নিজস্ব কোন মতামতই নেই সর্দার—আপনারা সকলে মিলে আজ মাড়বারের—আপনাদের সমগ্র রাঠোর-কুলের ভবিষ্যৎ রক্ষার জন্য যে ব্যবস্থা করবেন সেই ব্যবস্থাই আমাকে মেনে নিতে হবে।

মনের মধ্যে আর কোন দ্বিধা রাখবেন না সর্দারগণ—আমি অনেক ভেবেচিন্তেই আমীর খাঁর সাহায্য নেব বলে স্থির করেছি—কথাটা বলে মুকুন্দ দাস দ্বার-রক্ষীকে ইঙ্গিত করল।

দ্বাররক্ষী প্রস্থান করল এবং স্বল্পকাল পরেই কক্ষমধ্যে এসে প্রবেশ করল এক রাজপুত যুবককে নিয়ে।

আগন্তুক রাজপুতের বয়স ত্রিশের কিছু ঊর্ধ্বেই বলে মনে হয়। দীর্ঘদেহী—এবং দেখলে মনে হয় দেহে প্রচুর শক্তি ধরে রাজপুত।

সুজাবৎ রঘুনাথই প্রথমে বললে, কে এ?

গোবিন্দদাস বলে, একে যেন চিনি চিনি বলে মনে হচ্ছে—আমাদের সৈন্য-বাহিনীতে দেখেছি।

হ্যাঁ—ওর নাম কল্যাণ সিংহ—আপনারা এবং সৈন্যদলের মধ্যে সকলেই ওকে ঐ নামেই যদিচ জানে তথাপি ওটা ওর আসল নাম নয়।

আসল নাম নয়?

না।

কি তবে আসল নাম?

আমীর খাঁ—

সকলে যেন মুকুন্দ দাসের কথায় চমকে আমীর খাঁর মুখের দিকে তাকায়।

মাস আষ্টেক পূর্বে কাবুল সীমান্তে—মহারাজ যশোবন্ত তখনো জীবিত। সেই সময় একদিন মহারাজের কাছে এসে ও সৈন্যদলে যোগ দিতে চায়। পরিচয় দিয়েছিল সে একজন সুজাবৎ—নাম কল্যাণ সিংহ।

মহারাজ যশোবন্ত সরাসরি তাকে সৈন্যদলে ভরতি করে নেননি—কুম্পাবৎ সর্দার মুকুন্দ দাস নাহুর খাঁকে ডেকে বলেছিলেন, এই যুবক বলছে এ একজন সুজাবৎ রাজপুত—আমাদের সৈন্যদলে ভরতি হতে চায়—একে পরীক্ষা করে দেখুন সর্দার—যদি উপযুক্ত মনে করেন তো সৈন্যদলে নেবেন।

নাহুর খাঁ কল্যাণ সিংহকে নিয়ে নিজের তাঁবুর মধ্যে এলো।

কি নাম তোমার যুবক ?

কল্যাণ সিংহ—

কোথা থেকে আসছো ?

মাড়বার থেকে—মহারাজের অধীনে আমি কাজ করব দীর্ঘ দিনের আমার বাসনা।

কিন্তু এমনিতে তো তোমাকে আমরা সৈন্যদলে গ্রহণ করতে পারি না—তোমার যোগ্যতা সম্পর্কে তোমায় পরীক্ষা দিতে হবে এবং কারো পরিচয়পত্র পেশ করত হবে।

এই বিদেশে পরিচয়পত্র কোথায় পাবো সর্দার, তবে যোগ্যতার পরিচয় বলুন, পরীক্ষা বলুন, অবশ্যই দিতে আমি প্রস্তুত।

কি পরীক্ষা দিতে পার তুমি বল ?

সৈনিকের পরিচয় অসিযুদ্ধে।

উত্তম—আমার সঙ্গে তুমি যুদ্ধে প্রস্তুত আছো ?

অনুমতি করেন তো প্রস্তুত।

কিন্তু তোমার অসি কই ?

আপনি আমাকে একটা ধার দিন।

বেশ—

তাঁবুর গায়ে ঝুলান একটি অসি নিয়ে মুকুন্দ দাস ছুঁড়ে দিল কল্যাণ সিংহের দিকে—সঙ্গে সঙ্গে সে সেটা লুফে নিল।

সন্ধ্যার অত্যাসন্ন অন্ধকার যেন চারিদিকে ঘনিয়ে আসছে—মশালচি তাঁবুর মধ্যে প্রদীপ জেলে দিয়ে গেল।

দুজনে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে।

শোন যুবক, যুদ্ধে যদি হেরে যাও তো জেনো তোমার প্রাপ্য হবে মৃত্যু।

যুদ্ধে বীরের মৃত্যুর চাইতে আর কি কামনা থাকতে পারে নাহুর খাঁ—আমি প্রস্তুত।

চকিতে সেই তাঁবুর মধ্যে ক্ষীণ প্রদীপালোকে দুখানা তীক্ষ্ন তরবারি ঝলকে

উঠল। এবং অল্পক্ষনের মধ্যে নাহুর খাঁ বুঝতে পারে অসিযুদ্ধে যুবক সুনিপুণ। মুকুন্দ দাস আরও সতর্কভাবে অসিচালনা করতে থাকে।

মাড়বারের অন্যতম শ্রেষ্ঠ অসিযোদ্ধা মুকুন্দ দাস নাহুর খাঁ—যুবক প্রায় কোণঠাসা হবার যোগাড়—এবং সুকৌশলে কল্যাণ সিংহ নাহুর খাঁর আক্রমণ প্রতিহত করলেও তার একটি অসির আঘাত চকিতে বিদ্যুৎ চমকের মতই যেন কল্যাণ সিংহের পাগড়ি শিরশ্চ্যুত করে এবং সঙ্গে সঙ্গে নাহুর খাঁ ক্ষিপ্র দ্বিতীয় আঘাত যুবকের কবজির উপরে হানতেই তার তরবারি হস্তচ্যুত হয়ে ভূমিতে পড়ে যায়।

বজ্রগর্ভ কণ্ঠে নাহুর খাঁ প্রশ্ন করে, কে তুমি?

আমি কল্যাণ—

না—মিথ্যা বলো না—সত্য বল কে তুমি—তুমি রাজপুত নও—রাজপুতের শির দ্বিখণ্ডিত হয়, কিন্তু শিরস্ত্রাণ মাথা থেকে খসে পড়ে না।

নাহুর খাঁর দুচোখে অগ্নিগর্ভ সুতীক্ষ্ন দৃষ্টি—স্থিরভাবে চেয়ে আছে যেন যুবকের দিকে।

আপনার অনুমান সত্য সর্দার—

তুমি রাজপুত নও?

না।

তবে কি তোমার পরিচয়?

আমি একজন মুসলমান।

যবন—

মুসলমান—পুনরাবৃত্তি করে শব্দটা যুবক এবং ধীর শান্ত কণ্ঠে বলে, আমার নাম কল্যাণ সিংহ নয়—আমীর খাঁ—তবে বিশ্বাস করুন আমি সম্রাটের কোন গুপ্তচর নই।

তবে?

বলতে পারেন সম্রাটের চরম শত্রু।

শত্রু?

হ্যাঁ—যে সম্রাট আমার একমাত্র ভগিনীর সমস্ত সুখ পুড়িয়ে ছারখার করে দিয়েও তাকে মুক্তি দেয়নি—এখনো তাকে নির্যাতন করছে—হারেমে বন্দিনী করে রেখেছে সেই সম্রাটের সর্বাপেক্ষা বড় শত্রু আমি—

তোমার ভগিনী সম্রাটের হারেমে বন্দিনী?

হ্যাঁ।

কে সে—কি নাম তার?

সে সম্রাট্ সাজাহান জ্যেষ্ঠপুত্র দারা শিকোর সহধর্মিণী বেগম রানাদিল।

রানাদিলের নাম আমি শুনেছি খাঁসাহেব।

আমাকে খাঁসাহেব বলবেন না সর্দার—লোকে আমার সত্য পরিচয়টা জানতে পারলে আমার সমস্ত প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যাবে। বুকের মধ্যে দিবারাত্র যে প্রতিহিংসার অনল জ্বলছে কোনদিনই তা নির্বাপিত হবে না।

একটা অবরুদ্ধ যন্ত্রণার মত—চাপা একটা আর্তনাদের মতই যেন কথাগুলো মনে হলো আমীর খাঁর।

মুকুন্দ দাস ক্ষণকাল আমীর খাঁর দিকে চেয়ে থেকে বললে, তোমার কথা আমি বিশ্বাস না হয় করলাম যুবক কিন্তু—

বলুন সর্দার—

কিন্তু মহারাজের সৈন্যদলে নাম গোপন করে ভর্তি হলেই বা তোমার প্রতিহিংসা চরিতার্থ হবে কি করে বুঝতে তো পারছি না—

তার বিরুদ্ধে ধ্বংসাত্মক কাজ করবার সুযোগ তো পাবো—এবং এমনও তো হতে পারে কখনো কোন দিন কোন যুদ্ধক্ষেত্রে বা তেমন কোন সুযোগ যদি ঘটে সামনাসামনি তাকে হত্যা করবারও—

বাতুল তুমি যুবক—আলমগীরকে তুমি চেন না—সে সুযোগ জীবনে তোমার কোন দিনই আসবে না জেনো—

কিন্তু—

বুঝতে পারছো না কেন তুমি, যার সর্বত্র শত্রু—শত্রুতার কণ্টকভরা পথে পা ফেলেই যে সিংহাসনে গিয়ে বসেছে সে তার নিজের শক্তি সম্পর্কে সম্পূর্ণ সজাগ সর্বদা—

দয়া করুন, আপনি আমাকে নিরাশ করবেন না—আমাকে আপনি মুসলমান বলে ফিরিয়ে দেবেন না—আমাকে সৈন্যদলে স্থান দিন—

দেবো তোমাকে আমি স্থান আমীর খাঁ, মহারাজার সৈন্যদলে—

না, না—ও নাম নয়—বলুন কল্যাণ সিংহ—

তাই—তাই হবে—আজ তুমি বিশ্রাম করগে—কাল রাজসভায় তোমাকে সৈন্যদলে গ্রহণ করা হবে।

আপনাদের সকলের মনে যখন সন্দেহ হচ্ছে তখন বোধ হয় সব খুলে বলাই ভাল—বলতে বলতে সমস্ত ঘটনা আনুপূর্বিক বিবৃত করে মুকুন্দ দাস বললে, এই সেই কল্যাণ সিংহ—আজ দীর্ঘ আট মাসেরও উপর ও আমাদের সৈন্যদলে আছে এবং এই আট মাস ধরে সর্বদা ওর উপরে আমি তীক্ষ্ন নজর রেখেছি—ওকে আমরা বিশ্বাস করতে পারি—কিন্তু আমীর খাঁ, এবারে তোমাকে আমীর খাঁই আবার হতে হবে।

সর্দার—

হ্যাঁ—মুসলমান তুমি—সেই বেশে ও সেই পরিচয়ে যদি তুমি মাড়বারের রাজমুকুট নিয়ে যাবার সময়েও পথে কারো দৃষ্টি আকর্ষণ কর তোমার পরিচয়ই তোমায় পথ করে দেবে—যেটা আজ কোন রাজপুতের পক্ষেই সম্ভবপর নয়।

বেশ—আপনি যা হুকুম করবেন তাই আমি করব সর্দার—

তাহলে তুমি কাল প্রত্যূষে উঠেই চলে যাবে—তোমার সঙ্গে আরো দুটি অশ্বারোহী সৈনিক যাবে—তারা নির্দিষ্ট স্থানে তাদের অশ্ব দুটি তোমার জিম্মায় রেখে দিয়ে ফিরে আসবে। বলবন্ত সিংহ ও রুস্তা যাবে তোমার কাছে

এবং তোমার হাতে তুলে দেবে মাড়বারের মুকুট—রাজমুকুটের সকল দায়িত্ব অতঃপর তোমার জানবে আমীর খাঁ।

আমীর খাঁ সেলাম দিয়ে কক্ষ ত্যাগ করে গেল। সর্দাররা তখনো যে যার আসনে স্থির হয়ে বসে।

মনের মধ্যে বুঝি তখনো তাদের দ্বিধা—তখনো সংশয়।

কিন্তু মুকুন্দ দাস তাদের ভাববারও সময় দেয় না। আমীর খাঁ কক্ষ ত্যাগ করার সঙ্গে সঙ্গেই বলে, রাজমুকুটের ব্যবস্থা হলো এবারে আমাদের বাকী কর্তব্য —যবন সম্রাটের শঠতা ও শয়তানি—এবারে তার প্রত্যুত্তর দেবো আমরা।

গোবিন্দ দাস প্রশ্ন করে, কিছু স্থির করেছেন কুম্পাবৎ সর্দার?

করেছি বৈকি।

কী?

॥ ৩ ॥

মুকুন্দ দাস ধীর শান্ত কণ্ঠে মাত্র একটি কথা উচ্চারণ করে—যুদ্ধ—

যুদ্ধ।

হ্যাঁ—তারপর সম্মুখযুদ্ধ—রাজপুত সর্দাররা, আপনারা এতকাল মহারাজের দেওয়া ভূমিবৃত্তি ভোগ করে এসেছেন—আজ আমরা সেই মহারাজ ও জন্মভূমির গৌরব রক্ষার জন্য অসিযুদ্ধে সেই নীচ শয়তান যবন সম্রাটের সঙ্গে মুকাবিলা করব—আপনারা প্রস্তুত?

একসঙ্গে সবাই বলে, প্রস্তুত।

তাহলে প্রস্তত থাকবেন—কাল মধ্যরাত্রে মাড়বারের রাজমুকুট নিরাপদে এই উদ্যানবাটি থেকে বের হয়ে যাবার পর আমরা প্রত্যূষে যবনের মুকাবিলা করব অসিমুখে—

সে রাত্রের মত সভা ভঙ্গ হলো। সর্দাররা সবাই যে যার কক্ষে চলে গিয়েছে—একাকী নাহুর খাঁ মুকুন্দ দাস কক্ষমধ্যে পায়চারি করছিল।

রাত্রি তৃতীয় প্রহরও উত্তীর্ণপ্রায়। দ্বারপথে মৃদু পদশব্দ শোনা গেল। সঙ্গে সঙ্গে মুকুন্দ দাস ঘুরে দাঁড়ায়, কে?

সর্দার আমি। নারীকণ্ঠে জবাব এলো।

এসো রম্ভা—

রম্ভা কক্ষমধ্যে প্রবেশ করে মুকুন্দ দাসকে প্রণাম জানায়।

আমাকে স্মরণ করেছিলেন সর্দার?

হ্যাঁ—শোন রম্ভা, কাল রাত্রি তৃতীয় প্রহরে তুমি আর বলবন্ত সিংহ কুমার অজিত সিংহকে নিয়ে এই উদ্যানবাটি ছেড়ে যাবে। সবাই জানবে করণ্ডকে মিস্টান্ন ও সন্দেশ যাচ্ছে কিন্তু তার মধ্যে থাকবে কুমার অজিত সিংহ—

আমি—

শোন—সন্ধ্যার দিকেই কুমারকে দুধের সঙ্গে অহিফেন সেবন করাবে যাতে

করে সেই আফিঙের প্রতিক্রিয়ায় সে মরার মত ঘুমোয়—সহজে না জেগে ওঠে—অবিশ্যি একাকী বলবন্ত সিংহের সাহায্যেই কাজটা সম্পন্ন করা যেত, তোমাকে তার সঙ্গে দেবার কোন প্রয়োজন ছিল না।

রম্ভা চেয়ে থাকে মুকুন্দ দাসের মুখের দিকে।

সকলেই আশ্চর্য হয়ে গিয়েছে আমার প্রস্তাবটা শুনে—কিন্তু তবু আমার পক্ষে বলা সম্ভবপর হলো না কেন তোমাকেই সঙ্গে আমি পাঠাচ্ছি—এক নারীকে—

রম্ভা নিঃশব্দে তাকিয়ে থাকে সর্দারের মুখের দিকে।

মহারাজের কাছে আমি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ—

প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।

হ্যাঁ—শোন রম্ভা—আমি সবই জানি—

সর্দার—

হ্যাঁ—মহারাজ মৃত্যুর পূর্বে আমাকে সবই বলে গিয়েছেন এবং তোমার সমস্ত ভার আমার কাঁধেই চাপিয়ে গিয়েছেন—তবে শেষ পর্যন্ত সে ভার আমার পক্ষে বহন করা হয়ত আর হবে না।

সর্দার—

হ্যাঁ রম্ভা—অজিত সিংহ ও তোমাকে নিরাপদে এই উদ্যানবাটি থেকে বের করে দিয়ে আমরা পরদিন প্রত্যুষে যবন সেনাদের সঙ্গে মুকাবিলা করব অসিমুখে—তবে যদি বেঁচে ফিরে যেতে পারি মাড়বারে, আমার বাকি কর্তব্যটুকুও অবশ্যই পালন করব—নচেৎ তোমাকে তুমিই রক্ষা করো—রাজপুত রমণী তুমি, তোমাকে এর চাইতে বেশী কিছু বলবার আমার নেই। ভাল কথা, তুমি তো অশ্বারোহণে সক্ষম, তাই না?

হ্যাঁ সর্দার—

আমিও সেই রকমই শুনেছিলাম। যাক এখান থেকে তোমরা—তুমি পুরুষের ছদ্মবেশ নেবে, বুঝেছো—

বুঝেছি—

দুটি মিষ্টান্নভরা করণ্ডক কাল রাত্রি তৃতীয় প্রহরে এই উদ্যানবাটি থেকে বের হয়ে যাবে—একটি নেবে তুমি, অন্যটি বলবন্ত। বলবন্তের করণ্ডকেই থাকবে কুমার। অর্ধ ক্রোশ পথ উত্তীর্ণ হয়ে যমুনার তীরে পেঁছলে পাবে অশ্ব—সেখানে একজন অশ্ব নিয়ে অপেক্ষা করবে—

কুমারকে নিয়ে আমরা কোথায় যাবো?

সোজা মাড়বারের কোন নিভৃত স্থানে—

তারপর?

তারপর আমি আর জানি না—তোমরা তোমাদের রাজাকে বাঁচাবার জন্য যা প্রয়োজন বোধ কর তাই করবে।

দ্বাররপ্রহরী ঐ সময় এসে কক্ষে প্রবেশ করল।

সর্দার—

কী ?
দুর্গাদাস সর্দার—
যাও ভিতরে পাঠিয়ে দাও—যাও রম্ভা।
রম্ভা প্রণাম জানিয়ে ঘর ছেড়ে চলে গেল

॥ ৪ ॥

পরের দিন যথানির্দিষ্ট সময়ে আরো তিনজন মিষ্টান্নবাহকের সঙ্গে সঙ্গে বলবন্ত ও পুরুষবেশী রম্ভা দুই করণ্ডক মাথায় নিয়ে উদ্যানবাটি ত্যাগ করে চলে গেল। শিথিল প্রহরীরা কেউ বাধা দিল না।

রোজকার মত রাজপুতেরা মিষ্টান্ন বিতরণ করতে চলেছে যবন প্রহরীরা তাই জানল। সকলের চোখেই রাত্রির তৃতীয় প্রহরে ঘুম আসছে তখন—ঘুম ঘুম চোখে দুচারজন যবন প্রহরী মাত্র একবার তাকিয়ে দেখল। কেউ কোন কথা বলল না।

সেটা আবার এক শ্রাবণের রাত্রি। সন্ধ্যা থেকেই আকাশে মেঘের সঞ্চার হচ্ছিল। এবং রাত্রির প্রথম প্রহর থেকে টিপটিপ করে বৃষ্টি শুরু হয়েছিল। টিপটিপ বৃষ্টি ও সেই সঙ্গে বাদলা হাওয়া—স্বভাবতঃই প্রহরীদের চোখে বুঝি ঘুম নামে.

উদ্যানবাটি থেকে কিছুটা দূরে রাজপথে পড়ে দুইজনাই ওরা চলার গতি বাড়িয়ে দেয়—হনহন করে যমুনার দিকে হেঁটে চলে। মাথার ওপরে মেঘাবৃত আকাশ থেকে ঝরছে বৃষ্টি—ক্ষণে ক্ষণে মেঘের গুরুগুরু ডাক ও বিদ্যুতের সোনালী চমক।

কর্দমাক্ত পিচ্ছিল পথ। এমন অন্ধকার যে সামান্য দূরের বস্তুও ভাল করে দেখা যায় না। তবু বলবন্ত ও রম্ভার বুকের মধ্যে কাঁপছিল।

উদ্যানবাটি থেকে করণ্ডক নিয়ে বেরুবার মুখে কারো কোন সন্দেহ হয়েছে বলে মনে হয়নি বটে, তাহলেও যতক্ষণ না কুমারকে নিরাপদ স্থানে নিয়ে যাওয়া যায় বিশ্বাস নেই।

শত্রু এলাকায় বিপদ যে কোন মুহূর্তেই যে কোন দিক থেকেই আসতে পারে। এবং অর্ধপথ যাবার পরই প্রথমে রম্ভা শুনতে পেল ক্ষীণ একটা শব্দ—শব্দটা পিছনে পিছনে আসছে। রম্ভা ভাল করে কান পেতে শোনে। এবং রম্ভাই বলবন্তর মনোযোগ আকর্ষণ করে, বলবন্ত—

কিছু বলছো ?
হ্যাঁ—কোন শব্দ শুনতে পাচ্ছ ?
শব্দ।
হ্যাঁ—পাচ্ছ না ?
কই না তো—
ভাল করে কান পেতে শোন, রম্ভা বলে।
এবার বলবন্তর সত্যিই কান পেতে শুনতে গিয়ে মনে হয় যেন একটা শব্দ

পিছন থেকে অন্ধকারে অস্পষ্ট শোনা যাচ্ছে। অন্ধকারে কিছু দেখা যায় না বটে তবে শোনা যাচ্ছে একটা শব্দ।

কিসের শব্দ বল তো বলবন্ত ? রম্ভা শুধায়।

মনে হচ্ছে ঘোড়ার পায়ের শব্দ—

আমারও তাই মনে হচ্ছে—কোন অশ্বারোহী আমাদের পিছনে পিছনে আসছে না তো বলবন্ত—

অসম্ভব নয়—

তাহলে কি হবে ? ঔরংজীব কি তবে জানতে পেরে গেছে—

একটু দ্রুত চল রম্ভা।

চলার গতি ওরা বাড়িয়ে দেয়। এবং সঙ্গে সঙ্গে পশ্চাতের ঘোড়ার পায়ের শব্দও যেন দ্রুত তাদের অনুসরণ করে আসছে অন্ধকারে মনে হয়—এবার ওরা আরো দ্রুত ছুটতে শুরু করে।

হাওয়ায় ও বৃষ্টিতে সেদিন যমুনার জল যেন ফুলে ফেঁপে উঠেছিল। শান্ত যমুনার বুকে সেদিন ঢেউয়ের আথালিপাথালি। যমুনার তীরে একটা ভাঙা মন্দিরের সামনে অন্ধকারে নিঃশব্দে অশ্বারূঢ় হয়ে অপেক্ষা করছিল আমীর খাঁ। তার দু'পাশে আরো দুটি অশ্ব।

বৃষ্টি ও হাওয়ার বেগ ক্রমেই যেন বাড়ছে। সোঁ সোঁ জলো হাওয়ায় গায়ে যেন কাঁপুনি ধরায়। একবার বিদ্যুৎ চমকাল। ক্ষণিকে সেই বিদ্যুতের আলোয় আমীর খাঁ দেখতে পেল অন্ধকারে দুটি মনুষ্যমূর্তি ঐ দিকেই এগিয়ে আসছে।

আমীর খাঁর দৃষ্টি ও শ্রবণেন্দ্রিয় তীক্ষ্ন হয়ে ওঠে। নিশ্চয়ই বলবন্ত আসছে। আবার বিদ্যুৎ চমকাল। এবারে কিন্তু আমীর খাঁ চমকে ওঠে—ওদের মাত্র হাত কুড়ি পঁচিশ তফাতে আরো একজন অশ্বারোহী।

আমীর খাঁর মনে হলো যেন পশ্চাতের সেই অশ্বারোহী ওদের অনুসরণ করছে।

বাতাসে বলবন্তর কণ্ঠস্বর—সতর্ক চাপা কণ্ঠস্বর ভেসে আসে—কল্যাণ সিংহ—

সঙ্গে সঙ্গে আমীর খাঁ জবাব দেয়, এই যে আমি—

বলবন্ত শেষ পথটুকু একপ্রকার যেন ছুটতে ছুটতেই এসে কুমার অজিত সমেত মিষ্টান্নের করণ্ডকটি আমীর খাঁর হাতে তুলে দিতে দিতে বলে—এক মুহূর্ত আর বিলম্ব করো না আমীর খাঁ—কে যেন আমাদের অনুসরণ করছে বলে মনে হয়।

বলবন্তর কথা শেষ হলো না—অন্ধকারে একটা বর্শা সাঁ করে বায়ুতরঙ্গে তীক্ষ্ন শব্দ তুলে যেন ওদের মাঝখান দিয়ে চলে গেল।

সর্বনাশ—শত্রু—যবন।

সঙ্গে সঙ্গে আর একটা বর্শা বিদ্যুৎগতিতে ছুটে এসে বলবন্তর বাম বাহুমূলে বিদ্ধ করল। একটা যন্ত্রণাকাতর শব্দ করে ওঠে বলবন্ত। ব্যাকুল উৎকণ্ঠায় রম্ভা তার পাশেই সে সময় উপস্থিত ছিল, শুধায় কি—কি হলো বলবন্ত ?

বলবন্ত ততক্ষণে কটিদেশ থেকে অসি টেনে বের করেছে। সে বলে, পালাও —পালাও তোমরা—আর এক মুহূর্তও দেরি করো না—

রম্ভা শুধায়, কিন্তু তুমি—

আঃ রম্ভা—পালাও—আমার কথা তোমাদের ভাবতে হবে না—যাও—যাও—

আমীর খাঁ ও রম্ভা সঙ্গে সঙ্গে যে যার অশ্ব চালনা করে।

অন্ধকারে দুটি অশ্বের পায়ের দ্রুতধাবমান শব্দ মিলিয়ে যায়—খট্‌খট্ খটাখট্ —দূরে দূরান্তে—

ততক্ষণে শত্রু যবন একেবারে সন্নিকটে এসে পড়েছে বলবন্তর।

খবরদার। চেঁচিয়ে ওঠে সিংহবিক্রমে বলবন্ত।

বিদ্যুৎ চমকে ওঠে আবার। সামনেই মাত্র হাত দুয়ের ব্যবধানে এবারে বলবন্তর নজরে পড়ে এক যবন সৈনিক—অশ্বারূঢ়—হাতে তার তীক্ষ্ণধার অসি। ঝাঁপিয়ে পড়ে বলবন্ত উন্মুক্ত অসি হাতে সেই যবন সৈনিকের উপরে। অন্ধকারেই উভয়ের মধ্যে অসিযুদ্ধ শুরু হয়।

একজন অশ্বের উপরে, একজন ভূমিতে দাঁড়িয়ে।

বলবন্তর জন্য যে অশ্ব অপেক্ষা করছিল সেই অশ্বে আরোহণ করবার অবকাশই পায়নি তখনো সে। পূর্বেই নিক্ষিপ্ত বর্শায় আহত হয়েছিল বলবন্ত—যন্ত্রণায় ও রক্তপাতে হাতটা অবসন্ন হয়ে পড়ছিল, তথাপি রাজপুত যুদ্ধ চালিয়ে যায়।

একটা বিষয়ে তখন বলবন্ত নিশ্চিন্ত বোধ করছিল, আক্রমণকারী একজনই যবন মাত্র—সৈনিক, তার সঙ্গে আর কেউ নেই।

বলবন্ত জানত না সে সৈনিক আর কেউ নয়, স্বয়ং যবন সৈন্যাধ্যক্ষ ওমরাহ্ ইসমাইল খান। দুর্ধর্ষ যোদ্ধা ইসমাইল খান।

বলবন্ত ও রম্ভা যখন করণ্ডক নিয়ে বের হয়ে আসে তখন আর কোন যবন প্রহরীর মনে কোন সন্দেহ না জাগলেও ইসমাইল খানের মনে হঠাৎ যেন কেমন সন্দেহ জাগে। ওদের চলার ভঙ্গি ও সতর্কতা তাকে সন্দিগ্ধ করে তোলে।

সঙ্গে সঙ্গে নিঃশব্দে অন্ধকারে সে ওদের অনুসরণ করে এবং তার সন্দেহ যে মিথ্যা নয় ব্যাপারটা বুঝতে তার বেশী সময় লাগেনি যখন সে লক্ষ্য করল অন্যান্য মিষ্টান্নবাহীরা রাজধানীর দিকে গেলেও ওরা দুজনে যমুনার দিকে অগ্রসর হচ্ছে।

ঐ দিকে তো কোন লোকালয় নেই। তবে ওরা ওদিকে চলেছে কেন?

বলবন্ত শীঘ্রই নিদারুণভাবে আহত ও পরিশ্রান্ত হয়ে পড়ে—যদিও ইসমাইল খানও যথেষ্ট আহত হয় বলবন্তের হাতে। বলবন্ত শেষ হবার পর ইসমাইল খানও জ্ঞান হারায়। জ্ঞান হারিয়ে ইসমাইল খান ঘোড়ার উপরেই টলে পড়ে যায়।

ওদিকে উদ্যানবাটিতে তখন মরণ ও শেষ যুদ্ধের জন্য বীর রাজপুতদের মধ্যে প্রস্তুতি চলেছে। রাত্রির চতুর্থ প্রহর উত্তীর্ণ হয়ে গিয়েছে। অত্যাসন্ন ভোরের

আলোয় পূবের আকাশ রক্তিম হয়ে উঠেছে। সকলেই ইতিমধ্যে স্নান করে নিয়েছে। নতুন বেশ পরে—মাথায় পাগড়ি বেঁধে—কপালে চন্দনতিলক লাগিয়ে সবাই প্রস্তুত।

অতিরিক্ত অহিফেন সেবনে সকলেরই চোখ যেন রক্তাভ। সকলের চোখ থেকেই যেন আগুন ঝরছে। যবন ধ্বংসের জন্য সবাই যেন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। অনমনীয়—অটল—অচল।

ভট্ট কবি শুজোও বীর রাজপুতদের সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যুসাগরে ঝাঁপ দেবার জন্যে প্রস্তুত হয়েছিল। সে তার উদাত্ত কণ্ঠে গেয়ে ওঠে: হে মাড়বারের রাঠোর বীরগণ, আপনাদের রাজানুগ্রহ ভোগ সার্থক হলো এতদিনে—এ দিন আপনাদের জীবনে আর আসবে না। স্বদেশ ও রাজার গৌরব রক্ষা করবার জন্য হে বীর রাজপুতগণ আপনারা অসিধারে দেহত্যাগ করে স্বর্গের পথে অগ্রসর হতে চলেছেন। চলুন, আমি আপনাদের পাশে পাশে থেকে আপনাদের বীরত্বগাথা কম্বুকণ্ঠে গেয়ে যাবো—

ভট্ট কবি গাইতে থাকেন—আমরা এতকাল স্বর্গীয় মহারাজার সরল অকৃত্রিম বন্ধুত্ব ও অনুগ্রহ ভোগ করেছি, আজ আমি পিতার নাম ও গৌরব রক্ষা করব এবং মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে দেশজননীকে শেষ প্রণাম জানাব। তারপর আসুক মৃত্যু—ভয় নেই—ভয় নেই—ভয় নেই—

যবন প্রহরীদের তখনো নিদ্রাভঙ্গ হয়নি। সকলেই যে যার সুখশয্যায় ঘুমিয়ে এমন সময় ওমরাহ্ ইসমাইল খানের শিক্ষিত অশ্ব ফিরে এলো। রক্তাক্ত নিষ্প্রাণ ওমরাহ্ ইসমাইল খানের দেহটা ঘোড়ার পিঠের ওপরে অসহায়ভাবে ঝুলছে।

শোভানাল্লা—

এ কেয়া—

বেইমানি—নিশ্চয়ই—এ কাফেরের কাজ।

কিন্তু তারা চিন্তা করবারও সময় পেল না, সহসা উদ্যানবাটির দ্বার উন্মুক্ত হলো এবং সহস্র রাজপুত বীর তীক্ষ্ন শূল ও অসি হাতে যবন সৈন্যদের উপর যেন বন্যার স্রোতের মত এসে পড়ল অকস্মাৎ। শুরু হয়ে গেল সে এক রক্তক্ষয়ী ভয়াবহ সংগ্রাম।

একদিকে মুষ্টিমেয় বলতে গেলে মরণপণে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ রাজপুত রাঠোর বীর, অন্যদিকে মোগল সম্রাটের সহস্র সহস্র সুশিক্ষিত যবন সৈন্য।

আজো রাজস্থানের ভট্ট কবি সেদিনকার যুদ্ধে—তাদের সে বীরত্বের গান গায়:

> জিতেন লভ্যতে লক্ষ্মীমৃতেনাপি সুরাঙ্গনাঃ
> ক্ষণবিধ্বংসিনি কায়ে কা চিন্তা মরণে রণে?

সত্যিই তো এই ক্ষণভঙ্গুর জীবনে মৃত্যুকে কি ভয়?

মরতে তো একদিন সবাইকেই হবে, তবে গৌরবের মরণই আসুক না কেন।

দেখতে দেখতে দিল্লীর পথের ধূলি রাজপুতের রক্তে লাল হয়ে ওঠে—একের

পর এক শুধু মৃত্যু বরণ—আর সেই সঙ্গে যবন ধ্বংস।

কিন্তু কত ধ্বংস করবে রাজপুতেরা যবনকে—পঙ্গপালের মতই যবন সৈন্য আসছে তো আসছেই।

হারে রে রে—আল্লা হো আকবর—যবনের সেই চিরন্তন ধর্মের জিগির, যে জিগির তুলে চিরদিন তারা হিন্দু ধ্বংস করেছে।

॥ ৫ ॥

রাজপথ জুড়ে যখন যুদ্ধের মত্ত কোলাহল, উদ্যানবাটির এক নিভৃত কক্ষে তখন আর এক দৃশ্য।

পট্টমহাদেবী পূর্বেই তাঁর কর্তব্য স্থির করে ফেলেছিলেন। পুরুষরা যা করবার করবে, বাকীটুকু তাঁর কর্তব্য। একবার সম্মুখযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়লে রাজপুত রমণীদের মুক্তির আর কোন উপায়ই যে থাকবে না তা তিনি জানতেন ভাল করেই। তাই তিনি সহচরীদের নির্দেশ দিলেন, এই বাড়ির মধ্যে যেখানে যত বারুদ ও ইন্ধন আছে সব দক্ষিণের ঘরে নিয়ে গিয়ে জমা কর তোমরা—

উদ্যানবাটির চারিদিকে এবং রাজপথের অনেকখানি জুড়ে তখন যুদ্ধ চলেছে। একে একে বীর রাজপুতেরা ধরাশয্যা নিচ্ছে।

পট্টমহাদেবী সেই উদ্যানবাটির মধ্যে যে সব রাজপুত রমণীরা ছিল সকলকে ডেকে আনলেন।

মা, আমরা এসেছি—

এসো আমার সঙ্গে।

কেউ একটি প্রশ্ন করল না। 'কেন—কোথায় যেতে হবে?' শুধাল না একটিবার।

পট্টমহাদেবীকে অনুসরণ করে সকলে গিয়ে সেই দক্ষিণের নাতিপ্রশস্ত ঘরের মধ্যে একে একে প্রবেশ করল। পট্টমহাদেবী ফিরে প্রশ্ন করলেন, সবাই এসেছে?

হ্যাঁ মা—একজন মহিলা জবাব দিল।

ঘরের এক পাশে স্তূপীকৃত বারুদ আর ইন্ধন। পট্টমহাদেবী ঘরের দ্বার নিজহাতে বন্ধ করে শান্ত ধীর পায়ে সেই স্তূপীকৃত বারুদ আর ইন্ধনের সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন, তারপর চকমকি ঠুকে সেই বারুদস্তূপে অগ্নিসংযোগ করলেন—একটা চোখঝলসানো আলো, তারপর প্রচণ্ড একটা শব্দে যেন কানে তালা লেগে গেল। তারপর শুধু আগুন আর আগুন। আগুনের শত শত লেলিহশিখা লকলক করে মৃত্যুক্ষুধায় যেন চারিদিকে নেচে নেচে বেড়াতে লাগল।

জহরব্রতের আগুনে দেখতে দেখতে সহস্র রাজপুত রমণীর কোমল দেহ—রূপ যৌবন লাবণ্য পুড়ে ছাই হয়ে গেল।

বাগানবাটি ভস্মীভূত। রাজপথেও যুদ্ধ সমাপ্ত। হাজার হাজার যবন সেনার মৃতদেহের পাশে পাশে সহস্র রাঠোর রাজপুতের মৃতদেহ পড়ে আছে কেবল।

লাল কেল্লায় সম্রাট্ অস্থিরভাবে পায়চারি করছিল। সংবাদদাতা এসে কুর্নিশ করে দাঁড়াল। আলমপনাহ—

কি সংবাদ রসুল খাঁ?

যুদ্ধে আমাদের জয় হয়েছে আলমপনাহ—সমস্ত রাজপুত নিশ্চিহ্ন।

আর রাজপুত নারীরা?

ভস্মীভূত।

কুমার?

সম্ভবতঃ ভস্মীভূত।

গুরগন খাঁ—

মালেক আলমের জন্য কুরবানি হয়েছেন।

ইসমাইল খাঁ?

খুদাতাল্লাহের অসীম করুণা তাঁর ওপরে—তিনিও প্রাণ দিয়েছেন।

হুঁ—আচ্ছা যাও।

সংবাদদাতা কুর্নিশ করে স্থান ত্যাগ করল।

রাজপথের অনেকখানি স্থান জুড়ে স্তূপীকৃত মৃতদেহ যেমন পড়েছিল এখনো তেমনি পড়ে আছে।

শ্রাবণ আকাশে ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘের ফাঁকে আধখানা চাঁদ উঁকি দেয়। শ্মশানের মত অদ্ভুত স্তব্ধ যেন চারিদিক। বাতাস পর্যন্ত বইছে না।

সেদিনকার সেই যুদ্ধে মাত্র একজন রাঠোর সর্দার দলপতি নাহুর খাঁর নির্দেশে ক্ষুরধার অসিমুখে অসংখ্য যবন সেনার মধ্যে দিয়ে অমিত শৌর্যে পথ করে নিয়েছিল। এবং তার সেই প্রচণ্ড আক্রমণের সামনে সেদিন কেউ দাঁড়াতে পারেনি।

কোন যবন তার পথ রোধ করতে পারেনি।

রক্তাক্ত ক্ষতবিক্ষত দেহে বিদ্যুৎগতিতে মুষ্টিধৃত অসির সাহায্যে সংখ্যাতীত যবন সেনাদের ব্যূহ ভেদ করে যে রাঠোর সর্দার চলে গিয়েছিল সে আর কেউ নয়—দুর্গাদাস।

নাহুর খাঁ বলেছিল, যেমন করে হোক তোমাকে মাড়বারে ফিরে যেতেই হবে দুর্গাদাস। আজ পর্যন্ত অজিত সিংহের জন্মবৃত্তান্ত সকলের কাছ থেকে গোপন করে রাখা হয়েছে। তার সত্যকারের পরিচয়ে তাকে সুপ্রতিষ্ঠিত একদিন করতে হবে আমাদেরই, কারণ আমরা ছাড়া তো কেউ তার সত্যকার পরিচয় জানে না।

কিন্তু সর্দার—

জানি দুর্গাদাস তুমি কি বলবে—কিন্তু দেশের জন্য একমাত্র যুদ্ধে প্রাণ দেওয়াটাই কোন দেশবাসীর শেষ কথা নয়—শেষ কর্তব্য নয়—আজ আরও একটি বিরাট কর্তব্য আমাদের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে—কুমার অজিত সিংহকে তার পিতার সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করা। মাড়বারের রাজমুকুট তার মাথায় তুলে দেওয়া। কিন্তু সে তো সম্ভব হবে না যদি আজ না তাকে যবন সম্রাটের আক্রোশ

থেকে রক্ষা করতে পারি—এবং তাই নয় কেবল, তার সত্যকারের পরিচয়টাও যা আজ গোপন করে রাখা হয়েছে সেটা সমস্ত দেশবাসীর কাছে প্রকাশ করে যাতে তারা সেটা সত্য বলে মেনে নেয় তার ব্যবস্থাও আমাদেরই করতে হবে জেনো—আজ আমরা যদি সবাই যুদ্ধে প্রাণ দিই তো কে সে কর্তব্য সম্পাদন করবে। আমীর খাঁ একজন বিদেশী যবন—তার কথা তো কেউ বিশ্বাস করবে না। রম্ভার কথাও কেউ বিশ্বাস করবে না, কিন্তু তোমার কথা কেউ অবিশ্বাস করতে পারবে না। কাজেই এই কর্তব্যটুকু তোমাকেই পালন করতে হবে—

যুদ্ধক্লান্ত ক্ষতবিক্ষত রুধিরাপ্লুত দুর্গাদাস ঘোড়ার পৃষ্ঠে মাড়বারের পথে যেতে যেতে ঐ কথাগুলি ভাবছিল। যেমন করে হোক তাকে বাঁচতেই হবে। মাড়বারে তাকে পেঁছাতেই হবে। যশোবন্ত নন্দন কুমার অজিত সিংহকে বাঁচিয়ে—মাড়বারের সমস্ত ভবিষ্যৎ আশা ও স্বপ্নকে সত্য করে তাকে তুলতেই হবে।

পিপাসায় গলা শুকিয়ে গিয়েছে—ক্লান্তি ও রক্তক্ষয়ে শরীর অবসন্ন হয়ে আসছে, তথাপি দুর্গাদাস দাঁড়ায় না কোথায়ও। জোরে আরো জোরে ঘোড়া ছুটিয়ে চলে। মাড়বার যেমন করে হোক আজ তাকে পেঁছাতেই হবে।

॥ ৬ ॥

অন্ধকার অরণ্যসংকুল সংকীর্ণ পথ ধরে দুটি অশ্ব পাশাপাশি এগিয়ে চলেছিল। সেই গত রাত্রের চতুর্থ প্রহর থেকে তারা চলেছে—কোথাও একটি মুহূর্তের জন্য থামেনি। কে জানে এতক্ষণে সমস্ত কথা মোগল সম্রাটের কানে পেঁছে গিয়েছে কিনা—যদি গিয়ে থাকে হাজার হাজার সৈন্য হয়ত সে প্রেরণ করেছে তাদের পশ্চাতে।

সেই পশ্চাদ্ধাবনকারী সৈন্যরা যদি কোনক্রমে তাদের ধরে ফেলে তো তাদের এত প্রাণদান এত শ্রম এত প্রচেষ্টা সব নিষ্ফল হয়ে যাবে। যে অমূল্য নিধিকে মোগলের সর্বনাশা আক্রোশ থেকে বাঁচাবার জন্য এত দিন ধরে এত জন রাজপুত ও রাজপুতরমণী প্রচেষ্টা চালিয়ে এলো, দুর্দান্ত নৃশংস মোগলেরা তাকে তরবারি দিয়ে টুকরো টুকরো করে কেটে ফেলবে।

কথাটা যখনই রম্ভার মনে হয়েছে সে আমীর খাঁকে বলেছে, চল—আরোও দ্রুত চল কল্যাণ সিংহ—

রম্ভা জানত না যে কল্যাণ সিংহ আসলে একজন রাজপুত নয়—সে এক যবন। আমীর খাঁও তাকে সে কথা বলেনি। জানতে দেয়নি।

কিন্তু দুর্ভাগ্য—মুকুন্দ দাস যে ভেবেছিল প্রধান পথ ধরে না গিয়ে অন্য আর একটি দুর্গম পথ ধরে গেলে অনায়াসেই তারা শত্রুর দৃষ্টি এড়িয়ে যেতে পারবে এবং যে পথের সংবাদ আমীর খাঁর খুব ভাল করেই জানা আছে সে মুকুন্দ দাসকে বলেছিল—রাত্রির অন্ধকারে আমীর খাঁ সেই পথটাই হারিয়ে ফেলেছিল।

সে ভুলে অন্য এক ঘোরা পথের মধ্যে গিয়ে পড়েছিল এবং প্রথমটা সে জানতেও পারেনি—জানতে যখন সে পারল তখন রীতিমত চিন্তিত হয়ে উঠেছে—

রুম্ভারও সেই রকমই কিছু একটা সন্দেহ হয়েছিল। সে তাই একসময় শুধায়, আমাদের মাড়বারে পেঁছাতে আর কত সময় লাগবে কল্যাণ সিংহ ?

ঠিক বলতে পারছি না রুম্ভা—একটু ইতস্ততঃ করে জবাব দেয় আমীর খাঁ।

বুঝতে পারছো না ?

না—

কেন, এ পথ তো তোমার পরিচিত—তবে তুমি—

না রুম্ভা, মনে হচ্ছে যেন ঘোরা কোন পথে এসে পড়েছি ভুল করে।

বল কি !

হ্যাঁ।

এবং ঝোঁকের মাথায় আরো কিছু বলে বসে আমীর খাঁ—বৎসর দুই পূবে মহারাজ যশোবন্তের সঙ্গে দেখা করবো বলে দিল্লী থেকে মাড়বারের দিকে রওনা হয়েছিলাম—

কী রকম ?

হ্যাঁ—যেদিন প্রথম বুঝতে পারি সম্রাটের উপর প্রতিহিংসা নিতে হলে এমন কারো আশ্রয় আমায় নিতে হবে যিনি কেবল সুনিপুণ যোদ্ধা ও ক্ষমতাশালীই নন—যিনি মনে মনে ঔরংজীবকে সর্বাপেক্ষা ঘৃণা করেন তখন একজনের নামই আমার মনে পড়েছিল—মহারাজ যশোবন্ত সিংহ—

কী বলছো তুমি কল্যাণ সিংহ—তুমি কি তাহলে মাড়বারের লোক নও—

রুম্ভার আকস্মিক প্রশ্নে হঠাৎ যেন আমীর খাঁ কেমন থতমত খেয়ে যায়—কয়েকটা মুহূর্ত মুখ দিয়ে কোন বাক্য সরে না—তারপর ধীরে ধীরে বলে, না রুম্ভা, আমি মাড়বারের লোক নই—মাড়বারের আমি কেউ নই—

মাড়বারের তুমি কেউ নও ! বিস্ময়ের যেন অবধি নেই রুম্ভার।

আমীর খাঁ এবার বলে, না—

তবে—তবে তুমি কোথাকার লোক ? মেওয়ারের—বিকানীরের—না—

না—রাজস্থানেরই নই। আমি একজন যবন, রুম্ভা—

যবন !

একটা অস্ফুট আর্ত চিৎকারের মত যেন কথাটা বের হয়ে এলো রুম্ভার মুখ থেকে। এবং শুধু তাই নয় সে যেন তখন একেবারে পাথর হয়ে গিয়েছে।

তু—মি যবন ?

হ্যাঁ, আমার আসল ও সত্যিকারের নাম আমীর খাঁ।

এ—একথা নাহুর খাঁ জানতেন ?

জানতেন।

সঙ্গে সঙ্গে একটা কুটিল সন্দেহ যেন রুম্ভার মনের মধ্যে ধোঁয়ার কুণ্ডলীর মত পাক খেতে শুরু করে।

আমীর খাঁ—যবন—

মুকুন্দ দাস সব জেনে শুনেও এত বড় ভুলটা করেছেন ?

একটা যবনকে বিশ্বাস করেছেন ?

এখন মনে হচ্ছে তার এই ভুল ঘোরা পথে আসাটা সবটাই হয়ত এ যবনের একটা ছলনা মাত্র।

ছলনা করে অজিত সিংহকে এই দুর্গম পথের মধ্যে এনে ফেলেছে যাতে করে তাদের মাড়বারে পেঁছাতে দেরি হয় এবং সেই অবসরে মোগল সৈন্যরা এসে তাদের ঘিরে ফেলে চারিদিক থেকে।

সঙ্গে সঙ্গে কটিদেশ থেকে ধারালো ছুরিকা টেনে বের করে রম্ভা এবং বলে, তাহলে এ সব কিছুই তোমার পূর্বপরিকল্পিত আমীর খাঁ!

কি বলছ তুমি রম্ভা ?

ঠিকই বলছি—একজন যবনকে আর যেই বিশ্বাস করুক আমি করি না—দাও —অজিত সিংহকে আমার কাছে দাও—নচেৎ এই ছুরিকা—বিষ-মাখানো এই ছুরিকা দিয়ে তোমায় আমি হত্যা করবো—

শোন, শোন রম্ভা, বিশ্বাস কর আমায়—তুমি আমার সব কথা জান না, জানলে—

জানার কোন নতুন করে প্রয়োজন দেখছি না—তোমার হীন মতলব আমি বুঝতে পেরেছি—দাও কুমারকে—

হাত বাড়ায় রম্ভা।

রম্ভা—

দাও—

শোন—আমার কথাটা শোন—আমি যবন হতে পারি কিন্তু বিশ্বাসঘাতক নই।

হঠাৎ সেই সময় দূরাগত এক অশ্বক্ষুরধ্বনি ওদের দুজনারই কানে প্রবেশ করে, দুজনাই সচকিত হয়ে ওঠে।

রম্ভার মনে হয় নিশ্চয়ই মোগল সৈন্য তাদের পেছনে পেছনে এসে পড়েছে—

রম্ভা আর কালবিলম্ব করে না—বিষমাখানো হাতের ছুরিকা সজোরে আমীর খাঁকে লক্ষ্য করে নিক্ষেপ করে।

বিষমাখানো তীক্ষ্ন ছুরিকা চকিতে গিয়ে আমীর খাঁর বক্ষে বিদ্ধ হয়—সে অস্ফুট একটা কাতর শব্দ করে ওঠে, আঃ—

রম্ভা তখন উন্মাদিনীপ্রায়—সে ঝাঁপিয়ে পড়ে আমীর খাঁর উপরে যেন। ছুরিকার আঘাতে আমীর খাঁ টলে পড়ে যাচ্ছিল এবং সামনের করণ্ডকটি পড়ে যাচ্ছিল, কিন্তু ছোঁ মেরেই যেন রম্ভা করণ্ডক থেকে ঘুমন্ত অজিত সিংহকে বুকে তুলে নেয় আর ঠিক সেই মুহূর্তে এক অশ্বারোহী এগিয়ে আসছে দেখতে পায় রম্ভা।

রম্ভা প্রথমটা অশ্বারোহীকে চিনতে পারেনি, কিন্তু যে মুহূর্তে অশ্বারোহী চিৎকার করে উঠলো, এ কি করলে রম্ভা—এ কি করলে—

রম্ভা কণ্ঠস্বরে চিনতে পারে দুর্গাদাসকে।

সসম্ভ্রমে সে বলে, সর্দার—

হ্যাঁ—কিন্তু ওকে তুমি হত্যা করলে কেন?

রম্ভা তখনো হাঁপাচ্ছে—হাঁপাতে হাঁপাতেই বলে, আপনি জানেন কিনা জানি না—ও একজন যবন, রাজপুত নয়।

জানি জানি, ও যে যবন—ওর নাম আমীর খাঁ আমরা জানি। ও না থাকলে আজ কুমারকে আমরা বাঁচাতে পারতাম কিনা সন্দেহ। মাড়বারের এত বড় উপকারী বন্ধুকে তুমি হত্যা করলে—

আমীর খাঁর প্রাণ তখনো দেহ থেকে বের হয়ে যায়নি। তীব্র বিষের ক্রিয়া তখন রক্তস্রোতের সঙ্গে দেহের কোষে কোষে ছড়িয়ে পড়ছে বটে—ক্রমশঃ সে আচ্ছন্ন হয়ে আসছে, কিন্তু তবু জ্ঞান পুরোপুরিই তখনো রয়েছে।

দুর্গাদাস তাড়াতাড়ি এগিয়ে এলো মৃত্যুপথযাত্রী আমীর খাঁর সামনে একেবারে।

॥ ৭ ॥

দুর্গাদাস ডাকল, আমির খাঁ—

সর্দার—

কোনমতে চোখ মেলে তাকাল আমীর খাঁ, সমস্ত মুখ বিবর্ণ হয়ে উঠেছে—কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম—টেনে টেনে শ্বাস নিচ্ছে—

রম্ভাকে—মাড়বারকে তুমি ক্ষমা করো বন্ধু—

রম্ভার কোন দোষ নেই সর্দার—দীর্ঘদিন ধরে এই ভারতবর্ষে যবনেরা হিন্দুর কাছে নিজেদের যে পরিচয় দিয়ে এসেছে—যে নীচতার পরিচয় তাদের দিয়ে এসেছে—আজ তাদের এর বেশী কি আর প্রাপ্য হতে পারে বলুন।

রম্ভা ইতিমধ্যে তার ভুল বুঝতে পেরেছিল—সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল আমীর খাঁর—

আমীর খাঁ টেনে টেনে অতিকষ্টে বলে, এ তো রম্ভার ঘৃণা বা আক্রোশ নয় সর্দার, এ সমস্ত হিন্দুর সমস্ত যবনের প্রতি দীর্ঘদিনের সঞ্চিত আক্রোশ আর ঘৃণা—তবু রম্ভা দেবী, আমীর খাঁ যবন হলেও সে—

আমাকে—আমাকে ক্ষমা করুন খাঁসাহেব—

না দেবী—আপনার কোন অপরাধ নেই—আপনি আমার বহিনের মত—

ভাই—

ভাই—সত্যিই আমাকে আপনি ভাই বলছেন দেবী?

হ্যাঁ—ভাই—

আঃ, আর আমার কোন দুঃখ নেই বহিন—খুদাতাল্লাহের কাছে কুমারের দীর্ঘজীবন কামনা করছি—আর—

বলুন—

আর বহিন, জেনো, সব যবনই এক নয়। ভাল মন্দ তাদের মধ্যেও আছে—কেবল ঘৃণা দিয়ে সমস্ত জাতটাকে বিচার করো না বহিন—আঃ একটু জল—জল—

কিন্তু জল দিতে পারল না দুর্গাদাস বা রম্ভা মৃত্যুপথযাত্রীর ওষ্ঠে।

আশেপাশে মরুস্থলীর কোথাও জল পাওয়া গেল না। শুধু অরণ্য আর পাথরের পাহাড়—

শেষ পিপাসা নিয়েই আমীর খাঁ এক সময় চোখ বুজল। রম্ভা নিঃশব্দে তাকিয়ে থাকে সেই মৃত যবনের মুখের দিকে।

দু'চোখের কোলে তার জল। এত বড় ভুল সে করলো।

দুর্গাদাস মৃদুকণ্ঠে ডাকে, রম্ভা—

সর্দার—

চলো বহিন—

চলুন—

দুর্গাদাস কিন্তু জায়গাটা চিনতে পেরেছিল। মাড়বারের সীমানার মধ্যেই তারা তখন প্রবেশ করেছে। মরুস্থলীর এলাকায় তারা পৌঁছে গিয়েছে। কিছু দূরেই অর্বুদ গিরিপ্রদেশ—

ঐ গিরিপ্রদেশে কিছু সর্দারের বসতি। অরণ্য থেকে বের হয়ে দুর্গাদাস লোকালয়ের দিকে অশ্বচালনা করে। বুকের মধ্যে ধরা মাড়বারের ভবিষ্যৎ—সমস্ত রাঠোরের জীবনপ্রদীপ কুমার অজিত সিংহ।

আগে আগে দুর্গাদাস চলে। পশ্চাতে তাকে অনুসরণ করে অশ্বপৃষ্ঠে রম্ভা।

রম্ভা সত্যিই যেন তখন আর অশ্বের পৃষ্ঠে বসে থাকতে পারছিল না। দুই রাত্রি ও এক দীর্ঘ পথের ক্লান্তি—অনাহার দুশ্চিন্তা—তার শরীর যেন ভেঙে আসছিল। একে তার শরীর সুস্থ নয় তার উপরে এই শ্রম—এই উত্তেজনা—এই ক্লান্তি—রম্ভা যেন সত্যিই আর পারছিল না।

দুর্গাদাস নিজেও তো অক্ষত ছিল না, তার উপরে দীর্ঘ পথশ্রমের ক্লান্তি—কিন্তু তথাপি সে পুরুষ।

চারিদিকে ইতিমধ্যে অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে। হঠাৎ দূরে কয়েকটা আলোর বিন্দু অন্ধকারে যেন দেখা গেল।

অন্ধকারে মিটমিটি বিন্দুগুলো যেন মৃদু মৃদু কাঁপছে। দুর্গাদাস বলে, আর ভয় নেই রম্ভা—লোকালয় আর বেশী দূর নয়—ঐ যে দূরে আলোর বিন্দুগুলো দেখা যাচ্ছে, দেখতে পাচ্ছো?

রম্ভার তখন আর চোখ মেলে তাকাবারও ক্ষমতা বুঝি নেই। সে কেবল মৃদুস্বরে 'হুঁ' বলে গেল।

দুর্গাদাস ঘোড়ার গতি বাড়িয়ে দেয়।

দুর্গাদাসের অনুমান মিথ্যা নয়। সেইগুলো লোকালয়েরই আলো।

লোকালয়ে পেঁছিতেই একজন রাঠোর সর্দার যে সেখানে উপস্থিত ছিল এগিয়ে এলো, কে ?

তুমি কে ?—দুর্গাদাস শুধায়।

আমি একজন কুম্পাবৎ সর্দার—অর্জুন সিংহ—

আমি দুর্গাদাস—

বীর যোদ্ধা দুর্গাদাসকে চিনত না বা তার নাম শোনেনি সমগ্র মাড়বারে আবালবৃদ্ধবনিতা এমন কেউই ছিল না।

অর্জুন সিংহ সসম্ভ্রমে আলোটা তুলে ধরে, দুর্গাদাস—

হ্যাঁ—

দেহেলীর সংবাদ কি সর্দার ?

ভাল নয় অর্জুন সিংহ, দুর্গাদাস বলে।

ভাল নয় ?

না। মহারাজের সঙ্গে যে সব সর্দার ও সৈন্যরা কাবুল প্রান্তে গিয়েছিল তারা একজনও আর জীবিত নেই।

সেকি !

হ্যাঁ—শঠ—প্রতারক সম্রাট কৌশলে তাদের বন্দী করেছিল—অনন্যোপায় হয়ে—

বুঝেছি—কিন্তু পট্টমহাদেবী—

তিনি জহরব্রতে প্রাণ দিয়েছেন।

একটা কথা সর্দার—

কি ?

মহারাজের কোন বংশধর—

জানি না—এখন পর্যন্ত কিছুই জানি না।

অর্জুন সিংহ ক্ষণকাল চুপ করে থাকে তারপর শুধায় এই রমণী কে ?

এক কৃষক রমণী আমাকে পথ দেখিয়ে এনেছে। অর্জুন সিংহ—

সর্দার—

অর্জুন সিংহ, তোমার সঙ্গে আমার কিছু কথা ছিল—গোপনে বলতে চাই—

আরো অনেকেই ইতিমধ্যে সেখানে এসে উপস্থিত হয়েছে।

অর্জুন সিংহকে নিয়ে দুর্গাদাস একটু দূরে অপেক্ষাকৃত নির্জন অন্ধকারে গিয়ে দাঁড়াল, তারপর বললে, এখানে কোন নিভৃত স্থানের খবর দিতে পার অর্জুন ?

নিশ্চয়ই—কিন্তু—

শোন, সব কথা এখন স্পষ্ট করে তোমায় বলতে পারছি না—সমস্ত মাড়বারের বহুমূল্য এক সম্পদ আমার জিম্মায় নাহুর খাঁ তুলে দিয়েছেন—গোপনে লোকচক্ষুর আড়ালে তাকে রক্ষণাবেক্ষণ করতে হবে, তাই বলছিলাম এমন কোন জায়গা—

অর্জুন সিংহ বলে, আছে সর্দার।

কোথায় ?

ঐ দূরে অর্বুদ পাহাড়ের চূড়ায় একটি মঠ আছে।

মঠ—

হ্যাঁ—এককালে সেখানে এক সাধু থাকত কিন্তু এখন সেটা পরিত্যক্ত শূন্য। সেখানে গিয়ে আপনি অনায়াসেই থাকতে পারেন—বাইরের কারো সাধ্য নেই যে আপনার সন্ধান পায়। তাছাড়া আমি তো এই পাহাড়ের নীচে সমতলভূমিতে রইলাম, আমার অজ্ঞাতে কেউ ওদিকে পা বাড়াতেও পারবে না—

দুর্গাদাস আনন্দিত হয়ে ওঠে।

বলে, ঠিক আছে—সেই পাহাড়ের চূড়ার মঠেই আমি যাবো—আমাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চল।

চলুন—

দীর্ঘ তিন ঘণ্টা ধরে খাড়াই বেয়ে বেয়ে একসময় দুর্গম সেই গিরিশিখরে মঠের সামনে এসে ওরা হাজির হলো।

মধ্যরাত্রি তখন।

শ্রাবণ আকাশে ইতস্ততঃ মেঘ—তারই ফাঁকে একফালি চাঁদ।

চাঁদের আলো পাহাড়ের চূড়ায় সর্বত্র গাছপালার উপর ও পাথরের তৈরী মঠটার উপরে এসে পড়েছে।

দুর্গাদাস যেন মুগ্ধ হয়ে যায়।

রম্ভা—

রম্ভা বলে ডেকে চোখ ফেরাতেই দুর্গাদাসের নজরে পড়ল মঠের পাষাণচত্বরে শুয়ে পড়েছে তখন রম্ভা।

অর্জুন সিংহকে বিদায় দিল দুর্গাদাস।

কোথায় মধ্যরাত্রির স্তব্ধতা বিদীর্ণ করে ময়ূরের কেকারব শোনা গেল।

এবং রম্ভার শুশ্রূষায় নিজেকে নিযুক্ত করে।

একটু পরে সুস্থ হয়ে রম্ভা চোখ মেলে তাকায়।

এখন কেমন বোধ করছো রম্ভা—

ভাল—

তুমি একটু বিশ্রাম কর এখানে—আমি মঠের ভিতরটা দেখে আসি।

দুর্গাদাস ও রম্ভার স্নেহে ও যত্নে কুমার অজিত সিংহ সেই পাহাড়ের চূড়ায় নির্জন মঠের মধ্যে মানুষ হতে লাগল এবং মাস চারেক বাদে এক গভীর রাত্রিতে রম্ভার সমস্ত শরীরে ব্যথার কম্পন লাগল।

রাত্রির শেষ প্রহরে রম্ভার একটি কন্যা হলো যেন একমুঠো জুঁই ফুল—শুভ্র কোমল।

রম্ভার সন্তানের দিকে চেয়ে চেয়ে যেন চোখ ফেরে না আর।

দু' চোখে জল ভরে আসে।

ওরে আমার সোনা—ওরে আমার দুলালী—রাজার মেয়ে এ তুই কোন্

অপরিচয়ের মধ্যে এসে জন্মালি মা—

কেমন করে তোকে আমি মানুষ করব—কেমন করে তোর পরিচয় তোকে দেবো—রাজনন্দিনী, তোকে আমি কোন্ প্রাণে অজ্ঞাতকুলশীলা রেখে দেবো অজ্ঞাত অপরিচিতা এ জগতে।

দুর্গাদাস এসে সদ্যোজাত শিশুকে দেখে আনন্দের সঙ্গে বলে ওঠে, বাঃ বাঃ, এ যে চাঁদের হাট রে—দেখি—দেখি বহিন—একটিবার আমার বুকে দে।

হাত বাড়িয়ে শিশুকে বুকে তুলে নেয় দুর্গাদাস।

বিধাতার কি বিচিত্র বিধান—যাদের আজ রাজপ্রাসাদে পাখীর পালকের গদিতে শুয়ে সোনার ঝিনুকে দুধ খাবার কথা তারা আজ অজ্ঞাত অখ্যাত এক নির্জন মঠের মধ্যে পড়ে থাকল—রম্ভা মৃদু কণ্ঠে বলে।

দুর্গাদাস বলে, না রে না—দুঃখ করিস না বহিন—এ অমাবস্যার অন্ধকার কেটে যাবে আবার আকাশে চাঁদের আলো হেসে উঠবে—দুঃখের পর আনন্দ—এই যে নিয়ম।

॥ ৮ ॥

লাল কেল্লায় সম্রাট্ ঔরংজীবের অস্থিরতার সীমা ছিল না।

উদ্যানবাড়ির সমস্ত রাঠোর রাজপুত ও তাদের রমণীরা নিশ্চিহ্ন হয়ে গেলেও সম্রাটের মনে স্বস্তি ছিল না। কেন যেন তার বার বার মনে হচ্ছিল রাজপুতরা তার সমস্ত কৌশল সমস্ত প্রচেষ্টা সমস্ত চাতুরীকে ব্যর্থ করে দিয়েছে। যশোবন্তের বংশধরকে সে কিছুই করতে পারেনি। যশোবন্তের বংশধর তার নাগালের বাইরে চলে গিয়েছে।

অথচ অতঃপর কি করণীয়—কি এখন সে করবে কিছুই যেন বুঝে উঠতে পারছিল না যবন সম্রাট্।

আর ওদিকে দুর্গাদাস ও রম্ভা অজিত সম্পর্কে যতই সাবধানতা অবলম্বন করুক না কেন—যতই গোপনতা ও নির্জনতার আশ্রয় নিক না কেন, মাড়বারে কেমন করে না জানি প্রচার হয়ে গিয়েছিল কথাটা।

মৃত মহারাজ যশোবন্তের বংশ একেবারে বিলুপ্ত হযে যায়নি পৃথিবী থেকে। তাঁর বংশপরিচয় মাড়বারের ইতিহাসের পাতা থেকে দয়ালু ঈশ্বর একেবারে মুছে দেননি।

পৃথ্বী সিংহই যশোবন্তের শেষ বংশধর নয়।

শয়তান কুচক্রী যবন সম্রাট্ হিন্দুকুলতিলক যশোবন্তের শেষ চিহ্নটুকু মাড়বারের বুক থেকে মুছে দিতে পারেনি। তার সমস্ত চক্রান্ত—জঘন্য প্রচেষ্টা ব্যর্থ করে দিয়েছে রাঠোররা। আছে—এখনো আছে মাড়বারের শেষ আশার প্রদীপশিখাটি—মাড়বারেরই কোন নিভৃত গোপন কন্দরে মিটিমিটি জ্বলছে। এবং তার সমস্ত সংবাদ মাত্র একজন রাঠোর সর্দারই জানে।

দিল্লীর যুদ্ধে যার মৃতদেহ পাওয়া যায়নি, যার মৃত্যুর সঠিক কোন সংবাদ আজ পর্যন্ত পাওয়া যায়নি, সে মানুষটি হচ্ছে রাঠোর সর্দার দুর্গাদাস।

শ্রাবণের এক প্রত্যূষে মাত্র কয়েক মাস আগে কঠিন প্রতিজ্ঞায় অন্যান্য রাঠোর বীরদের সঙ্গে দুর্গাদাস সেই যে উন্মুক্ত অসিহাতে যবনদের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল, তারপর আজ পর্যন্ত তার কোন সংবাদই সংগ্রহ করা যায়নি।

একটি মাত্র সংবাদ ছাড়া—মৃতপ্রায়—আঘাতে আঘাতে ক্ষতবিক্ষত এক রাঠোর সৈনিক কোনমতে মাড়বারে এসে পৌঁছেছিল এবং সেই বলেছিল, যুদ্ধ যখন প্রচণ্ডভাবে চলেছে তখন নাকি অশ্বারূঢ় দুর্গাদাসকে সে ছুটে বের হয়ে যেতে দেখেছিল।

মাড়বারবাসী শুধিয়েছিল, তারপর?

তারপর আর জানি না।

শুধুমাত্র সেইটুকু সংবাদের ওপরে নির্ভর করেই মাড়বারের রাঠোর সর্দাররা মরুস্থলীর সর্বত্র সেই থেকে দুর্গাদাসের সন্ধান করে ফিরেছে কিন্তু আজ পর্যন্ত তার কোন সন্ধান পায়নি।

কোথায় দুর্গাদাস কেউ জানে না এখনো। তবু কিন্তু অনুসন্ধান তারা থামিয়ে দেয়নি। সন্ধান করেই চলেছে।

মাড়বারের সর্বত্র রাঠোর সর্দার দুর্গাদাসের সন্ধানে গোপনে গোপনে চর প্রেরণ করেছে—চর রাজপুতের দল সর্বত্র ঘুরে বেড়াতে লাগল।

মানিকলাল তাদের অন্যতম। এক তীর্থযাত্রীর বেশে মানিকলাল সর্বত্র ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। ঘুরতে ঘুরতে একদিন মানিকলাল আবু পাহাড়ের শীর্ষে সেই নির্জন মঠের সামনে এসে এক সায়াহ্নে উপস্থিত হলো।

শীতের শেষে বসন্ত ঋতু সবে দেখা দিয়েছে—আবু পাহাড়ের চূড়ায় নানা রঙবেরঙের বুনো ফুলের সমারোহ।

মানিকলাল সংবাদ পেয়েছিল উপত্যকার বনচারী ভীলদের কাছ থেকে—এক সাধু ও এক সাধুমা ঐ পাহাড়ের চূড়ার মঠে নাকি থাকে। তাদের একটি বাচ্চা ছেলে ও একটি বাচ্চা মেয়ে আছে। ফুলের মতই নাকি সুন্দর সেই ছেলে মেয়ে দুটি।

মানিকলাল একবার ইতস্ততঃ করেছিল—সে খুঁজছে একটি ছেলে।

একটি ছেলে ও একটি মেয়ে তো নয়।

তবু মনের মধ্যে কেমন একটা সন্দেহ জাগায় উঠে এসেছিল পাহাড়ের চূড়ায়। একবার চোখে দেখে এবং কিছু যদি শোনা যায় তো জেনে যেতেই বা ক্ষতি কি।

কিন্তু পাহাড়ে ওঠা তার হলো না।

সে বাধা পেল।

সদা সতর্ক অর্জুন সিংহই বাধা দিল, কে তুমি—পাহাড়ের উপর উঠতে চাও কেন?

আমি একজন তীর্থযাত্রী।

কিন্তু উপরের মঠে তো কোন দেবতা নেই।

আছে শুনেছি—

মিথ্যা কথা—সত্য বল কে তুমি ?

সর্দার, আমি মানিকলাল—

মানিকলাল ?

হ্যাঁ—সর্দার—আমি কেন সমগ্র মাড়বারই আজ সংবাদ পেয়েছে—

কি ?

মহারাজ যশোবন্তের এখনো বংশ শেষ হয়ে যায়নি।

চুপ—চুপ আবার—যাও উপরে যাও তুমি।

পাহাড়ের উপর উঠতে উঠতেই বেলা গড়িয়ে গিয়েছিল এবং রীতিমত পরিশ্রান্তও হয়ে পড়েছিল মানিকলাল।

কিন্তু মঠের আশেপাশে কাউকেই সে দেখতে পায় না। জনমনুষ্যের চিহ্নও চোখে পড়ে না।

মানিকলাল জানত মঠটা একটা পড়ো মঠ—মঠে কেউ থাকে না—ভীলরাই বলেছিল কয়েক মাস থেকে নাকি এক সাধু ও সাধুমা দুটি বাচ্চাকে নিয়ে মঠে এসে বাসা বেঁধেছে।

মানিকলাল এদিক ওদিক অনুসন্ধানী দৃষ্টিতে তাকাচ্ছিল। হঠাৎ একটা পুরুষকণ্ঠে ও চমকে ওঠে—

কে তুমি ?

মানিকলাল চমকে ফিরে চেয়ে দেখে এক দীর্ঘকায় বলিষ্ঠ পুরুষ মঠের সামনে প্রস্তরনির্মিত সংকীর্ণ চত্বরের ওপরে দাঁড়িয়ে আছে। পুরুষটির পরিধানে গেরুয়ারংয়ের ঝোলা আলখাল্লার মত একটি পোশাক, মাথায় পাগড়ি—পাগড়ির বন্ধনমুক্ত হয়ে ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল কাঁধের ওপরে লুটোচেছ।

দেখে প্রথম দৃষ্টিতে সাধু বলেই মনে হয় কিন্তু ভাল করে চেয়ে দেখলে মনে হবে সমস্ত চেহারার মধ্যে যেন একটা উদ্ধত বীরোচিত ভঙ্গী।

মানিকলাল প্রশ্নকর্তার দিকে চেয়ে চেয়ে দেখছিল—প্রশ্নকর্তা মানিকলালকে চুপ করে থাকতে দেখে আবার প্রশ্ন করে, কে তুমি ?

মানিকলালের মনে হয় কেন যেন ঐ ব্যক্তি কোন ছদ্মবেশধারী। ঐ গেরুয়াবর্ণের আলখাল্লা ও মাথায় পাগড়ি দিয়ে সে কোন সত্যকে গোপন করে রেখেছে—ঐ বেশ তার স্বাভাবিক সত্য বেশ নয়।

দেখে মনে হচ্ছে, মানিকলাল বলে, আপনি কোন সাধু ব্যক্তি হবেন—আমি একজন মাড়বারবাসী রাঠোর রাজপুত—

বলা বাহুল্য, সেই ব্যক্তি আর কেউ নয় স্বয়ং রাঠোর সর্দার বীরচূড়ামণি দুর্গাদাস। দুর্গাদাস অতঃপর একটু যেন সন্দিগ্ধভাবেই আগন্তুকের সর্বাঙ্গে একবার দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে বলে, কি নাম তোমার ?

অধীনের নাম মানিকলাল—একজন কুম্পাবৎ—

কুম্পাবৎ ?

আজ্ঞে—

এখানে কেন এসেছো ?

আমি আমাদের প্রভুর সন্ধানে ঘুরতে ঘুরতে এখানে এসেছি—

প্রভু !

আজ্ঞে—এক শিশু যাকে দুনার সর্দার'ধনী' উপাধির দ্বারা ভূষিত করেছেন।

কি বলছো তুমি আমি কিছুই বুঝতে পারছি না মানিকলাল। দুনার সর্দার কাকে ধনী উপাধিতে ভূষিত করেছেন ?

মহাত্মন্, আমি যে কি বলছি বা আমার কথার অর্থ আপনি সুনিশ্চিতভাবেই সম্যক বুঝতে পেরেছেন এবং পারছেন তথাপি যদি অজ্ঞতার ভান করেন তবে আর কি বলতে পারি—আমি মাড়বারের কুলপ্রদীপ মহারাজ যশোবন্তের একমাত্র বংশধরের কথাই—

মানিকলালের কথা শেষ হয় না। চকিতে দুর্গাদাস তার আলখাল্লার অভ্যন্তর থেকে তীক্ষ্ণফলা একটি ছুরিকা টেনে বের করে। অপরাহ্নের সূর্যালোকে ইস্পাতের ধারালো অগ্রভাগ ঝিকমিক করে ওঠে।

কে তুমি—সত্য বল—নচেৎ—

দুর্গাদাসের হাতের অস্ত্র আর একটু হলেই মানিকলালকে বিদ্ধ করছিল কিন্তু সে সচকিতে দু'পা পিছিয়ে গিয়ে বলে ওঠে, থাম—থাম দুর্গাদাস—সত্যিই কি তুমি আমায় চিনতে পারনি—চেয়ে দেখ তো এবারে—

বলতে বলতে মানিকলাল নিজের ওষ্ঠের ওপরে লাগানো ভারী গোঁফজোড়া টেনে খুলে ফেলে। মাথার পরচুলা ও পাগড়ি খুলে ফেলে।

দুর্গাদাস এবার আগন্তুককে চিনতে পেরে চমকে ওঠে। বলে, একি—দাদা তুমি !

আগন্তুক মানিকলাল তখন বলে, হ্যাঁ ভাই, আমি শোণিঙ্গদেব—

কি আশ্চর্য—সত্যিই তোমায় আমি চিনতে পারিনি দাদা—

সে আমি বুঝতে পেরেছি—কিন্তু আমি তোমাকে ঠিকই চিনতে পেরেছিলাম—আগে বল রাজকুমারের সংবাদ কী ?

সে জীবিত ভাই—সুস্থই আছে—

তবে আর এই নির্জন মঠের মধ্যে পড়ে থেকে কি হবে—মাড়বারের রাঠোর সর্দাররা মাড়বারের ভাবী অধীশ্বরকে স্বাগত জানাবার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে আছে—ভট্ট ও চারণকবিরা—

না দাদা, কুমারের আত্মপ্রকাশের মুহূর্ত এখনো আসেনি। ঠিক সময়ে রাজকুমার দেশবাসীর সামনে উপস্থিত হবে।

কিন্তু—

না—রাজকুমার যে এখনো বেঁচে আছে একথা কোন ক্রমেই প্রকাশ হতে দেওয়া হবে না—শত্রুপক্ষ প্রবলপ্রতাপান্বিত—দুর্ধর্ষ যবন সম্রাট্, তার গুপ্তচর মাড়বারের চারিদিকে ঘুরছে আমি জানি—তাছাড়া একটা দুঃসংবাদ তোমরা হয়ত জান না দাদা—

কী দুঃসংবাদ ?

ইন্দো বংশের কথা জান ?

ইন্দো ? কে তারা ?

পুরীহর কুলের একটি প্রধান শাখা ঐ ইন্দো রাজপুতরা—একসময় ওরা মরুভূমির অনেকটা জুড়ে রাজত্ব করত—আমাদের পূর্বপুরুষরা তাদের যুদ্ধ করে মরুভূমি থেকে তাড়িয়ে দেন।

আমাদের পূর্বপুরুষ ?

হ্যাঁ—রাঠোর বীর চণ্ড তাঁর নাম। যাহোক সেই থেকেই বহু বর্ষ ধরে সেই পরাজিত পুরীহররা দীনভাবে সামন্তদের মত দিন কাটাচ্ছিল এবং একদিনের জন্যও তারা তাদের সেই পরাজয়ের লজ্জা ও ক্ষোভকে মন থেকে মুছে ফেলতে পারেনি। আজ তারা শয়তান যবন সম্রাট্ ঔরংজীবের কুটজালে প্রতারিত প্রলোভিত হয়ে আবার তলে তলে গোপনে গোপনে সঙ্ঘবদ্ধ হয়েছে।

এ সংবাদ তুমি কোথা থেকে পেলে দুর্গাদাস ?—শঙ্কিত কণ্ঠে প্রশ্ন করে শোণিঙ্গদেব।

যেমন করেই হোক সে সংবাদ আমি পেয়েছি দাদা—আরাবল্লীর পাদদেশে অরণ্যের গভীরে তারা গোপনে গোপনে দলবদ্ধ হয়েছে—যবন সম্রাট্ তাদের অর্থ, খাদ্য ও রণসম্ভার যুগিয়েছে তলে তলে—এইভাবে সে মাড়বারের মধ্যে একটা বিদ্রোহ সৃষ্টি করে আমরা যাতে পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে হানাহানি কাটাকাটি করে ক্ষয় হয়ে যাই সেই চেষ্টা করছে।

সর্বনাশ—তাহলে উপায় ?

দেশবাসীই হোক বা পরদেশীই হোক, যে আমাদের দেশের ক্ষতিসাধন করতে উদ্যত সেই আমাদের শত্রু—শত্রুকে সমূলে নিঃশেষ করাই হচ্ছে একমাত্র পথ এবং এক্ষেত্রে আমাদেরও তাই করতে হবে। আমি নিজেই আজ যাবো ভেবেছিলাম যোধপুরে—কিন্তু তুমি যখন এসে গেছো আজই তুমি রাজধানীর উদ্দেশে যাত্রা কর এবং সেখানে পৌঁছে সমস্ত রাঠোর সর্দার ও সামন্ত সর্দারদের একত্র করে শত্রুর মুখোমুখি আমরা যাতে দাঁড়াতে পারি সেজন্য প্রস্তুত হতে হবে।

॥ ৯ ॥

সেই দিনই রাত্রির দ্বিতীয় প্রহরে মাড়বারের ভাবী অধীশ্বরকে সম্মান দেখিয়ে শোণিঙ্গদেব দুর্গাদাসেরই একটি সংগৃহীত অশ্বে আরোহণ করে রাজধানীর দিকে দ্রুতগতিতে অগ্রসর হলো।

কিন্তু দুর্গাদাস বোধহয় একটু বিলম্বেই পুরীহরকুলের অভিযানের সংবাদটা পেয়েছিল। কারণ মাড়বারবাসী প্রস্তুত হবার আগেই তারা অকস্মাৎ রাঠোরদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল।

দেশে রাজা নেই—নামকরা যোদ্ধা সর্দাররাও নেই—আর পিছনে রয়েছে যবন সম্রাটের গোপন উৎসাহ ও সক্রিয় সাহায্য—অল্প আয়াসেই ইন্দোদের বহুদিনের

আশা সফল হয়ে গেল—মন্দবারের শীর্ষে পুরীহরদের বিজয়পতাকা উড়ল।

এবং দুর্ভাগ্য বুঝি একা আসে না—সেই সঙ্গে রাঠোরদের আর এক কুলাঙ্গার দেশদ্রোহী রত্ন তলে তলে তৎপর হয়ে উঠল। এই সুযোগে এই ডামাডোলের মধ্যে যদি যোধপুর হস্তগত করা যায়—মন্দ কি!

মাড়বারের সর্বত্র তখন যবন সম্রাটের গুপ্তচরেরা ঘুরে বেড়াচ্ছে—চতুর যবন সম্রাট্ আরো একটি জঘন্য চক্রান্ত করল। রত্নকে আশ্বাস দিল সম্রাটের গুপ্তচর, এই ফাঁকে যোধপুর জয় করে নাও রত্ন—সম্রাট্ তোমাকে সাহায্য করবেন।

রত্নের বাপ অমর সিংহও ঠিক ঐ চরিত্রেরই ছিল—তার বাপ তাকে ঘর থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিল তার ঔদ্ধত্যের জন্য।

দুঃসংবাদ দুর্গাদাসের কানে গিয়ে পেঁছৈছিল—দেশ মাতৃভূমি বিপন্ন—দুর্গাদাস আর মুহূর্ত বিলম্ব করে না, ছুটে এলো যোধপুরে।

আরাবল্লীর পাদদেশে গভীর অরণ্যের মধ্যে বিতাড়িত পরাজিত রাঠোররা গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিল—অনেক কষ্টে খুঁজে খুঁজে তাদের বের করল দুর্গাদাস।

নতুন উৎসাহে রাঠোররা আবার শত্রুর মুখোমুখি হলো। প্রথমেই রত্নর সঙ্গে রাঠোরদের যুদ্ধ হলো।

প্রচণ্ড আক্রমণ—রত্ন সেই আক্রমণের সামনে দাঁড়াতে পারল না। সে পালিয়ে গেল নাগোরের দুর্গে।

রত্নকে পরাজিত পর্যুদস্ত করে রাঠোরদের মনে বোধ হয় নতুন আশার সঞ্চার হয়—তারা এবারে ইন্দোদের ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ল মরণপণে মুকাবিলা করবার জন্য।

প্রচণ্ড সে আক্রমণের মুখে ইন্দোরাও দাঁড়াতে পারল না—মন্দবার ছেড়ে চলে যেতে পথ পেল না—আবার তারা দুর্গম মরুভূমির মধ্যে গিয়ে লুকাল।

মাড়বারের সমস্ত শত্রু পর্যুদস্ত হলো আপাততঃ। রাঠোররা যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচল। প্রাসাদের এক গোপন কক্ষে রাঠোর সর্দাররা মিলিত হলো। সকলের মুখেই তখন এক প্রশ্ন, মহারাজ যশোবন্তের কোন বংশধর সত্যিই আছে কি না।

দুর্গাদাস সকলের মুখের দিকে তাকাল।

কক্ষের এক কোণে দেওয়ালে একটি মৃৎপ্রদীপ জ্বলছিল, তারই আলোয় কক্ষটি আলোকিত। দুর্গাদাস ধীরে ধীরে মুখ তুলে বললে, হ্যাঁ—রাজকুমার অজিত সিংহ জীবিত।

সবাই একসঙ্গে চীৎকার করে ওঠে, কোথায়—কোথায় আমাদের রাজকুমার—তাকে একটিবার আমরা চাক্ষুষ দেখতে চাই—বৎসরাধিক কাল ধরে কেবল শুনেই আসছি মহারাজের বংশ আছে কিন্তু—

ব্যস্ত হবেন না আপনারা—বিশ্বাস করুন আমাকে—বিশ্বাস করুন আমার কথা সত্যিই—রাজকুমার অজিত সিংহ আছে এবং জীবিত—কুচক্রী শয়তান যবন সম্রাটের হিংসা থেকে বাঁচানর জন্যই অজিত সিংহকে নিরাপদ জায়গায় লুকিয়ে রাখা হয়েছে এবং যতদিন প্রয়োজন লুকিয়ে রাখা হবে।

একজন কুম্পাবৎ রাঠোর সর্দার বলে, ঠিক আছে, থাক সে লুকানো কিন্তু

একটিবার তাকে আমরা দেখতে চাই—চোখের দেখা দেখতে চাই—

না, তা সম্ভব নয়—মাথা নাড়ল দুর্গাদাস।

দুর্গাদাসের শেষের কথায় সভামধ্যে যেন একটা অসন্তোষের গুঞ্জন ওঠে। একজন সর্দার কটু কণ্ঠে বলে, সব ধাপ্পা—মিথ্যা কথা—

মিথ্যা নয়, বিশ্বাস করুন আমাকে—আমি বলছি—দুর্গাদাস বোঝাবার চেষ্টা করে।

দুর্গাদাসের কথা শেষ হলো না, সর্বাঙ্গ কালো চাদরে আবৃত এক ব্যক্তি কক্ষমধ্যে এসে ঢুকল।

কি খবর দুর্জন সিংহ ?

দুর্গাদাস আগন্তুকের মুখের দিকে তাকাল। আগন্তুক দুর্জন সিংহ মুখের ওপর থেকে কাপড় সরাল।

দুঃসংবাদ সর্দার—দুর্জন সিংহ বললে।

দুঃসংবাদ—কী হয়েছে বল ?

যবন সম্রাট্ বিরাট এক সৈন্যবাহিনী নিয়ে মাড়বার আক্রমণ করতে আসছে !

সকলেই ঐ সংবাদে যেন চমকে ওঠে—না, না—অসম্ভব—

দুর্জন সিংহ বলে, সম্রাট্ তার বিরাট বাহিনী নিয়ে অর্ধেকেরও বেশী পথ এসে গিয়েছে—আমি নিজের চোখে দেখে এসেছি।

দুর্গাদাসের মুখখানি রক্তাভ হয়ে ওঠে। ভ্রূ কুঞ্চিত হয়।

মুহূর্তকাল যেন কি ভেবে নিয়ে দুর্গাদাস বলে, ঠিক আছে—আসুক—শয়তান যবন যদি ভেবে থাকে মাড়বার আজ অরক্ষিত—রাঠোররা তাদের নিজের দেশ তার লোভের থেকে বাঁচাতে অক্ষম তো সে ভুল করেছে। এবার তার যুদ্ধসাধ ও পররাজ্যগ্রাসের দুরাকাঙ্ক্ষা ভাল করেই মিটিয়ে দেবো।

বয়সে প্রৌঢ় মৈরতা সর্দার যমুনা সিংহ চুপটি করে একপাশে আফিংয়ের নেশায় বুঁদ হয়ে বসে ছিল—দুর্জন সিংহ ঘরে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গেই সে চোখ মেলে তাকিয়েছিল—কান পেতেছিল ওদের কথায়।

সে-ই এবারে মাথাটা দুলিয়ে বললে, দুর্গাদাস, তুমি বীর—তোমার যুদ্ধ-কৌশল অতুলনীয় তাও জানি—মরুস্থলীকে তুমি সমস্ত প্রাণ দিয়ে ভালবাস—দেশের জন্য তুমি প্রাণ দিতে পার হাসতে হাসতে তাও জানি, কিন্তু পাগলামি করো না—

কি বলছেন আপনি মৈরতা সর্দার—পাগলামি কি করলাম আমি !

করছো বৈকি—সম্রাটের লোকবল অর্থবল—সে কথাটা ভেবেছো কি ? বিরাট সৈন্যবাহিনী—

মনে হচ্ছে মৈরতা সর্দারের যেন সত্যিই বার্ধক্য এসেছে।

কী বললে—বার্ধক্য ?

বাঘের মতই যেন গর্জন করে ওঠে যমুনা সিংহ।

তাছাড়া আর কি বলব বলুন মৈরতা সর্দার—লক্ষ কোটি সৈন্য দেখেও কি রাজপুত কখনো ভয় পেয়েছে বা পেছু হটে এসেছে ? হার জিত যুদ্ধে আছেই—

হার জিতের কথা নয় দুর্গাদাস—মৈরতা সর্দার বলে, সম্ভব অসম্ভব বলে একটা কথা আছে তাই আমি বলছিলাম—তাছাড়া পড়ে মার খেয়ে লাভ কি—

দেখুন মৈরতা সর্দার, পালালেও মার খেতে হবে আর যুদ্ধ করতে গেলেও তাই—মৃত্যু ছাড়া আর যখন কোন রাস্তা নেই তখন সেই গৌরবের মৃত্যুকেই আমরা কেন বেছে নেবো না—যুদ্ধ আমরা করব—

সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য সর্দাররাও বলে ওঠে হ্যাঁ, আমরা যুদ্ধ করব—

যুদ্ধ ছাড়া আর পথও ছিল না রাঠোরদের পক্ষে। কিন্তু একদিকে মুষ্টিমেয় রাজপুত অন্যদিকে যবন সম্রাটের বিরাট সৈন্যবাহিনী। অতএব যুদ্ধ তো নয়, রাঠোররা প্রতিরোধের চেষ্টা করল মাত্র।

বন্যার জলে কুটোর মতই তাদের সেই প্রতিরোধের প্রচেষ্টা ভেসে গেল—সূর্যাস্তের আগেই রাঠোররা রাজধানীর মধ্যে গিয়ে আশ্রয় নিয়ে প্রধান দরোয়াজা গুলো বন্ধ করে দিল লৌহঅর্গল তুলে।

প্রাণে বাঁচল বটে রাঠোররা কিন্তু যোধপুর অবরুদ্ধ হলো। মাড়বারের রাজধানী যোধপুর যবনের কুক্ষিগত হলো।

এক দিন দু'দিন তিন দিন—ক্রমে দশ দিন—জলাভাব দেখা দিল নগরের মধ্যে, সঙ্গে খাদ্যেরও অভাব। যোধপুরবাসী ভেবে পাচ্ছে না কি করবে—ঐ সময় ঔরংজীবের বিরাট সৈন্য-বাহিনী কামানের গোলায় নগরের প্রধান দরোয়াজা ভেঙে চুরমার করে দিয়ে বন্যার জলের মত পিলপিল করে নগরের মধ্যে এসে ঢুকে পড়ল।

আল্লা হো আকবর—যবনের বীভৎস চীৎকারে দানবীয় উল্লাসে বাতাস কেঁপে ওঠে। শুরু হলো লুণ্ঠন হত্যা ও ধর্ষণ। সে এক নারকীয় দৃশ্য।

কেবল মাত্র যোধপুরই নয় সেই সঙ্গে মাড়বারের অন্যান্য প্রদেশ—মৈরতিয়া, দিদবান ও রোহিত যবন সেনাদের কুক্ষিগত হলো। মুসলমানরা তাদের চিরাচরিত প্রথায় নারকীয় নৃশংসতায় মাড়বারের নগরের পর নগর, গ্রামের পর গ্রাম, পল্লীর পর পল্লী, হত্যা লুণ্ঠন ধর্ষণ ও অগ্নিদগ্ধ করে নেচে বেড়াতে লাগল বীভৎস উল্লাসে।

রাঠোর বীরদের বুঝতে কষ্ট হয় না যে সমগ্র মাড়বারেব উপর আধিপত্য ও তাকে কুক্ষিগত করে শোষণ করাটাই ছিল যবন সম্রাটের মনোগত বাসনা গোড়া থেকেই।

মহারাজ যশোবন্তের শৌর্য ও পরাক্রমের জন্য এতদিন সেটা পারেনি ঔরংজীব —আজ তাকে—তার জীবনের সব চাইতে বড় শত্রুকে কৌশলে বিষপ্রয়োগে হত্যা করে এবং তার যোগ্য বংশধরকেও কৌশলে হত্যা করে অরক্ষণীয় মাড়বারের বুকের উপর হিংস্র লালসায় ঝাঁপিয়ে পড়েছে।

অবিশ্যি ঝাঁপিয়ে পড়বার আগে মাড়বারের শেষ আলোর শিখাটি ভবিষ্যতের অজিত সিংহকেও ছলে বলে কৌশলে করায়ত্ত করতে চেয়েছিল। কিন্তু তা যখন পারল না—সম্ভব হলো না কোন কারণেই, তখন সে মুখ থেকে সৌজন্যের শেষ

মুখোশটি টান মেরে খুলে ফেলে হিংস্র নখর বিস্তার করে মাড়বারের বুকের উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে আর এতটুকু দেরি করল না।

যবন তার উপযুক্ত কাজই করেছে এবং হিন্দুস্থানে পা দেওয়ার পর থেকে ক্রমশঃ একটু একটু করে সমস্ত হিন্দুস্থানকে গ্রাস করবার যে মনোগত বাসনা তার বাবুরের সময় থেকে তারই একটা ধারাবাহিকতা চলেছে মাত্র।

মাড়বারের রাঠোররা কি কথাটা বুঝতে পারেনি ? বুঝতে পেরেছিল বৈকি।

কিন্তু মাড়বারও যে আজ সূর্যের অভাবে অন্ধকারে কালযাপন করছে।

রাঠোররা আবার গভীর অরণ্যে, মরুভূমির মধ্যে ও পর্বতকন্দরে গিয়ে একে একে আশ্রয় নিতে লাগল তাদের ঘরবাড়ি ছেড়ে।

সমস্ত মাড়বারকে একেবারে শ্মশানে পরিণত করে যবন সম্রাট্ তার সেনাপতি টাইবার খাঁর উপর সব কিছু ভার দিয়ে আজমীরের দিকে চলে গেল। পুষ্করের তীরে গিয়ে তাঁবু ফেলল বিশ্রাম নেবার জন্য। কিছুদিন সেখানে বিশ্রাম করে ফিরে এলো দিল্লীতে। কুমার অজিতের কিন্তু কোন সন্ধানই করতে পারল না যবন সম্রাট্ ঔরংজীব। তার সমস্ত চাতুরী সমস্ত চক্রান্ত সমস্ত অত্যাচারই ব্যর্থ হয়ে গেল। এবং প্রতিমুহূর্তে একটা দুর্বিষহ পরাজয়ের গ্লানি যেন ঔরংজীবকে বৃশ্চিক-দংশনের মত ক্ষতবিক্ষত করতে লাগল।

ঐ হিন্দু—ঐ কাফেররা ঔরংজীবের উপর টেক্কা দিয়ে যাবে!

ঔরংজীবের কূট চিন্তার মধ্যে এক বীভৎস পরিকল্পনা স্থান পেল। সে ঘোষণা করল—দেশের সমস্ত হিন্দুদের ইসলাম ধর্মে দীক্ষা নিতে হবে—এবং যারা এর প্রতিবাদ করবে সম্রাট্ তাদের ওপরে বলপ্রয়োগ করতেও দ্বিধা করবে না।

ঔরংজীব ভেবেছিল তার চিরাচরিত নিষ্ঠুর অত্যাচারের রথ চালাতে পারলেই বুঝি সাফল্য করায়ত্ত হবে। কিন্তু ভুল ভাঙতে দেরি হলো না।

প্রথমে অবিশ্যি একটা আতঙ্কে দেশ ছেয়ে গিয়েছিল, যার ফলে বহু হিন্দু রাজ্য ছেড়ে দাক্ষিণাত্যে পালিয়ে গেল—কিছু অবিশ্যি ইসলাম ধর্ম গ্রহণও করল অত্যাচারে জর্জরিত হয়ে। অত্যাচারে অত্যাচারে সারা রাজ্য জুড়ে হাহাকার—মর্মভেদী কান্না। আর এই ফাঁকে একদল সুবিধাবাদী শুরু করল লুণ্ঠন চুরি ডাকাতি ধর্ষণ।

রাজ্য শ্মশানপ্রায়। রাজকোষে অর্থ নেই, ক্ষেতে ফসল নেই—অশান্তি আর গোলযোগ সর্বত্র।

অন্য কিছুর জন্য ঔরংজীবের এতটুকু মাথাব্যথা নেই। কিন্তু কোষাগার যে শূন্য! আহার সৈন্যরক্ষা বিলাসব্যসন চলবে কি করে সব—চিন্তিত হয়ে ওঠে সম্রাট্।

কোষাধ্যক্ষ বললে, কোষাগার একেবারে শূন্য আলমপনাহ—

॥ ১০ ॥

নিজের সিংহাসনকে কায়েমী করবার জন্য জীবনে একটার পর একটা ভুলই করে

গিয়েছে ঔরংজীব এবং তার মধ্যে অন্যতম একটি মারাত্মক ভুল হচ্ছে জিজিয়া (মুণ্ড) কর। এবং সে কর তো কেবল মাড়বারেই নয়, সমগ্র রাজস্থান জুড়ে। মেওয়ারের রানা রাজসিংহের নতুন করের কথা শুনে ভ্রু দুটো কুঞ্চিত হয়ে ওঠে।

রূপনগর-মহিষী রূপকুমারী প্রভাবতী পাশেই ছিল স্বামীর। প্রভাবতী বলে, যবনের এই নিত্য নতুন নতুন অত্যাচার সত্যিই অসহ্য প্রভু—মাড়বার আজ বিপদগ্রস্ত—রাজস্থানের সমগ্র আশা-ভরসা বলতে গেলে তুমিই এখন—এর একটা ব্যবস্থা তোমাকেই করতে হবে—

নিশ্চয়ই করব প্রভাবতী—আগে আমি সম্রাট্‌কে একটা পত্র দেবো—

কিন্তু তাতে করে কোন ফল হবে তুমি মনে কর? প্রভাবতী স্বামীর মুখের দিকে তাকাল।

জানি প্রভাবতী, ফল হবে না কিন্তু তবু—

সময় নষ্ট করা মানেই ঐ শয়তান যবনকে প্রস্তুতির সময় দেওয়া—সে প্রস্তুত হওয়ার আগেই তার অন্যায়ের বিরুদ্ধে আমাদের রাজস্থানের সমস্ত শক্তি নিয়ে আমাদের সকলকে রুখে দাঁড়াতে হবে—

মাড়বারের বর্তমান দুর্দশায় প্রভাবতী নিজের মধ্যেই নিজে যেন কিছুদিন ধরে ছটফট করছিল—মেওয়ার-উদয়পুর মহিষী হলেও আসলে প্রভাবতী মারবাড়েরই একজন সামন্ত-কন্যা। এবং সেই কথাটিই যেন অকস্মাৎ নতুন করে গত রাত্রে তাকে মনে করিয়ে দিয়ে গিয়েছে রম্ভা।

নিজের কক্ষে একাকিনী বসে ছিল প্রভাবতী—জর্গনিবাসে। ঔরংজীবের অত্যাচারের কথাই ভাবছিল—শয়তানটা সিংহাসনে বসা অবধি যেন একটা দুষ্ট-গ্রহের মত রাজস্থানের ভাগ্যাকাশে মেঘের সঞ্চার করছে।

প্রভাবতীও সেই দুষ্টগ্রহের শয়তানি থেকে নিষ্কৃতি পায়নি। কুমারী প্রভাবতীর রূপের খ্যাতি সামন্ত রাজ্য ক্ষুদ্র রূপনগর থেকে ছড়াতে ছড়াতে লোকমুখে ঐ শয়তান যবনটার কানে গিয়েও প্রবেশ করেছিল, আর সঙ্গে সঙ্গে তার লোভের জিহ্বা লকলকিয়ে উঠেছিল।

প্রভাবতীর বাপ সামন্তরাজ তো ভয়ে দিশেহারা। প্রবল পরাক্রান্ত সম্রাটকে ঠেকাবে কি করে? প্রভাবতীর মাথাতেই তখন একটা বুদ্ধি আসে। সে গোপনে একটা পত্র লিখে পাঠায় এই মেওয়ার রানা রাজসিংহকে।

আপনি যদি এই মহাসংকটে আমাকে উদ্ধার করতে পারেন তো এ দাসী আপনারই হবে। হে শিশোদীয় বীর, আপনি বেঁচে থাকতে এক রাজপুতকুলের কুমারী কি শেষে ম্লেচ্ছ যবনের উপভোগ্যা হবে। পদ্মিনী মণ্ডকের ঘর করবে। রাজহংসী হবে ভেকের সহচরী। ঐ জানোয়ার মুসলমানটার হাত থেকে আপনি যদি এক হিন্দু কুমারী আমাকে রক্ষা না করেন—মেওয়ারের রানা হয়ে যদি বংশের মর্যাদা না রক্ষা করেন তবে প্রতিজ্ঞা করছি আমি—জানবেন—মুসলমানের অঙ্কশায়িনী হওয়ার আগে বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করব—

রানা রাজসিংহ তার মান রেখেছে। মুসলমানের গ্রাস থেকে তাকে ছিনিয়ে এনেছে। সামন্ত রাজকন্যা আজ মেওয়ারের মহিষী।

সহচরী এসে কুর্নিশ করে জানাল, একটি স্ত্রীলোক আপনার সাক্ষাৎ-প্রার্থিনী।

প্রভাবতী শুধায়, কি চায় সে?

তাও জানি না—যা বলবার সে নিজেই আপনাকে বলবে।

যা এই ঘরে পাঠিয়ে দে।

কালো রেশমী ওড়নায় সর্বাঙ্গ আবৃত রম্ভাকে চিনতে পারেনি প্রথমটায় প্রভাবতী—এমন কি গুণ্ঠন উম্মোচন করে যখন প্রভাবতীর মুখের দিকে তাকাল রম্ভা, তখনো প্রভাবতী বিস্ময়াভিভূত হয়ে তাকিয়ে থাকে রম্ভার অনিন্দ্যসুন্দর কিন্তু ক্লান্ত অবসন্ন বিশুষ্ক মুখখানার দিকে।

রানীমা—

কে তুমি?

আমায় তো আপনি চিনবেন না রানীমা।

কি নাম তোমার?

রম্ভা—তবে আমি নীচকুলোদ্ভবা নই—বংশমর্যাদায় কারো চাইতে ছোট আমি নই—কিন্তু সে কথা থাক—আমি এসেছি যে কারণে বহুদূর থেকে বহুক্লেশে সেই কথাই বলি।

কী বল তো?

সমস্ত মারবাড়ই নয়, সমস্ত রাজওয়ারা—সমস্ত হিন্দুজাতিই আজ বিপন্ন!

রম্ভা—

হ্যাঁ রানীমা—মাড়বারের মহারাজা বেঁচে থাকলে আজ হয়ত আমি তাঁর কাছেই যেতাম কিন্তু তিনি না বেঁচে থাকলেও মহারানা রাজসিংহ তো আছেন আমাদের মাথার উপর রানীমা—এই জিজিয়া কর এই জঘন্য অত্যাচারের কি কোন প্রতিবিধানই হবে না! রাজস্থানের শৌর্য কি নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে!

রম্ভা হয়ত আরো কিছু বলত কিন্তু তার বলা হলো না—দাসী এসে জানাল মহারানা রানীমাকে স্মরণ করেছেন তাঁর প্রকোষ্ঠে।

কেন কিছু জানিস চিত্রা?

না রানীমা—

আচ্ছা তুই যা—আমি আসছি।

চিত্রা দাসী চলে গেল। প্রভাবতী এবার রম্ভার দিকে তাকাল, তুমি কে জানি না—তোমার পরিচয়ও আমি জানতে চাই না—তোমার যদি অনিচ্ছা না থাকে তো মহারানার কাছে তোমাকে আমি নিয়ে যেতে পারি।

মৃদু হাসে রম্ভা। তারপর শান্ত কণ্ঠে বলে, তার কি প্রয়োজন রানীমা—আমি কি জানি না, আপনার কাছে সংবাদটা পৌঁছে দেওয়া মানেই মহারানার কাছে পৌঁছে দেওয়া—আমার কর্তব্য শেষ হয়েছে—

তুমি একটু অপেক্ষা কর, আমার স্বামী কেন আমাকে ডেকেছেন শুনে এখুনি আমি ফিরে আসছি—

প্রভাবতী রম্ভাকে তার কক্ষে অপেক্ষা করতে বলে স্বামীর কক্ষের দিকে চলে গেল, কিন্তু আধ ঘণ্টা পরে স্বামীকে সঙ্গে নিয়ে কক্ষে ফিরে এসে রম্ভাকে আর কোথায়ও দেখতে পেল না।

দ্বার-রক্ষিণীকে জিজ্ঞাসা করল প্রভাবতী রম্ভার কথা।

কিন্তু দ্বার-রক্ষিণী কোন সদুত্তরই দিতে পারল না। সে কেবল বলছে, কাউকে তো আমি ঘর থেকে বের হয়ে যেতে দেখিনি।

সে কি—তবে—

কি তবে রানীমা?

মানুষটা তো কিছু আর হাওয়ায় উড়ে যেতে পারে না—এ কক্ষ থেকে বেরুবার অন্য যে পথ সেখান দিয়ে তো জগনিবাস প্রাসাদ থেকে কারো চলে যাবার কোন উপায়ই নেই—তাহলে তো তাকে জলের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে!

কথাটা মিথ্যা নয়—রাজসিংহের পিতা মহারানা জয়সিংহের তৈরী মনোরম জগনিবাস একেবারে পেশোলা লেকের সরোবরের মধ্যে।

পশ্চাৎপটে তার সুউচ্চ পর্বতশ্রেণী—যেন কালো মেঘের উপরে মেঘ ঢেউ তুলেছে। চারিদিকের অথৈ জলরাশির উপরে জগনিবাসের ছায়া কাঁপছে।

প্রভাবতীর বিস্ময়ের যেন অবধি নেই, আশ্চর্য—গেল কোথায় মেয়েটা বল তো!

রাজসিংহ মৃদু হেসে বলে, কেমন করে বলব বল!

প্রাসাদে একবার ভাল করে খোঁজ করলে হতো না?

না প্রভা—আমি এতক্ষণে চিনতে পেরেছি তাকে—রম্ভা নাম বলেছিল না তোমাকে তার?

হ্যাঁ।

তার কপালের ডান দিকে একটা ক্ষতচিহ্ন আছে?

হ্যাঁ।

আশ্চর্য—

কি আশ্চর্য প্রভু?

আমি ভেবেছিলাম—

কী?

রম্ভার বুঝি মৃত্যু হয়েছে—দিল্লীর জহরব্রতে সে নিজেকে আত্মাহুতি দিয়েছে, কিন্তু এখন বুঝতে পারছি সে মরেনি—কিন্তু কেন? কেন সে জহরব্রতে নিজেকে উৎসর্গ করল না?

আমি তোমার কথা কিছু বুঝতে পারছি না—প্রভাবতী বলে।

এখন সময় নেই প্রভা—ঔরংজীবকে একটা পত্র পাঠাতে হবে—পরে সব বলব।

ঔরংজীবকে পত্র দেবে—কিসের পত্র ?

তার ঐ জিজিয়া করের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ—

আমিও তোমাকে কথাটা কয়েক দিন থেকেই বলবো বলবো ভাবছিলাম। অসহ্য স্পর্ধা ঐ শয়তানটার !

আচ্ছা আমি চলি—মুন্সীজীকে ডেকে পত্রটার মুসাবিদা আগে করি, তারপর তোমায় পড়ে শোনাব।

রাজসিংহ কক্ষ থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেল।

প্রভাবতী বাতায়নপথে এসে দাঁড়াল।

চারিদিকে ইতিমধ্যে রাত্রির অন্ধকার ছড়িয়ে পড়েছে। পেশোলা লেকের জলে জগনিবাসের আলোর ছায়া পড়ে কাঁপছে মৃদু মৃদু।

দূরের পাহাড় আর এখন দেখা যায় না।

বিচিত্র একটা কথা হঠাৎ মনের মধ্যে উদয় হয় প্রভাবতীর—

পারা যায় না কি—হিন্দুস্থানের মাটি থেকে সমস্ত যবনকে একেবারে নির্মূল করে ফেলা যায় না কি ?

হবার নয় কোন দিনই—এই দুই ভিন্ন ধর্ম ভিন্ন সংস্কার ভিন্ন রীতিনীতি আচার-ব্যবহার—দুই জাতের মিশ্রণ ঘটাতে পারে না।

আকবর ভেবেছিল হয়ত হিন্দুনারীকে বিবাহ করে সেই মিলন ঘটাবে—দুই জাতিকে এক করে দেবে কিন্তু তা হলো কই ?

দ্বন্দ্ব যেন উত্তরোত্তর বেড়েই চলেছে।

শত্রুতা—হ্যাঁ আকবর শত্রুতাই করে গিয়েছে—তার মত শত্রু আর হিন্দুদের দ্বিতীয় জন্মায়নি।

ঔরংজীবের দোষ কি ?

তাতার রমণীর গর্ভজাত তাতার পিতার ঔরসজাত যবন সন্তান সে তার ধর্মই পালন করছে। তার যা স্বাভাবিক তাই তো করছে—বেশী কিছু তো নয়।

॥ ১১ ॥

রম্ভা।

বল।

প্রদীপের মৃদু আলোকে দুর্গাদাস রম্ভার মুখের দিকে তাকাল। সত্যই বিচিত্র আশ্চর্য ঐ নারী।

এই কয় বছরের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কেও যেন ঐ নারীর কোন হদিস করতে পারল না দুর্গাদাস।

আশ্চর্য—এই দীর্ঘ পথ তুমি গেলে কি করে ?

ভুলে যাচ্ছো কেন সর্দার, আমি রাজপুত রমণী—তাছাড়া শিশোদীয় বংশের রক্তধারা আমার ধমনীতে—

তুমি—অকস্মাৎ যেন একটা বিস্ময়কর আবিষ্কারের আকস্মিকতায় চেয়ে থাকে দুর্গাদাস রম্ভার মুখের দিকে—

তুমি—তুমি শিশোদীয়—

হ্যাঁ সর্দার—উদয়পুরেই তো আমার জন্মস্থান—শিশোদীয় রক্তের ধারা আমার শরীরে—তাই তো রানা রাজসিংহকে তাঁর কর্তব্যটুকু আজকের মনে করিয়ে দিতে গিয়েছিলাম। সমস্ত রাজস্থানে আজ রানা রাজসিংহ ব্যতীত কে আর আছে বল।

কিন্তু রাজসিংহ কি পারবে সম্রাটের বিরাট বাহিনীকে ঠেকিয়ে রাখতে?

রূপনগরের সংগে যুদ্ধে একবার তা প্রমাণ হয়েছে সর্দার—

তা অবিশ্যি হয়েছে কিন্তু এবার কে আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের সেনাপতি হয়ে আসছে জান রম্ভা?

কে?

টাইবর খাঁ—আর আমার অনুমান যদি মিথ্যা না হয় তো যবন সম্রাটের মনোগত বাসনা এবারে ভয়ানক—

সর্দার—

হ্যাঁ রম্ভা—ঔরংজীব নাকি ঘোষণা করেছে সমগ্র ভারতভূমিতে মাত্র একটি ধর্মই থাকবে, আর সে হচ্ছে তাদের ইসলাম ধর্ম—আর জান তো ঐ কুসংস্কারাচ্ছন্ন ধর্মোন্মাদ যবনদের—ধর্মের জিগির তুলে ওরা বীভৎস পাশবিকতাও করতে পারে।

রম্ভা অতঃপর ক্ষণকাল চুপ করে থেকে বলে, ঐ কথাটা আমি শুনিনি বটে তবে টাইবর খাঁর কথা আমি উদয়পুরেই শুনে এসেছি—আর তার ব্যবস্থাও আমি করে এসেছি—

ব্যবস্থা করে এসেছো?

হ্যাঁ—

কী—কী ব্যবস্থা?

একলিঙ্গজীকে প্রণাম করতে গিয়েছিলাম আমি, সেখানেই চন্দনার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে—নাথোয়ারা থেকে এসেছিল পুজো দিতে।

চন্দনা—

হ্যাঁ—সে অবিশ্যি একজন নটনী—তার পরিচয় ঐটুকুই—

নটনী—

হ্যাঁ—কিন্তু রূপ তার চোখঝলসান—আগুনের মত রূপ তার—এবং টাইবর খাঁর মৃত্যুবাণ হচ্ছে আমার ঐ চন্দনা।

রম্ভার কথা শেষ হলো না। ঐ সময় বছর পাঁচেক বয়সের দুটি শিশু—একটি বালক একটি বালিকা—দুটি শিশু পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে মারামারি করতে করতে ঘরে এসে ঢুকল। রম্ভা তাড়াতাড়ি ওদের ছাড়াতে চেষ্টা করে—মেয়েটিকেই ছেলেটির কাছ থেকে। বলে, লাল, আবার তুই অজিতের সঙ্গে মারামারি করছিস।

ছেলেটি অজিত সিংহ বলে, তুমিই বল তো লাল বড় না আমি বড় ?

লাল অর্থে লালবাঈ।

রম্ভা নয় দুর্গাদাসই আদর করে নাম রেখেছিল লালবাঈ—চুনীর মতই যেন লাল টকটকে গাত্রবর্ণ। তাই আদর করে দুর্গাদাস নাম রেখেছিল, ও আমাদের লালবাঈ রম্ভা।

রম্ভা কোন কথা বলেনি, মুখটা শুধু ঘুরিয়ে নিয়েছিল।

অমন সুন্দর ফুলের মত মেয়েটা—একমাথা কালো কোঁকড়ান চুল গুচ্ছে গুচ্ছে কাঁধের উপরে লুটিয়ে পড়েছে। হরিণশিশুর মত দুটি কালো চঞ্চল চোখের তারা—হাসলে দু'গালে দুটি টোল পড়ে।

দেখলেই যাকে আদর করতে ইচ্ছা করে—বুকে তুলে নিয়ে চেপে ধরতে ইচ্ছা করে, কি জানি কেন রম্ভার তার প্রতি বিতৃষ্ণার যেন সীমা নেই। বলে, কেন ও জন্মালো—মরে গেলেই তো পারত—

দুর্গাদাস বলে, ছিঃ ছিঃ ও কি কথা—তুমি না ওর মা—ও তোমার সন্তান।

সন্তান নয় শত্রু—মহাশত্রু—মনে মনে কতদিন ভেবেছে রম্ভা—ও যদি না তখন গর্ভে থাকত অনায়াসেই তো সে স্বামীর সঙ্গে চিতায় সহমরণে যেতে পারত। ঐ তো বাধা হয়ে ওর পায়ে বেড়ি পরিয়ে রেখে দিয়েছে। তারপর ঐ রূপ নিয়ে জন্মেছে। মেয়েদের রূপের যেমন সার্থকতা রয়েছে তেমনি অভিশাপেরও তো অন্ত নেই—একদিকে ঐ আগুনের মত রূপ অন্যদিকে ওর জন্ম-পরিচয়ের কুয়াশা যা কোন দিনই ওর জীবন থেকে অপসারিত হবে না।

তার চাইতে কবিরত্ন যখন বলেছিল তার দাদাকে ঐ সন্তানকে গর্ভেই বিনষ্ট করে ফেলতে, কেন সে করল না ? কেন অন্ধ মমতায় দু'হাতে ওকে আঁকড়ে ধরল ? কেন মনে পড়ল না একটিবারও অজিতের ভবিষ্যৎটা ? যতদিন বেঁচে থাকবে ঐ দুশ্চিন্তা একটি অভিশাপের মতই কি ওর এবং লালের ভাগ্যকে তাড়া করে বেড়াবে না ?

অজিত বয়েসে লালবাঈয়ের চাইতে কয়েক মাস বড় হলে কি হয় কিন্তু হৃষ্টপুষ্ট বেশী ওদের মধ্যে লালবাঈ-ই।

অজিত চিরদিনই একটু যেন রুগ্ণ। কালো ছিপছিপে—কিন্তু মুখখানি বড় সুন্দর। চোখ দুটির যেন তুলনা নেই।

লালকে জোর করে ছাড়িয়ে দেওয়ায় সে তখন রাগে ফুঁসছিল—ফরসা গালে একটা নখের ক্ষতচিহ্ন, রক্ত দেখা দিয়েছে। মাথার চুল এলোমেলো।

রম্ভার শাসনে লাল ফুঁসতে ফুঁসতে বলে, বড় না হাতী—আমার চাইতে তুই তো ছোট।

দুর্গাদাস অদূরে দাঁড়িয়ে মিটিমিটি হাসে। যেন উপভোগ করছে ব্যাপারটা সে।

ঐ দেখ আয়ি, ও আবার বলছে আমি ছোট—অজিত কাঁদো কাঁদো গলায় রম্ভার কাছে নালিশ জানায়।

লালবাঈ আবার বলে ওঠে চীৎকার করে, ছোটই তো—ছোট—ছোট—ছোট—

আমার সঙ্গে মল্লযুদ্ধে পারিস না তো—

রম্ভা অকস্মাৎ যেন রাগে ফেটে পড়ে—মেয়ের গালে ঠাস করে একটা চড় কষিয়ে দিয়ে চাপা আক্রোশভরা কণ্ঠে বলে ওঠে, অসভ্য মেয়ে।

রম্ভা আবারও মারবার জন্য হাত তুলেছিল কিন্তু মাঝখান থেকে দুর্গাদাস তাড়াতাড়ি লালবাঈকে নিজের কাছে টেনে এনে দু'হাতে আড়াল করে বলে, আহা, ও কি রম্ভা, ছিঃ—অমন করে মারে।

মারব না—গর্জাতে থাকে রম্ভা, জানে না হতভাগী ও কার গায়ে হাত তুলেছে—

ও কি বলছো তুমি রম্ভা—দুর্গাদাস প্রতিবাদ জানায়, শিশুর কি কোন বোধশক্তি আছে—তাছাড়া ওর অধিকারও তো কম নয়—একই—

চুপ করুন—চুপ করুন সর্দার—তাড়াতাড়ি যেন থামিয়ে দেয় রম্ভা দুর্গাদাসকে, কে বিশ্বাস করবে সে কথা—আর কোন দিন কি সে সম্মান সে অধিকার ও পাবে, না দুনিয়ার কাছে কোন দিন দাবি করতে পারবে। অজ্ঞাতকুলশীলা হয়েই যে চিরদিন অপরিচয়ের অন্ধকারে ওকে মাথা কুটে মরতে হবে।

না তা হবে না।

সর্দার—

হ্যাঁ—যদি আমি বেঁচে থাকি তো সে ব্যবস্থা আমিই করব—কিন্তু তুমি আর বিলম্ব করো না, যাও আহার্য প্রস্তুত করে ফেলগে, আমাকে আবার রাত্রির তৃতীয় প্রহরেই রওনা হতে হবে।

রম্ভা অন্দরের দিকে চলে গেল। এবং অঞ্চলে চোখ মুছতে মুছতে যে গেল সেটা দুর্গাদাসের নজর এড়ায় না—

মনে মনে বলে দুর্গাদাস, আহা হতভাগিনী—জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্মান পেয়েও সব হারাল।

একটা বড় রকমের দীর্ঘশ্বাস যেন দুর্গাদাসের বুকখানা কাঁপিয়ে বের হয়ে আসে।

রম্ভাকে দুর্গাদাস সত্যিই কন্যার মত ভালবেসেছিল।

ইতিমধ্যে অজিতের লালের প্রতি আর কোন রাগ ছিল না।

শিশু মন—রাগ অভিমান হতেও যতক্ষণ আবার সব জল হয়ে যেতেও ততক্ষণ। সে লালবাঈয়ের দিকে এগিয়ে গিয়ে তার হাত ধরে, আয় লাল—

লালবাঈ হাত ছাড়িয়ে দেয়। বলে, না—

আয় না—চল খেলিগে—

না যাবো না—

তোর গাল দিয়ে রক্ত পড়ছে আয় মুছিয়ে দিই—চল দুর্বা থেঁতো করে লাগিয়ে দেবো—

না—শক্ত হয়ে মুখ ফিরিয়ে দাঁড়ায় লালবাঈ অজিতের দিক থেকে।

দুর্গাদাস ওদের কথা শুনতে থাকে একপাশে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে।

রাগ করেছিস ?

অজিত এবার দু'পা এগিয়ে আসে লালবাঈয়ের দিকে।

লালবাঈ মুখ ঘুরিয়ে তখনো দাঁড়িয়ে আছে।

কথা বলবি না আমার সঙ্গে ?

লালবাঈ নিরুত্তর তবু।

তোর খুব লেগেছে আমি জানি—রক্ত পড়ছে। কেন তুই আমাকে রাগিয়ে দিলি তাই তো খামচে দিলাম নখ দিয়ে—বিষণ্ণ অনুতপ্ত কণ্ঠে থেমে থেমে কথাগুলো বলে অজিত।

লালবাঈ তথাপি কোন সাড়া দেয় না। মুখ ঘুরিয়ে যেমন তাকিয়ে ছিল অন্য দিকে তেমনিই দাঁড়িয়ে থাকে।

দুর্গাদাস চেয়ে থাকে ওদের দিকে। কোন কথা বলে না কাউকে।

কাকা—

অজিত সিংহ ডাকে দুর্গাদাসকে এবারে তার মুখের দিকে চেয়ে।

লালকে তুমি বল না কাকা,—বল না আর আমি ওকে মারব না।

দুর্গাদাস কিছু বলবার আগেই অন্দর থেকে রম্ভার ডাক ভেসে আসে। আহার্য দেওয়া হয়েছে।

দুর্গাদাস ঘর থেকে বের হয়ে যায়।

লাল—

অজিতের চোখ দুটো ততক্ষণে ছলছল করে উঠেছে।

আমার সঙ্গে সত্যিই তুই কথা বলবি না লাল—এই লাল—বলছি তো আর কখনো তোকে মারব না—লাল—

কী ?

মুখটা না ফিরিয়েই লালবাঈ এবারে জবাব দেয়।

লাল—

বল—

আমার সঙ্গে খেলবি না ?

খেলব।

আমার সঙ্গে তবে চল।

কোথায় ?

বাইরে—

না—এখন বেরুলে আয়ি রাগ করবে।

আয়ি জানবে কেমন করে—এখনও সে রান্না করছে।

তবে চল—

দুজনে পা টিপে টিপে অন্ধকারে ঘর থেকে বের হয়ে যায়।

ঔরংজীবের নির্দেশে সপ্তাতি সহস্র সৈন্যের এক বিরাট বাহিনী নিয়ে সেনাপতি টাইবর খাঁ ক্রমশঃ রাজস্থানের দিকে এগিয়ে আসছিল।

আর সম্রাট্ স্বয়ং আজমীরের দিকে গেল।

ঔরংজীব আজমীরের দিকে গিয়েছে জানতে পেরে মৈরতীয় সামন্ত দল রীতিমত ভীত হয়ে ওঠে।

ঔরংজীবের মতলবটা যে আদো ভাল নয় মৈরতীয়দের বুঝতে কষ্ট হয় না। সম্রাটের লক্ষ্য হিন্দুর মহা পবিত্র তীর্থ পুষ্কর।

তারাগর পর্বতের ঠিক পাদদেশে অবস্থিত আজমীর—আকবরের দুর্গে গিয়েই যে যবন সম্রাট্ আসন পাতবে সেও ওদের জানা।

তারপর হয়ত সেই পবিত্র পুষ্কর সরোবরকে অপবিত্র করবে।

কিন্তু তা হতে দেওয়া হবে না।

সামনেই কার্তিক পূর্ণিমার উৎসব আসছে—পুষ্কর সরোবরে স্নান করে দেব ব্রহ্মাকে সকলে পূজা দেবে—অর্ঘ্য দান করবে—

মৈরতীয়রা আর বিলম্ব করে না—তারা যবন সম্রাটের অগ্রগতিকে বাধা দেবার জন্য অগ্রসর হলো।

কিন্তু যবন সম্রাটের সুশিক্ষিত বিরাট বাহিনীর কাছে মৈরতীয় সামন্ত সৈন্যদের সাধ্য কি যে দাঁড়ায়।

ভগবান বরাহের পবিত্র মন্দিরের সামনে উভয় পক্ষের যুদ্ধ হলো।

মাত্র কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই মৈরতীয় সৈন্যরা নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল।

যবন সম্রাট্ আকবরের দুর্গে গিয়ে স্থান নিল।

টাইবর খাঁ এগিয়ে চলেছে।

মুরধরের অধিবাসীরা তো পালিয়েই প্রাণ বাঁচাল। টাইবর এগিয়ে চলে।

কিন্তু বেশীদূর এগুনো সম্ভব হলো না।

ওরাতে এসে তাকে দাঁড়াতে হলো।

রূপ আর কুম্ভ দুই ভাই তাদের ছোট একটি সেনাদল নিয়ে সংকীর্ণ গিরিপথের মুখ আগলে দাঁড়িয়েছে—মাত্র পঁচিশজন দলে তারা।

যেতে দেবে না—এক পাও আর যেতে দেবে না যবন সেনাপতি টাইবর খাঁকে তার সৈন্যবাহিনী নিয়ে।

কিন্তু অগণিত যবন সেনার আক্রমণের সামনে মাত্র পঁচিশজন রাজপুত কি করতে পারে—বন্যার জলে কুটোর মতই ভেসে গেল দেখতে দেখতে।

টাইবর খাঁ রূপ আর কুম্ভকে নিশ্চিহ্ন করে এগিয়ে গেল অজয় দুর্গে।

সেখান থেকে চিতোর।

চিতোরেও যবনের আধিপত্য বিস্তৃত হলো।

আকবরের দুর্গে বসে ঔরংজীব সব সংবাদই পায়।

নিশ্চিহ্ন—নিশ্চিহ্ন করে দাও রাজস্থান—মরুভূমি করে দাও—

দুর্গের একটি কক্ষে পায়চারি করতে করতে অদূরে দণ্ডায়মান টাইবর খাঁকে বলছিল ঔরংজীব।

রাত্রি মধ্য প্রহর।

দ্বাররক্ষী এসে কক্ষে প্রবেশ করল, আলমপনাহ—

কি সংবাদ দেলোয়ার খাঁ?

দ্রুতগামী অশ্বারোহী পত্রবাহক এসেছে।

কোথা থেকে?

উদয়পুরের মহারানা—

কে—রাজসিংহ—সেই রাজস্থানের ছুঁচোটা—

রাজসিংহের উপরে আক্রোশ এখনো যায়নি ঔরংজীবের—তাই কি যায় না যেতে পারে। সেই সামান্য সামন্ত রাজকন্যা রূপনগর কুমারী প্রভাবতী—ঐ ছুঁচোটা একদিন তাকে ছিনিয়ে নিয়েছে তার প্রায় হাতের মুঠো থেকে বলতে গেলে।

একটা চাপা ক্রোধে ঔরংজীবের সমস্ত মুখটা লাল হয়ে ওঠে।

কোথায় সেই পত্রবাহক?

দুর্গের বাইরে অপেক্ষা করছে আলম্‌পনাহ্‌—

যাও—এখানে নিয়ে এসো।

দেলোয়ার খাঁ কুর্নিশ করে ঘর থেকে বের হয়ে গেল এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই পত্রবাহককে নিয়ে এসে পুনরায় ঘরের মধ্য প্রবেশ করল।

উদয়পুর থেকে আসছো?

জাঁহাপনা—মহারানার পত্রবাহক আমি—

সসম্ভ্রমে পত্রখানি এগিয়ে দেয় কুমার সিং। টাইবর খাঁ পত্রটা তুলে দেয় সম্রাটের হাতে।

পত্রের ভাঁজ খুলে চোখের সামনে মেলে ধরল ঔরংজীব।

সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের দয়ায় এবং আপনার সুশাসনে হে সম্রাট্‌ আমরা শান্তি আর নিশ্চয়তা চাই—আর সে কারণে সর্বতোভাবে আপনাকে আমি সাহায্য করতেও প্রস্তুত—কিন্তু যখন জানলাম জিজিয়া করের দ্বারা আপনি সমগ্র হিন্দু-জাতির উপরে একটা অবিশ্বাস্য ভার চাপিয়ে দিয়েছেন এই প্রতিবাদপত্র না দিয়ে আপনাকে—শাহেনশা—আমি আর স্থির থাকতে পারলাম না। আপনার পিতামহ পিতা তাঁরা চিরদিন তাঁদের প্রজাদের সুখ-দুঃখ সত্যিকারের দরদ দিয়ে দেখেছেন—যার ফলে তাঁদের সাম্রাজ্যে চিরশান্তির সঙ্গে মৈত্রী ও ঐক্য বিরাজ করেছে—কিন্তু আপনি যে পথে চলেছেন এ ধ্বংসের পথ—অবিশ্বাসের পথ—অন্যায়ের পথ—

ঔরংজীব পত্রখানি পড়তে পড়তে জ্বলে ওঠে।

কি—রাজসিংহের এতদূর স্পর্ধা!

ঔরংজীব—জিন্দাপীরের কাজের সমালোচনা করে!

তথাপি শেষ পর্যন্ত পত্রটা পড়ে সেটা টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলে দেয় সম্রাট্‌ কুমার সিংহের সামনেই।

বলে, যাও—তোমার রানাকে গিয়ে বলো কামানের মুখেই সম্রাট্‌ তার পত্রের জবাব দেবে।

কুমার সিং একটি কথাও বলে না। নিঃশব্দে সম্রাট্‌কে সেলাম জানিয়ে কক্ষ ত্যাগ করে।

দূতের মুখে সমস্ত কথা শুনে রাজসিংহ গর্জে ওঠে।

যুদ্ধের দামামা বেজে ওঠে।

এবং দীর্ঘ দিন পরে আবার শিশোদীয় ও রাঠোররা পরস্পরের শত্রুতা ভুলে গিয়ে একজাতি একপ্রাণ হয়ে রাজোয়ারার স্বাধীনতা রক্ষার জন্য পাশাপাশি এসে দাঁড়াল।

মেওয়ার ও মারবাড় মিলিত হলো।

ঔরংজীব সৈন্যদের নিয়ে দোবারীর গিরিপথের নিকট এসে হাজির হয়—গিরিপথের অন্য মুখে কুম্ভ উগ্রসেন উদো রাঠোর বীররা পথ আগলে দাঁড়াল।

ঔরংজীবের বিরাট বাহিনী গিরিবর্ত্ম ধরে উদয়পুরের দিকে এগিয়ে চলেছে যখন হঠাৎ সেই সময় সম্রাটের কাছে সংবাদ এলো রাঠোর বীর দুর্গাদাস ঝালোর আক্রমণ করেছে।

ঔরংজীব প্রমাদ গণে মনে মনে—পুত্র আজিম চিতোরে রয়েছে।

ঔরংজীব সেনাপতি মকরা খাঁকে ঝালোরে বিহারীর সাহায্যের জন্য পাঠিয়ে এবং অন্য পুত্র আকবরকে টাইবর খাঁর কাছে রেখে দ্রুত আজমীরে ফিরে এলো।

দুর্গাদাসকে কিন্তু মকরা খাঁ ঠেকাতে পারল না—সে দেখতে দেখতে যোধপুরে এসে উপস্থিত হলো, কিন্তু জয়ের আশা সুদূরপরাহত।

যবন সৈন্যর লুণ্ঠন ও অমানুষিক অত্যাচারে সারা রাজস্থানে তখন ভয়াবহ এক অরাজকতা।

রাঠোররা উপায়ান্তর না দেখে আরাবল্লীর পর্বত-কন্দরে-কন্দরে গিয়ে আশ্রয় নিল।

রাজসিংহ তার পুত্র ভীমসিংহকে রাঠোরদের সাহায্যের জন্য পাঠাল। ভীম এসে দুর্গাদাসের সঙ্গে মিলিত হলো।

দুর্গাদাস তখন ইন্দ্রভান ও রাঠোর বাহিনী নিয়ে গদবারে পুনরায় আক্রমণ চালাবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে।

টাইবর খাঁ ও আকবর মোঘল সৈন্য নিয়ে এগিয়ে এলো দুর্গাদাসে প্রচেষ্টাকে ধ্বংস করতে।

নাদোল নগরে প্রচণ্ড এক যুদ্ধ হলো।

দ্বিতীয় দিনের যুদ্ধে ভীমসিংহ প্রাণ দিল

রাঠোরদের শেষ আশা নিঃশেষ হতে চলেছে—নামই বুঝি তাদের ইতিহাসের পাতা থেকে এবারে মুছে গেল।

অন্যদিকে মোঘল শিবিরে সম্রাট্-পুত্র আকবর সেনাপতি টাইবর খাঁকে ডেকে পাঠাল।

খাঁসাহেব—

বলুন শাহজাদা।

এ যুদ্ধ বন্ধ করুন!

কি বলছেন আপনি?

ঠিকই বলছি—এই দুঃসাহসিক রাজপুতরাই আমাদের এদেশে একমাত্র ভরসা—এদের এভাবে ধ্বংস করা মানেই নিজেদের ধ্বংস ডেকে আনা—পিতা ভুল করছেন—ভেবে দেখুন ওরা না থাকলে এদেশে আমরা রাজত্ব করতে পারতাম?

তা অবিশ্যি মিথ্যা বলেননি শাহজাদা।

দুর্গাদাসের কাছে দূত প্রেরণ করুন।

কিন্তু সম্রাট্—

সম্রাটের ভাবনা আমি ভাবব—আপনি দূত প্রেরণ করুন সন্ধির জন্য।

সেই রাত্রেই মোঘল শিবির থেকে দূত প্রেরিত হলো জরুরী পত্র নিয়ে।

শাহজাদা আকবরের কাছ থেকে সন্ধির পত্র পেয়ে দুর্গাদাস কিন্তু স্বস্তির নিশ্বাস নেয়—তাড়াতাড়ি তার তাঁবুর মধ্যে সমস্ত সর্দারদের ডেকে পাঠাল।

কী হয়েছে দুর্গাদাস—কোন দুঃসংবাদ?

না—বলতে পার বরং সত্যিকারের সুসংবাদ।

কী?

সন্ধির প্রস্তাব করেছেন শাহজাদা।

॥ ১৩ ॥

দুর্গাদাসের আহ্বানে ঐ মধ্যরাত্রিতে চম্পাবৎ, কুম্পাবৎ, পত্তাবৎ, লাক্ষাবৎ, কর্নোট, দুঙ্গারোৎ, মৈরতীয় ও বীরসিংহোট এবং উদাবৎ ও বীদাবৎ সমস্ত সামন্ত সর্দাররাই দুর্গাদাসের তাঁবুতে এসে জমায়েৎ হলো।

সাথি রতনদাস কুম্পাবৎই সর্বপ্রথমে প্রশ্ন করে, সন্ধির প্রস্তাব পাঠিয়েছে শাহজাদা আকবর?

হ্যাঁ—টাইবর খাঁ সেই সন্ধিপত্রের উপরে নিজের নামাঙ্কিত মোহর এঁকে দিয়ে—দুর্গাদাসের কথা শেষ হলো না।

রতনদাস বললে, যবনের ও এক নতুন চাল দুর্গাদাস—

না, না—সত্যিই—

দেখ দুর্গাদাস, পৃথিবীতে সমস্ত জাতকে আমি বিশ্বাস করতে পারি কিন্তু করতে পারি না ঐ যবনকে।

কিন্তু রতনদাস—

না—ওরা বিশ্বাসের মুখোশ মুখে এ'টে চরম বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারে যেমন তেমনি ওরা কার্য হাসিলের জন্য পারে না এমন কোন কাজই নেই—এ সন্ধি হতে পারে না—হবে না।

দুর্গাদাস বোঝাবার চেষ্টা করে নানাভাবে কিন্তু সর্দারদের ঐ এক কথা—যবনের সঙ্গে কোন সন্ধি হতে পারে না—যারা ধর্মের জিগির তুলে মানুষের বুকে ছুরি বসায় তাদের বিশ্বাস করা বোকামি—পাকে পড়ে এখন তারা সন্ধির প্রস্তাব করেছে—ভুলে গেলে কি দুর্গাদাস মহারাজ যশোবন্তের পুত্র পৃথ্বী সিংহকে কি নিষ্ঠুরভাবে ওরা হত্যা করেছে—কিভাবে হত্যা করেছে মহারাজ যশোবন্তকে—জয়সিংহকে—দাক্ষিণাত্যের শিবাজীকে—ওরা শত্রু—হিন্দুস্থানের শত্রু রাজস্থানের শত্রু ভারতের শত্রু। ওদের আমরা নির্মূল করে ফেলবো।

যমুনা সিংহ তো স্পষ্টই দুর্গাদাসকে সন্দেহ করে! নিশ্চয়ই দুর্গাদাসের কোন স্বার্থ আছে নচেৎ তার এত আগ্রহই বা কেন—

বিশ্রী একটা গোলমাল ও কথাকাটাকাটি শুরু হয়ে যায়।

দুর্গাদাস তাদের থামিয়ে দিয়ে বলে, থামুন—অনুগ্রহ করে আপনারা থামুন সর্দাররা—আর যাই করুক দুর্গাদাস সে তার নিজের মাতৃভূমিকে যবনের হাতে তুলে দেবে না—আপনাদের মন থেকে ভয় আর সন্দেহ দূর করুন—শত্রু যখন যেচে সন্ধির প্রস্তাব পাঠিয়েছে তাদের আমরা ফিরিয়ে দিলে জগৎ বলবে আমাদের ভীরু—বিশ্বাসঘাতকতা যদি তারা করেই আমরা রাঠোররাও মরে যাইনি—আমরা শত্রুকে তখন সমূলে ধ্বংস করে দেবো—

দুর্গাদাসের শেষের কথায় ধীরে ধীরে সকলে শান্ত হয়। এবং শেষ পর্যন্ত সভায় স্থির হয় সন্ধির প্রস্তাব গ্রহণ করা হবে। কিন্তু কে যাবে মোঘল শিবিরে?

দুর্গাদাস বলেছিল সেই যাবে কিন্তু অন্যান্য সর্দাররা বলে, না—একা নয় তুমি দুর্গাদাস—আমরা সকলেই যাবো—

কেন?

ও যবনকে বিশ্বাস নেই, বিশেষ করে ঐ ঔরংজীবকে—যদি সে রকম বুঝি তো সব একেবারে শেষ করে দিয়ে আসব আমরা—একজন সর্দার বলে।

বেশ—তাই চলুন তবে।

শাহজাদা আকবর লোকটা খুব খারাপ প্রকৃতির ছিল না। বাপ ঔরংজীবের মত ছিল না। আর সে ঠিক কোন দিন চায়নি সারা দুনিয়ায় একটি মাত্র ধর্মই থাক—সে ইসলাম ধর্ম। এবং সে হিন্দু প্রজাদের সঙ্গে একটা সদ্ভাব রেখেই রাজ্য চালিয়ে যেতে চেয়েছিল।

রাঠোর সর্দাররা তার শিবিরে আসতেই সে সাদরে তাদের আহ্বান জানিয়ে যথাযোগ্য সম্মান দিল।

আমি যুদ্ধ চাই না—আপনাদের সহায়তাই চাই সর্দারগণ।

দুর্গাদাস বলে, আমরাও তা চাই না কিন্তু আপনার পিতা সম্রাট্—

জানি—তিনি অবিবেচক—উম্মাদ—নচেৎ কখনোই এভাবে আপনারা যাঁরা তাঁর সবচাইতে বল ভরসা তাঁদের সঙ্গে এভাবে ঝগড়া মারামারি করে নিজের ভবিষ্যৎকে ক্রমশঃ অন্ধকার অনিশ্চয়তার মধ্যে টেনে নিয়ে যেতেন না একটা ধর্মের অন্ধ জিগির তুলে—

সর্দাররা আকবরের কথায় মুগ্ধ হয়ে যায়।

এবং দুর্গাদাসই তখন অন্যান্য সামন্ত সর্দারদের সঙ্গে পরামর্শ করে শাহজাদা আকবরকেই ভারতের সম্রাট ভারতেশ্বর বলে সম্বোধন করে তার কাছে নতি স্বীকার করল। সন্ধি হলো। শান্তি হলো।

দ্রুতগামী এক অশ্বারোহী দূত প্রেরিত হলো আজমীরে আকবর দুর্গে সম্রাট ঔরংজীবের কাছে পত্র নিয়ে।

ঔরংজীব পত্র পড়ে স্তম্ভিত হয়ে গেল।

সর্বনাশ—একি—তার নিজের পুত্র—তার বিশ্বস্ত সেনাপতি, তারা কিনা এমন একটা মূর্খের মত কাজ করেছে!

ধূর্ত ঔরংজীব মনে মনে জ্বলতে থাকলেও মুখে কিন্তু কাষ্ঠ হাসি হেসে বলে, এ তো খুব ভাল কথা—আমি প্রৌঢ় হয়েছি—উপযুক্ত পুত্র আমার, সে যদি আমার গুরুভার মাথায় তুলে নেয় আর তাতে যদি সকলের সম্মতি থাকে সে তো অতীব আনন্দের কথা। কিন্তু মুখে ঔরংজীব যাই বলুক সেটা যে তার মনের কথা নয় তা আর কেউ না বুঝতে পারলেও উদিপুরী বেগম বুঝতে পেরেছিল।

সে কিন্তু সংবাদটা পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মনে মনে শঙ্কিত হয়ে ওঠে। এ প্রশান্তি ঝড়ের পূর্বাভাষ মাত্র।

ওদিকে রাঠোররাও চুপ করে ছিল না—মুখে সম্রাট যাই বলুক সেটা যে কোনমতেই তার মনের কথা, সত্যিকারের কথা হতে পারে না, সেটা তারা জানত বলেই তারাও আকবরের পতাকাতলে একে একে এসে সমবেত হতে লাগল।

সমস্ত সংবাদই ঔরংজীব পায়। আর একটা আশংকায় ছটফট করতে থাকে। আশেপাশে বিশ্বাস করতে পারে এমন একটি বন্ধু বা সুহৃদ তার চোখে পড়ে না।

না—কেউ নেই— জীবনে তো কোন দিন কাউকে বিশ্বাস করেনি ঔরংজীব—করতে পারে নি—বাপ বোন ভাই বন্ধু স্ত্রী মন্ত্রী সেনাপতি এমন কি নিজস্ব দেহরক্ষীকেও নয়— সর্বত্র সে দেখেছে কেবল সন্দেহের ছায়া—একটা ষড়যন্ত্রের ছায়া—মনে হয়েছে সবাই তার বিরুদ্ধে ছুরি শানাচ্ছে—সবাই তাকে বিষ দিতে চায়—সুযোগ পেলেই তাকে হত্যা করবে। তার আশেপাশে যারা সর্বক্ষণ আছে তারাই যে সুযোগ পেলে প্রথমেই তাকে হত্যা করবে—এই বিশ্বাসই তাকে জীবনের সবচাইতে বড় সহায় ও আশ্বাস-বিশ্বাসের থেকে দূরে—বহুদূরে নিয়ে গিয়েছে। তাই আজ সে নিজের ছায়া দেখেও আতকে ওঠে। মানুষের হাসিতে সে

ক্রূর অভিসন্ধি দেখে। মানুষের আশ্বাসে সে ষড়্‌যন্ত্র দেখে। তাই ঔরংজীব আজ একা। সহস্রজনের মধ্যে পরিবেষ্টিত থেকেও সে একা। হাজার আশ্রয়ের মধ্যে থেকেও সে নিরাশ্রয়।

আহারে তার রুচি নেই—নিশীথে নিদ্রা নেই—যদি কখনো নিদ্রা যায় তো সেও দুঃস্বপ্নে ভরা। কিন্তু এই রাজ্য এই সাম্রাজ্যই কি ঔরংজীব চেয়েছিল। এই জন্যই কি সে একে একে সব ভাইদের পথের কাঁটা হিসাবে সরিয়ে দিয়েছে—বৃদ্ধ পিতাকে বন্দী করে হত্যা করেছে ?

কে ?

চমকে ওঠে ঔরংজীব—একাকী কক্ষের মধ্যে পায়চারি করছিল নিশীথ রাত্রে। দুর্গের গবাক্ষপথে হাওয়া এসে—অদূরে একটি সুউচ্চ কাষ্ঠখণ্ডের ওপরে রক্ষিত যে কোরান এতক্ষণ ঔরংজীব পড়ছিল, সশব্দে তার পাতাগুলি ফরফর করে উড়তে শুরু করে। তারই শব্দে চমকে ওঠে ঔরংজীব।

কে—কে—না—কেউ নয়। বাতাস—বাতাসে কোরানের পাতাগুলো উড়ে উড়ে শব্দ করছিল।

বিশ্বাস—কাউকে আজ সে বিশ্বাস করতে পারছে না কেন ? এই অবিশ্বাস এই সন্দেহের বিষ কোথা থেকে তার মনে এসে বাসা বাঁধল। মনে পড়ে সেই শৈশবের কথা।

মা মমতাজমহল ছিল রূপসী অগ্রগণ্যা—কোমলহৃদয়া নারী—পিতা সাজাহানও তো নিষ্ঠুর ছিল না—তবে তার মনের সমস্ত কোমলতা এমন করে মুছে গেল কেন ? কেন ? অবিশ্বাস আর সন্দেহের বিষে সব কিছু শুকিয়ে গেল কেন।

শিশু ঔরংজীব তখন—পিতা সাজাহান তার পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে—পিতামহ জাহাঙ্গীরের কোপদৃষ্টিতে পড়েছিল পিতা সাজাহান এবং লুকিয়ে এখানে ওখানে পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে—অবশেষে বছর তিনেক ঐভাবে পালিয়ে পালিয়ে বেড়িয়ে জাহাঙ্গীরের কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করে শিশু ঔরংজীবকে তার প্রতিভূ হিসাবে তার কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিল সাজাহান।

জাহাঙ্গীর সাজাহানকে ক্ষমা করল বটে কিন্তু বেচারী ঔরংজীব—তার মা বাপ বেঁচে থাকা সত্ত্বেও তাদের স্নেহ ও সঙ্গসুখ থেকে বঞ্চিত হলো। এবং সেই সঙ্গে জাহাঙ্গীর-মহিষী নূরজাহাঁর আওতায় তাকে গিয়ে থাকতে হলো—যে নূরজাহাঁ কোন দিন তাকে সুচক্ষে দেখতে পারেনি। বরাবর একটা বিদ্বেষের চোখেই দেখেছে তাকে। ঘৃণা আর বিদ্বেষের মধ্যে থেকে দিনের পর দিন শিশুমনের সমস্ত কোমল বৃত্তিগুলো একে একে শুকিয়ে গেল।

তারপর যখন জাহাঙ্গীরের মৃত্যু হলো—সাজাহান সম্রাট হলো, তখনো সে পেল না পিতার সাহচর্য বা স্নেহ। দারা শিকো ও সুজাই ছিল তখন তার সব।

ঔরংজীবের শিক্ষাদীক্ষার সব ভার পড়লো এক অশিক্ষিত দুর্ধর্ষ খোজার ওপরে। অতি নিকৃষ্ট শ্রেণীর একটা মানুষ। আর গৃহশিক্ষক ছিল কে—না স্বার্থপর নীচমনা চাটুকার অনুগ্রহলোভী মীর মহম্মদ। তাই তো ঔরংজীব সম্রাট হয়ে বসবার পর মীর মহম্মদ যখন তার কৃপা ভিক্ষা করতে এসেছিল ঔরংজীব

বলেছিল, কি শিক্ষা দিয়েছো তুমি আমায় মোল্লাসাহেব, যে আজ গুরুদক্ষিণা নিতে এসেছো ?

কেন জাঁহাপনা, আমি কি আপনাকে উপযুক্ত শিক্ষা দেইনি ।

হ্যাঁ দিয়েছো—কতকগুলো আরবী ব্যাকরণ—নিরর্থক শব্দতত্ত্ব ও নীরস দর্শনশাস্ত্রের কচকচানি আমাকে শিখিয়েছো, কিন্তু বলতে পারো একজন পরবর্তী কালে যে তামাম দুনিয়ার মালিক হবে—যাকে লোকে শুধু সম্রাট আলমগীর নয় জিন্দাপীর বলে জানবে, তার ভবিষ্যৎকে গড়ে তোলবার জন্য কি শিক্ষা দিয়েছো ?

জাঁহাপনা—

আমার এই বিশাল রাজ্যে ছাড়াও পৃথিবীর অন্যান্য রাজ্যগুলিতে যে বিভিন্ন জাতি—তাদের আচার-ব্যবহার, রীতিনীতি, শিক্ষাদীক্ষা এসব সম্পর্কে কোন শিক্ষা তুমি কি কোনদিন আমায় দিয়েছো মোল্লাসাহেব—তাদের রাজ্য-শাসন নীতি, সামরিক শক্তির কথা, শাসনপ্রণালী, সামাজিক আচার-ব্যবহারের কথা কি কখনো আমাকে জানিয়েছো। বিশ্ববিশ্রুত সাম্রাজ্যের উত্থান-পতনের কাহিনী —কেন উত্থান হলো কেনই বা পতন হলো সে কথা কি বোঝাবার চেষ্টা কখনো করেছো আমায় ?

কিন্তু জাঁহাপনা—

বিরক্ত করো না, যাও—আর কখনো যেন দিল্লীর কোথাও তোমার ছায়া না পড়ে ।

কক্ষদ্বারে পদশব্দ শোনা গেল ।

কে ?

আলমপনাহ—আমি গুরেগন খাঁ—

কি খবর—এসো ভিতরে এসো—কি খবর ?

অত্যন্ত দুঃসংবাদ আলমপনাহ—শাহজাদা আকবর অগণিত রাজপুত সৈন্য নিয়ে এই আজমীঢ়ের দিকেই আসছেন—

হুঁ—আর সেই বিশ্বাসঘাতক শয়তান টাইবর খাঁ ?

সে আসেনি ।

কোথায় সে ?

তার এক দূত পত্র নিয়ে এসেছে—জরুরী—আপনার সাক্ষাৎপ্রার্থী ।

নিয়ে এসো তাকে ।

টাইবর খাঁ গোপন পত্র পাঠিয়েছে সম্রাটকে এক বৃদ্ধ মোঘল সৈন্যের হাত দিয়ে ।

সম্রাট জাঁহাপনা যদি তাকে পুরস্কৃত করেন তো শাহাজাদা আকবরকে তাঁর হাতে তুলে দিতে তিনি প্রস্তুত—এবং যা ঘটেছে তার জন্য তিনি এতটুকুও দায়ী তো ননই এবং যা ঘটেছে সবই তার অনিচ্ছা ও বাধাদান সত্ত্বেও ।

হুঁ—টাইবর তাহলে ভেঙেছে—কাঁটা দিয়েই কাঁটা তুলতে হবে ।

সঙ্গে সঙ্গে ঔরঙ্গজীব মনস্থির করে ফেলে ।

বৃদ্ধ পত্রবাহকের দিকে তাকিয়ে বলে, তাই হবে—তাকে গিয়ে বল আমি তাকে পুরস্কৃত করব—সে যেন আমার সঙ্গে অবিলম্বে দেখা করে।

জাঁহাপনা কথা দিচ্ছেন—

দিচ্ছি।

টাইবর সম্রাটের সামনেই উপস্থিত জাঁহাপনা—বলতে বলতে মুখের দাড়ি গোঁফ টেনে খুলে ফেলে কুর্নিশ জানায় টাইবর খাঁ।

টাইবর—

গোলাম আপনার সামনে জাঁহাপনা মালেকআলম—শত্রুসৈন্য মাত্র এক ক্রোশের মধ্যে এসে গিয়েছে—আমি বিনা রক্তপাতে একটি কৌশল খাটাতে চাই যদি শাহেন-শাহর অনুমতি হয়।

কী ?

আমি দুর্গাদাসের কাছে একটি পত্র পাঠাবো—

পত্র !

হ্যাঁ—তাতে লেখা থাকবে—রাঠোর সর্দার, শাহজাদা আকবরের সঙ্গে সন্ধি-স্থাপনে আমি আপনাদের গ্রন্থিস্বরূপ ছিলাম কিন্তু গোপনে পিতা পুত্র মিলিত হয়ে আবার এক হয়ে গিয়েছে—অতএব আমরা পরস্পরে যে পণ করেছিলাম মনে করুন তা প্রতিপালিত হয়েছে—এবারে নিজের ধ্বংস যদি না চান তো স্বদেশে ফিরে যান।

চমৎকার—উল্লাসে ফেটে পড়ে ঔরংজীব।

টাইবর খাঁর সীলমোহর অঙ্কিত করে তখনই পত্র প্রেরিত হলো রাঠোর যুদ্ধ-শিবিরে দ্রুতগামী অশ্বারোহীর মারফত।

আলমপনাহ, আমি কেমন পথ নিয়েছি বলুন ?

চমৎকার—এবং পুরস্কারও তোমার প্রাপ্য—এই তার পুরস্কার—

টাইবর খাঁ কিছু বুঝবার আগেই চকিতে কক্ষের প্রদীপালোকে সম্রাটের কোষ-মুক্ত তরবারি যেন ঝলসে উঠল এবং টাইবরকে দ্বিখণ্ডিত করে ফেলল। রক্তে মেঝে ভেসে গেল।

টাইবর খাঁর সেই পত্র রাঠোর শিবিরে যখন গিয়ে পৌঁছাল সে আর এক ইতিহাস। রাজোয়ারার ইতিবৃত্তের অন্য এক পৃষ্ঠা। নতুন এক কাহিনী। এ কাহিনীর এইখানেই শেষ।

তৃতীয় পর্ব : সম্রাটের চক্রান্ত

॥ ১ ॥

রাঠোর সর্দাররা দুর্গাদাসের মতে মত দিয়ে শাহজাদা আকবরের সঙ্গে হাতে হাত মিলালেও মনে মনে কিন্তু তারা আদৌ স্বস্তি বোধ করছিল না। মনের মধ্যে তাদের সর্বক্ষণই একটা দ্বিধা। যবনের শঠতা ও নীচতার জন্য রাজপুতেরা কিছুতেই যেন মন থেকে তাদের বিশ্বাস করতে পারত না।

বিশেষ করে শঠ ও নীচ ঔরংজীবেরই পুত্র ঐ আকবর। আকবরের দেহে ঐ ঔরংজীবেরই রক্ত।

দুর্গাদাস যা তাদের বুঝিয়েছিলেন—হয়ত বাপের মত পুত্র আকবর ততটা খারাপ নয়—তথাপি আকবর মানুষটা বিলাসপ্রিয়—এবং অত্যন্ত দুর্বল চরিত্রের। সর্বদাই সে নর্তকী ও সুরা নিয়ে আনন্দে ডুবে আছে। রাজ্য পরিচালনা বা যুদ্ধ চালনা কোনটাই তার ধাতে সয় না। আর প্রকৃতপক্ষে দেখাও গেল তাই।

রাঠোর বীরদের সঙ্গে সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হবার সঙ্গে সঙ্গে সে তার সমস্ত কর্তব্য-দায়িত্ব ও পদমর্যাদা যেন ভুলে গেল।

নর্তকী ও সুরা নিয়ে মত্ত হয়ে পড়ল। নাচো—গাও—পান কর আকণ্ঠভরে।

এবং নৃত্য গীত ও সুরায় মশগুল ভারতেশ্বর আকবর জানতেও পারল না কখন ইতিমধ্যে তার দক্ষিণ হস্ত—তার সেনাধ্যক্ষ টাইবর খাঁ গোপনে প্রাসাদ ত্যাগ করে চলে গিয়েছে।

রাঠোর সর্দাররাও জানতে পারেনি। বস্তুতঃ ব্যাপারটা তারা বুঝি স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি।

ওদিকে ধূর্ত ঔরংজীব টাইবর খাঁকে হত্যা করে নিশ্চুপ বসে ছিল না। তার লিখিত পত্রখানি এক দ্রুতগামী অশ্বারোহী দূতের হাতে রাঠোর শিবিরে প্রেরণ করেছিল।

রাঠোর বীররা মৃত্যুপণে তাদের নবঅভিষিক্ত ভারতেশ্বর আকবরের স্বার্থরক্ষার জন্য তখন সকলে একত্রে মিলিত হয়ে শয়তান ঔরংজীবকে ধ্বংস করবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে তারা আজমীঢ়ের দিকে বিশাল সৈন্যবাহিনী নিয়ে ধীরে ধীরে অগ্রসর হচ্ছে। ঠিক সেই সময় এক রাত্রে—

চম্পাবৎ ও কুম্পাবৎ ও লাক্ষাবৎ, কর্নাট ও দুঙ্গারোৎ, মৈরতীয় ও বীর-সৈংহোট, উদাবৎ ও বীদাবাৎ সব রাঠোর সর্দাররা একত্র হয়েছে।

আজমীঢ় আর মাত্র একদিনের পথ। আজই রাত্রির দ্বিতীয় যামে রওনা হয়ে সকলে আশা করছে আগামীকাল দ্বিপ্রহরের পূর্বেই আজমীঢ় প্রান্তে পেঁছাবে —ঠিক এমনি সময়—

ধূর্ত ঔরংজীবের অশ্বারোহী সংবাদবাহী টাইবর খাঁর পত্রখানি নিয়ে দুর্গা-

দাসের সামনে এসে হাত তুলে সসম্ভ্রমে কুর্নিশ করল।

তুমি আজমীঢ় থেকে এসেছো?

হ্যাঁ সর্দার—

কি চাও?

আজ্ঞে আমি কিছু চাই না—একখানি পত্র শুধু নিয়ে এসেছি।

কার পত্র?

খাঁ সাহেবের।

কে খাঁ সাহেব?

সেনাধ্যক্ষ টাইবর খাঁ—

সঙ্গে সঙ্গে দুর্গাদাস চমকে ওঠে। বলে, কি—কি বললে?

বললাম তো—সেনাধ্যক্ষ টাইবর খাঁ।

তুমি সম্রাটের কাছ থেকে আসোনি?

তিনিই পাঠিয়েছেন খাঁ সাহেবের পত্রখানি দিয়ে।

দেখি কি পত্র?

সংবাদবাহী তখন জোব্বার পকেট থেকে একটা ভাঁজকরা পত্র বের করে দিল—

পত্রের সারমর্ম হচ্ছে :

রাঠোর সর্দারগণ—

শাহজাদা আকবরের সহিত আপনাদিগের সন্ধিবন্ধনের আমি গ্রন্থিস্বরূপ ছিলাম, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ যে বাঁধ জলরাশিকে পৃথক করিয়া রাখিয়াছিল, তাহা ভাঙিয়া পড়িয়াছে। আপনারা ঘুণাক্ষরেও জানিতে পারেন নাই যে আকবরের জন্য আপনারা আজ একত্রে মিলিত হইয়া এতবড় সংকল্প লইয়াছেন সেই আকবর আপনাদের সহিত প্রতারণা করিয়াছে। গোপনে সে তার পিতা সম্রাট ঔরংজীবের সহিত মিলিত হইয়াছে—আর সেই সংবাদ পাওয়ার পর লজ্জায় ও অনুতাপে মর্মাহত আমি আপনাদের সামনে আর না দাঁড়াইতে পারিয়া গোপনে পলাইয়া আসিয়াছিলাম এখানে যদি কোন ব্যবস্থা করিতে পারি। কিন্তু সম্রাট কি আর আমাকে বিশ্বাস করিবেন—

ইত্যাদি।

পত্রখানি পাঠ করে দুর্গাদাসের মাথা ঘুরতে থাকে।

সংবাদবাহীকে বিদায় দিয়ে তক্ষুনি দুর্গাদাস অন্যান্য সর্দারেদের শিবিরের মধ্যে ডেকে পাঠাল।

জরুরী পরামর্শ আছে—সকলে অবিলম্বে আসুন।

সকলেই এসে দুর্গাদাসের শিবিরে সমবেত হলো।

কি সংবাদ দুর্গাদাস?

অত্যন্ত দুঃসংবাদ বলেই মনে হচ্ছে—টাইবর খাঁ পলাতক—

সেকি!

হ্যাঁ—এবং এখন সে আজমীঢ়ে আরঙ্গের আশ্রয়ে—

টাইবর বিশ্বাসঘাতক।

শুধু তাই নয় সর্দারগণ, টাইবর একখানি পত্র পাঠিয়েছে—পড়ছি—শুনুন—

দুর্গাদাস পত্রখানি সকলের সামনে পাঠ করে ধীরে ধীরে।

পত্র পাঠ শুনে মুহূর্তে সমস্ত সর্দাররা জ্বলে ওঠে ক্রোধে।

শঠ—বিশ্বাসঘাতক যবন—

একজন বলে, তখুনি আমি বলেছিলাম দুর্গাদাস আরঙ্গ-পুত্র ঐ শাহজাদাকে বিশ্বাস করো না—কিন্তু তুমি আমাদের তখন বোঝালে সে যবন ও ঔরংজীবের পুত্র হলেও সরল ও সম্পূর্ণ অন্য প্রকৃতির, কিন্তু এখন দেখলে তো সাপের বাচ্চা সাপই হয় আর সাপ তার ধর্ম কখনো ভোলে না।

দুর্গাদাস নির্বাক হয়ে থাকে।

সত্যিই তো সে আর কি বলবে—বলবার তার তো কিছুই আর নেই।

আকবর শেষ পর্যন্ত এমনি করবে—সত্যিই তো সে ভাবেনি।

অল্প দূরেই আকবরের বাসস্থান।

কক্ষে কক্ষে তার আলো জ্বলছে—বাতাসে ভেসে আসছে নূপুর ও সংগীতের ধ্বনি।

আকবর নিত্যকার মত সুরা ও নর্তকী নিয়ে প্রমোদে মত্ত।

রাগে দুঃখে লজ্জায় দুর্গাদাসের সর্বাঙ্গ যেন রী রী করে জ্বলতে থাকে।

একজন রাঠোর সর্দার বলে, আর এখনো ভাবছো কি দুর্গাদাস—শাহজাদা তলে তলে কতদূর অগ্রসর হয়েছে কিছুই আমরা জানি না—এতক্ষণ সম্রাটের বাহিনী কত কাছে এসে পড়লো কে জানে?

কি করতে চাও তোমরা—দুর্গাদাস প্রশ্ন করে।

একজন মৈরতীয় সর্দার বলে, সর্বাগ্রে এই মুহূর্তে ঐ বিশ্বাসঘাতক নীচ যবনকে হত্যা করবো, তারপর—

না, না ও সবের মধ্যে যেও না—কারণ আকবরকে এখনো যেন—সে অতটা নীচে নামতে পারে এ আমি ভাবতে পারছি না—কে জানে এও ঐ শয়তান ধূর্ত ঔরংজীবেরই নতুন কোন চাল কিনা।

তোমার এখনো দ্বিধা দুর্গাদাস—মৈরতীয় সর্দার বলে, বেশ তবে তুমি থাক, আমরা এই মুহূর্তে এস্থান ত্যাগ করে যাবো—কি বলো তোমরা?

সমস্ত সর্দাররা একসঙ্গে বলে ওঠে, নিশ্চয়ই—চল—

সেই রাত্রেই অর্ধঘন্টার মধ্যে রাঠোর সর্দাররা তাদের নিজ নিজ সৈন্যবাহিনী নিয়ে শাহজাদা আকবরকে পরিত্যাগ করে চলে গেল শিবির ছেড়ে নিঃশব্দে।

নৃত্য গীত ও সুরা পানে মত্ত আকবর হয়ত ব্যাপারটা জানতেও পারত না যদি না সে রাত্রে রম্ভা আকস্মিকভাবে রাঠোর শিবিরে এসে উপস্থিত হতো।

অর্বুদ পাহাড়ের চূড়ায় অবস্থিত মঠের মধ্যে লোকচক্ষুর অন্তরালে কুমার অজিত সিংহকে রেখেও মনে শান্তি পায় না। যদিচ সে জানে বীর রাঠোর সর্দার দুর্গাদাস দশ চক্ষু সর্বক্ষণ মেলে রেখেছে কুমারের দিকে তথাপি কেন যেন একটা ভয় সর্বক্ষণই তাকে চঞ্চল করে রাখে।

ধূর্ত এবং অতীব কূট ঐ যবনসম্রাট—একবার তার বিষনজর যার উপরে পড়ে তাকে সে সহজে নিষ্কৃতি দেয় না। এবং সে যখন জেনেছে মহারাজ যশোবন্তের বংশধর আজো জীবিত তখন অজিতকে খুঁজে বের না করা পর্যন্ত সে নিশ্চিন্ত হবে না। সর্বত্র সে তার গুপ্তচরদের প্রেরণ করবে।

এতদিন রাঠোর সর্দার দুর্গাদাস তার মাথার উপরে ছিল—এখন সে একা। যদিও অর্বুদ পাহাড়ের মঠ থেকে চলে আসবার সময় দুর্গাদাস রম্ভাকে আশ্বাস দিয়ে এসেছিল। বলে এসেছিল, কোন ভয় নেই ভগিনী—এস্থানের সংবাদ কেউ পাবে না—কারো পক্ষে পাওয়া দুরাশা মাত্র। তুমি নির্ভয়ে এখানে ওদের নিয়ে থাক। ওদিককার গোলমাল মিটবার সঙ্গে সঙ্গেই এখানে আবার আমি চলে আসবো—

রম্ভা দুর্গাদাসের আশ্বাসবাক্যে কতটুকু নির্ভরতা পেল তা সেই জানে, তবে মুখে কিছুই সে প্রকাশ করল না। চিরদিন স্বল্পভাষিণী রম্ভা নিঃশব্দে বিদায় দিতে নেমে এলো পর্বতের সানুদেশ পর্যন্ত তার সঙ্গে সঙ্গে।

দুর্গাদাস যখন অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করতে চলেছে তখন কেবল বলে, ভাই, মধ্যে মধ্যে সংবাদ দিও কিন্তু।

অবশ্যই দেবো। অতঃপর অশ্বপৃষ্ঠে লম্ফ দিয়ে আরোহণ করবার সঙ্গে সঙ্গে অন্ধকারে দ্রুতগামী অশ্ব দুর্গাদাসকে নিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল।

॥ ২ ॥

দিন কয়েক বাদেই সংবাদ এলো রাঠোর শিবির থেকে। যুদ্ধের খবরাখবর ছাড়াও তার মধ্যে আর একটি গুরুতর সংবাদ ছিল। যবন সম্রাট ঔরংজীব নাকি সমগ্র রাজস্থান জুড়ে হিন্দু প্রজাদের ওপরে জিজিয়া কর ঘোষণা করেছে।

সংবাদটা পেয়ে রম্ভা যেন একেবারে স্তম্ভিত হয়ে যায়। এবং যতই ব্যাপারটা ভাবে বা ভাববার চেষ্টা করে ততই যেন রুদ্ধ একটা নিরুপায় আক্রোশে বুকের ভিতরটা জ্বলতে থাকে। এবং সেই সময়ই অকস্মাৎ প্রভাবতীর কথা মনে পড়ে রম্ভার।

রূপনগর কুমারী প্রভাবতীর কথা, যে আজ মেবারের রাজমহিষী। রানা রাজসিংহের প্রিয়তমা মহিষী। প্রভাবতীর কাহিনী রম্ভার অজ্ঞাত ছিল না যদিচ রম্ভার কোনদিন ঐ অসামান্যা নারীকে চাক্ষুষ দেখবার সৌভাগ্য হয়নি।

প্রভাবতী আজ মেবারের রানার মহিষী হলেও সে মাড়বারেরই এক সামন্ত-কন্যা। রাঠোর কুলেই তার জন্ম। একদা মাড়বারের মাটিতেই সে জন্মেছে—খেলা করেছে বড় হয়েছে।

তার পিতৃভূমি মাড়বারের বুকে আজ বিপদের ঘন মেঘ আঁধার ছায়া ফেলেছে—প্রিয় জন্মভূমি শৈশবের—কৈশোরের যৌবনের লীলানিকেতন তার সেই মাড়বারের এতবড় বিপদের দিনে কি নিশ্চুপ হয়ে থাকতে পারে? নিশ্চেষ্ট হয়ে হাত গুটিয়ে থাকতে পারে?

নিশ্চয়ই সে পারবে না। কোনমতে তাকে এই বিপদের কথা জানাতে হবে। তার স্বামী যদি আজ তার সৈন্যবল নিয়ে—সমগ্র মেবারের শক্তি নিয়ে পর্যুদস্ত মাড়বারের পাশে এসে দাঁড়ায় নিশ্চয়ই ঐ যবন সম্রাটকে হটে যেতে হবে। কিন্তু কেমন করে—কেমন করে জন্মভূমির দোহাই দিয়ে তার মনকে জাগিয়ে তোলা য়। এবং বিলম্ব করলে চলবে না—যত শীঘ্র সম্ভব সেটা তাকে করতে হবে। কিন্তু কেমন করে ?

অনেক চিন্তার পর রুম্ভা নিজেই উদয়পুরে যাওয়া স্থির করে। স্থির করে যেমন করেই হোক জগনিবাসে প্রবেশ করে সে রানী প্রভাবতীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করবে। দাসীর জিম্মায় শিশু দুটিকে রেখে সেই রাত্রেই রুম্ভা দ্রুতগামী অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করে অদৃশ্য হয়ে যায়।

দীর্ঘ পথ। অর্বুদ পাহাড় থেকে জগনিবাস দীর্ঘ পথ। দুই রাত্রি ও এক দিন ক্রমান্বয়ে অশ্ব ছুটিয়ে রুম্ভা মেবারের জগনিবাসে গিয়ে পেঁছায়।

প্রভাবতীর সঙ্গে কৌশলে জগনিবাসে সাক্ষাৎ করে সেই রাত্রেই রুম্ভা রাঠোর শিবিরের উদ্দেশে অশ্বচালনা করে। যেমন করেই হোক রাঠোর শিবিরে পেঁছে দুর্গাদাসের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে হবে।

কিন্তু সম্ভব হলো না রুম্ভার পক্ষে দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে রাঠোর শিবিরে পেঁছান। পথশ্রমে ক্লান্ত অশ্বটি তার পথিমধ্যে শেষ নিঃশ্বাস নিল।

ফিরে আসতে হলো নিরুপায় রুম্ভাকে পুনরায় অর্বুদ পাহাড়ের নিভৃত মঠে। এবং প্রত্যাবর্তনের পর কয়েক দিনের মধ্যেই রুম্ভা সংবাদ পেল—যবন সম্রাটকে পর্যুদস্ত ও নিশ্চিহ্ন করবার কঠোর প্রতিজ্ঞা নিয়ে মেবার মাড়বারের পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছে।

রাঠোর ও শিশোদীর পাশাপাশি দাড়িয়েছে।

নাদোলে প্রচন্ড যুদ্ধ হয়ে গিয়েছে। এবং সেই যুদ্ধে মেবারের রাজকুমার রাজসিংহের প্রাণাধিক পুত্র ভীমসিংহ মৃত্যুবরণ করেছে।

বীরবর ইন্দ্রভানেরও মৃত্যু হয়েছে। শোণিঙ্গা ও দুর্গাদাসের কোন সংবাদ নেই। রুম্ভা বিচলিত হয়ে পড়ে। নানা ভাবে শোণিঙ্গা ও দুর্গাদাসের সংবাদ নেবার চেষ্টা করে কিন্তু ব্যর্থকাম হয়।

তারপরই এলো একদিন বিস্ময়কর এক সংবাদ। রাঠোর বীর দুর্গাদাস যে কেবল জীবিতই আছে তাই নয়। সম্রাটপুত্র আকবরের সঙ্গে রাঠোরদের সন্ধি হয়েছে।

রাঠোররা আরঙ্গ-পুত্রকেই ভারতেশ্বর বলে সম্মান দিয়ে তাকে তার পিতার স্থলে নাকি অভিষিক্ত করেছে।

রুম্ভা এতদিনে যেন কুমার অজিতের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সত্যিই নিশ্চিন্ত হয়।

আর ভয় নেই। এবারে নিঃসন্দেহে যোধপুরের ভাবী অধীশ্বর কুমার অজিত আত্মপ্রকাশ করতে পারবে।

দিন এসেছে। আর আত্মগোপনের প্রয়োজন নেই।

হায় নারী—সে কেমন করে কল্পনা করবে রাজনীতির খেলা বড় বিচিত্র। মুহূর্তে মুহূর্তে তার পট পরিবর্তন হয়। রাজা ফকির হয়—ফকির বাদশা হয়।

রাজনীতির পটে রৌদ্র-মেঘের খেলা ক্ষণে ক্ষণে চলে। তাই রম্ভা জানতেও পারেনি ইতিমধ্যে আকবরের ভাগ্যে মেঘের সঞ্চার হয়েছে। ধূর্ত সম্রাটের চক্রান্তে আকবরের ভাগ্যসূর্য অকালেই অস্তমিত হয়েছে টাইবর খাঁর নির্বুদ্ধিতায়।

নিশ্চিন্ত হয়েই রম্ভা রাঠোর শিবিরে এসেছিল সে রাত্রে অতঃপর অজিত সিংহ সম্পর্কে দুর্গাদাস কি করবে সেটা জানতে।

সে জানতোও না, মাত্র ঘণ্টা দুই আগে রাঠোর শিবির একেবারে শূন্য হয়ে গিয়েছে। রাঠোররা নিঃশব্দে ঔরংজীবের চক্রান্তে টাইবর খাঁর পত্র পেয়ে আকবরকে পরিত্যাগ করে রাঠোর শিবির ত্যাগ করে চলে গিয়েছে। খাঁ খাঁ করছে রাঠোর শিবির।

হঠাৎ তার কানে এলো ঐ সময় নূপুরের নিক্বণ—সংগীতের ঝংকার—সারেঙ্গীর সুর। সেই শব্দ অনুসরণ করেই রম্ভা গিয়ে উপস্থিত হয়েছিল আকবরের প্রমোদশালায়। সর্বাঙ্গ একটা কালো ওড়নায় আবৃত—কেবল মুখখানি উন্মুক্ত।

সমস্ত প্রমোদ কক্ষটি জুড়ে বিশৃঙ্খলা। নেশাগ্রস্ত মানুষগুলোর কোন হুঁশই নেই যেন। প্রথমটার তাই বোধ করি কারোর নজরও পড়ে না।

রম্ভা কিন্তু কক্ষমধ্যে পা ফেলেই থমকে দাঁড়িয়েছিল। সর্বনাশ—এ সে কোথায় এসে পা দিল। এবং সে প্রস্তরমূর্তির মতই দাঁড়িয়ে যায়।

হঠাৎ আকবরের এক পারিষদের নজর পড়ে রম্ভার প্রতি। কক্ষের উজ্জ্বল আলোয় রম্ভার সুন্দর মুখখানি তার দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

কে—কে ওখানে—

সঙ্গে সঙ্গে সে উঠে দাঁড়ায় নেশায় টলতে টলতে।

কে গো ?

ইতিমধ্যে আকবরেরও রম্ভার প্রতি নজর পড়েছিল। শাহজাদাও প্রশ্ন করে, কে ?

রম্ভা ততক্ষণে পরিস্থিতি অনুযায়ী নিজেকে সংযত ও দৃঢ় করে নিয়েছে।

সে শান্ত কণ্ঠে বলে, আমি রম্ভা—

রম্ভা—আকবর পুনরায় প্রশ্ন করে—স্ত্রীলোক ?

পার্শ্বচর বলে, হাঁ, শাহেনশা—রম্ভা—সুন্দরী—

রম্ভা প্রত্যুত্তর দেয় এবং বলে, আমার যদি ভুল না হয়ে থাকে তাহলে নিশ্চয়ই আমি ভারতেশ্বরের সামনে !

কে তুমি ? আকবর সামনে এসে দাঁড়ায়।

ভারতেশ্বর, রম্ভার কুর্নিশ গ্রহণ করুন—রম্ভা শাহজাদা আকবরকে সেলাম জানায়।

আকবর বিস্ময়াভিভূত। একদৃষ্টে চেয়ে আছে তখনো রম্ভার অতুলনীয় মুখশ্রীর দিকে।

শাহেনশা—আমি রম্ভা—দুর্গাদাসের ভগিনী।

কে—সর্দার দুর্গাদাসের—

হ্যাঁ—তারই ভগিনী।

ও—তুমি ভুল করেছো রম্ভা, এ তো রাঠোর শিবির নয়।

জানি শাহেনশা—

অল্পদূরেই রাঠোরদের শিবির, তোমাকে কি সেখানে কাউকে দিয়ে পেঁাছে দেবো রম্ভা ?

না জাঁহাপনা, তার কোন প্রয়োজন নেই। আমি সেখান থেকেই আসছি।

দুর্গাদাস—

কেবল দুর্গাদাস কেন, কোন রাঠোর বা রাজপুতকেই শিবিরে দেখলাম না।

তার মানে—

জানি না জাঁহাপনা—শিবির জনহীন শূন্য—একটি প্রাণীও সেখানে নেই।

সে কি—কি বলছো তুমি রম্ভা ?

আকবরের সুরার নেশাতখন প্রায় কর্পূরের মত উবে যাবার উপক্রম হয়েছে।

আমি মিথ্যা বলছি না জাঁহাপনা, কাউকে দিয়ে আপনি সংবাদ নিন।

মীর্জা বেগ—

পাশের ঘরেই আকবরের প্রধান দেহরক্ষী মীর্জা বেগ ছিল—আকবরের ডাকে সঙ্গে সঙ্গে কক্ষমধ্যে প্রবেশ করে কুর্নিশ জানায়।

আলমপনাহ—

বিরাট দশাসই চেহারা মীর্জা বেগের। দেখে এসো তো রাঠোর শিবির শূন্য কিনা।

সঙ্গে সঙ্গে সে পুনরায় কুর্নিশ জানিয়ে সংবাদ আনবার জন্য কক্ষ ত্যাগ করে। এবং মীর্জা বেগের সংবাদ নিয়ে আসতে দেরি হয় না।

মিনিট দশেকের মধ্যেই মীর্জা বেগ প্রত্যাবর্তন করে।

কি মীর্জা বেগ ?

আলমপনাহ—মিথ্যা নয় সংবাদ—সত্যিই রাঠোর শিবির শূন্য।

মীর্জা বেগ—

আলমপনাহ—গোলামের গোস্তাকি মাপ হয়—আমার কথা একবর্ণও মিথ্যা নয়—সত্যি তারা শিবির ত্যাগ করেছে।

না না—এ যে অসম্ভব। হিন্দু রাজপুত—তারা এতবড় বিশ্বাসঘাতক হতে পারে না—বিশেষ করে দুর্গাদাস।

বন্দেগী জাঁহাপনা—

কে ?

চকিতে ফিরে তাকায় আকবর। একজন মুসলমান—তার অধীনস্থ সৈন্যাধ্যক্ষ মেহেদী আলী খাঁ।

আলী খাঁ—

জাঁহাপনা—সংবাদটা সত্যিই মিথ্যা নয়—আমিও এই মাত্র সংবাদটা পেয়ে আপনাকে সংবাদটা দিতে এসেছি। সত্যিই রাঠোররা আমাদের পরিত্যাগ করে গিয়েছে।

মেহেদী আলী—

হ্যাঁ জাঁহাপনা—এবং জানতে পারলাম সম্রাট আপনার পিতার প্রেরিত পত্রখানি পেয়েই তারা আমাদের ত্যাগ করে গিয়েছে।

পিতার পত্র—

হ্যাঁ জাঁহাপনা—এই সেই পত্র—রাঠোর শিবিরে আমি কুড়িয়ে পেয়েছি—

পত্রখানি এগিয়ে দিল মেহেদী আলী আকবরের দিকে।

কম্পিত হাতে পত্রখানি দৃষ্টির সামনে ধরল আকবর এবং সঙ্গে সঙ্গে সেই পত্রের নীচে নামটা দেখে যেন ভূত দেখার মতই চমকে ওঠে।

একি—টাইবর খাঁ—

॥ ৩ ॥

মেহেদী আলী বলে, শাহেনশার অনুমান মিথ্যা নয়—সত্যিই বিশ্বাসঘাতক টাইবর খাঁ—

ততক্ষণে আকবর পত্রখানি বারবার দুইবার পড়ে শেষ করে ফেলেছে।

আশ্চর্য! এই পত্রখানি পেয়ে তারা আমাদের ত্যাগ করে গেল!

আমারও তাই মনে হচ্ছে জাঁহাপনা—মেহেদী আলী বলে।

কিন্তু—না, না—এ আমার বিশ্বাস হচ্ছে না। দুর্গাদাস একবার তো আমাকে সত্য মিথ্যা জিজ্ঞাসা করেও দেখতে পারত।

মেহেদী আলী বলে, প্রয়োজন মনে করেনি হয়ত।

ঐ সময় একজন সৈন্য এসে কক্ষে প্রবেশ করে আভূমি নত হয়ে সেলাম জানাল।

আলমপনাহ—অত্যন্ত দুঃসংবাদ—

কি হয়েছে সুলতান?

আমাদের সমস্ত সৈন্য শিবির ত্যাগ করে আজমীঢ়ের দিকে চলে যাচ্ছে—

সেকি—আলী খাঁ—

আলী খাঁ সঙ্গে সঙ্গে কক্ষ হতে নিষ্ক্রান্ত হয়ে যায়।

আলী খাঁ—শেষবারের মত যেন চীৎকার করে বলে আকবর, ওদের থামাও আলী খাঁ—যেমন করে পার থামাও—

কিন্তু আলী খাঁ ব্যর্থ হয়ে ফিরে এলো। মোঘল সৈন্যদের সে ফেরাতে পারেনি। তারা সবাই আকবরকে ছেড়ে চলে গিয়েছে। আজমীঢ়ের দিকে তারা ছুটেছে সম্রাটের বাহিনীর সঙ্গে যোগ দিতে।

আত্মীয় বন্ধু—পার্শ্বচর—দেহরক্ষী সৈন্যদের নিয়ে আকবরের ভরসা তখন

মাত্র শখানেক লোক। আর সকলেই চলে গিয়েছে তাকে ত্যাগ করে সম্রাটের রোষের ভয়ে।

ক্রমে কালরাত্রি অতিবাহিত হলো। ভোরের সূর্যালোকে চারিদিক স্পষ্ট হয়ে ওঠে। রম্ভা আর সেখানে থাকা যুক্তিযুক্ত মনে করেনি—সে অর্বুদ পাহাড়ের দিকে নিঃশব্দে একসময় প্রস্থান করেছে সকলের অজ্ঞাতে।

কিন্তু এখন কি হবে।

হতভাগ্য আকবর চারিদিকে অন্ধকার দেখে। নিজের হাত অনুশোচনায় যেন নিজেরই কামড়াতে ইচ্ছা করে। নেশায় মত্ত হয়ে থেকে এ সে কি করল। পিতাকে সে খুব ভাল করেই চেনে। তার এ বিদ্রোহ ঔরংজীব সহজে ক্ষমা করবে না। কাউকে সে কোনদিন ক্ষমা করেনি—বাপ—ভাই—বোন—কাউকে না। পুত্রকেও সে ক্ষমা করবে না।

তার নিজের স্বার্থের কাছে কোন স্বার্থই নয়। নিজের স্বার্থের জন্য সে যে কোন কাজ করতে পারে। পিতার হাতে সে ধরাও দিতে পারে না—তার কাছে ফিরেও যেতে পারে না।

তবে আকবর কি করবে?

মীর্জা বেগ—

জাঁহাপনা—

মীর্জা বেগ, এখন আমি কি করি?

মীর্জা বেগ সত্যিই প্রাণ দিয়ে ভালবাসত হতভাগ্য আকবরকে এবং দুনিয়ায় আকবরের যদি কেউ সত্যিকারের শুভানুধ্যায়ী মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী থাকে তো একমাত্র ঐ মীর্জা বেগই ছিল। এবং মীর্জা বেগ কতখানি আত্মত্যাগ করেছিল তার জীবনে আকবরের জন্য, তা জানতও না আকবর।

কিন্তু জানত একজন। মেহেরুন্নিসা। সে জানত—কেমন করে একদিন মীর্জা বেগ তার জীবনের সব চাইতে বড় ভালবাসা—সব চাইতে বড় আকাঙ্ক্ষার ধনটি হাসতে হাসতে আকবরের হাতে তুলে দিয়েছিল।

আগ্রা শহরের এক বর্ধিষ্ণু মুসলমান গৃহের মেয়ে মেহেরুন্নিসা। এবং তার সঙ্গে বালিকা বয়স থেকেই পরিচয় ছিল মীর্জা বেগের। সেই পরিচয় ক্রমশঃ নিবিড় ভালবাসায় পরিণত হয়েছিল। যদিচ কেউ কোনদিন পরস্পরের কাছে মনের কথাটা প্রকাশ করেনি। অবিশ্যি প্রকাশ না করলেও দুজনারই দুজনার মনের কথা জানতে বাকী ছিল না।

আগ্রায় গিয়েছিল শাহজাদা আকবর। আগ্রায় আকবরের সর্বাপেক্ষা প্রিয় স্থানটি ছিল তাজ। শীতের এক অপরাহ্ণে দোস্ত ও দেহরক্ষী মীর্জা বেগকে সঙ্গে নিয়ে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছিল তাজের সামনের উদ্যানে আকবর। সে সময় মানুষজন কেউই ছিল না সেখানে।

হঠাৎ উচ্ছ্বসিত এক হাসির লহরী কানে আসতেই আকবর ফিরে তাকায়। তাদের সামনে পর পর ফোয়ারাগুলি থেকে যেখানে ঝরঝর করে জল ঝরে পড়ছে চৌবাচ্চার মধ্যে। যেখানে অসংখ্য রক্ত ও শ্বেত পদ্ম ফুটে আছে সেই চৌবাচ্চার

সামনে, দুটি তরুণী চৌবাচ্চা থেকে হাতে করে জল নিয়ে পরস্পরের গায়ে ছিটিয়ে ছিটিয়ে দিচ্ছে আর আনন্দে হেসে উঠছে।

উন্মুক্ত বোরকা—কোন আবরণ নেই মুখে তরুণীদের। উচ্ছ্বসিত হাসির লহরী মীর্জা বেগের দৃষ্টিও আকর্ষণ করেছিল এবং সঙ্গে সঙ্গে সে ফিরে তাকিয়েই চমকে উঠেছিল।

সর্বনাশ—মেহের—মেহেরুন্নিসা।

মেহেরুন্নিসার চাচা তাজের প্রধান রক্ষী—কথাটা জানত মীর্জা বেগ। এবং সেই কারণেই মধ্যে মধ্যে মেহের তাজে আসতো। মেহেরের সঙ্গে মীর্জাও কতদিন এসেছে তাজে। কত আনন্দ মুহূর্ত তাদের এখানে কেটেছে। আজও হয়ত তেমনি এসেছে তার কোন সহেলীর সঙ্গে।

বিব্রত সংকুচিত মীর্জা ফিরে তাকাল শাহজাদার দিকে, কিন্তু শাহজাদা তখন নিষ্পলক তাকিয়ে আছে মেহেরের দিকে। শুধু নিষ্পলক সে দৃষ্টি নয়—মুগ্ধ সে দৃষ্টি।

মীর্জাও কি বলবে অতঃপর ভেবে পায় না। কিন্তু ইতিমধ্যে মেহেরের সহেলীর দৃষ্টি পড়ে গিয়েছিল অকস্মাৎ শাহজাদা ও মীর্জার ওপরে।

সে ফিসফিস করে মেহেরকে কি বলতেই দুজনে মুখের ওপরে বোরকা টেনে দিয়ে ছুটে পালায় পরমুহূর্তেই।

শাহজাদা ফিরে তাকায় মীর্জার দিকে।

ওয়া ওয়া—দেখেছো মীর্জা— দিলরুবা—

হ্যাঁ শাহজাদা—মৃদু শান্ত কণ্ঠে জবাব দেয় মীর্জা আলী বেগ।

আলী—

জনাব—

যেমন করে হোক যাও, এখুনি ঐ খাপসুরত মেয়েটির পরিচয়—কার মেয়ে কি বৃত্তান্ত—কোথায় থাকে জেনে আসতে হবে—

মীর্জা কিন্তু নড়ে না।

শাহজাদা অসহিষ্ণু হয়ে ওঠে। বলে, কই যাও—গেলে না?

প্রয়োজন নেই জনাব।

প্রয়োজন নেই মানে—কি বলছো তুমি!

আমি জানি ওকে।

কে? কে ও—কি ওর পরিচয়?

আপনাদের তাজের প্রধান রক্ষী নুরউল্লার ভাইয়ের মেয়ে—

বল কি—কুঁড়ে ঘরে বসরাই গোলাপ—

সব তো খোদাতালার মর্জি জনাব—তাঁর মর্জিতে এ দুনিয়ায় কি না হয়?

থাক থাক—খোদাতালার কথা থাক। ওর সাদী হয়েছে কি না জান?

জানি—হয়নি।

মাসেল্লা—

কিন্তু জনাব—কি বুঝি বলবার চেষ্টা করে মীর্জা আলী।

কিন্তু শাহজাদা আকবার তার আগেই বলে ওঠে, শোন আলী, ওকে আমার চাই-ই—

জনাব—

হ্যাঁ—নচেৎ আমি বাঁচবো না। যেমন করে যে ভাবে হোক আজই আগ্রা দুর্গে ওকে তোমায় আনতে হবে।

আজই!

হ্যাঁ আজই—বিলম্ব আমার সইবে না। ও চলে গেল, মনে হচ্ছে দুনিয়ার সমস্ত রোশনাই যেন আমার চোখের ওপর থেকে নিভে গেল—আমি ওর প্রেমে দেওয়ানা হয়ে গিয়েছি—যাও যাও, আর বিলম্ব করো না। আমি চললাম দুর্গে—অপেক্ষা করে থাকবো—

একপ্রকার জোর করেই যেন পাঠিয়ে দিয়েছিল ঐ মুহূর্তে শাহজাদা মীর্জা বেগকে মেহেরুন্নিসার সন্ধানে।

শ্লথ পায়ে হেঁটে চলে মীর্জা বেগ নূরউল্লার গৃহের দিকে।

তাজের প্রধান যে দরোয়াজা—চত্বর পার হয়ে তারই বামদিক দিয়ে সরু একটা রাস্তা পশ্চিমে চলে গিয়েছে—সেখানেই নূরউল্লার গৃহ।

তখন অত্যাসন্ন সন্ধ্যার আবছা আলোয় চারদিক ক্রমশঃ ঝাপসা হয়ে আসছে। তাজ বাজারের বিপণিতে বিপণিতে চিরাগ বাতি সব এক এক করে জ্বলে উঠছে।

নূরউল্লার গৃহদ্বারের সামনে এসে একসময় দাঁড়াল মীর্জা বেগ।

দুয়ার ভেতর থেকে বন্ধ। অনেকক্ষণ স্থাণুর মত দাঁড়িয়ে থেকে একসময় ধীরে ধীরে বন্ধ দুয়ারে করাঘাত করল মীর্জা বেগ। বার দুই করাঘাত করবার পর ভিতর হতে নারীকণ্ঠে প্রশ্ন এলো, কে?

॥ ৪ ॥

মীর্জা বেগ আবার দ্বারে করাঘাত করে। দরজাটা খুলে গেল। এক বৃদ্ধা এসে দরজাটা খুলে দিল। নূরউল্লার জননী ঐ বৃদ্ধা। হাতে বৃদ্ধার একটা আলো।

কে গা?

দাদী আমি—মীর্জা—

মীর্জা

হ্যাঁ দাদী।

এসো—এসো ভাই—বাইরে দাঁড়িয়ে কেন। উঃ, কি জাড়টাই না পড়েছে।

মীর্জা এসে ভিতরে প্রবেশ করল। খানচারেক মাঝারি গোছের কামরা নিয়ে ছোট একখানি বাসগৃহ নূরউল্লার।

অবিশ্যি সংসারে প্রাণীও চারজন মাত্র। নূরউল্লা বিয়ে-থা করেনি। সাধু প্রকৃতির মানুষ। বয়েস যদিচ ষাটের উর্ধ্বে নয়। বৃদ্ধা জননী। আর একটি ভ্রাতুষ্পুত্র—মোবারক—বয়েস ২০।২২, আর ভ্রাতুষ্পুত্রী মেহেরুন্নিসা।

মেহেরের বয়স ষোল কি সতের।

মোবারক একেবারে বওয়াটে হয়ে গিয়েছে—কোন কাজকর্ম করে না। আড্ডা দিয়ে জুয়ো খেলে হৈ হৈ করে দলবল নিয়ে শহরের সর্বত্র ঘুরে বেড়ায়। ষন্ডাগন্ডা চেহারা যেমন, প্রকৃতিও তেমন—কথায় কথায় ছুরি চালায়।

মেহের কিন্তু একেবারে স্বভাবে ও চেহারায় সম্পূর্ণ বিপরীত তার ভাইজান থেকে।

রোগা ছিপছিপে গঠন। মুখখানি একটু লম্বাটে হলেও অপরূপ সুষমা আর লাবণ্য মুখখানি জুড়ে যেন ঢলঢল করছে। টকটকে গৌর না হলেও বেশ গৌর গাত্রবর্ণ। যেমন হাসিখুশী তেমনি মধুর স্বভাব।

মীর্জা বেগ একসময় নুরউল্লাদের পাশের বাড়িতেই ছিল—এবং পড়শী হিসাবেই পরস্পরের মধ্যে পরিচয়ের সূত্রপাত।

বুড়ী চেঁচিয়ে ওঠে দরজাটা বন্ধ করতে করতে, ওরে ও মেহের—দেখ এসে কে এসেছে—বোস ভাই বোস—আমি তোমার জন্য একটু গরম দুধ নিয়ে আসি। বুড়ী পাকশালার দিকে চলে গেল। বয়েস হলেও বুড়ী এখনো বেশ শক্তসমর্থ। সংসারের সব কাজ সেই করে।

মেহেরুন্নিসা এসে ঘরে ঢোকে। দুজনে চোখাচোখি হয়।

ঘরের এক কোণে নিদারুণ ঠান্ডার জন্য একটা মাটির পাত্রে আগুন জ্বলছে গনগন করে—তারই রক্তাভা মাটির দেওয়ালে ছড়িয়ে পড়েছে অনেকটা। অন্য কোণে একটি আলো জ্বলছে।

কি ব্যাপার—পথ ভুলে নাকি?—মেহের মিটিমিটি হাসছে মীর্জার মুখের দিকে চেয়ে।

মীর্জা অপলককে চেয়ে থাকে মেহেরের লাবণ্যঢলঢল মুখখানির দিকে।

মেহের আবার বলে, অমন বোকার মত হাঁ করে আমার মুখের দিকে চেয়ে কি দেখছো?

মীর্জা চুপ। আজ তার ঐ মানসী প্রিয়াকে শাহজাদার হাতে তুলে দিতে হবে।

আকবরের দৃষ্টি যখন একবার ওর ওপর পড়েছে, ওকে করায়ত্ত না করা পর্যন্ত আকবর নিশ্চিন্ত হবে না। নিবৃত্ত হবে না। আর আকবরের হাতে তুলে তাকে দিতে হবে নিজের হাতে।

কি হলো—একেবারে শব্দই যে বেরুচ্ছে না মানুষটার গলা থেকে। বোবা হয়ে গেলে নাকি—মেহের পরিহাসতরল কণ্ঠে আবার শুধায়।

মেহের—

যাক্—তাহলে বোবা এখনো হয়ে যাওনি—জান আজ একটা ভারী মজা হয়েছে।

মজা?

হ্যাঁ—তাজে গিয়ে চৌবাচ্চার জল নিয়ে খেলা করছিলাম তখন হঠাৎ কাকে দেখেছি জান?

কাকে—

বল তো কে?

কেমন করে বলব ?

স্বয়ং শাহজাদা আকবরকে—বাবাঃ এখনো ভয়ে বুকের মধ্যে ঢিপঢিপ করছে—এমন ভাবে আমাদের দিকে চেয়ে ছিল, না, মনে হচ্ছিল যেন গিলে খেয়ে ফেলবে। পুরুষগুলো মেয়েমানুষের দিকে এমনভাবে চেয়ে থাকে, না, দেখে যেন মনে হয় জীবনে কখনো বুঝি মেয়েমানুষ দেখেনি—কিন্তু তোমার কি হয়েছে বল তো। অমন একেবারে চুপচাপ কেন !

মেহের—

কী ?

তুমি একবার বলেছিলে না—

কি বলেছিলাম ?

আগ্রার দুর্গের মধ্যে ঢুকে দেখতে চাও—যাবে সেখানে ?

যাবো—নিয়ে যাবে তুমি ?

আমি না নিয়ে গেলে আর কে নিয়ে যাবে ?

সত্যি বলছো ?

সত্যি বলছি বৈকি।

কবে নিয়ে যাবে ?

যদি বলি, আজই রাত্রে—

আজই রাত্রে ?

হঁ্যা—যাবে ?

যাবো।

যাবে ?

নিশ্চয়ই

ভয় করবে না তো ?

বাঃ, তোমার সঙ্গে আবার ভয় কি।

তবে ঠিক আছে—আজ রাত্রেই তোমাকে আমি নিয়ে যাবো। তুমি জেগে থেকো—মাঝরাত্রে আমি আসবো, দরজায় তিনটে টোকা দেবো—মনে থাকে যেন।

বেশ—

তবে আমি এখন আসি।

মীর্জা আলী আর দাঁড়াল না।

আর দাঁড়াতে মেহেরুন্নিসার মুখোমুখি যেন পারছিল না সে।

দ্রুত তাই ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

মেহের যেন মীর্জার ব্যবহারে একটু অবাকই হয়। দীর্ঘ দিন পরে এসেছিল মীর্জা—কিন্তু এসে ভাল করে কথা বললো না—বসলো না পর্যন্ত—এসে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই চলে গেল।

দাদী পাত্রে গরম দুধ নিয়ে ঘরে প্রবেশ করে।

এক হাতে গরম দুধের পাত্র, অন্য হাতে কিছু মিঠাই পাত্রে।

ভাই—

দাদী ভাল করে আজকাল চোখে দেখে না।

মীর্জা যে ঘরের ভিতর নেই সেটা প্রথমে তার নজরে পড়ে না।

অগ্নিকুণ্ডের আগুন ঝিমিয়ে এসেছিল, মেহের কিছু শুকনো লকড়ি অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে গুঁজে দিচ্ছিল।

দাদীর কণ্ঠস্বরে সে ফিরে তাকাল, ও তো নেই দাদী।

নেই।

না।

চলে গেল?

হ্যাঁ।

আমি যে দুধ আনছি বলে গেলাম।

হুঁ্যা—ও এখন তোমার গরম দুধ খাবে। তুমিও যেমন—

দুধ খাবে না। তা খাবে কেন। বেশ ঘন মহিষের দুধ গরম করে এনেছিলাম—মরুকগে—ঐজন্যই তো আজকালকার ছেলেমেয়েগুলো নিত্য অসুখে ভোগে। দুবলা—রুগ্ণ—বকর বকর করতে করতে দাদী দুধের ও মিষ্টান্নের পাত্র নিয়ে অন্দরে চলে যায়।

অগ্নিকুণ্ডে লকড়ি ঠেলে দিতে দিতে মৃদু হাসে মেহের আপনমনে। বাইরে প্রচণ্ড ঠাণ্ডা পড়েছে। হাড়জমানো ঠাণ্ডা। আগুনের তাপে দেহ গরম করতে করতে প্রজ্বলিত আগুনের ছোট ছোট শিখাগুলোর দিকে চেয়ে থাকে মেহের। হঠাৎ শাহজাদার মুখখানা—তার চোখের দৃষ্টিটা মনে পড়ে যায়।

শাহজাদা আকবরকে আগেও একবার দেখেছে মেহের। মীনাবাজারে।

এক রাত্রে দোকানে দোকানে সওদা করে ফিরছিল শাহজাদা। সে একটা বিশেষ পরবের দিন ছিল। বিশেষ বিশেষ পরবের দিনে আজও রাত্রে মীনাবাজারে দোকানপাঠ খরিদ্দার ও বেচাকেনায় গমগম করে ওঠে।

এখন তো অনেকেই—অনেক ওমরাহ ও বনেদী ধনী ক্রেতা আগ্রা শহরের মীনাবাজারে সওদা করতে আসে।

কিন্তু দাদীর মুখে শুনেছে মেহের, একদিন নাকি একমাত্র বাদশাহ ব্যতীত অন্য কোন পুরুষ ক্রেতারই মীনাবাজারে প্রবেশের অধিকার ছিল না। সতর্ক খোজা প্রহরীরা দ্বারে প্রহরারত থাকত।

আর বিক্রেতাও ছিল সব নারীর দল। আগ্রা নগরীর নারীরা সব দোকান সাজিয়ে বসত বিচিত্র দ্রব্যসম্ভার নিয়ে—সম্রাট বাদশাহ, একমাত্র ক্রেতা, ঘুরে ঘুরে সব বাজার করতেন।

॥ ৫ ॥

সাজাহান বাদশা—রসিক পুরুষ ছিলেন।

ঐ দাদী আজ বুড়ী হয়ে গিয়েছে। লোলচর্ম—চোখে ভাল দেখতে পায় না। কিন্তু একদিন ঐ বুড়ীই ছিল ষোল বছরের অপরূপ এক তরুণী।

মীনাবাজারে সওদা করতে এসে বাদশা মুগ্ধ হয়েছিলেন লায়লীর রূপে। দাদীর নামই যে ছিল লায়লী। তারপর এসেছিল একরাত্রে আগ্রা দুর্গ থেকে ষণ্ডা চার কাহার বাহিত ডুলি লায়লীর কাছে বাদশাহের আমন্ত্রণ নিয়ে।

কৌতুকে শুধিয়েছিল দাদীকে গল্প শুনতে শুনতে মেহের, বল কি দাদী—বাদশার আমন্ত্রণ।

নয়ত কি—

তা কি করলে?

কি আবার করবো। গেলাম।

গিয়েছিলে?

তা যাবো না—এমন সুযোগ কেউ ছাড়ে।

ভয় করলো না?

কেন, ভয় করবে কেন?

বাঃ বাদশা—

তা সেও তো মানুষ।

তারপর কি করলে?

আগ্রা দুর্গের সে এক রাত্রির স্বপ্নভরা কাহিনী। দাদী শুধু ইঙ্গিতটুকু দিয়েছিল দুর্গের ঐশ্বর্য ও চাকচিক্য বর্ণনা করে—তার চাইতে বেশী কিছু বলেনি।

তাতে করেই যে একটা উগ্র কৌতূহল মেহেরুন্নিসার তরুণী মনের মধ্যে রঙিন স্বপ্নের মত দানা বেঁধে উঠেছিল তাতেই সে মীর্জা বেগকে শুধিয়েছিল, আচ্ছা মীর্জা—

কী—

আগ্রা দুর্গের ভিতরটা কেমন?

কেন হঠাৎ ও কথা?

তুমি তো দেখেছো—কত সময় সেখানে যাও—শাহজাদার বিশ্বস্ত পার্শ্বচর—দেহরক্ষী তুমি—বল না কেমন ভিতরটা—

মীর্জা বলেছিল, ও কথা থাক মেহের—

কেন?

ওর সমস্ত ঐশ্বর্য ও বিরাটত্বের চাকচিক্যের মধ্যে সর্বক্ষণ একটা করুণ কান্নার অভিশাপ লুকিয়ে আছে।

কি বলছো?

সত্যিই তাই।

কোথায় আমি ভেবেছিলাম একদিন যদি দুর্গের ভিতরে যেতে পারি—

না—ও কথা মনেও এনো না।

তা কেন বলবে তো।

যেন কোন দিন সে কথা বলতে না হয় আমাকে তোমায়—তোমাকেও না জানতে হয়।

সেদিনের সেই কথাটাই যেন অকস্মাৎ মনে পড়ে যায় আবার আগুনের সামনে বসে মেহেরুন্নিসার অন্যমনস্ক ভাবে।

ঐ সঙ্গে আবার মনে পড়ে মীর্জা বেগের কথাগুলো।

আজ রাত্রে সে আসবে বলে গেল। বলে গেল আজ রাত্রে তাকে সে আগ্রা দুর্গে নিয়ে যাবে। সত্যি সেদিন আগ্রা দুর্গে যাওয়ার কথায় দাদীকে সে ভয় করেছিল কি না জিজ্ঞাসা করেছিল, কিন্তু আজ তো কই তার একটুও ভয় করছে না। আর ভয় করবেই বা কেন—ভয়ের কিই বা আছে আগ্রার দুর্গের মধ্যে। বরং একটা অভূতপূর্ব রোমাঞ্চ শিহরণ সে মনের মধ্যে অনুভব করছে।

আপন স্বপ্নের মধ্যে তন্ময় হয়ে ছিল মেহেরুন্নিসা। সময় কতটা কোথা দিয়ে পার হয়ে গিয়েছে জানতেও পারেনি। হঠাৎ বন্ধ দরজার গায়ে শোনা গেল শব্দ। টুক—টুক—টুক। মৃদু করাঘাতের শব্দ।

নিশ্চয়ই মীর্জা এসেছে। তাড়াতাড়ি উঠে গিয়ে দরজাটা খুলে দেয় মেহের। তার ধারণা মিথ্যা নয়। সত্যিই তার মীর্জাই বটে। মীর্জা—সত্যি তুমি এসেছো?

মীর্জা আলি বেগ সে কথার জবাব না দিয়ে কেবল মৃদু কণ্ঠে বলে, তুমি প্রস্তুত হয়ে নাও—আমরা এখুনি যাবো—

একটু তুমি ভিতরে এসে বোসো—আমি এখুনি প্রস্তুত হয়ে নিচ্ছি।

না, আমি এখানেই দাঁড়াচ্ছি, তুমি এসো।

মীর্জা ভিতরে গেল না।

দরজা খোলাই রইল, মেহেরুন্নিসা অন্দরে অদৃশ্য হয়ে গেল। অল্পক্ষণের মধ্যেই সে প্রস্তুত হয়ে ফিরে এলো।

বাইরে শীতের রাত্রি যেন প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় স্তব্ধ মূর্ছিত হয়ে আছে। হিমশীতল নিঃসঙ্গ অন্ধকার। চোখের দৃষ্টি বুঝি অন্ধ হয়ে যাবে। অন্ধকারে দুজনা অগ্রসর হয়। এবং অল্পদূর এগিয়েই মীর্জা মেহেরকে থামতে নির্দেশ দেয়, দাঁড়াও মেহের—

যাবে না?

হ্যাঁ—সামনেই ডুলি আছে—ডুলিতে উঠে বোস তুমি।

সত্যিই অন্ধকারে আবছা আবছা একটা ডুলি ও চারজন ডুলিবাহককে দেখা গেল। আর তার পাশেই একটা ঘোড়া।

তুমি—তুমি যাবে না মীর্জা?

যাবো—তুমি ডুলিতে ওঠো—আমি ঘোড়ায় যাবো।

তখনো এতটুকু ভয় হয়নি মনের মধ্যে কোথাও মেহেরের। নিশ্চিন্তে এবং একটা শিহরণ অনুভব করতে করতেই মেহের সে রাত্রে ডুলির মধ্যে গিয়ে উঠে বসেছিল। ডুলিবাহকেরা ডুলি তুলে নিল। কিছুক্ষণ ডুলির মধ্যে বসে বসে মেহের অশ্বের খুরধ্বনি শুনেছিল তার পাশে পাশেই চলছে। তারপর আর একসময় শুনতে পায়নি। এবং দুর্গে প্রবেশ করেও আর মীর্জার দেখা পায়নি।

দেখা পেয়েছিল আলোঝলমল এক কক্ষে সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত এক ব্যক্তির। শাহজাদা আকবরের।

আর সেই মুহূর্তেই মেহেরের বুকের ভিতরে ধক করে উঠেছিল। থমকে সে দাঁড়িয়ে পড়েছিল। শাহজাদা আকবরকে চিনতে মেহেরের কষ্ট হয়নি।

শাহাজাদা মৃদু মৃদু হাসছিল ভীত শঙ্কিত ওর মুখের দিকে তাকিয়ে। ভীরু কপোতীর মতো।

এসো পিয়ারী—

না, না—মীর্জা—

মীর্জা তো এখানে নেই!

আমি তার কাছে যাবো।

সেকি—সে কি তোমায় কিছু জানায়নি? তার তো এখানে আসবার কথা নয় —একা তোমাকেই আমার এই ঘরে পৌঁছে দেবে বলেছিল।

ঐ ঘটনার দীর্ঘ নয় মাস পরে মেহেরুন্নিসার সঙ্গে মীর্জার দেখা হয়েছিল আগ্রায় নয়—দিল্লীর লাল কেল্লায়। তাও মীর্জা নিজে থাকতে আসেনি। মেহের তাকে ডেকে পাঠিয়েছিল।

মেহের তখন আকবরের অন্যতমা প্রিয় বেগম। শাহজাদা আকবর আগ্রায় মেহেরকে বিধিমতে সাদী করেছিল ঐ ঘটনার দশ দিন পরে এক রাত্রে এক মোল্লা ডেকে। অন্যথায় মেহেরকে পাওয়া শাহজাদার পক্ষে সম্ভবপর ছিল না।

দশ দিন দশ রাত অপেক্ষা করেছিল মেহের মীর্জার জন্য। কারণ কথাটা সে আদৌ বিশ্বাস করতে পারেনি। সে বিশ্বাস করতে পারেনি আলী শেষ পর্যন্ত তাকে অমনি করে আর একজনের হাতে বিলিয়ে দিতে পারে।

তা ছাড়া সে মীর্জার নিজের মুখ থেকেও একটা কথায় জবাব চেয়ে নেবে ভেবেছিল। কিন্তু মীর্জা সেদিন আসেনি। আকবরকে দিয়ে সংবাদ পাঠানো সত্বেও সে আসেনি সেদিন।…

মীর্জা এসে কক্ষের মধ্যে প্রবেশ করল। বাঁদী তাকে গোপন পথ দিয়ে কেল্লার মধ্যে নিয়ে এসেছিল গভীর নিশীথে।

এই যে মীর্জা আলী বেগ—চাপা ব্যঙ্গভরা কণ্ঠে আহ্বান জানায় মেহের।

মীর্জা নত হয়ে কুর্নিশ জানায়, বেগমসাহেবা আমায় স্মরণ করেছেন?

হ্যাঁ—কেমন আছো মীর্জা বেগ?

আপনার মেহেরবানি—

বাঁদী ঘরের মধ্যে ছিল না, মেহেরের ইঙ্গিতে ইতিপূর্বেই কক্ষ ত্যাগ করে চলে গিয়েছিল।

হঠাৎ মীর্জা কিছু বুঝবার আগেই পাগলের মত মেহের মীর্জার বুকের ওপর এসে ঝাঁপিয়ে পড়ে কান্নায় ভেঙে পড়ে, এ তুমি কেন করলে মীর্জা—এ তুমি কেন করলে—আমি তোমার কি করেছিলাম যে এতবড় প্রবঞ্চনা আমার সঙ্গে করলে।

ঘটনার আকস্মিকতায় মীর্জা প্রথমটায় এমন হকচকিয়ে গিয়েছিল যে কি করবে, কি বলবে বুঝে উঠতে পারে না। পাথরের মত অনড় হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে কয়েকটা মুহূর্ত। তারপর ধীরে ধীরে নিজেকে মেহেরের আলিঙ্গন থেকে মুক্ত করে নিয়ে শান্ত কণ্ঠে বলে, বেগমসাহেবা—ভুলে যাবেন না, ভারতের ভাবী অধীশ্বর শাহজাদা আকবরের বেগম আপনি। আমি আপনাদের সামান্য একজন ভৃত্য মাত্র—স্থির হোন, শান্ত হোন।

মেহেরুন্নিসা নিজেকে ধীরে ধীরে সংযত করে নেয়। অবরুদ্ধ অশ্রুকে শান্ত করে। ওড়না দিয়ে অশ্রুসিক্ত আঁখি মুছে নেয়।

বেগমসাহেবা, অনুমতি করুন বান্দা এবারে যাবে।

মীর্জা আলী—

বেগমসাহেবা—

কুর্নিশ করে মীর্জা আলী কক্ষ হতে নিষ্ক্রান্ত হয়ে যায়। বাঁদী কক্ষের বাইরেই তখনো দাঁড়িয়ে ছিল, সে মীর্জাকে সঙ্গে করে স্বল্পালোকিত অলিন্দ-পথে অগ্রসর হয়।

কিন্তু বেশী দূর অগ্রসর হতে পারে না তারা—অকস্মাৎ এক খোজা প্রহরী অন্ধকারের ভিতর থেকে সামনে এসে দাঁড়ায়। হাতে তার তীক্ষ্ন তরবারি।

দাঁড়ান।

কে?

চমকে মুখ তুলে তাকাল মীর্জা আলী বেগ।

চলুন আমার সঙ্গে—

কি জানি কেন মীর্জা আলী এতটুকু প্রতিবাদ করে না। নিঃশব্দে সঙ্গে সঙ্গেই প্রায় খোজা প্রহরীকে অনুসরণ করে। অন্য একটি সরু গর্ভপথে ঘুরে অনতিবিলম্বে খোজা প্রহরী মীর্জাকে একটি অত্যুজ্জ্বল কক্ষের মধ্যে নিয়ে এসে ঢোকে। ঘরে পা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সামনে দৃষ্টি পড়ে এবং থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে মীর্জা। সামনেই তার দাঁড়িয়ে শাহজাদা আকবর।

মীর্জা আলী বেগ—

মীর্জা মাথা নত করে কুর্নিশ জানাতেও যেন ভুলে যায় তার প্রভুকে।

মীর্জা আলী, আকবর বলে, আমি যদি এখন তোমাকে এই দুর্গের উদ্যানে মাটির নীচে পুঁতে ফেলার জন্য ঐ খোজা প্রহরীকে আদেশ দিই?

মীর্জা কোন সাড়া দেয় না। পূর্ববৎ মাথা নীচু করেই থাকে। এই আশঙ্কাই সে করছিল।

জাঁহাপনা—

বল তোমার কি বলবার আছে?

কিছুই আমার বলবার নেই জাঁহাপনা, আমি দোষী—যে শাস্তি আপনার অভিরুচি আমায় দিন, কেবল বেগমসাহেবাকে ক্ষমা করুন—বালিকা তিনি—সরলমতি—তাঁর কোন অপরাধ নেই—আমিই সেখানে গিয়েছিলাম।

মীর্জা—

হ্যাঁ, জাঁহাপনা—আমি তাঁর রূপে একসময় মুগ্ধ ছিলাম—

আর এখন ?

এখন তিনি আমার ভগ্নীর মত—তাছাড়া ভারতের ভাবী সম্রাটের বেগম তিনি।

কিন্তু আমি জানি দোষ তারই বেশী—বাঁদী.কুলসমকে সে-ই তোমার কাছে প্রেরণ করেছিল।

না, না জাঁহাপনা, মিথ্যা—সম্পূর্ণ মিথ্যা—বাঁদী মিথ্যা বলেছে—আমায় আপনি প্রাণদণ্ড দিন—কিন্তু তিনি নিষ্পাপ নির্দোষ।

তাই দেবো—তোমায় প্রাণদণ্ডই আমি দেবো মূর্খ—বলতে বলতে আকবর এগিয়ে এসে সহসা দুই বাহু প্রসারিত করে মীর্জা আলীকে নিজের বক্ষের ওপরে টেনে নিয়ে বলে ওঠে, না দোস্ত—মৃত্যুদণ্ড নয়—এই হচ্ছে তোমার দণ্ড—আজ হতে তুমি আমার দোস্ত—

জাঁহাপনা—

কিন্তু একথা তুমি আগে আমায় জানাওনি কেন—সে তোমায় ভালবাসত—তুমি তাকে ভালবাসতে—

জাঁহাপনা—ছিঃ ছিঃ ও কথা বলবেন না—আজ তিনি মহামান্যা বেগমসাহেবা—আমি তাঁকে হাজারো কুর্নিশ দিই—সেলাম জানাই—ও কথা তাঁর সম্পর্কে শোনাও আমার পাপ—বলতে বলতে মীর্জা আলী বেগের দু'চোখের কোলে জল ভরে ওঠে।

সেই দিন থেকে বিশ্বাসের সঙ্গে শ্রদ্ধা এবং স্নেহের সঙ্গে প্রীতি এসে মিলিত হয়। মীর্জা আলী বেগ শাহজাদার শুধু প্রধান দেহরক্ষীই নয়, সর্বাপেক্ষা বিশ্বস্ত সহচর ও বন্ধু হয়ে ওঠে।

যদিচ মীর্জা আলী পরম শ্রদ্ধার সঙ্গেই সে সম্পর্ককে বাঁচিয়ে এসেছে। প্রভু ভৃত্যের মধ্যে যে দূরত্ব স্বাভাবিক, তাকে কোন দিন অতিক্রম করবার চেষ্টা করে আকবরের স্নেহ ও বিশ্বাসকে ক্ষুণ্ণ হতে দেয়নি।

॥ ৬ ॥

মীর্জা বেগ, তুমিই বল এখন আমি কি করি ? আকবর বিব্রত বিহ্বল—পুনরায় প্রশ্ন করে ওর মুখের দিকে তাকাল।

আমার পরামর্শ যদি নেন জাঁহাপনা—

বল বল—থামলে কেন ?

এই সময় আপনার পিতা সম্রাটের কাছে ফিরে যাওয়া বা আত্মসমর্পণ করাটা বোধহয় যুক্তিসংগত হবে না।

তবে—

যেমন করে হোক রাঠোর সর্দারদের খুঁজে বের করে তাদের বুঝিয়ে বলতে হবে তারা ঐ কপটচারী টাইবরের পত্রকে ভুল বুঝেছে—আপনার যে এর মধ্যে

কোন হাত নেই—কোন অভিসন্ধি নেই, আপনার সে কথাটা তাদের যেমন করে হোক বুঝিয়ে দিতে হবে।

কিন্তু কেমন করে ?

আমি জানি তারা কোন্ দিকে গিয়েছে—শিবির তোলবার আদেশ দিন আপনি—এই মুহূর্তে আমরা এই স্থান ত্যাগ করবো। যেমন করে হোক তাদের আমরা ধরবোই। সেই আদেশই দিন জাঁহাপনা—

কে—মেহের—

মেহেরুন্নিসা ইতিমধ্যে গোলমাল শুনে প্রমোদকক্ষে এসে হাজির হয়েছিল।

হ্যাঁ জাঁহাপনা—মীর্জা বেগ ঠিকই বলেছে।

তুমিও তাই বলছো মেহের ?

হ্যাঁ জাঁহাপনা—এ ছাড়া আমাদের এই মুহূর্তে বাঁচবার আর দ্বিতীয় কোন পথ নেই সম্রাটের আক্রোশ থেকে, বুঝতে পারছি শুধু একা সম্রাটই নয় আপনার সেনাধ্যক্ষ বিশ্বাসঘাতক টাইবর খাঁও চক্রান্ত ষড়যন্ত্র করেছে।

বেশ, তবে তাই হোক। আকবর তখুনি শিবিরাধ্যক্ষকে শিবির তুলে মীর্জা আলীর নির্দেশ-মত যাত্রার আদেশ দিল।

দুই দিন দুই রাত্রি ক্রমান্বয়ে পথ চলে চলে আকবর তার দলবল নিয়ে আরাবল্লীর এক নিভৃত অরণ্যে এসে রাঠোর সর্দারদের নাগাল পেল। পর্যুদস্ত —পথশ্রমে ক্লান্ত আকবর একেবারে এসে দুর্গাদাসের সামনে হাত জোড় করে দাঁড়াল, সেখানে অন্যান্য সর্দাররাও উপস্থিত ছিল। এবং সর্দারদের কোন কথা বলবার অবকাশমাত্রও না দিয়ে বললে, আপনাদের হাতেই আমি ও আমার সর্বস্ব মান ইজ্জত তুলে দিলাম—এখন ইচ্ছা করলে আপনারা আমাকে বাঁচাতে পারেন—আর যদি না চান তো সম্রাটের হাতে আমায় তুলে দিতে পারেন, আপনাদের যেমন অভিরুচি তাই করুন—

রাঠোর কবি কর্ণিধন ঐখানে উপস্থিত ছিল। সে-ই বললে, শরণার্থীকে আশ্রয় দেওয়াই সনাতন হিন্দুধর্ম—রাজধর্ম।

সর্দাররা পরস্পর পরস্পরের মুখের দিকে তাকায়, কেউ কোন মতামত প্রকাশ করে না। কি করা এখন কর্তব্য ? শাহজাদাকে তারা আশ্রয় দেবে, না, দেবে না ? সর্দারদের মনের মধ্যে যে বেশ সংশয় ও দ্বিধা জাগছে বুঝতে পারে দুর্গাদাস।

কিন্তু দুর্গাদাসের নিজের মন সত্যিই বিচলিত হয়েছিল আকবরের মুখের দিকে চেয়ে। দুর্গাদাস আকবরকে বসতে বলে অন্যান্য সর্দারদের নিয়ে পাশের মন্ত্রণাকক্ষে গিয়ে প্রবেশ করে।

চম্পাবৎ, কুম্পাবৎ, পত্তাবৎ ও লাক্ষাবৎ, কর্নোট ও দুম্পারোৎ, মৈরতীয় বীরসিংহোট এবং উদাবৎ ও বীদাবৎ—সকল রাঠোর সর্দাররা অনেকক্ষণ ধ' নিজেদের মধ্যে আলাপ-আলোচনা করে শেষ পর্যন্ত দুর্গাদাসের মতেই মত দে'। আর একবার তারা শরণার্থী আকবরকে বিশ্বাস করে আশ্রয় দেবে। সাহায্য দেবে!

এবং সকলের পরামর্শানুসারে চম্পাবৎ সম্প্রদায়ের শিরোমণির কনিষ্ঠ ভ্রাতা জৈৎ সর্দারের উপর আকবর ও তার পরিবারবর্গের রক্ষণাবেক্ষণের ভার দেওয়া হলো।

রাঠোর সর্দাররা তাদের সৈন্যবাহিনী এবং আকবরের সৈন্যবাহিনী যারা ইতিমধ্যে আবার আকবরের কাছে ফিরে এসেছিল—এক মিলিত সৈন্যবাহিনী নিয়ে সম্রাটের দিকে এগিয়ে চললো দুর্গাদাসের নেতৃত্বে। লুনী নদীর দিকেই দুর্গাদাস অগ্রসর হলো।

ঔরংজীব প্রমাদ গণল। তার সমস্ত চাল ব্যর্থ হয়েছে সে বুঝতে পারে। ধূর্ত সম্রাট তখন অন্য মতলব করে। দলপ্রধান দুর্গাদাসকে বশীভূত ও করায়ত্ত করবার জন্য গোপনে এক চর মারফত একটা ঝাঁপিতে করে চল্লিশ হাজার সোনার মোহর পাঠিয়ে দিল ও সঙ্গে একটা চিঠি: দুর্গাদাস—যদি তুমি আকবরকে ত্যাগ কর তো আরো চল্লিশ হাজার সোনার মোহর তোমায় আমি দেবো।

দুর্গাদাস চরের সামনেই শাহজাদা আকবরকে ডেকে তার হাতে ঝাঁপি তুলে দিল—নিন ভারতেশ্বর—অধীনের প্রথম নজরানা।

একি—এত মোহর কোথা থেকে এলো—কোথা হতে পেলেন সর্দার এত সোনার মোহর।

সামান্য রাজপুত সর্দার আমি জাঁহাপনা—এ দৌলত আমি কোথায় পাবো—আপনার পিতা সম্রাট আমায় উৎকোচ পাঠিয়েছেন—যদি আপনাকে ত্যাগ করি তো আরো চল্লিশ হাজার দেবেন।

বলেন কি!

ঐ দূতকে জিজ্ঞাসা করুন।

আকবর মুগ্ধ বিস্মিত, প্রীত কৃতজ্ঞ। আকবর মোহর থেকে সামান্য নিজের জন্য তুলে নিয়ে বাদবাকী সব সর্দারদের মধ্যে ও সৈন্যদের মধ্যে বিলিয়ে দিল।

ঔরংজীব যখন দেখলো তার ঐ চালও ব্যর্থ হয়েছে, সে আর কালবিলম্ব না করে বিদ্রোহী পুত্রকে দমন করবার জন্য এক সৈন্যদল প্রেরণ করল।

সংবাদ পেয়ে দুর্বলচরিত্র আকবর ভীত হয়ে ওঠে। এবং আরো তার ভয় হলো—পিতার বিশাল সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে সহজে যোঝা যাবে না—সম্ভবও নয় তা—পরাজয় তার হবেই, আজ নয় কাল, এবং সেক্ষেত্রে সে চিরদিনের মতই রুষ্ট পিতার অনুগ্রহলাভ থেকে বঞ্চিত হবে। ভারতের সিংহাসনও হয়ত সুদূরপরাহত হবে। ভবিষ্যতের সমস্ত সুখস্বপ্ন নির্মূল হয়ে যাবে। তার চাইতে আত্মসমর্পণ করাই বোধহয় বুদ্ধিমানের কাজ। দুর্গাদাসের কাছে মনের বাসনা ব্যক্ত করল আকবর।

দুর্গাদাস নানাভাবে আকবরকে সান্ত্বনা দেয়—আশা দেয়। বলে, কোন ভয় নেই আপনার শাহজাদা, আপনার জীবন-মৃত্যুর জন্য আমি দায়ী রইলাম। আমাকে আগে বধ না করে কেউ আপনার গা স্পর্শও করতে পারবে না। শুধু

মুখের আশ্বাস নয়, জীবন পণ করে দুর্গাদাস।

জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শোণিঙ্গর ওপরে রাঠোর রাজকুমার অজিতের ভার ও দায়িত্ব দিয়ে তাকে অর্বুদ পাহাড়ের দিকে পাঠিয়ে দিয়ে নিজে এক সহস্র সুশিক্ষিত রাজপুত সৈন্য নিয়ে দাক্ষিণাভিমুখে অগ্রসর হলো।

সম্রাট তখন তার সৈন্যবাহিনী নিয়ে ঐদিকেই ছিল।

ধূর্ত ঔরংজীব দুর্গাদাসকে চারিদিক থেকে ঘিরে ফেলবার জন্য অন্য দিক থেকে তার সৈন্যবাহিনী নিয়ে দুর্গাদাসকে অনুসরণ করল এবং সত্যি সত্যিই দুর্গাদাসকে চারিদিক থেকে ঘিরে ফেলল।

দুর্গাদাসও সঙ্গে সঙ্গে তার শিবির ত্যাগ করে ঝালোরের দিকে চলে গেল। এবং কিছুটা পথ ঝালোরের দিকে গিয়ে দর্গাদাস গুর্জরকে দক্ষিণে এবং চম্পনকে বামে রেখে সোজা গিয়ে পেঁছিল একেবারে নর্মদা নদীর তীরে।

ঔরংজীব প্রথমটায় কিছুই জানতে পারেনি, দুর্গাদাস ঝালোরের দিকে গিয়েছে অনুমান করে সেখানে গিয়ে ব্যাপারটা জানতে পেরে আক্রোশে হতাশায় পরাজয়ের প্লানিতে নিজের হাত নিজেই কামড়াতে থাকে।

পুত্র আজিমকে ডেকে পাঠাল। আজিম তখন উদয়পুরের দিকে অভিযানের জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল।

আমাকে ডেকেছিলেন ?

হ্যাঁ আজিম। শোন, উদয়পুর এখন থাক—তুমি তোমার সমস্ত সৈন্যবাহিনী নিয়ে নর্মদার দিকে যাও—সমস্ত রাঠোরদের একেবারে ধ্বংস করে নিশ্চিহ্ন করে দেবে—তারপর তোমার ঐ উদ্ধত মূর্খ জ্যেষ্ঠকে শৃঙ্খলিত করে আমার কাছে নিয়ে আসবে। পারবে না ?

নিশ্চয়ই পারব—

তবে আর দেরি করো না, যাও।

আজিমকে নর্মদাতীরে প্রেরণ করেই ঔরংজীব নিশ্চিন্ত থাকে না—দশ দিনের মধ্যে সম্রাট যোধপুর ও আজমীঢ়ে সেনাদল রেখে নর্মদার দিকে অগ্রসর হলো। প্রথম যৌবনে একবার নর্মদার যুদ্ধে ভাগ্য স্থিরীকৃত হয়েছিল—আজ আবার সেই নর্মদাতীরেই যুদ্ধ। ভাগ্যদেবী এবারে কি লিখেছেন কপালে দেখা যাক।

প্রচণ্ড যুদ্ধ হলো দীর্ঘ দিন ধরে। সে এক ভয়াবহ পরিস্থিতি। সরধরের নয় সহস্র ও মেবারের দশ সহস্র নগর জনমানবহীন ভয়াবহ এক শ্মশানে পরিণত হলো। ঔরংজীবের সেনাধ্যক্ষ ইনায়েৎ খাঁ লুণ্ঠন ধর্ষণ ও অকথ্য অত্যাচার করতে করতে তার দশ সহস্র যবন সৈন্য নিয়ে যোধপুরে এসে ঢুকল।

আর রাঠোররা তখন মরুভূমির মধ্যে জড়ো হয়েছে রাঠোর বীর দুর্গাদাসের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শোণিঙ্গর নেতৃত্বে।

ক্রমশঃ রাজপুতেরা—কর্ণোট, ক্ষেমকর্ণ, যোধবংশীয় সুবল মাহিচা বিজয়মল, সুজোৎ জৈতমল, কর্ণোট কেশরী এবং যোধবংশীয় শিবদান ও ভীম—দুই ভাই অদের নিজের নিজের সৈন্য নিয়ে এসে একত্রে মিলে যোধপুরে এসে খাঁ সাহেবকে

দুর্গে অবরুদ্ধ করে ফেললো চারিদিক থেকে ঘিরে।

ঔরংজীব তখন আজমীঢ়ের চার ক্রোশ দূরে অবস্থান করছে।

॥ ৭ ॥

ইনায়েৎ খাঁ যে যোধপুরে অবরুদ্ধ ঔরংজীবের নিকট সে সংবাদ পেঁছাতে দেরি হয় না। বিরাট এক মোঘলবাহিনী যোধপুরের দিকে এগিয়ে এলো স্বয়ং ঔরংজীবের নেতৃত্বে।

প্রচণ্ড গ্রীষ্ম। সূর্যতাপে চারিদিক ঝলসে যাচ্ছে, মাড়বারের আকাশে কোথায়ও মেঘ নেই। সেই প্রচণ্ড গ্রীষ্মের মধ্যেই যোধপুরের দ্বারে দুই বাহিনী মোকাবিলার জন্য মুখোমুখি হলো।

দুই পক্ষে কয়েকদিন ধরে যে যুদ্ধ হলো তাতে অনেক মোঘল যেমন শেষ নিঃশ্বাস নিল, তেমনি দেশের স্বাধীনতাকে রক্ষা করতে গিয়ে বহু রাঠোর বীরও শেষ শয্যা নিল।

শোণিঙ্গর প্রচণ্ড বীর্যে ঔরংজীব না পারল এগুতে, না পারল পিছিয়ে যেতে আবার—বেচারীর তখন অবস্থা অনেকটা গন্ধমূষিককে আক্রমণ করার পর ভুজঙ্গের অবস্থা।

অবশেষে অনন্যোপায় ঔরংজীব সন্ধির প্রার্থনা জানাল শোণিঙ্গর কাছে।

সন্ধি।

ক্লান্ত পর্যুদস্ত রাঠোরদেরও সন্ধি করা ছাড়া বোধহয় উপায় ছিল না। মত দিল তারা সন্ধি করতে।

ঔরংজীব মহারাজ যশোবন্তের শেষ জীবিত বংশধর শিশু অজিত সিংহকে স্বীকার করে নিল, আজমীঢ় শোণিঙ্গাকে ফিরিয়ে দিল—এবং তাকেই আজমীঢ়ের শাসনকর্তা বলে ঘোষণা করে সন্ধিপত্রে স্বীয় পাঞ্জা এঁকে দিল।

সন্ধি হলো বটে কিন্তু বিদ্রোহী আকবরের ব্যাপারটার কোন ফয়সালা হলো না—কোন মীমাংসাই হলো না। এবং সন্ধি হওয়া সত্ত্বেও দর্গাদাস অজিতের বাসস্থানের ব্যাপারটা সযত্নে গোপনই রাখল, সম্রাটকে সে বিশ্বাস করতে পারেনি।

ঔরংজীবের প্রতিভূ হিসাবে আসুদ খাঁ আজমীঢ়ে থেকে গেল—শোণিঙ্গদেব মৈরতা নগরে—ঔরংজীব দাক্ষিণাবর্তের দিকে চলে গেল তার দলবল নিয়ে।

আকবর তখনো দুর্গাদাসের আশ্রয়ে দাক্ষিণাবর্তে।

মাস তিনেকও গেল না, হঠাৎ শোণিঙ্গদেবের আকস্মিক রহস্যজনক মৃত্যু-সংবাদ এলো ঔরংজীবের কানে। উৎফুল্ল হয়ে ওঠে সম্রাট সেই সংবাদ পেয়ে—তার সত্যিকারের এক শত্রু ঐ শোণিঙ্গদেব—সেই শত্রুর মৃত্যুসংবাদ সত্যিকারের আনন্দ সংবাদ বৈকি। ঔরংজীব এক মুহূর্তও আর দেরি করে না—শোণিঙ্গদেবের মৃত্যুসংবাদের সঙ্গে সঙ্গে সন্ধিপত্র সে নাকচ করে দিল। সন্ধিপত্র থেকে পাঞ্জা উঠিয়ে নিলো।

মৈরতার কর্তৃত্বভার পড়লো এবারে মৈরতীয় কল্যাণের পুত্র মুকুন্দ সিংহের

ওপরে। অতএব। আবার যুদ্ধ। এবং সে যুদ্ধে রাজপুতেরা পরাজিত হয়ে আবার আত্মগোপন করল। আজমীঢ়ে আস্‌সেদ খাঁ আর আজিম এবং যোধপুরে ইনায়েৎ খাঁ।

কুম্পাবৎ শম্ভু, বর্কাসি উদঙ্গ সিংহ এবং দুর্গাদাসের পুত্র তেজ সিংহ তাদের বাহিনী নিয়ে মাতৃভূমির উদ্ধারকল্পে আবার এগিয়ে এলো এবং তাদের সঙ্গে এসে হাত মিলাল দাক্ষিণাবর্ত থেকে এসে ফতে সিংহ ও রাম সিংহ।

কিন্তু এবারেও তাদের পরাজয় মানতে হলো—আবারও তারা আরাবল্লীর পর্বত কন্দরে কন্দরে বনমধ্যে আত্মগোপন করে প্রাণ বাঁচাতে বাধ্য হয়।

মধ্যে মধ্যে উভয় পক্ষের মধ্যে যুদ্ধ চলতে লাগল। কিন্তু রাজপুতেরা কিছুতেই মোঘলদের পরাজয় বা কোণঠাসা করতে পারে না। অনেক বীরের রক্তস্রোতে মাতৃভূমির তর্পণ—রাঠোররা সংকল্পে অটুট। ক্রমশঃ একের পর এক রাঠোর বীররা মাতৃভূমির মুক্তির জন্য প্রাণ দিতে লাগল। দলে তারা ক্ষীণ হয়ে আসতে লাগল।

দেখতে দেখতে আরো একটি বছর কালের বুকে মিলিয়ে গেল। কালচক্র অবিরাম ঘুরে চলে আপন চক্রপথে।

ইনায়েৎ খাঁ আজমীঢ়ের শাসনকর্তা। আজিম ও আস্‌সদ খাঁ দাক্ষিণাবর্তে সম্রাটের সঙ্গে গিয়ে মিলিত হয়।

বর্ষার কালো মেঘ আরাবল্লীর শীর্ষে শীর্ষে পুঞ্জীভূত হতে থাকে।

মাড়বারের সমস্ত নগর ও গ্রামই তখন বলতে গেলে মোঘলদের করায়ত্ত—রাঠোররা বনেজঙ্গলে মরুভূমিতে আশ্রয় নিয়েছে। সেখান থেকেই মধ্যে মধ্যে ঝড়ের মত আবির্ভূত হয়ে যুদ্ধ করে যায়।

যুদ্ধের বিরাম নেই। কিন্তু ঐভাবে ইতস্ততঃ ছড়িয়ে থেকে লাভ নেই—বরং হঠাৎ আক্রান্ত হলে তেমন করে প্রতিরোধ করার উপায় থাকবে না ভেবে রাঠোররা নিবিড় পর্বতের মধ্যে অবস্থিত মৈরাবাড়ে এসে জড়ো হলো।

এখানে তারা অনায়াসেই আত্মগোপন করে মধ্যে মধ্যে যুদ্ধ চালিয়ে মোঘলদের পর্যুদস্ত করতে লাগল। মোঘলদের করায়ত্ত নগর ও গ্রাম লুণ্ঠন করতে লাগল মধ্যে মধ্যে। সুন্দরনগর রাঠোররা অধিকার করে নিল।

আরো একটি বছর যুদ্ধ ও অশান্তির মধ্য দিয়ে রাঠোরদের অতিবাহিত হয়। তারপর আরো একটি বছর। এবং আরো একটি বছর। যুদ্ধ—রক্তক্ষয়—অশান্তি।

রাঠোররা যখন মৃত্যুপণে লড়ে চলেছে মাতৃভূমির মুক্তির জন্য মোঘলদের সঙ্গে, দিনে দিনে অর্বুদ পাহাড়ের মঠে নিভৃতে সকলের অজ্ঞাতে ও চোখের অলক্ষ্যে শশিকলার মত বেড়ে চলেছে মাড়বারের ভাবী অধীশ্বর কুমার অজিত সিংহ। আর তার পাশে পাশে সামান্য কয়েক মাসের ছোট বংশ-গোত্র-পরিচয়হীন ফুলের মত একটি মেয়ে।

সংযুক্তা। রম্ভার কন্যা সংযুক্তা।

দুর্গাদাসই রম্ভার কন্যার নাম দিয়েছিল সংযুক্তা। সত্যিই যেন এক স্তবক টাটকা ফুলের মত মেয়েটি। ঢলঢল নমনীয় মুখখানি—টানা টানা দুটি চঞ্চল হরিণচোখ। সংযুক্তা যেন অজিতের ছায়া।

এক মুহূর্ত কেউ কাউকে ছেড়ে থাকে না। দুজনে একত্রে থাকে—একত্রে খেলা করে, মারামারি করে—এই আড়ি এই ভাব। মেঘ ও রৌদ্রের খেলা যেন।

অজিতের যেমন বাড়ন্ত গড়ন বয়েসের তুলনায় তেমনি সংযুক্তারও দেহের গঠনটা যেন একটু বেশী। ছয় বছরের বালক-বালিকাকে দেখলে মনে হয় যেন তারা আট দশ বছরের। প্রকৃতির খোলা রৌদ্র ও বাতাসে তাদের দেহের বৃদ্ধিটা একটু বেশীই।

কুমার অজিতের গাত্রবর্ণ শ্যাম। কিন্তু সংযুক্তার যেন সোনার বরণ। কাঁচা সোনার মত রং।

মাঠের পাষাণ চত্বরে বসে এক চৈত্রের দ্বিপ্রহরে দুটি শিশু আপনমনে খেলা করছিল। রম্ভা মঠের একটি কক্ষে বসে জাঁতায় যব পিষছিল। দুটি শিশুর কলকাকলী থেকে থেকে তার কানে আসছিল।

জানিস, মা বলেছে একদিন আমি যখন মাড়বারের সিংহাসনে বসবো—

সংযুক্তা বলে, সত্যি—কবে বসবি রে?

অজিত জবাব দেয়, দাঁড়া না—যে সব মোঘলরা আমার দেশে জোর করে বসে আছে আগে তাদের তাড়াই।

যুদ্ধ করবি না?

হ্যাঁ—যুদ্ধ করবো।

খুব মজা হবে, না রে?

হ্যাঁ।

হঠাৎ ঐ সময় সংযুক্তার দূর পাহাড়ের পাদদেশে নজর পড়ায় চমকে ওঠে। বিরাট একটা কালো সাপ যেন এঁকেবেঁকে এগিয়ে আসছে ক্রমশঃ তাদের ঐ পাহাড়ের দিকে।

ভয়ার্ত কণ্ঠে সংযুক্তা ডাকে, অজিত—

কি রে?

ঐ দেখ—

কি?

দেখ না—ঐ যে দূরে কালো মত কি ওটা রে—এদিকেই আসছে—

প্রথমটায় অজিতও বুঝতে পারে না। চেয়ে চেয়ে বোঝাবার চেষ্টা করে—তারপরই বুঝতে পারে ব্যাপারটা।

বলে, মানুষ—অনেক, অনেক মানুষ—

এদিকেই আসছে।

হুঁ।

অত মানুষ এদিকে আসছে কেন রে?

নিশ্চয় মোঘল সৈন্য।

মোঘল সৈন্য—

হুঁ।

কি হবে ?

কি আবার হবে—বলতে বলতে পাশেই রাখা তীর ও ধনুক হাতে করে তুলে নেয় অজিত—যুদ্ধ করে সব শেষ করে দেবো—আসতে দেবো না।

আমি মাকে ডেকে নিয়ে আসি, দাঁড়া।

সংযুক্তা আর দেরি করে না। ছুটে চলে যায় মঠের ভিতরে, মা, মা—

সংযুক্তা ও অজিতের কথাগুলো রম্ভার কানে গিয়েছিল। সেও ইতিমধ্যে কৌতূহলের বশবর্তী হয়ে বাইরে এসে দাঁড়িয়েছিল।

মা মা—ঐ দেখো কত মানুষ এই দিকে আসছে—সংযুক্তা ছুটে এসে রম্ভার হাত চেপে ধরে।

রম্ভাও কম বিস্মিত হয়নি। সারিবদ্ধভাবে একটা মানুষের মিছিল সাপের মত এঁকেবেঁকে ঐ পাহাড়ের দিকেই আসছে সত্যি।

কিন্তু কারা ওরা ? তবে কি মোঘলরা তাদের গোপন বাসস্থানের কথা জানতে পেরে গিয়েছে কোনক্রমে।

সম্রাট ঔরংজীব তাই বিশাল সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করেছে কুমার অজিতকে ছিনিয়ে নিয়ে যাবার জন্য। অজ্ঞাত একটা ভয়ে রম্ভার বুকের ভিতরটা কাঁপতে থাকে। কি করবে রম্ভা এখন।

দুর্গাদাসও নেই—একা সে নারী আর এক বৃদ্ধা পরিচারিকা জানকী। সম্রাটের ঐ বিশাল সৈন্যবাহিনীকে সে রুখবে কেমন করে।

বালক অজিতের তখন কৌতূহলের যেন অন্ত নেই। সে এগিয়ে গিয়ে পাহাড়ের একধারে একটা বিরাট পাথরের উপরে উঠে দাঁড়িয়ে অগ্রগামী সেই মানুষগুলোকে ভাল করে দেখবার চেষ্টা করছে।

কম্পিত কণ্ঠে রম্ভা ডাকে, অজিত এদিকে চলে এসো শিগ্‌গিরী।

অজিত সে ডাকে কোন সাড়া দেয় না। শুনতেই যেন পায়নি সে ডাক। রম্ভা আবার ডাকে।

অজিত অজিত—এসো ওখান থেকে—

অজিত ঘাড় ফিরিয়ে এবারে জবাব দেয়, না—আমি ওদের সংগে যুদ্ধ করবো।

দুষ্টু ছেলে শিগ্‌গিরী এসো বলছি—

না—যুদ্ধ করবো আমি—

অজিতের কথা শেষ হয় না। দ্রুত অশ্বখুরধ্বনি শোনা যায় একটা—পাহাড়ী চড়াই সরু পথ ধরে খট্ খট্ একটা অশ্বখুরধ্বনি শোনা যায়।

রম্ভা উৎকর্ণ হয়ে ওঠে।

॥ ৮ ॥

দীর্ঘ দিন ধরেই রাঠোর সামন্ত সর্দাররা শুনে আসছিল তাদের মাড়বারের সিংহাসন শূন্য হয়ে যায়নি। মহারাজ যশোবন্ত একেবারে নির্বংশ হননি। তাদের ভাবী অধীশ্বর নিভৃতে সংগোপনে শশিকলার মত দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

অনেকের অনেকরকম ধারণা হয়েছিল। কারো ধারণা তাদের শিশু কুমার যশল্মীরে রয়েছে কোথাও। কারো ধারণা বিক্রমপুরে—কারো ধারণা শিরোহীতে। সত্যিকারের যে কোথায় তাদের কুমার রয়েছে, রাঠোর সামন্ত সর্দাররা সঠিকভাবে মাত্র দুইজন ব্যতীত কেউ জানতে পারেনি এতদিন।

খীচি বংশের শিব সিংহ ও মুকুন্দকে ছাড়া শিশু রাজকুমার অজিতের সত্যিকারের অবস্থিতির কথা তৃতীয় কোন ব্যক্তিকেই জানায়নি দুর্গাদাস।

সর্দাররা এই কয় বছর সেই শিশু রাজকুমারকে স্মরণ করেই এত ক্লেশ সহ্য করেছে—যুদ্ধে হাসতে হাসতে প্রাণ দিয়েছে। কিন্তু লক্ষাবৎ ও আশাবৎ নামে মাড়বারের প্রাচীন সামন্ত সম্প্রদায় সত্যিই যেন শেষ পর্যন্ত অসাধ্য সাধন করে।

তাদের সঙ্গে যোগ দেয় সংগ্রামসিংহ। সকলে যোধপুরের চারিদিকে যত গ্রাম ছিল একেবারে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে ছারখার করে দিয়ে ঝালোর আক্রমণ করল।

বিহারী বেগতিক দেখে রাঠোরদের হাতে নগর সমর্পণ করে গা-ঢাকা দিল। এবং তারপরই সামন্ত সর্দাররা ক্ষেপে ওঠে—তাদের রাজকুমার যদি সত্যিই থাকে তো তাকে তারা স্বচক্ষে দেখতে চায়। আর কোন কথা শুনতে চাই না—সামন্ত সর্দাররা সমস্বরে বলে ওঠে, হয় আমাদের রাজাকে দেখাও, নচেৎ বুঝবো এতকাল যা বলে এসেছে দুর্গাদাস সব ধাপ্পা—সব মিথ্যা—

সকলে পরামর্শ করে মুকুন্দ সর্দারের কাছে দূত প্রেরণ করল। আমরা আমাদের রাজাকে দেখতে চাই। সকলের মুখেই এক কথা : রাজা—আমাদের রাজাকে দেখতে চাই।

কিন্তু মুকুন্দ রাজী হতে পারে না। কারণ দুর্গাদাস বিশ্বাস করে দাক্ষিণাত্যে যাবার আগে তাকে কুমারের গোপন অবস্থানের কথা বলে গিয়েছিল। সে এখনো দাক্ষিণাত্যে। তার বিনানুমতিতে কোন কিছু প্রকাশ করা আদৌ সম্ভবপর নয়। প্রত্যবায়ের ভাগী আমি হতে পারব না।

সামন্ত সর্দাররা চীৎকার করে ওঠে, দুর্গাদাসকে যা বলবার আমরা বলবো—তুমি বল কোথায় আমাদের রাজা, মুকুন্দ। তাকে আমাদের সামনে একবার আনো—আমরা একবার তাকে দেখে নয়ন ও মন পরিতৃপ্ত করব।

মুকুন্দ কিছুতেই সামন্ত সর্দারদের দাবিকে অগ্রাহ্য করতে পারল না। সাহসও হয় না তার। সে রাজী হয়। বলে, বেশ তবে চল—দেখবে চল তোমাদের রাজাকে।

মুকুন্দের নেতৃত্বে তখন সমগ্র মাড়বারে যেখানে যত সামন্ত সর্দার ছিল

সকলে একত্রিত হয়ে রাজদর্শনের উদ্দেশ্যে যাত্রা করল।

রম্ভার অনুমান মিথ্যা নয়। সত্যিই শুনেছিল সে—অশ্বখুরধ্বনি এগিয়ে আসছে পার্বত্য চড়াই পথ ধরে। পাহাড়ী চড়াই ধরে সুশিক্ষিত অশ্ব না হলে উঠতে বা নামতে পারে না। এবং সকলে চড়াই বা উতরাইয়ে অশ্বচালনাও করতে পারে না। অশ্বখুরধ্বনি যত কাছে এগিয়ে আসে রম্ভা নিজেকে ততই দৃঢ় করে স্থির হয়ে দাঁড়ায়।

অজিত ও সংযুক্তাকে দু'পাশে টেনে নিয়ে কোমরে গোঁজা তীক্ষ্ন ছুরিকার হাতীর দাঁতের বাঁটটা শক্ত মুঠিতে চেপে ধরে। রুদ্ধশ্বাসে সামনের দিকে চেয়ে থাকে। খট্—খট্—খটাখট্—

হাঁপাতে হাঁপাতে ঘর্মাক্তকলেবর একটি অশ্ব মঠের চত্বরে উঠে এলো চড়াই পথ ধরে। অশ্বের পৃষ্ঠে আসীন পেশল বলিষ্ঠ এক ব্যক্তি।

মোঘল নয় রাজপুত। এবং তাকে চিনতেও রম্ভার বিলম্ব হয় না। বলে, একি, মুকুন্দ।

হ্যাঁ জননী—মুকুন্দ—

মুকুন্দ অশ্বপৃষ্ঠ থেকে ভূতলে অবতরণ করে, তারপর রাজকুমার অজিতকে সসম্ভ্রমে অভিবাদন জানায়—জয়োঽস্তু কুমার—

অজিতও চিনতে পেরেছিল মুকুন্দকে। কেননা বেশ কয়েকবার মুকুন্দ তাদের খবরাখবর নিতে এলে তাকে দেখেছে, তার সঙ্গে পরিচয়ও হয়েছে।

মুকুন্দ—

হ্যাঁ কুমার—শুধু আমি নয়, এবারে মাড়বারের নানা দিক থেকে সমস্ত সামন্ত সর্দাররাই প্রায় এসেছে তোমাকে দর্শন করতে।

রম্ভা চমকে ওঠে, বলে, সেকি—

হ্যাঁ জননী—এ ছাড়া আর উপায় ছিল না, রাঠোররা তাদের রাজাকে দেখবার জন্য পাগল হয়ে উঠেছে—

কিন্তু মুকুন্দ—

তাছাড়া আমিও ভেবে দেখলাম, প্রজাদের কাছ থেকে রাজাকে আর এভাবে গোপনে দূরে সরিয়ে রাখা উচিত হবে না। এখনো যদি ওরা ওদের রাজাকে চাক্ষুষ না দেখতে পায়, ওদের মনের মধ্যে যে সন্দেহ মধ্যে মধ্যে দেখা দিয়েছে—যেটা খুবই স্বাভাবিক—ওদের রাজা বেঁচে নেই—সেটাই ওদের মনের মধ্যে এক স্থির বিশ্বাসে পরিণত হবে।

দুর্গাদাসের সম্মতি নিয়েছো?

সুযোগ হয়নি—তাছাড়া দাক্ষিণাত্যে যে ঠিক কোথায় সে ইদানীং আছে তাও আমরা জানতে পারিনি। আমার বিশ্বাস সে এখানে থাকলে আজ আপত্তি করতে পারত না।

তবু আমার ভয় করছে মুকুন্দ—

রাজা-প্রজায় সাক্ষাৎ হবে, এতে ভয় পাচ্ছেন কেন—এর চাইতে মঙ্গল, এর

চাইতে শুভ আর কি হতে পারে—যান রাজাকে সাজিয়ে নিয়ে আসুন আপনি। ওদের ডেকে আনি—

মুকুন্দ চলে গেল আবার সর্দারদের কাছে।

জয় রাঠোরকুলতিলক শ্রীমন মহারাজাধিরাজ অজিতসিংহ! জয়তু মহারাজাধিরাজ অজিতসিংহ! অগণিত রাঠোরের আনন্দোৎফুল্ল চীৎকারে অর্বুদ পাহাড়স্থিত মঠের চত্বর চৈত্র শেষের এক অপরাহ্ণে মুখরিত কল্লোলিত হয়ে ওঠে।

সবাই এসেছে অর্বুদশিখরে আজ তাদের রাজদর্শনে—রাজেন্দ্রসঙ্গমে—মাড়বারের যে যেখানে ছিল—এবং তাদের সঙ্গে এসেছে কোটা রাজ্যের হার রাজা দুর্জনশাল তার দুই সহস্র অশ্বারোহী সৈন্য সঙ্গে নিয়ে।

বালক রাজা। মনের মত করে রম্ভা তাকে সাজিয়ে দিয়েছে। কুমকুম চন্দন তিলক পাগড়ি রঙিন কুর্তা—

জয়তু মহারাজ অজিতসিংহ। সৌরকরস্পর্শে শতদল যেমন প্রস্ফুটিত হয়ে ওঠে, বালক রাজাকে দেখতে পেয়ে রাঠোরদের মানসকমলও যেন তেমনি প্রস্ফুটিত হয়ে উঠল।

সবাই এসেছে রাজদর্শনে—রাজেন্দ্রসঙ্গমে। উদয়সিংহ, সংগ্রামসিংহ, বিজয়পাল, তেজসিংহ, মুকুন্দসিংহ ও নাহোর প্রভৃতি চম্পাবৎ সর্দাররা—রাজসিংহ, জগৎসিংহ, সামন্তসিংহ প্রভৃতি কুম্পাবৎ সর্দাররা।

শুধজম্মা উহার সর্দার, পুরোহিত, খীচিবীর মুকুন্দ—পুরীহার ও জৈন শ্রাবক যতি জ্ঞানবিজয় সবাই সেখানে উপস্থিত।

সর্বপ্রথমে হার রাজা দুর্জনশাল নতুন রাজাকে অভিবাদন জানাল: জয়তু মহারাজাধিরাজ শ্রীমন অজিতসিংহ—অতঃপর মাড়বারের উপস্থিত সমস্ত সামন্ত সর্দাররা একে একে তাদের রাজার সামনে স্বর্ণ মণিমুক্তা অর্থাদি উপঢৌকন দিয়ে নতি স্বীকার করল, অভিবাদন জানাল।

রাজা প্রজার মিলন হলো। রম্ভার দু'চক্ষুর কোল বেয়ে অবিরল আনন্দাশ্রু গড়িয়ে পড়ে। আর একজন—বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে একটি পাশে দাঁড়িয়ে থাকে, মঠের থামের অন্তরালে আত্মগোপন করে রম্ভার নির্দেশে। রম্ভা তাকে কেবল বলেছিল, সামনে যাবি না। তাই সে সামনে যায়নি।

অবিশ্যি বালিকা সংযুক্তা একবার প্রশ্ন করেছিল, কেন মা—ও যাবে আমি যাবে না কেন?

অভাগিনী রম্ভা উত্তর দিতে পারেনি—উত্তর দেয়নি। কি উত্তর দেবে সে আত্মজাকে। কেমন করে বলবে, ওরে, একই ঔরসে, একই রক্তে জন্মেও তোর কোন পরিচয় এ দুনিয়ায় নেই—কোন স্বীকৃতি নেই—অস্বীকৃতি অপরিচয়ের দুঃখের তিলক তোর কপালে এঁকে বিধাতা অভাগিনীর কোলে তোকে তুলে দিয়েছেন।

বল না মা, যাবো না কেন?

না রে না—ওখানে তোর যেতে নেই।

কেন—কেন যেতে নেই—ও যেতে পারে, আমি যেতে পারি না কেন?

সংযুক্তাকে অতঃপর বুকের মধ্যে টেনে নিয়েছিল রম্ভা।

চুপ কর—চুপ কর। ওকথা বলতে নেই—বলতে নেই—তুই এখানে এই থামের আড়ালে দাঁড়িয়ে দেখ।

তাই দেখছিল সংযুক্তা।

সর্দাররা বললে, আর এখানে নয় জননী। আমাদের রাজা আর অজ্ঞাতবাসে থাকবে না। আমরা ওকে আহোবে নিয়ে যাবো।

রম্ভা কি আর বলবে। ওদের রাজাকে ওরা যদি, নিয়ে যেতে চায় নিয়ে যাবে বৈকি।

॥ ৯ ॥

রাজাকে নিয়ে সামন্ত সর্দাররা আহোবে এলো।

আহোবের অধিপতি তখন মৌক্তিক। তিনি অজিতের সঙ্গে 'বাধু' বিধান করে তাকে সম্মান জানালেন অনেকগুলি অশ্ব উপঢৌকন দিয়ে নত হয়ে। তারপর সেইখানেই মহা আড়ম্বরে অজিতের অভিষেক টিকাডোর উৎসব সম্পন্ন হলো।

এক পার্বত্য সর্দার তীক্ষ্ন ছুরিকা দিয়ে তার অঙ্গুলি চিরে রক্ত বের করে সেই রক্তের তিলক এঁকে দিল অজিতের কপালে।

টিকাডোর উৎসব সম্পন্ন করে সর্দাররা আহোব দুর্গ ত্যাগ করল।

পথে যেতে যেতে রায়পুর, ভিলার ও বারুন্দ অজিতের কাছে নতি জানাল—এবং সেখানকার সর্দাররাও তাকে বহুবিধ উপঢৌকনে অভিবাদন সম্পন্ন করে।

আহোব দুর্গ থেকে আশোপ দুর্গ—সেখান থেকে লাবৈরো—তারপর মৈরতীয়দের আবাসভূমি রিয়া—তারপর কেবনশির—সেখান থেকে ধন্ডলে—সবাই নতি জানায়—সবাই অভিবাদন জানায় তাদের রাজাকে।

শেষে ভাদ্রের এক বর্ষণমুখর মধ্যাহ্নে দাক্ষিণাত্য থেকে দুর্গাদাস এসে সকলের সঙ্গে মিলিত হলো।

অজিতের আত্মপ্রকাশের সংবাদটা মোঘলদের কাছে কিন্তু চাপা থাকল না। সমস্ত সংবাদই তারা পায়।

ইনায়েৎ খাঁ ভীষণ ভীত হয়ে পড়ল—সে তাড়াতাড়ি দ্রুতগামী অশ্বারোহী দূতের হাতে সমস্ত সংবাদ পত্র মারফত সম্রাটের নিকট পাঠাল।

> শাহেনশা, এতদিন রাঠোররা জানত না যে আজো তাদের রাজা জীবিত—তবু তারা দেশের জন্য দলে দলে প্রাণ দিয়েছে—এত দুঃখ সহ্য করেছে—আর আজ তারা যখন জানতে পেরেছে তাদের রাজা জীবিত তখন তাদের উৎসাহ ও বল অনেক বেশী হবে—তারা আরো দুর্বার হয়ে উঠবে—এ অবস্থায় আমার অধীনে যে সৈন্য আছে আমার মনে হয় রাঠোরদের সঙ্গে মুকাবিলা করতে আদৌ তা যথেষ্ট নয়—আমি সাহস পাচ্ছি না। আপনার আদেশের প্রত্যাশায় রইলাম।

ঔরঙ্গজীব নতুন একদল সৈন্য পাঠিয়ে দিল ইনায়েতের সাহায্যের জন্য। কিন্তু ইনায়েতের কাল শেষ হয়ে এসেছিল—সজ্জিত নতুন বাহিনী নিয়ে যুদ্ধ করবার আগেই অকস্মাৎ তার মৃত্যু হলো। সুজেৎ খাঁ এলো মাড়বারের সম্রাট-নিযুক্ত নতুন শাসনকর্তা হয়ে—ইনায়েতেরই পুত্র।

এদিকে ঔরঙ্গজীব ইনায়েৎ খাঁর সাহায্যে নতুন বাহিনী প্রেরণ করে নিজে আর এক কূট চাল চাললো। মহম্মদ শাহ নামে একটি যবন বালককে মহারাজা যশোবন্তের পুত্র বলে ঘোষণা করে ঔরঙ্গজীব বললে, অজিত ছাড়াও রাজা যশোবন্তের আর এক পুত্র ছিল, সে এখন আমার আশ্রয়ে—অনুপসিংহ—তাকেই আমি মাড়বারের সিংহাসনের অধিকারী বলে ঘোষণা করছি। আর অজিতকে পাঁচ হাজার মনসবদারী দিচ্ছি।

যথাসময়ে সংবাদটা রাঠোরদের কানে এলো। দুর্গাদাস ও মুকুন্দ সর্দার শুনে হাসল।

সেখানে আর যারা উপস্থিত ছিল, তারা কিন্তু সম্রাটের নতুন চালে ভয় পেয়েছে বলেই মনে হলো। তারা শুধায়, কি হবে দুর্গাদাস?

ভাবছো কেন তোমরা—দেখ না কি হয়—আমি ব্যবস্থা করছি।

অবিশ্যি দুর্গাদাসকে কিছু ব্যবস্থা করতে হলো না। তার আগেই সম্রাটের ঘোষিত মাড়বারের ভাবী অধিকারীর অদৃশ্য ছুরিকাঘাতে মৃত্যু হলো। সহস্র প্রহরী পরিবেষ্টিত অনুপসিংহকে যে কে বা কারা অমন করে তার শয়নকক্ষে ছুরিকাঘাতে নিহত করে গেল, কেউ সেটা বুঝতেও পারল না।

দুর্গাদাস নিশ্চিন্ত হয়ে বসে ছিল না। তারই পরামর্শে রাঠোর ও হারগণ একত্রে মোঘলদের মরুভূমি থেকে বিতাড়িত করে মালপুর ও পুরমণ্ডল দুর্গের ওপর আক্রমণ চালাল।

মোঘলরা সে প্রচণ্ড আক্রমণের সামনে দাঁড়াতে পারল না—দুর্গ ছেড়ে পালাল। দুর্গ অধিকার করে রাঠোর ও হাররা বহু সহস্র স্বর্ণমুদ্রা পেল।

কিন্তু সে যুদ্ধে হার নৃপতির দেহান্ত হলো।

সুজেৎ খাঁ ব্যাপারটায় বিচলিত হয়ে পড়ে—সে সম্রাটকে বলে, জাঁহাপনা, আমার মনে হয় ওরা যেভাবে ক্রমশঃ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ও মরণপণে উদ্ধুদ্ধ হয়ে উঠছে—মাড়বারকে ঐ রাঠোরদের হাতে ইজারা স্বরূপ তুলে দেওয়া যাক। তাতে করে অযথা এই লোকক্ষয় ও অর্থব্যয়ও বন্ধ হবে—ঘরে বসে বসে আমরা মোটা একটা অর্থও পাবো নিয়মিত।

ঔরঙ্গজীব সম্মত হলো। রাঠোররাও সে প্রস্তাব সানন্দে মেনে নিল।

স্থির হলো, বিদেশীয় বাণিজ্যের দরুন যে শুল্ক আদায় হবে সেই বাণিজ্যের ব্যয় বহন বাদ দিয়ে সংগৃহীত অর্থ হতে বাদবাকী এক-চতুর্থাংশ রাঠোররা পাবে। অর্থাৎ ব্যয় বাদ দিয়ে তিনের চার অংশ সম্রাটের ভাগে পড়বে। আকবর ও তার পরিবারকে ছেড়ে দিতে হবে। অনেকে আপত্তি তুলেছিল, কিন্তু দুর্গাদাস বুঝিয়ে সকলকে রাজী করাল।

ইনায়েৎ পুত্র সুজৈৎ খাঁ যোধপুর ত্যাগ করে চলে গেল দিল্লীর পথে। কিন্তু হতভাগ্য দিল্লী পর্যন্ত পেঁছাতে পারল না।

রৈনবলে উপস্থিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই যোধ হরনট তাকে আক্রমণ করে তার যথাসর্বস্ব, এমন কি রমণীদের পর্যন্ত লুঠ করে নিল।

হৃতসর্বস্ব পর্যুদস্ত সুজৈৎ খাঁ কাঁদতে কাঁদতে সম্রাটের কাছে গিয়ে সব দুঃখের কথা বললে দীর্ঘ এক বৎসর পরে।

ঔরংজীব শুধু শুনে গেল। তারপর শুধাল, ঠিক আছে—এখন আমার পৌত্রী লায়লীর কি হলো বলো—তাকে দেয়নি ছেড়ে দুর্গাদাস তোমার সঙ্গে।

না আলমপনাহ।

আকবরের ত্রয়োদশী কন্যা লায়লীকে দুর্গাদাস আসতে দেয়নি। বলেছিল—লায়লী সুজৈৎ খাঁর পরিবারবর্গের সঙ্গে আসবে—কারণ তখনো দাক্ষিণাত্য থেকে নাকি দুর্গাদাসের পরিবারবর্গের সঙ্গে লায়লী যোধপুরে এসে পেঁছায়নি। যাই হোক, ঔরংজীব আবার লিখল দুর্গাদাসকে—কিন্তু কোন সাড়া এলো না যোধপুর থেকে।

এমনি করে অপেক্ষা করে করে আরো একটা বছর কেটে গেল—অবশেষে অনন্যোপায় ঔরংজীব আজমীঢ়ের হাকিম সেফি খাঁকে একখানা পত্র লিখে দ্রুতগামী অশ্বারোহীর হাতে তখুনি পাঠিয়ে দিল।

॥ ১০ ॥

পত্রে লেখা ছিল : সেফি খাঁ, যদি তুমি দুর্গাদাসকে জীবিত বা মৃত আমার সামনে এনে দিতে পার তোমাকে আমি রাজ্যের সমস্ত খাঁর উপরে পদমর্যাদা দেবো। আর যদি ব্যর্থকাম হও—জেনো তোমার জন্য অবিলম্বে 'বালা' প্রেরিত হবে।

সেফি খাঁ প্রমাদ গনে—একদিকে শয়তান কুটচক্রী বাদশা—অন্যদিকে দুর্ধর্ষ যমসদৃশ দুর্গাদাস। কি করা যায় এখন—কিং কর্তব্যং। অনেক ভেবে একটা বুদ্ধি মাথায় আসে সেফি খাঁর।

সে অনেক মুসাবিদা করে অজিতসিংহের নামে একটি পত্র লিখে পাঠাল।

মহামান্য রাজা—

সম্রাটের আদেশে আপনাকে এই পত্র লিখছি—আপনার পিতৃরাজ্য আপনাকে ফিরিয়ে দেওয়ার আদেশ হয়েছে—আজমীঢ়ে এসে সম্রাটের সনন্দ গ্রহণ করলে সুখী হবো।

পত্রখানি পড়ে দুর্গাদাস বুঝতে পারে পৌত্রী লায়লীকে ফিরে না পাওয়ার জন্য সম্রাটের এটা আর একটা কৌশল মাত্র। কিন্তু মুকুন্দ বললে, আহা তা নাও তো হতে পারে—

দুর্গাদাস মৃদু হেসে বলে, আমি জানি মুকুন্দ তাই—তবু ভাবছি একবার

যাব, সম্রাটের সঙ্গে না হয় একবার দেখাই করা যাক।

কিন্তু দুর্গাদাসের অনুমান যে মিথ্যা নয়, পর্বতমালার দূরস্থিত সংকীর্ণ গিরিপথের সম্মুখভাগে পৌঁছেই মুকুন্দ তা উপলব্ধি করতে পারে।

বার বছরের কিশোর বালক অজিত কিন্তু সেকথা জানতে পেরে এতটুকু ভীত হয় না। বলে, ঠিক আছে সর্দার, তবু আমরা যাবো।

কিন্তু রাজা—

দেখাই যাক না দুর্গে প্রবেশ করে, খাঁ সাহেবের সত্যিকারের অভ্যর্থনাটা কেমন হয়।

বেশ, তবে তাই হোক।

দুর্গাদাস প্রস্তুত হয়েই এসেছিল বিরাট এক সৈন্যবাহিনী নিয়ে—তার উপরে নগরদ্বারে উপনীত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কিশোর রাজাকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্য যখন সমস্ত আজমীঢ় এগিয়ে এলো খাঁ সাহেব চক্ষে সর্ষেফুল দেখে।

তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে অজিতকে সাদর অভ্যর্থনা জানায়—প্রচুর উপঢৌকন ইত্যাদি দিয়ে প্রাণ বাঁচায়।

সাড়ম্বরে অজিতসিংহ প্রচুর উপঢৌকন ইত্যাদি নিয়ে যোধপুরে ফিরে এল।

কাল নিরবধি। আরো তিনটি বছর কালের বুকে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। ষোল বছরের যুবক আজ অজিতসিংহ। কিন্তু চিরদিন বাড়ন্ত গড়ন—দেখলে মনে হবে বুঝি কুড়ি-বাইশ বছরের যুবক। দুর্জয় সাহসী ও একরোখা।

সংযুক্তারও বয়েস বেড়েছিল—সেও আজ পূর্ণযুবতী।

আর লায়লী—আকবর দুহিতা—সম্রাটের পৌত্রীকে আজও দুর্গাদাস ফিরিয়ে দেয়নি।

সম্রাটের সঙ্গে শেষ বোঝাবুঝির জন্যই দুর্গাদাস লায়লীকে ফিরিয়ে দেয়নি। সে জানত, লায়লী হবে তার শেষ অস্ত্র। ঐ লায়লীর জন্যই হয়ত ঔরংজীব একদিন নতি স্বীকার করবে—অজিতকে তার পিতৃরাজ্য ফিরিয়ে দিতে বাধ্য হবে। কারণ দুর্গাদাস জানত সত্যিকারের স্নেহ করে ঔরংজীব তার ঐ পৌত্রীটিকে। মা-মরা ঐ লায়লী ঔরংজীবের অতি প্রিয়পাত্রী ছিল।

লায়লী আকবরের প্রথমা বেগমের কন্যা। লায়লী কিন্তু ওর পিতৃদত্ত আদরের ডাক নাম। আসল নাম তার সবাই ভুলে গিয়েছিল।

তরুণ রাজা অজিতের চরিত্রে অনেক গুণ ছিল সত্যি, কিন্তু যৌবনপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে এমন একটি দোষ তার মধ্যে ক্রমশঃ প্রকটিত হয়ে উঠতে লাগল যেজন্যে দুজন সত্যিই চিন্তিত হয়ে উঠছিল। সে দুজন দুর্গাদাস ও রম্ভা। আর দোষটি নারী সম্পর্কে একটা উগ্র লালসা।

ব্যাপারটা প্রথমে নজরে পড়ে রম্ভার। সংযুক্তা ও লায়লী দুটি পাশাপাশি কক্ষে থাকত এবং দুজনার মধ্যে অদ্ভুত একটা সখিত্ব গড়ে উঠেছিল। দিন ও রাত্রির বেশির ভাগ সময় তাদের একত্রই কাটত। যেন একে অন্যের ছায়া।

লায়লী কালো শ্যামলী আর সংযুক্তা উজ্জ্বল গৌরবর্ণা। দিন ও রাত্রি যেন।

সংযুক্তা বড় হবার সঙ্গে সঙ্গেই রম্ভা ওকে অজিতের সংসর্গ থেকে একটু একটু করে দূরে সরিয়ে নিয়েছিল।

সংযুক্তা প্রথমটায় বিদ্রোহ করেছে—বলেছে, কেন মা, ওর সঙ্গে মিশলে কি হয়?

না।

বাঃ, না কেন তা অন্ততঃ বলবে তো!

ভুলে যাস কেন, ও রাজা আর তুই—

কেন আমিও তো একদিন রানী হতে পারি। সংযুক্তা বলে।

চুপ চুপ—ওকথা বলা তো দূরে থাক। মনের মধ্যে আনাও মহাপাপ জানবি—

যুক্তি বা নিষেধ মনে ধরেনি সংযুক্তার।

সে তর্ক করেছে, পাপ—কেন পাপ?

মেয়ে একগুঁয়ে জেদী। রম্ভা শঙ্কিতা হয়ে ওঠে। কিন্তু আর তো বেশী কিছু প্রকাশ করে বলা যায় না। কেবল সতর্ক থাকে। মেয়েকে চোখে চোখে রাখে। কিন্তু মেয়ের বয়েস হয়েছে—কতই বা তাকে চোখে রাখা যায়। তার উপর হতভাগী মেয়েটার রূপের যেন অন্ত নেই। যত দিন যাচ্ছে যৌবন আর রূপ যেন উথলে পড়ছে।

রম্ভা দুর্গাদাসকে বলে, এ রাজপ্রাসাদে আর নয়, এবারে আমার অন্য কোথায়ও একটা ব্যবস্থা করে দাও না ভাই।

দুর্গাদাস বলে, সেকি—এ প্রাসাদ ছেড়ে তুমি কোথায় যাবে—আর যাবেই বা কেন?

যাবো ঐ হতভাগিনী মেয়েটার জন্যই—ওর জন্যই আমাকে যেতে হবে।

কেন? সংযুক্তা আবার কি করলো? তাছাড়া এ প্রাসাদ ছেড়ে তুমি সংযুক্তা যাবেই বা কেন—একমাত্র অজিত ছাড়া আর কার বেশী তোমাদের চাইতে এখানে থাকবার অধিকার আছে?

অধিকার—অধিকারের কথা ছেড়ে দাও ভাই—বিধাতার যদি তেমনি ইচ্ছা হবে—এমন করে সমস্ত সত্য পরিচয় একটা গোপন লজ্জার মত বহন করতে হবে কেন সারাটা জীবন—থাক, সে নালিশ আমি জানাচ্ছি না—জানাবোও না কোন দিন—মুখ যখন বিধাতাই বন্ধ করে দিয়েছেন বন্ধ থাকবে।

তবে—

অজিত বড় হয়েছে—এখন সে আর শিশুটি নেই।

ও এই কথা—তা সে নিশ্চয়ই তার নিজের বোনকে অসম্মান করবে না।

সংযুক্তার সে পরিচয় তো ওর কাছে কোন দিনই দেবার উপায় নেই।

নাই বা থাকল—তাই বলে সম্পর্কটা মুছে যাবে নাকি—অন্য সম্পর্ক তো নয়, রক্তের সম্পর্ক।

ভাই, তোমার চোখ নেই নচেৎ—

কি বলবে রম্ভা, অন্ততঃ স্পষ্ট করে বল।

দেখতে পাচ্ছ না অজিতের যত বয়েস হচ্ছে দিন দিন সে কেমন উচ্ছৃঙ্খল হয়ে উঠছে।

—তা অবিশ্যি একটু—আর হবেই বা না কেন—রাজরক্ত শরীরে—

তোমাকে স্পষ্টই বলি ভাই—সংযুক্তার প্রতি অজিতের চোখের দৃষ্টিটা আদৌ ভাল নয়।

কি বলছো রম্ভা—

হ্যাঁ—আর সে দৃষ্টি আর যাকেই ফাঁকি দিক আমাকে ফাঁকি দিতে পারেনি—

সত্যি বলছো ?

নচেৎ আমার চিন্তার কোন কারণই থাকত না।

কি করি তাহলে বল তো ?

কি আবার করবে—আমরা চলে যাই মা মেয়ে—

না—বরং—

কি ?

অজিতকে তোমাদের সত্য পরিচয়টা—

ছিঃ ছিঃ, এ তুমি কি বলছো ভাই—বিশ্বাস তো সে করবেই না—উল্টে সমস্ত মাড়বারে আমাদের কারো আর মুখ দেখাবার উপায় থাকবে না।

কেন থাকবে না—যা সত্য—

সত্য—কি অসত্য—আর তা যে সত্য কে তা প্রমাণ করবে—তোমার আমার মুখের কথা—যদি তারা বলে তোমার ও আমার এটা একটা ষড়যন্ত্র।

না, না—

তাই ভাই—তাই সকলে বলবে। পৃথিবীতে সমস্ত মিথ্যার মত সমস্ত সত্য যদি এত সহজে স্বীকৃতি পেত, সম্মান পেত, তাহলে সত্যের মূল্য কবে মিথ্যার কোঠায় নেমে আসত—তার চাইতে তুমি আমাদের অন্যত্র বাসের ব্যবস্থা করে দাও ভাই।

দাঁড়াও—ক'টা দিন আমায় ভেবে দেখতে দাও—

ভাবতে চাও ভাবতে পার, তবে আমার মনে হয় যত তাড়াতাড়ি এখান থেকে ওকে আমি সরিয়ে নিয়ে যেতে পারি ততই মঙ্গল।

॥ ১১ ॥

রম্ভা মিথ্যা বলেনি। বুঝতেও তার ভুল হয়নি। সংযুক্তার প্রতি তরুণ অজিতের চোখের দৃষ্টির ভাষা রম্ভার নারীমনের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠতে দেরি হয়নি।

কিন্তু একা কি অজিতেরই যৌবনের দোষ—সংযুক্তার দিক থেকে কি কোন সাড়া ছিল না ? দুটি তরুণ মনের স্বাভাবিক যে পরিণতি তাই ঘটেছে—তার জন্য দোষী অজিতও নয়, সংযুক্তাও নয়। তারা তো জানে না পরস্পর তাদের কি সম্পর্ক।

আর ইদানীং রম্ভার কাছ থেকে বাধা পেয়ে আরো যেন সংযুক্তার জিদ বেড়ে যায়। অজিতের মনও সংযুক্তার দেখা না পেয়ে ব্যাকুল হয়ে ওঠে।

সেদিন সন্ধ্যায় অন্দরণের নির্জন এক অলিন্দপথে অকস্মাৎ দুজনে দেখা হয়ে

যায়। ক্ষীণ মশালের আলোয় অলিন্দপথে একটা আলোছায়ার লুকোচুরি যেন।

সংযুক্তা—

কি ?

তুমি তাহলে প্রাসাদে আছো ?

থাকবো না তো কোথায় যাবো।

কিন্তু আমাকে যে এক দাসী বললে সেদিন—

কি ?

তুমি প্রাসাদে নেই !

তেমনি আমিও তো শুনেছিলাম—

কি—কি শুনেছিলে সংযুক্তা ?

তুমি আমার সঙ্গে দেখা করতে চাও না—বিরক্ত হও।

কে—কে বলেছে একথা।

যেই বলে থাক কথাটা সত্যি কি না তুমিই বল ?

সংযুক্তা—

তুমি আমায় ঘৃণা করো, আমার মুখ দেখতে চাও না—কথাটা তো তুমিও আমায় স্পষ্ট করে বলতে পারতে মহারাজ—কোন দিন তোমার সামনে আর আসতাম না, কোন দিন আমার এ মুখ তোমায় দেখতে হতো না—গলার স্বর সংযুক্তার যেন কান্নায় বুজে আসে।

একথা তুমি বিশ্বাস করো, বিশ্বাস করেছো ?

কেন করবো না—কে আমি—তুমি মাড়বারের মহারাজ আর আমি পিতৃমাতৃ-পরিচয়হীনা কুড়িয়ে পাওয়া এক অভাগিনী বই তো নয়।

কে বললে তুমি অজ্ঞাতকুলশীলা—অভাগিনী—পরিচয়হীনা।

কেন—বলতে হবে কেন কাউকে—তাই তো সত্য—

তাই যদি সত্য হয় তো জেনো সেই অজ্ঞাতকুলশীলা নামগোত্রপরিচয়হীনা-কেই আমি আমার জীবনসঙ্গিনী করবো—মাড়বারের পাটরানীর সম্মান দেবো।

পরিহাস করছো মহারাজ।

পরিহাস নয়—জেনো এর চাইতে বড় সত্য আমার জীবনে নেই—বলতে বলতে অজিত ব্যগ্র দু'বাহু প্রসারিত করে সংযুক্তাকে আপন বক্ষের মধ্যে টেনে নিতে উদ্যত হয়। কিন্তু তার আগেই তাকে থামতে হয়।

সংযুক্তা—

রম্ভার কঠিন কণ্ঠস্বর যেন একটা সুতীক্ষ্ন তরবারির মত উভয়ের মাঝখানে এসে পড়ে অকস্মাৎ।

দুজনেই প্রস্তরমূর্তি যেন।

রম্ভা বলে, সংযুক্তা, তোমায় না বলেছিলাম আজ অমাবস্যা—মন্দিরে পূজা দিতে যাবো তোমায় নিয়ে—তোমাকে প্রস্তুত হয়ে থাকতে ?

মা—

যাও।

সংযুক্তা মাথা নীচু করে ধীরে ধীরে স্থান ত্যাগ করে।

রম্ভাও বুঝি যাবার জন্য প্রস্তুত হয়েছিল—থামতে হলো তাকে অজিতের আহ্বানে।

মা—

রম্ভা তাকায় অজিতের মুখের দিকে।

তোমাকে একটা কথা জানাতে চাই।

আমি এখন বড় ব্যস্ত অজিত, পরে শুনবো তোমার কথা—রম্ভা যাবার জন্য আবার পা বাড়ায়।

দাঁড়াও মা।

অজিত—

শোন—সংযুক্তাকে আমি ভালবাসি তুমি জানো—আর সেও আমায় ভালবাসে।

অজিত—

তাকে আমি বিবাহ করবো।

ছিঃ ছিঃ, এক অজ্ঞাতকুলশীলা পথ হতে কুড়িয়ে পাওয়া মেয়ে—

হোক—তবু সে-ই আমার মনোনীতা বধূ।

না—ভুলো না তুমি মাড়বারের অধিপতি—হাজার হাজার প্রজার তুমি প্রভু।

মা—সে কারণে কি রাজার সুখ দুঃখ আশা আকাঙ্ক্ষা সব বিসর্জন দিতে হবে?

রাজাকে অনেক ত্যাগ স্বীকার করতে হয় অজিত।

আমি সংযুক্তাকে ত্যাগ করতে পারব না।

এ বিবাহ হতে পারে না—তবু—

কিন্তু কেন—কেন হতে পারে না?

প্রশ্ন করো না—জবাব দিতে পারবো না—তবে জেনো এ অসম্ভব—তোমাদের পরস্পরের মধ্যে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক হতে পারে না। ভুলে যাও তুমি ওকে—

ভুলে যাবো!

হ্যাঁ—

ভুলে যাবো সংযুক্তাকে—যাকে জ্ঞান হওয়া অবধি পাশে পাশে দেখেছি—যার কাছ থেকে জীবনে প্রথম ভালবাসার আস্বাদ পেয়েছি—তাকে ভুলে যাবো। অজিত তা পারবে না কোনদিন জেনো।

তবু তোমাকে ভুলতে হবে। রম্ভার কণ্ঠস্বর কঠিন।

হঠাৎ যেন অজিতের কণ্ঠস্বর পরিবর্তিত হয়। বলে, তোমার হুকুম নাকি?

অজিত—

জানতে চাই এটা তোমার হুকুম কি না—

অজিতের উদ্ধত ভঙ্গী ও কণ্ঠস্বর রম্ভাকে যেন স্তম্ভিত করে দেয়।

কিন্তু রম্ভাও নিজেকে সামলে নেয়—শান্ত ধীর কণ্ঠে অজিতের চোখের

ওপরে চোখ রেখে বলে, যদি তাই মনে কর তো তাই—

অকস্মাৎ বিষধর কালনাগ যেন ফণা তুলে ছোবল হানল।

তাহলে তুমিও শোন মাড়বার অধিপতির ধাত্রী—পালনকর্ত্রী—

অস্ফুট যন্ত্রণাকাতর কণ্ঠে চীৎকার করে ওঠে রম্ভা, অজিত—

হ্যাঁ—শোন পালনকর্ত্রী—তোমার ঋণ যতই অপরিশোধনীয় হোক—মাড়বারের অধিপতির জন্য যদি কিছু করেও থাক তার প্রতি সামান্যা এক প্রজার কর্তব্যটুকুই তুমি করেছো—তার জন্য পারিতোষিক যদি চাও তো নিশ্চয়ই দেবে মাড়বারাধিপতি, কিন্তু তোমার অধিকারের সীমালঙ্ঘনকে সে কোন দিনই ক্ষমা করবে না।

ওরে হতভাগা, চুপ কর চুপ কর—আমি—

শোন পালনকর্ত্রী—আমি মাড়বার অধিপতি বলছি—ঐ সংযুক্তাই হবে আমার মহিষী।

অজিত—

হ্যাঁ—ওকেই আমি বিবাহ করব এবং শীঘ্রই সামন্ত সর্দারদের সকলকে ডেকে সে কথাটা আমি ঘোষণা করব। কথাগুলো বলে মাড়বার অধিপতি অজিতসিংহ আর দাঁড়াল না—ধীর শান্ত পায়ে সেই সংকীর্ণ আলো-আঁধারিভরা অলিন্দপথ ত্যাগ করে চলে গেল।

আর স্তব্ধ অনড় প্রস্তরমূর্তির মত সেখানে দাঁড়িয়ে রইল রম্ভা। একি হলো ভগবান, একি হলো। বলে দাও স্বামী, রম্ভার এখন কি কর্তব্য—মনে মনে স্মরণ করে রম্ভা মৃত স্বামী মহারাজ যশোবন্তকে। একি কঠিন কর্তব্যের গুরু-ভার তুমি এ অভাগিনীর মাথায় চাপিয়ে গিয়েছো প্রভু। আমি ধাত্রী—পালনকর্ত্রী মাড়বার অধিপতির—তোমার সন্তানের।

সহসা রম্ভার দু'চোখের কোল ছাপিয়ে জল নেমে আসে। চোখের দৃষ্টি জলে ঝাপ্সা হয়ে যায়। দু'হাতে মুখ ঢাকে রম্ভা।

সহসা কোমল একখানি হাত রম্ভার হাতটা চেপে ধরে, দাইমা—

কে—

আমি সুলতানী।

সুলতানী—

আমি সব শুনেছি দাইমা—

কি হবে সুলতানী?

চলুন, ঘরে চলুন—ওঁর ইচ্ছা যখন এ বিবাহ হয়—

কিন্তু মা, এ বিয়ে যে হতে পারে না রে—হতে পারে না।

দাইমা—

ওরে এ যে অসম্ভব।

অসম্ভব। কেন দাইমা?

ওরে সে কথা আমায় শুধোস না—বলতে পারব না—এ অসম্ভব—হতে পারে না—হতে পারে না—পুনরায় কান্নায় ভেঙে পড়ে রম্ভা।

চতুর্থ পর্ব : অশ্রুমুখী

॥ ১ ॥

রুম্ভা আর কি বলবে? আর বেশী রুম্ভা কি বলতে পারে?

নির্মম নিয়তি যে তার কণ্ঠ চিরদিনের জন্য রোধ করে দিয়েছে। বুক ভেঙে গেলে—গলা দিয়ে রক্ত উঠলেও তো একথা কোনদিনও সে গলা দিয়ে বের করতে পারবে না।

সুলতানী লায়লী রুম্ভাকে তার কক্ষে পৌঁছে দিয়ে নিজের ঘরে চলে গেল। লায়লীর নিজেরও আর বুঝি দাঁড়াবার ক্ষমতা ছিল না। পা দুটো থরথর করে কাঁপছিল। হতভাগিনী লায়লী এ আজ কি শুনলো।

তার প্রিয়তম—প্রাণাধিকপ্রিয় অজিত তাকে চায় না—চায় সমস্ত প্রাণ দিয়ে ঐ সংযুক্তাকেই। অন্তরের নিভৃতে অজিতকে ঘিরে লায়লীর যে লজ্জানম্র প্রেমপুষ্পটি ধীরে ধীরে দল মেলেছিল, অকস্মাৎ তার উপরে যেন নিদাঘের তপ্ত শ্বাস এসে পড়েছে—ঝলসে যেন সব শুকিয়ে গেল।

বাতায়নের সামনে এসে দাঁড়াল লায়লী। আকাশচুম্বী দুর্গের কক্ষ থেকে বাতায়নপথে অন্ধকারে দূর নগরের আলোর কম্পমান শিখাগুলো ইতস্ততঃ যেন আকাশের বুকে নক্ষত্রের মত মনে হয় অনিশ্চিত নাগালের বাইরে। মিটিমিটি জ্বলছে যেন দুরাশার স্বপ্নের মত। কি হবে আর এখানে পড়ে থেকে।

দুর্গাদাস সর্দার—চাচাজী—কিছুদিন আগেও তাকে শুধিয়েছিল, কিরে বেটী, দিল্লীতে তোর দাদুর কাছে, আব্বাজানের কাছে ফিরে যাবি? যাস তো বল্ আমি ব্যবস্থা করে দিই—

লায়লী স্পষ্টই বলেছে; না চাচাজী, দিল্লী যাবো না।

কেন রে?

না, যাবো না।

নিজের আত্মীয়স্বজন আপনার জনকে দেখতে ইচ্ছা করে না তোর?

না।

কেন রে—কোথায় দিল্লীর লালকিল্লা আর কোথায় তোর চাচাজীর জীর্ণ কুটীর।

হোক—সেখানে মানুষ থাকে নাকি—

মানুষ থাকে না তো কি থাকে রে বিটীয়া?—শুধিয়েছিল দুর্গাদাস।

শুধু হিংসা, চক্রান্ত, সন্দেহ, অবিশ্বাস সেখানকার প্রত্যেকের মনে। লালকিল্লার বাতাসটাই বিষাক্ত—মানুষের কোন ইনসান সেখানে থাকে না—

হো হো করে হেসে উঠেছিল দুর্গাদাস। বলে, কিন্তু বেটী সে যে তোর আপনার ঘর—তাছাড়া আমরা তো তোর শত্রু!

শত্রুরা বুঝি কাউকে এত ভালবাসে—এত আদর করে?

কিন্তু তোর দাদু তাই আমাদের বলে।

আব্বাজান কিন্তু বলতো না তা।

জানি—

তারপরই একটু থেমে দুর্গাদাস বলেছিল, শাহজাদা আকবরের মত মানুষ হয় না—ও ঠিক যেন তোর বাপের জ্যেষ্ঠতাত দারা শিকোর মত হয়েছে।

আচ্ছা চাচাজী—

কি রে?

দারা শিকোকে তুমি দেখেছ—আমার সেই বড় দাদু—

দেখেছি বইকি মা—সম্রাট সাজাহাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র—যেন দেবদূত—মুসলমান হয়েও হিন্দুধর্মের প্রতি অমন শ্রদ্ধা—হিন্দুর প্রতি অমন প্রীতি কই আর তো চোখে পড়ল না বেটী।

দাদু ওঁকে হত্যা করেছিল, তাই না?

হ্যাঁ মা—নিষ্ঠুর দানবীয় হত্যা—ভাই তো দূরে থাক, অতি বড় শত্রুকেও বোধকরি কেউ অমন নির্মম, নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করতে পারে না। সেই মহাপাপেরই ফল মা—সেই মহাপাপেরই ফল। নচেৎ একটা দিনও মানুষটা সিংহাসনে বসে নিশ্চিন্ত হতে পারল না—স্বস্তি পেল না।

লায়লী তার পিতার কাছ থেকে সবই শুনেছিল।

তার দাদু ঔরংজীবের ময়ূর সিংহাসনে বসবার পশ্চাতে যে রক্তাক্ত ইতিহাস, আকবর তার কন্যাকে সবই বলেছিল। সে বীভৎসতা সে নারকীয়তা শুনতে শুনতে শিউরে উঠেছে বার বার লায়লী। বলেছে আব্বাজান, মানুষ এত নিষ্ঠুর হয় কি করে?

আমাদের মোঘলদের তক্তেতাউসের ইতিহাসটা তো বলতে গেলে গোড়া থেকেই তাই মা—অভিশপ্ত ও তক্তেতাউস—খুন দিয়ে তৈরী ঐ তক্তেতাউস—আকবর বলেছিল বিষণ্ণ কণ্ঠে।

তবে তুমি ঐ তক্তেতাউসে বসো না আব্বাজান।

আদরিণী কন্যার কথাটা শুনে হেসে উঠেছিল শাহজাদা আকবর।

পাগলী বেটী, ওরে আমি না বসলেও একজন বসবে, আর ও রক্তও সিংহাসনের গায়ে আবার লাগবে। রক্তের দাগ খুনের দাগ মোছা যাবে না যেমন, তেমনি বিনা রক্তেও ওই সিংহাসনের অধিকার কারো জন্মাবে না এ বংশে—কে জানে হয়ত এ বংশের একটা অভিশাপ।

না মোছা যায় থাক্—তুমি অন্তত বসো না আব্বাজান ঐ অভিশপ্ত তক্তেতাউসে—

কিন্তু ঐ তক্তেতাউসের এমনি আকর্ষণশক্তি বেটী যে ও ঠিক ঐ অভিশাপের মধ্যে আমাদের টেনে নিয়ে যাবে দেখিস।

কেন—টেনে নেবে কেন—আমরা যদি দিল্লীতে কোন দিন আর ফিরে না যাই আব্বাজান—

সে কি রে বেটী!

হ্যাঁ—নাইবা গেলাম আব্বাজান আমরা দিল্লীতে ফিরে আর—

দিল্লীতে ফিরে যাবি না? সে কি কথা বেটী।

না—মরু-অরণ্য-পর্বতবেষ্টিত এই রাজস্থান—এখানেই যদি আমরা চিরদিন থেকে যাই?

কিন্তু এরা আমাদের থাকতে দেবে কেন—

কেন দেবে না—নিশ্চয়ই দেবে—জোর গলায় বলেছিল লায়লী।

না বেটী—

কেন আব্বাজান, একথা তুমি বলছো কেন—

যেখানে পরস্পরের প্রতি সত্যিকারের বিশ্বাস নেই—বিশ্বাস গড়ে ওঠে না, সেখানে কি নিশ্চিন্তে পাশাপাশি থাকা যায়?

তার জন্য তো তোমরাই দায়ী আব্বাজান!

কে যে সঠিক দায়ী আমি জানি না বেটী—তবে—

কি তবে আব্বাজান?

যেখানে জবরদস্তি আর দখলের প্রশ্ন থাকে সেখানে সত্যিকারের বিশ্বাস আর প্রীতি বোধ করি কোন দিনই গড়ে উঠতে পারে না।

কিন্তু বাদশা আকবরের সময় শুনেছি সত্যিকারের একটা সম্পর্ক ওদের ও আমাদের মধ্যে গড়ে উঠেছিল—লায়লী বলে।

কে জানে মা—হয়ত বাদশা আকবরের ঐ প্রচেষ্টার মধ্যে দিয়েই আজকের পরস্পরের প্রতি এই তিক্ত সম্পর্কটা ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছে—পরস্পরের অন্তরকে একেবারে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে—দুটো রক্তের ধারাকে একত্রে মিশিয়ে দিলেই হয় না বেটী, যুগ যুগ ধরে দুই রক্তের মধ্যে যে ধর্ম তাকে কি এত সহজেই দু-চার পুরুষে অতিক্রম করা যায়—সে আমরা এখানেই থাকি বা দিল্লীতে ফিরে যাই, ওকে কোনদিনই আমরা অতিক্রম করতে পারবো না।

কিন্তু সেদিন দুর্গাদাস সর্দারের অনুরোধ সত্ত্বেও লায়লী তার আব্বাজানের সঙ্গে দিল্লীতে ফিরে যেতে চায়নি, সে কি কেবল দিল্লীতে লালকিল্লার বিষাক্ত ও তিক্ত শ্বাসরোধকারী আবহাওয়ার জন্যই? আজ মনের দিকে তাকিয়ে শিউরে ওঠে লায়লী। মনের ভিতরকার সেদিনকার ঝাপসা ছবিটা আজ আর ঝাপসা নেই—অস্পষ্টও নেই।

কিন্তু এ কি করেছিস তুই হতভাগী—এ তুই কি করেছিস। এমনি করে নিজের সর্বস্ব কেন তুই নিঃশেষ করে বসে রইলি। এমনি করে নিজেকে যদি না নিঃশেষ করে দিতিস তবে তো আজ এমনি করে চরম লজ্জার সঙ্গে চরম বেদনাটা বাকী জীবনের জন্য বয়ে বেড়াতে হতো না হতভাগিনী তোর। আজ যে তোর জন্য কোন সান্ত্বনাই রইলো না।

মাত্র এক বছর আগেকার সেই সন্ধ্যার কথাটা মনের পাতায় ভেসে উঠেছিল লায়লীর।

আব্বাজান আকবরের হঠাৎ কি খেয়াল হয়েছিল তার বাঁশবাদন শুনবে।

তাই আব্বাজানের ঘরে বিস্তৃত গালিচার উপর বীণাটি নিয়ে বসে আপনমনে তন্ময় হয়ে লায়লী সুর-সাধনা করছিল।

হঠাৎ আব্বাজানের কণ্ঠস্বরে লায়লী চমকে উঠল। আসুন—আসুন সর্দার—একি মহারাজ—আসুন আসুন—কি সৌভাগ্য আমার।

সামনের দিকে তাকিয়ে আর যেন দৃষ্টি ফেরাতে পারে না লায়লী।

কে ঐ তার সামনে তরুণ যুবক। ঢলঢল যৌবন সুগঠিত দেহে যেন উপচে পড়ছে—মদিরালস দুটি চক্ষুর দৃষ্টি।

লায়লী—

আব্বাজান—

যাও আমাদের হিন্দু পরিচারিকাকে বলো মিঠাই ও শরবত নিয়ে আসতে—মহারাজ অজিতসিংহ আজ আমাদের গৃহে মেহমান—কি সৌভাগ্য আমাদের—কি সৌভাগ্য—

মহারাজ অজিতসিংহ। সেই প্রথম লায়লীর কর্ণে পশেছিল ঐ নামটি—অজিতসিংহ। ঐ অনুপম রূপরাশি—ঐ যৌবন-ঢলঢল সারা দেহে—ঐ মহারাজ যশোবন্তের পুত্র অজিতসিংহ—যোধপুরাধিপতি—

অন্দরের দিকে যেতে যেতে লায়লী ভাবে—ঐ অজিতসিংহকে ধ্বংস করবার জন্যই তার দাদু বাদশাহ আলমগীরের এত প্রচেষ্টা দীর্ঘ দিন ধরে—এত যুদ্ধ-বিগ্রহ এত চক্রান্ত এত ছলনা—

পরিচারিকাকে শরবতের আদেশ দিয়ে এসে মনের দুর্দমনীয় পিপাসাকে নিবৃত্ত না করতে পেরে লায়লী পিতার ঘরের একটি বাতায়নের আড়ালে নিঃশব্দে দাঁড়ায় এসে পুনরায়। লোভী মন কোনমতেই যেন বারণ মানে না। পাল্লার ফাঁক দিয়ে সতৃষ্ণনয়নে তাকায় ভিতরে। ঐ তো উপবিষ্ট সেই তরুণ যুবক। অজিতসিংহ—

ভিতরে তখন কথা হচ্ছিল আব্বাজানের সঙ্গে দুর্গাদাসের। কিন্তু শাহজাদা—দুর্গাদাস বলছিল, সম্রাটের সঙ্গে আমাদের সন্ধির শর্তানুযায়ী ইতিপূর্বেই আপনার দিল্লীতে ফিরে যাবার কথা—

তা জানি সর্দার কিন্তু—

আমি আপনার সংকোচের কারণ যে বুঝি না শাহজাদা তা নয়—কিন্তু সম্রাট আবার পত্র প্রেরণ করেছেন, অবিলম্বে আপনাকে ও আপনার পরিবারবর্গকে দিল্লীতে পাঠিয়ে দেবার জন্য।

শাহজাদা একটা দীর্ঘশ্বাস রোধ করে বলে, জানি সর্দার, আমাকে লালকিল্লায় ফিরে যেতেই হবে আর সেখানে ফিরে যাওয়ার কি যে অর্থ তাও আমি জানি।

শাহজাদা—

যাক্—সে জন্য দুঃখ করে কোন লাভ নেই—আল্লাহ্‌র ইচ্ছা পূর্ণ হবেই—ভবিতব্যকে রোধ করি সাধ্য কি।

শুনুন শাহজাদা, আপনার যদি অনিচ্ছা থাকে তো সম্রাটের আক্রোশকে আমি

ভয় করি না—আপনি এখানেই থাকুন—

না সর্দার, আপনি ব্যবস্থা করুন আমি যাবো—কেবল একটা কথা—

বলুন—

লায়লী—আমার মাতৃহারা কন্যা আদরিণী লায়লী—তাকে আমি নিয়ে যাবো না সঙ্গে করে।

বেশ তো শাহজাদা—আমার কন্যা নেই—মা আমার কাছে—যতদিন খুশি তার ও আপনার,—কন্যারূপেই থাকবে—এবং তার সকল দায়িত্ব আমি সানন্দে বহন করবো—

সর্দার, সত্যি বলছেন—আকবরের যেন বিশ্বাস হতে চায় না কথাটা।

সত্যি বলছি শাহজাদা—প্রাণ থাকতে কারো সাধ্য নেই, দুর্গাদাসের আশ্রয় থেকে লায়লী মাকে আমার ছিনিয়ে নিয়ে যায়—তার এতটুকু অসম্মান করে।

আঃ, আপনি আমায় নিশ্চিন্ত করলেন দুর্গাদাস সর্দার—কিন্তু মহারাজ—

অজিতসিংহ সঙ্গে সঙ্গে বলে ওঠে, নিশ্চিন্ত থাকুন শাহজাদা, আপনার কন্যা আমাদের দুর্গপ্রাসাদেই থাকবেন রুম্ভার তত্ত্বাবধানে—সংযুক্তার সখী সঙ্গিনী হয়ে।

আঃ—তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়ায় শাহজাদা—অজিতসিংহের হাত দুটি ধরে বলে, দোস্ত, যদি দিন আসে আকবরের তো কথা দিচ্ছি আপনার এই বদান্যতার এই উপকারের এই সহৃদয়তার প্রতিদান দিতে এতটুকু ত্রুটি করবে না সে সেদিন—

আকবরের গলা দিয়ে আর স্বর বের হয় না—অশ্রুতে গলার স্বর রুদ্ধ হয়ে আসে। অজিতসিংহ আকবরের ধৃত হাতটি আরো দৃঢ় করে নিজের হাতের মুঠোর মধ্যে ধরে।

॥ ২ ॥

লায়লী দুর্গপ্রাসাদে স্থান পেল—

অজিতসিংহই তাকে রুম্ভার হাতে তুলে দিল। তার স্থান হলো রুম্ভার নির্দেশে তারই প্রকোষ্ঠের পাশের প্রকোষ্ঠে—যেখানে সংযুক্তা থাকত তার সংলগ্ন প্রকোষ্ঠে। এবং দুর্গপ্রাসাদে আসবার কয়দিন পরেই আবার সাক্ষাৎ হলো অজিতসিংহের সঙ্গে লায়লীর।

দ্বিপ্রহরে লায়লী নিজ প্রকোষ্ঠে বসে আপনমনে বীণ বাজাচ্ছিল। প্রকোষ্ঠের দরজা খোলাই ছিল। কখন যে সেই দরজাপথে স্বয়ং অজিতসিংহ সেই প্রকোষ্ঠের সামনে দিয়ে যেতে যেতে বীণের ঝংকারে আকৃষ্ট হয়ে ঐ প্রকোষ্ঠের মধ্যে এসে প্রবেশ করেছে, বীণবাদনে আত্মমগ্ন লায়লী জানতেও পারেনি।

বীণ বাজানো শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই লায়লী চমকে ওঠে অজিতসিংহের কণ্ঠস্বরে: বাঃ, চমৎকার—অপূর্ব আপনার বীণবাদন শাহজাদী—

কে—একি মহারাজ! নত হয়ে সসম্ভ্রমে তখুনি উঠে দাঁড়িয়ে কুর্নিশ জানায় লায়লী অজিতসিংহকে।

সুলতানী, সত্যিই অপূর্ব আপনার বীণবাদন—পুনরুচ্চারণ করে কথাটা অজিতসিংহ।

প্রশংসমান দৃষ্টিতে শাহজাদীর লজ্জারক্তিম মুখখানির দিকে তাকিয়ে কথাগুলো বলে অজিতসিংহ।

মহারাজের অশেষ মহানুভবতা—মৃদু কণ্ঠে বলে লায়লী।

সত্যিই এমন বীণবাদন জীবনে আজো আমি শুনিনি—আপনার বীণবাদন শুনে কি মনে হচ্ছিল জানেন শাহজাদী?

মৃদু কণ্ঠে এবার বলে লায়লী, লজ্জা দেবেন না মহারাজ ঐভাবে আপনি বলে—আমি আপনার চাইতে বয়সেই কেবল ছোট নয়, মর্যাদায় গৌরবে সব দিক দিয়েই তো ছোট। মহারাজ অনুগ্রহ করে আমাকে 'তুমি' বলেই সম্বোধন করবেন—

তাই হবে সুলতানী।

আমায় আপনি লায়লী বলে ডাকবেন। সবাই আমাকে লায়লী বলেই ডাকে।

চমৎকার নামটি তো তোমার।

ওটা আমার আব্বাজানের দেওয়া প্রিয় ডাক নাম।

তোমার আব্বাজান নিশ্চয়ই কবিতা লেখেন, তাই না লায়লী?

মহারাজের অনুমান মিথ্যা নয়—আব্বাজান অনেক ফারসী বয়েৎ লিখেছেন, মুখে মুখেও রচনা করতে পারেন।

সত্যি—

শুধু তাই নয় মহারাজ আমার বীণবাদন শিক্ষাও আমার আব্বাজানের কাছ থেকে। কিন্তু আপনি দাঁড়িয়ে রয়েছেন মহারাজ, উপবেশন করবেন না?

মৃদু হেসে অজিত বলে, তুমি তো আমাকে বসতে বলনি লায়লী।

আমার ত্রুটি হয়েছে মহারাজ, ক্ষমা করবেন—বলতে বলতে একটি ছোট পশমের নরম আসন গালিচার ওপরে এনে বিছিয়ে দেয় লায়লী অজিতসিংহের সামনে সসম্ভ্রমে।

অজিত উপবেশন করে লায়লীর দেওয়া আসনে।

বসো লায়লী, তুমিও বসো—অজিত বলে।

অজিতের স্বল্প দূরে ভূতলে বিস্তৃত গালিচার ওপরেই হাটু মুড়ে কুণ্ঠার সঙ্গে বসল লায়লী।

লজ্জানত দৃষ্টি।

মুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে চেয়ে দেখে অজিত শ্যামলী নবযৌবনা লাবণ্যে ঢলঢল কমনীয় লজ্জারক্তিম লায়লীর মুখখানির দিকে।

লায়লী—

মহারাজ—

না লায়লী মহারাজ নয়—বলো অজিত—কেবল অজিত বলেই তুমি আমায় ডাকবে আজ থেকে—তুমি বলে আমার মত সম্বোধন করবে—

ভীরু দৃষ্টি তুলে তাকায় লায়লী অজিতের মুখের দিকে।

চার চোখে মিলন হয়। এক চোখে লজ্জা এক চোখে সম্ভ্রম, এক চোখে বিস্ময় এক চোখে অনুরাগ! বুকের ভিতরটা কাঁপতে থাকে লায়লীর। ভীরু কপোতীর মত কাঁপতে থাকে অনুরাগে লজ্জায় ভয়ে।

বড্ড পিপাসা পেয়েছে লায়লী—

মহারাজ—

আবার মহারাজ—বল অজিত, বল তুমি—বল—

কিন্তু আমি—

কি তুমি—বল, থামলে কেন—'তুমি' বলতে পারছ না বুঝি?

না—তা নয়—

তবে—

আমার হাতের পানীয়—আমি মুসলমান।

ওঃ এই কথা—আমি ঐ সব ধর্ম সংস্কার মানি না লায়লী—যাও—নিয়ে এসো জল।

লায়লী উঠে গেল এবং কিছুক্ষণ বাদে একটি শ্বেতপাথরের পাত্রে ঠাণ্ডা শরবত এনে দিল অজিতকে।

অজিত হাত বাড়িয়ে শরবতের পাত্রটা নেয়—পরস্পরের আঙুলে ছোঁয়া লাগে।

আবার শিহরণ মাথা থেকে পা পর্যন্ত।

আবার সেই বুকের মধ্যে ভীরু কপোতীর কাঁপুনি।

আঃ, ভারি চমৎকার তো শরবতটা—কিসের শরবত লায়লী?

আনারসের শরবত—

মৃদু কণ্ঠে বলে লায়লী।

নিঃশেষিত শরবতের গ্লাসটা রাখতে রাখতে অজিতসিংহ বলে, তুমি কিন্তু অন্যায় করলে লায়লী—

অজিতের কণ্ঠস্বরে যেন চমকে ওঠে লায়লী। ভীরু দৃষ্টিতে অজিতের মুখের দিকে তাকায়—কাঁপা গলায় বলে, অন্যায় করেছি—

হুঁ—খুব বেশী রকম অন্যায় করেছো।

পূর্ববৎ ইচ্ছাকৃত গম্ভীর কণ্ঠে বলে কথাটা অজিতসিংহ।

মহারাজ—

তুমি আমার মনে লোভের আগুন জ্বালিয়ে দিলে—অন্যায় নয়—

লোভের আগুন—ভীরু দৃষ্টিতে কথাটা বলে লায়লী অজিতের মুখের দিকে তাকায়। সে তখনো কিছু বুঝতে পারেনি। সরল মন তার ভয়ে কাঁপছে।

হ্যাঁ—লোভের আগুন—এবার থেকে ঘন ঘন তোমার কক্ষে আমায় আসতে হবে ঐ শরবত পানের লোভে আর তোমার বীণবাদন শ্রবণের লোভে—

এতক্ষণে হেসে ফেলে লায়লী।

হাসছো যে লায়লী?

লায়লী সলজ্জভাবে হাসতে হাসতে মুখটা নীচু করে। সেই সলজ্জ রক্তিম মুখখানির দিকে চেয়ে হঠাৎ যেন অজিতের বুকে নতুন এক আগুন জ্বলে ওঠে।

অজিত স্থান কাল পাত্র উচিত অনুচিত সব কিছু বিস্মৃত হয়—সহসা হাত বাড়িয়ে লায়লীর আনত চিবুকখানি দু আঙ্গুলে স্পর্শ করে গাঢ় কণ্ঠে ডাকে—লায়লী—

লায়লীর দুটি চক্ষু মুদ্রিত তখন—অপরাজিতার মত ওষ্ঠ দুটি মৃদু মৃদু কাঁপছে।

লায়লী—সত্যি তুমি সুন্দর—ভারী সুন্দর—

লায়লী বুঝি আর দাঁড়াতে পারে না। অজিতসিংহের দ্বিতীয়বারের স্পর্শে সমস্ত দেহ তখন তার অবশ শিথিল—আনন্দের এক অসহ প্লাবনে যেন সমস্ত অনুভূতি কোন্ অতলে তলিয়ে যাচ্ছে।

লায়লী পড়ে যাচ্ছিল, হঠাৎ দু হাত বাড়িয়ে অজিতসিংহ লায়লীকে বুকে টেনে নেয়—কি—কি হলো—লায়লী ?

লায়লীর সমস্ত চেতনা সমস্ত অনুভূতি তখন যেন—উগ্র একটা নেশার ঘোরে যেমন তলিয়ে যায়—তেমনি তলিয়ে যাচ্ছে। কেবল সে তখন বুঝতে পারছে দুটি সবল বাহুর নিশ্চিন্ত আশ্রয়ের মধ্যে সে তখন নিজেকে সঁপে দিয়েছে নিঃস্ব করে পরম নিশ্চয়তায়—চরম সুখে। আর অপূর্ব একটা পুলকানুভূতিতে তার দেহের সমস্ত অণু-পরমাণু রোমাঞ্চিত হচ্ছে।

লায়লী—

মনে হয়েছিল ঐ মুহূর্তটি যেন নিরবধি অনন্তকাল ধরে পরিব্যাপ্ত হয়ে থাকে। ঐ বাহুদুটির আশ্রয়েই যেন তার মৃত্যু ঘটে। তার সমস্ত চেতনা লুপ্ত হয়ে যায় চিরদিনের মত।

লায়লী—কথা বল লায়লী—চোখ মেল—তাকাও—লায়লী—লায়লী—

এমনি মধুক্ষরা ডাক জীবনে আর কখনো শুনেছে কি লায়লী ? কানের ভিতর দিয়ে এমনি করে কি ঐ তিন অক্ষরের নামটি ইতিপূর্বে তার অন্তরে গিয়ে প্রবেশ করেছে আর কোন দিন ?

লায়লী—

উঁ—

চোখ মেলো লায়লী—

চোখ মেলতে পারেনি তবু লায়লী। তারপরই একজোড়া অন্যাভৃপ্ত ওষ্ঠ তার হিমশীতল থরথরকম্পিত ওষ্ঠ দুটি স্পর্শ করেছে। সঙ্গে সঙ্গে সর্বাঙ্গ শিহরিত হয়ে ওঠে লায়লীর বার বার।

লায়লী দুই চক্ষু মেলে তাকায় আরো অনেকক্ষণ পরে। সংবিৎ যেন ফিরে পায়। নিজেকে অজিতের নিবিড় বাহুবন্ধন থেকে মুক্ত করে নিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ায়।

অজিতসিংহেরও বুঝি ততক্ষণে নেশার ঘোর কেটে গিয়েছে। একটু সরে দাঁড়ায় সেও। মৃদু কণ্ঠে বলে, ক্ষমা করো আমায় লায়লী—

লায়লী আর দাঁড়াতে পারেনি। ছুটে পাশের কক্ষে পালিয়েছিল অজিতের সামনে থেকে ঐ মুহূর্তে চোখ বুজে রুদ্ধশ্বাসে।

ছিঃ ছিঃ ছিঃ ছিঃ···হতভাগিনী—এ কি করলি—এ কি করলি—ভুলে গেলি কি করে ও আকাশের সুধা তোর নাগালের বাইরে।

দিন দশেক কারো সঙ্গে কারো দেখা নেই তারপর। কিন্তু মুগ্ধ পতঙ্গের মত অবস্থা তখন তরুণ অজিতসিংহের। তার তারুণ্যের রক্তে তখন বিচিত্র একটা মাদকতার দোলা লেগেছে। বিচিত্র এক নেশার ঘোরে আচ্ছন্ন যেন তখন সে। সতৃষ্ণ তার দুটি নয়ন বার বার দুর্গপ্রাসাদের মধ্যে লায়লীকে খুঁজে বেড়ায়, কিন্তু লায়লীর দর্শন পায় না।

অজিতের মুখেই কথাটা শুনেছিল অতঃপর একদিন লায়লী। লায়লী বলেছিল, কিন্তু ইচ্ছা করলেই তো তুমি আমার কক্ষে আসতে পারতে অজিত।

না তা পারতাম না—অজিত বলেছিল।

পারতে না—কেন?

পারতাম না—তুমি তো জান না অনেক সময় অনেক ছোট্ট সহজ কাজও নিরতিশয় কঠিন হয়ে ওঠে। দুঃসাধ্য মনে হয়—ছোট্ট বাধাটাই তখন অনতিক্রমণীয় মনে হয়—একটু থেমে বলে, তাছাড়া—

কি তাছাড়া?

কেবলই মনে হয়েছে চাচাজীর ও আমার রাঠোরাধিপতির সম্মানিত মেহমান তুমি এই দুর্গপ্রাসাদে—যদি কোনক্রমে তোমার অসম্মান হয়—তোমাকে ছোট করে ফেলি—

অসম্মান!

নয়—

একটা কথা জিজ্ঞাসা করব? হঠাৎ বলে লায়লী।

কি লায়লী?—অজিত লায়লীর মুখের দিকে তাকায়।

রাগ করবে না তো?—লায়লী বলে।

রাগ করবো কেন—

আমি যবনকন্যা বলেই কি—

ছিঃ ছিঃ এখনো তোমার মনের সে অন্ধ ধর্মের সংস্কার যায়নি দেখছি।

কিন্তু—

না লায়লী—সে সংস্কার আমার নেই—তোমার হাত থেকে সেদিন শরবত পান করেই তো তোমাকে বুঝিয়ে দিয়েছি—তাছাড়া তোমাদের বংশে কি পূর্বে আমাদের মেয়েরা বেগম হয়ে যায়নি। তোমাদের হারেমে কি রাজপুতানীরা কেউ আগে বেগম হয়ে যায়নি—বল—জবাব দাও—

লায়লী মাথা নীচু করে নীরব ছিল।

মূর্খ। মূর্খ লায়লী। নচেৎ সেদিন ঐ কথা শুনে অসম্ভবের স্বপ্ন দেখে। চোখ বুজে পরম নিশ্চিন্তে নিজের যথাসর্বস্ব অজিতের হাতের মুঠোর মধ্যে তুলে দেয়।

এ কি করল সে। এ কি করল। কেন সে বুঝতে পারল না অজিতের মনের মধ্যে এতটুকু স্থানও তার জন্য নেই—সবটাই চোখের নেশা মাত্র। ক্ষণিকের একটা নেশা। নিছক যৌবনের মাদকতা মাত্র। অজিতের সমস্ত মন ভরে রয়েছে সংযুক্তা। সুন্দরী—অপরূপ রূপলাবণ্যময়ী বাল্যসঙ্গিনী সংযুক্তাই অজিতের সমস্ত ভালবাসার একচ্ছত্র অধিকারিণী। সেখানে তার এতটুকু স্থানও নেই।

॥ ৩ ॥

রম্ভা কি করবে বুঝতে পারে না।

এ কি সর্বনাশা কথা সে শুনলো।

অজিতের সমস্ত মন জুড়ে রয়েছে সংযুক্তা। সংযুক্তাকে বিবাহ করতে সে স্থিরপ্রতিজ্ঞ। দুর্জয় জেদী অজিতসিংহ। মনে মনে সে যখন স্থির করেছে সংযুক্তাকেই বিবাহ করবে তাকে রোধ করা কঠিন হবে। অজিতের দৃষ্টি থেকে একই প্রাসাদদুর্গে অবস্থান করে সংযুক্তাকে দূরে রাখা তো শুধু দুঃসাধ্যই নয় অসম্ভবও। সেদিক থেকেও চিন্তার কারণ আছে।

কয়েকটা দিন অতঃপর রম্ভা তার কন্যা সংযুক্তাকে সর্বক্ষণ নিজের কক্ষের মধ্যে একপ্রকার বন্দিনী করেই রেখে দিল।

সংযুক্তা বলে, কি ব্যাপার বল তো মা—তুমি কি আমাকে এ ঘর থেকে বের হতেও দেবে না নাকি?

না—কঠিন কণ্ঠে সংযুক্তার দিকে তাকিয়ে বলে রম্ভা।

কিন্তু কেন?

তর্ক করো না সংযুক্তা—যা আমি বলি তাই করো।

দুর্ধর্ষ প্রহরিণী তারা—রাজপুতানী তারাবাঈ। রম্ভার প্রিয় দেহরক্ষিণী তারা—প্রাসাদদুর্গে আসার পর তারাকে সে নিজে বেছে নিয়েছিল নিজের জন্য। তারা সর্বক্ষণ সংযুক্তার কক্ষের দরজায় প্রহরা রয়েছে রম্ভার নির্দেশে।

অজিত তারাবাঈকে রীতিমত ভয় করে। স্ত্রীলোক হলেও আদৌ স্ত্রীলোকের মত চেহারা নয় তারাবাঈয়ের। যেমনি ঘোর কৃষ্ণবর্ণ তেমনি মেদবহুল বিরাট দেহ, একটা পুরুষের মত। দেহের অনুপাতে মাথাটা ছোট—তাতে যেন আরো বীভৎস মনে হয় চেহারাটা। চোখ দুটো বর্তুলাকার এবং ছোট ছোট। নেশায় সর্বক্ষণই প্রায় রক্তবর্ণ হয়ে থাকে।

সে চোখের পাতা যে কখনো পড়ে না। সর্বক্ষণ চেয়েই আছে সামনের দিকে। এবং নারী হলেও অজিত জানে অসাধারণ শক্তি রাখে তারাবাঈ তার দেহে। এবং সে শক্তির পরিচয়ও ইতিপূর্বে সে পেয়েছে। দূর থেকে চেয়ে চেয়ে দেখে অজিত, কাছেপিঠে যায় না তাই বড় একটা সংযুক্তার কক্ষের।

রম্ভা ক্রমশঃ যেন আরো উৎকণ্ঠিতা হয়ে ওঠে অজিতসিংহকে যখন তখন সংযুক্তার কক্ষের দ্বারের সামনে ঘুরঘুর করতে দেখে। এমনি করে চলতে পারে না—চলবেও না বেশীদিন সে স্পষ্টই বুঝতে পারে। সে বা তারা চিরদিন এমনি

করে অজিতসিংহকে ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না।

অতএব অনেক ভেবে চিন্তে রম্ভা দুর্গাদাসেরই শরণাপন্ন হবে স্থির করে। দুর্গাদাসকে দুর্গপ্রাসাদে ডেকে আনলে অন্যের সন্দেহ জাগতে পারে তাই সে স্থির করে নিজেই রাত্রে গোপনে একাকিনী গিয়ে রাঠোর সর্দারের সঙ্গে দেখা করবে।

দুর্গপ্রাসাদ থেকে প্রায় ক্রোশখানেক দূরে সমতল ভূমিতে রাঠোর সর্দারের গৃহ। একটা কালো রেশমী আঙরাখায় সর্বাঙ্গ আবৃত করে রাত্রির মধ্য প্রহরে গোপন পথ দিয়ে দুর্গপ্রাসাদ থেকে বের হয়ে পড়ে রম্ভা দুর্গাদাস সর্দারের উদ্দেশে।

রম্ভার নির্দেশমত তারাবাঈ আগেই প্রাসাদের বাইরে একটি অশ্ব প্রস্তুত করে রেখে দিয়েছিল একজন সৈনিকের হেপাজতে। সেই অশ্বে আরূঢ়া হয়ে রম্ভা দ্রুত অশ্বচালনা করে রাঠোর সর্দারের গৃহের দিকে। দ্রুত অশ্বচালনা করে রম্ভা যখন দুর্গাদাসের কুটিরপ্রান্তে এসে উপস্থিত হলো তখন তার কক্ষে আলো জ্বলছে।

দুর্গাদাসের শয়নকক্ষের বাতায়নপথে সেই আলোর শিখা দেখে রম্ভা মনে মনে আশ্বস্ত হয়—যাক সর্দার তাহলে এখনো জাগ্রত। ঘুমিয়ে পড়েনি। দুর্গাদাস জাগ্রত ছিল। ঘুম ছিল না তার চোখে। রাজ্যের চিন্তায় এবং যে গুরুভার সর্দার মুকুন্দ একদা এক অসহায় শিশুকে তার হাতে তুলে দিয়ে তার মাথায় চাপিয়ে দিয়ে গিয়েছিল, তারপর আর কি চোখে ঘুম থাকে কারো! ছিলও না তার। শয়নে স্বপনে নিদ্রায় জাগরণে সর্বক্ষণ ঐ এক চিন্তাই যেন তাকে কুরে কুরে খাচ্ছিল।

ঔরঙ্গজীব এখনো পুরোপুরিভাবে অজিতসিংহকে যোধপুরাধিপতি বলে মেনে নেয়নি। আর সেই কারণেই দুর্গাদাস আজও আকবর-দুহিতা ঔরঙ্গজীবের পৌত্রী সুলতানী লায়লীকে ফিরিয়ে দেয়নি। ঔরংজীবের যে কতখানি দুর্বলতা আছে তার ঐ পৌত্রীর জন্য সেটা দুর্গাদাসের অজ্ঞাত ছিল না বলেই লায়লীকে সে আজো প্রত্যর্পণ করেনি।

তাছাড়া আরো একটা সংবাদ যেটা বিশেষভাবেই কয়েক দিন থেকে শ্রবণপথে আসা অবধি সর্দারকে বিচলিত করেছে—ঔরংজীব এখনো তাকে পর্যুদস্ত করবার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। এমন কি সুযোগ পেলে তাকে গুপ্তঘাতকের দ্বারা হত্যা করতেও কুণ্ঠিত হবে না ঔরঙ্গজীব। দুর্গাদাস যে আজ ঔরংজীবের সবচাইতে বড় শত্রু তাই নয়, দুর্গাদাসের বাঁচা ও মরার ওপরেই তার মানসম্মান নির্ভর করছে। এতবড় পরাজয় বুঝি যবন সম্রাটের জীবনে আজ পর্যন্ত একটা ঘটেনি।

এ কেবল রাজপুতানায় মাড়বারের উপর তার আধিপত্য-বিস্তারই নয়—ঔরংজীবের সাম্রাজ্য ও আধিপত্যও টিকে থাকার প্রশ্নটা যেন ওর সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে রয়েছে। তাই এক মুহূর্তও দুর্গাদাস নিশ্চিন্ত থাকতে পারছে না।

তার বশংবদ অশেষ প্রিয়পাত্র যোধপুরের ঐ শয়তান হাকিম সুজৈৎকে গোপনে নাকি আবার পত্র দিয়েছে ঔরংজীব। গুপ্তচরমুখে কথাটা কয়দিন হলো দুর্গাদাসের কর্ণগোচর হয়েছে।

ঔরংজীব নাকি লিখেছে—যে কোন উপায়ে হোক এবং যত দুঃসাধ্যই হোক সুজৈৎ, আমার—তোমার সম্রাটের সম্মান, আলমগীরের সম্মান তোমাকে রাখতেই হবে। ঐ রাজস্থানের মূষিক রাঠোর সর্দার—ওকে যেমন করে হোক এ দুনিয়া থেকে সরিয়ে ফেলতেই হবে। আর তা যদি পার যোধপুরের সিংহাসনে বসবে তুমি জেনো। ঘরের মধ্যে একাকী বিনিদ্র পায়চারি করছিল দুর্গাদাস। কক্ষদ্বারের প্রহরী একটি সাংকেতিক স্বর্ণাঙ্গুরীয় এনে প্রভুর সামনে ধরল—সর্দার—

কি খবর জেৎ সিং?

একজন নারী আপনার দর্শনপ্রার্থী।

এত রাত্রে কে আবার নারী দর্শনপ্রার্থী।

তা জানি না প্রভু—তবে এই নিদর্শন অঙ্গুরীয় আপনাকে পেশ করতে বলেছে—

স্বর্ণাঙ্গুরীয়?

হ্যাঁ।

দেখি।

কক্ষের প্রদীপের আলোয় আঙ্গুরীয় দেখেই চমকে ওঠে দুর্গাদাস, তাড়াতাড়ি বলে, যাও প্রহরী• শীঘ্র এই কক্ষেই তাকে নিয়ে এসো—

আশ্চর্য। এই গভীর নিশীথে রম্ভার এমন কি প্রয়োজন হলো তার কাছে আসবার। দুর্গাদাস চিন্তিত হয়ে পড়ে।

একটু পরেই সর্বাঙ্গ কালো আঙরাখায় আবৃত রম্ভা এসে কক্ষে প্রবেশ করতেই দুর্গাদাস প্রহরীকে বলে, তুমি এখন যেতে পার জেৎ সিং—দরজাটা টেনে দিয়ে যেও—

যে আজ্ঞে প্রভু—জেৎ সিং যেতে উদ্যত হয়।

দুর্গাদাস তাকে আবার ডাকে, শোন—যতক্ষণ আমরা এ কক্ষে থাকবো এদিকে যেন কেউ না আসে।

যে আজ্ঞে—জেৎ সিং চলে গেল।

তারপর রম্ভা—বহিন—কি ব্যাপার? এই মধ্যরাত্রে? উৎকণ্ঠিতভাবে দুর্গাদাস প্রশ্ন করে রম্ভাকে।

রম্ভা তার গুণ্ঠন মোচন করে সর্দারের দিকে তাকাল। বললে, অনন্যোপায় হয়েই আমাকে এই মধ্যরাত্রে তোমার সঙ্গে দেখা করবার জন্য ছুটে আসতে হয়েছে

অনন্যোপায় হয়ে।

হ্যাঁ—

কিন্তু ব্যাপারটা কি?

অজিতসিংহ সম্পর্কে আমি অত্যন্ত চিন্তিত হয়ে পড়েছি।

মহারাজ অজিতসিংহ ?

হ্যাঁ।

কি হলো তার আবার হঠাৎ ?

ব্যাপারটা যে এমনি করে এতদূর পর্যন্ত গড়াবে তা স্বপ্নেও আমি ভাবিনি ভাই—ভাই-বোনের মত মিশেছে সেই শিশুকাল থেকে—

কার কথা বলছো ? কি বলছো বহিন।

বলছি অজিত আর সংযুক্তার কথা।

খুলে বল—স্পষ্ট করে বল।

অজিত সংযুক্তাকে বিবাহ করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

বল কি বহিন।

হ্যাঁ—সে নাকি দু'একদিনের মধ্যেই রাজ্যের সমস্ত সামন্ত সর্দারদের আহ্বান করে তাদের সম্মুখে তার সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা করবে।

না, না—এ তুমি কি বলছো রম্ভা—বহিন—অজিত এমন নির্লজ্জ হবে।

তাই হয়েছে ভাই।

আমার যে কেমন সব গুলিয়ে যাচ্ছে বহিন—

গুলিয়ে আমারও গিয়েছে ভাই। শিশুকাল থেকে যাকে সে নিজের বোনের মত দেখে এসেছে শেষ পর্যন্ত তাকে যে সে ঐ চোখে দেখবে এ যে আমি কল্পনাতেও কোন দিন আনতে পারিনি।

তাই তো—এ যে দেখছি সত্যিই বড় দুশ্চিন্তার কথা হলো—আত্মগতভাবে কথাগুলো বলে একটু চিন্তা করে তারপর বলে, রম্ভা—বহিন—এ কারো দোষ নয়—এ হচ্ছে বয়েসের দোষ—বয়েসের—যৌবনের স্বাভাবিক ধর্ম। যাক সে জন্য আর চিন্তা করে কি হবে—এখন সর্বনাশ যাতে করে না হয় সেইটে আমাদের দেখতে হবে—অন্য কোন সম্পর্ক হলেও কথা ছিল, এ যে একই পিতার ঔরসজাত ভাই বোন—

কথাগুলো বলতে বলতে পায়চারি করতে থাকে দুর্গাদাস। ভ্রূযুগল তার কুঞ্চিত হয়ে ওঠে।

॥ ৪ ॥

শোন বহিন—দুর্গাদাস রম্ভার মুখের দিকে তাকাল কথাটা বলে পায়চারি থামিয়ে অনেকক্ষণ পরে।

বল—রম্ভা তাকায় দুর্গাদাসের মুখের দিকে।

ওদের পরস্পরের পরিচয় আর বোধহয় গোপন করে রাখা যুক্তিসংগত হবে না। তুমি না পার, আমিই বরং একদিন ওদের ডেকে সব কথা—

না, না—কি বলছো তুমি, ক্ষেপে গেলে নাকি সর্দার।

কিন্তু রম্ভা, তুমি বুঝতে পারছো না বহিন—ব্যাপারটা যা গড়িয়েছে এখন—

ভুলে যেও না ভাই একথা শুধু অজিতকে বলা নয়—অজিতের কাছ থেকে হয়ত সমস্ত যোধপুরবাসী জানতে পারবে—তখন যে অবিশ্বাস আর ধিক্কারের গরল ফেনিয়ে উঠবে চারিদিকে, তাকে তুমি চাপা দেবে কি দিয়ে ?

রম্ভা—

হ্যাঁ—বিশ্বাস তো কেউ করবেই না—ঐ সঙ্গে, আমাদের মা ও মেয়ের মাথা হেঁট হয় হোক—কিন্তু মহারাজের নামটাও যে কলঙ্কিত হবে। না, তা আমি প্রাণ থাকতে হতে দেবো না।

তাহলে— ?

কি তাহলে ?

অজিতকে তুমি ঠেকাবে কি করে ?

একটা কথা বলবো ?

বল।

তুমি বরং আমাদের অন্যত্র কোথাও যাবার ব্যবস্থা করে দাও।

তাতেই কি তুমি অজিতের দৃষ্টি থেকে তোমার মেয়েকে আড়াল করতে পারবে বহিন ? না, তাতে কোন ফল হবে না—বরং তার জিদ আরো চেপে বসবে বলেই আমার মনে হয়।

তবে আমি কি করবো তুমিই বল।

শোন বহিন—ভগবানই হয়ত এ সমস্যার একটা মীমাংসা করে দেবেন—আর সেরকম সংবাদও আমি পেয়েছি।

কিসের সংবাদ ?

উদয়পুরের মহারানার কনিষ্ঠ ভ্রাতা গর্জসিংহের একটি অপরূপ রূপলাবণ্যবতী কন্যা আছে শুনেছি—হীরাবাঈ—

তাতে কি হয়েছে ?—সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকায় রম্ভা দুর্গাদাসের মুখের দিকে। কথাটার অর্থ সে ঠিক উপলব্ধি করতে পারেনি তখনো।

দুর্গাদাস মৃদু হেসে বলে, আমি দূতমুখে গতকালই সংবাদ পেয়েছি গর্জসিংহ-দুহিতা সেই হীরাবাঈয়ের সঙ্গে আমাদের অজিতের বিবাহ প্রস্তাব করে রানা নাকি মুক্তামণ্ডিত নারিকেল এবং মূল্যবান্ গর্জনশোভিত দুটি হাতি ও দশটি অশ্ব প্রেরণ করেছেন—সংবাদবাহী যোধপুরের মধ্যপথে—

তুমি বলছো—

হ্যাঁ—সে কন্যার রূপও নাকি অসাধারণ—অজিতের যদি তার সঙ্গে বিবাহ হয়, সে হয়ত সংযুক্তার কথা ভুলে যাবে। যৌবনের চঞ্চল মন—

তুমি বলছো বটে কিন্তু আমার ধারণা অজিত এত সহজে সংযুক্তাকে ভুলে যাবে না। তার দু চোখের দৃষ্টিতে যে আগুন আমি দেখেছি সে রাত্রে—

কি বলছো বহিন।

হ্যাঁ দাদা—মেয়েমানুষ আমি—পুরুষের চোখের সে দৃষ্টি সে আগুনকে চিনতে আমার ভুল হয়নি—ভুল হতে পারে না।

ঠিক আছে—দেখাই যাক না অজিত কতদূর অগ্রসর হয়—তুমি কেবল সর্বদা

লক্ষ্য রাখবে যাতে করে সংযুক্তার ধারে-কাছেও না আসবার সুযোগ পায় ও—আচ্ছা একটা কথা—

কি ?

সংযুক্তার মনের খবর কিছু তুমি জান ?

তুমি তো জান মেয়ে আমার অত্যন্ত চাপা প্রকৃতির—বুক ফাটলেও মুখ খুলবে না।

তাহলেও—

আকর্ষণ অজিতের উপরে থাকাটা তো স্বাভাবিক। আর সেইখানেই তো আমার ভয়—তারপর একটু থেমে আবার বলে রম্ভা, জ্ঞান হওয়া থেকে এই সেদিন পর্যন্ত দুজনে একত্রে থেকেছে খেলেছে আহার করেছে—যদিও সেরকম কিছু আজ পর্যন্ত আমার চোখে পড়েছে বলে মনে পড়ে না তবু—

অন্যায় হয়ে গিয়েছে বহিন। দুটিকে ঐভাবে সর্বদা একত্রে থাকতে দেওয়াই তোমার উচিত হয়নি।

কিন্তু তাছাড়া আর উপায়ই বা ছিল কি বল ? তুমি তো সবই জান—

তাহলেও ছোটবেলা থেকেই ওরা যদি পরস্পরের সঙ্গে পরস্পরের সম্পর্কটা জানতে পারত তবে হয়ত আজকের এই দুরূহ প্রশ্নটা আমাদের সামনে দেখা দিত না—যাক্ যা হবার হয়েছে—এখন আর ভেবে কি হবে।

কিন্তু এখন কি করণীয় তাই বল ?

বললাম তো—বিবাহের যে প্রস্তাব আসছে আপাততঃ সেই প্রস্তাবকে মেনে নিয়েই যত শীঘ্র সম্ভব বিবাহটা দিয়ে ফেলতে হবে—তারপর অজিতের মনের অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করা যাবে। কিন্তু আর তুমি দেরি করো না বহিন—রাত প্রায় শেষ হয়ে এলো—তুমি প্রাসাদদুর্গে ফিরে যাও—আর একটা কথা—

বল—

সংযুক্তাকে তুমি সর্বক্ষণ যথাসম্ভব নিশ্চয়ই চোখে চোখে রাখবে যাতে করে সংযুক্তার সঙ্গে ইচ্ছামত অজিত মেলামেশা না করতে পারে—অবিশ্যি অজিত যেন সন্দেহ না করে কোনমতে।

আচ্ছা, এক কাজ করলে হয় না—হঠাৎ রম্ভা কথাটা বলে দুর্গাদাসের মুখের দিকে তাকায়।

কি ?—দুর্গাদাস সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকাল রম্ভার দিকে।

কিছুদিনের জন্য যদি সংযুক্তাকে সরিয়ে দিই দুর্গপ্রাসাদ থেকে—

কোথায় সরিয়ে দেবে ?—প্রশ্ন করে দুর্গাদাস।

ধর তোমার এখানেই যদি তাকে কিছুদিনের জন্য কালই পাঠিয়ে দিই আমি ?

মন্দ মতলব নয়—তা পাঠাতে পারো, তবে তাতে করে কি অজিতের চোখকে এড়াতে পারবে ?

পারবো না হয়ত, তবু আমার মনে হচ্ছে সেটাই সবচাইতে ভাল হবে আপাততঃ।

তাহলে তুমি কাল—

কাল আর নয়—শুভস্য শীঘ্রম্—আজই রাত্রি শেষ হবার পূর্বেই তাকে এখানে নিয়ে আসতে হবে—তুমি সেই ব্যবস্থাই কর।

কিন্তু—

চল তুমি আমার সঙ্গে—দুর্গপ্রাসাদের গোপন সুড়ঙ্গপথ দিয়ে আমি সংযুক্তাকে বের করে আনবো—তুমি তোমার ঘোড়ায় চাপিয়ে সোজা এখানে নিয়ে আসবে—চল—আজ রাত পোহাবার আগে কাজটা আমাদের শেষ করতে হবে।

বেশ—তাই হোক—চল। দুর্গাদাস অবিলম্বে প্রস্তুত হয়ে নেয়।

॥ ৫ ॥

আর দেরি করে না ওরা। সঙ্গে সঙ্গে দুর্গপ্রাসাদের উদ্দেশে বের হয়ে পড়ে।

রাত্রির শেষ প্রহরে দুটি অশ্ব পাহাড়ী চড়াই-উতরাই বন্ধুর পথ ধরে আবছা আলো-ছায়ার মধ্যে দুর্গপ্রাসাদের দিকে ছুটতে থাকে নক্ষত্রবেগে যেন। রাত্রি শেষ হওয়ার আগেই সংযুক্তাকে দুর্গাদাসের গৃহে পৌঁছে দিতে হবে। আশ্চর্য—একবারও আগে মনে হয়নি কথাটা রম্ভার কেন।

অজিতের দৃষ্টি থেকে সংযুক্তাকে সরিয়ে নেবার যে এমন একটা সহজ উপায় আছে—সংযুক্তাকে রাখবার এমন যে একটা নিশ্চিন্ত নিরাপদ স্থান আছে একবারও কথাটা রম্ভার মনের মধ্যে কোথাও উদয় হয়নি।

যাক এবার রম্ভা নিশ্চিন্ত হতে পারবে। বড় দুর্ভাবনা হয়েছিল সংযুক্তাকে নিয়ে।

দুর্গপ্রাকারের বাইরে একটা বৃক্ষের নীচে অন্ধকারে দুর্গাদাসকে অপেক্ষা করতে বলে গোপন সুড়ঙ্গপথে রম্ভা দুর্গের মধ্যে প্রবেশ করে।

সংযুক্তার শেষ রাত্রের গাঢ় ঘুম সহজে ভাঙতে চায় না। দু'তিনবার ডাকবার পর সংযুক্তা উঠে বসে।

কক্ষের মৃদু আলোয় শয্যার সামনে জননীকে দণ্ডায়মান দেখে ঐ সময় সংযুক্তা একটু বিস্মিতই হয়। চোখের পাতায় তখনো ঘুম জড়িয়ে আছে।

কে—মা—ঘুমজড়ানো শিথিল কণ্ঠে শুধায়।

হ্যাঁ—ওঠ তাড়াতাড়ি—এখুনি আমাদের বেরুতে হবে।

সেকি!

হ্যাঁ—তাড়াতাড়ি কর—এক জায়গায় যেতে হবে।

কোথায় যাবো?

পরে শুনবি—এখন ওঠ—তাড়াতাড়ি আছে—চল্।

সামান্য কিছু জামা-কাপড় একটা পুঁটলিতে রম্ভাই বেঁধে দেয়, তারপর একটা চাদরে সংযুক্তাকে ভলে করে ঢেকে দেয়।

সংযুক্তা একটু বিস্ময়ের সঙ্গেই নিঃশব্দে মায়ের কার্যকলাপ নিরীক্ষণ করতে থাকে।

চল্‌।

কিন্তু কোথায় যাচ্ছি মা আমরা?

চল্‌ না—যেতে যেতে বলবোখন—

রম্ভা কন্যার হাত ধরে অন্ধকার সুড়ঙ্গপথে অগ্রসর হয়। এখানে এই দুর্গপ্রাসাদে আসা অবধি সংযুক্তা বাইরে বেরুন দূরে থাক, দুর্গপ্রাসাদেরই সব কিছু চেনে না এখনো বা এখনো পর্যন্ত দেখেনি। দেখবার বা জানবার কোন রকম সুযোগও হয়নি—

বস্তুতঃ রম্ভা সংযুক্তাকে তার কক্ষ থেকেই বড় একটা বেরুতে দিত না।

সযত্নে যেন আড়াল করে রাখত সর্বদা।

বড্ড অন্ধকার মা—সুড়ঙ্গপথে যেতে যেতে একসময় সংযুক্তা বলে।

আয়—আমার হাতটা শক্ত করে ধরে থাক—আশ্বাস দেয় মেয়েকে রম্ভা।

মায়ের হাতটা সংযুক্তা শক্ত করে চেপে ধরে অন্ধকারেই।

কেমন যেন দম বন্ধ হয়ে আসছে মা, সংযুক্তা আবার বলে ফিসফিস করে অন্ধকারে চলতে চলতে মায়ের হাত ধরে।

আর বেশী পথ নেই—রম্ভা জবাব দেয়।

আরো কিছুটা এগোবার পরই একটা ঠাণ্ডা রাত্রিশেষের হাওয়ার মৃদু ঝাপটা সংযুক্তার চোখে-মুখে এসে লাগল।

তারপর দুঃসহ অন্ধকারটা যেন ফিকে হয়ে গেল ক্রমশঃ অল্পে অল্পে।

সুড়ঙ্গ শেষ হয়েছে।

ঐ তো মাথার ওপরে নক্ষত্রখচিত বৈশাখের রাত্রিশেষের আকাশ।

বহিন—

দুর্গাদাস চাপা কণ্ঠে প্রশ্ন করে বৃক্ষের কাছ বরাবর ওরা পৌঁছাতেই।

এই যে এসেছি আমরা—রম্ভা জবাব দেয়।

এসো মা—দুর্গাদাস মৃদু কণ্ঠে আহ্বান জানায় সংযুক্তাকে।

যা সংযুক্তা—উনি তোকে যেখানে নিয়ে যাবেন সেখানে যাবি। উনি দুর্গাদাস সর্দার—তোর মামাজী—

মামাজী।

হ্যাঁ—যা আর দেরি করিস না।

এসো মা—দুর্গাদাস স্নেহভরা কণ্ঠে ডাকে সংযুক্তাকে।

দুর্গাদাস অশ্বের ওপরে আরোহণ করে হাতটা বাড়িয়ে দেয় সংযুক্তার দিকে, আয় মা। হাত ধরে অবলীলাক্রমে দুর্গাদাস তার বলিষ্ঠ বাহু দিয়ে সংযুক্তাকে নিজের অশ্বের ওপরে তুলে নেয়।

মা—সংযুক্তা যেন শেষবারের মত কি বলবার চেষ্টা করে। অদ্যাবধি সে কখনো মায়ের অবাধ্য হয়নি। রম্ভার কোন নির্দেশই সে অমান্য করেনি। তবু কেমন যেন একটা অজ্ঞাত ভয়ে তার বুকের ভিতরটা কাঁপছিল ঐ সময়। ব্যাপারটা

গোড়া থেকে কিছুই যেন তার বোধগম্য হচ্ছিল না। যেমনি দুর্বোধ্য তেমনি হেঁয়ালিভরা। তার মা তাকে ঘুম থেকে তুলে এমন গোপন রহস্যজনকভাবে দুর্গাদাস মামাজীর সঙ্গে কোথায় পাঠাচ্ছে? আর কেনই বা পাঠাচ্ছে?

রম্ভা আবারও বলে, মামাজীর কথনো অবাধ্য হোস না সংযুক্তা। আমি কাল পরশুই তোর সঙ্গে দেখা করে তোকে সব বুঝিয়ে বলব।

দুর্গাদাস অশ্বের রাশ ধরে ঈষৎ আকর্ষণ করতেই অশ্ব চলতে শুরু করে।

পূবের আকাশে তখন প্রথম ভোরের আলোর পরশ লেগেছে লাজরক্তিম। পথপার্শ্বে ডালে ডালে পাখীদের ঘুম ভাঙতে শুরু করেছে রাত্রিশেষের হাওয়ায়। ভোররাত্রির আবছা আলো-আঁধারে অশ্বপৃষ্ঠে দুর্গাদাস ও সংযুক্তা যেন মিলিয়ে গেল। সহসা সেই দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে রম্ভার দু চোখের কোলে জল নেমে আসে। দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে যায়। অশ্বখুরধ্বনি দূরদূরান্তে ক্রমশঃ মিলিয়ে যায়।

ব্যাপারটা যে এত তাড়াতাড়ি অজিত জেনে ফেলবে রম্ভা বুঝতে পারেনি। সে যেন প্রস্তুত হবারও সময় পেল না।

পরের দিন দ্বিপ্রহরের দিকেই অজিত এসে রম্ভার কক্ষে প্রবেশ করল অশান্তভাবে।

রম্ভা একাকী কক্ষের মধ্যে একটা নাতিউচ্চ আসনের ওপরে বসে একটা কাঁচুলির উপর জরির ফুল তুলছিল। পদশব্দেই বুঝতে পারে রম্ভা কার পদশব্দ। কে ঐ মুহূর্তে ঐ কক্ষমধ্যে এসে প্রবেশ করেছে। ও পদশব্দ যে রম্ভার অত্যন্ত পরিচিত। বুকটার মধ্যে কাঁপুনি শুরু হয়ে যায় রম্ভার। তবু কিন্তু সে মুখ তোলে না বা সামনের দিকে তাকায় না। যেমন সেলাই করছিল তেমনি সেলাই করে চলে যেন আপনমনে।

মা—

মুখ তোলে না তথাপি রম্ভা এবং হাতের কাজও থামায় না। মুখ নীচু করেই জবাব দেয়, কী?

সংযুক্তা কোথায়? অসহিষ্ণু ও কর্কশ কণ্ঠস্বর অজিতের।

রম্ভা একেবারে নিশ্চুপ—যেন বোবা।

জবাব দিচ্ছ না কেন আমার কথার—শুনতে পাচ্ছ না?

পাচ্ছি—শান্ত কণ্ঠে এবারে জবাব দেয় রম্ভা।

তবে জবাব দিচ্ছ না কেন আমার কথার?

কিসের জবাব চাও?

সংযুক্তা কোথায়?

সংযুক্তা—

হ্যাঁ হ্যাঁ—কোথায় সে—কোথায় তাকে সরিয়েছো—আমি জানি এ তোমারই কাজ—বল কোথায় তাকে সরিয়েছো?

তাকে তুমি ভুলে যাও অজিত।

শান্ত কণ্ঠে একটা জরির সুতো দাঁতে কাটতে কাটতে বলে রম্ভা।

ভুলে যাবো।

হ্যাঁ—শোন অজিত—অবুঝ হয়ো না—ভুলো না তুমি যোধপুরের মহারাজা—আর সে কে—সামান্য নাম-গোত্র-পরিচয়হীনা এক অতি সাধারণ তোমাদেরই আশ্রিত মেয়ে। সে কোনদিন তোমার যোগ্য হতে পারে না—যোধপুর মহিষীর মর্যাদা পেতে পারে না।

সেদিনকার মতই যেন হঠাৎ ক্ষেপে ওঠে অজিত আজও এবং কর্কশ রূঢ় কণ্ঠে রম্ভাকে লক্ষ্য করে বলে ওঠে, উপদেশ শুনতে আমি তোমার কাছে আসিনি দাই—পালনকর্ত্রী—নগণ্যা এক নারীর মুখে আর যাই শুনি না কেন অন্ততঃ জেনো উপদেশ শুনতে মহারাজ অজিতসিংহ রাজী নয়—এখন বল, কোথায় তাকে সরিয়েছো—

অজিত, বুঝতে পারছো না তুমি—আক্রোশে অন্ধ হয়ে, অধৈর্ব হয়ে হিতাহিতজ্ঞানটুকু পর্যন্ত তোমার লোপ পাচ্ছে—আমি তোমার মঙ্গলের জন্যই—তোমার সম্মান গৌরব রক্ষার জন্যই—

থাক—হঠাৎ কুৎসিত কণ্ঠে চিৎকার করে ওঠে অজিতসিংহ, দাসী—দাই—দাসীর মতই থাকবে—বল সংযুক্তা কোথায়—

হঠাৎ যেন সমস্ত সংযমের সমস্ত ধৈর্যের অবসান ঘটে রম্ভার।

তার শান্ত মুখখানি কঠিন হয়ে ওঠে অকস্মাৎ। চোখের তারা দুটো যেন জ্বলতে থাকে বাঘিনীর মত। শান্ত দৃঢ় চাপা কণ্ঠে বলে ওঠে রম্ভা, অজিত—

অজিত নয়—বলো মহারাজ—

তবে শোন মহারাজ অজিত—সংযুক্তার সঙ্গে ইহজীবনে আর তোমার দেখা হবে না।

কি—কি বললে?

যা বললাম শুনতে তো পেয়েছো। আরো শোন—সংযুক্তা অন্যের বাগদত্তা—জন্মাবধি অন্যের বাগদত্তা—

তাই বুঝি?

হঠাৎ কঠিন ব্যঙ্গে হো হো করে উচ্চকণ্ঠে হেসে ওঠে অজিত।

কি বললে—বাগদত্তা—জন্মাবধি অন্যের বাগদত্তা—ঠিক আছে—তাহলে তুমিও শুনে রাখ দাই—তার সে বাগদত্তা স্বামীকে অজিতসিংহের অসির মুকাবিলা করতে হবে—আর তোমার ঔদ্ধত্যের উপযুক্ত শাস্তি—তাও শীঘ্রই তুমি পাবে।

কথাগুলো বলে আর অজিত দাঁড়াল না—কক্ষ হতে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেল।

বাইরে তার চর্মপাদুকার ভারী শব্দ ক্রমশঃ মিলিয়ে গেল।

॥ ৬ ॥

রম্ভার কক্ষ হতে নিষ্ক্রান্ত হয়ে অজিত অধীর আক্রোশে অশান্ত পায়ে সোজা গিয়ে লায়লীর কক্ষের সামনে দাঁড়াল।

লায়লী—অশান্ত কণ্ঠে ডাকে অজিত। কিন্তু অপেক্ষা করে না আর—সাধারণ সৌজন্যটুকুও বিস্মৃত হয়ে দরজায় ধাক্কা দেয়—সশব্দে ভেজানো দুয়ার খুলে গেল এবং অজিত লায়লীর কক্ষমধ্যে এসে প্রবেশ করল।

ঘরের মেঝেতে বিস্তৃত গালিচার উপর বসে বীণের তারের উপর মধ্যে মধ্যে মৃদু আলতোভাবে অঙ্গুলি স্পর্শ করছিল লায়লী।

সঙ্গে সঙ্গে তার আঙুল থেমে যায়, মুখ তুলে তাকায় লায়লী।

লায়লী—

বলুন।

তোমার সহেলীকে প্রাসাদদুর্গের মধ্যে কোথাও দেখছি না কেন।

সংযুক্তার কথা বলছেন?

হ্যাঁ।

কেন, সে কি তার কক্ষে নেই?

না—এই প্রাসাদদুর্গেই নেই।

কিন্তু কাল রাত্রেও তো তার সঙ্গে দেখা হয়েছে আমার।

রাত্রেই কোন একসময় মনে হয় আমার ঐ শয়তানী দাইটা সংযুক্তাকে কোথাও সরিয়ে ফেলেছে আমার অজ্ঞাতে।

না, না—তা কেন হবে?

তাই—কিন্তু ও ভুল করেছে। আমার সঙ্গে চাতুরী খেলে ও পারবে না। কোথায় লুকোবে তোকে—আমি তাকে খুঁজে বের করবই—তারপর জীবন্ত ঐ শয়তানীকে মাটিতে পুঁতে ফেলবো। শোন—তোমার সাহায্য আমি চাই—

আমার সাহায্য!

হ্যাঁ।

আমি অবলা নারী—আমি কি সাহায্য আপনাকে করতে পারি—তাছাড়া—

কি লায়লী?

আমি শীঘ্রই এখান থেকে চলে যাচ্ছি।

চলে যাচ্ছো! কোথায়?

বাঃ, কেন—আমার নিজের দেশে—ঘরে—দেহলীতে।

দিল্লীতে তুমি ফিরে যাবে!

যাবো না—চিরকালই আপনাদের আশ্রয়ে থেকে আপনাদের বিরক্ত করবো নাকি?

বিরক্ত—এ তুমি কি বলছো লায়লী!

তাছাড়া কি—আপনিই বলুন—কে আমি—কি সম্পর্ক আপনাদের সঙ্গে আমার—লায়লী বলতে থাকে, সম্পর্ক তো নেই-ই, বরং আপনার চিরশত্রুর আপনার পিতৃহত্যাকারীর পৌত্রী আমি।

লায়লী—কি হয়েছে তোমার—নতুন ...র আপনি আপনি করে কথা বলছো!

অধিকারের সীমানা কারো পক্ষেই অতিক্রম না করাই কি বুদ্ধিমত্তার পরিচয়

নয় মহারাজ ?

লায়লী—

হ্যাঁ মহারাজ—তাছাড়া শত্রুর পৌত্রী আমি—আমাকে বিশ্বাসই বা কি আপনার !

লায়লী—

অজিত এগিয়ে এসে লায়লীর একটি হাত ধরবার চেষ্টা করে কিন্তু পারে না —লায়লী স্পর্শের নাগালের বাইরে সরে যায় ।

না মহারাজ—ক্ষমা করুন ।

লায়লী—কি হয়েছে লায়লী ?

আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন মহারাজ, কিছুই হয়নি—লায়লী শান্ত কণ্ঠে বলে পুনরায় ।

হ্যাঁ—নিশ্চয়ই হয়েছে—তুমি গোপন করছো—কেউ কি তোমাকে কোন-রকম অসম্মান করেছে এখানে বা তোমার বেদনার কারণ ঘটিয়েছে—তোমাকে ক্ষুণ্ণ করেছে ?

মহারাজের অতিথি আমি—তাই কি কখনো সম্ভব তাঁরই আশ্রয়ে—না মহারাজ সে সব কিছু নয় ।

তবে—তবে তুমি চলে যেতে চাইছো কেন ?

মহারাজ—

তুমি তো একদিন বলেছিলে এই দুর্গপ্রাসাদ ছেড়ে আর দেহলীতে ফিরে যাবে না—সেখানকার বাতাস বিষাক্ত—হাঁপ ধরায়—না—নিশ্চয়ই তোমাকে কেউ অসম্মান করেছে—তোমার মনে ব্যথা দিয়েছে—বল—অসংকোচে তার নাম প্রকাশ কর ।

না মহারাজ, তা নয় ।

তবে কি—

বরং বলতে পারেন নিজের সত্যিকারের অধিকারটুকু ভুলে গিয়ে লায়লী যে ভুল যে অন্যায় করেছে এতদিন, আজ সে সেটুকু বুঝতে পেরে অনুতপ্ত চিত্তে নিজের অধিকারের সীমানার মধ্যে প্রত্যাবর্তন করেছে ।

লায়লী—

আপনি আমার দেহলীতে ফিরে যাবার ব্যবস্থা করে দিন ।

তাহলে কি আমি এই বুঝবো এতকাল যা ভেবে এসেছি তা ভুল মিথ্যা—তুমি কোনদিন আমায় ভালবাসনি—লায়লী—বল—চুপ করে থেকো না মাথা নীচু করে অমন করে প্রাণহীন পুতুলের মত—হ্যাঁ কি না বল—বল লায়লী—জবাব দাও আমার কথার—

লায়লী যেন পাথর ।

নিস্পন্দ প্রাণহীন—যেমন মুখ নীচু করে দাঁড়িয়ে ছিল তেমনি দাঁড়িয়ে থাকে পূর্ববৎ ।

লায়লী—

কোন জবাব দেয় না লায়লী তবু—কেবল প্রাণপণে দাঁত দিয়ে নীচের ওষ্ঠটা কামড়ে ধরে নিজেকে রোধ করবার চেষ্টা করে।

তাহলে এতদিন তুমি আমাকে নিয়ে কেবল খেলাই খেলেছো ?

তথাপি লায়লী মাথা তোলে না।

সব অভিনয়—সব মিথ্যা—সবই ছলনা—আগাগোড়াই একটা নিষ্ঠুর খেলা ! কি, জবাব দিচ্ছ না কেন নারী—বল, বলতে বলতে সহসা বলিষ্ঠ দুই হাতে লায়লীর বাহু দুটি টেনে ধরে কঠিন কণ্ঠে শেষ কথাগুলো শুরু করে—জবাব দাও—আমি তোমার খেলার পাত্র ?

মহারাজ—

আর পারে না নিজেকে রোধ করতে লায়লী, কান্নায় ভেঙে পড়ে এবং আকর্ষণে অজিতের বুকের উপর গিয়ে পড়ে।

হ্যাঁ হ্যাঁ তাই—আপনার সঙ্গে আমি খেলাই করেছি—খেলা—ছলনা—মিথ্যা—সব মিথ্যা—সব—

লায়লী—

হ্যাঁ—আপনি যান—এখান থেকে যান দয়া করে—দয়া করুন—যান, যান।

লায়লী যেন একপ্রকার ঠেলেই অজিতসিংহকে তার কক্ষ থেকে বের করে দিল। অজিত কক্ষ হতে নিষ্ক্রান্ত হয়ে যায়। এবং লায়লী আর নিজেকে রোধ করতে পারে না। অজিতসিংহ কক্ষ হতে নিষ্ক্রান্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে লায়লী মেঝের ওপরে বসে কান্নায় ভেঙে পড়ে দু হাতে মুখ ঢেকে, হ্যাঁ হ্যাঁ—সব খেলা—সব মিথ্যা—সব ছলনা—

দুর্গাদাস সঠিক সংবাদই পেয়েছিল। দিন দুইয়ের মধ্যেই এক অপরাহ্ণে উদয়পুর থেকে রানার দূত এলো। রানার ভ্রাতা গজসিংহের একমাত্র কন্যা রূপবতী হীরাবাঈয়ের সঙ্গে অজিতের বিবাহের প্রস্তাব নিয়ে মূল্যবান গর্জন-শোভিত দুটি হস্তী ও দশটি অশ্ব সমভিব্যাহারে দূত এলো.

অজিতসিংহ কিন্তু বেঁকে বসে, সে বিবাহ করবে না।

দুর্গাদাস বলে, সে কি অজিত, তোমার কি মাথা খারাপ হলো ? শিশোদীয় বংশের কন্যা—কুল উজ্জ্বল তো করবেই—তাছাড়া রানার ভ্রাতুষ্পুত্রীকে তুমি বিবাহ করলে রানার সঙ্গে তোমার আত্মীয়তা হবে—রানা হবেন তোমার মস্ত বড় সহায়।

কিন্তু চাচাজী—

না অজিত—এখনো ঔরংজীব গোপনে গোপনে নানাভাবে চেষ্টা করছে তোমাকে হত্যা করবার জন্য—মাড়বারকে গ্রাস করবার জন্য—সর্বক্ষণ চারিদিক থেকে আমাদের সতর্ক থাকতে হচ্ছে—এই অবস্থায় উদয়পুরের মহারানাকে যদি চটিয়ে দিই আমরা, আমাদের শত্রুকেই পরোক্ষভাবে সাহায্য করা হবে।

অন্যান্য সামন্ত সর্দার যারা উপস্থিত ছিল তারাও দুর্গাদাসের কথায় যুক্তিতে সায় দেয়—বলে, সর্দার ঠিকই বলেছেন মহারাজ—এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করা

আরো উচিত হবে না।

বেশ—আপনাদের সকলের যখন ঐ মত তাই হবে। অজিত কতকটা অনন্যোপায় হয়েই সম্মতি দেয় বিবাহে।

অতঃপর আলোচনা করে স্থির হয় আগামী মাসেই শুভকার্য সম্পন্ন হবে। সেইমতই পত্রোত্তর দেওয়া হলো। অজিতসিংহ বিবাহে সম্মতি দিল বটে, সমস্ত মন তখনো তার সংযুক্তাই ভরিয়ে রেখেছে। সংযুক্তাকে যেন অজিত কিছুতেই ভুলতে পারছিল না।

কয়দিন ধরে গোপনে গোপনে অনেক অনুসন্ধান করেছে অজিত সংযুক্তার, কিন্তু কোন সন্ধানই তার করতে পারেনি। বিশ্বস্ত কয়েকজন চরকেও অনুসন্ধানের কাজে নিযুক্ত করেছিল অজিত, তারাও কোন সন্ধান এনে দিতে পারেনি আজ পর্যন্ত। আশ্চর্য—সংযুক্তা কি কর্পূরের মত উবে গেল এই চতুর্দিক থেকে সুরক্ষিত সদাপ্রহরারত দুর্গপ্রাসাদের অন্দরণ থেকে।

রম্ভাকে আর পীড়ন করেনি অজিত—কি জানি কেন তার মনে হয়েছে সে যে সংযুক্তার খোঁজ করছে গোপনে গোপনে, রম্ভাকে সেটা না জানতে দেওয়াই বোধহয় বুদ্ধিমানের কাজ হবে। কারণ রম্ভা যদি জানতে পারে হয়ত সংযুক্তা সম্পর্কে সে আরো সতর্ক হবে—আর যদি তার ধারণা হয় যে অজিত সংযুক্তা সম্পর্কে ততটা ব্যাকুল নয়, হয়ত তার মধ্যে শিথিলতা আসবে।

তার অদমনীয় মনোভাব কিছুটা আপনা হতেই হয়ত শান্ত হয়ে আসবে।

কিন্তু তৎসত্ত্বেও পুরোপুরি রম্ভার ব্যাপারে নিশ্চিন্ত থাকতে পারেনি—তাই দুর্গপ্রাসাদ ও তার বাইরে রম্ভার সকল প্রকার গতিবিধির উপর দৃষ্টি রাখবার জন্য বিশেষ সতর্ক প্রহরার ব্যবস্থা করেছিল। এবং প্রহরার ব্যাপারে নিযুক্ত করেছিল তার অন্দরণের বিশ্বস্ত দেহরক্ষী মঘাকে। কানা মঘাকে!

মঘা জাতিতে রাজপুত হলেও তার দেহে ছিল মুঘোলের রক্ত। দেখতে ছোটখাটো একটা দৈত্যের মত যেন—লম্বায় পাঁচ ফুটের বেশী হবে না। পেশল বলিষ্ঠ দেহ। কালো কষ্টিপাথরের মত কুচকুচে গাত্রবর্ণ। ছোটবেলায় বসন্ত হয়ে একটি চক্ষু নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। দুর্গপ্রাসাদে ওকে তাই সকলে কানা মঘা বলে ডাকত। মঘার বয়স যে ঠিক কত তাকে দেখে বুঝবার উপায় ছিল না। কারণ মঘা অজিতসিংহের পিতারও দেহরক্ষী ছিল একসময় এবং মহারাজ যশোবন্তর সঙ্গে কাবুলপ্রান্তেও গিয়েছিল।

ঔরংজীবের সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে দেহলীতে রাঠোরদের যে ঘোরতর যুদ্ধ হয় সেই যুদ্ধে নিদারুণ আহত হয়ে পথের মধ্যে তিন দিন অজ্ঞান হয়ে নাকি পড়ে ছিল মড়ার মত। তারপর জ্ঞান হলে একসময় সে অতিকষ্টে হামাগুড়ি দিয়ে দিয়ে স্তূপীকৃত মৃতদেহের মধ্য থেকে বের হয়ে আসে। এবং একসময় দীর্ঘ দিন ধরে আত্মগোপন করে করে হাঁটতে হাঁটতে মাস চারেক পরে মাড়বারে এসে পৌঁছেছিল। তারপর অর্বুদ পাহাড় থেকে অজিতকে নিয়ে এসে রাঠোর সর্দাররা যোধপুরের দুর্গপ্রাসাদে তুললে, মঘা একদিন কিশোর অজিতের সামনে এসে দাঁড়াল।

অজিত তো প্রথমে ঐ ছোটোখাটো দৈত্যের মত মানুষটাকে দেখে চমকে

উঠেছিল ভয়ে। ভয়ে ভয়ে প্রশ্ন করে, কে তুই?

আভূমি নত হয়ে অভিবাদন করে মঘা বলে, রাজাধিরাজ, আমি আপনার দাসানুদাস মঘা—কানা মঘা।

কানা মঘা—

ঐ সময় দুর্গাদাস সর্দার সেখানে এসে উপস্থিত হয় এবং সেই মঘার বাকী পরিচয়টুকু দেয়।

অজিত বলে, তুমি আমার পিতাকে দেখেছো?

দেখেছি বৈকি—তাঁরই তো দাসানুদাস ছিলাম—

তা ও কি চায় চাচাজী ওকে জিজ্ঞাসা করুন—অজিত দুর্গাদাস সর্দারকে বলে।

আমি—মঘাই জবাব দেয়, আপনার পিতা মহারাজের দেহরক্ষী ছিলাম—আপনারও দেহরক্ষী হয়ে এই দুর্গাপ্রাসাদেই থাকতে চাই রাজাধিরাজ।

কি জানি কেন অজিতের মনে হয়েছিল ঐ মুহূর্তে, সঙ্গে সঙ্গে সে বলে, কি বলেন চাচাজী, ও থাকুক এখানে?

বেশ তো বাবা—

সেই হতে থেকে গেল মঘা অজিতের দেহরক্ষী হয়ে দুর্গপ্রাসাদে। দেহে অসুরের মত শক্তি থাকলেও মস্তিষ্কে বুদ্ধিটা ছিল না মঘার। কেমন যেন একটু বোকা বোকাই ছিল। তবে একটা জিনিস ছিল ওর চরিত্রের মধ্যে। প্রভুর আজ্ঞায় সে প্রাণ পর্যন্তও দিতে পারত। সেখানে তার কোন যুক্তি বা বিচার ছিল না।

আর দুর্গপ্রাসাদের মধ্যে একদা যেমন সে মহারাজ যশোবন্তের একমাত্র আজ্ঞাবাহী ছিল, আজ তেমনি সে একমাত্র অজিতেরই আজ্ঞাবাহী। অজিত ব্যতীত কারো কোন কথাই সে পালন করা দূরে থাক, কানই দিত না। অজিতের নির্দেশই ছিল তার শেষ ও একমাত্র নির্দেশ।

অজিত মঘার উপরই ভার দিয়েছিল রম্ভার গতিবিধির ওপরে সর্বক্ষণ নজর রাখবার জন্য। মঘা কেবল প্রভুর নির্দেশে মাথা হেলিয়ে নিঃশব্দে সম্মতি প্রকাশ করেছিল।

এদিকে দেখতে দেখতে কুমার অজিতের বিবাহের নির্দিষ্ট দিন এসে গেল। অজিত বাছাই বাছাই পঞ্চাশ জন দুর্ধর্ষ সামন্ত সর্দার দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে এক অপরাহ্নে জমকালো পোশাক পরিধান করে উদয়পুরাভিমুখে যাত্রা করল। এবং দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে সকলে এসে উদয়পুরে উপনীত হলো একদিন।

বিবাহ হবে পেশলা জলাশয়ের ধারে অবস্থিত বিখ্যাত জগনিবাসে। রানার নিজস্ব প্রাসাদ জগনিবাস। সমস্ত উদয়পুর তখন উৎসবে যেন মেতে উঠেছে। আলোয় নৃত্য-গীত-বাদ্যে সমগ্র উদয়পুর যেন মুখরিত হয়ে উঠেছে। আলোয়-আলোয় জগনিবাস ঝলমল করে।

গজসিংহের একমাত্র কন্যা হীরা—হীরাবাঈ। বড় আদরিণী কন্যা। রূপে

গুণে অনন্যা। রাজকোষ মুক্তহস্তে খুলে দিয়েছিলেন মহারানা। আমোদ-প্রমোদের এবং ভোজের প্রভূত ব্যবস্থা করেছিলেন। এবং বিবাহ উৎসবের মধ্যে আকর্ষণ ছিল নটনী পান্নার নৃত্য। নাদোয়ারার সুন্দরী তন্বী যুবতী নটনী পান্না এসেছে হীরাবাঈয়ের বিবাহে নৃত্য-গীতে আনন্দ পরিবেশন করতে।

দশ দিন ও দশ রাত্রি ধরে একটানা বিবাহের উৎসব ও হুল্লোড় চলল সারা উদয়পুর জুড়ে। সমস্ত উদয়পুরবাসী যেন সে উৎসবে গা ঢেলে দেয়।

নটনী পান্নার নৃত্য-গীতে মুগ্ধ হয়ে অজিত একদিন তাকে সাদর আমন্ত্রণ জানাল যোধপুরে যাবার জন্য।

বল কবে যাবে তুমি পান্না আমার ওখানে ?

পান্না তো আপনার অনুগ্রহের দাসী রাজন—যখনই অনুমতি করবেন—

বেশ সামনের মাসেই আমি লোক পাঠাবো।

আপনার যেমন অভিরুচি রাজন।

কথাটা অবিলম্বে নববধূ হীরাবাঈয়ের কানে যায়।

সঙ্গে সঙ্গে হীরার দুই বঙ্কিম ভ্রূ কুঞ্চিত হয়ে ওঠে।

বিশেষ করে ইতিপূর্বে একদিন হীরা দূর থেকে লক্ষ্য করেছিল তার স্বামীকে—অজিত সে সময় নটনী পান্নাকে সামনে বসিয়ে তার সঙ্গে আলাপ করছিল।

পান্নার প্রতি স্বামীর সেই মুহূর্তের চোখের দৃষ্টি হীরাকে ফাঁকি দিতে পারেনি। নারী হয়ে তার স্বামীর চোখের দৃষ্টি অন্য এক যুবতী নারীর প্রতি চিনতে তার এতটুকুও বিলম্ব হয়নি। মুখখানা রক্তিম হয়ে উঠেছিল হীরার।

॥ ৭ ॥

কেবল কি রক্তিমই হয়ে- উঠেছিল হীরাবাঈয়ের মুখখানা—বুকের ভিতরটাও কি অজ্ঞাত এক আশঙ্কায় কেঁপে ওঠেনি ? আর তাইতেই বুঝি হীরা বার বার মনে মনে স্মরণ করেছিল একলিঙ্গকে। হে প্রভু একলিঙ্গ, তোমাকেই জ্ঞান হওয়া অবধি একমাত্র দুর্গতিনাশন জেনে এসেছি—আমার ভয় যেন মিথ্যা হয় প্রভু—মিথ্যা হয়।

হীরার যে বড় ভয়। বছর দুই পূর্বে একবার একলিঙ্গের মন্দিরে হীরা পুজো দিতে গিয়েছিল—সেখানেই দেখা হয় এক সাধুর সঙ্গে। একলিঙ্গের মন্দিরে যাবার, বিশেষ করে সেবার, ঐ সাধু দর্শনই ছিল অন্যতম কারণ। সাধুর নাকি অদ্ভুত ক্ষমতা।

অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎ যে কোন লোকের তিনি কররেখা পর্যালোচনা করেই নাকি নির্ভুলভাবে বলে দিতে পারেন।

অবিশ্যি সাধুর কাছ থেকে কোন কিছু জানাটাই নাকি দুঃসাধ্য—বেশীর ভাগ সময়ই চোখ বুজে মৌনী হয়ে থাকেন। ধর্না দিয়ে থাকতে হয় কৃপার জন্য—কখন চোখ মেলে তাকাবেন—মুখ খুলবেন—কৃপা করবেন। মন্দিরের পশ্চাতে

পাষাণচত্বরের এক পাশে সাধু বসে ছিলেন—অগণিত নারী পুরুষ তাঁর সামনে ভিড় করে বসে ছিল।

ভিড়ের এক পাশে গিয়ে হীরা দাঁড়িয়েছিল।

সবাই একাগ্রচিত্তে একদৃষ্টে মুদ্রিতচক্ষু সাধুর দিকে চেয়ে আছে অধীর প্রতীক্ষায়। কখনো কখনো একবার বা দুবার দিন ও রাত্রির মধ্যে সাধু চক্ষু খোলেন—সামান্য হয়ত সে সময় একটু দুগ্ধ পান করেন—কাঁচা দুগ্ধ—সেই সময় কৃপা হলে দু'চারটে কথা বলেন কারো কারো সঙ্গে।

ভাগ্য হীরার বোধ করি সেদিন প্রসন্ন ছিল। একটু পরেই চক্ষু খুললেন এবং প্রথমেই তাঁর দৃষ্টি গিয়ে নিবদ্ধ হয় ভিড়ের এক পাশে দণ্ডায়মানা হীরাবাঈয়ের প্রতি। ক্ষণকাল সাধু চেয়ে থাকেন হীরার প্রতি—তারপর মৃদুকণ্ঠে তাকে আহ্বান জানান সাধু—আও বেটী ইধার আও।

সঙ্গে সঙ্গে রানার যে সব দেহরক্ষীরা এসেছিল হীরাবাঈয়ের সঙ্গে মন্দিরে তারা এগিয়ে সমবেত জনতাকে হটিয়ে দেয়—যাও সব—যাও—এখান থেকে যাও।

এতক্ষণ তারা লক্ষ্য করেনি হীরাবাঈকে। এখন তার প্রতি নজর পড়ায় এবং তার সঙ্গে রানার সশস্ত্র প্রহরীদের দেখে সসম্ভ্রমে সেখান থেকে সকলে সরে পড়ে। দেখতে দেখতে স্থানটি একেবারে নির্জন হয়ে যায়।

হীরাবাঈ সাধুর সামনে এসে প্রণাম করে। সাধু তখন আশীর্বাদ করে বলেন, বেটী, তোমার দেহরক্ষীদের একটু এখান থেকে সরে যেতে বল, তোমার সংগে আমার কিছু কথা আছে।

হীরাবাঈ চোখের ইংগিতে দেহরক্ষীদের একটু সরে যেতে বলে।

তারা সরে যায়।

সাধু আবার তাকালেন হীরাবাঈয়ের দিকে—দেখি বেটী তোর হাতটা—হাত দেখতে দেখতে আবার প্রশ্ন করেন—কি নাম তোর বেটী?

হীরাবাঈ—

হুঁ—শোন বেটী—তোর স্বামীভাগ্য আছে, কিন্তু—

কি—কি প্রভু—থেমে গেলেন কেন, বলুন।

স্ত্রীলোকের প্রতি অতিশয় আসক্তি ও দুর্দমনীয় যৌনলিপ্সাই হবে তার পতন ও মৃত্যুর কারণ।

প্রভু—

দুঃখ করিস না মা—এ ছাড়া উপায় নেই মা। নিয়তির গতি কেউ রোধ করতে পারে না—তোর ভাগ্যলিপি যা তোর হস্তরেখা দেখে পাঠ করছি তাতে সেই কথাই বলছে। নারীর প্রতি অতিশয় আসক্তি ও দুর্দমনীয় যৌনলিপ্সাই হবে তোর স্বামীর ধ্বংসের কারণ। কথাগুলি বলেই সাধু চোখ বুজেছিলেন ও মৌনী হয়েছিলেন। চোখ খোলেননি এবং একটি কথাও আর বলেননি।

ভারাক্রান্ত হৃদয়ে ফিরে এসেছিল হীরাবাঈ প্রাসাদে। সেই দিন থেকে বিবাহে তার এতটুকু স্পৃহাও ছিল না। বিবাহের কথা মনে হলেই সেই সাধুর কথা মনে

পড়ত। অজ্ঞাত এক আশঙ্কায় বুকের ভিতরটা কেঁপে উঠত।

মহারানা যখন যোধপুরের স্বর্গীয় মহারাজা যশোবন্তের পুত্র অজিতের সঙ্গে বিবাহ স্থির করে কনিষ্ঠ ভ্রাতা গজসিংহকে জানালেন, হীরা-মার বিবাহ ঠিক করলাম গজ—

তখন গজসিংহ শুধিয়েছিলেন, কোথায় দাদা?

মাড়বারের অধিপতি যশোবন্ত-পুত্র কুমার অজিতসিংহের সঙ্গে।

গজসিংহ সংবাদটা শুনে খুশীই হয়েছিলেন। বলেছিলেন, এর চাইতে আর হীরার কি ভাল বিবাহ হতে পারত দাদা—খুব ভাল হয়েছে—মাড়বার ও মেবারের সঙ্গে নতুন করে কুটুম্বিতা স্থাপন হলো—নতুন করে আমরা আবার আত্মীয়তা-সূত্রে বাঁধা পড়তে চললাম।

পট্টমহাদেবী হীরাকে সংবাদটা দিয়েছিলেন। কারণ হীরা পট্টমহাদেবীর কাছেই মানুষ। শিশুবয়সেই তার মাতৃবিয়োগ হয়েছিল।

বিবাহের দিন স্থির হওয়া অবধি হীরার মনের মধ্যে সর্বক্ষণ সাধুর সেই ভবিষ্যৎবাণী তোলপাড় করে দিয়েছে। সাধুর সেই কথা, উপায় নেই মা, নিয়তির গতি কেউ রোধ করতে পারে না। তোর ভাগ্যলিপি যা তোর হস্তরেখা দেখে পাঠ করছি তাতে সেই কথাই বলছে—নারীর প্রতি অতিশয় আসক্তি ও দুর্দমনীয় যৌনলিপ্সাই হবে তার পতন ও মৃত্যুর কারণ। স্পষ্টই সাধু সেদিন বলে দিয়েছেন—তোর স্বামী হবে উচ্ছৃঙ্খল—চরিত্রহীন!

সঙ্গে সঙ্গে মনকে শক্ত করবার চেষ্টা করেছে হীরা। না—সে তা কিছুতেই হতে দেবে না—স্বামীকে সে রক্ষা করবে।

আজ নটনী পান্নার প্রতি স্বামীর চোখের দৃষ্টিই হীরার বুকের ভিতরটা কাঁপিয়ে তোলে। নারী হয়ে তার বুঝতে কষ্ট হয় না স্বামীর চোখের ঐ দৃষ্টি। সে দৃষ্টির মধ্যে যে লালসার আগুন লুকানো আছে সেটা বুঝতে আর যারই কষ্ট হোক হীরার হয় না। গত দুই বছর ধরে প্রতিদিন যে ভয়টা তার বুকের মধ্যে একটা কালোছায়া বিস্তার করে রেখেছে—যে ভয়টা বলতে গেলে প্রতিদিন অনুক্ষণ তাকে একটা অদৃশ্য কীটের মত কুরে কুরে যন্ত্রণা দিয়েছে—নারীর পক্ষে যেটা সব চাইতে বড় দুর্ভাগ্য আজ সেই ভয় আর দুর্ভাগ্যটা তার মুখোমুখি একেবারে সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। সমস্ত সংশয়ের অবসান ঘটিয়ে একেবারে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

মহারানা তাঁর ঐ মাতৃহারা ভ্রাতুষ্পুত্রীটিকে সন্তানাধিক স্নেহ করতেন বরাবর। গজসিংহের দুহিতা হলেও মহারানা আর পট্টমহাদেবীর কাছেই সর্বক্ষণ থাকত হীরাবাঈ। তার যত আদর আবদার ছিল ঐ মহারানা ও পট্টমহাদেবীর কাছেই।

কাল কন্যা তার শ্বশুরালয়ে চলে যাবে—মহারানার মনটা খুবই বিষণ্ণ হয়েছিল—আজ আর তাই রাজসভায় রাজকার্যে যাননি। নিজের শয়নকক্ষের মধ্যে একাকী চুপ করে বসে ছিলেন।

পট্টমহাদেবী হীরাবাঈকে নিয়ে একলিঙ্গের মন্দিরে পুজো দিতে গিয়েছেন—

অপরাহ্ণে অজিত হীরাকে নিয়ে যোধপুরের দিকে রওনা হবে।

মহামন্ত্রী সে সব ব্যবস্থা করতে ব্যস্ত। গর্জসিংহ মহামন্ত্রীর সঙ্গেই ছিলেন। যৌতুকের সব সামগ্রী—সোনাদানা মূল্যবান বস্ত্র অলংকার অশ্ব হস্তী উষ্ট্র বহু দান করেছেন মহারানা অজিতকে। সব কিছুই অজিতের সঙ্গে যাবে।

গর্জসিংহ এসে মহারানার কক্ষে প্রবেশ করলেন।

মহারানা—

কে—গর্জসিংহ, এসো ভাই—সব ব্যবস্থা হয়ে গেল?

হ্যাঁ।

দেখো ভাই, কোন দিক দিয়ে যেন কোন ত্রুটি না থাকে—মাড়বারের সর্দাররা যেন না বলে মেওয়ারের আতিথেয়তায় কোন রকম ত্রুটি ছিল।

ভয় নেই—দুর্গাদাস সর্দার অত্যন্ত প্রীত হয়েছেন—কিন্তু আমি একটা কথা বলছিলাম—

কি ভাই?

দেহলী থেকে দূত এসেছে—স্বয়ং সম্রাট ঔরংজীবের দূত।

কোন সংবাদ আছে?

আপনার নিকট একটি পত্র প্রেরণ করেছেন সম্রাট।

পত্র?

হ্যাঁ।

তুমি পড়েছো পত্র?

পড়েছি মহারানা—সম্রাট ঔরংজীব যোধপুরের সঙ্গে উদয়পুরের এই নতুন প্রীতি-সম্পর্ককে খুব খুশী মনে গ্রহণ করতে পারেননি।

ও তো আমি জানতাম গর্জসিংহ। এ আর এমন নতুন কথা কি—মাড়বার ও মেবার পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হোক সম্রাটের ইচ্ছে নয়।

দাদা—

হ্যাঁ ভাই—ধীরে ধীরে বললেন মহারানা, সে মনে করে এটা আদৌ তার পক্ষে শুভ নয়।

কক্ষের মধ্যে ধীরে ধীরে পায়চারি করছিলেন মহারানা।

মহারানা বললেন, তুমি তো জান যশোবন্তের বংশকে ধ্বংস করতে চেয়েছিল সম্রাট—এবং সে কারণে এমন কোন হীন জঘন্য চক্রান্ত বা নীচ কাজ ছিল না, সম্রাট ঔরংজীব করেনি। সেই যোধপুরাধিপতির সন্তানকেই আমরা জামাতৃপদে বরণ করেছি এতে করে তো দেহলীর উষ্মার কারণ ঘটেছেই।

কি হবে দাদা?

চিন্তা করো না গর্জসিংহ—সব দিক ভেবেচিন্তেই এ সম্পর্ক আমি স্থাপন করেছি।

গজসিংহ মহারানার মুখের দিকেই একদৃষ্টে তাকিয়ে ছিলেন।

মহারানা পূর্ববৎ পায়চারি করতে করতেই বললেন, সম্রাট যতই চতুর ধূর্ত হোক সত্যকারের রাজনীতিক নয়—নচেৎ এমনি করে সারা ভারত জুড়ে তার শত্রু সৃষ্টি করত না। মহারাষ্ট্র রাজোয়ারা কেউই ঔরংজীবের রাজনীতিতে আজ সন্তুষ্ট নয়—সর্বত্র অসন্তোষের বহ্নি। শুধু বাইরে নয়, তার অন্দরণের মধ্যেও আজ অসন্তোষের বহ্নি ছড়িয়ে পড়ছে—আর আমি এও তোমাকে বলে রাখছি দেখো ঔরংজীবকে ঐ বহ্নিতেই একদিন পুড়ে মরতে হবে।

কিন্তু—

তুমি পত্রের জন্য চিন্তা করো না গজসিংহ—দু'চার দিন পরে ওর জবাব আমি দেবো।

আরো কিছু বলতে উদ্যত হয়েছিলেন মহারানা কিন্তু বলা হলো না—বাইরে নূপুরের আওয়াজ পাওয়া গেল। ঐ নূপুরের ধ্বনি মহারানার পরিচিত। হীরাবাঈ তাঁর কক্ষের দিকে আসছে।

কনিষ্ঠের দিকে তাকিয়ে মহারানা বললেন, দেহলীর সঙ্গে আমরা প্রীতি ও শান্তির সম্পর্কই বজায় রাখতে চাই—আর রাখবার তা শেষ পর্যন্ত চেষ্টাও করব, কিন্তু জেনো মাড়বারের সঙ্গে—শুধু মাড়বার কেন সমগ্র রাজস্থানের সঙ্গে প্রীতির সম্পর্ক রক্ষা করাই আমাদের সর্বপ্রথম কর্তব্য—আর তা ছাড়া সমগ্র রাজস্থানের বাঁচবার আর কোন পথ নেই।

হীরাবাঈ এসে কক্ষে প্রবেশ করল। প্রথমে জ্যেষ্ঠতাত মহারানাকে, তারপর পিতা গজসিংহকে প্রণাম করল।

গজসিংহ বললেন, আমি তাহলে ওদের যাত্রার ব্যবস্থা করিগে?

হ্যাঁ, যাও।

গজসিংহ কক্ষ থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেলেন।

মহারানা আদরিণী ভ্রাতুষ্পুত্রীকে সামনে টেনে নিলেন, মার আমার মুখখানি শুকনো লাগছে কেন মা?

হীরাবাঈ কোন জবাব দেয় না—মাথাটা কেবল নীচু করে।

বক্ষের ওপরে টেনে নিলেন এবার কন্যাসমা ভ্রাতুষ্পুত্রীকে মহারানা, মা গো, দেখি দেখি—এ কি মা গো, কাঁদছিস।

হীরাবাঈ জ্যেষ্ঠতাতর বক্ষের ওপরে মাথাটা রক্ষা করে কান্নায় ভেঙে পড়ে।

এ কি মা গো, এই আনন্দের দিনে চোখে তোমার অশ্রু কেন মা—ছিঃ, মুছে ফেল ও অশ্রু।

সযত্নে নিজ উত্তরীয় দিয়ে ভ্রাতুষ্পুত্রীর চক্ষের অশ্রু মুছিয়ে দিলেন মহারানা।—অজিত বড় ভাল ছেলে মা। আমি ওর সঙ্গে সামান্য কথাবার্তা বলেই বুঝেছি স্বর্গীয় যশোবন্তর যোগ্য পুত্র ও।

হীরাবাঈ তার জ্যেষ্ঠতাতর নিকট বলতে পারে না যে ভয় তার সেখানে নয় —ভয় তার অন্যখানে—স্বামীর দু চোখের দৃষ্টিতে নারীর প্রতি লালসার

আগুনেই তার চিন্তার কারণ।

রানা আবার বলেন, আমি আশীর্বাদ করছি মা তুমি সুখী হবে।

স্বামী সমভিব্যাহারে হীরাবাঈ যোধপুরের প্রাসাদদুর্গে এসে পৌঁছাল পাঁচ দিন পরে দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে। এবং স্বামিগৃহে আসবার পর এক মাসও অতিবাহিত হলো না, স্বামী তার প্রতাপগড় দেবলে গিয়ে সেখানকার শিশোদীয় রায়মল্লর কন্যা চন্দনাকে বিবাহ করে নিয়ে এলো।

হীরাবাঈ মুহূর্তের জন্য বিমনা হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু অসাধারণ বুদ্ধিমতী হীরাবাঈ নিজেকে সামলে নেয়—এবং নিজেই এগিয়ে গিয়ে সপত্নীকে সাদরে হাত ধরে অন্দরণে নিয়ে এলো।

আর ঠিক তারই দিন দশেক পরে দেহলী থেকে ঔরংজীবের পত্রবাহী দূত এলো যোধপুরে।

সম্রাট ঔরংজীব মুহূর্তের জন্য ভুলতে পারেনি তার পৌত্রীর কথা। আকবর-কন্যা সুলতানীর জন্য তার দুশ্চিন্তার অবধি ছিল না, কারণ সুলতানীর ক্রমশঃ বয়স হচ্ছে—যুবতী সে এখন। আর তা ছাড়া অজিত সম্পর্কে কিছু কিছু কথা ইতিমধ্যে ঔরংজীবের গোচরীভূত হয়েছিল। অজিতের নারীপ্রীতির কথা তার কর্ণে প্রবেশ করার পর থেকেই আরো বেশী উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছিল ঔরংজীব তার পৌত্রী সম্পর্কে।

ইতিপূর্বে আরো কয়েকবার সম্রাট দুর্গাদাস এবং অজিতকে পত্র প্রেরণ করেছিল, কিন্তু দুর্গাদাস সম্মত হয়নি সম্রাটের প্রস্তাবে। তাছাড়া লায়লীও ফিরে যেতে ইচ্ছুক ছিল না।

কিন্তু এবারে লায়লী স্বয়ং এসে দুর্গাদাসের কাছে অনুরোধ জানাল, চাচাজী, আপনি আমাকে দেহলীতে পাঠিয়েই দিন।

সে কি বেটী—আজ একথা বলছো কেন—তুমি তো কখনো দেহলীতে ফিরে যেতে চাওনি!

না—চাইনি, কিন্তু আজ চাইছি। শুনুন চাচাজী, আমার মাথায় একটা মতলব এসেছে।

কি বেটী?

আপনি পত্রোত্তরে সম্রাটকে জানান আপনি আমাকে প্রত্যর্পণ করবেন, তবে একটি শর্তে—

কি—বিস্ময়ে তাকায় দুর্গাদাস সর্দার সুলতানীর মুখের প্রতি।

কুমার অজিতকে যোধপুরের অধীশ্বর বলে প্রকাশ্যে স্বীকৃতি দিয়ে তাঁকে তাঁর পিতৃসিংহাসনের অধিকার ফিরিয়ে দিতে হবে।

বলিস কি বেটী!—দুর্গাদাসের যেন বিস্ময়ের অবধি থাকে না।

এ শুধু একটা সামান্য শর্ত নয়, রীতিমত যাকে বলে একটা রাজনৈতিক চাল। কথাটা যে এবারে সম্রাটের পত্রপ্রাপ্তির পর দুর্গাদাস সর্দারেরও মনে হয়নি একবার তা নয়, কিন্তু এখন সেই ইচ্ছার প্রতিধ্বনি লায়লীর মুখে শুনে দুর্গাদাস যেন ভবিষ্যৎ পন্থা সহজেই নিরূপণ করতে পারে এবং সেই সঙ্গে লায়লীর প্রতি তার

শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা যেন তার সমস্ত অন্তরকে ছাপিয়ে যায়।

গভীর স্নেহে দুর্গাদাস সর্দার লায়লীর দিকে তাকিয়ে বলে, মাগো, তোকে আর কি বলব—আজ এইটুকু বুঝতে পারছি, পৃথিবীতে অজিতের এত বড় একজন সত্যিকারের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিণী থাকা সত্যিই ওর পরমতম সৌভাগ্য।

না না চাচাজী, ও কথা বলবেন না—আপনারা আমার আব্বাজানের জন্য যা করেছেন সে আর কেউ না জানুক আমি তো জানি—লায়লীর দুটি চক্ষু অশ্রুতে ঝাপসা হয়ে আসে—গলার স্বর রুদ্ধ হয়ে আসে। দ্রুত স্খলিত পায়ে লায়লী দুর্গাদাসের সামনে থেকে সরে যায়।

আর সেই মুহূর্তে লায়লীর ঐ অশ্রুভেজা দুটি সুর্মাটানা চক্ষু—রুদ্ধ গলার স্বর—দ্রুত পলায়ন অন্য একটি সত্যকে যেন অকস্মাৎ দুর্গাদাসের চোখের সামনে উদ্ঘাটিত করে দিয়ে যায়।

বুঝতে তার বাকী থাকে না আর অজিতের প্রতি লায়লীর অনুচ্চারিত নিবিড় প্রেম। তাড়াতাড়ি উচ্চকণ্ঠে ডাকে দুর্গাদাস সর্দার—লায়লী—বেটী শোন—শোন্ মা—শোন্—

কিন্তু লায়লীর কোন সাড়া পাওয়া গেল না। লায়লী আর ফিরে এলো না।

দুর্গাদাস আর কালক্ষয় করে না। সম্রাটের নিকট পত্র প্রেরণ করে, ঠিক যেমনটি লায়লী বলেছিল তেমনি একটি পত্র রচনা করে।

লায়লীকে সে প্রত্যর্পণ করবে তবে অজিতের পূর্ণ স্বীকৃতি চাই।

আশ্চর্য।

সম্রাট ঔরংজীব স্বীকৃত হলো। ঔরংজীব জানাল—তাই হবে।

পূর্ণ সন্ধির ব্যাপারটা অতঃপর আলোচিত হয়ে স্থির হলো, অজিত তার পিতৃসিংহাসনে উপবেশন করতে পারে—সেই সঙ্গে সম্রাট আরো কিছু উপঢৌকন দেবে বলে জানাল—অজিতের সিংহাসনপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে দুর্গাদাস সর্দারকে সম্রাট পঞ্চসহস্রের সৈনাপত্যে বরণ করে নেবে।

দুর্গাদাস জানাল, না সম্রাট, তার কোন প্রয়োজন নেই।

বিস্মিত সম্রাট শুধায়, চাও না ঐ সম্মান—সে কি কথা!

না—বরং যদি সত্যিই কিছু আপনি দিতে চান মাড়বারবাসীকে অজিতের স্বীকৃতির সঙ্গে সঙ্গে, তাহলে ঝালোর, শিবাঞ্চি ও থিয়াৎ প্রদেশগুলো আমাদের মাতৃভূমিকে প্রত্যর্পণ করলে জানবেন সত্যিই আমরা সুখী হবো—কৃতজ্ঞ হবো।

তাই হলো।

শীতের এক প্রত্যুষে রাজা যশোবন্তর সুবর্ণমুকুট মাথায় পরে সমগ্র মাড়বারবাসীর সামনে অজিত পিতৃসিংহাসনে উপবেশন করল।

প্রথমে সম্রাটের প্রতিনিধি হিসাবে সম্রাট-পুত্র আজিম গুর্জর থেকে এসে সম্রাটের স্মারকলিপি পাঠ করল, তারপর দেশবাসী জানাল তাদের স্বতঃস্ফূর্ত অন্তরের আনন্দোচ্ছ্বাস : জয়তু মহারাজ অজিতসিংহ!

পুরোহিত স্বস্তিবাচন পাঠ করল : জয়তু মহারাজ শ্রীমান অজিতসিংহ

যোধপুরে সেদিন সত্যিই বড় আনন্দের দিন। বড় উৎসবের দিন। পঞ্চদ্বারের মধ্যে প্রত্যেকটিতে মঙ্গলাচরণ হিসাবে এক-একটি করে মহিষ বলি দেওয়া হলো। আর সেই সঙ্গে এতকাল পরে রাজস্থান থেকে সুলতানীর বিদায়ের মুহূর্ত ঘনিয়ে এল।

॥ ৯ ॥

অজিত কিন্তু প্রথমটায় কথাটা শুনে দুর্গাদাসের প্রস্তাবে সম্মতি দিতে চায়নি। বলেছিল, না—এ হতে পারে না—হবে না—

কিন্তু দুর্গাদাসের সঙ্গে সমস্ত সামন্ত সর্দাররা যখন একত্র হয়ে বললে, অমত করো না মহারাজ—এ অতি উত্তম প্রস্তাব, তখন অতগুলো লোকের মতের বিরুদ্ধে অজিত দাঁড়াতে পারেনি। সম্মতি দিয়ে সম্রাটের নিকট লেখা পত্রে শেষে স্বাক্ষর করে দিয়েছিল। এবং স্বাক্ষর করে দিয়ে অন্দরণে গিয়ে এসে সোজা গিয়ে হাজির হয়েছিল লায়লীর কক্ষের দ্বারের সামনে। কিন্তু লায়লীর সঙ্গে দেখা হয়নি।

লায়লীর প্রধানা দাসী বিনীতভাবে বলেছিল, সুলতানী প্রচণ্ড শিরঃপীড়ার ঔষধের প্রভাবে নিদ্রাচ্ছন্ন। কবিরাজের নির্দেশ আছে—তাঁকে বিরক্ত না করা হয়—

অজিতকে ফিরে আসতে হয়েছিল। এবং তারপর আরো কয়েকবার চেষ্টা করেও তার সঙ্গে অজিত দেখা করতে পারেনি। লায়লীর সঙ্গে দেখা হয়নি। তারপর কয়দিন অজিতকেই সিংহাসনে উপবেশনের ব্যাপারে—অত্যাসন্ন উৎসবের ব্যাপারে বিশেষভাবে ব্যস্ত থাকতে হয়েছিল—লায়লীর কোন খবরাখবর করতে পারেনি।

বিদায়ের দিন রাজসভা থেকে অন্দরণে ফিরে আসতেই লায়লীর প্রধানা দাসী অজিতের সামনে এসে অভিবাদন করে সসম্ভ্রমে দাঁড়াল।

মহারাজ—

কি চাই ?

সম্রাট-পৌত্রী সুলতানী আজ এখান থেকে চলে যাচ্ছেন, তাই তিনি যাবার পূর্বে আপনাকে অভিবাদন জানাতে চান।

কোথায় সে ?

তাঁর কক্ষে।

যাও—আমি যাচ্ছি—

দাসী পুনরায় অভিবাদন জানিয়ে স্থান ত্যাগ করল।

যাত্রার জন্য প্রস্তুত হয়েই দাঁড়িয়ে ছিল লায়লী। অজিত এসে তার কক্ষে প্রবেশ করল।

আভূমি নত হয়ে লায়লী কুর্নিশ জানায় অজিতকে, লায়লীর সশ্রদ্ধ অভিবাদন

গ্রহণ করুন মহারাজ।

লায়লী—

মহারাজ—

তাহলে সত্যি সত্যিই তুমি আমায় ত্যাগ করে চললে ?

লায়লীর বুকের ভিতরটা যেন কি এক যন্ত্রণায় মোচড় দিয়ে ওঠে। একবার বুঝি ইচ্ছা হয় চেঁচিয়ে বলে ওঠে, না গো না—তোমাকে ছেড়ে আমি কোথায় যাবো—কোথায় আমার যাবার জায়গা আর—দেহটা আমার এখান থেকে দেহলীতে চলে গেলেও মনটা যে আমার এখানেই পড়ে থাকবে সর্বক্ষণ। কিন্তু বুকের কথা বুকের ভিতরেই গুমরে গুমরে মরে।

দু চোখের সমস্ত সংযম অবাধ্য অশ্রু বুঝি ভাসিয়ে নিয়ে যেতে চায়—কিন্তু না—সংযম হারালে তো চলবে না। চোখের জল ফেললে তো চলবে না। আর কেনই বা ফেলবে—কার কাছেই বা ফেলবে। ঐ বুকের মধ্যে লায়লীর স্থান কোথায় ? ঐ বুকের সবটাই যে সংযুক্তা অধিকার করে বসে আছে।

মনকে দৃঢ় করে লায়লী। পাষাণের মত বুঝি কঠিন করে। তারপর ধীরে ধীরে চোখ তুলে তাকায় অজিতের দিকে। মহারাজ, ভুলে যাচ্ছেন কেন সেই আমার ঘর, তারাই আমার আপনার জন।

আপনার জন—সেই তোমার ঘর—আর এই ঘর বুঝি তোমার ঘর নয় লায়লী—আমরা বুঝি তোমার কেউ নই ?

লায়লী মাথা নীচু করে থাকে।

এতকাল পরে তুমি এই কথা বললে লায়লী—

মৃদু হাসে লায়লী, তারপর বলে, আপনি একটু ভুল করছেন না কি মহারাজ ?

লায়লী—কি বলছো তুমি—

তাই মহারাজ—ভুলে যাচ্ছেন কেন, আপনাদের চিরশত্রু সম্রাট ঔরংজীব আমার দাদু—আমি আপনাদের শত্রুপক্ষের মেয়ে।

লায়লী—একটা অস্পষ্ট আর্তনাদ করে ওঠে যেন অজিত।

লায়লী বলে, শত্রুপক্ষের মেয়েকে বিশ্বাস করাটাই কি আপনার ভুল নয় ?

ওঃ, তাহলে তুমি এর পর আমার সঙ্গে শত্রুতাও করতে পারো ?

তা যদি করিই মহারাজ, তাতে আশ্চর্য হবার কি আছে—সেটাই তো একান্ত স্বাভাবিক—

হুঁ—ঠিকই বলেছো তুমি লায়লী। ভুল আমারই হয়েছে—কথাগুলি বলে অজিত আর কক্ষের মধ্যে দাঁড়াল না।

স্খলিতপদে কক্ষ হতে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেল।

আর সঙ্গে সঙ্গে কক্ষের মেঝেতে বিস্তৃত গালিচার ওপরে লুটিয়ে পড়ে লায়লী।

কান্নায় ভেঙে পড়ে।

তাই—তাই হোক গো—তোমার বুকভরা ঘৃণাই আমার যাত্রাপথের সম্বল

হোক। আমার জন্য তোমার ঘৃণাই শুধু থাক—ঘৃণাই থাক—

নিঃশব্দে পশ্চাতের দ্বার-পথে ঐ সময় হীরাবাঈ লায়লীর কক্ষে প্রবেশ করল। আড়াল থেকে সব সে শুনেছে। স্বামীকে সে সর্বদা যেন ছায়ার মত অনুসরণ করে। স্বামীকে লায়লীর কক্ষের দিকে আসতে দেখামাত্রই নিঃশব্দে তাকে অনুসরণ করে ঐ পশ্চাতের দ্বারের ওদিকে আত্মগোপন করে দাঁড়িয়ে ছিল। সব কথাই তার কর্ণে প্রবেশ করেছে।

কয়েকটা মুহূর্ত নিঃশব্দে ভূলুণ্ঠিতা ক্রন্দনরতা সুলতানীর দিকে অশ্রুপূর্ণ নয়নে তাকিয়ে থেকে একসময় ওর একেবারে পাশটিতে এসে দাঁড়াল। একটু যেন ইতস্ততঃ করল, তারপর ধীরে ধীরে ওর মাথায় একখানি সস্নেহ হাত রাখল।

শাহজাদী—

মৃদু কণ্ঠে ডাকে হীরাবাঈ।

লায়লী কোন জবাব দেয় না। পূর্ববৎ ফুলে ফুলে কাঁদতে থাকে।

উঠুন শাহজাদী—সমগ্র রাজস্থানের পক্ষ থেকে এক নারী আপনাকে অজস্র ধন্যবাদ জানাচ্ছে।

কে—

উঠে বসে লায়লী।

তাড়াতাড়ি ওড়না দিয়ে চোখের জল মুছে ফেলে।

শাহজাদী, আমি হীরাবাঈ।

পট্টমহাদেবী—

না শাহজাদী—পট্টমহাদেবী নয়—আজ থেকে আমরা পরস্পর পরস্পরের বহিন।

বহিন।

হ্যাঁ।

দু হাতে হীরাবাঈ শাহজাদীকে বুকের ওপরে টেনে নেয়।

কিন্তু এত বড় ভুলটা কেন করলে বহিন—হীরাবাঈ বলে।

ভুল—

নয়। ও তো কোনদিনই তোমার এ প্রেমের মূল্য বুঝবে না।

না, না—কোন মূল্য চাই না আমি, কোন মূল্য চাই না—একটা—একটা কথা বহিন—। লায়লী হীরাবাঈয়ের হাতটা চেপে ধরে দু হাতে।

কি বহিন ?

একথা যেন কোন দিন—

ভয় নেই—কোন দিনই প্রকাশ পাবে না—কেউ জানবে না। কিন্তু একটা কথা বহিন—

বল বহিন।

তুমি ওকে ক্ষমা করবে বল। নচেৎ—

লায়লী হীরাবাঈকে তার কথা শেষ করতে দেয় না, তাড়াতাড়ি ওর মুখে হাত চাপা দেয়।

সম্রাট-পৌত্রী লায়লী দেহলীতে ফিরে গেল।

সম্রাটের সৈন্যবাহিনী ছাড়াও দুর্গাদাস সর্দার লায়লীর সঙ্গে পঞ্চাশ জন সুদক্ষ অশ্বারোহী সৈন্য তার দেহরক্ষী হিসাবে সঙ্গে দিয়ে দিল।

তারা শাহজাদীকে দেহলীতে পৌঁছে দিয়ে তারপর ফিরে আসবে।

অজিত সংযুক্তার কথা ভুলতে পারেনি।

সর্বক্ষণ তার মনের মধ্যে সংযুক্তার স্মৃতি যেন আগুনের মতই জ্বলছিল।

এমন সময় এক অপরাহ্ণে মঘা এসে অজিতের বিশ্রামকক্ষে প্রবেশ করল।

মহারাজ—

মঘা আভূমি নত হয়ে অজিতকে অভিবাদন জানাল।

মঘা—

মহারাজ, সংবাদ আছে—নিম্ন চাপা কণ্ঠে বলে মঘা।

অজিত উঠে বসে শয্যার ওপরে।

উৎকণ্ঠিত দৃষ্টিতে মঘার কুৎসিত মুখটার দিকে তাকায়।

মহারাজ, সংযুক্তার খবর পেয়েছি।

পেয়েছিস্!

আগ্রহে উত্তেজনায় উঠে দাঁড়িয়েছে ততক্ষণে অজিতসিংহ। প্রশ্ন করে, বল্, বল্ কোথায় সে?

কঠিন জায়গা মহারাজ।

কঠিন জায়গা।

হ্যাঁ মহারাজ, সে দুর্গাদাস সর্দারের গৃহে আছে।

কি বললি—দুর্গাদাস সর্দারের ওখানে?

হ্যাঁ।

হঠাৎ যেন স্তব্ধ হয়ে যায় অজিতসিংহ। বিমূঢ় হয়ে পড়ে। দুর্গাদাস সর্দারের ওখানে আছে সংযুক্তা।

রম্ভা তাহলে রীতিমত কৌশলের আশ্রয় নিয়েছে।

মঘা—

মহারাজ—

যেমন করে যেভাবেই হোক, সর্দারের আশ্রয় থেকে পারবি না সংযুক্তাকে চুরি করে আনতে?

মহারাজ—

কণ্ঠের বহুমূল্য রত্নহারটি খুলে হাতের ওপরে দোলাতে দোলাতে অজিতসিংহ বলে, পারবি তুই? যদি পারিস তো এই রত্নহার পারিতোষিক পাবি—

মঘার কুৎসিত মুখটা কুৎসিত হাসিতে যেন আরো কুৎসিত বীভৎস হয়ে

ওঠে। বলে, পারবো মহারাজ!

মঘা কক্ষ থেকে বের হয়ে গেল। এবং মঘা ও অজিতসিংহ দুজনার একজনাও জানতে পারল না, পশ্চিমের বাতায়নের ওপাশে দাঁড়িয়ে হীরাবাঈ সব শুনতে পেল।

সংযুক্তার ব্যাপারটা সে কিছুই জানত না—তখন পর্যন্ত শোনেনি।

সংযুক্তা—সংযুক্তা কে? কে বলবে—কে বলে দেবে তাকে? কার কাছ থেকে পাবে সংযুক্তার পরিচয়?

নিজের কক্ষের দিকে ফিরছিল হীরাবাঈ, হঠাৎ রম্ভার কণ্ঠস্বরে থমকে দাঁড়ায় —মুখ তুলে চায়।

পট্টমহাদেবী—

দাইমা!

হীরাবাঈ ঐ নামেই সম্ভাষণ করত রম্ভাকে।

কি হয়েছে পট্টমহাদেবী—মুখখানা তোমার অমন শুকনো লাগছে কেন?

দাইমা—

বল মা।

সংযুক্তা কে জানো?

কে—কার কথা বললে?

সংযুক্তা কে—জান কিছু?

মুহূর্তকাল নিঃশব্দে চেয়ে থেকে রম্ভা হীরাবাঈয়ের মুখের দিকে, তারপর প্রশ্ন করে, কেন—কোথায় শুনলে ও নাম? কার কাছ থেকে শুনলে?

পঞ্চম পর্ব : অনবগুণ্ঠিতা

॥ ১ ॥

ও নামটা তুমি কার কাছে শুনলে ? কথাটা বলে হীরাবাঈয়ের মুখের দিতে তাকাল রুম্ভা।

মেওয়ারের এই মেয়েটি বয়েসে তার চাইতে অনেক ছোট এবং কন্যার মত হলেও বধূবেশে এই প্রাসাদগৃহে পা দেবার পরই দু'চারটি কথা বলেই রুম্ভা বুঝতে পেরেছিল, শুধুমাত্র রূপের দিক দিয়েই অসাধারণ নয়, মেয়েটি বুদ্ধিমতীও অসাধারণ। সেই বুদ্ধির সঙ্গে মেয়েটির চরিত্রে আরো একটি গুণ আছে—ধীর শান্ত ও আত্মমর্যাদায় মেয়েটি সুকঠিন। ওকে দেখলে, ওর কথায়বার্তায় চালচলনে সব কিছুতেই যেন মনে হবে ও পৃথিবীতে এসেছে রানীর মর্যাদা আর অধিকার নিয়েই।

আর তাইতেই রুম্ভা যেন কতকটা নিশ্চিন্ত হয়েছিল অজিতসিংহ সম্পর্কে।

চঞ্চল অস্থির প্রকৃতির দুর্মদ অজিতকে ও ঠিক পথেই চালিয়ে নিয়ে যেতে পারবে—রুম্ভার কেন যেন মনে হয়েছিল হীরাবাঈকে দেখেই।

হীরাবাঈয়েরও এ প্রাসাদে পা দিয়ে রুম্ভাকে দেখে ও তার সঙ্গে দু'চারটে কথাবার্তা বলেই মনে হয়েছিল, প্রাসাদদুর্গে যে আরো অনেক নানাবয়সী নারী আছে, দাইমা রুম্ভা তাদের মধ্যে স্বতন্ত্র।

তার সব কিছুর মধ্যেই যেন একটা বিশেষ আভিজাত্য—একটা বিশেষ মর্যাদাবোধ আছে। এবং হীরা রুম্ভা সম্পর্কে ভাল করে খোঁজ নিয়ে জেনেছিল, একদা ঐ অপরূপ রূপলাবণ্যবতী নারী স্বর্গীয় মহারাজার নর্মসহচরী ছিল এবং পরবর্তীকালে পিতৃমাতৃহারা শিশু অজিতের পালন ও রক্ষাকর্ত্রী। এবং রুম্ভা মাড়বারের নয়, মেওয়ারের এক দুঃস্থ সম্ভ্রান্ত ঘরের কন্যা।

হীরাবাঈ রুম্ভাকে তার পর হতেই যথাযোগ্য সম্মান ও শ্রদ্ধা জানিয়ে এসেছে।

সংযুক্তাকে দুর্গাদাসের গৃহে পাঠিয়ে দেবার পর হতেই রুম্ভা যেন নিজেকে প্রাসাদের সব কিছু থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়েছিল।

অজিতের দাইমা ও পালনকর্ত্রী হিসাবে একদিন প্রাসাদের মধ্যে তার যে অবিসংবাদী কর্ত্রীত্ব ছিল, সেই কর্ত্রীত্ব থেকে সে যেন নিজেকে একটু একটু করে দূরে সরিয়ে নিয়েছিল।

তার দুটো কারণ ছিল। প্রথমতঃ অজিতের বেদনাদায়ক ব্যবহার এবং দ্বিতীয়ঃ একমাত্র সন্তান সংযুক্তার বিচ্ছেদ ও তার ভবিষ্যৎ-চিন্তা।

সংযুক্তাকে দুর্গাদাসের গৃহে পাঠিয়ে দিলেও তার জন্য চিন্তার অবধি ছিল না রুম্ভার। অজিত সংযুক্তাকে সহজে ভুলতে পারবে না এও যেমন সত্য—তেমনি সংযুক্তার একটা সত্যিকারের চিরস্থায়ী ব্যবস্থা না করা পর্যন্ত অজিতের

হাত থেকে সংযুক্তার নিষ্কৃতি নেই সেও তেমনি সত্য। কিন্তু রম্ভা কিছুতেই ভেবে পাচ্ছিল না সে কি ব্যবস্থা করতে পারে সংযুক্তার। সংযুক্তার সত্যিকারের পরিচয় কোন দিনই রম্ভা দিতে পারবে না—আর তা সম্ভবপরও নয়। অথচ সংযুক্তা চিরদিনই অজ্ঞাতকুলশীলা থেকে যাবে—কাউকেই তার সত্য পরিচয় দিতে পারবে না—এমন কি সংযুক্তাকেও কোনদিন বলতে পারবে না। নিরুপায়তার বেদনারও যেন কোন সান্ত্বনা ছিল না।

তার উপরে কয়েক দিন পূর্বে কন্যার সংগে কথাপ্রসংগে অজিতের প্রতি সংযুক্তার সত্যিকারের মনোভাবটা জানতে পেরে রম্ভা যেন আরো দিশেহারা হয়ে পড়েছিল। কয়েক দিন পূর্বে রম্ভা দুর্গাদাসের গৃহে এক রাত্রে গোপনে গিয়ে কন্যার সঙ্গে দেখা করেছিল।

সংযুক্তার সে চেহারা আর নেই। সে হাসিখুশী ভাবও যেন আর নেই। কেমন যেন রুগ্ণ কৃশ আর সদাবিষণ্ন।

দুর্গাদাস সর্দারই রম্ভাকে সংবাদটা দিয়েছিল—সংযুক্তা যেন কেমন সর্বদা বিষণ্ন মনমরা হয়ে থাকে। ভাল করে কারো সঙ্গে কথা বলে না—হাসি নেই আনন্দ নেই—সর্বক্ষণই যেন কি ভাবছে।

সংযুক্তাকে দেখে রম্ভাও যেন চমকে উঠেছিল। এ কি চেহারা হয়েছে তোর?

মেয়ে মাকে দু হাতে জড়িয়ে ধরে মায়ের বুকের মধ্যে মাথাটা গুঁজে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে।

কি হয়েছে সংযুক্তা?

কিছু না।

না যদি তবে এমন চেহারা হয়েছে কেন। আর মামাজীও বলছিল, তুই কারো সংগে মিশিস না—গল্প করিস না।

ভাল লাগে না আমার। সংযুক্তা বলেছিল মৃদু কণ্ঠে।

ভাল লাগে না? মা বিস্ময়ে তাকায় মেয়ের মুখের দিকে।

না।

কেন?

জানি না।

অতঃপর মা মেয়ের মুখটা তুলে ধরে শুধিয়েছিল, সত্যি করে বল্ তো কি হয়েছে তোর।

এখানে আমার থাকতে একটুও ভাল লাগে না।

কেন রে—মামাজী কি—

না, না—মামাজী আমাকে খুব ভালবাসেন।

তবে?

মেয়ে চুপ করে থাকে। কোন জবাব দেয় না।

সংযুক্তা।

মা।

এখানে তোর কেন ভাল লাগে না বল্ তো ?

মা—

কি ?

আমাকে আবার প্রাসাদদুর্গে নিয়ে চল—আমি—

কি—থামলি কেন, বল।

অজিতকে না দেখতে পেলে আমার ভাল লাগে না।

ভূত দেখার মতই যেন চমকে ওঠে রম্ভা।

অর্ধস্ফুট একটা আর্তনাদ যেন রম্ভার কণ্ঠ চিরে বের হয়ে আসে, সংযুক্তা—

হ্যাঁ মা, সব সময়ই আমার অজিতের কথা মনে পড়ে। মনে হয়, সে যেন প্রাসাদের সর্বত্র আমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে।

না, না—তা হবে না—হবার নয়—পূর্ববৎ অর্ধস্ফুট কণ্ঠে যেন চীৎকার করে ওঠে রম্ভা।

বিস্ময়ে সংযুক্তা মায়ের মুখের দিকে তাকায়।

মা—

তা হবার নয় সংযুক্তা।

হবার নয়!

না। তাকে তুই ভুলে যা সংযুক্তা।

ভুলে যাবো ?

হ্যাঁ—আমি তোর মা। তোকে বলছি পৃথিবীতে তার চাইতে বড় শত্রু আর তোর নেই।

কি বলছো মা। অজিত আমার শত্রু—

হ্যাঁ হ্যাঁ—শত্রু।

তুমি কি পাগল হয়ে গেলে মা। সে আমাকে কত ভালবাসে—

অজিত তোকে ভালবাসতে পারে না।

তুমি জান না। আমি জানি সে আমাকে ভালবাসে।

তোকে ভালবাসা তার পক্ষে পাপ।

পাপ!

হ্যাঁ—মহাপাপ।

কেন—কেন—একথা কেন তুমি বলছো ?

মেয়ে মায়ের মুখের দিকে তাকায়।

আর কিছু জিজ্ঞাসা করিস না আমাকে—যা বললাম মনে রাখিস—তার চাইতে সত্য আর নেই।

না—আমি তোমার কোন কথা শুনতে চাই না।

সংযুক্তা—

তোমাকে বলতেই হবে কেন তার আমাকে ভালবাসা পাপ।

সংযুক্তা—

হঠাৎ দুর্গাদাসের কণ্ঠস্বরে মা ও মেয়ে দুজনেই ফিরে তাকায়। দুর্গাদাস যে ইতিমধ্যে কখন ঐ ঘরের মধ্যে এসে প্রবেশ করেছে দুজনার একজনাও জানতে পারেনি।

মামাজী—

তোর মা তোকে ঠিক কথাই বলেছেন বেটী।

কিন্তু মামাজী—

শোন্ বেটী, আমি তোকে সব কথা বুঝিয়ে বলব।

না, না—দাদা—রম্ভা আর্তকণ্ঠে প্রতিবাদ জানায়।

ওকে জানতে দাও সত্য কথাটা রম্ভা।

না—দাদা—না—তা হয় না।

কিন্তু রম্ভা—

দাদা—আজ সত্য প্রকাশ হয়ে পড়লে যে ঝড় উঠবে, সে ঝড়কে সামলাতে কি তুমি পারবে?

মা মা—বল মা—বল কি আমাকে তুমি গোপন করেছো?

রম্ভা আর সেখানে দাঁড়াতে পারেনি।

একপ্রকার ছুটেই যেন পালিয়ে এসেছিল।

কিন্তু নিজের মেয়ের সামনে থেকে সেদিন পালিয়ে এলেও, রম্ভা বুঝতে পারে হীরাবাঈয়ের কাছ থেকে সে পালিয়ে বাঁচতে পারবে না।

হীরাবাঈ প্রশ্নটা করে তখনো স্থিরদৃষ্টিতে রম্ভার মুখের দিকে নিঃশব্দে তাকিয়ে আছে।

হীরাবাঈ আবার ডাকে, দাইমা—

রম্ভা ধীরে ধীরে মুখ তুলল। তার দু চোখের কোলে জল টলমল করছে।

সংযুক্তা কে তুমি তো বললে না!

পট্টমহাদেবী—

মনে হচ্ছে সংযুক্তার কথাটা বলতে তোমার কষ্ট হচ্ছে?

না মা—কষ্ট হলেও অন্ততঃ তোমার কাছে আজ আমাকে সত্যটা প্রকাশ করতেই হবে।

দাইমা—

হ্যাঁ মা—যদি কেউ সেই অভাগিনীকে রক্ষা করতে পারে তো সে একমাত্র তুমিই।

আমি।

হ্যাঁ—তুমি—তুমিই পট্টমহাদেবী। শোন—সংযুক্তা আমার মেয়ে।

তোমার মেয়ে।

হ্যাঁ—আমারই গর্ভজাত কন্যা।

তোমার—কিন্তু তুমি—

হ্যাঁ—যদিও শাস্ত্রানুযায়ী সংযুক্তার জন্মদাতার সঙ্গে বিবাহ হয়নি সর্বসমক্ষে,

তথাপি সংযুক্তার বাপই আমার স্বামী।

স্বামী!

হ্যাঁ—গন্ধর্বমতে সকলের অজ্ঞাতে তিনি আমায় স্ত্রী বলে গ্রহণ করেছিলেন।

কিন্তু—

অবশ্য তিনি আমাদের গন্ধর্ব বিবাহের কথাটা সকলকে জ্ঞাত করতে বার বার চেয়েছিলেন—আর তিনি বেঁচে থাকলে তা একদিন হতোও।

সংযুক্তার পিতা কি জীবিত নেই?

না—

তারপর একটু চুপ করে থেকে রম্ভা পুনরায় বলে, সবটাই আমার দুর্ভাগ্য। সংযুক্তা যখন আমার গর্ভে মাত্র তিন কি চার মাস সেই সময় অকস্মাৎ সংযুক্তার পিতার মৃত্যু হয়।

কিন্তু কে—কে সংযুক্তার পিতা?

তোমার স্বামী মহারাজ অজিতের স্বর্গীয় পিতা।

দাইমা—

অর্ধস্ফুট একটা চীৎকার করে ওঠে যেন হীরাবাঈ। এবং সঙ্গে সঙ্গে বিস্ময়ে যেন একেবারে বোবা হয়ে যায়। তার মুখ দিয়ে কয়েকটা মুহূর্ত আর কোন কথাই বের হয় না।

এ—এ কথা আর কেউ জানে?

জানে—মাত্র একজন—আর—আর তৃতীয় তুমি আজ জানলে।

কে—কে সে দাইমা?

দুর্গাদাস সর্দার।

সর্দার জানেন?

হ্যাঁ—আর সেই কারণেই তাঁর আশ্রয়ে সংযুক্তাকে আমি লুকিয়ে রেখেছি।

অতঃপর ধীরে ধীরে সংযুক্তা কাহিনী আনুপূর্বিক রম্ভা হীরাবাঈয়ের কাছে বলে যায়। হীরাবাঈ যেন একেবারে পাথর। অজিত সংযুক্তাকে ভালবাসে আর সংযুক্তাও তাকে ভালবাসে, অথচ তারা জানে না তাদের পরস্পরের সম্পর্কটা।

রম্ভা বলে, এখন তুমিই বল মা আমি ঠিক করেছি কি অন্যায় করেছি?

কিন্তু দাইমা—

বল।

সংযুক্তাকে কতদিন এমনি করে তুমি ওর কাছ থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে পারবে—তার চাইতে যদি প্রথম থেকেই ওদের জানতে দিতে ওরা সম্পর্কে ভাই বোন—

তাতে কোনই লাভ হতো না মা, অন্য দিক দিয়ে জটিলতার সৃষ্টি হতো।

কিন্তু যে জটিলতার সৃষ্টি করেছ তুমি, তাও কম নয়।

পারবে না মা—এর একটা উপায় তুমি বের করতে পারবে না?

পারবো না হয়তো, তবু আমি চেষ্টা করবো।

॥ ২ ॥

হীরাবাঈ রম্ভাকে মুখে আশ্বাস দিলেও বুঝতে পারে না কি করে সে অসম্ভবকে সম্ভব করবে। তার স্বামী একবার যখন জেনেছে সংযুক্তা কোথায় আছে সে তাকে ফিরে পাবার—নিজের অধিকারের মধ্যে ফিরিয়ে আনবার যথাসাধ্য চেষ্টা করবেই। সেক্ষেত্রে স্বামীর সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় কতটুকু সফল সে হতে পারবে? তার স্বামী মাড়বারের রাজাধিরাজ—অসীম ক্ষমতা ও লোকবল তার—আর সে অন্তঃপুরবাসিনী। পুরাঙ্গনা। রাজান্তঃপুরের বাইরে তার ক্ষমতা সীমিত।

কিন্তু তাকে একটা ব্যবস্থা করতেই হবে, কারণ এ কেবলমাত্র একজন নারীর মানসম্ভ্রমকে রক্ষা করাই নয়—তার স্বামীর ধর্ম ও তার শ্বশুরের ধর্মকেও রক্ষা করা। তার স্বামীর সঙ্গে ঐ মঘার যে সব কথাবার্তা হয়েছিল, তার সব কিছুই কানে গিয়েছিল হীরাবাঈয়ের।

মঘা লোকটাকে দেখলেই যেন কেমন গা ঘিন ঘিন করে হীরাবাঈয়ের। যেমন বেঁটে তেমনি কদাকার। যেন ছোটখাটো একটা বনমানুষ। গা-ভর্তি লোম—মাথাটা ছোট—কপালের সামনে দুটো শিংয়ের মত যেন উঁচু হয়ে আছে।

তাছাড়া গোপনে খবর নিয়ে হীরা জানতে পারে, ঐ মঘাকে আর যাই হোক উৎকোচের দ্বারা কখনো বশীভূত করা যাবে না। সে প্রাণ দেবে, তবু তার প্রভুর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করবে না। আর এও ঠিক একমাত্র মঘাই হয়তো সংযুক্তাকে দুর্গাদাসের ওখান থেকে কোনমতে কৌশলে বের করে নিয়ে আসতে পারে। যেমন করে হোক বাধা দিতেই হবে তাকে।

দুর্গাদাসকে একটা সংবাদ পাঠালে হয় না? কিন্তু দুর্গাদাস সর্দারের নামই কেবল সে শুনেছে—চাক্ষুষও তাকে দেখেনি এবং তার সঙ্গে কোন পরিচয়ও নেই। তা নাই বা থাক, দুর্গাদাসকে একটা সংবাদ দেওয়া প্রয়োজন।

কিন্তু কি উপায়ে? কেমন করে সংবাদটা পাঠাবে হীরা দুর্গাদাসের কাছে? রম্ভাকে দিয়ে সংবাদটা পাঠান যেত, কিন্তু মঘার মুখে সংযুক্তার দুর্গাদাসের গৃহে অবস্থিতির কথাটা জানতে পারার সঙ্গে সঙ্গেই অজিত রম্ভার সমস্ত গতিবিধির ওপরে কঠোর প্রহরার ব্যবস্থা তো করেছিলই, সেই সঙ্গে সে যাতে কোনক্রমে কখনো দুর্গপ্রাসাদের বাইরে না যেতে পারে তারও কঠোর ব্যবস্থা করেছিল। রম্ভাকে একপ্রকার দুর্গপ্রাসাদে বন্দিনীই করেছিল। আর তার নিজের পক্ষেও তো দুর্গাদাসের গৃহে যাওয়া সম্ভব নয়। অবশেষে ভেবে ভেবে হীরাবাঈ একটা মতলব স্থির করে। একটা পত্র লিখে দুর্গাদাসকে সব কথা জানিয়ে দেবে সে। পত্র সে রচনাও করল।

মহামান্য সর্দার—

আপনাকে একটি বিশেষ ব্যাপার জ্ঞাত করাইতেছি। কিন্তু তাহার পূর্বে আমার পরিচয় আপনাকে দেওয়া প্রয়োজন।

আমি হীরাবাঈ রাজমহিষী। আপনার কন্যাতুল্য।

সর্দার, আপনার গৃহে যে বহুমূল্য দ্রব্যটি রক্ষিত আছে সে সংবাদটি মহারাজ

জানিবেন যেভাবেই হউক অবগত হইয়াছেন। এবং তিনি হয়ত কৌশলে সে বস্তুটি আপনার নিকট হইতে ছিনাইয়া আনিবার চেষ্টা করিবেন। অথচ আপনি তো জানেন তাহাতে কি অমঙ্গল হইবার সম্ভাবনা। বস্তুটি সম্পর্কে আমি সব কিছুই অবগত আছি জানিবেন। ইতি—

রাজমহিষী।

পত্র রচনা করা হলো। এখন এ পত্র কিভাবে দুর্গাদাসের হাতে পেঁছে দেওয়া যায়। হীরাবাঈ রম্ভার পরামর্শ নেবে স্থির করে। এবং রম্ভার কক্ষে গিয়ে উপস্থিত হয়।

দাইমা।

পট্টমহাদেবী—

দাইমা—একটি পত্র আমি দুর্গাদাস সর্দারের কাছে প্রেরণ করতে চাই।

পত্র।

হ্যাঁ।

হীরাবাঈ রম্ভাকে পত্রের ব্যাপারটা খুলে বলে।

কাউকে দিয়ে পত্রটা সেখানে পাঠানো যায় না দাইমা? এই দুর্গপ্রাসাদের মধ্যে কাউকে—

রম্ভা বলে, আছে—একজন।

কে?

তারা।

হীরাবাঈ বলে, হ্যা, ঠিক বলেছো দাইমা—ঐ তারাই আমাদের পত্র নিয়ে যাক।

বলা বাহুল্য, সেই মতই ব্যবস্থা হলো। ঐ দিনই রাত্রে তারার হাত দিয়ে হীরার পত্রখানি প্রেরিত হলো দুর্গাদাস সর্দারের কাছে। তারা পত্রখানি নিয়ে গোপন সুড়ঙ্গপথ দিয়ে প্রাসাদদুর্গ থেকে নিষ্ক্রান্ত হলো। হীরা তাকে বার বার সাবধান করে দিয়েছিল। তারা হেসেছিল। বলেছিল, কোন ভয় নেই পট্টমহাদেবী, আমি পত্র পেঁছে দেবো।

দেখো যেন মহারাজ কোনমতে না জানতে পারেন।

জানতে পারবেন না। আপনার কোন ভয় নেই পট্টমহাদেবী। তারা আশ্বাস দেয় হীরাবাঈকে।

কিন্তু তারা জানত না—জানতেও পারেনি—রম্ভার ওপরে সর্বক্ষণ দৃষ্টি রাখতে বলে মহারাজ অজিত তার অনুচরদের বিশেষভাবে নির্দেশ দিয়েছিল তারার ওপরেও দৃষ্টি রাখতে।

তারা রম্ভার বিশ্বস্ত অনুচরী।

অজিত সংযুক্তার সংবাদটা পাওয়ার পর তখনো স্থির করতে পারেনি কিভাবে কি উপায়ে সংযুক্তাকে সে দুর্গাদাস সর্দারের আশ্রয় থেকে ছিনিয়ে আনবে।

রাঠোর সর্দারগণের মধ্যে দুর্গাদাস শুধু যে একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি ছিল তাই

নয়, তার যেমন শক্তি ছিল সমগ্র মাড়বারে তেমনি তার প্রতিপত্তি ছিল। দুর্গাদাস সর্দার যদি তার বিরুদ্ধে যায়, তাহলে সমগ্র মাড়বার তার বিরুদ্ধে যাবে। তাছাড়া ঐ দুর্গাদাস সর্দারের প্রতি তার একটা শ্রদ্ধাই নয় কেবল, বিশেষ কৃতজ্ঞতাও ছিল, যেহেতু ঐ দুর্গাদাস সর্দার না থাকলে তার পক্ষে আজ বেঁচে থেকে রাজসিংহাসনে বসা ছিল স্বপ্নাতীত ব্যাপার।

তাকে একটা কীটের মতই বহু আগে সম্রাট ঔরংজীব শেষ করে ফেলত। আরো—দুর্গাদাস সর্দার তার স্বর্গীয় পিতার পরম হিতৈষী বন্ধু ও মঙ্গলকাঙ্ক্ষী ছিল। তার পিতার বয়েসী দুর্গাদাস সর্দার। তার বিরুদ্ধে দাঁড়াবার পূর্বে তাকে সব দিক ভাল করে চিন্তা করে তারপর অগ্রসর হতে হবে। হুট্ করে কিছু একটা করা বুদ্ধিমানের বিবেচকের কাজ হবে না। দেশের লোকের কাছে দুর্গাদাস দেবতার মত সম্মানিত।

তাকে মনে মনে পূজো করে দেশের লোকেরা।

এ মাতা। পুত এসা জিন
যেসা দুর্গাদাস,
বন্দে মুদ্রা রোখিও
বিন থাম্বা আকাশ।

ওগো জননী—মায়েরা—ঐ দুর্গাদাসের মত পুত্র প্রসব করো, যিনি প্রথমে মুদ্রের (মরুর) বাঁধকে রক্ষা করে পরে আকাশকে স্তম্ভের দ্বারা ধারণ করলেন।

সেই দুর্গাদাসের গৃহে রম্ভা সংযুক্তাকে রেখে এসেছে। অন্য কোথাও হলে কোন চিন্তার, ভয়ের বা সংকোচের কিছু ছিল না। রাতারাতি ঘরে আগুন ধরিয়ে তার সৈন্যদের দিয়ে সংযুক্তাকে লুঠ করে নিয়ে আসত অজিত।

রম্ভা রীতিমত কৌশলের আশ্রয় নিয়েছে।

মঘা অবিশ্যি বলেছে সে সংযুক্তাকে উদ্ধার করে এনে দেবেই।

দুর্গাদাসের গৃহে কোন রাত্রে প্রবেশ করে হয়ত মঘা কৌশলে সংযুক্তাকে চুরি করে আনলেও আনতে পারে, কিন্তু যদি ধরা পড়ে যায় সে কোনক্রমে—কথাটা ভাবতে গিয়েও যেন অজিত চমকে ওঠে। একবার মনে হয় কাজ নেই সংযুক্তাকে এনে, মঘাকে ডেকে সে বারণ করে দেবে। পরক্ষণেই মনে হয় ঐ রম্ভার কাছে সে হেরে যাবে। রাজাধিরাজ অজিতসিংহ সামান্যা এক ধাত্রীর কাছে হেরে যাবে। ভিতরের পৌরুষ মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে।

না, কখনোই তা হবে না। সংযুক্তা—সংযুক্তাকে তার চাই-ই। সংযুক্তা তার।

রম্ভার ওপরে কঠিন পাহারা বসায় অজিত। প্রাসাদদুর্গের বাইরে যেন সে কোথাও না যেতে পারে। আর সেই সঙ্গে দুর্গাদাস সর্দারেরও গৃহের চতুষ্পার্শ্বে সদা সতর্ক প্রহরা বসিয়েছিল গোপনে যাতে করে দুর্গাদাস সংযুক্তাকে কোথাও স্থানান্তরিত না করতে পারে।

অবিশ্যি দুর্গাদাস ব্যাপারটা ঘুণাক্ষরেও কিছু জানতে পারেনি।

অজিত যে সংযুক্তার অবস্থিতির ব্যাপারটা জানতে পেরে গিয়েছে, সে স্বপ্নেও

ভাবতে পারেনি। সেদিন অকস্মাৎ এক রাত্রে তারার হাতে পট্টমহাদেবীর পত্রখানি পেয়ে চমকে উঠল দুর্গাদাস, পত্রের সত্যিকারের অর্থটা বুঝতে পেরে।

মূল্যবান বস্তু বলতে যে সংযুক্তা সেটা বুঝতে দুর্গাদাসের ক্ষণমাত্রও বিলম্ব হয় না। আরো একটা কথা দুর্গাদাসের কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে—সংযুক্তার পরিচয়টা তাহলে হীরাবাঈ জানতে পেরে গিয়েছেন।

॥ ৩ ॥

তারা যে রাত্রে গোপন সুড়ঙ্গপথ দিয়ে পত্রখানি নিয়ে প্রাসাদদুর্গ হতে নিষ্ক্রান্ত হয়ে দুর্গাদাসের গৃহাভিমুখে চলেছিল, সে টেরও পায়নি তাকে দূর থেকে অলক্ষ্যে অনুসরণ করছিল মঘা।

তারা এত রাত্রে কেন দুর্গপ্রাসাদের বাইরে চলেছে গোপন সুড়ঙ্গপথ ধরে। মঘার মনে যেন কেমন সন্দেহের উদ্রেক করে। মঘা তাকে অনুসরণ করে দূর থেকে অলক্ষ্যে নিঃশব্দে একটা শিকারী বিড়ালের মত। তারা জানতেও পারে না ব্যাপারটা।

তারা পূর্ব থেকেই প্রাসাদদুর্গের বাইরে একটা অশ্ব প্রস্তুত করে রেখেছিল—সুড়ঙ্গপথে প্রাসাদদুর্গ থেকে বের হয়ে অশ্বারূঢ় হয়ে তারা অন্ধকারে মিলিয়ে গেল।

মঘা ঠিক সেজন্য প্রস্তুত ছিল না। সে অতঃপর ঠিক কি করবে বুঝতে পারে না। অশ্বচালনায় তারা অতীব দক্ষ, মঘা তা ভাল করেই জানে। অন্ধকারে কোন্ দিকে অশ্ব ছুটিয়ে দ্রুত অদৃশ্য হয়ে গেল তারা, জানতে হলে তাকেও অশ্বারূঢ় হয়েই তারাকে অনুসরণ করতে হয়, কিন্তু মঘা অশ্বচালনা করতে জানত না।

প্রথম জীবনে মঘা অশ্বচালনা শেখবার চেষ্টা একবার করেছিল। কিন্তু একটা দুর্ঘটনায় তাকে এমন ভীত করে দেয় যে জীবনে পরবর্তীকালে আর সে কখনো অশ্বরূঢ় হবার চেষ্টামাত্রও করেনি। এবং ঐ জীবটিকে বরাবর যেন এড়িয়েই চলত। মঘা সত্যিই অত্যন্ত মুশকিলে পড়ে। কি করা যায় এবারে—কোথায় যেতে পারে তারা এতরাত্রে অশ্বারূঢ় হয়ে? কথাটা ভাবতে গিয়ে একটিমাত্র সম্ভাবনাই মনের মধ্যে তার উদয় হয়—সে দুর্গাদাসের গৃহ। তারা নিশ্চয়ই দুর্গাদাসের গৃহেই গিয়েছে এবং রম্ভাই নিশ্চয়ই তাকে সেখানে প্রেরণ করেছে। মঘা নিশ্চিন্ত থাকতে পারে না। সে ঐ অন্ধকারেই দুর্গাদাসের গৃহের উদ্দেশে ছুটতে শুরু করে।

তারার হাত থেকে পত্রখানি নিয়ে তাড়াতাড়ি পাঠ করে দুর্গাদাস। এবং পত্রখানি পাঠ করে দুর্গাদাসের আর বুঝতে কিছুই বাকী থাকে না।

প্রথমতঃ পট্টমহাদেবী সংযুক্তার ব্যাপারটা জেনে গেছেন এবং দ্বিতীয়তঃ স্বয়ং মহারাজ অজিতের কাছেও সংযুক্তার তার গৃহে অবস্থিতির কথাটা আর গোপন নেই। অজিত ব্যাপারটা জেনে ফেলেছে।

অতঃপর সংযুক্তাকে আর তার গৃহে রাখা নিরাপদ হবে না। দেশের রাজা যেখানে হাত বাড়িয়েছে সেখানে তার পক্ষে সংযুক্তাকে রক্ষা করা আর হয়ত সম্ভবপর হবে না।

এখন কি কর্তব্য ?

তারা শুধায়, আমি কি চলে যাবো সর্দার ?

হ্যাঁ—তুমি যাও—

পট্টমহাদেবীকে কিছু বলতে হবে ?

বলো—আমি ব্যবস্থা করব।

তারা দুর্গাদাসকে অভিবাদন জানিয়ে কক্ষ হতে বের হয়ে গেল। গৃহদ্বারের বাইরে এসে অশ্বারূঢ় হলো। এবং পুনরায় দুর্গপ্রাসাদের দিকে ফিরে চলল। কিন্তু তারার দুর্গপ্রাসাদে পৌঁছানো হলো না। অকস্মাৎ তার অশ্বের গতিরোধ হলো। অশ্ব যন্ত্রণাকাতর একটা চীৎকার করে আচমকা সামনের দিকে লাফিয়ে উঠে কয়েক পাক ঘুরে সামনের দিকে হুমড়ি খেয়ে পড়ল। তারাও সঙ্গে সঙ্গে ছিটকে পড়েছিল অশ্বের পৃষ্ঠ হতে কিছুদূরে রাস্তার ওপরে।

ইতিমধ্যে আকাশে কৃষ্ণা চতুর্দশীর চাঁদ দেখা দিয়েছিল।

ম্লান চাঁদের আলোয় চারিদিক সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছিল।

আচমকা অশ্বপৃষ্ঠ হতে ছিটকে পড়ে তারার কোমরে সামান্য লেগেছিলও—এবং সে বিহ্বল বিমূঢ় হয়ে পড়েছিল কিছুক্ষণের জন্য। ব্যাপারটা যে কি ঘটলো তখনো সে বুঝে উঠতে পারেনি। ধীরে ধীরে এক সময় তারা ভূশয্যা থেকে উঠে দাঁড়ায়। তার অশ্বটা তখনো ভূমিতে পড়ে ছটফট করছে। চার পা ছুড়ছে—যন্ত্রণায় গোঙাচ্ছে।

কোনমতে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে সামনে এসে দাঁড়াতেই তারা যেন চমকে ওঠে। পাথুরে রাস্তা রক্তে একেবারে লাল হয়ে গিয়েছে। আর অশ্বের ঠিক গলার মাঝামাঝি একটা ছোরা বিঁধে আছে সমূলে। বাঁটটা ধরে এক হেঁচকা টানে ছোরাটা তুলে আনল তারা এবং তাতে আরো বেশী রক্তক্ষরণ হতে লাগল।

অশ্বটা চার পা ছুড়ে আক্ষেপ করছে। এতক্ষণে যেন কিছুটা সংবিৎ ফিরে পায় তারা এবং সামনের দিকে তাকায়, এবং সামনের দিকে তাকাতেই তার নজরে পড়ে হাত চার পাঁচ ব্যবধানে এক ব্যক্তি।

তারা সঙ্গে সঙ্গে কোমরে হাত দিল যেখানে ধারাল ছোরাটা গোঁজা ছিল। এবং চকিতে ছোরাটা সেই ব্যক্তিকে লক্ষ্য করে ছুড়ে ছিল।

কিন্তু ছোরাটা সেই ব্যক্তিকে আহত করতে পারে না। তার আগেই সে ছোরাটা হাত দিয়ে লুফে নিয়েছে।

তারা—

কে—মঘা!

হ্যাঁ।

শয়তান—তুই—

মঘা তখন তার মুলোর মত দাঁত বের করে হ্যা হ্যা করে হাসছে।

তারার চোখ দুটো প্রতিহিংসার আগুনে যেন ধকধক করে জ্বলতে থাকে। নিরস্ত্র সে—কি করবে বুঝে পায় না।

মঘাটা হ্যা হ্যা করে হাসছে তখনো।

কোথায় গিয়েছিলি রে? মঘা জিজ্ঞাসা করে।

তাতে তোর দরকারটা কি রে কুত্তা?

কথাটা বলতে বলতে একটা বুনো মহিষের মত যেন তারা তার বিরাট দেহটা নিয়ে গিয়ে মঘার উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

অতবড় একটা বিরাট দেহের ভার অকস্মাৎ এসে হুমড়ি খেয়ে পড়ায় মঘা প্রথমটায় ভারসাম্য হারিয়েছিল, এবং মাটিতে লুটিয়ে পড়েছিল। তার প্রায় শ্বাস রোধ হবার যোগাড় হয়।

কিন্তু সে কিছুক্ষণের জন্য মাত্র। বেঁটেখাটো হলেও মঘার দেহে ছিল এক আসুরিক শক্তি। সে লোহার মত শক্ত দুহাতে তারাকে জাপটে ধরে এবং কিছুক্ষণ ধস্তাধস্তি করে এক সময় তারাকে চিৎ করে ফেলে তার বুকের উপর উঠে বসে। তারার গলাটা টিপে ধরে মঘা দু হাতে। ক্রমশঃ বেশী করে পেষণ করে।

বল, বল কোথায় গিয়েছিলি! বল—

তারা জবাব দেয় না।

মঘা আরো জোরে আরো শক্ত করে তারার গলাটা টিপতে থাকে। প্রথমে একটা গোঁ গোঁ আওয়াজ, তারপর সে আওয়াজটাও বন্ধ হয়ে আসে ক্রমশ ক্ষীণ হতে হতে। চোখের তারা দুটো চোখের কোটর থেকে মরণাধিক যন্ত্রণায় যেন ঠেলে বের হয়ে আসে।

নিদারুণ হত্যালিপ্সায় মঘার মাথার মধ্যে যেন ঝিমঝিম করতে থাকে—মঘা যেন পাগল হয়ে ওঠে। তারপর এক সময় হাঁপাতে হাঁপাতে যখন সে উঠে দাঁড়ায়, তারার বুকের উপর থেকে, সে নিজেও তখন টলছে। দাঁড়াতে পারছে না। অমানুষিক একটা পরিশ্রমে সর্বাঙ্গ তখন তার কাঁপছে।

মঘা আবার বসে পড়ে। তারা কি মরে গেল নাকি? কোন সাড়াশব্দ করছে না—নড়ছে না এতটুকু। বিরাট একটা পাথরের মত পড়ে আছে। টলতে টলতে উঠে দাঁড়াল মঘা আবার একসময়। তারার সামনে গিয়ে দাঁড়াল।

ম্লান চাঁদের আলোয় তারার মুখের দিকে তাকাল—বীভৎস দৃশ্য। মুখটা হা হয়ে আছে। চোখের তারা দুটো ঠেলে বের হয়ে এসেছে।

তারা—কোন সাড়া নেই। মুখের কাছে ঝুঁকে পড়ে মঘা আবার ডাকল— তারা, এই তারা—

চারিদিকের পাহাড়ের গায়ে গায়ে সেই ডাক ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হলো নিঃশব্দতার সমুদ্রে যেন একটা তরঙ্গ তুলে। তারা—তারা—তারা—

হঠাৎ—হঠাৎ—মঘার যা কোন দিনও হয়নি, তাই হলো। মঘা যেন হঠাৎ ভয় পেল। কেমন যেন একটা ভয় একটা আতঙ্ক তাকে ঘিরে ধরে চারপাশ থেকে। চারিদিক স্তব্ধ—নির্জন।

মরা চাঁদের আলোয় যেন কেমন একটা নিঃসঙ্গতা। মঘা ছুটতে থাকে।

প্রাণপণে ছুটতে থাকে।

কে যেন তাকে পিছনে পিছনে তাড়া করছে—তারার প্রেতাত্মা—নিশ্চয়ই তারার প্রেতাত্মা। মঘা একটিবারের জন্যও ফিরে তাকায় না। ছুটতে ছুটতে একেবারে প্রাসাদদুর্গের সিংহদ্বারের সামনে এসে থামে। সিংহদ্বারের সামনে বিরাট একটা পাথরের সামনে ধপ্ করে বসে পড়ে মঘা। তার সমস্ত দম তখন ফুরিয়ে গিয়েছে।

দুর্গাদাস যখন তারার সঙ্গে কথা বলছিল ঠিক তার পাশের ঘরেই তখন ছিল সংযুক্তা। সে তখনো ঘুমোয়নি। তারার কণ্ঠস্বর তার কানে যেতেই সঙ্গে সঙ্গে সে উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠেছিল।

এত রাত্রে তারা কেন এখানে? তারা তারই মায়ের বিশ্বস্ত অনুচরী।

তার মায়ের সে রাত্রে তার জবাব এড়িয়ে ঐভাবে ছুটে পালিয়ে যাবার পর থেকেই যেন সংযুক্তার মনের মধ্যে একটা সন্দেহের কালো ছায়া ঘনাচ্ছিল। কেন-কেন তার মা ঐ ধরনের কথা বলল? কেন তাদের ভালবাসা পাপ? কেন সে অজিতকে ভালবাসতে পারে না? কেন অজিত তাকে ভালবাসতে পারে না?

কথাটা যত ভাবে সংযুক্তা ততই যেন তার মনের মধ্যে একটা অশান্তি তোলপাড় করতে থাকে। তাকে অস্থির চঞ্চল করতে থাকে। ভালবাসার মধ্যে পাপ থাকবে কেন? ভালবাসা তো পাপ নয়। তবে—তবে মা ঐ ধরনের কথা বলে গেল কেন—কেনই বা ছুটে পালিয়ে গেল? তারপর থেকেই বস্তুতঃ সংযুক্তার মনটা তার মায়ের সংগে আর একটিবার দেখা করবার জন্য ছটফট করছিল।

মামাজীকে তারপর নানাভাবে সে প্রশ্ন করেছে কিন্তু মামাজীও তাকে কোন জবাব দেননি। কেবলমাত্র বলেছেন তার মা যা তাকে বলেছেন তা নাকি তার মঙ্গলের জন্যই বলেছেন—মা তার মঙ্গলই চান।

আজ তারার গলা পাশের ঘরে শুনেই সে কান খাড়া করে রেখেছিল—একেবারে মধ্যবর্তী দেওয়ালের গা ঘেঁষে এসে দাঁড়িয়েছিল—এবং তারা চলে যাবার পর কিছুক্ষণ বাদে দুর্গাদাস যেমন ঘর থেকে বেরুতে যাবে, সংযুক্তা এসে তার সামনে দাঁড়াল।

মামাজী—

কে? একি সংযুক্তা—তুমি ঘুমোওনি মা?

না। কিন্তু তারা এসেছিল মনে হলো?

অ্যাঁ—হ্যাঁ—এসেছিল।

কেন?

ঐ—মানে—মানে একটা জরুরী পত্র—

কথাটা বলতে গিয়ে হঠাৎ মনে হলো দুর্গাদাসের হাতের মধ্যে তার চিঠিটা নেই। ইতিমধ্যে কখন চিন্তা করতে করতে এবং অস্থিরভাবে ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে করতে অন্যমনস্ক হাত থেকে তার পত্রটা পড়ে গিয়েছিল দুর্গাদাসের মনেও নেই।

জরুরী পত্র !

হ্যাঁ।

দুর্গাদাস তখন এদিক-ওদিকে পত্রের সন্ধানে তাকাচ্ছে। হঠাৎ নজরে পড়লো ঘরের মধ্যে দণ্ডায়মান সংযুক্তার ঠিক পায়ের সামনেই ভূতলে পত্রটা পড়ে আছে।

সংযুক্তার নজরে পড়েছিল ইতিমধ্যে পত্রটা। সে নীচু হয়ে পত্রটা তুলে নেয়।

সংযুক্তা—

॥ ৪ ॥

সংযুক্তা শক্ত মুঠো করে পত্রখানা তখনো ধরে আছে।

সংযুক্তা, পত্রটা দাও—

সংযুক্তা ততক্ষণে পত্রটা কক্ষের দীপালোকে নিজের দৃষ্টির সামনে মেলে ধরেছে।

পড়ো না—পড়ো না ও পত্র সংযুক্তা—কথাটা যেন বলতে গিয়েও বলতে পারে না দুর্গাদাস।

সংযুক্তা পত্রটা পড়ে ফেলে একনিমেষে। এবং পত্রটা পড়ে সেটা দুর্গাদাসের দিকে এগিয়ে দিল, মামাজী—

সংযুক্তা—

এ পত্রের অর্থ কি মামাজী ?

ও তোমার কোন দরকার নেই সংযুক্তা।

তা না হয় অর্থ নাই জানলাম, কিন্তু আমি কি সত্যিই কোন মূল্যবান বস্তু নাকি ?

সংযুক্তা—

মামাজী, অপনি যতই এড়াবার চেষ্টা করুন ঐ পত্রে আমার সম্পর্কেই সাবধান করে দেওয়া হয়েছে সে আমি বুঝতে পেরেছি।

কি বলছো।

ঠিকই বলছি। আমাকে জানতে দিন মামাজী, কি আপনি আর মা আমার কাছ থেকে গোপন করবার চেষ্টা করছেন ?

সংযুক্তা—

বলুন, আমি জানতে চাই—অনুগ্রহ করে আমাকে আর অন্ধকারে রাখবেন না।

দুর্গাদাস শান্ত কণ্ঠে বলে, হয়ত সত্যিই তোমার আজ সব কথা জানা উচিত সংযুক্তা—কিন্তু—

মামাজী—

কিন্তু আমি এখনো বুঝতে পারছি না তোমার মা যে কথা আজ পর্যন্ত তোমার কাছে প্রকাশ করেননি—যে কথা আমাকে পর্যন্ত তোমায় না বলতে বার বার অনুরোধ করেছেন সে কথা তোমাকে বলবো কি না—

মামাজী, আমি বুঝতে পারছি আমাকে ঘিরে কোন রহস্য অন্ধকার আছে—জানি না সে রহস্য আমার জীবনের মঙ্গল কি অমঙ্গল—কিন্তু মঙ্গল হোক আর অমঙ্গল হোক আমাকে জানতে দিন—এ পীড়ন আর আমি সহ্য করতে পারছি না। শেষের দিকে সংযুক্তার গলাটা অশ্রুতে যেন রুদ্ধ হয়ে আসে। দু চোখের দৃষ্টি তার জলে ঝাপসা হয়ে যায়।

সংযুক্তা মা—

আমি বুঝতে পারছি মামাজী, অন্ধকার ঐ রহস্যের মধ্যে আমার জীবন ঘিরে লজ্জা আছে।

না, না।

তাই যদি না হবে তো কেন—কেন আপনারা সে কথা আমাকে জানতে দিচ্ছেন না।

ঠিক আছে—শোন মা, আমি বলব তোমাকে—সব বলব আজ—দুয়ারটা বন্ধ করে দিয়ে এসো।

সংযুক্তা ঘরের দুয়ারে অর্গল তুলে দিল।

শোন মা—তুমি এতদিন জেনে এসেছো রম্ভা তোমার পালনকর্ত্রী মাত্র, কিন্তু তা নয়।

তবে—

সেই তোমার গর্ভধারিণী জননী।

মামাজী—মহারাজের পালনকর্ত্রী দাসী—

অস্ফুট একটা চীৎকার করে ওঠে যেন সংযুক্তা বেদনার হতাশায়।

সে নীচকুলোদ্ভবা নয়—সম্ভ্রান্তবংশীয়া কন্যা, কিন্তু তাহলেও সত্যিই সে অভাগিনী মা—যে মা আজ পর্যন্ত কোন দিন নিজের সন্তানের সত্য পরিচয়টুকু পর্যন্ত তাকে দিতে পারেনি।

এ—এ আপনি কি বলছেন মামাজী! মার তো বিবাহই হয়নি—

কে বললে হয়নি—হয়েছিল—ভগবানকে সাক্ষী রেখে বিবাহ হয়েছিল।

কার—কার সঙ্গে? কে আমার বাপ? কে সে?

স্বর্গীয় মহারাজ যশোবন্তসিংহ!

মামাজী—

হ্যাঁ—অজিতের আর তোমার বাপ এক।

না, না—এ আপনি কি বলছেন।

যা বললাম মা, তা নিষ্ঠুর সত্য। স্বর্গীয় পুণ্যশ্লোক রাঠোরকুলতিলক মহারাজ যশোবন্তরই ঔরসজাত কন্যা তুমি।

সত্যি—আমার পিতা স্বর্গীয় মহারাজ যশোবন্তসিংহ!

হ্যাঁ মা, তাঁরই কন্যা তুমি।

আমার মা একথা গোপন করে গিয়েছেন?

হ্যাঁ।

কেন?

লজ্জায় ।

লজ্জা—লজ্জা কিসের ? তাঁদের তো গন্ধর্বমতে বিবাহ হয়েছিল আপনিই বললেন ।

হয়েছিল, কিন্তু মহারাজ সে কথা তাঁর মৃত্যুর পূর্বে জানিয়ে যাবার অবকাশ পাননি । এবং তাঁর মৃত্যুর পর তোমার জন্ম ।

কিন্তু তাতেই বা কি হলো ? আমার পিতৃপরিচয় জানাতে কি এমন বাধা ছিল ?

জানালেও রাঠোর সর্দাররা সে কথা বিশ্বাস করতেন না । তাই তোমার জননী কোনদিন কথাটা প্রকাশ করেননি ।

নিজের কলঙ্কের ভয়ে বোধ হয় । অথচ মা হয়ে তাঁর নিজের মেয়ের কপালে এঁকে দিলেন চিরজীবনের মত অজ্ঞাতকুলশীলার দুরপনেয় কলঙ্কালি । চমৎকার—চমৎকার বিচারবুদ্ধি ।

তুমি বুঝতে পারছো না মা । তোমার সত্য পরিচয় প্রকাশ পেলে কেবলমাত্র তোমার মারই কলঙ্ক রটত না, সেই সঙ্গে তোমার জন্মদাতার নামেও কলঙ্ক রটত । একমাত্র সেই কারণেই—স্বামীকে কলঙ্ক হতে বাঁচাবার জন্যই রম্ভা কোনদিন সে কথা প্রকাশ করেননি ।

মুহূর্তকাল যেন অতঃপর স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল সংযুক্তা—তারপর শান্ত মৃদু কণ্ঠে দুর্গাদাসের দিকে তাকিয়ে বলল—আমি চললাম—

কোথায় ?

প্রাসাদদুর্গে—

না, না ।

হ্যাঁ—আমাকে যেতেই হবে । আমি মাকে শুধাব, কেন তিনি এত বড় অন্যায় অবিচার আমার প্রতি করলেন—কেন ? সংযুক্তা যাবার জন্য পা বাড়াল ।

শোন সংযুক্তা শোন—

না, না—আমি যাবোই । আমাকে যেতে হবেই ।

সংযুক্তা ঝড়ের মতই কক্ষ হতে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেল যেন ।

শোন—সংযুক্তা শোন—

কিন্তু সংযুক্তার সাড়া পাওয়া গেল না । ততক্ষণে সে অন্ধকার অলিন্দ-পথে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে ।

উৎকণ্ঠিতা পট্টমহাদেবী হীরাবাঈ নিজের কক্ষে জেগে বসে ছিল । রাত্রি প্রায় শেষ হতে চলল, কিন্তু এখনো তারা ফিরে এলো না । এত দেরি হবার কথা তো নয় । তারা এখনো ফিরে আসছে না কেন ? তারা কি তবে পত্রখানি যথাস্থানে পৌঁছে দিতে পারেনি ? নানাপ্রকার সম্ভব অসম্ভব দুশ্চিন্তায় হীরাবাঈ ছটফট করতে থাকে ।

রম্ভা এসে কক্ষমধ্যে প্রবেশ করে ।

পট্টমহাদেবী ।

কে—দাইমা—

এখনো তুমি জেগে আছো!

দাইমা—

কি পট্টমহাদেবী ?

তারাকে আমি দুর্গাদাস সর্দারের গৃহে প্রেরণ করেছিলাম পত্র দিয়ে—

কখন ?

তা অনেকক্ষণ হবে, কিন্তু এখনো সে ফিরল না কেন।

ভয় নেই তোমার, সে ঠিক পত্র পৌঁছে দিয়েই আসবে।

আমার বড় দুশ্চিন্তা হচ্ছে দাইমা।

দুশ্চিন্তার কোন কারণ নেই। তারাকে আমি ভাল করেই জানি। পত্র যদি সে যথাস্থানে না পৌঁছে দিতে পারে তো জেনো সে পত্র অন্য কারো হাতে পড়বে না। তুমি যাও—শুয়ে পড়গে—আমি খবর নিচ্ছি।

রম্ভা কক্ষ হতে বের হয়ে গেল।

কিন্তু তারা ফিরে এলো না। একসময় রাত্রি প্রভাত হয়ে গেল—তারা ফিরল না তবু। প্রাসাদশীর্ষে প্রথম সূর্যের আলো এসে পড়ল।

॥ ৫ ॥

রাত্রি প্রভাত হয়ে গেল তথাপি তারা যখন প্রাসাদদুর্গে ফিরে এলো না, রম্ভাও চিন্তিত হয়ে ওঠে। কি হলো তারার ? সে এখনো ফিরল না কেন ?

পত্রটা দুর্গাদাস সর্দারের হাতে পৌঁচেছে কি না তাই বা কে জানে। একটা সংবাদ নেবারও উপায় নেই।

ক্রমশঃ বেলা গড়িয়ে গিয়ে এক প্রহর হয়। রম্ভা তার নিজের কক্ষের মধ্যেই চিন্তান্বিত হয়ে বসে ছিল। মহারাজ অজিত এসে কক্ষমধ্যে প্রবেশ করল।

অজিতকে কক্ষমধ্যে প্রবেশ করতে দেখে রম্ভা অজিতের মুখের দিকে তাকায়!

দাইমা, একটা সংবাদ বোধ হয় পাওনি—তোমার বিশ্বস্ত অনুচরী তারার মৃতদেহটা এখান থেকে ক্রোশখানেক দূরে পথের মধ্যে পাওয়া গিয়েছে।

কে—কে বললে!

মৃতদেহটা প্রাসাদদুর্গে নিয়ে আসা হয়েছে—ইচ্ছা করলে দেখতে পার। দেখতে চাও ?

রম্ভা চুপ করে থাকে।

শুনলাম গত রাত্রে সে দুর্গাদাস সর্দারের গৃহে গিয়েছিল—সে তোমার বিশ্বস্ত অনুচরী—মনে হচ্ছে তোমারই কোন সংবাদ বহন করে দুর্গাদাস সর্দারের কাছে গিয়েছিল—আশ্চর্য স্পর্ধা তোমার!

অজিত—

ভুলো না আমি মাড়বারের মহারাজ—সেইভাবেই কথা বল। আমি জানতে চাই কেন সে সেখানে গিয়েছিল—

আমি তাকে পাঠাইনি কোথায়ও।

এখনো সত্য অস্বীকার করবার চেষ্টা করছো। শোন দাই, আমি এও জানি যে তুমি সংযুক্তাকে দুর্গাদাসের গৃহে পাঠিয়ে দিয়েছ আমার বিনানুমতিতে।

তা যদি করেই থাকি তো জেনো সে তোমারই মঙ্গলের জন্য।

আমার মঙ্গলের জন্য। আমার ধাত্রীর দেখছি আমার মঙ্গলচিন্তায় ঘুম হচ্ছে না—শোন দাই তোমার এই স্পর্ধার বিচার আমি করবো এবং প্রকাশ্য দরবারেই বিচার করবো। আজ থেকে এই কক্ষে তুমি বন্দিনী থাকবে।

কথাটা বলে অজিত কক্ষ ত্যাগ করে চলে গেল।

রম্ভা যেন পাথরের মত দাঁড়িয়ে রইলো।

তারা নিহত নিশ্চয়ই। কিন্তু কে তাকে হত্যা করল।

প্রাসাদ-অলিন্দে অজিতের চর্মপাদুকার শব্দ ক্রমশঃ মিলিয়ে গেল।

কিন্তু অজিত মুখে যাই বলুক প্রকাশ্য দরবারে রম্ভার বিচার করবার সাহস তার ছিল না। কেননা সে ভাল করেই জানত ঐ ব্যাপারে রাঠোর সর্দারদের এতটুকুও সমর্থন সে পাবে না।

রম্ভাকে তারা দেবীর মত শ্রদ্ধা করে—পূজা করে। রম্ভাকে হত্যা করলেও সেকথা চাপা থাকবে না। প্রকাশ হয়ে পড়বে কথাটা। কোন একটা কৌশলের আশ্রয় নিতে হবে তাকে।

সেদিন আর অজিত দরবারে গেল না। নিজের কক্ষের মধ্যেই সে অস্থিরভাবে পায়চারি করতে থাকে।

মঘা ক্ষতবিক্ষত ও মৃতপ্রায় হয়ে কোনমতে প্রাসাদদুর্গে ফিরে এসেছে। মঘা যদিও দেখেনি তারাকে দুর্গাদাসের গৃহে প্রবেশ করতে, তথাপি সে ব্যাপারটা অনুমান করে নিয়েছিল। অজিতেরও তাই ধারণা।

রম্ভার বিশ্বস্ত অনুচরী তারা দুর্গাদাসের গৃহেই গিয়েছিল গত রাত্রে। সে যে সংযুক্তাকে দুর্গাদাসের গৃহ থেকে তার সদাসতর্ক প্রহরা থেকে গোপনে গোপনে ছিনিয়ে আনার চেষ্টা করছে, সেটা জানতে পেরে গিয়েছে রম্ভা কোনক্রমে। তাই হয়ত সে দুর্গাদাসকে সাবধান করে দেবার জন্য তারাকে দিয়ে কোন সংবাদ পাঠিয়েছিল দুর্গাদাসের কাছে।

এখন হয়ত দুর্গাদাস আরো সতর্ক হবে। সংযুক্তাকে তার কোটর থেকে ছিনিয়ে আনা রীতিমত কষ্টসাধ্য হবে। হোক—তথাপি অজিত নিবৃত্ত হবে না। সোজাসুজিই দুর্গাদাসকে ডেকে এনে প্রশ্নটা করবে অজিত। জিজ্ঞাসা করবে সে, দেশের রাজার বিরুদ্ধাচরণ করা বিদ্রোহ কি না।

দ্বাররক্ষী এসে কক্ষদ্বারে দাঁড়াল, মহারাজ—

কি চাই?

দুর্গাদাস সর্দার—

চমকে ওঠে অজিত নামটা শুনে—দুর্গাদাস সর্দার।

কোথায়?

প্রাসাদের মন্ত্রণাকক্ষে আপনার জন্য অপেক্ষা করছেন।

যা—আমি আসছি—

দ্বাররক্ষী চলে গেল অভিবাদন জানিয়ে।

মন্ত্রণাকক্ষে একটি আসনের ওপরে বসে ছিল দুর্গাদাস। এবং শুধু দুর্গাদাসই নয়, আরো অন্যান্য সর্দাররাও উপস্থিত ছিল। দুর্গাদাস সর্দারের বয়েস হয়েছে। মাথার চুলে শুভ্রতার ছাপ পড়েছে। দেহে ও মুখে বহু যুদ্ধের ইতিহাস চিহ্নিত হয়ে আছে। তবু মনে হয় দীর্ঘ ঋজু দেহের মধ্যে যেন কোন ক্লান্তি নেই, অবসন্নতা নেই।

অজিত মন্ত্রণাকক্ষে প্রবেশ করতেই দুর্গাদাসের সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য সর্দাররা গাত্রোত্থান করে দাঁড়াল।

জয়তু মহারাজ—

অজিত যেন একটু বিস্মিতই হয় মন্ত্রণাকক্ষে দুর্গাদাস সর্দারের সঙ্গে অন্যান্য সর্দারদের দেখে। তবে কি এরা সব দল বেঁধে তার প্রতি কোন অভিযোগ জানাতেই এসেছে! অসম্ভব নয়—রম্ভা হয়ত সকলের মন তার প্রতি কৌশলে বিষিয়ে দিয়েছে।

বসুন। শান্ত কণ্ঠে অজিত বলে কথাটা।

এবার দুর্গাদাসই কথা বলে, মহারাজ দুঃসংবাদ আছে—

দুঃসংবাদ!

অজিত দুর্গাদাসের মুখের দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকাল।

হ্যাঁ মহারাজ—দুর্গাদাস বলে, যবন ঔরংজীব তার সন্ধিশর্ত ভঙ্গ করেছে—আপনাকে অস্বীকার করেছে।

কি বললেন সর্দার!

হ্যাঁ—এ অবিশ্যি আমি জানতাম—ধূর্ত ঔরংজীব সেদিন একমাত্র তার পৌত্রী সুলতানীর জন্যই অনন্যোপায় হয়ে আমাদের শর্তানুযায়ী সন্ধি করেছিল।

কিন্তু—

এর মধ্যে তো কোন কিন্তু নেই। সুলতানীকে ফিরে পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সে তুচ্ছ একটা ছেঁড়া পাতার মত সন্ধিপত্র ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে।

কিন্তু শাহজাদা আকবর—তিনি তো এখনো দেহলীতে—

না।

সেকি—তিনি কি—

দেহলীতে তিনি নেই।

তবে কোথায়?

তিনি দেহলীতে আদৌ সেদিন ফিরে যাননি।

ফিরে যাননি!

না।

তবে—

তিনি তাঁর পিতাকে ভাল করেই চিনতেন। তাঁর পিতা ঔরংজীব যে তাঁকে

হাতের মুঠোর মধ্যে নিজের এক্তিয়ারে পেলে সহজে নিষ্কৃতি দেবেন না তা তিনি জানতেন—সেই ভয়েই পিতার কাছে তিনি ফিরে যাননি।

আপনি জানলেন কি করে সে কথা ?

এ দেশ চিরদিনের মত ছেড়ে যাবার আগে গুপ্তচরমুখে তিনি আমায় জানিয়েছিলেন—এবং আমায় বিশেষভাবে অনুরোধ জানিয়েছিলেন কথাটা যেন প্রকাশ না পায়।

তিনি এ দেশ চিরদিনের মত ছেড়ে গিয়েছেন ?

হ্যাঁ।

কোথায় গিয়েছেন ?

আপনার মনে আছে বোধহয় তাঁর বিশেষ অনুরোধে তাঁর ফিরে যাবার সময় তাঁর সংগে আমি পাঁচশত সশস্ত্র দেহরক্ষী দিয়েছিলাম, তাদেরই সাহায্যে মেওয়ার, ডোনগারপুর ও নারবুদার ভিতর দিয়ে প্যালেরগড়ে মহারাষ্ট্র দলপতি সম্ভাজীর আশ্রয়ে গিয়ে পে'ছিন, তারপর তাঁরই সাহায্যে সেখান থেকে এক ফিরিঙ্গী অর্ণবপোতে চেপে পারস্যে চলে গিয়েছেন।

লায়লীও বোধহয় ব্যাপারটা জানে না ?

না—আর আমিও মাত্র কিছুদিন পূর্বে দূতমুখে সংবাদটা পাই যে তিনি পারস্যে গেছেন। কিন্তু যাক সে কথা—এখন আমাদের বর্তমান পরিস্থিতি চিন্তা করতে হবে—যবনরাজ দক্ষিণাবর্ত থেকে ফিরে এসেছে এবং শাহজাদা আজিম শাহকে নির্দেশ দিয়েছে যোধপুর আক্রমণ করার জন্য।

আজিম শাহ!

হ্যাঁ—বিরাট সৈন্যবাহিনী নিয়ে সে এগিয়ে আসছে।

কত দূরে তার বাহিনী ? কত দিনের পথ ?

বড় জোর দিন সাত-আটের পথ।

আমরা এর মধ্যে প্রস্তুত হতে পারব না ?

পারব নিশ্চয়ই, কিন্তু ফল খুব ভাল হবে বলে মনে হয় না।

একথা কেন বলছেন সর্দার ?

প্রশ্নটা করে অজিত দুর্গাদাসের মুখের দিকে তাকাল।

শাহজাদা আজিম শাহের সঙ্গে রয়েছে আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত এক বিরাট বাহিনী—সেই বাহিনীর সঙ্গে মোকাবিলা করা অত সহজ হবে না মহারাজ—অবশ্য তাহলেও আমাদের চেষ্টা করতে হবে। জীবনপণ করে মাতৃভূমিকে রক্ষা করবার জন্য যুদ্ধ করতে হবে।

তবে সেই ব্যবস্থা করুন।

কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা গেল দুর্গাদাসের অনুমান এতটুকু মিথ্যা নয়।

আজিম শাহর বিরাট বাহিনী প্রচণ্ড বন্যার মতই যেন এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল। এবং সেই প্রচণ্ড বন্যার মুখে সব যেন কুটোর মতই ভেসে যেতে লাগল।

যোধপুরের পতন হলো যবন বাহিনীর কাছে।

ষষ্ঠ পর্ব ঃ পুনরধিকার

॥ ১ ॥

অনন্যোপায় পর্যুদস্ত অজিতসিংহ তার পরিবারবর্গকে নিয়ে কোনমতে প্রাণ হাতে করে গোপন পথে ঝালোরে পালিয়ে গেল।

অজিত পূর্বেই তার জেঠশ্বশুর মেওয়ারের রানাকে সংবাদ প্রেরণ করেছিল তার বিপদে সাহায্য ভিক্ষা করে। কিন্তু রানার কাছ থেকে কোন সাহায্যই সে পায়নি। কারণ রানাও নিজে তখন বিপন্ন। তাঁরও একমাত্র আশা তখন একলিঙ্গ।

আর অম্বররাধিপতি—তিনি তো বরাবরই যবনের প্রসাদভিক্ষু এবং তাদেরই পদলেহন করে জীবন ধারণ করেছেন।

আজিম শাহর বিরাট বাহিনী চারিদিকে যেন ভূতের মত বীভৎস নৃত্য করে বেড়াতে লাগল। হত্যা—লুণ্ঠন—অত্যাচার। চারিদিকে হাহাকার। কোন কোন রাঠোর সর্দার যবনের দলে ভিড়ে গেল। চারিদিকে যবনের অত্যাচারে অরাজকতা—মাৎস্যন্যায়। গোহত্যা লুণ্ঠন ধর্ষণ বেপরোয়া চলতে লাগল সর্বত্র। এমন কি হিন্দুর পরম পবিত্র তীর্থস্থান মথুরা প্রয়াগও বাদ গেল না।

অজিত সপরিবারে তখন নিরুপায় হয়ে আরাবল্লীর পর্বতশ্রেণীর মধ্যে গভীর অরণ্যে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে।

মাঘ মাস—প্রচণ্ড শীত তখন। এক শীতের রাত্রে মহারাজ অজিতের চৌহানী মহিষী একটি পুত্রসন্তান প্রসব করল। চরম দুঃখ ও নিরানন্দের মধ্যে আনন্দের আলো জ্বলে উঠলো যেন। অজিতের প্রথম সন্তান। রাঠোরবংশের কুলপ্রদীপ।

দৈবজ্ঞ এলেন।

দৈবজ্ঞ ঠাকুর, আমার নবজাত পুত্রের ভবিষ্যৎ কি বিচার করে দেখুন—ওকেও কি জন্মের পর থেকেই দুর্ভাগ্যের সংগে আমারই মত যুদ্ধ করতে হবে?

প্রৌঢ় দৈবজ্ঞ দুই দিন ধরে নানাভাবে বিচার করে নবজাতকের জন্মপত্রিকা রচনা করলেন। এবং বললেন, জাতক একতুংগে ভবেদ্ভোগী দ্বিতুংগে নৃপবল্লভঃ। ত্রিতুংগে নৃপতির্জ্ঞেয়শ্চতুস্তুংগে ধনেশ্বরঃ ॥

সত্যি বলছেন তো দৈবজ্ঞ?

নিশ্চয়ই। বৃহস্পতিতুঙ্গযোগোহস্তি তৎফলং মন্ত্রিনরেন্দ্রাতিবলপ্রধান প্রচণ্ডবীর্যোপি ধনেশ্বরশ্চ, জীবোপিতুঙ্গী যদিকর্কটস্যাৎ সম্মানযুক্ত পুরুষ সদৈব।

কি নাম রাখা যায়?

দৈবজ্ঞই বললেন, পুত্রের নাম রাখুন মহারাজ অভয়সিংহ।

এবার আমার জন্মপত্রিকা বিচার করে কিছু বলুন—আর কতদিন এমনি করে দুর্ভাগ্যের সংগে যুদ্ধ করতে হবে?

দৈবজ্ঞ মহারাজের জন্মপত্রিকা বিচার করে বললেন, মহারাজ, আপনার এখন বক্রী শনির দশা চলেছে—এখনো তিন বৎসর এইভাবেই চলবে। তবে হতাশ হবেন না—তিন বৎসর পরে আবার আপনি আপনার পিতৃসিংহাসন ফিরে পাবেন।

দৈবজ্ঞকে পুরস্কার দিয়ে বিদায় করলেন মহারাজ।

বৃদ্ধ ঔরংজীবের শক্তিও ক্রমশঃ কমে আসছিল—ক্রমশঃ সে দুর্বল হয়ে পড়ছিল। চারিদিকে তার বিদ্রোহের ইঙ্গিত। অশান্তি তো ছিলই, ক্রমশঃ সেই অশান্তি যেন বৃদ্ধি পেতে থাকে।

ঔরংজীব কোন দিন কাউকে বিশ্বাস করেনি। অবিশ্বাস আর সন্দেহ ছিল তার সকলের প্রতি—পরমাত্মীয় থেকে অনাত্মীয়—জীবনপ্রান্তে উপনীত হয়ে ঔরংজীব দেখলো সেই সন্দেহ আর অবিশ্বাসের বিষেই তার সব কিছু বিষাক্ত হয়ে গিয়েছে কবে, সে এতদিন জানতেও পারেনি। ভালবাসা, প্রীতি, প্রেম, স্নেহ যা মানুষের জীবনে সবচাইতে বড় সান্ত্বনা, সেইখানেই সে আজ নিঃসম্বল। সেইখানেই তার জীবনের ঝুলি আজ একেবারে শূন্য।

রাজ্যের পর রাজ্য জয় করেছে—মদমত্ত হস্তীর মত সামনে যা পেয়েছে দলিত পিষ্ট করে আত্মশ্লাঘা লাভ করেছে—ধনভাণ্ডার পূর্ণ করেছে রাজ্যের পর রাজ্য দেশের পর দেশ লুঠ করে। অমিত প্রতাপে একদিন সব কিছুকে তুচ্ছ করেছে যে মানুষটা, আজ সে ফেলে আসা জীবনের দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারছে জীবনের সেইটাই সব কথা নয়। জীবনের সেইটাই শেষ কথা নয়।

আমিই একমাত্র সব—আমিই জিন্দাপীর আলমগীর। তোমরা যে যেখানে আছো আমারই মুখের দিকে চেয়ে থাকো। জগতের বিধাতা আমি। আমার বিধানই একমাত্র বিধান।

সেই আলমগীর—জিন্দাপীর বাদশাহ ঔরংজীব আজ বার্ধক্যে জীর্ণ ক্লান্ত অবসন্ন। আজ তার পাশে কেউ নেই। সে একা। শক্তির অহংকার—আত্মম্ভরিতার দুর্জয় অভিমান আজ চূর্ণবিচূর্ণ। চোখের দৃষ্টি ক্ষীণ। লোল চর্ম। পা টেনে টেনে চলতে হয়। সোজা হয়ে দাঁড়াতেও পারে না। যে দিকে তাকায় এক শূন্যতা।

কি মনে হলো ঔরংজীবের সেদিন গভীর রাত্রে—কাগজ কলম নিয়ে লিখতে বসল।

॥ ২ ॥

প্রিয়তম পুত্র আমার আজিম,

সুস্থ সবল হও তুমি। তুমি আমার কাছ থেকে দূরে থাকলেও জেনো আমি তোমার কাছে কাছেই আছি। আজ আমি বৃদ্ধ অথর্ব—দৌর্বল্য আমার দেহের অমিত শক্তিকে আজ রাহুর মত গ্রাস করেছে। অপরিচিত অজ্ঞাত একদিন এই

পৃথিবীতে এসেছিলাম—অপরিচিত অজ্ঞাত আজ আবার এই দুনিয়া থেকে চির-বিদায়ের জন্য প্রস্তুত হয়েছি।

জানি না কে আমি—আর কেনই বা এই দুনিয়ায় একদিন জন্ম নিয়েছিলাম

শক্তির মত্ততায় অন্ধ হয়ে ছুটে চলেছিলাম—ভেবেছিলাম জীবনের পাত্র বুঝি ভরে উঠছে দিনকে দিন, কিন্তু আজ দেখতে পাচ্ছি সব ভুল—কেবল পশ্চাতে পড়ে আছে অপরিসীম এক দুঃখ। যৌবনের সে শক্তি কবে অন্তর্হিত হয়েছে। বিশাল এক সাম্রাজ্য, তার কর্তা বা রক্ষাকর্তা কিছুই আমি নই—মূল্যবান সময় দেখছি বৃথাই কখন কোন্ পথে অতিবাহিত হয়ে গিয়েছে।

আমার বিবেক তার ক্ষীণ ঝাপসা দৃষ্টির জন্য সত্যিকারের আলো কোনদিন দেখতে পায়নি জীবনে। একবারও মনে হয়নি যে জীবন চিরস্থায়ী নয়।

দীর্ঘ দিন ধরে জ্বরে ভুগছি। আজ জ্বর একটু কমেছে কিন্তু আমার দেহে অস্থি আর চামড়া ছাড়া কিছুই নেই। একটা কঙ্কাল।

পুত্র কামবক্স বিজাপুর গিয়েছে। শাহ আলম অনেক দূরে কাবুলে। পৌত্র আজিম হুসান হয়তো এখন হিন্দুস্থানেই আছে।

আমার সৈন্যরা যারা এতদিন আমাকে যমের মত ভয় করেছে—আমি পাশে থাকলে যারা ভেবেছে কোন ভয় নেই—দুর্ধর্ষ মুঘোল সৈনিক তারা আজ আমারই মত নিজেদের অসহায় মনে করছে। তারা আজ ভীত। তাদের মাথার উপর যে তাদের কোন প্রভু আছে তাও তারা বিশ্বাস করতে পারছে না যেন। আজ মনে হচ্ছে এ দুনিয়ায় তো কিছুই নিয়ে আসিনি সঙ্গে করে—নিয়েও যাবো না কিছুই সঙ্গে করে।

মৃত্যুর পর কি আমার জন্য অপেক্ষা করছে কে জানে। যদিও খোদাতালাহ্র ওপরে আমার অসীম বিশ্বাস তথাপি সারা জীবন ধরে যা করেছি তার ভয় যেন আমাকে সর্বক্ষণ আঁকড়ে আছে।

আর ভাবতে পারছি না—সমুদ্রে নাও ভাসিয়ে দিয়েছি। পৌত্র বেদার বক্সকে আমার ভালবাসা দিও।

আর একটি পত্র শাহজাদা কামবক্সকে।

আমার প্রিয় পুত্র,

একদিন যখন দেহে মনে তরবারিতে শক্তি ছিল তোমাদের ওপরে হুকুম চালিয়েছি। আজ মনে হচ্ছে সে তো একান্তই অর্থহীন। কে আমি আদেশ দেবার। কি ক্ষমতা ছিল আমার।

এক অজ্ঞাত অপরিচিতের মত আজ শেষ বিদায় নেবার জন্য প্রস্তুত হয়ে আছি—পা বাড়িয়ে আছি। আমার ক্ষুদ্রতা তুচ্ছতা ও অপরাধের সমস্ত ফল সঙ্গে নিয়ে চলেছি। একা এসেছিলাম একদিন, আজ আবার একা শেষ যাত্রার পথে পা বাড়িয়েছি। কুব্জ দেহ—ক্ষীণ দৃষ্টি—শক্তিহীন বাহু—অশক্ত পদযুগল।

কত পাপ আর অন্যায় যে করেছি জীবনে তার সংখ্যা নেই। জানি না সেই সীমাহীন পাপের কি শাস্তি আমার জন্য জমা হয়ে আছে।

আজিম শাহ কাছেই আছে।

একটা কথা মনে রেখো, কোন বিশ্বাসীকে যেন হত্যা করা না হয় কিংবা তাদের অভিশাপ আমার মাথার ওপরে না পড়ে। তোমাকে তোমার জননীকে ও তোমার পুত্রকে খোদাতালাহ্‌র হাতে তুলে দিয়ে গেলাম, কারণ আমি তো চলার পথে। মৃত্যুর যন্ত্রণা আর দুঃস্বপ্ন প্রতিমুহূর্তে আমাকে চারপাশ থেকে গ্রাস করছে।

বাহাদুর শাহ যেখানে ছিল সেখানেই আছে এখনো। বেদার বক্স গুজরাটে।

তোমার জননী উদিপুরী আজ আমারই মত রোগগ্রস্তা এবং সে আমারই সঙ্গে মৃত্যুবরণ করতে চায়—কিন্তু তা তো হবার নয়। সময় যার হয়েছে একমাত্র সেই যাবে।

আমি চলেছি। যা কিছু ভাল বা মন্দ করেছি জেনো সে তোমাদেরই জন্য করেছি। ভুল বুঝো না আমায় কিংবা কি অন্যায় আমি জীবনে করেছি সেটাই কেবল মনে রেখো না। জানি না আজ পর্যন্ত কেউ তার আত্মাকে দেহ ছেড়ে যেতে দেখেছে কি না।

আমি কিন্তু দেখছি প্রতিমুহূর্তে কেমন করে আমার এই জীর্ণ অথর্ব দেহটা ছেড়ে আমার প্রাণবায়ু মিলিয়ে যাচ্ছে।···

দুঃখে আর কষ্টে অজিতের দিন চলছিল।

যোধপুরের নতুন হাকিম হয়েছে মুরসিদকুলি। ইউসুফ বিতাড়িত।

মুরসিদকুলি এসেই বললে, সে মহারাজ অজিতকে মৈরতা ফিরিয়ে দেবে—রাজকীয় নির্দেশ সে পেয়েছে। কিন্তু সময়কালে দেখা গেল ভার দেওয়া হল মৈরতার মৈরতীয় সর্দার কুশল সিং ও ধওন গোবিন্দদাসের হাতে।

মুরসিদকুলির ঐ যথেচ্ছচারিতায় ইন্দ্রসিংহের পুত্র অত্যন্ত অপমানিত বোধ করে নিজেকে এবং রাজাকে একখানা পত্র লিখে সে কথা জানালও।

কিন্তু মুরসিদকুলি সে পত্র ছিঁড়ে ফেলে দিল। মুরসিদকুলি জানত না যে তারও সময় শেষ হয়ে এসেছে। ঐ ঘটনার কিছুদিন পরেই তার হাকিমিপদ গেল—তার জায়গায় এলো জাফর খাঁ।

ইন্দ্রসিংহকে জাফর খাঁ আশ্রয় দিল—ইন্দ্রসিংহ তার সঙ্গে যোগ দিল সৌভাগ্যের আশায়।

মহারাজ অজিত কথাটা জানতে পেরে ক্রোধে অগ্নিশর্মা হয়ে ওঠে এবং সঙ্গে সঙ্গে ইন্দ্রসিংহকে ধ্বংস করবার জন্য তার বাহিনী নিয়ে এগিয়ে আসে।

দুনারে হলো দুই পক্ষে যুদ্ধ। ইন্দ্রসিংহ নিহত হলো।

কিন্তু অজিত তথাপি নিষ্কণ্টক হতে পারলো না, তার পিতৃরাজ্য যোধপুরে ফিরে যেতে পারল না। মাড়বারের প্রান্তদেশে পড়ে রইলো। এমনি করে আরো কয়েকটা মাস অতিবাহিত হয়ে গেল।

গ্রীষ্মকাল। প্রচণ্ড সূর্যতাপে মরুভূমি আগুন ছড়াচ্ছে। মাড়বার যেন তপ্ত

খোলার মত। জল। জল। মানুষ হাঁপিয়ে উঠছে। এভাবেও আর পথ-কুকুরের মত জীবন যাপন করা যায় না। যা থাকে কপালে অজিত সর্দারদের সঙ্গে পরামর্শ করে স্থির করে জাফর খাঁকে আক্রমণ করে পিতৃরাজ্য যোধপুর আবার ফিরে পাবার শেষ চেষ্টা করবে।

চারিদিকে সঙ্গে সঙ্গে রব পড়ে গেল।

ঠিক ঐ সময় সংবাদ এল—জিন্দাপীর শাহেনশা বাদশাহ ঔরংজীব আর ইহজগতে নেই। চৈত্র মাসের দ্বিতীয় দিবসে অমাবস্যা তিথিতে আরঙ্গাবাদে তারই নামে প্রতিষ্ঠিত শহরে পরলোকগকমন করেছে। দীর্ঘ অর্ধশতাব্দী ধরে অত্যাচার আর ভয়ের এক ইতিহাস সমাপ্ত হয়েছে।

সম্রাটপুত্র আজিম আছে মালোয়াতে বিদ্রোহী রামগোপাল ও রানা উমারার গতিবিধি লক্ষ্য করার জন্য, তারই পিতার নির্দেশে।

মহারাষ্ট্রীয় নিমা সিন্ধিয়া নারবুদায়।

রানা জয়সিংহ সম্রাট-নির্দেশে আজিম শাহকে সাহায্য করার জন্য এগিয়ে গিয়েছে। কেননা মারহাট্টারা মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে—ওদের এই সময় ধ্বংস না করতে পারলে বিপদের সম্ভাবনা সমূহ।

সম্রাটের মৃত্যুসংবাদ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তার দ্বিতীয় পুত্র আজিম গুর্জর থেকে বুন্দেলার রাও দলপুৎ ও হারার রাও রামসিংহের সাহায্যে ও তাদের প্রতিশ্রুতিতে আশান্বিত হয়ে আগ্রার পথে রওনা হয়ে গিয়েছে সিংহাসন অধিকার করবার জন্য সিংহাসনের প্রকৃত অধিকারী জ্যেষ্ঠভ্রাতা মৌজামকে বঞ্চিত ও পর্যুদস্ত করে।

মৌজামও বসে নেই—সেও কাবুল ত্যাগ করে আগ্রার পথে এগিয়ে গিয়েছে। সেও জানে তাকে সাহায্য করবে মেওয়ার ও মাড়বার এবং পশ্চিম রাজোয়ারা। চারিদিকে বিশৃংখলা—এই তো সুবর্ণ সুযোগ।

লাহোরের রাজপ্রতিনিধি ইব্রাহিম খাঁ নাকি আজিমের শূন্য পদে গুর্জরের নতুন শাসনকর্তা হয়ে আসছে যোধপুরের পথে।

অজিত আর বিলম্ব করে না। সে তার সর্দারদের নিয়ে অশ্বারোহণে যোধপুরে এসে প্রবেশ করল। পশ্চাতে তার পরিবারবর্গ।

অজিত হৈ হৈ করে যোধপুরে প্রবেশ করে পঞ্চদ্বারে নানা বলি দিল দেবতাদের উদ্দেশে।

প্রাসাদদুর্গে ছিল তখন মির্জা। সেও ইতিমধ্যে সম্রাটের মৃত্যুসংবাদ পেয়েছিল। বুঝতে পেরেছিল তার দিন শেষ হয়েছে—সে নিঃশব্দে এগিয়ে এসে দুর্গপ্রাসাদের তোরণ খুলে দিয়ে মহারাজ অজিতকে সসম্মানে গ্রহণ করল। জয়তু মহারাজ—

অজিত তার পরিবারবর্গদের নিয়ে অনেকদিন পরে পরম নিশ্চিন্ত হয়ে নিজ পিতৃদুর্গভবনে প্রবেশ করল। যবনের পতাকা দুর্গপ্রাসাদচূড়া থেকে নামিয়ে ফেলা হলো—তার স্থলে উড্ডীন হলো রাঠোরদের জাতীয় পতাকা। চারিদিকে আনন্দের উৎসব। মনোরম বাদ্যধ্বনি—নৃত্য গান—মিষ্টান্ন বিতরণ ঘরে ঘরে।

দীর্ঘ ছাব্বিশ বৎসর ধরে রাঠোররা যে উৎপীড়ন যবন সম্রাটের হাতে ভোগ করেছে সে উৎপীড়নের আজ অবসান। তারা আজ মুক্ত—সত্য সত্য স্বাধীন। তারপর শুরু হলো হত্যা আর লুণ্ঠন। সে এক বীভৎস দৃশ্য। দীর্ঘ দিন ধরে মাড়বারের যে ধনরত্ন যবনরা লুঠ করেছিল, আজ রাঠোররা সেই সব আবার ছিনিয়ে নিতে শুরু করল।

কত মুসলমান ও সেইসঙ্গে কত রাজপুত যে ঐ লুণ্ঠনযজ্ঞে আত্মাহুতি দিল তার বুঝি সংখ্যা নেই। যবনরা ভয়ে ভয়ে হিন্দুর পরিচ্ছদ পরে। মুখে বলতে লাগল—সীতারাম হরগোবিন্দ—আল্লা হো আকবর তারা আজ ভুলে গিয়েছে। মোল্লারা তাদের জপমালায় রাম নাম জপতে শুরু করে।

রাঠোর সর্দাররা বললে, মহারাজ, এবারে তিলক গ্রহণ করুন, আমরা ব্যবস্থা করি—

অজিত সানন্দে সম্মত হয়। দৈবজ্ঞ এসে একটি শুভদিন ধার্য করল। এবং সেই দিনে মহারাজ অজিত রাজতিলক ধারণ করে পিতার সিংহাসনে বসল।

ওদিকে যাজোয়াতে ময়ূর সিংহাসনের মীমাংসা হয়ে গেল দুই ভায়ের মধ্যে। আজিম ও মৌজাম। আজিম ও তার পুত্র দেবার বক্স কোটা ও দাতার যুবরাজদের সঙ্গে যুদ্ধে পরাস্ত ও নিহত হলো।

শাহ আলম বাহাদুর শাহ নাম নিয়ে মৌজাম সিংহাসনে উপবেশন করল। ভ্রাতৃরক্তে সে নিজের স্বীকৃতি প্রতিষ্ঠিত করল। সেই একই ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি। মুঘোল সিংহাসনের সেই পুরাতন ইতিবৃত্তেরই যেন নতুন করে আর একবার পাতা ওলটানো।

অভিশপ্ত মুঘোল সিংহাসন। শুধু রক্ত আর রক্ত। হত্যা আর হত্যা।

তবে এও ঠিক মৌজামের অনেক গুণ ছিল, নচেৎ মাড়বার ও মেওয়ারের সমর্থন তার প্রতি থাকত না। হয়তো সেই প্রীতি ও সমর্থনের পিছনে ছিল তার শরীরে এক রাজপুতানী মাতার রক্তের মিশ্রণ।

যদি ঔরংজীব তার চরম হিন্দুবিদ্বেষে ও নৃশংস রাজনীতিতে সমগ্র হিন্দুজাতির হৃদয়ে এক গভীর ক্ষত না সৃষ্টি করত, তাহলে হয়ত পরবর্তী কালে শাহ আলম দিল্লী সিংহাসনে বসে সমগ্র এশিয়ার প্রতিনিধিত্ব করতে পারত। কিন্তু হিন্দুদের মনের সে ক্ষত বাহাদুর শাহর সামান্য দিনের রাজত্বকালে নিরাময় করে তাদের বিশ্বাস ও প্রীতি ফিরিয়ে আনা সম্ভবপর হয়নি।

তা কোনদিন সম্ভবপর হবারও কথা নয়, কারণ দীর্ঘ অর্ধ শতাব্দী ধরে আলমগীর বাদশাহ যে বিষ চারিদিকে তার হিন্দুবিদ্বেষ নীতি ও অত্যাচার ও অবিশ্বাসে অপমানে ও সন্দেহে ছড়িয়েছিল সেই বিষই একদিন তার শেষ চিহ্নকে গ্রাস করে মুঘোল মসনদের ওপরে যবনিকা টেনে দিয়েছিল।

হিন্দুরা মুঘোল রাজাদের আর মনেপ্রাণে কোন দিনই বিশ্বাস করতে পারেনি। তাদের দীর্ঘ দিনের অভিজ্ঞতাই হয়েছিল সেই বিশ্বাসের অন্তরায়।

সমগ্র মাড়বারে আবার শান্তি ফিরে এসেছে। আর সেই সঙ্গে সঙ্গে দিল্লীতে সংবাদ পেঁছে গেল মহারাজাধিরাজ রাঠোরকুলতিলক অজিত মরুপ্রদেশের সমস্ত যবনসেনাকে নির্মূল করে দিয়েছে। মির্জাকে বিতাড়িত করে যোধপুর দুর্গপ্রাসাদ অধিকার করেছে। শাহ আলম বাহাদুর শা সংবাদটা দূতমুখে শুনে রীতিমত চিন্তিত হয়ে ওঠে।

এককালে ঐ অজিতসিংহেরই স্বর্গীয় পিতা মহারাজ যশোবন্তসিংহ ছিল তার পিতার সর্বাপেক্ষা বড় শত্রু। সমগ্র রাজস্থানে ঐ একটি মাত্র লোককেই সত্যি বাদশাহ আলমগীর ভয় করত। আজ আবার তারই পুত্র অজিতসিংহ মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। ঐ মাথা যদি অবিলম্বে নীচু না করে দেওয়া যায় ভবিষ্যতে একদিন ঝড় উঠবে। শাহ আলম স্থির করে সামনের বর্ষাকালেই অজিতের বিরুদ্ধে অভিযান করবে।

॥ ৩ ॥

কিন্তু সে রাত্রে সংযুক্তা ছুটে বেরিয়ে কোথায় গেল।

ভাগ্যবিপর্যয়ে সর্বক্ষণ গত কয়েক মাস ধরে নানাভাবে ব্যস্ত থাকায় অজিত আর সংযুক্তার কোন সংবাদ সংগ্রহ করবার চেষ্টা করতে পারেনি। সংযুক্তার কথা একপ্রকার যেন ভুলেই গিয়েছিল।

পিতৃসিংহাসন ফিরে পেয়ে এবং মাড়বারকে শত্রুসৈন্য থেকে মুক্ত করে এবং পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করে নিশ্চিন্ত হয়ে বসবার পর সেদিন রাত্রে সংযুক্তার কক্ষের সামনে দিয়ে যেতে যেতে হঠাৎ যেন নতুন করেই আবার সংযুক্তার কথা তার মনে পড়ে যায়। সংযুক্তা। কোথায় গেল সংযুক্তা?

ইতিমধ্যে দুর্গাদাস সর্দারের মৃত্যু হয়েছিল। তারপর নানাভাবে দুর্গাদাসের গৃহে খোঁজ করে জেনেছে অজিত সেখানে সংযুক্তা নেই। প্রায় তিন বৎসর পূর্বে সংযুক্তা অকস্মাৎ এক রাত্রে সে গৃহ ত্যাগ করে কোথায় যেন চলে গিয়েছে।

কোথায় যে সে গিয়েছে সে সংবাদ কেউ আর দিতে পারেনি। সংযুক্তাকে আজো ভুলতে পারেনি অজিত। বাল্যসঙ্গিনী সংযুক্তা।

একসঙ্গে তারা মানুষ হয়েছে—একসঙ্গে আহার করেছে--খেলেছে—শয়ন করেছে। অচ্ছেদ্য এক প্রীতির সম্পর্কে একে অন্যের সঙ্গে বাঁধা পড়েছে। সংযুক্তাকে অজিত কেমন করে ভুলবে! বার বার মনে পড়েছে সংযুক্তার কথা! তার অনিন্দ্যসুন্দর দেহবল্লরী সমস্ত মন জুড়ে বার বার ভেসে উঠেছে চিত্রের মত।

সকলের ধারণা অবিশ্যি সংযুক্তা আর জীবিত নেই। নচেৎ তার খোঁজ নিশ্চয়ই কোথায়ও না কোথায়ও পাওয়া যেত।

অজিত কিন্তু কথাটা আদৌ বিশ্বাস করে না; করতে পারেনি। সংযুক্তা বেঁচে আছে। নিশ্চয়ই বেঁচে আছে।

ইতিমধ্যে পিতৃসিংহাসন ও পিতৃরাজ্য সম্পূর্ণ নিষ্কণ্টক করে অজিত তৃতীয়-বার আবার বিবাহ করেছিল। একজন গররানীকে বিবাহ করেছিল।

আমখাসে অমরসিংহকে হত্যা করে অর্জুন যে বিবাদের সূচনা করেছিল এই বিবাহ যেন তারই সন্ধিপত্র রচনা করল। রাজপুত্র চরিত্রে এটা একটা জ্বলন্ত নিদর্শন।

অমরসিংহ নিজের দেশ থেকে নির্বাসিত হয়ে সম্রাটের অনুগ্রহ ভিক্ষা করে নাগোর পেয়েছিল। সম্রাট নাগোর তাকে দান করেছিল। কিন্তু সে সৌজন্য বেশী দিন অমরসিংহ ভোগ করতে পারেনি। রাজসভায় হার রাজকুমারের হাতে তার মৃত্যু হয়।

অমরসিংহের পুত্র ইন্দ্রসিংহ ও পৌত্র মাক্কম যতদিন জীবিত ছিল, একদিনের জন্য তাদের অগ্রজস্বত্ব পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করবার চেষ্টা থেকে বিরত হয়নি।

বার বার তারা সে চেষ্টা করে গিয়েছে। এবং সে কারণে অজিতের সংগে যে তাদের কত বিবাদ-বিসংবাদ হয়েছে পরবর্তী কালে দীর্ঘদিন ধরে তার লেখাজোখা নেই।

তা সত্ত্বেও নিজে রাঠোর হয়ে আর একজন রাঠোরের উপর প্রতিশোধ নিতে অজিত কোন ত্রুটি দেখায়নি।

গররানী রত্নাবতী অজিতের সর্বাপেক্ষা প্রিয়তমা মহিষী।

তিজ মহোৎসবের দিন পীপার নগরে ভগবতী ভবানীর পূজা দিতে যাবে মনে মনে বাসনা করে, কিন্তু পট্টমহাদেবী বলেছে, না তা সম্ভব নয়।

কেন সম্ভব নয় দিদি ?

বহুকাল আগে এই বংশেরই পূর্বপুরুষ মহারাজ সুরেজমল ঐ উৎসবে প্রাণ দিয়েছিলেন রাঠোর কুমারীদের যবনের হাত থেকে রক্ষা করতে গিয়ে—

তাতে কি ?

সেই থেকেই ঐ উৎসবের দিন এ বংশের কোন নারী ঐ উৎসবে যায় না—কন্যা পুত্রবধূ বা মহিষী—ও বাসনা তুমি ত্যাগ কর।

রত্নাবতী পট্টমহাদেবীকে কিছু বললে না আর। ঐ সম্পর্কে কোন আর উচ্চবাচ্যও করল না। নিশীথে স্বামীর কাছে কথাটা উত্থাপন করল।

অজিত ইদানীং রত্নাবতীর মন্দিরেই রাত্রিযাপন করছিল। সে রাত্রে রত্নাবতীর শয়নমন্দিরে প্রবেশ করে দেখে বাতায়নের ধারে উদাসভাবে বসে আছে তার প্রিয় মহিষী। কেশরচনা করেনি—প্রসাধন করেনি—বস্ত্র পর্যন্ত পরিবর্তন করেনি।

অজিত সামনে এসে দাঁড়াল, কি হয়েছে প্রিয়ে ?

রত্নাবতীর কোন সাড়া নেই।

মানিনীর মান। কথা বলবে না প্রিয়ে ? বল কি হয়েছে—নয়নযুগল কেন ছলোছলো—বিষণ্ন বদন—আলুলায়িত কুন্তল—বিস্রস্ত বসন—কেউ কি তোমায় কোন কটু কথা বলেছে মনোহারিণী ?

রত্নাবতী তথাপি নীরব।

প্রিয়ে—

আমাকে তুমি কালই পিতৃগৃহে পাঠিয়ে দাও।

সেকি!

হ্যাঁ—যেখানে রাজমহিষীর এতটুকু স্বাধীন সত্তা নেই—

কি বলছো প্রিয়ে, তোমার স্বাধীন সত্তা নেই, এ প্রাসাদদুর্গে তবে কার আছে! বল কি চাই তোমার!

যা হবে না তা মিথ্যে বলে কি হবে।

আমি তোমায় কথা দিচ্ছি প্রিয়তমে, তোমার বাসনা যদি আকাশের চাঁদও হয় তাও আমি—

থাক থাক যা পারবে না তা বলে কোন লাভ নেই।

অজিতেরও যেন কেমন জিদ চেপে যায়। বার বার বলতে থাকে, নিশ্চয়ই পারবো—বলো। বলো তোমার কি ইচ্ছা—

আমি মা ভবানীর পূজা দিতে যাবো পীপার নগরে।

এই কথা—নিশ্চয়ই যাবে—কবে যাবে বল?

তিজ মহোৎসবের দিন—পার্বতী উৎসব—

কিন্তু—সহসা যেন অজিত থমকে থেমে যায়।

জানি তুমি তা পারবে না!

তা নয় রাণী—এ বংশের এক স্বামীহারা পট্টমহাদেবী এক ইচ্ছা জানিয়ে গিয়েছিলেন মৃত স্বামীর চিতায় সহমরণে যাবার পূর্বে, যেন এ বংশের কোন নারী ঐ বিশেষ দিনটিতে মা ভবানীর পূজা দিতে না যায় পীপার নগরে—

আশ্চর্য!

আশ্চর্য নয় রাণী—মহিষী এই কথাই বলেছিলেন মা ভবানীর পূজা দিতে যে কুমারীরা তাঁর মন্দিরে সেদিন গিয়েছিল তাদেরই নারীত্ব সতীত্ব রক্ষা করতে গিয়েছিলেন মহারাজ অথচ মা ভবানী তাঁকে রক্ষা করলেন না। এ এক অভিমান রাণী—এক মর্মান্তিক অভিমান সন্তানের মায়ের প্রতি। মা তাঁর কন্যার সিঁথির সিঁদুর নিজহাতে মুছে দিলেন—তাই এ বংশের কোন নারী—স্ত্রী মাতা পুত্রবধূ কন্যা—ঐ বিশেষ দিনটিতে আজিও তাঁরই প্রতি শ্রদ্ধায় সেখানে পূজা দিতে যায় না। অন্য দিনে যাওয়ায় কোন বাধা নেই।

এ অর্থহীন অভিমান—কবে কোন্ অতীতে কি হয়েছিল—কুসংস্কার—

হয়ত তাই রাণী। তবু এ বংশেরই শোকাহত এক বধূ—

তার চাইতে বল না তুমি রাজী নও।

না গো না—তা নয়—ঠিক আছে, তোমার যখন এত ইচ্ছা যাবে তুমি। আর আমিই সঙ্গে করে নিয়ে যাবো।

তাহলে তুমি ব্যবস্থা কর—

বেশ।

ভবানীর মন্দিরে সেদিন পার্বতী উৎসবে চারিদিক রমরম করছে। অসংখ্য

নারী নানা দিক থেকে এসেছে মা ভবানীর পূজো দিতে।

পূজা দিয়ে রত্নাবতী স্বামীকে নিভৃতে ডেকে বললে, দেখ এখানে আসার আমার আরো একটা উদ্দেশ্য ছিল তোমায় জানাইনি।

উদ্দেশ্য ?

হ্যাঁ—শুনেছি এখানে এক যোগিনী আছেন পর্বতচূড়ায় এক গুহায়।

যোগিনী—

হ্যাঁ—যোগিনী মা সকলে বলে তাঁকে—তাঁর সঙ্গে একবার আমি দেখা করব। তিনি শুনেছি মানুষের ভূত ভবিষ্যৎ সব বলতে পারেন কররেখা বিচার করে।

কিন্তু পর্বতচূড়ায় তুমি উঠতে পারবে ?

কেন পারব না।

বেশ তবে যাও।

তুমি যাবে না ?

না।

যোগিনী মাকে তুমি দেখবে না ?

না।

তা হবে না। তোমাকেও আমার সঙ্গে যেতে হবে—

রত্না, তুমি একাই যাও।

না।

দেখো, ওসবে আমার আদৌ বিশ্বাস নেই—

তাই তো আরো বেশী করে তোমাকে আমি নিয়ে যেতে চাই।

কিন্তু তাতেই কি আমার মনে বিশ্বাস কণ্টুটি জাগাতে পারবে রত্না ?

কৌতুকস্মিত হাস্যে মহিষীর দিকে তাকিয়ে কথাটা বলে অজিত।

রত্নাবতীরও যেন কেমন জিদ চেপে যায়। সে বলে, না—তোমাকেও আমার সঙ্গে পর্বতচূড়ায় যোগিনী মার কাছে যেতেই হবে।

যেতেই হবে ?

হ্যাঁ—যেতেই হবে।

বেশ, তবে চল।

দুজনে অতঃপর চড়াই ঠেলে পর্বতচূড়ায় উঠতে থাকে। ইতিমধ্যে বেলা গড়িয়ে এসেছিল। চারিদিকে ম্লান আলোয় যেন কেমন বিষণ্ণ করুণ মনে হয়। বেশী ভাগ দর্শনার্থীই তখন যোগিনী মাকে দর্শন করে নেমে আসছে। উপরের যাত্রী তখন একমাত্র ওরাই স্বামী-স্ত্রী। রত্নাবতী ও অজিত।।

ওরা ব্যাপারটা ঠিক উপলব্ধি করতে পারেনি প্রথমে। ভেবেছিল পর্বতচূড়াটা খুব উঁচুতে নয় কিন্তু চড়াই ঠেলতে শুরু করে পরিশ্রমে হাঁপাতে হাঁপাতে বুঝতে পারে দুরারোহ পথ।

সময় তো নেবেই। কষ্টসাধ্যও। রত্নাবতী রীতিমত হাঁপাচ্ছে।

অজিত বলে, থাক রত্না।

না—রত্নাবতী হাঁপাতে হাঁপাতে দৃঢ় কণ্ঠে জবাব দেয়। উঠে চলেছে ক্লান্ত চড়াই তখনো।

তুমি পারবে না, এখনো অনেকটা পথ।

না।

তাছাড়া দেখো সন্ধ্যা হয়ে আসছে।

তা আসুক, আমি ইচ্ছে করেই এ সময়টা বেছে নিয়েছি। নিভৃতে একা এক যোগিনী মার দেখা পাবো এ সময়।

অজিত রীতিমত বিরক্ত হয়, বলে, আগে পৌঁছাও, তারপর তো নিভৃতে দেখা পাবে—

পাবোই—চলো—ওঠো।

দেখ তো চারিদিকে ক্রমশঃ অন্ধকার হয়ে আসছে।

আসুক।

আসুক মানে ?

ভয় করছে নাকি ?

ভয় নয়—অতর্কিতে যদি কোন বন্য জন্তু এসে আক্রমণ করে—

ভালই তো মরে যদি যাই।

রত্না—

হ্যাঁ—সতীনের জ্বালা সহ্য করতে হবে না।

সতীনরা তোমায় জ্বালা দেয় ?

তা দেয় বৈকি। তুমি তাদের ঘরে যাও না—ব্যাপারটা আমার ভাল লাগে না।

সত্যি নাকি ?

নয় ? চতুর্থী এলে আমারও তো তখন অমনি অবস্থা হবে—

চতুর্থী।

হ্যাঁ—মানে নতুন মহিষী।

এ খবরটা তুমি কোথায় পেলে ?

এ কি পেতে হয় গো, আপনিই জানান দেয়।

বটে ?

হুঁ।

নিম্নে উপত্যকায় অন্ধকার ঘনিয়ে এলেও পর্বতশীর্ষে তখনো আলোর কিছুটা অবশিষ্ট রয়ে গিয়েছে যেন। পর্বতশীর্ষে উঠে সেই দিনশেষের ম্লান আলোতেই অদূরে চোখে পড়ে দুজনার একটি গুহা এবং গুহার সামনে একটি প্রস্তরখণ্ডের উপরে কে যেন বসে। বুঝতে ওদের কষ্ট হয় না সে আর কেউ নয়—নিশ্চয়ই যোগিনী মা। এগিয়ে এল সসম্ভ্রমে তাঁর কাছে।

পরনে গেরুয়া—মাথায় বিলম্বিত কেশরাশি দুই কাঁধের ওপর দিয়ে বুকে

এসে পড়েছে। ধ্যানমগ্না। দুটি চক্ষু মুদ্রিত।

গুহার ভিতর থেকে এক প্রৌঢ়া নারী ঐ সময় বের হয়ে এলো। তার হাতে জলপাত্র।

কে—কে তোমরা? সেই প্রৌঢ়া প্রশ্ন করে।

রঞ্জাবতী বলে, আমরা যোগিনী মাকে দেখতে এসেছি, তাঁর দর্শন পেতে এসেছি।

কিন্তু এ সময় তো তাঁর সঙ্গে দেখা হয় না।

দেখা হবে না? রঞ্জাবতী পুনরায় শুধায়।

না—যোগে বসেছেন মা—মা এখন চোখও খুলবেন না, কারো সঙ্গে কথাও বলবেন না। কিন্তু তোমরা কে?

অজিত বা রঞ্জাবতীকে সে প্রশ্নের আর জবাব দিতে হলো না।

ইতিপূর্বে অজিতের দেহরক্ষী সুন্দর সিং মহারাজ ও রাজমহিষীকে পর্বত-শীর্ষে গুহাভিমুখে যেতে দেখে তাদের পিছনে পিছনে অনুসরণ করে এসেছিল। এবং সুন্দর সিং ওদের পশ্চাতেই এসে দাঁড়িয়েছিল।

সে জবাব দিল, চিনতে পারছো না নারী কে ওঁরা—রাঠোরকুলতিলক শ্রীমন শ্রীল মহারাজ অজিত ও তাঁর মহিষী—

সুন্দর সিংয়ের কথাটা শেষ হতেই ধ্যানমগ্না যোগিনী মার যেন অকস্মাৎ ধ্যানভঙ্গ হলো—তিনি গাত্রোত্থান করে গুহামধ্যে গিয়ে প্রবেশ করলেন।

মহারাজ, আমার অপরাধ নেবেন না, প্রৌঢ়া বলে, আমি যোগিনী মায়ের সেবিকা। আপনাকে ইতিপূর্বে দেখিনি তাই চিনতে পারিনি—

অজিত কোনো কথা বলে না। কথা বলে রঞ্জাবতী, উনিই নিশ্চয়ই যোগিনী মা।

হ্যাঁ রানীমা।

উনি গুহা-মধ্যে চলে গেলেন—

হ্যাঁ—কেন আজ হঠাৎ ভিতরে চলে গেলেন বুঝতে পারলাম না। মধ্যরাত্রি পর্যন্ত এখানেই বাইরে প্রস্তরখণ্ডের ওপর যোগে বসে থাকেন প্রত্যহ—

বোধ হয় আমরা এসেছি বলে—

তা হবে—উনি তো বেশী কথা বলেন না। আচ্ছা রানীমা, আপনি একটু অপেক্ষা করুন, আমি ভিতর থেকে আসছি—

সেবিকা গুহা-মধ্যে গিয়ে ঢুকল।

অজিত ও রঞ্জাবতী গুহার বাইরে দাঁড়িয়ে থাকে।

কিছুক্ষণ পরেই সেবিকা গুহা থেকে বের হয়ে এলো, রানীমা—

কিছু বলছিলে?

যোগিনী মার সঙ্গে আজ আর দেখা হবে না।

দেখা হবে না।

না।

কেন?

তা জানি না, তবে উনি তাই ইঙ্গিতে বলে দিলেন—আপনারা অন্য কোন একদিন দ্বিপ্রহরের দিকে আসবেন—

রঞ্জাবতী বলে, বেশ—একবার তাহলে সামনে থেকে প্রণাম করে যাবো।

কিন্তু—

ভয় নেই আমি কোন কথা বলবো না—একবার প্রণাম করেই চলে আসবো। এসো—স্বামীর হাত ধরে রঞ্জাবতী আকর্ষণ করে।

তুমি যাও না রঞ্জা—

না—তুমিও এসো। দুজনে অতঃপর গুহা-মধ্যে প্রবেশ করে।

বেশ বড়ই গুহাটি। দীপাধারে একটি দীপ জ্বলছে। সেই দীপালোকে গুহাটি আলোকিত। স্পষ্ট। সেই আলোতেই সামনের দিকে তাকিয়ে যেন অজিত চমকে ওঠে, কে—কে—

নিজের অজ্ঞাতেই যেন অর্ধস্ফুটভাবে বের হয়ে আসে কণ্ঠ থেকে কথাটা, সংযুক্তা—

কি বললে ?

রঞ্জা স্বামীর মুখের দিকে তাকাল।

না—কিছু না।

অজিত আর দাঁড়াল না, গুহা-মধ্য থেকে বের হয়ে এলো।

একটি ছোট প্রস্তরখণ্ডের উপরে উপবিষ্টা যোগিনী মা—ধ্যানমগ্না। সমগ্র মুখে যেন একটা স্বর্গীয় জ্যোতি। কিন্তু বয়স তো বেশী নয়। এ যে যৌবনেই যোগিনী। সন্ন্যাসিনী।

সেবিকার ইঙ্গিতে আর বেশীক্ষণ দাঁড়ায় না রঞ্জাবতী—যোগিনী মাকে প্রণাম করে গুহা থেকে বের হয়ে আসে।

অজিত অন্ধকারে বাইরে দাঁড়িয়ে ছিল।

তুমি চলে এলে যে—

চল—এবার ফেরা যাক—অজিত মৃদুকণ্ঠে কেবল বলে।

তুমি যোগিনী মাকে প্রণাম করলে না।

রঞ্জা, অনেকটা পথ নামতে হবে—চল আর দেরি করো না। দুজনে পাহাড়ী পথ ধরে নামতে থাকে। অজিত যেন স্তব্ধ—অন্যমনস্ক।

কি ভাবছো ? রঞ্জা প্রশ্ন করে।

অ্যাঁ—কিছু বললে ?

ভাবছো কি ?

কিছু না তো।

তবে অত গম্ভীর কেন—কথা বলছো না ?

অজিত জবাব দেয় না।

পরের দিন একাকী অশ্বারূঢ় অজিত যখন সেই পর্বতশীর্ষে গুহার সামনে এসে দাঁড়াল, বেলা তখন অবসানপ্রায়। সামনেই সেবিকার সঙ্গে দেখা।

সে অভিবাদন জানায়—প্রণাম মহারাজ।

যোগিনীর সঙ্গে দেখা করব।

তিনি তো নেই।

নেই!

তিনি কাল রাত্রেই কখন চলে গেছেন জানি না।

কাল রাত্রে!

হ্যাঁ মহারাজ। তারপর সারাটা দিন কত অনুসন্ধান করেছি কিন্তু কোন সন্ধান করতে পারিনি।

সেবিকার দু চোখে জল। মহারাজ অজিত স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনায় চারিদিকে।

॥ ৫ ॥

দুর্গপ্রাসাদে ফিরে এলেন মহারাজ অজিতসিংহ মহিষী রত্নাবতীকে সঙ্গে নিয়ে।

যোগিনীই যে সংযুক্তা সে বিষয়ে অজিতের আর সন্দেহমাত্রও মনে ছিল না। সংযুক্তা শেষ পর্যন্ত সন্ন্যাসিনী—যোগিনী হল যৌবনে। কিন্তু কেন? ঐ প্রশ্নটার কোন জবাব যেন অজিতসিংহ কিছুতেই খুঁজে পায় না। সংযুক্তা কি তবে তাকে ভালবাসত না? না—তা কি করে হবে।

সংযুক্তা বাল্যসঙ্গিনী তার। সংযুক্তা তাকে ভালবাসত বৈকি। তার চোখ মুখ তার কণ্ঠের ভাষাই তো তার কাছে তার ভালবাসা ব্যক্ত করেছে চিরদিন। অজিতের ভুল হতে পারে না। অজিত ভুল করেনি। তবে—তবে এমনটা ঘটলো কেন?

অশ্বারূঢ় হয়ে পাশাপাশি প্রাসাদদুর্গে ফেরার পথে অজিত একটি কথাও বলেনি। অজিত যেন সহসা নির্বাক হয়ে গিয়েছিল। মূক—একেবারে যেন বোবা হয়ে গিয়েছিল।

রত্নাবতী দু-চারবার প্রশ্ন করেছে, কি ভাবছো?

কই না—কিছু না তো।

একটা কথা বলবো? রত্নাবতী বলে।

বল।

মনে হচ্ছে—

কি?

ঐ মঠের যোগিনীকে যেন তুমি চিনতে।

না, না—

বল না চিনতে কিনা।

মঠের ব্রহ্মচারিণী—যোগিনী আমি তাকে কি করে চিনব—

কথাটা এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করেছিল অজিত।

কিন্তু রত্নাবতী তথাপি তাকে নিষ্কৃতি দেয়নি, বার বার কথাটা জানবার জন্য

অনুরোধ করেছিল। অজিত আর কোন জবাব দেয়নি।

অবশ্যই অজিতসিংহ নিষ্ক্রিয় হয়ে বসে থাকেনি। সে গোপনে নানাদিকে যোগিনীর সন্ধানে চর প্রেরণ করেছিল। কিন্তু যোগিনীর আর কোন সন্ধান পাওয়া যায়নি।

দিন গড়িয়ে চলে। দিনের পর রাত, আবার দিন। সপ্তাহ-মাস-বৎসর।

বাদশাহ শাহ আলমের ব্যবহারে সৌজন্যে সকলেই সন্তুষ্ট। কিন্তু তথাপি যেন রাজ্যে সত্যিকারের শান্তি ফিরে আসে না। দীর্ঘ অর্ধশতাব্দী কাল ধরে বাদশাহ ঔরংজীব সকলের মনে যে ঘৃণার বিষ সৃষ্টি করে গিয়েছিল তারই প্রতিক্রিয়া চলতে থাকে।

এমন সময় মাত্র কয়েকমাস রাজত্ব করে শাহ আলমের মৃত্যু হলো।

ইতিমধ্যে দুর্গাদাসও স্বর্গারোহণ করেছিল।

শাহ আলমের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে আবার দিল্লীর সিংহাসন নিয়ে রক্তপাত শুরু হলো। অভিশপ্ত তৈমুরের বংশ। অভিশপ্ত ময়ূর সিংহাসন। শাহ আলমের ছেলেদের মধ্যে শুরু হয়ে গেল সিংহাসনের লোভে বিবাদ। লোভের আগুন জ্বলে উঠলো। ভ্রাতৃবিরোধের আগুন।

শাহ আলমের জ্যেষ্ঠ পুত্র আজিমউশ্শান নিহত হলো তার কনিষ্ঠ ভ্রাতার চক্রান্তে। মৈজুদ্দীন জাহান্দার শা নাম নিয়ে দিল্লীর সিংহাসনে বসল।

ইতিমধ্যে রাঠোররাজ অজিতসিংহ নাহু ও হিমাগিরির রাজার বিরুদ্ধে সম্রাট কর্তৃক প্রেরিত হয়ে তাদের পর্যুদস্ত করে বিজয় গৌরবে মাড়বারে ফিরে এসেছিল। ক্লান্ত মহারাজ বিশ্রাম নিচ্ছিল, ঐ সময় দূতমুখে সংবাদ এল, মৈজুদ্দীন জাহান্দার শা নাম নিয়ে সিংহাসনে বসেছে।

রাঠোর সর্দারদের ডেকে পাঠাল অজিত।

দিল্লীর সংবাদ শুনেছেন ?

হ্যাঁ মহারাজ।

এখন আমাদের কি কর্তব্য—

আপনি কি স্থির করেছেন ? মৈবতেয় সর্দার প্রশ্ন করে।

স্বীকৃতি দিয়ে উপঢৌকন পাঠাব দিল্লীতে স্থির করেছি।

সেই মতই ব্যবস্থা হলো। অজিত রাঠোর সর্দার চন্দাবী কৈম সিংহকে উপঢৌকনসহ দিল্লীতে পাঠিয়ে দিল। এবং এক মাস পরে কৈম সিংহ ফিরে এলো।

সম্রাট অজিতকে গুর্জরের প্রতিনিধি করে দিয়েছে।

সনন্দ পাঠিয়ে দিয়েছে।

জাহান্দার শা'র প্রধান মন্ত্রণাদাতা ও বল ছিল প্রতিপত্তিশালী জুলফিকার খাঁ ও তার বাপ আসসদ খাঁ। ঐ পিতা-পুত্রের হাতেই তখন দিল্লীর রাজনীতি। প্রকৃতপক্ষে মুঘোলদের প্রতিপত্তি ও বল-বীর্য ছিল আসসদ খাঁ ও তদীয় পুত্র জুলফিকার খাঁ।

সৈয়দ-ভ্রাতারা হুসেন আলী ও আবদুল্লা খান ব্যাপারটা কিন্তু সহ্য করতে

পারছিল না। তারা পলাতক ফারুকশিয়ারের সঙ্গে গোপনে হাত মিলিয়ে জাহান্দর শা'কে সিংহাসন থেকে সরানোর জন্য ষড়যন্ত্র করতে লাগল। তারা জুলফিকার খাঁকে উৎকোচের দ্বারা বশীভূত করে গোপনে নিজেদের দলে টেনে নিয়ে এল।

মূর্খ জুলফিকার খাঁ বুঝতে পারেনি তখনো আগুনে সে হাত দিতে চলেছে। সে আগুন তাকেই একদিন পুড়িয়ে শেষ করে দেবে। হলোও তাই।

জুলফিকার খাঁর সাহায্যে সৈন্যদলকে হাত করে জাহান্দার শা'কে হত্যা করলো সৈয়দরা। ফারুকশিয়ার সম্রাট বলে ঘোষিত হলো। এবং পরের দিনই আসসদ খাঁ ও জুলফিকার খাঁকে সৈয়দের সৈন্যরা তাদের গৃহ অবরোধ করে বন্দী করল।

জুলফিকার খাঁ পালাল। কিন্তু সৈয়দের হাত থেকে সে নিষ্কৃতি পেল না। জুলফিকার খাঁকে আশ্বাস দিল সৈয়দরা, তার প্রতি কোন বিদ্বেষ নেই তাদের। অতএব নির্ভয়ে ফিরে আসতে পারে সে।

জুলফিকার খাঁ সৈয়দদের চাল ধরতে পারেনি। রাজধানীতে ফিরে আসার সঙ্গে সঙ্গেই তাকে সম্রাটের সৈন্যরা বন্দী করল। নির্মমভাবে হত্যা করা হলো পিতা-পুত্রকে। একদিন যাদের দাপটে সারা দিল্লী শহর কাঁপত—আজ তাদের ছিন্নভিন্ন মৃতদেহ দিল্লীর পথের ধুলোয় লুণ্ঠিত।

সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয় এখন রাজধানীতে সর্বেসর্বা। প্রকৃতপক্ষে তাদেরই হাতে দিল্লীর শাসন-ক্ষমতা।

দুর্ধর্ষ—উদ্ধত সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয় অজিতের কাছে হুকুমনামা পাঠাল সম্রাটের শীলমোহর দিয়ে। অভয়সিংহকে আগ্রাতে পাঠিয়ে দাও—তোমার প্রতিনিধি করে।

পুত্র অভয়সিংহ তখন ষোল বছরের তরুণ যুবক। বলিষ্ঠ কন্দর্পকান্তি। মহারাজ অজিতের নয়নের মণি। ইতিমধ্যে অজিতের আরো কয়েকটি পুত্রসন্তান হয়েছিল—ভক্তসিংহ তাদের অন্যতম এবং সর্বকনিষ্ঠ। ঐ ভক্তসিংহ অজিতের চৌহানী স্ত্রীর গর্ভে জন্মায়।

রপ্পাবতীর গর্ভে আরো পাঁচটি পুত্র হয়েছিল।

অভয়সিংহ ও ভক্তসিংহের মধ্যে বয়সের তফাত প্রায় পাঁচ বছরের। দুজনাই যেমন কান্তিমান তেমনি তেজস্বী, উদ্ধত ও গর্বিত।

ইতিমধ্যে অজিত একটি সংবাদ পেয়েছিল—বিশ্বাসঘাতক মুকুন্দ সিংহ আগ্রাতেই অবস্থান করছে। অজিতের কেমন যেন একটা ধারণা হয় ওর মধ্যে একটি জঘন্য চক্রান্ত আছে এবং মুকুন্দ সেই চক্রান্তের মধ্যে আছে। অথচ সম্রাটের নির্দেশ। সম্রাটের হুকুমনামা। উপায় নেই—মানতেই হবে।

বিলাসপ্রিয়—শান্তিপ্রিয় অজিত সম্রাটের সঙ্গে বিবাদের ভয়ে অভয়সিংহকে আগ্রায় পাঠানোই স্থির করে শেষ পর্যন্ত—তবে একাকী নয়। অভয়সিংহের সঙ্গে একদল সুদক্ষ বিশ্বাসী সামন্ত সৈন্য প্রেরিত হলো।

অজিতের অনুমান মিথ্যা নয়। দিল্লী পেঁছানোর সঙ্গে সঙ্গেই মুকুন্দর সৈন্যরা অভয়সিংহকে ঘিরে ফেলে। সঙ্গে সঙ্গেই দুই দলে যুদ্ধ বেধে যায়।

দুর্ধর্ষ সামন্ত সৈন্যরা মুকুন্দকে হত্যা করল। অভয়সিংহ ফিরে এল যোধপুরে।

সৈয়দরা প্রচণ্ড আক্রোশে যেন হুতাশনের মত জ্বলে ওঠে। এতদূর স্পর্ধা!

বিরাট সেনাদল নিয়ে সৈয়দরা যোধপুরের দিকে এগিয়ে গেল—প্রতিশোধ। প্রতিশোধ চাই—

অজিত দেখলো বেগতিক।

সম্রাটের বিরাট বাহিনী তখন প্রায় যোধপুরের সীমানায় উপস্থিত। ঐ বিরাট বাহিনী যদি যোধপুরের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে সব নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। আজ আর রাঠোর বীর চূড়ামণি সর্দার দুর্গাদাস নেই—যার হাতের অসি বিদ্যুতের মত ঝলসে উঠবে। নেই মুকুন্দ সর্দার।

সম্মুখ যুদ্ধ নয়। কৌশল। নগরের সমৃদ্ধ ও সম্পদশালী ব্যক্তিদের পরিবারবর্গ সহ তাড়াতাড়ি শিবানো নগরে পাঠিয়ে দিল এবং নিজের পরিবার-বর্গকে লুনী নদীর পশ্চিম তীরে অবস্থিত রুদ্দুরোতে পাঠিয়ে দিল গোপনে রাতারাতি।

সম্রাটের সৈন্যরা চারিদিক থেকে নগর অবরোধ করল। নগর, দুর্গপ্রাসাদ অবরুদ্ধ।

দিন যায়—রাত যায়—দুর্গমধ্যে ক্রমশঃ খাদ্যাভাব—জলাভাব দেখা দেয়। কিন্তু তথাপি অজিত অদমিত। সম্রাটের কাছে সে নতিস্বীকার করবে না।

যবন সৈন্যরাও মরুপ্রান্তে দিনের পর দিন নিষ্ক্রিয় বসে থাকতে থাকতে ক্লান্ত হয়ে পড়ে।

প্রচণ্ড গ্রীষ্ম। উত্তপ্ত হাওয়া মরুর আগুন যেন দগ্ধ করে। যবন সেনাপতিও বেগতিক দেখে। সে তখন দুর্গমধ্যে এক পত্র পাঠায় পত্রবাহীর হাতে।

॥ ৬ ॥

কি সংবাদ?

না—যবন সেনাপতি আমীর উল ওমরা হোসেন আলী—অন্যতম সৈয়দ, নগর অবরোধ তুলে দিয়ে যোধপুরের মহারাজার সঙ্গে যোগ্য মর্যাদায় সন্ধি করতে রাজী আছে—তবে তা একটি মাত্রই শর্তে।

শর্ত—রাজকুমার অভয়সিংহকে শরীর বন্ধক স্বরূপ সম্রাটের সভায় যেতে হবে। অন্যথায় নগরের চির অবরোধ।

তিলে তিলে ক্ষুধায় তৃষ্ণায় অবশ্যম্ভাবী মৃত্যু।

অজিত বললে, না। কখনই না।

বৃদ্ধ দেওয়ান একপাশে দাঁড়িয়ে ছিল, বললে, আমার প্রস্তাব যদি গ্রহণ করেন মহারাজ তো বলবো—

বল—

এ সুযোগ আপনি প্রত্যাখ্যান করবেন না।

কি বলছেন দেওয়ান, এই ঘৃণ্য প্রস্তাব—

তথাপি বলবো প্রত্যাখ্যান করবেন না।

আপনি বুঝতে পারছেন না—শুধু ঘৃণা আর অপমানই নয় দেওয়ান—

অজিতকে কথা শেষ করতে দেয় না দেওয়ান। বলে, জানি—কুমারের প্রাণ-সংশয় পর্যন্ত ঘটতে পারে।

তবু বলবেন—

তবু বলবো। কারণ আপনি তো মাত্র আপনার সন্তানদেরই পিতা নন মহারাজ—রাজ্যের অগণিত প্রজা সবাই তো আপনার সন্তান। তাছাড়া একের জন্য বহু বিনাশ না বহুর জন্য একের বিনাশ, কোন্‌টা মঙ্গল মহারাজ—

ভট্টকবি কেশর বলে, দেওয়ান ঠিকই বলেছেন মহারাজ—

আপনাদের তাহলে ঐ মত।

হ্যাঁ মহারাজ।

বেশ। তবে তাই হবে—দ্রুতগামী অশ্বারোহী পাঠিয়ে দিন, দেওয়ান, রুদ্রোতে কুমারকে ডেকে নিয়ে আসুক—কথাটা বলে অজিতসিংহ আর দাঁড়াল না। সভাকক্ষ ত্যাগ করে গেল।

যবন সেনাপতির কাছে পত্রোত্তর গেল—মহারাজ অজিত তার প্রস্তাবে সম্মত। অভয়সিংহ প্রেরিত হবেন অবিলম্বে দিল্লীতে।

গ্রীষ্মের অবসান হলো। জ্যৈষ্ঠের শেষ, আষাঢ়। আরাবল্লীর চূড়ায় চূড়ায় মেঘের ধূসর ওড়না দোলে। কিন্তু বৃষ্টি কই—জল কই—প্রচণ্ড তাপে সব ঝলসে যাচ্ছে।

অবশেষে আষাঢ়ের শেষাশেষি এক অপরাহ্ণে কুমার অভয়সিংহ হোসেন আলীর সঙ্গে দিল্লী অভিমুখে যাত্রা করল শর্তানুযায়ী।

দিল্লীতে পেঁছাবার পর সম্রাট ফারুকশিয়ার মরুরাজ্যের উত্তরাধিকারীকে পঞ্চ সহস্র সৈন্যের সেনাপতি পদে নিযুক্ত করল।

কিছু দিন আরো অতিবাহিত হয়ে গেল। কিন্তু নগরের অবরোধ অপসারিত হলো না আজ পর্যন্ত। অবরোধের ব্যাপারে কিছুটা শৈথিল্য প্রকাশ পেল বটে, কিন্তু অবরোধ থেকেই গেল।

অজিত যবন সেনাপতির কাছে একজন সর্দারকে প্রেরণ করল।

এ কি রকম ব্যবহার।

তোমাদের প্রস্তাবমত কুমার কবে দিল্লী চলে গিয়েছেন কিন্তু এখনো তোমরা নগর অবরোধ করে আছ।

যবন সেনাপতি আমীর উল উমরা হুসেন আলী বলে পাঠালো: আপনার সঙ্গে আমার কিছু কথা আছে—সেটা শেষ হলেই আমি আমার সৈন্যবাহিনী নিয়ে দেহলীতে ফিরে যাবো।

অজিতের ভ্রূকুঞ্চিত হয়—আবার কি কথা? না—আমি যাবো না।

ভট্টকবি কেশর অজিতের সমবয়সী ও বন্ধুস্থানীয়।

ভট্টকবি বলে, যান মহারাজ—শুনেই আসুন না কি বলতে চায় ও।
বলছো যাবো ?
হ্যাঁ—যান।
কিন্তু—
আর কোন কিন্তু নয়, যান।
ঐ দিন রাত্রির মধ্যযামে সমস্ত নগর যখন নিদ্রিত—অশ্বারোহণে অজিত দুর্গপ্রাসাদ থেকে বের হয়ে গেল।
দ্বারী নগরের প্রধান প্রবেশদ্বার খুলে দিল মহারাজের ইঙ্গিত পেয়ে।
নিঃশব্দে একটি ঘোর কৃষ্ণবর্ণ অশ্বের পৃষ্ঠে আরোহণ করে অজিত শত্রু-শিবিরের দিকে এগিয়ে যায়।

আমীর উল উমরা হুসেন আলী নিজ শিবিরে জেগেই ছিল। অপেক্ষা করছিল সে অজিতের আগমনের জন্য।
দ্বারী এসে মহারাজের পাঞ্জা দেখাল, একজন আলীর দর্শন-প্রার্থী।
পাঞ্জার দিকে অবলোকন করেই আলী বলে, যাও এখানে নিয়ে এসো সসম্মানে।
কৃষ্ণবর্ণ পরিচ্ছদে আবৃত অজিত আলীর শিবিরাভ্যন্তরে প্রবেশ করতেই সসম্ভ্রমে সে বলে, আসুন—আসুন মহারাজ।
বহু মূল্যবান আসনে বসতে দেয় অজিতকে সৈয়দ।
বলুন কি পানীয় ইচ্ছা করেন মহারাজ—
পানীয় এখন থাক আলী। কি কথা আছে আমার সঙ্গে আপনার তাই বলুন।
বলবো, বলবো বৈকি—বিশ্রাম নিন—
বিশ্রামের আমার প্রয়োজন নেই, বলুন আপনি কি বলতে চান।
তথাপি আলী দাসীদের ডেকে সরাব পরিবেশন করে।
কিন্তু মহারাজ অজিতের কিছুই ভাল লাগছিল না। সে আবার তাগিদ দেয়।
আলী বলে, মহারাজ, যে কথাটা বলতে চাই সেটা আনন্দের ও সুখের কথা।
বলুন—
সম্রাট আপনার সঙ্গে একটি চিরস্থায়ী মধুর সম্পর্ক স্থাপন করতে চান।
কি রকম।
শুনেছি আপনার একটি অপরূপ লাবণ্যময়ী কন্যা আছে।
আলী—গর্জন করে ওঠে অজিত।
শুনুন মহারাজ শুনুন—অধৈর্য হবেন না। বিচলিত হবেন না। সম্রাট ফারুকশিয়ারের সঙ্গে আপনি আপনার কন্যার বিবাহ দিন।
বিবাহ ? চন্দ্রাবতীর—ফারুকশিয়ারের সঙ্গে বিবাহ ?
হ্যাঁ—ভেবে দেখুন মহামান্য আকবরের সময় থেকেই আপনাদের সঙ্গে সম্রাট বংশের বিবাহ ঘটে এসেছে এবং তাতে করে নিশ্চয়ই আপনি স্বীকার করবেন

মঙ্গলই হয়েছে।

এ প্রস্তাবটি কি আপনারই আলী?

হ্যাঁ।

মহারাজ অজিত কয়েকটা মুহূর্ত অতঃপর চুপ করে থাকে। কোন কথা বলে না। ভ্রূযুগল কুঞ্চিত তার।

কি ভাবছেন মহারাজ—দেখুন সম্রাট যদি আপনার জামাতা হন তাহলে দিল্লী চিরদিন আপনার বন্ধু—আপনার সহায় থাকবে। রাজস্থানের অন্যান্য রাজন্যবর্গও আপনার বিরুদ্ধে কোন দিন অস্ত্রধারণে সাহসী হবে না।

অজিত সহসা গাত্রোত্থান করে।

উঠছেন?

হ্যাঁ।

তাহলে আমার প্রস্তাবটা—

যথাসময়ে জবাব পাবেন—

শুনুন মহারাজ, আপনাকে আমি একটা সংবাদ দিচ্ছি—সম্রাট বর্তমানে মাড়বারের জংগলের মধ্যে শিকারের জন্য এসেছেন—

কি বললেন!

হ্যাঁ—যদি আপনি সম্মত থাকেন তাহলে—

দু' একদিনের মধ্যেই জানতে পাবেন—আমি চললাম।

অজিত আর দাঁড়াল না। আলীর শিবির থেকে বের হয়ে এলো। অন্ধকার পথ ধরে অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করে অজিত প্রাসাদদুর্গের অভিমুখে চলেছিল।

অমাবস্যার ঘোর অন্ধকার। মাথার উপরে নক্ষত্ররাজি যেন হীরার কুচির মত কালো আকাশপটে জ্বলছিল। মন্দ মন্দ বায়ু প্রবাহিত হচ্ছিল।

চন্দ্রাবতী আর সূর্যকুমারী তার দুটি কন্যা। চন্দ্রাবতী তার আদারিণী কন্যা। ষোড়শী—অপরূপ লাবণ্যময়ী। রঙ্গাবতীর গর্ভে ঐ একটি কন্যা সন্তানই হয়েছে। সূর্যকুমারী প্রধানা মহিষীর কন্যা। সেই কন্যাকে তুলে দিতে হবে যবনের হাতে।

অজিত যত ভাবে ততই মনে হয়—মন্দ কি। প্রস্তাবটা এমন কিছু সত্যিই তো গর্হিত নয়। বরং একদিক দিয়ে অতি উত্তম।

হ্যাঁ—মিথ্যা বলেনি আলী—সম্রাট ফারুকশিয়ার যদি তার জামাতা হয়—মহাপরাক্রমশালী সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয় হবে তার সহায়—সিংহাসনের কোন আর ভয় থাকবে না—নিত্য নব নব আশংকা থাকবে না—চিন্তা থাকবে না কোন রকম।

পরম নিশ্চিন্তে অজিত বাকী জীবনটা রাজত্ব করে যেতে পারবে—নিষ্কণ্টক রাজত্ব। আর তাদের পূর্বপুরুষরা তো যবনের হাতে কন্যা সম্প্রদান করেছেই—রাজস্থানে বিশেষ করে ঐ ধরনের বিবাহের যথেষ্ট নজির আছে। তবে এর মধ্যে অন্যায় কি আছে!

সম্রাট ফারুকশিয়ার তার জামাতা। সৈয়দ ভ্রাতৃযুগল তার বন্ধু। আজ দিল্লীর সম্রাটের সমস্ত শক্তি তো ঐ সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয়—হুসেন আলী ও কুতুব-উল-মুলুক—

এবং আবদুল্লা খান। এত বড় সুযোগ হারানো মূর্খতা ছাড়া আর কি।

তার পিতৃদেব যশোবন্তসিংহ সম্রাট ঔরংজীবের সঙ্গে বিবাদ করে সারাটা জীবন একপ্রকার দুঃখে ও দুশ্চিন্তায় কাটিয়ে গিয়েছে বলতে গেলে। কেবল যুদ্ধ আর যুদ্ধ—রাজত্ব করা তো নয়—দুশ্চিন্তার সাগরে সর্বক্ষণ হাবুডুবু খাওয়া।

যত ভাবে অজিত কথাটা ততই যেন তার মনে হয়—এ অপূর্ব সুযোগ—এ সুযোগ হারানো মূর্খতা। না—না—সে হারাবে না এ সুযোগ।

চন্দ্রাবতী—তা হোক—সে হবে দিল্লীর সম্রাটের মহিষী। মনস্থির করে ফেলে অজিত। এবং মনে মনে পরিতৃপ্তির হাসি হাসে। আলী নিঃসন্দেহে এক কূটনৈতিক চাল চেলেছে কিন্তু অজিত আরো বড় চাল দেবে। এক চালে মাত্ করবে সব দিক—

॥ ৭ ॥

সত্যিই তখন সম্রাট ফারুকশিয়ার আরাবল্লীর পাদদেশে গভীর অরণ্যে মৃগয়ায় কালযাপন করছিল। জঙ্গলের মধ্যে বহু বিস্তীর্ণ জায়গা নিয়ে সম্রাটের তাঁবু পড়েছে। নৃত্য-গীত-সরাব হৈ-হল্লা সারাটা রাত্রি ধরে এবং দ্বিপ্রহরে হাতীতে চড়ে হৈ-হৈ করে শিকার করা। বেশ আনন্দেই দিন কাটছিল সম্রাটের।

এদিকে একদিন গেল দুদিন গেল, আলী অপেক্ষা করছে অধীর হয়ে মহারাজ অজিতের কাছ থেকে সংবাদ পাওয়ার জন্য।

আসলে কিন্তু প্রস্তাবটা আলীর নয়—স্বয়ং সম্রাটের। লোকপরম্পরায় সম্রাট চন্দ্রাবতীর রূপের খ্যাতি শোনা অবধি সেই নারীরত্নকে লাভ করবার জন্য অধীর হয়ে উঠেছিল মনে মনে। এবং তারই পরামর্শ মত তখনো আলী নগরের অবরোধ তুলে নেয়নি।

আলীরও অবশ্য স্বার্থ ছিল। নিত্য নারী ও সর্বক্ষণ সুরা ও শিকার ব্যসনে যদি সম্রাটকে ডুবিয়ে রাখা যায় তবেই তারা দু ভাই নিরঙ্কুশ। তাদের আধিপত্যই থাকবে রাজ্যে। অতএব সেও সঙ্গে সঙ্গে উৎসাহিত বোধ করছিল।

কিন্তু ধূর্ত সৈয়দ বুঝতে পারেনি—কল্পনাও করতে পারেনি—মহারাজ অজিত তার চাইতেও বুদ্ধিমান। ঢের বেশী কৌশলী। চক্রী।

আলী যখন অস্থির হয়ে উঠেছে সেই সময় চতুর্থ রাত্রে মাড়বারের প্রাসাদ-দুর্গ থেকে একটি দ্রুতগামী অশ্ব বের হয়ে গেল। অশ্বের উপর দুজন আরোহী। অশ্ব দ্রুতগতিতে নগর-সীমানার দিকে ধাবিত হয়—যেখানে পর্বতসানুদেশে গভীর জঙ্গল।

অতিরিক্ত সুরা পানে নেশার ঘোরে প্রায় আচ্ছন্নের মত নিজ শিবিরে শয্যার ওপরে পড়ে ছিল অর্ধশায়িত ভাবে সম্রাট ফারুকশিয়ার। নেশায় রক্তিম দুটি চক্ষু

চলন্ চলন্। এই কিছুক্ষণ আগে নৃত্য-গীতের আসর থেকে উঠে এসেছে সম্রাট।

দ্বারী খোজা প্রহরী এসে কুর্নিশ জানাল। আলমপনাহ—যোধপুরাধিপতি—কে!

আলমপনাহ—তিনি খোদাবন্দের জন্য বিশেষ একটি উপঢৌকন এনেছেন—

সঙ্গে সঙ্গে যেন নেশা টুটে যায় ফারুকশিয়ারের।

কে—কে এসেছে—

আলমপনাহ—মহারাজ অজিতসিংহ!

কিন্তু উপঢোকন কি যেন বললি—

তাঁর সংগে এক নারী আছে বলে মনে হচ্ছে—

যা, যা. শীঘ্রই এখানে পাঠিয়ে দে—

একটু পরেই অজিতসিংহ সম্রাটের শিবিরাভ্যন্তরে এসে প্রবেশ করল।

বন্দেগী সম্রাট—

বসুন—বসুন মহারাজ—আসন গ্রহণ করুন। কি সৌভাগ্য আমার—মহারাজ অজিতসিংহ আজ আমার শিবিরে অতিথি—

মহারাজ অজিতের সংগে অবগুণ্ঠনবতী এক নারী।

তার গুণ্ঠন তখনো উন্মোচিত হয়নি।

সম্রাট—

বলুন মহারাজ—

ফারুকশিয়ারের লোভাতুর দৃষ্টি তখন বার বার অবগুণ্ঠবতী নারীর সর্বাঙ্গ যেন লেহন করছে।

সংগে আমার কন্যা চন্দ্রাবতী।

কে—

আমার কন্যা চন্দ্রাবতী—আমার ইচ্ছা এই কন্যাকে আপনারই হাতে তুলে দেবো—

শোভনাল্লা—আনন্দ উল্লাসে যেন চিৎকার করে ওঠে ফারুকশিয়ার। সে স্বপ্ন দেখছে না তো! দিনের মধ্যে কোন খোয়াব?

শিবিরের মধ্যে উজ্জ্বল আলো জ্বলছিল—অজিত সহসা কন্যার অবগুণ্ঠন হাত দিয়ে উন্মোচন করে দেয়। সংগে সংগে যেন মেঘের বুকে বিদ্যুৎ খেলে যায়।

ফারুকশিয়ারের লোভাতুর চোখের দৃষ্টি যেন সাপের মত হিল হিল করে ওঠে।

ওয়া—ওয়া—

সম্রাট বোধ হয় লোভাতুর—নেশার ঘোরে দু পা এগিয়েও এসেছিল, কিন্তু চকিতে হাত তুলে বাধা দেয় অজিত—সম্রাট, আগে সর্বসমক্ষে আমার কন্যার পাণিগ্রহণ করবেন তার পর—

বেশ, বেশ তাই হবে। তাই হবে—

অজিত তৎক্ষণে ক্ষিপ্রহস্তে পুনরায় চন্দ্রাবতীর মুখের ওপরে গুণ্ঠন টেনে

দিয়েছে।

আজই বিবাহ হয়ে যাক না মহারাজ।

না সম্রাট।

তবে—

আগে আমি সব ব্যবস্থা করি—আপনি এসে তারপর আমার কন্যার পাণিগ্রহণ করে হারেমে নিয়ে যাবেন—

কবে?

শীঘ্রই ব্যবস্থা হবে।

কিন্তু বিলম্ব করবেন না বেশী।

অজিত বুঝতে পারে তার কৌশল বিফল হয়নি—সে বলে—না—আপনি ইতিমধ্যে দিল্লীতে ফিরে যান, আমিও কন্যার বিবাহের আয়োজন করি—আর—

আর—

ইতিমধ্যে আলীকে অবরোধ তুলে নিতে বলুন।

নিশ্চয়ই—নিশ্চয়ই।

আজ তাহলে আমি বিদায় নেবো।

এক্ষুনি?

অজিত মৃদু হাসল, আমাকে সব ব্যবস্থা করতে হবে তো—শীঘ্র শীঘ্র—

তবে তাই করুন গে।

মহারাজ অজিতকে ফারুকশিয়ার সসম্ভ্রমে বিদায় দিল এবং কিছুক্ষণ পরেই আলীর কাছে তার নির্দেশনামা নিয়ে দ্রুতগামী অশ্বারোহী দূত প্রেরিত হলো। অবরোধ অবিলম্বে তুলে ফেলা হোক—অজিত কন্যা সম্প্রাদানে সম্মত। সে নিজে এসেছিল কন্যাসহ সম্রাট-শিবিরে। সম্রাটের আদেশের যেন একটুকু অন্যথা না হয়। অবিলম্বে যেন পালিত হয়।

সম্রাট ফারুকশিয়ার রাজধানীতে ফিরে এলো।

আলীও কয়েকদিন পরে নগরের অবরোধ তুলে সৈন্য সমভিব্যাহারে দিল্লীতে ফিরে এল।

রাজধানীতে উৎসব শুরু হয়ে যায়।

সম্রাট চন্দ্রাবতী—মাড়বার দুহিতার পাণিগ্রহণ করছে—সংবাদটা লোকমুখে চারিদিকে প্রচারিত হয়ে যায়। বিবাহের দিনও প্রায় আসন্ন। এমন সময় অকস্মাৎ এক বিপদ। সম্রাট অসুস্থ হয়ে পড়ল। সম্রাট ফারুকশিয়ারের পৃষ্ঠদেশে এক বিস্ফোটক দেখা দিল।

বিবাহের আনন্দ মাথায় উঠে যায়। সর্বক্ষণ যন্ত্রণায় ফারুকশিয়ার ছট্‌ফট্‌ করতে থাকে। বৈদ্য হাকিম যে যেখানে ছিল দলে দলে এল কিন্তু কেউ কোন প্রকারে ব্যাধির উপশম করতে পারে না। নানা প্রকার ঔষধি সেবন ও প্রলেপ হয়, কিন্তু কোন ফল পাওয়া যায় না।

ঐ সময় এক ব্যাপার ঘটলো।

যে ব্যাপারটা ভারতের ইতিহাসে পরবর্তী যুগে বিশেষ একটা যোগাযোগ বলে বর্ণিত হয়। সম্রাট তার কক্ষে সর্বক্ষণ যন্ত্রণায় ছটফট করছে। নিদ্রা নেই, আহার নেই। রাজসভাতেও যায় না। সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয়ই রাজত্ব চালায়।

রাজদরবারে ঐ সময় সুরাট থেকে একদল ফিরিঙ্গী বণিক এসে বসে আছে—সম্রাটের দর্শনাকাঙ্ক্ষায়। তারা ভারতে বাণিজ্যের অনুমতি চায়।

ঐ ফিরিঙ্গি বণিকদের দলে ডাঃ হ্যামিলটন নামে এক প্রখ্যাত শল্য-চিকিৎসক ছিল।

সম্রাট দরবারে আসছেন না—

ব্যাপার কি—না সম্রাট অসুস্থ।

ফিরিঙ্গি বণিকেরা জিজ্ঞাসা করে। কি হয়েছে সম্রাটের? কি অসুখ—

আলী বলে, পৃষ্ঠদেশে এক বিস্ফোটক হয়েছে সম্রাটের—যন্ত্রণায় কষ্ট পাচ্ছেন—কোন চিকিৎসাতে ফল হচ্ছে না।

বণিকেরা পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে। অবশেষে একজন বলে, আপনাদের যদি কোন আপত্তি না থাকে তো আমাদের দলে একজন আমাদের স্বজাতীয় চিকিৎসক আছেন—তিনি একবার চেষ্টা করে দেখতে পারেন—

বেশ তো—সম্রাটকে বলবো—আলী জবাব দেয়।

পরের দিন সম্রাট ঐ চিকিৎসককে ডেকে পাঠায়।

ডাঃ হ্যামিলটন সম্রাটকে ভাল করে পরীক্ষা করে বললো, এ ঠিক বিস্ফোটক নয় অন্য জিনিস—তবে আমার ধারণা শল্য চিকিৎসার দ্বারা সম্রাটকে আমি সুস্থ করে তুলতে পারব—

সম্রাট বলে, কর, কর—যা হয় কিছু কর সাহেব—আমি আর এ যন্ত্রণা সহ্য করতে পারছি না—

•

দিন দুই বাদে ডাঃ হ্যামিলটন সম্রাটের দেহে অস্ত্রোপচার করল। সে রাত্রে সম্রাট বহুদিন পরে নিশ্চিন্তে নিদ্রা গেল। এবং দিন দশেকের মধ্যেই সম্রাট সুস্থ হয়ে উঠল।

ভারী খুশি সম্রাট। দরবারে এসে বসেছে সম্রাট ফারুকশিয়ার অনেক দিন পরে। আমীর ওমরাহরা চারিপাশে তাকে ঘিরে আছে।

সম্রাট আলীকে বললে, সেই ফিরিঙ্গী চিকিৎসক কোথায়?

হ্যামিলটন এগিয়ে এসে কুর্নিশ দিল—সম্রাট দীর্ঘজীবী হোন—

আমি অত্যন্ত প্রীত হয়েছি ফিরিঙ্গি তোমার উপরে—কি পারিতোষিক তুমি চাও বল—ধনরত্ন—মণিমাণিক্য—

হ্যামিলটন বললে, সম্রাট মহানুভব—সম্রাট দীর্ঘজীবী হোন—

বল, কি তুমি চাও—তোমাকে অদেয় আমার কিছুই নেই।

সম্রাট যদি সত্যিই প্রীত হয়ে থাকেন আমার ওপরে, তাহলে বিশাল ভারত সাম্রাজ্যে বসবাস করবার ও বাণিজ্য করবার অনুমতি দিন সুদূর ব্রিটিশ সাম্রাজ্য থেকে আগত এই বিদেশী ইংরেজদের। হীরা, মণিমাণিক্য বা কোন ব্যক্তিগত

পুরস্কারের প্রতি আমার কোন লোভ নেই।

ফারুকশিয়ার হেসে বললে, মাত্র এই—তাই হবে বিদেশী বণিক—সম্রাট ফারমান সই করে দিল।

সম্রাট তখন খুশিতে টলমল করছে। অদেয় তার কিছুই নেই।

কিন্তু আশ্চর্য সেই ইংরাজ বণিক। নিজের ব্যক্তিগত স্বার্থের দিকে একবারও সে নজর দিল না। সমগ্র জাতির কথাই সে ভাবল।

সম্রাটের সেই অবাধ বাণিজ্যের ফারমান পরবর্তীকালের নতুন এক ইতিহাসের সূচনার স্বাক্ষর। এবং যার ফলে একদিন বণিকের ঐ মানপত্র রাজদণ্ডরূপে সমগ্র ভারতকে কুক্ষিগত করে—সব লাল করে দিয়েছিল। কিন্তু সে কথা সে দিন কেউ ভাবেনি। ভাববার অবকাশও পায়নি।

ক্রমশঃ বিবাহের উৎসব এসে গেল। রাজধানী আনন্দে খুশিতে আলোয়—নৃত্যে গীতে ঝলমল করে উঠল।

বিরাট ঐশ্চর্যপূর্ণ সে উৎসব পরিচালনা করেছিল স্বয়ং আমীর উল উমরা। তারই গৃহে উৎসবের আয়োজন হয়েছিল।

অজিতের কন্যার সঙ্গে ফারুকশিয়ারের পরিণয় সম্পন্ন হলো। কয়দিন ধরে কেবল উৎসব আর উৎসব। কত আলো জ্বললো—কত আতসবাজী পুড়লো। এদিকে দিন যত যেতে লাগল সম্রাট ফারুকশিয়ার বুঝতে পারে—সে সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয়ের হাতের পুতুল মাত্র।

নামে মাত্র সে সম্রাট—রাজ্যের সর্বেসর্বা অমিত পরাক্রমশালী সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয়। হুসেন আলী—আমীর উল উমরা ও তার ভাই আবদুল্লা—কুতুব-উল-মুলুক। শাসনকার্য ও তার পরিচালনার আসল চাবিকাঠিটি ক্রমশঃ কখন তাদেরই হাতের মুঠোর মধ্যে চলে গিয়েছে।

তারাই তাকে একদিন সিংহাসনে বসিয়েছে সত্য কিন্তু আজ তারা তাকে হাতের মুঠোর মধ্যে পুরে ফেলেছে।

চিন্তিত হয়ে ওঠে সম্রাট। কারণ সম্রাট বুঝতে পারছিল ঐ সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয় যে কোন মুহূর্তে তাকে সিংহাসন থেকে টেনে নামাতে পারে। অনেক ভেবে সে সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয়ের ক্ষমতা খর্ব করবার জন্য এক অভিনব পন্থা অবলম্বন করল। পিতামহ ঔরংজীবের মন্ত্রণাদাতা ইনায়েৎউল্লা খানকে ডেকে এনে দেওয়ানের পদ দিল।

এবং ইনায়েৎ ক্ষমতা পেয়েই প্রথমে যে কাজটি করল সেটি হচ্ছে রাজ্যে জিজিয়া কর প্রথাকে পুনরায় চালু করা। অবশ্য কিছু অদলবদল করল এবারের জিজিয়া কর প্রথার, কিন্তু তথাপি ঐ করভার জনগণের মনের মধ্যে বিক্ষোভের সৃষ্টি করল।

অসন্তোষের ধোঁয়া জমা হতে লাগল। অজিত তো রীতিমত অসন্তুষ্ট হলো। রাণা উমরাও চুপ করে বসে থাকে না। সে তার স্বাধীনতা লাভের জন্য তৎপর হয়ে ওঠে।

মারহাট্টারাও চুপ করে থাকে না। তারাও নানাভাবে তৎপর হয়ে ওঠে রাজা শাহুর নেতৃত্বে। তারাও চৌথ কর সৃষ্টি করে।

রাণা উমরার মৃত্যু হয় কিছু দিনের মধ্যেই এবং সংগ্রামসিংহ মেওয়ারের সিংহাসনে বসল।

হতভাগ্য ফারুকশিয়ারের দিনও শেষ হয়ে এসেছিল ইতিমধ্যে।

॥ ৮ ॥

সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয় নির্বোধ নয়। তারাও সম্রাটের মতিগতি দেখে বুঝতে পেরেছিল তৈমুরের ঐ বংশধরটির মনের মধ্যেও মসনদের নেশা ধরেছে। সে আর তাদের পুতুল হয়ে থাকতে রাজী নয়। ভোগ বিলাস আর প্রাচুর্য নিয়েই সে বোধ হয় আর সন্তুষ্ট থাকতে পারছে না—ঐ সঙ্গে সে আরো কিছু চায়। ক্ষমতার লোভ। ও বড় বিচিত্র আগুন, একবার জ্বললে সর্বস্ব না পুড়িয়ে সে কোনদিন ক্ষান্ত হয় না।

সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয় সঙ্গে সঙ্গে সতর্ক হয়ে ওঠে। এবং কাজে নামবার আগে ব্যাপারটা আরো ভালো করে বুঝে নেবার চেষ্টা করে। ক্ষমতা এখনো সম্পূর্ণ তাদের মুঠোর মধ্যে সত্য। তথাপি যত সহজে ফারুকশিয়ারকে সেদিন তারা মসনদে বসিয়ে ছিল তত সহজে হয়ত আজ আবার তাকে মসনদ থেকে টেনে নামানো যাবে না।

ফারুকশিয়ার ঠিক জাহান্দর শা নয়।

কিন্তু দুর্ভাগ্য ফারুকশিয়ারের। সে নিজেই কিছুটা তার পতনের পথ বোধ করি তৈরী করে দিয়েছিল। নিজের হাতে মৃত্যু-পরোয়ানায় স্বাক্ষর দিয়েছিল। তার সবচাইতে মারাত্মক ভুল—এনায়েৎউল্লা খানকে এনে দেওয়ানের পদে প্রতিষ্ঠিত করা। দিন দ্রুত বদলে চলেছিল। ঔরঙ্গজীবের পুরাতন নীতি আজ অচল—সেটা সেও যেমন বুঝতে পারেনি বা বুঝতে চায়নি, তেমনি এনায়েৎউল্লা খানও বুঝতে পারেনি।

জিজিয়া বা মুণ্ড করের পুনঃপ্রচলন রাজস্থানের রাজন্যবর্গের রীতিমত বিরক্তির কারণ ঘটিয়েছিল। এবং তাতে করে ফারুকশিয়ার তার অন্যতম ও প্রধান শক্তি—সহায় তার শ্বশুর অজিতসিংহ—তথা মাড়বারের সমস্ত সহানুভূতিও হারিয়েছিল।

ইতিমধ্যে প্রতিপত্তিশালী হায়দ্রাবাদের প্রতিষ্ঠাতা নিজাম-উল-মুল্কও মাথা তুলে দাঁড়াচ্ছিল। সক্রিয় হয়ে উঠেছিল মুরাদাবাদের মত ছোট একটা জিলার অধিপতি সেও।

নিজাম-উল-মুল্ক প্রখর বুদ্ধিমান—মালোয়া তাকে সাহায্য করবে এবং মারাহাট্টারাও তাকে নানা ভাবে উৎসাহ দিচ্ছিল।

চারিদিকেই ফারুকশিয়ারের শত্রু। বলতে গেলে কেউ তার মিত্র নয় একমাত্র অম্বর ও বুন্দির রাজা ছাড়া। শত্রু। চারিদিকে শত্রু। তথাপি হয়ত সৈয়দ

ভ্রাতৃদ্বয় ফারুকশিয়ারকে মসনদ থেকে ঐভাবে সরাতে বদ্ধপরিকর হতো না যদি না তখনো তাদের বিরুদ্ধাচরণ করে ফারুকশিয়ার তলে তলে সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয়কে সরাবার ষড়যন্ত্রে না লিপ্ত হতো।

তাদের আর বিশ্বাস করতে পারছিল না ফারুকশিয়ার। এবং অনন্যোপায় ফারুকশিয়ার কেল্লার অভ্যন্তরেই নিজেকে সুরক্ষিত মনে করে বাইরে বের হওয়াই এক প্রকার বন্ধ করে দিয়েছিলেন তখন। এমন কি ফারুকশিয়ার সেদিন প্রমাদবশতঃ কিছুদিন আগে যে বিশ্বাসী রাজপুত সৈন্যরা তার দেহরক্ষী ছিল তাদের পর্যন্ত বরখাস্ত করেছে। কেল্লার মধ্যেও সে আজ আর নিরাপদ নয়।

রাজনীতির খেলা বড় বিচিত্র নিষ্ঠুর খেলা। এ খেলায় ভাগ্যের পরিবর্তন হতে মুহূর্তও বিলম্ব হয় না। বাদশা হয় ফকির—ফকির হয় বাদশা।

ফারুকশিয়ারের সমস্ত আশাই যে নির্মূল হতে চলেছে সেটুকু না বুঝতে পারার মত বুদ্ধির অভাব অবশ্যই তার ছিল না। তবু মানুষ প্রবল স্রোতের মুখে সামান্য কুটোটুকুকেও আশ্রয় করে বাঁচবার শেষ চেষ্টা করে, সম্রাটও বুঝি তাই করে।

চারিদিকে তার শত্রু। অম্বর ও বুন্দির রাজাদের কতটুকু ক্ষমতা—তারাও আজ মিত্র থাকলেও চারিপাশে শত্রুর সঙ্গে যে হাত মিলাবে না কে জানে। একমাত্র ভরসা দাউদ খাঁ। ফারুকশিয়ারকে কথা দিয়েছিল দাউদ খাঁ যেমন করে যে ভাবেই হোক সে সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয়কে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেবে। কিন্তু ফারুকশিয়ার জানত না একা দাউদ খাঁর কোন ক্ষমতাই নেই।

সৈয়দরা ইতিমধ্যে চিঠির পর চিঠি দিয়ে মহারাজ অজিতকে ডেকে পাঠাতে থাকে দিল্লীতে। অবশেষে একদিন নাগোর, মৈরতা, পুষ্কর, মারোট ও শম্বরের ভিতর দিয়ে অজিত তার বাহিনী নিয়ে দিল্লীতে এসে উপস্থিত হলো। এসেই পুত্র অভয়সিংহকে অজিত মাড়বারে পাঠিয়ে দিল।

আলীবাদী সরাইয়ে গভীর রাত্রে অজিতের সঙ্গে এসে সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয় দেখা করল। তাদের কাছ থেকে দিল্লীর প্রকৃত সংবাদ জানতে পেরে অজিত যেন স্তম্ভিত হয়ে গেল। একবার ভেবেছিল সে সম্রাটের সঙ্গে দেখা করবে গোপনে কিন্তু সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয় সর্বক্ষণ চোখ মেলে আছে এবং তাদের গুপ্তচরেরা চারিদিকে এমনভাবে সর্বক্ষণ ঘুরে বেড়াচ্ছে যে লালকিল্লায় তাদের অজ্ঞাতে প্রবেশের কোন পথই নেই।

তাছাড়া বুদ্ধিমান অজিত এও বুঝেছিল আজ আর তার একার ক্ষমতা নেই ফারুকশিয়ারকে রক্ষা করা। চারিদিকে তার শত্রু ও চক্রান্ত—মনে হয় বুঝি কন্যা চন্দ্রাবতীর কথাটা একবার কিন্তু পরক্ষণেই মনে হয়—তার কথা ভেবেই বা সে আজ আর কি করবে—কি করতে পারে—ভাগ্য—সবই তার দুর্ভাগ্য।

সংবাদটা সম্রাটের কানেও পৌঁছায়—তার শ্বশুর দিল্লীতে এসেছেন। ফারুকশিয়ার বিলম্ব না করে সঙ্গে সঙ্গে কোটার হার রাও ভীম ও খান্দৌরাণ খাঁকে শ্বশুরের কাছে প্রেরণ করল।

অজিত এবার আর সে ডাকে না সাড়া দিয়ে পারল না। সঙ্গে যে সব রাঠোর

বীররা ছিল তাদের নিয়ে সে গিয়ে মতিবাগে সম্রাটের সঙ্গে দেখা করল।

ফারুকশিয়ার শ্বশুরকে তার "মহী মহতীর" রাজনিদর্শনের সঙ্গে তাকে সপ্ত সহস্রের সেনাপতির পদে অভিষেক করল। আর সেই সঙ্গে অনেক হাতী—ঘোড়া—একটি তরবারী—একটি ছুরিকা, একটি হীরার শির-পেঁচ ও দুই ছড়া বহু মূল্যবান মুক্তার মালা উপঢৌকন দিল।

অজিত সেখান থেকে গিয়ে আবদুল্লা খাঁর সঙ্গে দেখা করল। যবন মন্ত্রী প্রতিজ্ঞা করল, সে প্রাণ দিয়েও সম্রাটের স্বার্থ ও জীবন রক্ষা করবে। হয় একসঙ্গে জয়ী হবো নচেৎ একই সঙ্গে মৃত্যু বরণ করব।

রাজধানীর প্রভাবশালী মুঘলরা যারা তলে তলে বিদ্রোহী হয়ে উঠেছিল তারা ঐ ব্যাপারে রীতিমত ভীত হয়ে ওঠে। এবং গোপনে অজিতকে হত্যা করবার জন্য শত্রুপক্ষ তৎপর হয়ে ওঠে।

অজিত বুঝতে পারে অতঃপর আর দিল্লীতে থাকা সমীচীন হবেনা—কারণ অজিতের ঐভাবে সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয়ের পরামর্শ না নিয়ে সম্রাটের সঙ্গে দেখা করার ব্যাপারটা মুখে কিছু না বললেও আদৌ মনে মনে সন্তুষ্ট হতে পারেনি—বরং তারা রীতিমত ক্ষুব্ধই হয়েছে। এবং একদিন তারা বলেও কথাটা—মহারাজ, সম্রাট আপনার জামাতা ঠিকই, কিন্তু জিজিয়া কর আবার তিনিই করেছেন আপনাদের উপরে নিশ্চয়ই ভুলে যাননি। অজিত চুপ করে থাকে। বাতাস গরম বুঝতে পারে। সেই রাত্রেই শিবির তুলে সমস্ত সৈন্য নিয়ে অজিত দিল্লী ত্যাগ করে।

তারপর দেখতে দেখতে আবার একটা বছর অতিবাহিত হয়ে যায়।

সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয় তাদের দল বৃদ্ধি করে চলে সম্রাটের বিরুদ্ধে—গোপনে গোপনে এবারে।

অজিতের কাছে আবার সংবাদ গেল—ফারুকশিয়ারের লোক পত্র নিয়ে এল—

এবারে অজিত ফিরে এসে দেখলো ফারুকশিয়ারের বিরুদ্ধে জনমত আরো প্রবল আকার ধারণ করেছে।

তথাপি অজিত শেষ চেষ্টা করে। সৈয়দদের সঙ্গে একত্রিত হয়ে অজিত সম্রাটের সঙ্গে গিয়ে দেখা করে তাকে নানা প্রকারের মূল্যবান উপহার দিয়ে তার আনুগত্য জানাল।

ঐ সময় অজিত দ্রুতগামী অশ্বারোহীর হাতে দাক্ষিণাত্যে হোসেন আলীকে রাজধানীতে আসবার জন্য গোপনে একটি পত্র পাঠায়। কুড়ি দিনের মধ্যে হোসেন আলী বিরাট এক সৈন্যবাহিনী নিয়ে দিল্লীতে এসে উপস্থিত হলো।

অশ্বের খুরে খুরে দিল্লীর আকাশ রক্তিম হয়ে ওঠে ধূলায়। নগরের উত্তরে হোসেন আলী তার শিবির স্থাপন করল। এবং পরের দিন গভীর রাত্রে হোসেন এসে অজিতের সঙ্গে দেখা করল।

অম্বররাজ ঐসব দেখে কেমন যেন ভীত হয়ে পড়ে।

অজিতের শিবির পড়েছিল যমুনার তীরে।

সে স্পষ্টই বুঝতে পারে ফাররুখশিয়ারের পতন অবশ্যম্ভাবী। তার বাদশাহীর দিন ফুরিয়ে এসেছে।

আর সম্রাট ফাররুখশিয়ারও বুঝতে পেরেছিল সে কথা। তবু বুঝি তার শেষ আশা ছিল তার শ্বশুর অজিতসিংহ কিন্তু ক্রমশঃ বুঝতে পারে ফাররুখশিয়ার, সেদিক থেকে তার কোন আশাই নেই।

রাজপুতানী বেগম চন্দ্রাবতীর ঘরে গিয়ে উপস্থিত হলো ফাররুখশিয়ার। বললে, একমাত্র আশা ভরসা এখন তুমিই—

অজিত-কন্যা স্বামীর মুখের দিকে তাকায়।

সম্রাট পুনরায় বলে, তুমি আমায় রক্ষা কর।

আমি কি করতে পারি প্রভু—

যমুনার তীরে তোমার পিতা শিবির স্থাপন করেছে আজ রাত্রে যেমন করে পার তার সঙ্গে তুমি গিয়ে দেখা কর।

বেশ। বলছেন যখন যাবো কিন্তু কোন ফল হবে বলে মনে হয় না।

ফল হবে না বলছো?

হ্যাঁ—আপনি কি বুঝতে পারছেন না—চারিদিকে আজ আমাদের শত্রু—

কিন্তু তোমার বাবা চেষ্টা করলে হয়ত এখনো বাঁচতে পারি আমি, সেবারও তো বাঁচিয়ে ছিলেন তিনি।

সেই রাত্রে—একটি ডুলিতে চেপে চন্দ্রাবতী গোপনে পিতার শিবিরে গিয়ে উপস্থিত হলো।

একি—তুই—

হ্যাঁ বাবা—আমি—আমি তোমার কাছেই এসেছি।

জানি তুমি কেন এসেছো—অজিত বলে, কিন্তু আমারও হাত-পা আজ বাঁধা।

ইচ্ছা করলেই আমার স্বামীকে তুমি রক্ষা করতে পার বাবা। মেয়ে বাপের পায়ের কাছে কেঁদে পড়ে।

না—তুমি ভুল করছো।

ভুল করছি!

হ্যাঁ—আজ আর সে ক্ষমতা আমার নেই—তা ছাড়া ঐ অপদার্থ ফাররুখশিয়ারকে মসনদ থেকে যত তাড়াতাড়ি টেনে নামানো যায় ততই মঙ্গল—

এ কথা তুমি বলছো বাবা!

হ্যাঁ—

বেশ। চন্দ্রাবতী উঠে দাঁড়ায়। এই তবে তোমার শেষ কথা?

হ্যাঁ—তাকে বলো—আর এর জন্য সে-ই দায়ী—

চন্দ্রাবতী অজিতের শিবির ছেড়ে চলে গেল।

অনন্যোপায় ফাররুখশিয়ার পরদিনই কেল্লার দরোয়াজা বন্ধ করে দিল। প্রবেশ

ও নির্গম কিল্লা হতে বন্ধ হলো।

হতভাগ্য ফারুকশিয়ার তখনো বুঝতে পারেনি যে নিজের জালে সে নিজে আটকা পড়েছে। নিজের সুরক্ষিত হারেমেই আজ সে নিজে বন্দী হয়ে পড়ল।

ইতিমধ্যে হুসেন আলী—আমীর উল উমরার সঙ্গে বালাজী পণ্ডিতের চুক্তি হয়ে গিয়েছে।

বুন্দির রাও রাজা কুতুব-উল-মুল্কের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে তলে তলে—এবং কুতুব-উল-মুল্কের পরামর্শ ও সাহায্যে সে গিয়ে মহারাজ অজিতসিংহের সঙ্গে মিলেছে।

যুদ্ধে হারার জীৎসিংহ নিহত কোটার ভীমসিংহের হাতে।

ফারুকশিয়ার ভেবেছিল দুর্ভেদ্য কিল্লার মধ্যে হারেমে সে বুঝি সম্পূর্ণ নিরাপদ কিন্তু তার সে ভুল ভাঙতে দেরি হলো না। দিনের পর যেমন রাতের অন্ধকার চারিদিক গ্রাস করে ঠিক তেমনি ফারুকশিয়ারের চারপাশে অন্ধকার—দুর্ভাগ্যের অন্তিম অন্ধকার পায়ে পায়ে এগিয়ে আসে তাকে গ্রাস করতে। তার জীবনের শেষ রাত্রি এগিয়ে আসে।

আমীর উল উমরা দশ হাজার মারহাট্টা সৈন্যদের নিয়ে কিল্লার দরজার দিকে এগিয়ে যায়।

কিল্লার বাইরে নগরে—অজিতসিংহ ও উজির নিস্পন্দ হয়ে থাকে।

আমীর উল উমরা মারহাট্টাদের নিয়ে দুর্গে প্রবেশ করেছে।

তারপর—তারপর আর কেউ জানে না। সেই অভিশপ্ত রাত্রিতে কিল্লার মধ্যে কি ঘটে গেল।

লাল রক্তের স্রোত কেমন করে হারেমের নলী-পথ বেয়ে যমুনার জলে গিয়ে পড়ে মিশে গেল একসময়।

কালো জলে লাল রক্ত মিশে গেল।

সে অভিশপ্ত রাত্রিও একসময় প্রভাত হলো। নবারুণালোকে পূবের আকাশ রক্তিম বর্ণ ধারণ করল। সহসা ঐ সময় কিল্লার প্রাকারে নহবৎ বেজে উঠলো। আর সেই সঙ্গে সঙ্গে ঘোষিত হলো দিল্লীর সম্রাট রফিউদ্দৌলা দিজ্জৎ।

ফারুকশিয়ারের বাদশাহী শেষ হয়েছে।

॥ ৯ ॥

নতুন সম্রাটের প্রথম ঘোষণা—জিজিয়া কর রহিত হলো। দেওয়ান হলো আবার সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয়। এনায়েৎউল্লার জায়গায় নতুন মন্ত্রিসভায় এলো রতনচাঁদ।

কিন্তু দিল্লীর প্রভাবশালী মুঘলরা ঐ ব্যবস্থায় সন্তুষ্ট হতে পারল না। নিকুশাহ নামক অন্য এক ব্যক্তিকে তারা আগ্রায় সম্রাট বলে ঘোষণা করল।

অজিত ও সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয় আজ পরস্পর পরস্পরের বন্ধু। তারা সংবাদটা পেয়ে এতটুকু আর কালবিলম্ব না করে বিরাট এক সৈন্যবাহিনী নিয়ে আগ্রার দিকে অগ্রসর হলো।

মুঘলরা দেখলো বেগতিক। ঐ বিরাট বাহিনীকে প্রতিরোধ করা তাদের সাধ্যের অতীত। তারা তাড়াতাড়ি নিকুশাহকে অজিত ও সৈয়দদের হাতে তুলে দিল। শেলিমগড়ের কারাগারে নিকুশাহকে বন্দী করে রাখা হলো।

তারপর তিন মাসও গেল না—সম্রাট রফিউদ্দৌলার মৃত্যু হলো।

কে এবারে মসনদে বসবে। মুঘলের অভিশপ্ত মসনদ।

বাহাদুর শা'র জ্যেষ্ঠ পুত্র রোশন আক্তারকে মহম্মদ শা নাম দিয়ে দিল্লীর সম্রাট বলে ঘোষণা করা হলো। যা কিছু করার সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয় ও অজিতই করল। তাদেরই হাতে তখন সমগ্র শক্তি।

এদিকে ফারুকশিয়ারের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই অম্বররাজ জয়সিংহের সমস্ত আশা ভরসা নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল। অম্বরের পথে চলছিল জয়সিংহ, কিন্তু পথে অসুস্থ হয়ে পড়ে শিকড়ির দুর্গে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়।

কিন্তু অম্বররাজ জয়সিংহ বুঝতে পেরেছিল সৈয়দদের আক্রোশ থেকে সে সহজে নিষ্কৃতি পাবে না। অনন্যোপায় জয়সিংহ অজিতের শরণাপন্ন হলো।

অম্বররাজকে অজিত আশ্বাস দিল। সৈয়দরা সরে দাঁড়াল।

বুন্দির হাররাজ বুধসিংহও অজিতের শরণাপন্ন হলো কারণ তার উপরও সৈয়দদের আক্রোশ ছিল—যেহেতু একসময় বুন্দিরাজ ফারুকশিয়ারকে সাহায্য করেছিল।

দীর্ঘদিন অজিত দেশছাড়া। অম্বররাজ জয়সিংহ ও বুন্দির হাররাজ বুধসিংহকে নিয়ে অজিত যোধপুরের দিকে অগ্রসর হলো।

পথে মনোহরপুর পড়ে। ছোট একটি সামন্ত রাজ্য। শিখাবৎ সর্দার সেখানে রাজত্ব করছিল। পরম সমাদরে অজিত, জয়সিংহ ও বুধসিংহকে অভ্যর্থনা জানাল সামন্ত রাজা।

আসলে কিন্তু অজিতের মনোহরপুরে বিশ্রাম নেবার মধ্যে একটা গোপন অভিসন্ধি ছিল। লোকপরম্পরায় অজিত শিখাবৎ সর্দারের একমাত্র কন্যা চম্পাবতীর রূপলাবণ্যের খ্যাতি শুনেছিল।

ক্ষুদ্র সামন্তরাজের অপূর্ব সুন্দরী একটি কন্যা আছে।

শিখাবৎ সর্দার নানা উপঢৌকন দিল অজিতকে।

কিন্তু অজিত বলে, সামন্তরাজ—এ সবে আমার প্রয়োজন নেই—

শিখাবৎ সর্দার জবাব দেয়, রাজাধিরাজ আপনার যোগ্য সমাদর করব সে সামর্থ্য আমার কোথায়?

কিন্তু সামন্তরাজ আমি যে শুনেছি—

কি শুনেছেন মহারাজ!

বহু মূল্যবান এক রত্ন আপনার গৃহে আছে—

বহু মূল্যবান রত্ন!

হ্যাঁ।

আমি তো বুঝতে পারছি না মহারাজ। কি রত্ন আমার মত গরীবের গৃহে

আছে—তবে আপনাকে অদেয় আমার কিছুই নেই।
অজিত মৃদু হাসে।
মহারাজ—
বলবো, কাল বলবো আজ নয়, সামন্তরাজ।
সে রাত্রে চিন্তায় চিন্তায় সামন্তরাজের ঘুম হয় না।
অজিতসিংহ কি বললে? মহামূল্যবান রত্ন আছে তার গৃহে! কি সে রত্ন? শয়নকক্ষে পায়চারি করছিলেন সামন্তরাজ শিখাবৎ সর্দার।
রাত্রির মধ্যযাম।
বাপুজী—
কে?
ফিরে তাকালেন শিখাবৎ সর্দার।
কন্যা চম্পাবতী।
মাতৃহারা একমাত্র সন্তান চম্পাবতী।
সত্যিই রূপের যেন অবধি নেই চম্পাবতীর।
কি হয়েছে মা, এখনো ঘুমোওনি?
না বাপুজী—
চম্পাবতী যেন ইতঃস্তত করে, কিছু বুঝি সে বলতে চায়।
কিছু বলবে মা?
বাপুজী—মহারাজার সঙ্গে তোমার যে সব কথা হয়েছে—সবই আমার কানে এসেছে—
কিন্তু মা—আমি তো বুঝতে পারছি না কি রত্নর ইঙ্গিত তিনি দিলেন—যা আমার ক্ষুদ্র ভাণ্ডারে আছে—
যোধপুররাজকে এখনো তুমি চিনতে পারলে না বাপুজী।
চম্পা—
সে ইঙ্গিত করেছে আমার প্রতি—
না, না—
হ্যাঁ, বাপুজী।
কিন্তু সে অসম্ভব—তার তিন-তিনজন মহিষী আছে—তাছাড়া বয়েসে সে আজ প্রৌঢ়—
তবু তার দৃষ্টি যখন আমার উপর পড়েছে—
না মা, সে হবে না—
মাড়বার রাজার বিরুদ্ধে দাঁড়াবার মত শক্তি কোথায় তোমার বাপুজী. মুহূর্তে যে তোমার ক্ষুদ্র সামন্ত রাজ্য নিশ্চিহ্ন করে দেবে, রক্তের স্রোত বইয়ে দেবে।
কিন্তু মা—
তুমি সম্মত হয়ে যাও বাপুজী।
চম্পা—
তাছাড়া আর পথ নেই কোনো।

এ যে আমি কিছুতেই ভাবতে পারছি না মা—

পৃথিবীতে অনেক কিছুই তো আমাদের চিন্তার—ধারণার বাইরে বাপুজী—এবং অনেক সময় ক্ষেত্রবিশেষে অসম্ভবকেও মেনে নিতে হয়।

মা—

আমার জন্য তুমি কোন চিন্তা করো না বাপুজী।

শেষ পর্যন্ত ঐ প্রৌঢ়কে বিয়ে করবি তুই মা।

নচেৎ আমাকে সে লুণ্ঠন করে তোমার রাজ্যে আগুন জ্বালিতে দিয়ে চলে যাবে বাপুজী।

শিখাবৎ সর্দার দেখলেন, তার কন্যার অনুমান এতটুকু মিথ্যা নয়—

সত্যি সত্যিই পরের দিন অজিত খোলাখুলি ভাবেই চম্পাবতীর কথা বললে।

শিখাবৎ সর্দার বললেন, এ তো খুব আনন্দের কথা মহারাজ—আপনি আমার কন্যাকে গ্রহণ করুন—তাহলে আমি ব্যবস্থা করি?

অম্বররাজ ও বুন্দিরাজ সমস্বরে বললে, হ্যাঁ—হ্যাঁ—শুভস্য শীঘ্রম।

দিন কয়েক বাদে রাজ্যে বিবাহের উৎসব শুরু হয়ে গেল।

আলো জ্বললো, আতসবাজী পুড়ল।

শিখাবৎ সর্দারের কন্যার পাণিগ্রহণ করলো অজিত। তারপরে কয়েকদিন শিখাবৎ সর্দারের গৃহে আতিথেয়তা গ্রহণ করে নবপরিণীতা বধূকে নিয়ে যোধপুরের দিকে রওনা হলো অজিতসিংহ।

সপ্তম পর্ব ঃ উপসংহার

॥ ১ ॥

শীতের শেষ। বসন্ত সমাগমে চারিদিকে গাছে গাছে নতুন পাতার উৎসব। দিকে দিকে নানাবর্ণের ফুলের সমারোহ। রং-বেরংয়ের প্রজাপতি ফুলে ফুলে উড়ে বেড়ায়। ময়ূর-ময়ূরীর কেকারব—কোকিলের কুহুরব।

দীর্ঘ প্রবাসের পর মহারাজ অজিত যোধপুরে ফিরে এল। সঙ্গে তার অম্বররাজ জয়সিংহ, বুন্দির হাররাজ বুধসিংহ ও নবপরিণীতা বধূ—ষোড়শী পত্নী—শিখাবৎসর্দার দুহিতা চম্পাবতী।

জয়সিংহ তার অতিথি। দুর্গপ্রাসাদের এক কক্ষে জয়সিংহের থাকবার ব্যবস্থা হয়েছে।

বহুকাল পরে সেদিন দ্বিপ্রহরে প্রধানা মহিষী উদয়পুর-নন্দিনী হীরাবাঈয়ের কক্ষে স্বামী স্ত্রীতে সাক্ষাৎ হলো। রত্নাবতীকে বিবাহ করে আনবার পর হীরাবাঈ কতকটা ইচ্ছা করেই যেন অজিতের কাছ থেকে দূরে সরে গিয়েছিল। স্বামীর কোন অভিলাষে হীরাবাঈ কখনো বাধা দেয়নি। কিন্তু বাধা না দিলেও স্বামীর ঐ নারীপ্রীতি মনে মনে সে কোনদিনই সহজ মনে গ্রহণ করতে পারেনি।

ইদানীং কিছুকাল ধরে হীরাবাঈ দাইমা রম্ভাকে এনে তারই মহালে স্থান দিয়েছিল। সংঘমিত্রার নিরুদ্দেশের পর থেকে রম্ভা যেন কেমন হয়ে গিয়েছিল। দেহ ও মনে কেমন যেন তার একটা অকাল বার্ধক্যের ছাপ পড়ে গিয়েছিল।

রম্ভার দেহের বাঁধুনি ছিল অপূর্ব। বয়েস হলেও যেন বয়েস হয়েছে বলে মনে হতো না। কিন্তু ইদানীং কিছুকাল ধরে সে বাঁধুনী যেন শিথিল হয়ে গিয়েছিল।

অজিতও ইদানীং বড় একটা হীরাবাঈয়ের কক্ষে আসত না। হীরাবাঈকে সে যেন এড়িয়েই চলত।

আজ দ্বিপ্রহরে হঠাৎ মহারাজ অজিত এসে প্রধানা মহিষীর কক্ষে প্রবেশ করল।

হীরাবাঈ মৃদু হেসে স্বামীকে সাদর সম্ভাষণ জানায়। মহারাজ কি পথ ভুলে—

অজিত বলে, না—পথ চিনেই এসেছি পট্টমহাদেবী।

বুঝলাম—শরবত আনি—

না, না—এখন শরবতের কোন প্রয়োজন নেই—তারপর একটু থেমে বলে, নতুন মহিষীকে তুমি আশীর্বাদ করনি—

করেছি বৈকি।

দেখেছো তাকে?

দেখেছি।

মনে হচ্ছে তুমি যেন খুব খুশি হতে পারনি।

সেকি মহারাজ, খুশি হবো না কেন! খুব খুশি হয়েছি।

সত্যি বলছো?

সত্যি বৈকি।

যাক শোন—সূর্যকুমারীর জন্য আমি একটি পাত্র স্থির করেছি।

সেকি মহারাজ, সে তো এখনো বালিকা।

বালিকা হবে কেন, ত্রয়োদশবর্ষ অতিক্রম করে চতুর্দশে পা ফেলেছে।

তবু সে এখনো পুতুল নিয়ে খেলা করে।

ঐ খেলাঘরের খেলা সাঙ্গ করে এবারে স্বামীগৃহে যাবে।

কিন্তু মহারাজ—

শোন অম্বররাজ জয়সিংহের সঙ্গে সূর্যকুমারীর বিবাহ আমি স্থির করেছি।

অম্বররাজ জয়সিংহ—তার তো খুব কম বয়েস হবে না—অভয়সিংহের চাইতেও বয়েসে সাত-আট বছরের বড়—

তা হবে হয়ত—কিন্তু পুরুষের আবার বয়স কি—শোন, তুমি ব্যবস্থা কর—এই ফাল্গুনেই বিবাহ।

হীরাবাঈ আর কোন কথা বলে না।

চুপ করে থাকে।

অজিত আর দাঁড়ায় না—আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়।

এবং চম্পাবতীর ঘরের দিকে অগ্রসর হয়।

হীরাবাঈ একাকিনী ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকে। এবং কতক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিল নিজেও জানে না।

সহসা রম্ভার কণ্ঠস্বরে তার চমক ভাঙে।

পট্টমহাদেবী—

কে—ও দাইমা—

অজিত হঠাৎ কেন এসেছিল তোমার ঘরে?

সূর্যকুমারীর বিবাহের কথা বলতে এসেছিল।

সূর্য—সে তো এখনো বালিকা মাত্র—কিন্তু পাত্রটি কে?

অম্বররাজ জয়সিংহ—

সেকি—তার তো অনেক বয়েস—মানাবে কেন!

কিন্তু মহারাজ বললেন—

কি?

পুরুষের কোন বয়স নেই।

কিন্তু কুম্পাবৎ—চন্দ্রাবৎ সর্দাররা নিশ্চয়ই এ বিবাহ মেনে নেবে না।

মহারাজ কি সে কথা চিন্তা করেননি—সে ব্যবস্থাও নিশ্চয়ই করবেন।

তুমি বাধা দেবে না?

না।

দেবে না?

না।

মা হয়ে—

কিন্তু দাই মা, বাপ হয়ে যদি তিনি তাঁর নিজের কন্যার সর্বনাশ করতে পারেন আমি কি করতে পারি—চন্দ্রাবতীকে যবন সম্রাটের সঙ্গে বিবাহ দিলেন প্রথম—

কিন্তু আমি বাধা দেবো।

না দাই মা—প্রয়োজন নেই তার—হতভাগিনী সূর্যের যদি তার দিদির মতই দুর্ভাগ্য কপালে লেখা থাকে আমরা কি করতে পারি।

ফাল্গুনেই বিবাহ হয়ে গেল।

কুম্পাবৎ—চম্পাবৎ সর্দারদের পরামর্শ তো নেওয়াই হয়েছিল—এমন কি বিদ্দাবী দেওয়ান ও কুলগুরুর সম্মতি নেওয়া হয়েছিল।

বিবাহের পরও অম্বররাজ যোধপুরেই থেকে গেল। এবং বুন্দির হাররাজ বুধসিংও বুন্দিতে ফিরে যেতে সাহস পায়নি—সেও অজিতের আশ্রয়েই থেকে গেল আরো কিছুদিনের জন্য, কারণ সৈয়দদের সেও বিশ্বাস করতে পারেনি—

অজিতের আশ্রয়ে থাকলে তবু কতকটা নিরাপদ।

দেখতে দেখতে একটা বৎসর অতিবাহিত হয়ে যায়। বর্ষাকাল উপস্থিত। আরাবল্লীর শীর্ষে শীর্ষে মেঘের আনাগোনা।

এমন সময় দিল্লী থেকে সংবাদ এল পরাক্রমশালী সৈয়দভ্রাতৃদ্বয় আজ চারিদিকে শত্রু দ্বারা বেষ্টিত।

ইতিমধ্যে এক বৎসরে অনেক কিছুই ঘটে গিয়েছিল—মারহাট্টা ও আফগানরা মাথা তুলে দাঁড়িয়েছিল।

সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয়ের ব্যবহারে সবাই মনে মনে বিরক্ত। তাদের অত্যাচারে সবারই মনে একটু একটু করে অসন্তোষের মেঘ জমে উঠেছিল।

ঐ সুযোগে মালোয়ার সঙ্গে একটা সন্ধি করে নিজাম নিজেকে স্বাধীন বলে ঘোষণা করে এবং আসার ও বুরহানপুরের দুর্গ দখল করে নিয়েছিল।

মহম্মদ শা নিরুপায়, রাজস্থানের সাহায্য ভিক্ষা করে।

মেওয়ারের রাণার প্রধান মন্ত্রী বেহারী দাশ নাগোরের রাজা ভক্তসিংহের কাছ থেকে একটি পত্র পায়—

কোটা ও নিরয়ার—তারা এগিয়ে আসে নিজামকে বাধা দিতে—নারবদা থেকে বিচ্ছিন্ন করতে, কিন্তু নিজামের সৈন্যদের হাতে কোটার যুবরাজের মৃত্যু হলো।

নিজামের সঙ্গে সঙ্গে অযোধ্যাও স্বাধীনতা ঘোষণা করে বসল।

বিয়ানার শাসনভার তখন সাদৎখানের হাতে—সেও সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয়ের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয় তলে তলে। চারিদিকে বিদ্রোহ আর বিদ্রোহের সংবাদ—বিশৃংখলতা—

সম্রাট কি করবে বুঝে পায় না।

দেখতে দেখতে দু'দিনে যুদ্ধ বেধে উঠলো—রুত্তনচাঁদ সে যুদ্ধে প্রথম বলি। উজির বন্দী হলো।

সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয়কে সমূলে বিনাশ করার জন্য যে ষড়যন্ত্র করেছিল সাদৎখান—রুত্তনচাঁদ নিহত হওয়ার বাহাদুর জং উপাধিতে ভূষিত করে সাদৎখানকেই অযোধ্যার শাসনকর্তা করা হলো।

সম্রাট আরো দুজনকে পুরস্কৃত করে। জয়সিংহকে আগ্রার ও অজিতকে গুজরাট ও আজমীঢ়ের শাসনকর্তা নিযুক্ত করে।

ক্ষমতার ঐ যুদ্ধে মেওয়ার কিছুকাল নির্দিষ্ট একটা ব্যবধানে নিজেকে নিষ্ক্রিয় রাখে। শেষ পর্যন্ত সংবাদ এল সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয় নিহত। মুঘলরা ঐ দুই ভাইকে হত্যা করেছে। এবং ঐ সঙ্গে এও সংবাদ এল মুঘলরা যোধপুরাধিপতি অজিতসিংহের প্রতি আদৌ সন্তুষ্ট নয়—তারা অজিতকেও হত্যা করার পরিকল্পনা নিয়েছে।

অজিত ঐ সংবাদ পেয়ে নিষ্ক্রিয় হয়ে বসে থাকে না। অম্বররাজকে বিদায় দিয়ে অজিত বিরাট এক সৈন্যবাহিনী নিয়ে আজমীঢ়ের দিকে এগিয়ে যায়।

সেখানকার যবনেরা অজিতের সঙ্গে যুদ্ধ করল না। আত্মসমর্পণ করল। অজিত আজমীঢ় জয় করে নিল।

অজিতের একাদশে বৃহস্পতির যোগ চলেছে তখন। তারপর তারাগড়, শম্বর ও দিদবানের লবণহ্রদগুলো জয় করে অজিত যোধপুরে ফিরে এল সগৌরবে।

দিল্লীর ক্ষমতা আজ স্তিমিত। সেখানে সর্বক্ষণ ক্ষমতালোভীদের মধ্যে গোপন হিংসার চক্রান্ত চলেছে। মুঘল শক্তির অন্তিম দিন ক্রমশঃ ঘনিয়ে আসছে।

অবিশ্যি ঔরংজীবের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই মুঘল শক্তির শেষের ক্ষণ ঘনিয়ে এসেছিল। তার—স্বৈরাচার—রাজনীতির ব্যাপারে অদূরদর্শিতা—দেশের প্রধান শক্তি রাজপুতদের প্রতি অবিশ্বাস ও অসম্মান মুঘল সাম্রাজ্যের মূলে বহু পূর্বেই ঘুণ ধরিয়েছিল। এ তারই পরিণতি।

অজিতসিংহ মহাড়ম্বরে সিংহাসনে বসল। মাথার ওপরে সুবর্ণ রাজছত্র। স্বনামে মুদ্রার প্রচলন করল—গজ ও সেরের প্রচলন হলো এবং রাজ্যের সর্বত্র ধর্মাধিকরণ প্রতিষ্ঠা করে রাজ্যে সুশাসনের ব্যবস্থা করল।

সর্দারদের নতুন নতুন পদ দেওয়া হলো।

সম্রাট কিন্তু দিল্লীতে চুপ করে বসে থাকে না। আজমীঢ় আবার পুনরুদ্ধার করতেই হবে—মজফর খাঁকে সেনাপতি করে বিবাট এক বাহিনী প্রেরিত হলো আজমীঢ়ের দিকে।

অজিত এবারে আর নিজে যুদ্ধ করবে না মনস্থ করে। পুত্র অভয়সিংহ আজ যুবক—নতুন প্রাণ—নতুন শক্তি। তারই ওপরে অজিত অর্পণ করবে স্থির করে সৈন্য পরিচালনার ভার।

অভয়—

বলুন, পিতা—

এ যুদ্ধে তুমিই হবে সেনাপতি।
যেমন আপনি নির্দেশ করবেন তাই হবে।

বিরাট এক রাঠোর বাহিনী সজ্জিত হলো। প্রধান আটজন সামন্ত সর্দার বেছে বেছে ও তিন সহস্র অশ্বারোহী সৈন্য নিয়ে গঠিত হলো বিরাট এক সৈন্যবাহিনী সর্বাধিনায়ক যুবরাজ অভয়সিংহ।

দক্ষিণে চম্পাবৎ—বামে কুম্পাবৎ এবং মধ্যে করমসই মৈরতীয় যোধ, ঈন্দা ভাট্টি—শনি গুরু—দেবর, খীচি ও মরুভূমির দুটি প্রাচীন স্বাধীন রাজপুত কুল গোগাবৎ সম্প্রদায়। বিশাল ঐ সৈন্যবাহিনী রাঠোরের পতাকাতলে—কুমার অভয়সিংহের নেতৃত্বে যুদ্ধার্থে অগ্রসর হলো।

সম্রাট মহম্মদ শাহের সৈন্যবাহিনী ঐ বিশাল রাজপুত বাহিনীর সামনে দাঁড়াবার সাহস পেল না—তারা রণক্ষেত্র ছেড়ে পালাল। অভয়সিংহ তখন তার বিরাট বাহিনী নিয়ে শাজাহানপুর আক্রমণ করল। নার্নোল লুঠ করল এবং এগুতে এগুতে চারিদিককার গ্রাম ও পল্লীগুলো পুড়িয়ে ছারখার করে এসে উপস্থিত হলো আলীবাদী সরাইয়ে। দিল্লী ও আগ্রা ভয়ে কাঁপতে লাগল।

অজিতের নির্দেশ এল আর না এগিয়ে ফিরে এসো। ফিরবার এত শীঘ্র ইচ্ছা ছিল না অভয়সিংহের কিন্তু পিতার আদেশ—বিরাট সৈন্যবাহিনী নিয়ে অভয় ফিরে দাঁড়াল। ফিরবার পথে কুমার লুধান নগরে নরুকাশ সর্দারের কন্যা —লক্ষ্মণাবতীকে বিবাহ করে সঙ্গে নিয়ে এল অম্বরে। অম্বর দুর্গে পিতা ও পুত্রের দেখা হলো।

সম্রাট দিল্লী থেকে নাহুর খাঁকে চার সহস্র সৈন্যসহ পাঠিয়ে দিল সন্ধি করবার জন্য।

কিন্তু সন্ধি হলো না।

নাহুর খাঁর উদ্ধত আচরণে বিরক্ত হয়ে অজিত নাহুর খাঁ ও তার সৈনাদের বন্দী করে একে একে হত্যা করল।

ঐ সময় জাঠ—চোরমানের ছেলে এসে মহারাজ অজিতের শরণাপন্ন হয়।

হিন্দু ও যবনের মধ্যে মনোমালিন্য ও শত্রুতা দিন দিন বৃদ্ধি পেতে থাকে অতঃপর।

মহম্মদ শাহ শেষ বারের মত অজিত ও তার সৈন্যবাহিনীকে ধ্বংস করবার জন্য বিরাট এক সৈন্যবাহিনী প্রস্তুত করে। সম্রাটের অধীনে ম্বাবিংশ সেনা নানা দেশ হতে এসে তার সঙ্গে মিলিত হয় ঐ সময়।

অম্বররাজ জয়সিংহ, হাইদার কুলি, ইরাদৎ খাঁ বাঙ্গাশ প্রভৃতিকে সম্রাট তার সেনাদলের অধিনায়কত্বে বরণ করল।

শ্রাবণ মাসে এক বর্ষা-মেদুর অপরাহ্ণে তারাগড় অবরোধ করল সম্রাটের বিরাট বাহিনী।

॥ ২ ॥

অজিত এবার সত্যিই বিব্রত বোধ করে। চারিদিকে পাহাড় ও তার মধ্যস্থলে তারাগড়—বাইরে বেরুবার কোন উপায় নেই। ক্রমশঃ দুর্গ মধ্যে খাদ্যাভাব ও জলাভাব দেখা দেয়। কেউ দুর্গ থেকে বেরুবার কোন পথের সন্ধান দিতে পারছে না।

রাত্রি গভীর। ভাদ্র মাসের অসহ্য গুমোট গ্রীষ্ম। দুর্গের একটি কক্ষে অজিত একাকী পায়চারি করছিল। গবাক্ষ-পথে পূবের পর্বত-সানুদেশে আবছায়া দেখা যায় সম্রাটের বিশাল বাহিনীর সারি সারি শিবির।

শিবিরের মধ্যে মধ্যে আলো জ্বলছে। আজ আপন জনেরাই অজিতের সর্বাপেক্ষা বড় শত্রু।

একদিন যে অম্বররাজকে সে সৈয়দদের প্রচন্ড আক্রোশ থেকে বাঁচিয়েছিল—শুধু তাই নয় যার হাতে কন্যা সূর্যকুমারীকে সম্প্রদান করেছিল, আজ সেই জামাতা জয়সিংহই তার সর্বাপেক্ষা বড় শত্রু। উঃ, যদি অজিত ঐ শয়তান অকৃতজ্ঞটাকে একবার সামনে পেত—তরবারির এক ঘায়ে ওর মাথাটা দেহচ্যুত করত।

মহারাজ—

কে ?—

একজন দুর্গরক্ষী সামনে এসে অভিবাদন জানায়।

কে তুমি ?

আমি একজন দুর্গরক্ষী মহারাজ—বুধসিংহ—

কি চাই ?

দুর্গ মধ্যে একজন নারী গুপ্তচর ধরা পড়েছে মহারাজ।

কোথায় সে—নিয়ে এসো—

অনতিবিলম্বে দুর্গরক্ষী গেরুয়া-বসন-ধারিণী এক নারীমূর্তিকে অজিতের সামনে এনে দাঁড় করাল। নারীমূর্তির মুখে দীর্ঘ অবগুণ্ঠন।

কে তুমি, গুণ্ঠন তোল।

নারীমূর্তি শান্ত চাপা কণ্ঠে জবাব দেয়, একমাত্র আমার ইষ্টদেবী ছাড়া কারোর সামনেই আমি গুণ্ঠন মোচন করি না মহারাজ—ক্ষমা করবেন।

কি নাম তোমার ?

আমি সন্ন্যাসিনী—সন্ন্যাসিনীর কোন নাম থাকে কি—আমাকে সবাই যোগিনী মা বলে।

কোথা থেকে আসছো ?

সন্ন্যাসিনীর যোগিনীর তো কোন নির্দিষ্ট বাসস্থান থাকে না মহারাজ।

কণ্ঠস্বরটা ঐ নারীর কেমন যেন চেনা চেনা মনে হয় অজিতের। কবে কোথায় যেন ঐ কণ্ঠস্বর সে শুনেছে। ঐ কণ্ঠস্বর যেন তার পরিচিত। নিজের অজ্ঞাতেই বুঝি দু পা এগিয়ে আসে সন্ন্যাসিনীর সামনে অজিত।

কে—কে তুমি—সত্য বল—

মহারাজ, বলছি তো সন্ন্যাসিনী আমি—শুনুন মহারাজ আমার সময় অল্প—আমি আপনাকে একটি গুপ্ত-কথা জানাতে এসেছি।

গুপ্ত-কথা!

হ্যাঁ—এই দুর্গ থেকে বের হয়ে যাবার একটি গুপ্ত পথ আছে—

ঠিক বলছো?

প্রমাণ না করতে পারলে মহারাজ আমায় হত্যা করবেন—আমার মাথা আমি জামিন রাখছি।

অজিত তখনো স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে আছে সন্ন্যাসিনীর দিকে। গেরুয়া গুণ্ঠনের তলায় কে ঐ নারী? সত্যিই কি কোন সন্ন্যাসিনী—না—কোন ছদ্মবেশধারিণী সম্রাটের গুপ্তচরী। আবার মনে হয় পরক্ষণেই—কেন ওর কণ্ঠস্বর পরিচিত মনে হয়। দাঁড়াবার ভঙ্গিটি পর্যন্ত। চকিতে যেন একটা অতীত স্মৃতি অজিতের মনের মধ্যে বিদ্যুতের চমক দিয়ে যায়।

একখানি মুখ—যে মুখ আজো তার মনের পাতা থেকে মুছে যায়নি। আগুনের মত যে স্মৃতি আজো তার বুকের মধ্যে জ্বলছে। লোক পরম্পরায় শুনেছিল অজিত বাল্যসঙ্গিনী সংযুক্তা মরেনি—সে সন্ন্যাসিনী আজ।

ঐ নারী সংযুক্তা নয় তো?

সংযুক্তা—

কি ভাবছেন মহারাজ?

ভাবছি তুমি আমায় ঠকাতে পারনি—আমার কাছে তুমি ধরা পড়ে গিয়েছো।

আমি গুপ্তচরী নই মহারাজ।

তুমি সংযুক্তা।

হেসে ওঠে সঙ্গে সঙ্গে সন্ন্যাসিনী।

আমি বলপ্রয়োগে তোমার মুখের ওপর থেকে ঐ গুণ্ঠন মোচন করব—তোমাকে আমি দেখব।

মহারাজ, সন্ন্যাসিনীকে স্পর্শ করা, তাকে ধর্মচ্যুতা করা—ভ্রষ্ট করা চরম পাপ। দেশের রাজার কাছে কি এক দীনা সন্ন্যাসিনী ঐটুকু মর্যাদাও আশা করতে পারে না?

বেশ। তোমাকে আমি স্পর্শ করবো না। কেবল একবার নিজহাতে তুমি তোমার গুণ্ঠন মোচন কর—কিংবা মোচন করো না, কেবল বল তুমি সংযুক্তা কিনা—

আমি সংযুক্তা নই মহারাজ, আমি সামান্যা সন্ন্যাসিনী—

না—সন্ন্যাসিনী তুমি নও। তুমিই আমার হারানো সংযুক্তা—দু হাত বাড়িয়ে দেয় অজিত সংযুক্তাকে বুকে নেবার জন্য। অজিত বুঝি তখন পাগল হয়ে উঠেছে।

চকিতে সন্ন্যাসিনী সরে দাঁড়ায়, মহারাজ আমি সন্ন্যাসিনী—আপনি যদি আমায় স্পর্শ করেন তো—

সংযুক্তা—

আপনি আমায় স্পর্শ করলে আগুনে আত্মাহুতি দেওয়া ছাড়া আর আমার অন্য কোন দ্বিতীয় পথ থাকবে না।

কি জানি কি হলো। থমকে দাঁড়াল অজিত এবারে। প্রসারিত দুবাহু তার গুটিয়ে এল।

শুনুন মহারাজ—যে জন্য এসেছি সেই কথা বলি—এ দুর্গের দক্ষিণ দিকে যে শেষ কক্ষটি আছে—তারই পূর্ব কোণে কক্ষের মেঝেতে ত্রিকোণ একটি লাল রংয়ের পাথর বসানো আছে—সেটি সরালেই দেখতে পাবেন—ঐ পাথরে ঢাকা একটি গোপন সুড়ঙ্গ পথ আছে। সেই গুপ্ত সুড়ঙ্গ পথ দিয়ে আপনি তারাগড়ের সীমানা পার হয়ে যেতে পারবেন। কালবিলম্ব করবেন না—আজই চলে যান দুর্গ ছেড়ে নচেৎ—

নচেৎ।

মহম্মদ শার এই অবরোধই হবে আপনাদের সকলের মৃত্যুর কারণ।

অজিত ক্ষণকাল যেন কি ভাবে—তারপর বলে, ঠিক আছে—পরীক্ষা করে আমি এখুনি দেখছি—সত্য না মিথ্যা কথাটা—

মিথ্যা আমি বলিনি মহারাজ।

অজিত সে কথার কোন জবাব না দিয়ে দ্বাররক্ষীকে ডেকে প্রধান দেহরক্ষী চেৎসিংকে ডেকে পাঠাল—

একটু পরে চেৎসিং এসে ঘরে প্রবেশ করল, আমাকে ডেকেছেন প্রভু?

দুর্গের দক্ষিণ দিকে যে শেষ কক্ষটি, সে কক্ষে কে থাকে?

কেউ তো থাকে না মহারাজ সে কক্ষে—সেটা দুর্গের অস্ত্রাগার।

ঠিক আছে—সেই কক্ষে যাও—সেই কক্ষের মধ্যে পূর্ব দিকে মেঝেতে ত্রিকোণ একটি লাল রংয়ের পাথর দেখবে—সেই পাথর সরিয়ে দেখে এসে এক্ষুনি আমাকে সংবাদ দাও—

চেৎসিং চলে গেল।

আমাকে এবারে যাবার অনুমতি দিন মহারাজ।

সন্ন্যাসিনী বলে।

না। তুমি আমার এখানেই থাকবে।

এখানে—

হ্যাঁ—মানে যদি সত্যিই তোমার কথা সত্য হয়—এই দুর্গ থেকে বের হয়ে যাবার কোন উপায় থাকে—আজ এই রাত্রেই আমরা বের হবে যাবো এবং তুমি আমাদের সঙ্গে যাবে—

আপনাদের সঙ্গে কোথায় যাবো।

কেন, আমাদের সঙ্গে যোধপুরে—

যোধপুরের প্রাসাদদুর্গে।

হ্যাঁ—

সন্ন্যাসিনী; যোগিনী কি কখনো প্রাসাদে থাকে মহারাজ—তারা যে গৃহত্যাগ করেছে—

চেৎসিং ফিরে এল ঐ সময়।
সে যেন রীতিমত উত্তেজিত।
মহারাজ—
কি সংবাদ চেৎসিং?
আছে, মহারাজ আছে—
কি আছে?
গুপ্ত সুড়ঙ্গ পথ আছে!
সত্যি বলছো?
হ্যাঁ—
যাও, অবিলম্বে তুমি সেনাপতি অমরসিংহকে এখানে পাঠিয়ে দাও।
চেৎসিং চলে গেল।
মহারাজ—
সন্ন্যাসিনী আবার কথা বলে। আমাকে এবার তাহলে যেতে অনুমতি দিন।
না—বলেছি তো তুমি আমাদের সঙ্গে সঙ্গেই যাবে।
সে কখনো সম্ভব নয় মহারাজ—তাছাড়া শুনুন৹ তাতে করে আপনার আদৌ মঙ্গল হবে না—
অজিত হেসে ওঠে, আমার মঙ্গলের কথা তোমার না ভাবলেও চলবে সন্ন্যাসিনী।
মহারাজ—
বললাম তো।
মহারাজ, আপনি যদি আমার কথা বিশ্বাস করেন তো একটা কথা বলি।
কি।
আপনি আবার আমার দেখা পাবেন আমি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি।
দেখা পাবো?
হ্যাঁ—আগামী পূর্ণিমার রাত্রে বুরুবো যাওয়ার পথে পর্বতশীর্ষে যে রঘুনাথজীর ছোট্ট মন্দিরটি আছে—সেখানে রাত্রির মধ্যপ্রহরে এলে আমার সাক্ষাৎ আবার পাবেন। আর—
আর—
আর আপনার আজকের প্রশ্নের হয়ত জবাব পাবেন।
অজিত যেন অতঃপর কি ভাবে। তারপর মৃদু কণ্ঠে বলে, বেশ—তাই হোক—
সন্ন্যাসিনী কক্ষ ত্যাগ করতে উদ্যত হয়।
তুমি ঐভাবে তো যেতে পারবে না। আমার দুর্গরক্ষীরা তোমার পথ আটকাবে—
না—মহারাজ, মৃদু হেসে বলে সন্ন্যাসিনী, আমি ঠিক দুর্গ থেকে বের হয়ে যাবো তারা আমাকে দেখতেও পাবে না।
কিন্তু—

আসবার সময়ও তারা আমাকে দেখতে পেত না মহারাজ—আমি দেখা দিয়েছি বলেই তারা দেখতে পেয়েছে আমাকে—সেটা তো আমার ইচ্ছাকৃত।

ইচ্ছাকৃত!

হ্যাঁ—নচেৎ সামান্যা এক সন্ন্যাসিনী মহারাজের খাস কক্ষে আসতে চাইলেই কি আসতে পারে। সন্ন্যাসিনী আর দাঁড়ায় না—কক্ষ ত্যাগ করে চলে যায়।

কে—কে ঐ সন্ন্যাসিনী?

দাঁড়াবার ভঙ্গি—কণ্ঠের স্বর সব কিছু যেন কেমন পরিচিত মনে হলো। অচেনা নয়। সন্ন্যাসিনী বলে গেল—আগামী দোলপূর্ণিমার রাত্রে—পর্বতশীর্ষে রঘুনাথজীর মন্দিরে—

মনে পড়ছে বটে অজিতসিংহের—বুরবো যাওয়ার পথে পর্বতশীর্ষে একটি মন্দির আছে—ছোট মন্দির—অখ্যাত মন্দির। মন্দিরের রক্ষণাবেক্ষণ করে এক অশীতিপর বৃদ্ধ রাজপুত—জালিমসিংহ।

সেও রাঠোর। সে-ই একদা নাকি মন্দিরটি প্রতিষ্ঠা করেছিল শোনা যায়। এক সময় নাকি জালিমসিংহ ডাকাত ছিল। ঠাকুর জালিমসিংহ। জালিমসিংহকে অজিত কখনো দেখেনি—একবার রাঠোর সর্দার দুর্গাদাসের কাছে ওর কথা শুনেছিল—

মহারাজ।

কে?

॥ ৬ ॥

চিন্তাজাল ছিন্ন হলো। অজিত ফিরে তাকাল। সামনে দাঁড়িয়ে সেনাপতি অমরসিংহ।

অভিবাদন জানায় অমরসিংহ, আমাকে স্মরণ করেছেন?

হ্যাঁ—অমরসিংহ।

বলুন—

আমি আজ রাত্রেই তারাগড় দুর্গ ছেড়ে চলে যাচ্ছি।

কিন্তু মহারাজ—সম্রাটের বিরাট সৈন্যবাহিনী—

জানি—গুপ্ত পথ দিয়ে আমি চলে যাবো। আমার অনুপস্থিতিতে তুমিই এই দুর্গের অধিপতি হবে—খাদ্য ও পানীয়ের অভাব থাকবে না—কালকের মধ্যে সরবরাহের ব্যবস্থা আমি করছি। একটা কথা—

বলুন মহারাজ—

এখন ব্যাপারটা কাউকে জানতে দিও না। কাল সকালে জানাবে আমার ঘোষণা।

তাই হবে—

নিঃশব্দে তারপর সেই মধ্যরাত্রে মহারাজ অজিতসিংহ তার বিশেষ নির্বাচিত দলটি ও বিশেষ এক সুদক্ষ রক্ষীবাহিনী নিয়ে তারাগড় দুর্গ থেকে গোপন সুড়ঙ্গপথে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেল। দুর্গের অর্ধেক অধিবাসী ব্যাপারটা জানতেও পারল না। আর পারল না—সম্রাট মহম্মদ শা।

দুর্গম সংকীর্ণ বনপথ ধরে অজিত যোধপুরের দুর্গপ্রাসাদে ফিরে এল।

অতঃ কিম্? এবারে কোন রাস্তা? সম্রাটের ঐ বিপুল বাহিনীর সঙ্গে মুকাবিলা করা মানে প্রভূত রক্তক্ষয়—লোকক্ষয়—অর্থব্যয়। তার চাইতে সম্রাট তারাগড় দুর্গ অবরোধ করে আছে যেমন তেমনিই থাকুক।

আপাততঃ তো খাদ্যের অভাব নেই দুর্গবাসীর।

আর তা ছাড়া সুউচ্চ পর্বতোপরি তারাগড় দুর্গ দুর্ভেদ্য বললেও অত্যুক্তি হয় না। দুর্গবাসী ইচ্ছা করে দুর্গদ্বার না খুলে দিলে সেখানে প্রবেশ কেউ করতে পারবে না কোন দিন। অজিত তারাগড়ের চিন্তাটা আপাততঃ এক পাশে ঠেলে রাখে।

সন্ন্যাসিনী। সেই অবগুণ্ঠনবতী সন্ন্যাসিনীর চিন্তাটাই সর্বক্ষণ তার মনকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে।

একটা তীব্র নেশার মতই যেন অজিতের মনকে অভিভূত করে রেখেছে তারাগড়ের সেই অবগুণ্ঠনবতী সন্ন্যাসিনী। কে—কে ঐ রহস্যময়ী অবগুণ্ঠনবতী। কেন তাকে মনে হয়েছিল সে তার অপরিচিতা নয়।

আগামী পূর্ণিমার রাত। পূর্ণিমার রাত্রে আবার দেখা হবে—সন্ন্যাসিনী প্রতিশ্রুতি দিয়ে গিয়েছে।

প্রতি রাত্রে আকাশের চন্দ্রের দিকে সতৃষ্ণ দৃষ্টি নিয়ে চেয়ে থাকে অজিত। কবে ষোলকলায় পূর্ণ হয়ে উঠবে আকাশের ঐ চাঁদ। অবশেষে প্রতীক্ষার অবসান হয়।

পূর্ণিমার রাত। আকাশে পূর্ণচন্দ্র হাসছে। দুগ্ধধবল জ্যোৎস্নালোকে সমস্ত প্রকৃতি যেন হাসছে—প্রকৃতি যেন অভিসারিণী হয়েছে।

গভীর রাত্রে অজিত প্রাসাদ-দুর্গের গুপ্তদ্বার-পথে নিষ্ক্রান্ত হলো। দুর্গ-সীমানার বাইরে অশ্ব পূর্বে হতেই প্রস্তুত ছিল। অশ্বে আরোহণ করে অজিত রঘুনাথজীর মন্দিরের দিকে ধাবিত হলো। জ্যোৎস্নালোকিত নৈশ প্রকৃতি যেন অদ্ভুত শান্ত—সমাহিত। বুরুযোর দিকে অশ্ব ছুটে চলে।

পথ নেহাৎ কম নয়—প্রায় চার ক্রোশ। স্তব্ধ নৈশ প্রকৃতি দ্রুত ধাবমান অশ্ব-ক্ষুরধ্বনিতে সচকিত হতে থাকে।

নির্দিষ্ট পর্বতের সামনে এসে অশ্ব থেকে অবতরণ করে অজিত—এবার পায়ে হেঁটে অগ্রসর হতে হবে। দুর্গম চড়াই। রীতিমত কষ্টকর চড়াই। উঠতে থাকে অজিত সেই চড়াই পথে—ধীরে ধীরে।

সহসা এক সময় কানে এসে প্রবেশ করে যেন মধুর অস্পষ্ট একটি সংগীতের সুর। কে যেন গাইছে। জ্যোৎস্নালোকিত প্রকৃতি সেই সংগীতে যেন বাঙ্ময় হয়ে ওঠে। ক্রমশঃ স্পষ্ট হতে স্পষ্টতর হয় সেই সংগীত। নারীকণ্ঠের সংগীত।

কে গায়। এমন মধুর সংগীত কে গায়? আরো চড়াই উঠবার পর স্পষ্ট শোনা যায়—কে যেন গাইছে:

গোবিন্দ কবহু মিলে
পিয়া মীরা—

মীরার ভজন।

কে গায়? মন্ত্রমুগ্ধের মত যেন বাকী পথটুকু এক সময় শেষ হয়ে যায়।

পর্বতের উপর ছোট একটি মন্দির। মন্দিরের সামনে চাতালে বসে গাইছে এক নারী,

গোবিন্দ কবহু মিলে
পিয়া মীরা—

পায়ে পায়ে যেন মন্ত্রমুগ্ধ অজিত সেই সংগীতরতা নারীর সামনে এসে দাঁড়াল। চাতালে একাকিনী বসে এক নারী গান গাইছে—

গোবিন্দ কবহু মিলে
পিয়া মীরা,
চরণকমল কো—
হাসি হাসি দেখু
রাখু নয়না তেরা।

কে—কে—পরনে গেরুয়া শাড়ি। মাথার রুক্ষ চুল বুকের ওপর এসে পড়েছে—একি—এ যে সংযুক্তা!

দুটি নয়ন মুদ্রিত প্রায় এবং সেই নয়নের কোল বেয়ে অজস্র ধারায় অশ্রু ঝরছে। তন্মগত চিত্তে গেয়ে চলেছে সংযুক্তা। তাহলে তার অনুমান মিথ্যা নয়। মন তার সেদিন মিথ্যা বলেনি।

সংযুক্তা—সন্ন্যাসিনী—যোগিনী।

কিন্তু ডাকা হলো না আর অজিতের। সে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই গান শুনতে লাগল। এবং একসময় গান শেষ হলো—

সংযুক্তা—

কে—মহারাজ!

আমি অজিত, সংযুক্তা।

মহারাজ আমি সন্ন্যাসিনী—যোগিনী—কিন্তু মহারাজ দাঁড়িয়ে কেন বসুন—আসন গ্রহণ করুন।

অজিত বসে না। দাঁড়িয়েই থাকে।

কেন তুমি যোগিনী হলে সংযুক্তা? অজিত ধীরে ধীরে প্রশ্ন করে।

মহারাজ—

আমি অজিত।

যোগিনী মৃদু হাসে, মহারাজ, আজ আপনাকে এখানে কেন ডেকে এনেছি হয়ত অনুমানও করতে পারেননি।

কেন?

আমার সত্য পরিচয় আপনাকে দেবো বলে।

সত্য পরিচয়?

হ্যাঁ- পনার ও আমার পরস্পরের মধ্যে যে সত্য পরিচয়টা আজ পর্যন্ত আপনি জানেন না এবং দীর্ঘদিন পর্যন্ত আমি নিজেও জানতাম না।

অজিত কোন কথা বলে না—নিঃশব্দে তাকিয়ে থাকে সংযুক্তার মুখের দিকে।

যোগিনী সংযুক্তা বলে, আপনার ও আমার মধ্যে একটা পবিত্র মধুর স্বর্গীয় সম্পর্ক আছে মহারাজ—

জানি।

জানেন ?

হ্যাঁ—তোমায় আজো আমি ভালবাসি, তোমার ভালবাসায় আজো আমার সমস্ত হৃদয় ভরে আছে সংযুক্তা—

মহারাজ—ছি ছি, ওকথা মুখে উচ্চারণ করাও মহাপাপ।

পাপ—ভালবাসা পাপ—

পাহাড়ের কঠিন গায়ে গায়ে সেই হাসির শব্দ ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয়ে যায়।

হ্যাঁ মহারাজ—কারণ যে ভালবাসার কথা আপনি বলছেন সে ভালবাসা আমাদের কাছে পাপ—আপনি জানেন না—আমরা পরস্পর সম্পর্কে ভাই-বোন—

ভাইবোন। অজিতের যেন বিস্ময়ের অবধি নেই প্রথমটায় তারপরই নিজেকে সামলে নিয়ে অজিত হেসে ওঠে।

হাসছেন মহারাজ—

মিথ্যা এক কাহিনী রচনা করে তুমিই তো হাসাচ্ছো।

না মহারাজ, মিথ্যা কাহিনী নয়—আমরা শুধু ভাইবোনই নয়—

বল থামলে কেন ?

আমরা একই পিতার ঔরসজাত ।

কি—কি বললে—সহসা যেন আর্তকণ্ঠে চিৎকার করে ওঠে অজিত।

হ্যাঁ মহারাজ—আপনার দাই মা আমার গর্ভধারিণী হলেও স্বর্গীয় মহারাজ যশোবন্তসিংহই আমাদের উভয়ের জন্মদাতা।

না, না, এ মিথ্যা—

মিথ্যা নয় মহারাজ, সত্য—নিষ্ঠুর—নির্মম সত্য।

বিশ্বাস করি না—এ মিথ্যা—আমি বিশ্বাস করি না। পুনরায় অজিত চিৎকার করে ওঠে।

মহারাজ—এ সত্য—বিশ্বাস করুন—এ সত্য—সত্যিই আমরা ভ্রাতা ভগিনী।

অজিত আর দাঁড়াতে পারে না। সহসা উৎরাই ধরে পাগলের মত ছুটতে থাকে। ঊর্ধ্বশ্বাসে যেন ছুটে পালায় মন্দির চত্বর থেকে।

সংযুক্তার দুই চোখে অশ্রুধারা।

তার গান আবার শোনো যায়ঃ

গোবিন্দ করহু মিলে
পিয়া মীরা—

একটা দুঃস্বপ্ন যেন তাড়া করেছে। ঠিক তেমনি করেই অজিত এক সময় নক্ষত্রের মত অশ্ব ছুটিয়ে প্রাসাদদুর্গে ফিরে আসে।

রম্ভা—কোথায় সেই দাইমা রম্ভা। ঝড়ের মতই যেন অজিত রম্ভার কক্ষের সামনে এসে দাঁড়াল রাত্রির শেষ প্রহরে। দাইমা।

সে চিৎকারে রম্ভার ঘুম ভেঙে যায়। কে ?

দাই মা।

একি মহারাজ অজিত—রাত্রির এই শেষ প্রহরে। গত কয়েক বছরে তার সঙ্গে কোন সম্পর্কই রাখেনি অজিত। যেদিন থেকে সংযুক্তাকে রম্ভা দুর্গপ্রাসাদ থেকে সরিয়ে দিয়েছে সেই দিন থেকেই তো সমস্ত সম্পর্কের শেষ হয়ে গিয়েছে।

দাইমা—বন্ধ দরজায় ঘন ঘন করাঘাত পড়ে।

রম্ভা এসে দ্বার খুলে দেয়।

ওদিকে পট্টমহাদেবীরও নিদ্রাভঙ্গ হয়েছিল। হীরাবাঈও ভীত চকিত বাইরে এসে দাঁড়িয়েছে ততক্ষণে।

দাইমা—একি সত্যি ?

কি সত্যি অজিত ?

সংযুক্তা আমারই পিতার—

হ্যাঁ। রম্ভা নয়। জবাব দিল হীরাবাঈ। হীরাবাঈ এগিয়ে এল, হ্যাঁ মহারাজ --সংযুক্তা তোমার ভগিনী—

রম্ভা মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে থাকে নিঃশব্দে।

কিন্তু এ কথা এতদিন তোমরা আমাকে জানতে দাওনি কেন ?

কেউ কোন কথা বলে না।

অজিতও অতঃপর কিছুক্ষণ ওদের মুখের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, তার পর নিঃশব্দেই স্থান ত্যাগ করে।

ওরা পরস্পরের মুখের দিকে তাকায়।

অজিত সোজা এসে নৃত্যশালায় প্রবেশ করে। প্রহরীকে বলে, নৃত্যশালার সমস্ত বাতি জ্বালিয়ে দিতে। সুরা। অজিত পাত্রের পর পাত্র সুরা নিঃশেষ করতে থাকে।

অজিত যেন আরো বেপরোয়া আরো উচ্ছৃংখল হয়ে ওঠে। দিবারাত্র সুরা আর নর্তকী। নৃত্য আর সুরা—

ঐসময় অভয়সিংহ ও ভক্তসিংহের বিবাহ দিল মহারাণী। রাজ-অন্তঃপুরে দুই বধূ এল।

রাজ-অন্তঃপুরে উৎসব—আর ওদিকে তারাগড় দুর্গ তখনো অবরুদ্ধ।

অবশেষে সম্রাটেরও আর মরুপ্রদেশের আবহাওয়া সহ্য না হওয়ায় তার বিশাল

বাহিনীর এক অংশ তারাগড়ে রেখে বাকী সৈন্য নিয়ে দিল্লীতে ফিরে গেল একদিন।

দিল্লী থেকে আসে সন্ধির প্রস্তাব। অম্বররাজ জয়সিংহকে মধ্যস্থ রেখে সম্রাটের সেনাপতিরা সন্ধির কথাবার্তা চালায়।

অজিত বলে, ওদের আমি আর বিশ্বাস করি না—

সেনাপতিরা কোরান স্পর্শ করে বলে, শপথ নিচ্ছি আমরা—সন্ধির শর্ত যা ঠিক হবে তার এতটুকু এদিক ওদিক হবে না। অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালিত হবে। আমরা অবরোধ তুলে নিচ্ছি, মহারাজ আজমীঢ় প্রত্যর্পণ করুন।

পুত্র অভয়সিংহ এবার বলে, আমার মনে হয় পিতা সন্ধি করাই এ ক্ষেত্রে বিবেচনার কাজ হবে।

তুমি বলছো?

হ্যাঁ সন্ধিই করুন।

অজিত গড়িমসি করছে দেখে, সম্রাট ইতিমধ্যে আবার সেনাপতিদের পরামর্শে তারাগড়ে ফিরে যাবেন কিনা ভাবছেন—ঐ সময় যবন সম্রাটের শিবিরে জয়সিংহের মধ্যস্থতায় অভয়সিংহ যবন সেনাপতির সঙ্গে এসে সাক্ষাৎ করবে ও সন্ধির শর্ত আলোচনা করা হবে স্থির হলো।

কিন্তু অভয়সিংহের জামিন কে হবে?

জয়সিংহ বলে, আমিই হবো রাজকুমারের জামিন।

দুর্মদ—দাম্ভিক অভয়সিংহ সঙ্গে সঙ্গে তার কোষ হতে অসি নিষ্কাসিত করে বলে, আমার জন্য কারো জামিন হতে হবে না জয়সিংহ, আমার এই অসিই আমার জামিন।

অভয়সিংহ দিল্লীতে গেল।

সম্রাট মহম্মদ শা সাদরে যুবরাজকে আহ্বান জানাল। এসো যুবরাজ এসো।

কিন্তু ঐ সামান্য অভ্যর্থনায় যেন অভয়সিংহের মন ভরে না। কেন যেন তার মনে হয় তাকে যোগ্য সমাদর করা হলো না। তাকে যোগ্য ও যথোচিত সম্মান দেয়নি সম্রাট।

অভয়সিংহ জানত দরবারে সম্রাটের অব্যবহিত দক্ষিণ দিকেই বরাবর যোধপুরাধিপতির বসবার আসন নির্দিষ্ট ছিল। এবং পিতা অজিতসিংহ ঐ আসনেই বরাবর বসে এসেছেন—

আজ তার পুত্র অভয়সিংহ যোধপুরাধিপতির প্রতিনিধিই হয়ে যখন দরবারে এসেছে—সে তো ঐ আসনটিতেই বসবে।

কথাটা ভাববার সঙ্গে সঙ্গেই অভয়সিংহ—উদ্ধত—দাম্ভিক অভয়সিংহ সেই আসনটিতে বসবার জন্য এগিয়ে যায়।

সোপানশ্রেণীর মধ্য স্থানে এসেছে, ঐ সময় সভায় উপস্থিত অন্যান্য বয়স্ক পারিষদরা অভয়ের ঐরূপ অশিষ্ট আচরণের প্রতিবাদ করবার জন্য এগিয়ে যেতেই অভয়সিংহ থমকে দাঁড়ায়। তার ভ্রূযুগল কুঞ্চিত হয়ে ওঠে। অসির বাঁটে হাত পড়ে।

সম্রাট ব্যাপারটা বুঝতে পারে।

তাড়াতাড়ি সম্রাট তার নিজের গলা থেকে মূল্যবান মুক্তার হারটি অভয়সিংহের গলায় পরিয়ে দিয়ে—নিজেই আহ্বান করে অভয়সিংহকে তার পিতার নির্দিষ্ট আসনটিতে বসিয়ে দেয়।

সেইদিন সম্রাট যদি ঐ মুহূর্তে প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের পরিচয় না দিত—তা হলে সভাস্থলে হয়ত অভয়সিংহের পূর্বপুরুষ অমরসিংহের লোমহর্ষক হত্যাকাণ্ডের পুনরাবৃত্তিই হতো। রক্তস্রোতে সভাস্থল ভেসে যেত। কিন্তু দুর্বল সম্রাট অভয়সিংহকে সে সুযোগ দেয়নি। সে জানত কতবড় কৌশলী যোদ্ধা ঐ তরুণ যুবক অভয়সিংহ। খাঁটি সিংহের বাচ্চা।

তাছাড়া তৈমুরের বংশধর সেদিন চারিদিক থেকে নিষ্পেষিত—বিব্রত। চারিদিকে গোপন শত্রুর জাল বিস্তৃত।

তাছাড়া সত্যিকারের শক্তি বলতে তখন একমাত্র রাজস্থানে তো ঐ মাড়বারই। মেওয়ার নিজেকে সব কিছু থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিশ্চিন্ত জীবন যাপন করছে। আর মাড়বার আজমীঢ় থেকে গুজরাট পর্যন্ত তাদের জয়ের পতাকা প্রোথিত করে চলেছে। দিল্লীর সঙ্গে হাত মিলাতে মাড়বার আদৌ ইচ্ছুক নয়।

মুঘল শক্তি ক্ষয়ের পথে। ক্রমশঃ লীন হতে চলেছে।

মারহাট্টারা মাথা তুলেছে।

॥ ৫ ॥

অভয়সিংহ দিল্লীতেই থেকে গেল আপাততঃ মাড়বারের প্রতিনিধি হয়ে।

দিল্লীতে রাজকীয় সম্মান। স্বাধীনতা ও মুক্তির আনন্দ অভয়সিংহের মনের মধ্যে ক্রমশঃ যেন এক মোহ বিস্তার করে। পিতা অজিতের প্রতি কোন দিনই অভয় সন্তুষ্ট নয়। পিতার অত্যধিক নারীপ্রীতি—সুরা ও সংগীত প্রীতি কোন দিনই অভয়সিংহ ভালভাবে গ্রহণ করতে পারেনি। বিশেষ করে পিতার নারীর প্রতি দুর্বলতা। প্রৌঢ় হয়েছেন আজ পিতা, তবু নারীসঙ্গলিপ্সা তাঁর গেল না।

ছোট ভাই ভক্তসিংহ তখন নাগোরে। ভক্তসিংহও যে তার পিতার প্রতি খুব সন্তুষ্ট ছিল তা নয়। তবে সে তার জ্যেষ্ঠ অভয়সিংহের মত অত উদ্ধত ও দাম্ভিক প্রকৃতির ছিল না।

তাদের চৌহান জননী হীরাবাঈয়ের মনের মধ্যেও ইদানীং কেমন যেন একটা সন্দেহ বাসা বেঁধেছিল তার পুত্রেরা তাদের পিতার প্রতি তেমন সন্তুষ্ট নয়। কেন যেন তার মনে হচ্ছিল বিশেষ করে জ্যেষ্ঠ পুত্র অভয়সিংহ মহারাজকে সিংহাসনচ্যুত করার জন্য মনে মনে মতলব আঁটছে।

কথাটা যে একেবারে মিথ্যা—তার সন্দেহটা যে একেবারে অমূলক তাও নয়। এবং স্বামীকে সে জন্য মধ্যে মধ্যে সে সতর্কও করেছে। অজিত কিন্তু মহিষীর কথাটা হেসেই উড়িয়ে দিয়েছে।

না, না, তাও কখনো সম্ভব। তাছাড়া অভয় তো আমার মৃত্যুর পর

সিংহাসন পাবেই।

কিন্তু আগুন জ্বলে উঠলো অন্য দিক দিয়ে। আর সে আগুনে জ্বালাল অজিতের নারীপ্রীতিই।

ভক্তের স্ত্রী লীলাবতী। দুই বধূর মধ্যে কনিষ্ঠ বধূ লীলাবতীই ছিল বেশী সুন্দরী। এবং তার হাস্যলাস্যও বেশী ছিল। একটু বেশী চঞ্চলা প্রকৃতির ছিল।

পুত্রবধূরা বড় একটা শ্বশুরের সামনে আসত না।

পট্টমহাদেবীই সে জন্য সর্বদা সচেষ্ট ছিল।

কিন্তু নিয়তি বোধ করি কেউ রোধ করতে পারে না। অকস্মাৎ একদিন দ্বিপ্রহরে লীলাবতী অজিতের চোখে পড়ে গেল। লীলাবতীর মাথায় কোন গুণ্ঠন ছিল না।

অজিত চমকে ওঠে। কে ঐ সুন্দরী তরুণী। এবং অজিত যতই সেই ক্ষণেক দেখা তরুণীর কথা মনে করে, তার মনের মধ্যে কামনার আগুন জ্বলে ওঠে।

লীলাবতী যে তারই পুত্রবধূ তা হয়ত অজিত বুঝতে পারেনি—সে জিজ্ঞাসাও করেনি কাউকে—ভেবেছিল বুঝি রাজ-অন্তঃপুরে তারই পুত্রবধূদের কোন সহচরী হবে।

ভক্তসিংহ ঐ সময় নাগোরে। ঠিক ঐ সময় ভক্তসিংহ তার জ্যেষ্ঠর কাছ থেকে গোপনে এক পত্র পেল—

পত্রে লেখা ছিল—

ভক্তসিংহ,

তুমি যদি কোশলে কোন মতে পিতাকে হত্যা করতে পার—তাহলে তোমাকে আমি নাগোরের স্বাধীন নরপতি করে দেবো। এবং নাগোরের অন্তর্গত পাঁচশত পঁয়ষট্টি নগরগুলোও তোমাকে দেবো।

রাজ্যহীন রাজপুরুষ তো কাপুরুষ। জন্মই তার বৃথা। তাছাড়া পিতা আমাদের যত বড় গুরুই হোক—সে একের নম্বরের লম্পট—দিবারাত্র নেশা করে পড়ে থাকে।

প্রকৃতপক্ষে যবন সম্রাট যে যোধপুর আক্রমণ করছে না সে পিতার ভয়ে নয়—আমাদেরই অসির ভয়ে।

পত্র পড়ে লোভের আগুন জ্বলে ওঠে ভক্তসিংহের মনে। সামনেই পার্বতী উৎসব—রাজ-অন্তঃপুরের সমস্ত নারীরা পার্বতী উৎসবে যোগ দিতে যাবে—ঐ দিনই রাত্রে যদি ভক্তসিংহ রাজধানীতে গোপনে যায় তো অনায়াসেই কার্যোদ্ধার করতে পারবে।

ভক্তসিংহ মনে মনে তার সংকল্প স্থির করে ফেলে। এবং পার্বতী উৎসবের আগের দিন রাজধানীর উদ্দেশে রওনা হয়ে পড়ে। দ্রুতগামী অশ্ব ছুটে চলে রাজধানীর দিকে।

অভিশপ্ত সে রাত্রি। যোধপুর দুর্গাপ্রাসাদের অভিশপ্ত রাত্রি। সেই দিন পীপার

নগরে—পার্বতী তৃতীয়া মহোৎসব।

পট্টমহাদেবী ও অন্যান্য মহিষী ও রাজপুরনারীরা সকলেই প্রায় চলে গিয়েছে পীপার নগরে পার্বতী উৎসবে যোগ দিতে। দু-চারজন বৃদ্ধা পুরনারী ও কনিষ্ঠা বধূ লীলাবতীর শরীরটা তেমন ভাল নয় বলে তারা যায়নি উৎসবে।

একজন দেহরক্ষীকে অজিত লীলাবতীর সংবাদ নিতে বলেছিল।

ঐ দেহরক্ষীর কোন কারণে অজিতের উপর ছিল আক্রোশ—সে যখন অনুসন্ধান নিতে গিয়ে বুঝতে পারে লীলাবতী অজিতেরই পুত্রবধূ এবং মহারাজ তারই প্রতি আকৃষ্ট—মনে মনে সে হেসেছিল। এবং সেই সঙ্গে মনের মধ্যে একটা ভয়াবহ সংকল্পও নেয়। ঐ দেহরক্ষীর যুবতী স্ত্রীকে একদিন অজিতের কামানলে আত্মাহুতি দিতে হয়েছিল।

সে অপমানের কথা সে বিস্মৃত হয়নি। সে স্থির করে মনে মনে, লীলাবতীকে যেমন করেই হোক অজিতের হাতে তুলে দিয়ে তার বুকের জ্বালা প্রশমিত করবে।

সুযোগ উপস্থিত। রাজপুরনারীরা সব পীপার নগরে গেছে।

রাজ-অন্তঃপুর একপ্রকার খালি বললেও অত্যুক্তি হয় না। আপন কক্ষে বসে অজিত মদ্যপান করছিল—দেহরক্ষী এসে উপস্থিত হল।

মহারাজ—

কে?

আমি লাল সিং—

লাল সিং—কি সংবাদ?

সেই তন্বী সুন্দরী মহারাজ—

কোথায়?

চলুন তার কক্ষে আপনাকে নিয়ে যাবো।

কিন্তু—

এই অপূর্ব সুযোগ মহারাজ, পুরনারীরা প্রায় কেউ নেই—তাছাড়া সে থাকে পুবের মহলে।

অজিত টলতে টলতে উঠে দাঁড়ায়।

এ অলিন্দ সে অলিন্দ পার হয়ে অবশেষে এক সময় অজিত লীলাবতীর কক্ষের সামনে এসে উপস্থিত হলো।

ঘরের দরজা ভেজান ছিল—আগে হতেই লাল সিং ব্যবস্থা করে রেখেছিল।

নেশায় টলতে টলতে অজিত লীলাবতীর ঘরের মধ্যে গিয়ে প্রবেশ করল।

ঘরের কোণে একটি প্রদীপদানে প্রদীপ জ্বলছিল। প্রদীপের মৃদু আলোয় ঘরটার মধ্যে একটা আলো অন্ধকারের অস্পষ্টতা যেন।

॥ ৬ ॥

লীলাবতী নিদ্রিতা। গায়ের বসন শিথিল—অসংবৃত।

প্রদীপের মৃদু আলোয় নেশা ভরা চোখে অজিত শয্যায় শায়িতা অপরূপ রূপরাশির দিকে চেয়ে থাকে নিষ্পলক। নিদ্রায় শিথিল দেহ। সূক্ষ্ম এক রাত্রিবাসে শরীর আবৃত থাকলেও সেই দেহের প্রতিটি অঙ্গ যেন সুস্পষ্ট।

অজিতের মনের মধ্যে কামনার আগুন জ্বলে ওঠে। অজিত ঝাঁপিয়ে পড়ে সে দেহের উপর।

কে—কে—

আ—আমি—

লীলাবতীর ঘুম ভীত কণ্ঠস্বর যেন একটা চাপা আর্তনাদের মত শোনা যায়।

না, না।

কিন্তু অজিতের বিশাল বাহু তখন আষ্টেপৃষ্ঠে যেন বেঁধে ফেলেছে কোমল লীলাবতীর তনু। অজিত উন্মত্ত। আর ঠিক সেই সময় ভক্তসিংহ সেই কক্ষে এসে প্রবেশ করে।

ইতিমধ্যে লাল সিং প্রদীপের শিখাটা উসকে দিয়ে কক্ষ হতে একসময় সরে পড়েছিল।

কে—একি বাপুজী—ভক্ত চিনতে পারে তার পিতাকে। তার পিতার আলিঙ্গনে আবদ্ধ তারই স্ত্রী। সঙ্গে সঙ্গে ভক্তের অসি কোষমুক্ত হয়—সে তার অসির তীক্ষ্ণ অগ্রভাগ পিতা অজিতের পৃষ্ঠদেশে সমূলে বিদ্ধ করে দেয়।

একটা শেষ আর্তনাদ করে রক্তাক্ত কলেবর অজিত কক্ষের মেঝেতে লুটিয়ে পড়ে।

ভক্তর বুকের মধ্যে তখন আগুন জ্বলছে। রক্তমাখা অসি নিয়ে পরমুহূর্তে সে স্ত্রীকে হত্যা করে—স্বৈরিণী—লীলাবতীও ভূমিতলে রক্তাক্ত কলেবরে লুটিয়ে পড়ে।

হঠাৎ ভক্তের মনে হয় ঐ মুহূর্তে, রাঠোর সর্দাররা যদি জানতে পারে সে পিতাকে হত্যা করেছে—তারা হয়ত ক্ষেপে উঠবে—

অতএব দুর্গপ্রাসাদে আর এক মুহূর্ত নয়—ফুঁ দিয়ে কক্ষের একমাত্র দীপশিখাটি নির্বাপিত করে ভক্তসিংহ কক্ষ হতে নিষ্ক্রান্ত হয়ে যায়। গোপন সুড়ঙ্গ পথ—যে পথ দিয়ে সে পিতাকে হত্যা করতেই সে রাত্রে এসেছিল, সেই পথ দিয়েই দ্রুত দুর্গপ্রাসাদ ত্যাগ করে চলে যায়।

রাত্রি প্রভাতের সঙ্গে সঙ্গে সংবাদটা চারিদিকে রাজধানীতে যেন হাওয়ার বেগে ছড়িয়ে পড়ে—মহারাজা অজিত আর ইহসংসারে নেই। অদৃশ্য আততায়ীর হাতে নির্মমভাবে নিহত হয়েছে। তার রক্তাক্ত মৃতদেহ রাজ-অন্তপুরে পাওয়া গিয়েছে।

প্রত্যুষেই রাজপুরনারীরা পীপার নগর থেকে ফিরে এল। রাজ-অন্তপুরে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গেই ভয়াবহ দুঃসংবাদটা কানে এসে পৌছায়।

পট্টমহাদেবী অজিতের চৌহান মহিষী সে সংবাদ শ্রবণে সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান হারায়। রাজ-অন্তপুরে হাহাকার পড়ে যায়। রাজধানী শোকে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে।

দুর্গশীর্ষে পতাকা নমিত হয়। দ্রুতগামী অশ্বে দিল্লীতে অভয়সিংহ ও নাগোরে ভক্তসিংহের কাছে পত্র প্রেরিত হলো—তাদের পিতা মহারাজাধিরাজ অজিতসিংহ আর ইহজগতে নেই। অদৃশ্য আততায়ীর হাতে রাজাধিরাজের শোচনীয় মৃত্যু হয়েছে।

কিন্তু পুত্রবধূ লীলাবতীর রক্তাক্ত মৃতদেহ ও তারই শয়নকক্ষে অজিতের মৃতদেহ পট্টমহাদেবীকে সন্দিগ্ধ করে তোলে। স্বামীর চরিত্র তো তার অজ্ঞাত নয়। কিন্তু অতদূরে সে নামতে পেরেছে ভাবতেও যেন লজ্জায় ঘৃণায় পট্টমহাদেবী একেবারে পাথর হয়ে যায়। তবে রম্ভারই পরামর্শে লীলাবতীর সংবাদটা একেবারে চেপে যাওয়া হয়।

মৃতদেহের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার জন্য সর্দাররা তৎপর হয়ে উঠে।

মহারাজ অজিতের ছয় মহিষী। প্রধানা চৌহানী মহিষী। তার ষোল জন সখী—একদা যারা অজিতেরও নর্মসহচরী ছিল—তারা, বীরাঙ্গানা দুহিতা ভট্টিনী মহিষী, দেবরলের মহিষী—মৃগবতী, তুয়ার রাণী, সৌর রাণী—সকলেই তাদের স্বামীর সঙ্গে সহমরণে যাবার জন্য প্রস্তুত হয়।

বিরাট এক চিতায় মহারাজের নশ্বর দেহ স্থাপন করা হলো।

দাউ দাউ করে যেন শত শত লেলিহ জিহ্বা বিস্তার করে চিতার আগুন জ্বলছে। শোক বাদ্য বেজে ওঠে।

প্রথমে চৌহানী মহিষী ও তার ষোড়শ সখী—তারপর একে একে অন্যান্য মহিষীরা সেই গগনস্পর্শী চিতাগ্নিতে প্রবেশ করল। যোধপুরের আকাশ লালে লাল হয়ে ওঠে।

দিল্লী থেকে অভয়সিংহ তখন দ্রুতগামী অশ্বারোহণে যোধপুরের দিকে আসছে।

আর রাজ-অন্তঃপুরের এক নিভৃত কক্ষে তখন সবার অলক্ষ্যে ভূলুণ্ঠিতা এক নারীর চোখের জলের বুঝি বিরাম ছিল না। হতভাগিনী রম্ভা। সে যে একদিন তার সব কিছুর বিনিময়ে অজিতকে পালন করেছিল। রম্ভা কাঁদবে না তো কে কাঁদবে। রম্ভা তাই কাঁদে।

সেই মরুপ্রান্তে

ইতিহাস কথা বলে—১৬

শ্রীমতী অঞ্জনা সেন (কর্মাল) কে
চিরশুভার্থী দাদা

উল্কা
২৬-এ গড়িয়াহাটা।
কলিকাতা ১৯

॥ দুটি কথা ॥

ইতিহাস বলে যা লিপিবদ্ধ হয় তার প্রত্যেকটি সাল, তারিখ, চরিত্র ও ঘটনা সত্যের কষ্টিপাথরে যাচাই হয়ে যায়—সেখানে কল্পনার কোন স্থান নেই। তাই যা ঐতিহাসিক তা সত্য। তাই কোন ইতিহাসকে বা ইতিহাসের কোন ঘটনা বা চরিত্রকে কেন্দ্র করে যদি কোন উপন্যাস বা কাহিনী রচিত হয় সেখানে ইতিহাস যথাসম্ভব পূর্ণ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু কোন উপন্যাস বা কাহিনী যখন কোন লেখক লেখেন সেখানে তার কল্পনাটাই প্রধান যদিচ তার মধ্যে কোন কোন ক্ষেত্রে কোন কোন সত্য ঘটনা বা চরিত্র মধ্যে মধ্যে এসে পড়াটা অসম্ভব নয়। এবং কোন ঐতিহাসিক ঘটনা বা চরিত্রকে নিয়ে কোন কাহিনী রচিত হলে ইতিহাসকে লেখক যথাসম্ভব অনুসরণ করেই যান। ঐতিহাসিক উপন্যাসের পূর্ণ মর্যাদা সেইখানেই স্বীকৃত। সেদিক দিয়ে বিচার করতে গেলে সেই মরুপ্রান্তে হয়ত ঠিক ঐতিহাসিক উপন্যাসের পর্যায়ে পড়ে না। তুর্কী সম্রাট বাবুরের ভারত অভিযান ও সমসাময়িক রাজস্থানের ইতিবৃত্ত ও কিছু চরিত্রকে ও ঘটনাকে নিয়েই সেই মরুপ্রান্তে রচিত। সুদূর কাবুল-কান্দাহার থেকে রাজপুতানা-দিল্লী-আগ্রা সেই মরুপ্রান্তের পটভূমি ও সমসাময়িক চরিত্র ও ঘটনাকে কেন্দ্র করে কাহিনীর বিস্তার। এবং সেই ইতিহাস ও তারই সঙ্গে সঙ্গে এসেছে অনেক ঘটনা ও চরিত্র যা ইতিহাস নয়, লেখকের মনোরাজ্যের কল্প-কাহিনীরসের বিস্তারের জন্য, উপন্যাসের নিজস্ব ধর্মে। ১৯৬২ সালে রাজপুতানা ভ্রমণে যাই—ঘুরে বেড়াই রাজস্থানের এখানে ওখানে, চিতোরগড়, যোধপুর, জয়পুর, উদয়পুর, যশল্মীর, আজমীর—পুরাতন ঘরবাড়ি, গড়, দুর্গ—সর্বত্র ঘুরেছি আর মনে হয়েছে তাদের কথা যারা একসময় সেখানে ছিল—তাদের সুখ দুঃখ বেদনা ভালবাসার কাহিনী বারবার মনের মধ্যে উদয় হয়ে আমাকে যেন অন্য এক রাজ্যে নিয়ে গিয়েছিল। তখুনি মনে মনে স্থির করি সেই মরুপ্রান্তে দাঁড়িয়ে তাদের নিয়ে একটি উপন্যাস রচনা করবো। কিন্তু ইচ্ছা থাকলেই সব কিছু হয় না, তাই লিখতে বসেও বার বার কলম আমার থেমে গিয়েছে। খেই হারিয়ে ফেলেছি। কল্পনার সঙ্গে বাস্তবের সংঘর্ষ শুরু হয়ে গিয়েছে। মনে হয়েছে কত সময় যা লিখছি তা তো ইতিহাস নয়—সম্পূর্ণ আমার কল্পনা—ইতিহাসের মধ্যে তো কল্পনার স্থান নেই, আবার মনে হয়েছে কল্পনাও তো আমার ইতিহাসকে কেন্দ্র করেই ডানা মেলেছে। আর সেও তো একেবারে মিথ্যা নয়, তাকেও তো একেবারে অস্বীকার করা যায় না। আবার কলম তুলে নিয়েছি—বাবুর, রাণা সংঘ, মহারাজ গাঙ্গ—তারা আমার চারপাশে ভিড় করে এসে দাঁড়িয়েছে। এগিয়ে চলেছে কাহিনী। সেই মরুপ্রান্তে তারই পূর্ণরূপ।

'উল্কা'
২৬এ গড়িয়াহাটা রোড
কলকাতা

লেখক
১০.৯.৭০

॥ ১ ॥

পনেরশ ষোল খৃষ্টাব্দের এক শ্রাবণ-শেষের সন্ধ্যা।……আকাশে মেঘের সঞ্চার হচ্ছিল। মরুস্থলীর আকাশে—রাজোয়ারার আকাশে। পুঞ্জে পুঞ্জে মেঘ সঞ্চিত হচ্ছিল মরুস্থলীর আরাবল্লী শৈলচূড়াকে স্পর্শ করে। কালো পুঞ্জ পুঞ্জ মেঘ। সমস্ত দক্ষিণ দিক জুড়ে যত দূর দৃষ্টি চলে আরাবল্লী পর্বতশ্রেণী—কালো মেঘ যেন ঢেউ তুলে তুলে ছড়িয়ে পড়েছে। তারই শীর্ষে শীর্ষে পুঞ্জ পুঞ্জ মেঘ সঞ্চিত হয়েছে এবং মধ্যে মধ্যে সোনালী বিদ্যুতের চকিত চমক সেই মেঘের বক্ষ বিদারণ করে আত্মগোপন করছিল।

যোধপুরের দক্ষিণ দিকে আরাবল্লী পর্বত—আর তিন দিক ধু ধু মরুস্থলী—এখন অবিশ্যি সন্ধ্যার আসন্ন অন্ধকারে আবছায়া অস্পষ্ট কিন্তু দিনের বেলায় প্রখর সূর্যকিরণে ঐ দিগন্তবিস্তৃত মরুসাগর অগণ্য মরীচিকা সৃষ্টি করে চোখ ধাঁধিয়ে দেয়, দৃষ্টিবিভ্রম ঘটায়।

আরাবল্লীর একাংশে বিহঙ্গকূটের উন্নত শিখরে অবস্থিত মহারাজ যোধের পত্তন করা নতুন রাজধানী যোধপুরের প্রাসাদদুর্গের পাষাণচত্বরে, যোধপুর-অধিপতি সুরজমল—রাঠোরকুল-চূড়ামণি সুরজমল, ঐ মেঘছায়া সুনিবিড় আরাবল্লীর শৈলচূড়ার দিকে অন্যমনা হয়ে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন।

কয়েক দিন থেকেই সুরজমলের মনটা বিষণ্ণ। রাজজ্যোতিষী কর্ণদেব সেদিন দ্বিপ্রহরে তার বিশ্রামকক্ষে বসে তাঁর জন্মপত্রিকা বিচার করতে করতে হঠাৎ কেমন যেন চুপ করে গেলেন। জন্মপত্রিকাটি গুটিয়ে নিঃশব্দে এক পাশে সরিয়ে রাখলেন।

সঙ্গে সঙ্গে সুরজমল প্রশ্ন করেন, কি হলো দেব, জন্মপত্রিকাটি অমন করে এক পাশে গুটিয়ে রেখে দিলেন যে?—

সুরজমল তাঁর প্রশ্নের কোন জবাব পান নি। আবারও প্রশ্ন করেছিলেন সুরজমল, কোন অমঙ্গলের সূচনা কি দেখতে পেলেন—যদি পেয়ে থাকেন তো বলুন—সংশয় ও চিন্তার মধ্যে আমায় রাখবেন না—

তাঁর প্রশ্নের কোন জবাব দেন নি কর্ণদেব। কিন্তু মহারাজের প্রশ্নের জবাব না দিলেও কক্ষ হতে বহির্গত হয়ে আলিন্দে পা দিতেই পট্টমহাদেবী পথ রোধ করে দাঁড়ান কর্ণদেবের। সামনে হঠাৎ পট্টমহাদেবীকে দাঁড়াতে দেখে ঐভাবে বৃদ্ধ জ্যোতিষিও দাঁড়িয়ে পড়েন, মুখ তুলে তাকান। আমার স্বামীর প্রশ্নের কোন জবাব দিলেন না কেন দেব? মৃদু কণ্ঠে এবারে প্রশ্ন করেন পট্টমহাদেবী।

মা—

আমি আড়াল থেকে সব শুনেছি দেব—

রাজজ্যোতিষী নীরব।

নিশ্চয়ই আপনি মহারাজের জন্মপত্রিকায় কোন অমঙ্গলের সূচনা দেখতে

পেয়েছেন। তাই নয় কি ?—

ধীরে ধীরে এবারে মুখ তুলে পট্টমহাদেবীর দিকে তাকালেন রাজজ্যোতিষী—মুহূর্তকাল যেন ইতস্তত করলেন, তার পর বললেন, শুধু মহারাজের জন্মপত্রিকাতেই নয় মা—সমস্ত মরুস্থলী—মরুস্থলী শুধু কেন বলব, সমগ্র ভারতের ভাগ্যাকাশেই দেখতে পাচ্ছি মা অমঙ্গলের কালো ছায়া ঘনিয়ে আসছে। সূর্য মেষরাশিতে প্রবেশ করছে—

দেব—

হ্যাঁ মা—সুদূর কাবুল থেকে তুর্কীরা কয়েকবার এদেশে হানা দিয়ে প্রচুর ধনরত্ন লুঠ করে নিয়ে গিয়েছে যার ফলে তাদের লোভ বেড়েই গিয়েছে—আবারও তারা হানা দেবে এদেশে—এবং গণনা আমার যদি মিথ্যা না হয়তো—একটু থেমে কথাটা শেষ করলেন রাজজ্যোতিষী, শুধু দিল্লীর সিংহাসনই টলটলায়মান নয়, সমগ্র রাজস্থানও—

কিন্তু দেব—। বাধা দিলেন পট্টমহাদেবী।

জানি মা, তুমি হয়ত বলবে কোথায় দিল্লী আর কোথায় মাড়বার—এই মরুস্থলী। কিন্তু মা আমি দিব্যচক্ষে যা দেখতে পাচ্ছি লোদিবংশের আধিপত্য শেষ হয়ে এসেছে—পাঠানের দিন ফুরিয়ে আসছে—সামনে আসছে যবনের আর এক শাখা—তুর্কী।

আমি অতশত বুঝি না দেব—আমার স্বামীর কথা বলুন।···

কিছুই বলতে হবে না, যথাসময়ে তুমি নিজেই সব জানতে পারবে মা।

তবু—

অধীর হয়ো না মা। তাছাড়া ভবিষ্যতের কালো গর্ভে যা নিহিত আছে—যা অজ্ঞাত আছে, তাকে বর্তমানের আলোয় টেনে আনা মানে মনের উদ্বেগ ও অশান্তিকে অহেতুক বাড়ানো ছাড়া আর কিছুই নয় জেনো।

তবু আমি জানতে চাই—

শোন মা—এবার একটু যেন ইতস্তত করলেন কর্ণদেব, তারপর বললেন, আর চার দিন পরে পীপার নগরে পার্বতী তৃতীয়া উৎসব—

জানি—

পার তো—সেখানে তোমার স্বামীকে যেতে দিও না।···

আর কিছু ?

না। আর কিছু বলবার আমার নেই—এবারে পথ ছাড় মা—আমায় যেতে দাও।

কর্ণদেব আর দাঁড়ালেন না। একটু যেন ক্ষিপ্রপদেরই স্থান ত্যাগ করলেন।

পট্টমহাদেবী দাঁড়িয়ে রইলেন। হঠাৎ তাঁর কানে আসে সুমধুর বীণাবাদনের ধ্বনি। পৌত্রী পার্বতী বোধ হয় তার প্রকোষ্ঠে বসে বীণা বাজাচ্ছে। মৃত জ্যেষ্ঠপুত্রের কন্যা—পার্বতী।

অন্যমনস্ক প্রৌঢ়া পট্টমহাদেবী শ্লথপদে নিজ মহলের দিকে পা বাড়ালেন।

স্বামীর মুখে যে তিনি কিছু শোনেন নি তা নয়, কিছু কিছু শুনেছেন।

দিল্লীর সিংহাসন নিয়ে লোদী বংশীয় নৃপতিদের মধ্যে রীতিমত অন্তর্বিপ্লব নাকি শুরু হয়েছে বেশ কিছু দিন। সম্রাট ইব্রাহিম লোদীর সিংহাসনের ভিত কেঁপে উঠেছে। এবং ঐ অন্তর্বিপ্লবের কারণ অনুমান করেছেন মহারাজ সুরজমল—লোদী বংশেরই এক কুলাঙ্গার মাকড়সার মত হীন চক্রান্তজাল বিছিয়েছে।

দৌলত খাঁ।

দূরবর্তী শৈলশিখর-চুম্বিত পুঞ্জ পুঞ্জ মেঘের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন একাকী মহারাজ সুরজমল। মনটা বিষণ্ণ সুরজমলের, কারণ আকাশে বৃষ্টির নাম-গন্ধও নেই। ইতিমধ্যেই দুর্গমধ্যে রীতিমত জলকষ্ট দেখা দিয়েছে। কে জানে এ সেই যোগীবরেরই অভিশাপ কিনা।

মহারাজ যোধরাও যখন বিহঙ্গকুটে নতুন রাজধানী, প্রাসাদদুর্গ পত্তন করতে গিয়ে যোগীবরের নিভৃত নিবাসটুকু পর্যন্ত কুক্ষিগত করতে উদ্যত, তখন সেই যোগীবর অনেক অনুনয়-বিনয় করেছিলেন তাঁর সাধনপীঠটুকু ছেড়ে দেবার জন্য। কিন্তু যোধরাও তাঁর কথায় কর্ণপাতও করেন নি—তাঁর দীর্ঘদিনের সাধনপীঠ—নিভৃত কন্দরটুকু ভেঙেচুরে নির্মম হস্তে বর্তমান দুর্গপ্রাসাদের মধ্যে মিশিয়ে দিয়েছিলেন যোধরাও।

সেই সময়েই যোগীবর অভিসম্পাত দিয়েছিলেন, বলদর্পী রাজা, তুমি আমার সাধন-আশ্রয়টুকু যেমন ছিনিয়ে নিলে জোর করে, তেমনি আমিও তোমায় অভিসম্পাত দিচ্ছি—তোমার নতুন রাজধানী—তোমার এত সাধের যোধপুরে কোনদিন জলকষ্ট যাবে না, তোমার যোধপুরের জল চিরদিন তিক্ত ও দূষিত থাকবে। জলতৃষ্ণায় তুমি হাহাকার করবে··

অথচ আশ্চর্য মহারাজ যোধকে ঐ যোগীবরই, পুরাতন রাজধানী মন্দর ত্যাগ করে এই বিহঙ্গকুট পর্বতের শিখরে নতুন রাজধানীর পত্তন করতে উপদেশ দিয়েছিলেন। আর যোধরাও সেই উপকারীকেই কিনা শেষ পর্যন্ত অপমান করলেন, অবজ্ঞা করলেন।

পাষাণচত্বরে কার মৃদু পাদুকার শব্দ যেন শোনা গেল। ইতিমধ্যে সন্ধ্যার অন্ধকার আরো চারিদিকে ঘনিয়ে এসেছিল। চকিতে ফিরে তাকালেন সুরজমল। তিন-চার হাত মাত্র ব্যবধানে এক ছায়ামূর্তি সন্ধ্যার আবছায়ায় তাঁর দৃষ্টিগোচর হয়। দীর্ঘ ছায়ামূর্তি।

কে, কে ওখানে? প্রশ্ন করেন সুরজমল।

মহারাজ আমি—

কে? বীরেন্দ্র?

হ্যাঁ মহারাজ—

আগন্তুক এগিয়ে এলো। আবছা আবছা অন্ধকারে দেখা যায় দীর্ঘ বলিষ্ঠ-দেহী পত্তাবৎ বংশীয় যুবক বীরেন্দ্র। অঙ্গে সৈনিকের বেশ।···

যুবকের বীরত্বে শৌর্যে ও রণনিপুণতায় মুগ্ধ হয়েই সুরজমল মাত্র কয়েক মাস পূর্বে বীরেন্দ্রকে নিজের অশ্বারোহী সৈন্যবাহিনীতে স্থান দিয়েছেন।

বীরেন্দ্র আরো একটু কাছে এসে মহারাজকে কুর্নিশ জানাল। মাথায় শিরস্ত্রাণ, কটিদেশে খাপেভরা তরবারি ও স্কন্ধদেশে ধারালো বর্শা।

কিছু বলবে বীরেন্দ্র ?

হ্যাঁ মহারাজ। কিছু সংবাদ আছে—

এখানে বলতে পার না ?

না মহারাজ—কোন নিভৃত কক্ষে—

বেশ চল—মন্ত্রণা-কক্ষেই যাওয়া যাক—

ধাপের পর ধাপ প্রশস্ত প্রস্তরনির্মিত সোপান ঘুরে ঘুরে উপরে দুর্গাভ্যন্তরে চলে গিয়েছে। আগে আগে মহারাজ ও তাঁর পশ্চাতে বীরেন্দ্র মহারাজকে অনুসরণ করে চলে।

অনেকগুলো সোপান অতিক্রম করে উভয়ে আর একটি অনরূপ প্রশস্ত পাষাণচত্বরে এসে উপস্থিত হলেন। চত্বরের তিন কোণে কুলুঙ্গীতে দীপ জ্বলছে—সশস্ত্র প্রহরীরা এদিক ওদিক ঘোরাফেরা করছে মুক্ত কৃপাণ ও বর্শা হাতে নিঃশব্দে। চত্বর অতিক্রম করে উভয়ে একটি সরু গর্ভপথে এসে প্রবেশ করলেন। দুজন লোক অতিকষ্টে সেই গর্ভপথ দিয়ে পাশাপাশি হাঁটতে পারে।

মধ্যে মধ্যে আলোর ব্যবস্থা আছে, কিন্তু সে আলো এত কম যে অন্ধকার ও আলোর একটা রহস্যপূর্ণ আলোছায়ার সৃষ্টি হয়েছে সেই সংকীর্ণ গর্ভপথে।

সেই গর্ভপথ ধরেই দুজনে এগিয়ে যান। সেখানেও সশস্ত্র প্রহরী প্রহরারত। সংকীর্ণ গর্ভপথের শেষে একটি দ্বারপথ—দ্বারের কপাট বন্ধ ছিল—এবং দ্বারের সামনে প্রহরারত প্রহরী ছিল।

প্রহরী কুর্নিশ করে দ্বার খুলে দেয়।

প্রথমে মহারাজ সুরজমল ও তাঁর পশ্চাতে বীরেন্দ্র কক্ষমধ্যে প্রবেশ করে।

নাতিপ্রশস্ত একটি কক্ষ। প্রবেশ ও নির্গমের দুটি দ্বার—একটির বাইরের চত্বরের গর্ভপথের সঙ্গে যোগাযোগ, অন্যটির একেবারে রাজ-অন্তঃপুরের সঙ্গে।

কক্ষমধ্যে দীপাধারে দীপ জ্বলছিল—তারই অনুজ্জ্বল আলোয় কক্ষটি মৃদু আলোকিত। কক্ষমধ্যে খানকয়েক বসবার ইতস্তত বিক্ষিপ্ত পাথরের আসন—আর মেঝেতে পুরু জাজিম পাতা। অনেক উপরে কক্ষমধ্যে বায়ু চলাচলের জন্য বড় বড় কয়েকটি ঘুলঘুলি ব্যতীত আর কোন জানালা নেই।

সুরজমল বীরেন্দ্রর মুখের দিকে তাকালেন, বল কি বলছিলে।

আজ যখন নগরের বাইরে গিয়েছিলাম, পর্বতের সানুদেশে একদল অশ্বারোহী পাঠানকে দেখলাম।

অশ্বারোহী পাঠান—এই যোধপুরে ?

হ্যাঁ মহারাজ—তারা দেখলাম—

কি—কি দেখলে ? উদ্বিগ্ন কণ্ঠে প্রশ্ন করেন সুরজমল বীরেন্দ্রকে।

পাহাড়ের সানুদেশে জঙ্গলের ভিতর দিয়ে দিয়ে তারা পীপার নগরের দিকে চলেছে—

পীপার নগরের দিকে।

হ্যাঁ—

কিন্তু—

মহারাজ, আপনার নিশ্চয়ই অজানা নয় আগামী কাল পীপার নগরে পার্বতী তৃতীয়া উৎসব ? এবং ঐ উৎসবে কাল মাড়বারের চারিদিক থেকে আমাদের—বিশেষ করে আমাদের কুমারী মেয়েরা ভগবতী গৌরী দেবীর পুজো দিতে আসবে—

কি বলতে চাও তুমি বীরেন্দ্র, স্পষ্ট করে বল।

আমার মনে কেমন যেন একটা সন্দেহ জাগছে মহারাজ।

সন্দেহ! কিসের সন্দেহ ?

ঐ অশ্বারোহী পাঠানদের মতলব নিশ্চয়ই ভাল নয়। তাই আপনার কাছে আমি অনুমতি চাই—

কিসের অনুমতি।

আমি কিছু অশ্বারোহী সৈন্য নিয়ে আজই রাত্রে পীপার নগরের দিকে যে পাঠান সৈন্যরা গিয়েছে তাদের অনুসরণ করতে চাই—

শুধু অনুসরণ নয় বীরেন্দ্র—সঙ্গে তোমার কিছু সুদক্ষ ও বিশ্বাসী সৈন্য নিয়ে যাও, তাদের যেমন করে হোক পীপার নগরে পেঁছাবার আগেই ধ্বংস করে ফেলতে হবে। একটি পাঠানও যেন জীবিত পীপার নগরে প্রবেশ না করতে পারে—

তাই হবে মহারাজ—

হ্যাঁ, যদি কৃতকার্য হয়ে ফিরতে পার তাহলে আজকের এই সংবাদের জন্য ও কাজের জন্য তোমার আশাতীত পুরস্কারই জেনো তোমাকে আমি দেবো—প্রতিশ্রুতি দিলাম।

মহারাজ—

বল।

কৃতকার্য হয়ে আমি ফিরবই—কিন্তু তখন—শুধু একটা কথা দিন—

বল কি কথা চাও তুমি ?

আমি যা ভিক্ষা চাইবো তাই আপনি আমায় দেবেন ?

তাই পাবে তুমি বীরেন্দ্র—

ঠিক আছে মহারাজ। আমি তাহলে চললাম—বীরেন্দ্র সুরেজমলকে আভূমিনত হয়ে কুর্নিশ করে যে পথে প্রবেশ করেছিল নিঃশব্দে সেই পথেই প্রস্থান করল।

পূর্বের সেই সংকীর্ণ গর্ভপথ ধরে যেতে যেতে হঠাৎ থেমে যায় বীরেন্দ্র।... মুহূর্তকাল যেন কী ভাবে তারপর দ্রুত গর্ভপথ অতিক্রম করে ও গোটা দুই অলিন্দ পার হয়ে প্রশস্ত এক পাষাণচত্বরে এসে পড়ে।

চত্বরের একদিকে দুর্গপ্রাসাদ—অন্যদিকে সুউচ্চ প্রাচীর, আকাশচুম্বী। সোজা প্রাচীরের দিকে এগিয়ে গিয়ে প্রাচীরের গা ঘেঁষে ঘেঁষে অন্দরের দিকে অগ্রসর হয় বীরেন্দ্র। দুর্গের মধ্যস্থিত পেটা ঘড়িতে সংকেতধ্বনি শোনার সঙ্গে সঙ্গে

শিঙার ধ্বনিও শোনা যায়। বীরেন্দ্র বুঝতে পারে সন্ধ্যা উত্তীর্ণ—একদল প্রহরীর কার্য শেষ হলো—অন্যদল এবারে রাত্রির মধ্যপ্রহর পর্যন্ত দুর্গের চারিপাশে যারা পাহারা দেবে তারা পূর্ববর্তীদের স্থান অধিকার করবে।

মধ্যপ্রহরে আবার প্রহরী বদল হবে। প্রহরী বদলের সংকেত এই উপযুক্ত সময়—বীরেন্দ্র এক দুঃসাহসিক কাজে ব্রতী হয়। খাড়া প্রাচীরের গা বেয়ে সরু একটা লোহার শিকল ঝুলছিল—প্রয়োজন বোধে ঐ শিকল ধরে পতাকাবাহী কখনো কখনো দুর্গশীর্ষে উঠে থাকে—হাত বাড়িয়ে বীরেন্দ্র সেই শিকল শক্ত মুঠি করে ধরে সোজা সন্ধ্যা-রাত্রির আবছা অন্ধকারে শিকারী বিড়ালের মত ক্ষিপ্রগতিতে উপরে উঠে যায়।

মাঝবরাবর উঠতেই কানে আসে সুমধুর বীণাধ্বনি। মুহূর্তের জন্য বুঝি সেই বীণাধ্বনি কানে আসতে অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিল এবং হাতের মুষ্টি শিথিল হয়ে এসেছিল—সংগে সংগে নিজেকে সামলে নেয় বীরেন্দ্র—জোরে মুঠি দিয়ে শিকলটা চেপে ধরে। পড়লে আর রক্ষা ছিল না—সহস্রাধিক ফুট নীচে অন্ধকার পাহাড়ের তলদেশে পড়ে মুহূর্তে দেহের সমস্ত হাড় চুরমার হয়ে এক মাংসপিণ্ডে পরিণত হতো।

খুব সামলে নিয়েছে। সরু কার্নিশ পায়ে ঠেকে।...বীরেন্দ্র জানে সামনেই যোধপুরাধিপতির জ্যেষ্ঠপুত্রের একমাত্র কন্যা পার্বতীর মহল। সরু কার্নিসের উপর পা রেখে, বলতে গেলে প্রায় শূন্যে হাওয়ায় গা ভাসিয়ে অতি সন্তর্পণে এগিয়ে চলে বীরেন্দ্র। কিছুদূর অগ্রসর হয়ে কার্নিস ধরে ঝুলে পড়ে নীচের দিকে—তারপরই নিঃশ্বাস বন্ধ করে নীচের অন্ধকার অলিন্দে লুকিয়ে পড়ে।

ধুপ্ করে একটা শব্দ হলো। যদিও অতি সন্তর্পণে লাফ দিয়েছিল বীরেন্দ্র, তবু শব্দটা শোনা যায়।

সংগে সংগে অলিন্দের পূর্ব দিক থেকে প্রশ্ন ভেসে আসে সতর্ক প্রহরীর কণ্ঠে—কে!

বীরেন্দ্র একেবারে অন্ধকারে দেওয়ালের গায়ে মিশিয়ে নিজেকে দাঁড়িয়ে থাকে।

আবার প্রশ্ন আসে, কে? শুধু প্রশ্ন নয়, সেই সংগে মানুষের পদশব্দও শ্রুতিগোচর হয়।

দ্রুত দক্ষিণ দিকে এগিয়ে যায় বীরেন্দ্র—যেদিক থেকে বীণার ধ্বনি ভেসে আসছিল। অলিন্দ শেষ হয়েছে একটা খোলা বারান্দার মত জায়গায়, তারই কয়েক হাতের মধ্যে পার্বতীর কক্ষের দ্বার। সোজা সেই দ্বারপথ দিয়ে বীরেন্দ্র কক্ষমধ্যে প্রবেশ করে ভিতর থেকে দ্বার অর্গলরুদ্ধ করে।

সেই শব্দে সঙ্গে সঙ্গে ফিরে তাকায় পার্বতী—হাতের বীণা থেমে যায়। কক্ষের মধ্যে প্রদীপ জ্বলছিল, সেই স্বল্পালোকে একজন সৈনিককে কক্ষমধ্যে দেখে ভয়ে উৎকণ্ঠায় পার্বতীর কণ্ঠ কেঁপে যায়—তবু সে অস্ফুট চিৎকার করে ওঠে, কে—কে!

পার্বতী—

কে ?

আমি—আমি বীরেন্দ্র—

বীরেন্দ্র—

পার্বতীর মুখের কথা শেষ হলো না, পার্বতীর কক্ষের বন্ধ দুয়ারের ওপরে বাইরে থেকে করাঘাত পড়লো ও পুরুষের কণ্ঠে প্রশ্ন ভেসে এলো, পার্বতী—পার্বতী—

ঘরের মধ্যে পার্বতী ও বীরেন্দ্র একই সঙ্গে কেঁপে ওঠে—সে গলার স্বর চিনতে তাদের কষ্ট হয় না—পার্বতীর জ্যেষ্ঠ—রাজকুমার গাঙ্গ। পিতামহ সুরজমলের উত্তরাধিকারী দুর্ধর্ষ গাঙ্গ।

॥ ২ ॥

বীরেন্দ্র সিংহই নয় কেবল, সেই কণ্ঠস্বর শ্রবণে পার্বতীর বুকের ভিতরটাও যেন সহসা কেঁপে উঠেছিল। দুরু দুরু করে কেঁপে উঠেছিল। এবং মুহূর্তে যেন কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েছিল বীরেন্দ্র ও পার্বতী দুজনেই।

শুধু রাজপ্রাসাদেই নয়, দুর্ধর্ষ আত্মাভিমানী এবং আভিজাত্য-গর্বে অতি-মাত্রায় সচেতন বীরকেশরী সুনিপুণ অসিযোদ্ধা রাজকুমার গাঙ্গকে ভয় করত না এমন একটি প্রাণী বোধ করি সেদিন সমগ্র মাড়বারে ছিল না। বীরকেশরী ও সুনিপুণ অসিযোদ্ধাই নয়—অন্যান্য আরো বহুবিধ গুণাবলীতে অলঙ্কৃত ছিল গাঙ্গের চরিত্র।

গুণাবলীর সঙ্গে সঙ্গে রূপও দিয়েছিলেন বিধাতা গাঙ্গের দেহে। পেশল সুঠাম দীর্ঘদেহী পুরুষ—তপ্তকাঞ্চনের ন্যায় গাত্রবর্ণ। প্রশস্ত ললাট। দীর্ঘায়ত দুটি চক্ষু। উন্নত নাসা। প্রশস্ত বক্ষপট—আজানুলম্বিত বাহু। যেন সত্যকারের পুরুষসিংহ। মহারাজ সুরজমলের সর্বাধিক প্রিয়। জ্যেষ্ঠপুত্র ভাগের একমাত্র বংশধর।

অকালমৃত্যু হয়েছিল মহারাজ সুরজমলের জ্যেষ্ঠপুত্রের—শিশুকাল থেকেই দুঃসাহসী এবং শিকারপ্রিয় ছিল রাজকুমার ভাগ। একবার আরাবল্লীর সানুদেশে গভীর অরণ্যে বরাহ শিকারে গিয়ে আর প্রাণ নিয়ে ফিরে এলো না রাজকুমার ভাগ।

তার অনুচর ও দেহরক্ষীরা ভাগের প্রিয় অশ্ব অশ্বিনীর পৃষ্ঠে চাপিয়ে নিয়ে এলো বীভৎস রক্তাক্ত প্রাণহীন এক মৃতদেহ। বরাহ-শিকারে গিয়ে লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে বন্য বরাহের কবলে পড়ে ভাগ। তীক্ষ্ন ধারালো দন্তে বরাহ ভাগের উদর বিদীর্ণ করে ফেলেছিল। ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়।

ভাগের মৃতদেহ যখন সকলে বহন করে এনে দুর্গপ্রাসাদের পাষাণচত্বরে নামাল—রাজপুরীর অভ্যন্তর থেকে একটা নারী-কণ্ঠের তীক্ষ্ন দীর্ণ চীৎকার শোনা গেল। পট্টমহাদেবী—হতভাগ্য ভাগের জননী ছুটে এসে চীৎকার করে প্রিয়পুত্রের মৃতদেহের সামনে আছড়ে পড়লেন।

মহারাজ স্রজমলও সামনে এসে দাঁড়িয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর কণ্ঠে কোন শব্দ ছিল না—তিনি যেন পাথর হয়ে গিয়েছিলেন।

আর একজনও পাথব হয়ে গিয়েছিল। ভাগের তরুণী স্ত্রী চন্দনা।

অন্তঃপুরচারিণী রাজবধূ চন্দনা—যাকে ইতিপূর্বে কেউ কোনদিন দেখে নি—সেদিন সবাই দেখল নিঃশব্দচরণে কখন এসে রক্তাক্ত মৃতদেহের সামনে দাঁড়িয়েছে। অনবগুণ্ঠিতা। এলায়িত কুন্তলা।

দূর আরাবল্লীর শীর্ষ ছুঁয়ে সূর্য তখন অস্তাচলমুখী। সেই অস্তাচলমুখী সূর্যের শেষ রক্তিম রশ্মি যেন সেই শোকবিহ্বল পাষাণমূর্তির সর্বাঙ্গে রক্ত-আবির ঢেলে দিয়েছে। বধূ চন্দনার দিকে তাকিয়ে সমস্ত শোকের উচ্ছ্বাস সহসা স্তব্ধ হয়ে গেল। সকলে যেন কাঁদতে ভুলে গেল। বিস্ময়ে বিহ্বল সকলে নিঃশব্দে কেবল চেয়ে থাকে সেই শোকের নিশ্চল পাষাণ-মূর্তির দিকে।

চিতাসজ্জা প্রস্তুত হলো। আর সেই সময়ে রক্তবস্ত্র পরিহিতা চন্দনা এসে দাঁড়াল স্বামীর চিতাসজ্জার সামনে দণ্ডায়মান মহারাজ স্রজমলের সামনে। এলায়িত কুন্তল—অনবগুণ্ঠিতা। সমস্ত শোক, সমস্ত লজ্জার অতীত আজ রাজ-অন্তঃপুরচারিণী রাজবধূ চন্দনা।

অভিভূত হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন রাজাধিরাজ স্রজমল সুসজ্জিত চিতার সামনে। চমকে উঠলেন।

আমাকে আমার স্বামীর অনুগমন করবার অনুমতি দিন পিতা—

না মা না—, যেন চাপা আর্তনাদ করে ওঠেন স্রজমল।

পিতা, কন্যাকে আপনার অনুমতি দিন সহমরণের—

তোর ছেলে গাঙ্গ—তোর দুধের শিশু পার্বতী—তাদের ফেলে তুই কোথায় যাবি মা—; পট্টমহাদেবী কান্নায় ভেঙে পড়েন।

তাদের জন্য আপনারা রইলেন—আপনি, মা—আমায় অনুমতি দিন—

ভাগের দুটি সন্তান। জ্যেষ্ঠপুত্র গাঙ্গের বয়স তখন আট বৎসর, আর কন্যা পার্বতীর বয়স মাত্র দেড় বৎসর। ইতিমধ্যে কিশোর বালক গাঙ্গ সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল। চন্দনা তার দিকে ফিরেও তাকাল না একটিবার। আশ্চর্য। গাঙ্গও সেদিন মাকে একটিবার ডাকে নি। এক ফোঁটা চোখের জল ফেলে নি।

আর দাঈ রম্বা দেড় বৎসরের শিশু পার্বতীকে নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল গাঙ্গেরই একটা হাত ধরে অল্প দূরে। সেদিকেও তাকায় নি একটিবার চন্দনা। কারো কোন অনুনয়-বিনয়ে কর্ণপাত করে নি—স্থিতধী—স্থিরপ্রতিজ্ঞ—পুরঙ্গনাদের হুলুধ্বনি ও শঙ্খধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে প্রজ্বলিত চিতানলে গিয়ে প্রবেশ করল মাড়বার কুললক্ষ্মী রাজবধূ চন্দনা।

লেলিহান সর্বগ্রাসী অগ্নির শত শত শিখা মুহূর্তে সেই কোমল নারীদেহ গ্রাস করে নিল। ভস্মীভূত হয়ে গেল সব কিছু দেখতে দেখতে।

সেই হতে পট্টমহাদেবী ও মহারাজ স্রজমলের নয়নমণি ঐ রাজকুমার গাঙ্গ। এবং সবাই জানে স্রজমলের তিরোধানের পর ঐ গাঙ্গই সিংহাসনে উপবেশন করবে, তাঁর আরো পুত্র থাকা সত্ত্বেও। ভবিষ্যত যোধপুরাধিপতি রাজকুমার গাঙ্গই।

গাঙ্গ কনিষ্ঠা এবং একমাত্র ভগ্নী পার্বতীকে অত্যন্ত স্নেহ করে—অতি প্রিয় পার্বতী তার। কিন্তু তাই বলে সে তার ভগ্নী পার্বতীকে সামান্য এক সৈনিক বীরেন্দ্রর হাতে কোনদিনই তুলে দেবে না একথা ভাল করেই জানত পার্বতী।

বীরেন্দ্র ও পার্বতীর প্রেমকে কোনদিনই গাঙ্গ অনুমোদন করবে না—ক্ষমার চোখে দেখবে না। শুধু অনুমোদন বা ক্ষমাই নয়—ব্যাপারটা তার গোচরীভূত হলে বীরেন্দ্রকে সে হয়ত তীক্ষ্ণ তরবারি দিয়ে মুহূর্তে কেটে টুকরো টুকরো করে ফেলবে। বীরেন্দ্র ও পার্বতী উভয়েই সেটা জানত। তাই বুঝি দুজনার বুকের ভিতরটা অমন করে কেঁপে উঠেছিল।

কিন্তু এখন উপায় ? বাইরে আবার রাজকুমার গাঙ্গর কণ্ঠস্বর শোনা যায়, পার্বতী—দরজা খোল পার্বতী—

বীরেন্দ্রই এবারে বলে, যাও পার্বতী—দরজা খুলে দাও—

সে কি—তার পর—তুমি ওকে জান না।

জানি।

তবে ?

ভয় নেই তোমার—আমি চলে যাচ্ছি এ কক্ষ থেকে—

কেমন করে ? কোন্ পথে ?

দক্ষিণ দিককার ছোট একটি গবাক্ষর দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে বীরেন্দ্র বলে, ঐ গবাক্ষ-পথে—

ঐ গবাক্ষ-পথে তুমি কোথায় যাবে। তার চাইতে যা হয় হোক—যা আমার ভাগ্যে আছে হবে। আমি সাড়াও দেব না—দরজাও খুলবো না—

পাগলামি করো না পার্বতী—আমি যা বলছি তাই কর—যাও—

বীরেন্দ্র—

পার্বতী—আমাদের প্রেম যেমন মিথ্যা নয় তেমনি সে প্রেমে কোন অপরাধ বা কলঙ্কও নেই—ভগবতী গৌরী নিশ্চয়ই তোমার-আমার প্রেমকে মিথ্যা হতে দেবেন না। যাও আর বিলম্ব করো না—

কথাগুলো বলে বীরেন্দ্র আর দাঁড়াল না। সোজা এগিয়ে গেল গবাক্ষর দিকে এবং হাত বাড়িয়ে গবাক্ষ ধরে দেহ উত্তোলন করে নিমেষে গবাক্ষ-পথে অন্তর্হিত হয়ে গেল।

আর কাঁপতে কাঁপতে গিয়ে অতঃপর পার্বতী কক্ষের দরজার অর্গল মুক্ত করল।

রাজকুমার গাঙ্গ এসে কক্ষে প্রবেশ করল।

কি রে—সাড়া দিচ্ছিলি না কেন, এত ডাকছি তখন থেকে!

ঘুমিয়ে পড়েছিলাম দাদা—

এই সন্ধ্যাবেলায় ঘুম—একটু আগে শুনছিলাম তোর বীণার আলাপ—

কেমন ক্লান্ত লাগছিল তাই—

একে দুর্গশীর্ষের ঐ গবাক্ষ-পথে বীরেন্দ্র যে কোথায় গেল সেই চিন্তাতেই

বুকের ভেতরটা তখন হিম হয়ে ছিল, তার উপর রাজকুমার গাঙ্গ হঠাৎ এ সময় কেন তার কক্ষে সে চিন্তাটাও বুঝি পার্বতীকে ব্যাকুল করে তুলেছিল।

তবে কি তার জ্যেষ্ঠ তাদের সব কথা জানতে পারল নাকি।

ভয়ে ভয়ে তাকায় পার্বতী রাজকুমার গাঙ্গের মুখের দিকে। বুঝবার চেষ্টা করে বুঝি, আর ঠিক সেই মুহূর্তে গাঙ্গ ভগ্নীর মুখের দিকে তাকিয়ে স্নেহসিক্ত কণ্ঠে ডাকে, পার্বতী—

দাদা—

একটা সুসংবাদ পেয়েছি ভগ্নী।

সুসংবাদ!

হ্যাঁ—মেওয়ার অধিপতি সংঘ—সংগ্রাম সিংহ শুনলাম তোর পাণিপ্রার্থী হয়ে দূত সমভিব্যাহারে শীঘ্রই নারিকেল প্রেরণ করছেন মাড়বারে—

সেই কানা সংগ্রাম সিংহ দাদা?

হ্যাঁ—কানা হলে কি হবে—সত্যিকারের একজন বিচক্ষণ বহুদর্শী বীর রাজা। মেওয়ারের যোগ্য অধিপতি—, তোর অমত নেই তো?

সে তো প্রায় বৃদ্ধ দাদা—

বৃদ্ধ কে বললে—বয়েস হয়েছে হয়তো চল্লিশের কাছাকাছি। তা পুরুষের ঐ বয়স আর কি—

সে তো বিবাহিতা—তাছাড়া—

কি?

এক শূদ্রকন্যাকে যে বিবাহ করেছে—

তাতে কি, তুই হবি পাটমহিষী—বিবাহের পর—

আর সেই সময় বীরেন্দ্র সিংহ—হঠাৎ সরু কার্নিসের উপর থেকে পা ফসকে গিয়ে কোনমতে ভাগ্যক্রমে হাত দিয়ে গবাক্ষের সরু কার্নিসটা ধরে নীচে ঝুলতে ঝুলতে ভাবছিল বীরেন্দ্র কতক্ষণ সে অমনি করে শূন্যে ঝুলে থাকতে পারবে। টনটন করছিল দুটি হাত এতক্ষণ—এখন সীসার মত যেন ভারী হয়ে আসছে। ক্রমে হাত অসাড় হয়ে মুষ্টি শিথিল হবে, দেহভারে স্খলিত হয়ে সে মাধ্যাকর্ষণে বহু নিম্নে অন্ধকার উপত্যকায় গিয়ে পতিত হবে। চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যাবে দেহ। একটা হাড়গোড়-হীন রক্তাক্ত মাংসপিণ্ড—কেউ আর দেখে চিনতে পারবে না হতভাগ্য বীরেন্দ্র সিংহকে কাল। এমন কি রাজকুমারী পার্বতীর দৃষ্টিতেও যদি পড়ে—সেও চিনতে পারবে না। এর চাইতে বোধ করি রাজকুমার গাঙ্গের উন্মুক্ত অসির মুখোমুখি দাঁড়িয়ে মৃত্যুর সঙ্গে মোকাবিলাও শ্রেয় ছিল।

আর বুঝি মুষ্টি দিয়ে সরু কার্নিশ ধরে রাখতে পারে না বীরেন্দ্র সিংহ। মাথার মধ্যে কেমন যেন সব ঝিম ঝিম করছে—কেমন যেন সব ধোঁয়াটে—ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে। ঝাপসা কুয়াশার মত স্মৃতিপটে যেন হঠাৎ আলোকসম্পাত হয়—সুউচ্চ প্রাসাদপ্রাকারের দক্ষিণ দিকে বিরাট এক শিশুগাছ আছে না। এবং একদিন কৌতূহলে তার নজরে পড়েছিল উপত্যকা থেকে প্রাসাদে পার্বতীর কক্ষ দেখতে

দেখতে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত যদি সেই শিশুগাছের উপর গিয়ে না পড়ে—বহু নিম্নে পর্বতসানুদেশে প্রস্তরসঙ্কুল উপত্যকার মধ্যে গিয়ে পড়ে।

কিন্তু আর ভাবতে হলো না বীরেন্দ্রকে—সহসা ঐ সময় রাজকুমারী পার্বতীর উৎকণ্ঠায় ভরা চাপা সতর্ক কণ্ঠস্বর তার কানে এলো।

বীরেন্দ্র—বীরেন্দ্র—

পার্বতী—, ক্ষীণকণ্ঠে সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যুত্তর দেয় বীরেন্দ্র।

কোথায় তুমি বীরেন্দ্র—

গবাক্ষের নীচে আমি ঝুলছি—আর হয়ত পারব না—হাত অবশ হয়ে আসছে, এবারে হয়ত—

একটু—আর একটু অপেক্ষা কর বীরেন্দ্র—আমি একটা উপায় করছি—

বীরেন্দ্রর চিন্তায় পার্বতীর সমস্ত মনটা তখন এমনি আচ্ছন্ন ছিল যে সে তার জ্যেষ্ঠকে কোনমতে শেষের দিকে হাঁ হুঁ করে সরিয়ে দিয়েই কক্ষের দরজায় অর্গল তুলে দিয়ে পুনরায় ছুটে এসেছিল গবাক্ষ-পথে।

নীচের দিকে তাকাল গবাক্ষ-পথে পার্বতী—অন্ধকার—ছেদহীন অন্ধকার—কিছুই চোখে পড়ে না পার্বতীর।

অনন্যোপায় হয়ে সে চাপা উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বীরেন্দ্রর নাম ধরে ডাকে, বীরেন্দ্র—কোথায় তুমি ?

কার্নিশ ধরে ঝুলছি। বীরেন্দ্র জবাব দেয়।

সর্বনাশ। এখন কি উপায় সে করবে ? বীরেন্দ্রকে কেমন করে সে বাঁচাবে—পাগলের মতই যেন কক্ষের সর্বত্র প্রদীপালোকে তাকায় পার্বতী।

নেই—কিছু নেই—কোন কিছুই তার চোখে পড়ে না। এবং সেই সময়ই হঠাই তার মনে হয় তার উড়নীর কথা। তাড়াতাড়ি ঝাঁপি খুলে যত উড়নী ছিল টেনে টেনে পাগলের মত বের করে একটার সঙ্গে একটা গিঁট দিয়ে সেই উড়নীর এক প্রান্ত নিজের কটিদেশের সঙ্গে উত্তমরূপে জড়িয়ে বেঁধে অন্য প্রান্ত গবাক্ষ-পথে ঝুলিয়ে দেয়। বীরেন্দ্র—উড়নী ধরে উঠে এসো—ঝুলিয়ে দিলাম। পার্বতী গবাক্ষ-পথে ঝুঁকে চেঁচিয়ে বলে।

প্রথমে অন্ধকারে বীরেন্দ্র কিছুই দেখতে পায় না—তার পর যখন ঝুলন্ত দড়ির মত উড়নীটা চোখে পড়ে, সমস্যা হলো কেমন করে সেটাকে ধরবে সে। ধরতে হলে এক হাতে ঝুলতে ঝুলতে অন্য হাত বাড়িয়ে উড়নীটা ধরতে হয় কিন্তু হাতে তো সে শক্তি আর নেই। তাছাড়া এক হাতে যদি সে ঝুলে না থাকতে পারে—যদি অবশ শিথিল হাত তার ফসকে যায়—

বীরেন্দ্র—কই ধর—ধর উড়নী—পার্বতীর উত্তেজিত কণ্ঠস্বর আবার শোনা যায়। একদিকে জীবনের ক্ষীণতম আশ্বাস, অন্যদিকে ভয়াবহ অবশ্যম্ভাবী মৃত্যু। জীবন ও মৃত্যুর মধ্যে যেন ক্ষীণ সূক্ষ্ম এক যোগসূত্র।

এদিকে হাতও অবশ হয়ে এসেছে যে রকম—বেশীক্ষণ আর যুঝতেও সে যে পারবে না তাও বুঝতে পারছিল বীরেন্দ্র। মৃত্যুই হয়তো তার একমাত্র পরিণতি—তবে মৃত্যুর পূর্বে শেষ চেষ্টাই বা সে করবে না কেন ? আর যদি

মৃত্যুই হয় তো পার্বতীর জন্যই না হয় সে মৃত্যু বরণ করল। চোখ বুজে ডান হাতটা দিয়ে কার্নিসটা ধরে বাঁ হাতটা বাড়িয়ে কার্নিস থেকে ছাড়িয়ে এগিয়ে দিল। আর সঙ্গে সঙ্গে ডান হাতটার মুঠিও কার্নিস থেকে খুলে গেল। শেষবারের মত যেন কানে এলো পার্বতীর উদ্বিগ্ন কণ্ঠস্বর—বীরেন্দ্র—

॥ ৩ ॥

রাজজ্যোতিষী কর্ণদেবের ভবিষ্যৎবাণী মিথ্যা নয়, সত্যিই ভারতের ভাগ্যাকাশে মেঘ সঞ্চারিত হচ্ছিল। কাবুল। সুদূর কাবুল থেকে বুঝি সেই মেঘ সঞ্চারিত হচ্ছিল।

হিন্দুস্থান থেকে অনেক দূরের পথ। চারিদিকে কেবল পাহাড় আর পাহাড়। ...শীতকালে কাবুলে প্রবেশ ও নির্গমনের সমস্ত রাস্তাগুলি প্রচণ্ড বরফ পড়ে বন্ধ হয়ে যায়—মাত্র একটি ছাড়া। বিচিত্র ঐ দেশ কাবুল—উষ্ণ ও শীতপ্রধান অঞ্চলগুলো পাশাপাশি—কোথাও রীতিমত গ্রীষ্ম কোথাও অবিরাম তুষারপাত।

কাবুল শস্যসম্পদসমৃদ্ধ নয়। তবে ফলের প্রাচুর্য চারিদিকে—গাছে গাছে আঙুর থোকা থোকা কালো সবুজ—লাল সবুজ ডালিম—খুবানী লাল আপেল—আখরোট আর পীচ। তারই ফাঁকে ফাঁকে আবার জহিরুদ্দীন মুঘল সম্রাট মহম্মদ বাবুর—মীর্জা বাবুর, কাবুলের অধীশ্বর—চেরীগাছ এনে পুঁতে দিয়েছিল।

কাবুলের অধীশ্বর তখন জহিরুদ্দীন মহম্মদ বাবুর। এক দুর্ধর্ষ আশাবাদী মুঘল যুবক। বিরাট বাজার কাবুলের। ১৫০৪ খৃঃ রবিয়ল মাসের শেষের দিকে বাবুরের দখলে আসে কাবুল ও গজনী। এবং সেই সময়ই একবার মীর্জা বাবুর মনে মনে সঙ্কল্প করে সে হিন্দুস্থান আক্রমণ করবে।

সূর্য তখন মীন রাশিতে—শাবান মাসে একদল সশস্ত্র অশ্বারোহী মুঘল সৈন্যবাহিনী নিয়ে বাবুর হিন্দুস্থানের দিকে যাত্রা শুরু করে, সোনার দেশ ভারতকে লুণ্ঠনের লালসায় বোধ করি।

প্রথমে আদিনাপুর—তারপর খাইবার গিরিবর্ত্ম। সেখানে থেকে চলতে চলতে কোহাট—কোহাটে লুঠপাট করে বান্নুর দিকে অগ্রসর হয় বাবুর তার দুর্ধর্ষ তুর্কী লুঠেরা দলবল নিয়ে। আফগানরা বাবুরের অগ্রগতিকে প্রতিরোধ করবার চেষ্টা করেছিল বটে কিন্তু ব্যর্থকাম হয়ে পালায় প্রাণভয়ে।

কিন্তু সেবারে শেষ পর্যন্ত—সিন্ধুনদ ও ডেরাগাজী খাঁ থেকে ফিরে আসতে বাধ্য হয়েছিল বাবুর তার দলবল নিয়ে হতাশা ও পথশ্রমে ক্লান্ত হয়ে হিন্দুস্থানের সীমানা থেকে। কিন্তু হিন্দুস্থানের যে স্বপ্ন মনের মধ্যে বাবুরের বাসা বেঁধে- সে স্বপ্ন মন থেকে কোন দিনই বুঝি তার মুছে যায় নি।

বার বার হিন্দুস্থানের শস্যসম্পদ ও ধনসম্পদ তাকে হাতছানি দিয়েছে। তাছাড়া ক্রমাগত যুদ্ধ আর যুদ্ধ তাকে বোধ হয় ক্লান্তও করে তুলেছিল। একটা

নিশ্চিন্ত নির্ভরযোগ্য আশ্রয়ের জন্য মনে মনে বোধ করি বাবুর তৃষ্ণার্ত হয়ে উঠেছিল পরবর্তীকালে এবং হয়ত ভেবেছিল হিন্দুস্থানের মাটিতে মিলবে তার সেই নিশ্চিন্ত আশ্রয়।

কিছুদিন থেকেই বাবুরের মনে এতটুকু শান্তি ছিল না। যে সমরখন্দ ও হিসার বহুকষ্টে—বহু রক্তপাতে বাবুর অধিকার করেছিল এবং জীবনের সর্বাপেক্ষা বড় শত্রু ও সমস্ত দুর্গতির কারণ যে সেবানী খাঁর মৃত্যুতে বাবুর নিজেকে নিষ্কণ্টক ও নিশ্চিন্ত ভেবেছিল—সে স্বপ্ন কয়েক বছরের মধ্যেই মিলিয়ে গেল।

মাত্র কয়েকদিন আগে দুর্ধর্ষ উজবেগদের হাতে তার পুনরায় নির্মম পরাজয় ঘটেছে—ও সেই সঙ্গে আবার সমরখন্দ হারিয়ে বাবুর কাবুলে লজ্জায় মাথা নিচু করে ফিরে এসেছে। নির্জন 'কিলকিনে' বসে সেই কথাই ভাবছিল বাবুর।

অতঃ কিম্। এমনি করে কতকাল আর বাবুর ভাগ্যের সঙ্গে যুদ্ধ করবে। এই অনিশ্চয়তার মধ্যে আর কতকাল কাটবে। এই যাযাবর জীবনই কি তার শেষ পরিণতি।

বিরাট একটা ফোয়ারা থেকে ঝর ঝর করে জল ঝরছে। পাহাড়ের কিনারে কিনারে তারই তৈরী ছোট বড় সব ফোয়ারা। তার মধ্যে ঐ ফোয়ারাটাই সব চাইতে বড়। জল যখন পড়ে ঐ ফোয়ারা থেকে, চারিদিকে অসংখ্য জলকণা ছড়িয়ে ছড়িয়ে যেন একটা মেঘের মত সৃষ্টি করে।

চারিদিকে অজস্র চেরী আর খুবানী ফলের গাছ। সেই সব গাছে গাছে লাল ও লাল রংয়ের ছিট দেওয়া পীতবর্ণের ফুল ফুটে রয়েছে। চিরদিন মনে হয়েছে বাবুরের, এই তো স্বর্গ, এই তো বেহস্ত।

অল্পদূরে গালিচার উপর এক পাশে বীণ যন্ত্রটি রেখে নিঃশব্দে বসে আছে বাবুরের প্রিয় সহচর প্রবীণ বাদক—নুরউল্লা। এতক্ষণ বীণ বাজাচ্ছিল নুরউল্লা। সম্রাট বাবুরকে অন্যমনস্ক দেখে বীণ বাজানো থামিয়েছে। পাশে সুরাভর্তি পাত্র। অবহেলিত সুরাপাত্র।

খোদাবন্দ্—

ফিরে তাকাল বাবুর—কিছু বলেছিলে নুরউল্লা?

হ্যাঁ—পাদশাকে যেন বিশেষ চিন্তিত দেখছি—আজই নয় কেবল—কিছুদিন থেকেই যেন আপনি চিন্তিত, অন্যমনস্ক—

জান নুরউল্লা—গত রাত্রের সেই বিচিত্র স্বপ্নটা আবার আমি দেখেছি—

বিচিত্র স্বপ্ন! নুরউল্লার কণ্ঠে বিস্ময়।

হ্যাঁ, মনে নেই তোমার—তোমাকেও বলেছিলাম সে বিচিত্র স্বপ্ন-কথা—বাবুর বলতে লাগল, সেবার যখন আমি সমরখন্দ হারিয়ে, উজবেগদের কাছে পরাজিত ও পর্যুদস্ত হয়ে কেম্ থেকে হিসারের দিকে চলেছি—সেই সময় বিচিত্র স্বপ্নটা এক বসন্ত রাত্রে আমি দেখি প্রথম। মহামতি খাজা আবদাল্লা যেন আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন। তাঁকে অভ্যর্থনা করতে আমি এগিয়ে গেলাম—খাজা ভিতরে এসে বসলেন। তার জন্য একটা যেন টেবিল পাতা ছিল কিন্তু সেটা তেমন পরিচ্ছন্ন ছিল না—তাতে করে সেই নিষ্ঠাবান ধার্মিক যেন একটু ক্ষুন্ন

হলেন। মোল্লা বাবা ঐ সময় আমার পাশেই ছিলেন, ব্যাপারটা তিনি বুঝতে পেরে আমায় ইশারা করতেই আমি খাজাকে ইঙ্গিতে জানালাম দোষটা আমার নয়, যে টেবিল সাজিয়েছে তার। খাজা সাহেব আমার কথাটা বিশ্বাস করলেন—আবার প্রসন্ন হয়ে উঠলো তাঁর মুখখানি। তিনি তখন উঠে দাড়ালেন—আমি তখন সমাদরের সঙ্গে তাঁকে বাইরে নিয়ে এলাম।

তারপর ?—নুরউল্লা শুধায়।

সেই সময় হঠাৎ তিনি তাঁর দু হাত দিয়ে আমাকে জড়িয়ে ধরে এমন উঁচুতে তুলে ধরলেন যে আমার পা মাটি থেকে উঠে গেল। এবং তুর্কী ভাষায় আমাকে বললেন, "তোমার ধর্মগুরু তোমাকে উপদেশ দিয়েছেন।" ঐ স্বপ্ন দেখবার কয়েকদিন পরেই আমি সমরখন্দ দখল করি—

এবারও নিশ্চয়ই তাহলে পাদশা আপনি সমরখন্দ পুনরায় দখল করবার পূর্বে ইঙ্গিতই পেয়েছেন মহামতি খাজা আবদাল্লার কাছ থেকে—, সোল্লাসে বলে ওঠে বীণাবাদক নুরউল্লা।

না নুরউল্লা—সে ইঙ্গিত আমি পাই নি স্বপ্নে খাজা সাহেবের কাছ থেকে।

তবে কি পেয়েছেন ?

এবার ঠিক কি যে তিনি বললেন তা যেন আমি বুঝতেই পারলাম না—যেমন অস্পষ্ট তেমনি দুর্বোধ্য—তবে তার মধ্যে একটি কথা স্পষ্ট শুনেছিলাম মনে আছে—

কি কথা জাঁহাপনা ?

হিন্দুস্থান—

হিন্দুস্থান ?—প্রশ্নটা করে কেমন যেন বোকার মতই তাকিয়ে থাকে নুরউল্লা সম্রাটের মুখের দিকে ?

হ্যাঁ—তাই আমি ভাবছি—বোধ হয় এই তিনি বলে গেলেন—ঐ হিন্দুস্থানের মাটিই দেবে আমায় নিশ্চিন্ত আশ্রয়। হিন্দুস্থান—

কিন্তু সে তো আপনার মুখেই শুনেছি দীর্ঘ দুর্গম পথ—

তাই—

পাহাড়ে পাহাড়ে—গিরিবর্ত্মে বর্ত্মে আফগান লুঠেরারা সর্বক্ষণ ওত পেতে আছে—

তা হোক—তবু—

'অসময়ে যে অলস কাজ শুরু করে
সে কাজ নিষ্ফল হয় তার।
কর্মী যে জন, ঝাঁপ দিয়ে সুযোগ সে ধরে
পূর্ণ তার জীবন-সম্ভার।'

ঠিক—ঠিক বলেছেন পাদশা—

কে—

বাবুর ফিরে তাকিয়ে দেখে তার দোস্ত—তার বন্ধু—বাবুরী।

বাবুরী—তুমি যাও নি—তুমি যে বলেছিলে ক্যাম্প বাজারে চলে যাবে ?

যেতে আর পারলাম কই জাঁহাপনা ; আপনার দশা যে আমারও ! আপনিই তো বলেছেন,

'চলে যাওয়ার শক্তি নাই
থাকতেও না পারি ।
কি দশায় ফেলেছ প্রিয়
লাজে আমি মরি ।'

বীণ-বাদক নূরউল্লা হেসে ওঠে ।

বাবুরী তাড়াতাড়ি বলে, সন্ধ্যা হয়েছে আর এখানে এসময় থাকা যুক্তিসংগত নয় পাদশা, আপনার শত্রু চারিদিকে—তাছাড়া ঐ দেখুন ইব্রাহিম বেগ এইদিকেই আসছে—নিশ্চয়ই সম্রাজ্ঞী আপনাকে স্মরণ করেছেন—

ইব্রাহিম বেগ এসে সেলাম দিল ।

কি খবর ইব্রাহিম বেগ !

বেগম সাহেবা আপনাকে এবারে প্রাসাদে ফিরতে বলেছেন—বেগম সাহেবা অর্থাৎ আইষা সুলতানা বেগম । সম্রাজ্ঞী । বাবুরের প্রধানা বেগম ।

ভ্রূযুগল কুঞ্চিত হয়ে ওঠে সঙ্গে সঙ্গে বাবুরের বেগম সাহেবার নাম শুনে । বলে, যাও ইব্রাহিম—তোমার বেগম সাহেবাকে গিয়ে বল নিজেকে রক্ষা করতে বাবুর অপটু নয়—যাও—

বাবুরের মনের মধ্যে যখন হিন্দুস্থানের রঙিন স্বপ্ন জাল বুনে চলেছে—দিল্লীর তক্তে তখন সুলতান ইব্রাহিম লোদীর ভাগ্যাকাশেও যে পুঞ্জ পুঞ্জ মেঘের সঞ্চার হচ্ছিল এবং চারিদিক থেকে তার পতন ক্রমশঃ অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠেছিল বাবুর সেটা জানতে পারে নি তখনো । ভাবতেও পারে নি তখন মুঘল যুবক বাবুর সেদিন যে হিন্দুস্থানে তাইমুর বংশের রাজ্যস্থাপনের দিন সমাগত । ভাবতেও পারে নি বাবুর যে বার বার ভাগ্যের হাতে নিপীড়িত—পর্যুদস্ত তার জন্য ভাগ্যদেবী হিন্দুস্থানের মাটিতেই সোনার সিংহাসন পেতে রেখেছেন !

ভাগ্যাকাশের অন্ধকার তার অবসানপ্রায় ।

মুখে যাই বলুক, বাবুর আইষা সুলতানা বেগমকে বোধ হয় সত্যিসত্যিই একটু ভয় করত । মুখে কিছু বলে না বা প্রতিবাদও জানায় না সুলতানা বেগম, কিন্তু সুর্মা টানা ডাগর দুটো আঁখি ওর মুখের ওপরে ন্যস্ত করে এমন ভাবে চেয়ে থাকে যে মনে হয় বাবুরের সুলতানা যেন তাকে সম্মোহন করছে । বাবুর যেন কিছুতেই মাথা তুলতে পারে না তার সামনে গিয়ে দাঁড়ালে । নিজের অজ্ঞাতেই সুলতানার ইচ্ছায় সায় দেয়—শুধু তাই বা কেন—বাবুর কি সত্যিসত্যিই মনে মনে ঐ সুলতানা বেগমকে ভালবাসে না ?

সুলতান আমেদের কন্যা আইষা সুলতানা বেগমের সঙ্গে বাবুরের পিতা ও খুল্লতাত জীবিত থাকতে থাকতেই তার বিবাহের ব্যবস্থা পাকাপাকি ঠিক হয়ে গিয়েছিল । সুলতানা বেগম তখন কিশোরী—

খোজেন্দে পেঁছেই শাবান মাসে তাদের বিবাহ হয়েছিল । আর ঠিক ঐ সময়ই তার জীবনে এসেছিল বাবুরী । বাবুরী যেন অকস্মাৎ তার জীবনে এসে

তার সমস্ত ভালবাসাকে নিংড়ে কেড়ে নিয়েছিল মুহূর্তে—যার ফলে সুলতানা ও বেগমের আকর্ষণ ও ভালবাসাও সেদিন তার কাছে তুচ্ছ হয়ে গিয়েছিল।

উঠে দাঁড়িয়ে প্রাসাদের দিকে চলতে চলতে বাবুর যেন কেমন অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিল। হঠাৎ অশ্বক্ষুরধ্বনি তার চিন্তাজালকে ছিন্ন করে। আসন্ন সন্ধ্যার আবছায়া অন্ধকারে চারিদিকের পাহাড়, উপত্যকা ও বন ধূসর হয়ে এসেছে। সেই ধূসর অন্ধকারেই নজরে পড়লো এক অশ্বারোহী তাদের দিকেই এগিয়ে আসছে।

বাবুরীই বলে, মনে হচ্ছে যেন আশ্বারোহী মোল্লা মুরসিদ সম্রাট—

বাবুরও চিনতে পেরেছিল অশ্বারূঢ় মোল্লা মুরসিদকে দূর থেকে অশ্বপৃষ্ঠে।

মোল্লা মুরসিদ হঠাৎ মাসখানেক পূর্বে উধাও হয়ে গিয়েছিল না? বাবুরী শুধায়।

বীণবাদক নূরউল্লা বলে, হ্যাঁ—

বাবুর কিন্তু নীরব।

মোল্লা মুরসিদ পাদশার সামনে এসে অশ্বপৃষ্ঠ থেকে ভূমিতলে অবতরণ করে নত হয়ে বাবুরকে সেলাম জানায়, পাদশা দীর্ঘজীবী হোন—

বাবুর বলে, মোল্লা মুরসিদ মনে হচ্ছে তুমি ক্লান্ত—

হ্যাঁ পাদশা, দীর্ঘ পথশ্রমে আমি কিছু ক্লান্ত সত্য কিন্তু তাহলেও আপনার নিকটে সকল সন্দেশ না পেশ করে—

বাবুরী ও নূরউল্লা পরস্পর পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে। মোল্লা মুরসিদের কথাগুলো তাদের দুজনার কাছেই যেন কেমন দুর্বোধ্য ঠেকে।

বৎসর খানেক পূর্বে পাদশার প্রিয় ও বিশ্বস্ত সহচর মোল্লা মুরসিদ হঠাৎ কাবুল থেকে অদৃশ্য হয়েছিল—পাদশাকে নানাভাবে প্রশ্ন করেও কোন সদুত্তর পায় নি তখন ওরা। তবে এখন তারা বুঝতে পারছে পাদশারই কোন বিশেষ কাজের ভার নিয়ে মোল্লা মুরসিদ কাবুলের বাইরে কোথাও গিয়েছিল।

কিন্তু কোথায়! এবং কি কাজে?

ইতিমধ্যে অন্ধকার আরো ঘন হয়ে বাদুড়ের কালো ডানার মত চারিদিকে বিস্তৃত হয়ে সব কিছু দৃষ্টির অগোচর করে ফেলেছিল।

বাবুর বলে, চল মোল্লা, প্রাসাদের বিশ্রামকক্ষে গিয়ে তোমার সব কথা শোনা যাবে—

বাবুর আগে আগে অগ্রসর হয়—তাকে অনুসরণ করে—বাবুরী, নূরউল্লা এবং মোল্লা মুরসিদ। মুরসিদ বলে, আপনি যদি অনুমতি করেন তো শাহানশা আমি একটিবার আমার গৃহে ঘুরেই আসছি—

তাই এসো—কিন্তু বিলম্ব করো না।

না আমি যাবো আর আসবো—বলে চকিতে অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করে মোল্লা অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেল।

নাতিপ্রশস্ত বিশ্রামকক্ষ। মেঝেতে পুরু জাজিম পাতা। কক্ষের কোণে

দীপাধারে দীপ জ্বলছে। তারই আলোয় ঘরটি আলোকিত। এক পাশে পাত্রে সুরা ও পানপাত্র ছিল—বাবুর নিজের পানপাত্রে সুরা ঢেলে চুমুক দিতে দিতে মোল্লা মুরসিদের দিকে তাকিয়ে বলে, বল মোল্লা, হিন্দুস্থানের খবর কি? কি সংবাদ তুমি সংগ্রহ করে এনেছো?

মোল্লা মুরসিদ বলে, পাদশা, যেটুকু সংবাদ আমি সংগ্রহ করতে পেরেছি—দিল্লীর সুলতান ইব্রাহিম লোদীর ব্যাপারে আপনার বিশেষ চিন্তিত হবার বোধ হয় কোন কারণ নেই—

সত্যি বলছো মোল্লা? কৌতূহলী বাবুর মোল্লার মুখের দিকে তাকায়।

হ্যাঁ সম্রাট, তার সিংহাসনের ভিতে সত্যিই ঘুণ ধরেছে বলেই আমার অনুমান—তার প্রধান কারণ যতদূর বুঝতে পারলাম রাজ্যশাসনের ব্যাপারে তার অপটুতা ও দূরদর্শিতার অভাব তার চরিত্রে—আর সেই সুযোগ নিয়েই লুঠেরা আফগানরা এদিক ওদিক সর্বত্র সর্বদাই প্রায় হানা দিয়ে লুঠপাট করে বেড়াচ্ছে। তার ফলে তার সবচাইতে বড় সহায় রাজ্যের শক্তিশালী আফগান আমীররা যারা এযাবৎকাল তার দক্ষিণহস্ত স্বরূপ ছিল তার উপরে বিরক্ত হয়ে গঙ্গার অপর পারে চলে গিয়েছে—

সত্যি বলছো মোল্লা—সত্য এ সংবাদ? উদ্‌গ্রীব হয়ে ওঠে বাবুর।

হ্যাঁ জাঁহাপনা—বাদবাকী হিন্দুস্থানের বঙ্গদেশ, মালব ও গুজরাট স্বাধীন রাজার অধীনে—তার কিছু শক্তি আছে কিন্তু সত্যিকারের শক্তি বলতে রাজস্থানে—

কি রকম?—

রাজস্থান বা রাজোয়ারা বিশাল এক ভূখণ্ড—একদিকে তার পাহাড় আর একদিকে ধূ ধূ মরুভূমি—মেওয়ার, মাড়বার, বিকানীর, কোটা, অম্বর ও যশল্মীর—সমগ্র হিন্দুস্থানের বিশেষ চিহ্নিত ঐ অংশে যারা থাকে সেই রাজপুতরাই হচ্ছে প্রকৃত যোদ্ধা—

বল থামলে কেন?

ওদের মধ্যে, মোল্লা আবার বলে, বিশেষ শক্তিশালী হচ্ছে মেওয়ার ও মাড়বার এবং তাদের অধীশ্বর—

কে তারা?

মেওয়ারের রানা—রানা সঙ্গ—বা সংগ্রাম সিংহ—আর মাড়বারের রাও সুরজমল ও তার পৌত্র গাঙ্গা—

ওখানকার আবহাওয়া, শস্যসম্পদ ও সৈন্যবল?

আবহাওয়া অপূর্ব—গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শীত, বসন্ত এক এক ঋতুতে সেখানকার এক এক রূপ—আর শস্যসম্পদের কথা যদি বলেন জাঁহাপনা—হিন্দুস্থানের মাটিতে সোনা ফলে, মাঠে মাঠে তার ফসল অপর্যাপ্ত আর গৃহস্থের ঘরে ঘরে পূর্ণ খাদ্যভাণ্ডার—

তবে তো দেখছি হিন্দুস্থানকে করায়ত্ত করা রীতিমত কষ্টসাধ্য হবে মোল্লা—

হয়ত নাও হতে পারে শাহানশা।

কিসে বুঝলে ?

হিন্দুস্থানের লোকেরা বিশেষ করে যাদের দেখবার বেশী সুযোগ পেয়েছি সেই আফগানরা এক অদ্ভুত নির্বোধ জাত—যেমন না আছে তাদের কোন দেশপ্রীতি তেমনি না আছে দূরদৃষ্টি বা কোন চিন্তাশক্তি। বীরের মত তারা যুদ্ধও চালাতে পারে না আবার বন্ধুত্ব ও সৌহার্দ্যের মধ্যেও যে জোট বেঁধে থাকতে চায় তাও নয়—তাছাড়া দিল্লীতে ইব্রাহিম লোদীর কথা তো আপনাকে পূর্বেই বলেছি এবং বলেছি আফগান আমীরদের কথা।

কিন্তু—

পাদশা, এখনো আমার সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় সংবাদটিই আপনার কাছে পেশ করি নি—সেটা হচ্ছে পাঞ্জাবের অধীশ্বর দৌলত খাঁ এবং তার দুই পুত্র গাজি খাঁ ও দিলওয়ার খাঁর কথা—

তারা কি ?

বলবো জাঁহাপনা—কিন্তু সর্বসমক্ষে নয়—বলে মোল্লা কক্ষমধ্যে উপস্থিত নূরউল্লা ও বাবুরীর দিকে দৃষ্টিপাত করে।

বাবুর ইঙ্গিতটা বুঝতে পেরে ওদের দুজনকে চোখের ইঙ্গিত করে কক্ষ ছেড়ে যাবার জন্য—নূরউল্লা ও বাবুরী নিঃশব্দে কালবিলম্ব না করে সঙ্গে সঙ্গে কক্ষ হতে নিষ্ক্রান্ত হয়ে যায়।

বল এবারে কি বলছিলে ? বাবুর মোল্লার দিকে তাকাল।

আলমপনা, আপনাকে একটু আগেই বলেছি দিল্লীশ্বর ইব্রাহিম লোদীর ওপরে অসন্তুষ্ট হয়ে অনেক আফগান আমীর তাকে ত্যাগ করে গিয়ে স্বাধীন হয়েছে—

হ্যাঁ, কিন্তু গাজি খাঁ ও দিলওয়ার খাঁর কথা কি বলছিলে ?

উচ্চাভিলাষী—স্বার্থান্ধ ঐ দুই খাঁও এই সুযোগে নিজেদের স্বাধীন বলে ঘোষণা করতে চায় এবং আপনাকে ঐ অপূর্ব সুযোগটুকুই নিতে হবে—

এতক্ষণ বোধ করি বুদ্ধিমান বাবুরের কাছে মোল্লার ইঙ্গিতের নিহিত অর্থটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। উল্লাসে তার চোখের তারা উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

মোল্লা মুর্সিদ—

হ্যাঁ, পাদশা—আমি ঠিক তাই বলতে চাই। ঐ সুযোগটুকুরই আমাদের সদ্ব্যবহার করতে হবে দিল্লীর সম্রাট ইব্রাহিম লোদীকে সিংহাসনচ্যুত করতে—ঐটাই হবে আমাদের প্রধান অস্ত্র—কাঁটা দিয়ে কাঁটা তুলতে হবে—ওদের উচ্চাশাই হবে আমাদের হাতিয়ার—

হয়ত হবে কিন্তু—

এবং সেই হাতিয়ার ব্যবহারে যে আমাদের প্রধান সহায় হবে—এইবার পাদশার সামনে তাকেই আমি পেশ করব—পেশ করব সেই মূল্যবান সম্পদটি যা আমি সম্রাটের জন্য হিন্দুস্থান থেকে সংগ্রহ করে এনেছি—

মোল্লা—

মোল্লা মুর্সিদ অতঃপর দুই হাতে মৃদু তালি দিতেই সর্বাঙ্গ কালো রেশমী

বোরখায় আবৃত এক নারীমূর্তি মন্ত্রণা-কক্ষে এসে প্রবেশ করল।

সচকিত হয়ে ওঠে পাদশা বাবুর আকস্মিক সেই বোরখায় আবৃত নারীমূর্তির আবির্ভাবে? মৃদু কণ্ঠে প্রশ্ন করে—কে? এ কে মোল্লা?

মোল্লা পাদশার প্রশ্নের কোন জবাব না দিয়ে নিঃশব্দে কেবল নারীমূর্তির সামনে এগিয়ে গিয়ে তার বোরখা উন্মোচন করল। সঙ্গে সঙ্গে মৃদু দীপালোকিত কক্ষ যেন বোরখা-উন্মোচিত সেই নারীর অসামান্য রূপে ঝলমল করে ওঠে। আহা, মরি মরি কি রূপ!

বাইশ থেকে পঁচিশের ঊর্ধ্বে বয়স নয়—যৌবন ঢল ঢল অসামান্যা এক রূপসী—রূপ যেন তার দেহের প্রতি অঙ্গে অঙ্গে ঝরে পড়ছে। চারু ললাট—বঙ্কিম ভ্রূ—সুর্মাটানা বিলোলকটাক্ষ-ভরা স্বপ্নমদির দুটি আঁখি। পীনোন্নত বক্ষ রক্তলাল কাঁচুলীতে আবৃত—বাঁধুলী পুষ্পের ন্যায় দুটি রক্তিম ওষ্ঠে হাসির বিদ্যুৎ যেন ঝিলিক হানছে। কে ও—বেহেস্তের হুরী না স্বর্গের পরী?

অবাক বিস্ময়ে চেয়ে থাকে পাদশা বাবুর—বাক্যহারা নিস্পন্দ সেই অনিন্দ্য-সুন্দর রূপলাবণ্যের দিকে। তারপর মৃদু, অতি মৃদু কণ্ঠে শুধায় বাবুর, কে—কে তুমি—

বীণা-নিন্দিত কণ্ঠে জবাব দেয় নারী, আরো মৃদু কণ্ঠে—আভূমি কুর্নিশ জানিয়ে সম্রাটকে, জিন্দেগী জাঁহাপনা—

কে তুমি?

নাম আমার মরিয়ম—

না—তোমার নাম মরিয়ম হতে পারে না—রমণীরত্ন তুমি, নাম হোক তোমার আজ হতে জেবউন্নিসা—

না আলমপনা—আমি রমণীরত্ন নই—সামান্যা নর্তকী মরিয়ম। আমাকে আপনি মরিয়ম বলেই ডাকবেন।

বাবুরের ওষ্ঠপ্রান্তে মৃদু হাসি জেগে ওঠে।

॥ ৪ ॥

পার্বতীর সেই মধুর ডাকটি যেন বীরেন্দ্রর মনে হলো বহুদূর হতে তার কর্ণকুহরে একটা মধুর সংগীতের ঝাপটা দিয়ে গেল। বীরেন্দ্র তখন মাধ্যাকর্ষণের প্রবল টানে নীচের দিকে চলেছে। ঘটনার আকস্মিকতায় ও ভারে তার সমস্ত শরীর অসাড় হয়ে গিয়েছে—সমস্ত বোধশক্তি অসাড় হয়ে গিয়েছে। মৃত্যু—অবশ্যম্ভাবী মৃত্যুর হাতে তখন সে শেষবারের মত সেই নিরালম্ব শূন্যতার মাঝে নিজেকে সঁপে দিয়েছে।

সব বুঝি মুহূর্তের জন্য মুছে যায়—শুধু অন্ধকার—সীমাহীন ছেদহীন একটা ভয়াবহ অন্ধকার যেন তাকে গ্রাস করে। আর ঠিক সেই মুহূর্তে—হঠাৎ একটা হেঁচকা টানে সেই ভয়াবহ অন্ধকার ও শূন্যতার মধ্যে যেন সে সংবিৎ ফিরে পেল। এবং উপলব্ধি করল জীবনের শেষ আকাঙ্ক্ষা দিয়ে রেশমী উড়নীটার

একাংশ শক্ত মুষ্টিতে ধরে তখন সে দুলছে অন্ধকার শূন্যে।

দুলছে বীরেন্দ্র। মানুষের বাঁচবার স্পৃহাটা বুঝি সদা সক্রিয় অবচেতন মনে। তাই হেঁচকা টানে স্থির হয়ে দুলতে দুলতে পরমুহূর্তেই তার মনে পড়ে—বেঁচে গিয়েছে সে এবং অবলম্বন তার মুঠোর মধ্যে। তাড়াতাড়ি ডান হাতটা বাড়িয়ে বাঁ হাতে যে উড়নীর অংশটা এতক্ষণ নিজের অজ্ঞাতেই ধরে ছিল, সেটা আরো শক্ত করে চেপে ধরে। সেই সময় আবার কানে আসে সেই ডাক, বীরেন্দ্র—অনেক দূরে অস্পষ্ট ডাকটা।

কয়েকটা মুহূর্ত ঐ ভাবে দুলতে দুলতেই বীরেন্দ্র বুঝতে পারে, বাঁচতে হলে হস্তধৃত ঐ অবলম্বনটুকুকেই ধরে, যত ক্লেশ বা পরিশ্রমই হোক, ঝুলতে ঝুলতে তাকে উপরের দিকে উঠবার চেষ্টা করতে হবে। ঐ অবলম্বন পার্বতীরই দেওয়া। মুহূর্তে মনঃস্থির করে নেয় বীরেন্দ্র, তারপর মনের ও দেহের সমস্ত শক্তি শেষ-স্নায়ুর মত কেন্দ্রীভূত করে সেই অবলম্বন ধরে ধরেই পুনরায় উপরদিকে দুলতে দুলতে—ঝুলতে ঝুলতে উঠতে থাকে।

কক্ষের মধ্যে পার্বতী তখন উড়নীর অন্য প্রান্ত নিজের কোমল কটিদেশে জড়িয়ে সেটা তার কোমল দুটি হাতে ধরে উড়নীর অন্য প্রান্তের ভারসাম্য রাখবার চেষ্টায় প্রায় মেঝের পরে শুয়ে পড়েছিল। দুটি পা কক্ষের দেওয়ালে স্থাপিত। দম বন্ধ করে পার্বতী যুঝছিল নিজের সঙ্গে।

উড়নীর অন্য প্রান্তের প্রবল আকর্ষণ থেকেই বুঝতে পারছিল বীরেন্দ্র ধরতে পেরেছে তার দেওয়া অবলম্বন। নিশ্চয়ই সে উঠে আসছে—মা ভবানী, রক্ষা করো মা বীরেন্দ্রকে। নিজের সঙ্গে যুঝতে যুঝতে সে মা ভবানীকেই কেবল মনে মনে ডাকছিল।

হাত দুটো টানে যেন ছিঁড়ে পড়তে যায়। অসহ্য ব্যথায় টন টন করে। চামড়া ফেটে গিয়ে রক্ত ঝরছে তাও বুঝতে পারে পার্বতী, কিন্তু তবু হার স্বীকার তো সে করতে পারে না। রাজপুত রমণী সে।

মা ভবানী মুখরক্ষা করলেন তার। বীরেন্দ্র একসময় সেই গবাক্ষ-পথ দিয়েই পরিশ্রান্তিতে হাঁপাতে হাঁপাতে কোনমতে এসে কক্ষমধ্যে পুনরায় প্রবেশ করে বসে পড়ল। তারও দুটি হাত তখন ক্ষতবিক্ষত—অসহ্য জ্বালায় টন টন করছে।

কিন্তু সে পুরুষ, শীঘ্রই নিজেকে সামলে নিয়ে সে কোনমতে উঠে দাঁড়ায়। পার্বতী তখনো দেওয়ালে হেলান দিয়ে মুদ্রিত চক্ষে হাঁপাচ্ছে।

সামনে এসে দাঁড়াল বীরেন্দ্র।

পার্বতী—

পার্বতী কোনমতে চোখ মেলে তাকাল, বল—

পরক্ষণেই সহসা কক্ষের প্রদীপালোকে পার্বতীর রক্তাক্ত কোমল দুটি হাতের প্রতি নজর পড়তেই চমকে ওঠে বীরেন্দ্র। বলে, একি হয়েছে পার্বতী—

ও কিছু না—ব্যস্ত হয়ো না তুমি—আগে চলো কোনমতে তোমায় দুর্গ-

প্রাসাদের বাইরে পেঁছে দিয়ে আসি—পার্বতী ক্লান্ত কণ্ঠে কথাগুলো বলে উঠে দাঁড়ায়।

বীরেন্দ্র পার্বতীর দুটি কোমল হাত নিজের দু হাতে ধরে বলে, তুমিই আজ আমাকে নবজীবন দিলে পার্বতী—

আমি নয় বীরেন্দ্র—মা ভবানী—তিনিই তোমায় প্রাণ দিয়েছেন—কিন্তু আর দেরি করো না, চল। কিন্তু এ বেশে নয়—

তবে ?

অন্য বেশে, দাঁড়াও—বলে পার্বতী তাড়াতাড়ি একটা ঘাগড়া ও উড়নী এনে ওকে পরতে সাহায্য করে।

অতঃপর প্রাসাদদুর্গের অন্দরণ থেকে অন্তঃপুরিকাদের বাইরে যাবার একটি বিশেষ গোপন পথ ছিল এবং সে পথের সন্ধান অন্তঃপুরিকারা ব্যতীত কেউ জানত না। পার্বতী বীরেন্দ্রকে নারীবেশে সজ্জিত করে সেই পথ দিয়ে নিয়ে চলল।

অপ্রশস্ত—সংকীর্ণ পথ। দুজন পাশাপাশি হেঁটে যাওয়া যায়, তার বেশী নয়। অন্ধকার আঁকাবাঁকা পথ। এদিকে ওদিকে অনেক বাঁক। এবং একমাত্র সে পথের সন্ধান যারা ভাল করে জানে তারাই সে পথ ধরে বাইরে যেতে পারে। অন্য কেউ ঢুকলে পথ হারাবে—তারপর সেই সংকীর্ণ আঁকাবাঁকা পথের মধ্যে জীবনভোর শুধু ঘুরেই বেড়াবে আর বেড়াবে। কোন দিন আর বাইরে বেরুবার রাস্তা খুঁজে পাবে না। অন্ধকার—কোন আলো নেই। কিন্তু পার্বতীর চলতে কোন কষ্ট হচ্ছিল না—সে অনায়াসেই অন্ধকারে এঁকে-বেঁকে বীরেন্দ্রর হাত ধরে এগিয়ে চলছিল।

বীরেন্দ্রর হাঁপ ধরে। সে বলে, আর কত চলতে হবে পার্বতী—শেষ কি নেই—

আরো পথ আছে—কেন ভয় করছে ?

না—

তবে।

আমরা পথ হারাই নি তো।

না—চল—

তারপর একসময় হঠাৎ যেন মনে হলো বীরেন্দ্রর চোখে মুখে একটা ঠান্ডা হাওয়ার স্পর্শ লাগছে।

পার্বতী বলে, এসে গেছি—

সত্যিই তারা সেই সংকীর্ণ গোলকধাঁধা পথের অন্য প্রান্তে এসে পৌচেছে তখন। একটা ভারী পাথরের দরজার কবাট সরিয়ে দুজনে এসে বাইরের খোলা প্রকৃতির তলে দাঁড়াল। মাথার উপরে রাত্রির নিঃসঙ্গ নক্ষত্রখচিত আকাশ।

আর দূরে ঝাপসা আরাবল্লীর শীর্ষ।

এবার আমি তাহলে যাই—

এসো—দুজনা দুজনার কাছ থেকে বিদায় নিল।

পার্বতী সেই পথ দিয়ে ফিরে গেল—বীরেন্দ্র পর্বতের গা বেয়ে নীচের উপত্যকার দিকে নামতে লাগল। নামতে নামতে একসময় অন্ধকারে একটা ক্ষীণ আলোর শিখা বীরেন্দ্রর চোখে পড়ে। আলোর শিখাটা যেন মৃদু মৃদু কাঁপছে। দূরে আকাশে নক্ষত্রের মত যেন কাঁপছে।

দাঁড়াল বীরেন্দ্র। অন্ধকারে ও কিসের আলোর শিখা—ঐ সেই যোগী তাপস মার্কণ্ডেয়র সাধনপীঠ নয় ত! হ্যাঁ—তাই—বিহঙ্গকূট শৈলশিখরে যোগী তাপসের নিভৃত কন্দর! বীরেন্দ্র পর্বতগাত্র বেয়ে অনেকটা নেমে এসেছিল, আবার পর্বতগাত্র বেয়ে সেই আলোর শিখা লক্ষ্য করে উপরের দিকে উঠতে থাকে, এবং অনেক কষ্ট করে হাঁপাতে হাঁপাতে একসময় এসে মার্কণ্ডেয়র সাধনপীঠ—গুহার সামনে উপস্থিত হলো।

গুহামধ্যে প্রদীপ জ্বলছে। বহুদূর থেকে অন্ধকারে ঐ প্রদীপের কম্পিত শিখাই বীরেন্দ্রর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল।

সহসা গুরুগম্ভীর কণ্ঠে প্রশ্ন শোনা গেল, কে—কে ওখানে। যোগীবর মার্কণ্ডেয়র কণ্ঠস্বর। বীরেন্দ্রর পরিচিত ও কণ্ঠস্বর।

বীরেন্দ্র গুহামুখের কাছে এগিয়ে গিয়ে বলে, প্রভু—আমি—

কে—বীরেন্দ্র।

হ্যাঁ—প্রভু—

এই গভীর নিশীথে, কি সংবাদ বৎস। ভিতরে এসো—

বীরেন্দ্র সসম্ভ্রমে চর্মপাদুকা বাইরে খুলে রেখে ভিতরে প্রবেশ করল। অপরিসর একটি গুহা। এক কোণে একটি দীপাধারে দীপ জ্বলছে। তারই মৃদু আলোয় গুহাটি মৃদু আলোকিত, আর এক কোণে মৃত্তিকা-নির্মিত জলপাত্র ও একটি পাথরের থালিতে কিছু ফলমূল রক্ষিত। নাতিউচ্চ একটি শিলাসনের উপর ব্যাঘ্রচর্ম বিছিয়ে এক শীর্ণকায় ব্যক্তি বসে ছিলেন। মাথায় লম্বা লম্বা চুল—মুখভর্তি দাড়িগোঁফ। কটিদেশে সামান্য একটি বস্ত্রখণ্ড ব্যতীত সম্পূর্ণ উলঙ্গ।

কি সংবাদ বীরেন্দ্র?

বীরেন্দ্র আভূমি নত হয়ে শিলাসনে উপবিষ্ট মার্কণ্ডেয়কে প্রণাম করল। প্রভু—আপনার আশীর্বাদ নিতে এসেছি। বীরেন্দ্র বলে।

আশীর্বাদ!

হ্যাঁ, প্রভু—প্রত্যূষে আমি পীপার নগরে যাবো—

পীপার নগরে যাবে?

হ্যাঁ—প্রভু—

মার্কণ্ডেয় স্থিরদৃষ্টিতে কিছুক্ষণ চেয়ে রইলেন বীরেন্দ্রর দিকে, তারপর বললেন, সেখানে গিয়ে কোন লাভ হবে না বীরেন্দ্র—

কেন প্রভু, একথা কেন বলছেন।

পাঠানদের হাতে তোমরা পর্যুদস্ত হবে—

প্রভু—

এ নিয়তির লিখন বৎস—যোধরাওয়ের অহংকারের—পাপের ফল। তোমরা পাঠানদের হাতে পর্যুদস্ত—লাঞ্ছিত হবে—

তথাপি আমাকে যে যেতেই হবে প্রভু—আমাকে আশীর্বাদ করুন—

মার্কণ্ডেয় মৃদু হাসলেন। তারপর ধীরে ধীরে উঠে গুহার তলায় নিভৃত কন্দরে প্রবেশ করলেন।

বীরেন্দ্র আরো কিছুক্ষণ মার্কণ্ডেয়র জন্য অপেক্ষা করে এক সময় গুহা হতে বের হয়ে এল।

পীপার নগর। যোধপুর হতে ন্যূনাধিক পাঁচ ক্রোশ দূরে অবস্থিত। ছোট একটি শহর। পীপার নগরের ইতিহাস শুনেছিল বীরেন্দ্র—খৃষ্টজন্মের পূর্বে অবন্তী নগরে গন্ধর্ব সেন নামে প্রজার বংশীয় এক নৃপতি রাজত্ব করতেন। তিনিই পীপার নগর স্থাপন করেন।

রাত্রির শেষযামে অশ্বারূঢ় বীরেন্দ্র ত্রিশজন সুদক্ষ অশ্বারোহী সৈন্য সমভিব্যাহারে পীপার নগরের দিকে যেতে যেতে পীপার নগরটির কথাই ভাবছিল। ইতিপূর্বে বার দুই পীপার নগরে গিয়েছে বীরেন্দ্র। কিন্তু পার্বতী উৎসবে কখনো যায় নি।

পার্বতী-তৃতীয়া-তিথিতে বিরাট এক উৎসব হয়—পার্বতী উৎসব। পীপার নগরীর মধ্যস্থানে ভবানীর মন্দির। উৎসব প্রধানত মা ভবানীর পূজা উৎসব। প্রতি বৎসর ঐ পার্বতী-তৃতীয়া-তিথিতে মাড়বারের নানা দিক থেকে রাজপুত কুমারীরা এসে মন্দিরে মনোমত পতিলাভের জন্য—সৌভাগ্য লাভের জন্য গৌরীর পূজা করে। কাল সেই পার্বতী-তৃতীয়া-তিথি ও সেই পার্বতী উৎসব।

মন্দিরের পশ্চাতে সুউচ্চ পর্বতশ্রেণী ও গহন অরণ্য। মানুষের পক্ষে দুরোধগম্য—বিপদসংকুল। অবশ্য একেবারে যে কোন পথ নেই সেই দিকে তা নয়। খুব সংকীর্ণ একটি পথ পাহাড়ের গায়ে গায়ে আছে—পাঠানরা যদি আসে ত ঐ পথ ধরেই আসবে।

নগরের কাছাকাছি যখন বীরেন্দ্ররা এসে পৌঁছাল পূব আকাশে আলোর ছোপ ধরেছে। দূর হতে ভেসে আসছে ভবানী মন্দিরের ঘণ্টাধ্বনি ঢং…ঢং…ঢং…। বীরেন্দ্র তার অশ্বের বল্গা টেনে গতিরোধ করল এবং তার ইশারায় তার অনুগামী সৈন্যরাও যে যার অশ্বের বল্গা টেনে থামাল।

শোন, বীরেন্দ্র সৈন্যদের উদ্দেশ করে বলে, আমরা সব একত্রে নগরে প্রবেশ করব না। তোমরা ত্রিশজন সংখ্যায় আছো—চারটি দলে বিভক্ত হয়ে নগরের চারদিকে পাহারা দেবে—দলে সাতজন করে থাকবে তোমরা, কেবল দুজন—করম সিং আর রায়মল, তোমরা আমার সঙ্গে থাকবে।

বীরেন্দ্র নির্দেশ দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সাতজন করে এক-একটি দলে—চারটি দলে বিভক্ত হয়ে নগরের চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল। বাকী দুজনকে নিয়ে বীরেন্দ্র মন্দিরের দিকে অগ্রসর হলো।

মন্দিরের দিকে যত অগ্রসর হয় বীরেন্দ্র—বহু নারীকণ্ঠের সুললিত পূজা-

গীতি শ্রবণ-বিবরে এসে প্রবেশ করে। ইতিমধ্যেই কুমারীরা ভগবতী গৌরীর পূজার জন্য মন্দিরচত্বরে জমায়েত হতে শুরু করেছে—

বীরেন্দ্র ধীরে ধীরে অগ্রসর হতে থাকে—মনটা কিন্তু চঞ্চল বিক্ষিপ্ত। মার্কণ্ডেয় দেব আশীর্বাদ দেন নি। তা ছাড়া তিনি বলেছেন, তোমরা পাঠানদের হাতে পর্যুদস্ত—লাঞ্ছিত হবে—নিয়তির লিখন—যোধরাওয়ের অহংকারের—পাপের ফল।

বিহঙ্গকূটে যোগীবরের সাধনপীঠটুকু কুক্ষিগত করেছিলেন যোধরাও—নাগোর থেকে রাজপীঠ তুলে এনে নতুন করে রাজপীঠ তৈরী করবার সময়—সে কি এতই পাপ।

যোগীবর অভিশাপ দিয়েছিলেন মহারাজকে, আমার সাধনপীঠ—আশ্রমটুকু যেমন তুমি ক্ষমতার দর্পে লোভের বশে ছিনিয়ে নিলে তেমনি অভিসম্পাত রইলো, যোধপুরের জল চিরদিন দূষিত ও কষায় হয়ে থাকবে—পানের অযোগ্য হবে। যোগীবরেরই অভিশাপে কিনা কে জানে, যোধরাও যোধপুরে বিশুদ্ধ জলের ব্যবস্থা সত্যিই করতে পারলেন না এবং অনন্যোপায় হয়েই দুর্গের পাদমূলে বহুনিম্নে এক ক্ষুদ্র সরোবর থেকে একটি নলের সাহায্যে দুর্গে জল আনয়নের ব্যবস্থা করেন।

যোগী সাধক মার্কণ্ডেয় সেই যোগীবরেরই শিষ্য। কে জানে তাঁর গুরুর সেই আক্রোশ যোধপুরের প্রতি—আজো তার শিষ্যের মধ্যে অবর্তিত হয়ে চলেছে কিনা।

হঠাৎ চমক ভাঙল বীরেন্দ্রর। উন্মুক্ত বিশাল মন্দিরপ্রাঙ্গণের একেবারে সামনে এসে তারা পড়েছে।

আনন্দোচ্ছল কুমারী কন্যারা বিচিত্র রঙিন বেশভূষায় পূজার থালি নিয়ে মন্দিরপ্রাঙ্গণে চতুর্দিক হতে এসে ভিড় করছে। ক্রমশঃ ভিড় বাড়ছে।

সেই বিচিত্র আনন্দোৎসবের মধ্যে প্রবেশ করে বীরেন্দ্র বোধ করি কিছুক্ষণের জন্য সব কিছু ভুলে গিয়েছিল। পূজাগীতি আনন্দ কলরোল চারিদিকে—সহসা—সহসা যেন নীল আকাশ থেকে বজ্র নেমে এলো।

বহু অশ্বখুরের প্রচণ্ড শব্দে সহসা চারিদিক সচকিত হয়ে উঠল। খট্ খট্ খটা—খট্—কোথা থেকে যে কি হলো বীরেন্দ্র বুঝতেই পারল না—সহস্র অশ্বারোহী পাঠান সৈন্য মুহূর্তে যেন উত্তাল তরঙ্গমালার মত সেই উৎসবমগ্ন মন্দিরপ্রাঙ্গণে মুক্ত অসিহস্তে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

বহু নারীকণ্ঠের ভয়ার্ত চিৎকারে আকাশবাতাস মথিত হয়। মুহূর্তের জন্য ঘটনার আকস্মিকতায় বুঝি হতচকিত হয়ে গিয়েছিল বীরেন্দ্র—তারপরই কোষবদ্ধ অসি মুক্ত করে সামনের দিকে অগণিত পাঠান সৈন্যের মাঝখানে এগিয়ে যায়। একটি রাজপুত সৈন্য কোথাও নেই—কেবল পাঠান আর পাঠান—

হতচকিত বিমূঢ় কুমারী মেয়েরা এদিক ওদিক ছোটাছুটি করে—কিন্তু বেরুতে পারে না মন্দিরপ্রাঙ্গণ থেকে—প্রধান দ্বারে দশজন পাঠান সৈনিক যেন সাক্ষাৎ মৃত্যুর মত দ্বার আগলে রয়েছে।

চোখের উপরে দেখে বীরেন্দ্র—এক-একটি পাঠান সৈন্য এক-একটি কুমারী কন্যাকে বলপূর্বক তার অশ্বোপরি আকর্ষণ করে তুলে নিয়ে দ্বারপথে ছুটে বের হয়ে যাচ্ছে।

করণ সিং—রায়মল—

আজ্ঞা করুন! করণ সিং বলে।

যেমন করে যে উপায়ে হোক ঐ দ্বারপথের সমস্ত বাধা উত্তীর্ণ হয়ে এখুনি তোমাকে যোধপুরে ফিরে যেতে হবে—মহারাজকে দেবে সমস্ত সংবাদ।

করণ সিং আর রায়মল দুজনেই তীরবেগে দ্বারের দিকে অশ্বচালনা করে। প্রচণ্ড যুদ্ধে করণ সিং ঘটনাস্থলেই নিহত হয়, কিন্তু রায়মল কোনমতে রক্তাক্ত ক্ষতবিক্ষত হয়ে পালাতে সক্ষম হয়।

চারিদিকে কঠোর পাহারা সত্ত্বেও রাজপুত সৈন্যেরা জানতে পারে নি—কোন্ পথে কোন্ সময় পাঠান সৈন্যেরা নগরে প্রবেশ করেছিল। গোলমাল চিৎকার তাদের কানে গিয়ে প্রবেশ করতেই তারা ঐ মন্দির প্রাঙ্গণের দিকে ছুটে আসে। শুরু হয় প্রচণ্ড যুদ্ধ। একদিকে মাত্র ঊনত্রিশজন রাজপুত সৈন্য, অন্যদিকে অগণিত দুর্ধর্ষ পাঠান সৈন্য।

যুদ্ধ ত নয়, যেন রক্তের হোলি খেলা। অসির ঝনৎকার—অশ্বের হ্রেষারব—নারীকণ্ঠের আর্তচিৎকার—যবনের আল্লাহ হুঙ্কার, সে এক বীভৎস নারকীয় ব্যাপার।

সর্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত ক্লান্ত পরিশ্রান্ত বীরেন্দ্র ক্রমশঃই অবসন্ন হয়ে আসছিল—হঠাৎ তার কানে এলো তীক্ষ্ন নারীকণ্ঠের ডাক—বীরেন্দ্র!

কে? কোনমতে ফিরে তাকাল বীরেন্দ্র—কে?

আর ঠিক সেই মুহূর্তে সহস্র রাজপুত সৈন্য মদমত্ত হুঙ্কারে মহারাজ সুরজমলের অধিনায়কত্বে ঝাঁপিয়ে পড়ল মন্দিরপ্রাঙ্গণে যবন সেনাদের উপর।

আবার চিৎকার শোনা গেল ঃ বীরেন্দ্র—কোথায় তুমি—বীরেন্দ্র?

॥ ৫ ॥

সত্যি কথা বলতে কি, মহারাজ সুরজমহল বীরেন্দ্রর কথায় সেরকম কোন বিশেষ গুরুত্ব দেন নি, কারণ বীরেন্দ্রর কথাটা ঠিক মনেপ্রাণে যেন বিশ্বাস করতে পারেন নি। নচেৎ পূর্বাহ্ণেই হয়ত তিনি বিপদের সম্মুখীন হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করতেন।

নিজ শয়নকক্ষে নিভৃতে দ্বিপ্রাহরিক বিশ্রামরত ছিলেন মহারাজ সুরজমল। সহসা পট্টমহাদেবীর ব্যাকুল কণ্ঠস্বরে তার বিশ্রাম বিঘ্নিত হলো।

মহারাজ!

কে—ও পট্টমহাদেবী!

শীঘ্র গাত্রোত্থান করুন মহারাজ, অত্যন্ত দুঃসংবাদ—

পট্টমহাদেবীর কণ্ঠস্বর ভয়ে ও উত্তেজনায় যেন কাঁপতে থাকে।

মহারাজ সুরজমল ততক্ষণে শয্যার ওপরে উঠে বসেছেন। বিশ্রাম আলস্য তার সম্পূর্ণ তিরোহিত হয়েছে।

দুঃসংবাদ—কিসের দুঃসংবাদ মহাদেবী? মহারাজের কণ্ঠেও উৎকণ্ঠা প্রকাশ পায়।

পীপার নগরের ভবানী মন্দিরে অসংখ্য যবন প্রবেশ করে আমাদের কুমারী কন্যাদের লুঠ করে নিয়ে যাচ্ছে।

সে কি?

হ্যাঁ, মহারাজ।

কিন্তু কে—কে দিলে এ সংবাদ তোমাকে?

রায়মল—রায়মল সংবাদ এনেছে—

বীরেন্দ্র—

বীরেন্দ্রই সংবাদ পাঠিয়েছে—শুধু তাই নয় মহারাজ—আমাদের দৌহিত্রী পার্বতী—

পার্বতী—পার্বতীর কি হয়েছে?

সেও যে পীপার নগরে ভবানী মন্দিরে গিয়েছে মহারাজ পুজা দিতে!

সে কি—আমাকে জানাও নি কেন—কেন তাকে যেতে দিলে?

কান্নাকাটি করতে লাগল—ছেলেমানুষ—

কান্নাকাটি করতে লাগল—আর আমাকে কিছু না জানিয়ে তাকে তুমি উৎসবে যেতে দিলে! শীঘ্র, আর বিলম্ব করো না, আমার রণসজ্জা নিয়ে এসো।

কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই দ্রুত রণসাজে সজ্জিত হয়ে মহারাজ যেমন কক্ষ থেকে নিষ্ক্রান্ত হতে যাবেন, কক্ষদ্বারের একটি লৌহকীলকে বেঁধে তার পরিধেয় বস্ত্রের এক অংশ ছিঁড়ে গেল। থমকে দাঁড়ালেন সুরজমল। বাধা পড়ল।

মা ভবানী—রক্ষা করো মা—আমার স্বামীর গৌরব রক্ষা কর। মনে মনে মহারাণী ভাবেন।

বাধা পড়লো মহাদেবী—

ও কিছু না—মা ভবানী মঙ্গলই করবেন—বললেন বটে পট্টমহাদেবী কথাগুলো স্বামীকে সান্ত্বনা দেবার জন্য, কিন্তু কণ্ঠস্বর তাঁর যেন কেমন ক্ষীণ—নিষ্প্রাণ—নিস্তেজ।

নত হয়ে স্বামীর পদধূলি নিলেন।

চল।

সুরজমল এগিয়ে চললেন।

রায়মল দুর্গ-চত্বরে অশ্বারূঢ় হয়েই মহারাজের আগমন প্রতীক্ষা করছিল। সারা দেহে ক্ষত—রক্ত ঝরছে—যন্ত্রণায় পেশীগুলো মোচড় দিয়ে দিয়ে উঠছে—কিন্তু মুখে সে যন্ত্রণার চিহ্নমাত্রও প্রকাশ নেই।

সহসা দুর্গ-প্রাকারে [illegible] সাংকেতিক শিঙ্গাধ্বনি শোনা গেল। কানাড়া

বেজে উঠল ড্রুম—ড্রুম্—ড্রুম্—। মুহূর্তে যেন দুর্গমধ্যে সাজ সাজ রব পড়ে যায়। এবং আরো অর্ধ ঘণ্টা পরে—দুই সহস্র অশ্বারোহী সৈন্য মহারাজ সুরেজমলকে অনুসরণ করে অশ্বক্ষুরের ধূলিতে অপরাহ্নের আকাশ সমাচ্ছন্ন করে দুর্গ-দ্বার দিয়ে বের হয়ে গেল—হাজারো অশ্বক্ষুরে শব্দের প্রচন্ড ঝড় তুলে।

ঝড়ের গতিতে ছুটে চলে সেই দুই সহস্র অশ্বারোহী সৈন্য। পার্বত্য পথের প্রস্তরে প্রস্তরে অশ্বক্ষুরের ঘর্ষণে ঘর্ষণে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ছড়ায়।

ছয় দণ্ডের পথ যেন তারা দুই দণ্ডে অতিক্রম করে এলো। এবং মন্দির দ্বারে যখন তারা এসে পৌঁছাল—শেষ জনা পাঁচেক সৈন্য তারা মরণপণে যবনদের প্রতিরোধ করে চলেছে—সর্বাঙ্গ তাঁদের ক্ষতবিক্ষত—রুধিরাপ্লুত। পাঠান সৈন্যরা বহু কুমারী ইতিমধ্যে লুণ্ঠন করে নিয়ে গিয়েছে এবং তখনো লুণ্ঠন করবার চেষ্টা চলেছে।

ঝাঁপিয়ে পড়ল যেন সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গের মত—সেই দুই সহস্র রাজপুত সৈন্য লুণ্ঠনকারী যবন সৈন্যদের উপর।

সূর্য তখন অস্তমিত-প্রায়। আলো ক্রমশঃ ম্লান হয়ে আসছে। ভট্ট কবিরা সেদিনকার সেই ভয়াবহ যুদ্ধ-বর্ণনা করে গিয়েছে—রাজপুতদের সেদিনকার অমিত বিক্রম ও যুদ্ধনৈপুণ্যের কথা। মন্দিরপ্রাঙ্গণে সেদিন রক্তের স্রোত—স্তূপীকৃত যবন ও রাজপুত সৈন্য—আহতের আর্তনাদ—বাতাস মন্থর। নিশ্চিহ্ন নির্মূল করে দেয় যবন সৈন্যদের রাজপুত সৈন্যরা।

কিন্তু মহারাজ সুরেজমল—হঠাৎ এক পাঠান সৈনিকের নিক্ষেপ্ত এক তরবারির অগ্রভাগ সমূলে বক্ষে বিদ্ধ হয় তাঁর।

সঙ্গে সঙ্গে এক রাজপুতের নিক্ষিপ্ত বর্শায় সেই যবন সেনা মৃত্যুমুখে পতিত হয় বটে তবে ইতিমধ্যে রক্তাপ্লুত মহারাজের দেহ অশ্বপৃষ্ঠ হতে নীচে পড়ে যায়।

ছুটে আসে এক সৈনিক, মহারাজ।

কে ?

আমি সামন্ত সিংহ, মহারাজ।

যবন সব নিঃশেষ তো ?

হ্যাঁ, মহারাজ।

আমাদের কুমারী কন্যারা রক্ষা পেয়েছে ?

হ্যাঁ, মহারাজ।

আঃ। মহারাজ সুরেজমল চক্ষু মুদ্রিত করলেন। ধরণীর বক্ষ হতে শেষ আলোর চিহ্নটুকু পর্যন্ত তখন মুছে গিয়েছে। বিশাল পক্ষ বিস্তার করে তামসী রাত্রির অন্ধকার প্রকৃতির বুকে জুড়ে নেমে আসছে। ক্লান্ত দিনের শেষে রাত্রি। শান্তিময়ী ক্লান্তিহরা রাত্র। নিঃসঙ্গ রাত্রি।

অন্ধকার। চারিদিকে অন্ধকার। মন্দিরে অ[illegible] আরতি হয় নি—প্রদীপ জ্বলে [illegible] ঘণ্টাধ্বনি নেই। মন্দিরপ্রাঙ্গণ জুড়ে অন্ধকার আর অগণিত শব। অখণ্ড

স্তব্ধতা—মৃত্যুর স্তব্ধতা। থেকে থেকে সেই মৃত্যু-স্তব্ধতা ভঙ্গ হচ্ছে ক্ষীণ মুমূর্ষের আর্তনাদে। বাতাস মন্থর।

মহারাজ সুরজমলের মৃতদেহের পাশে উন্মুক্ত তরবারি হাতে স্থির পাথরের মত দাঁড়িয়ে তখনো সামন্ত সিংহ। মাড়বারের শৌর্য আজ রাজপুত কুমারীদের উদ্ধার করেছে বটে যবনের হাত থেকে, কিন্তু মাড়বারের মুকুটমণি—যোধপুরাধিপতি মৃত্যু-শয়নে।

একটি আলোকশিখা অন্ধকারে শব-সমাকীর্ণ মন্দিরপ্রাঙ্গনে ইতস্তত ঘুরে বেড়াচ্ছিল। আলোকশিখা এক নারীর হাতের প্রদীপের শিখা। কে ঐ নারী!··· অবগুন্ঠনে ঢাকা মুখ।

বীরেন্দ্র—বীরেন্দ্র—মধ্যে মধ্যে ঐ নারীকণ্ঠ হতে উচ্চারিত হচ্ছে একটি নাম—বীরেন্দ্র।

রাজকুমারী পার্বতী। সে খুঁজে বেড়াচ্ছিল বীরেন্দ্রকে—কোথায় তার বীরেন্দ্র। শুধু শব আর শব। হঠাৎ এক জায়গায় থমকে দাঁড়ায় পার্বতী। এই তো—এই তো তার বীরেন্দ্র—। বীরেন্দ্র—বীরেন্দ্র।

অতিকষ্টে বীরেন্দ্র চোখ মেলে, কে?

আমি—তোমার পার্বতী।

পার্বতী!

হ্যাঁ।

একটু জল।

একটু অপেক্ষা কর—এখুনি আমি জল নিয়ে আসছি।

ত্বরিত লঘুপদে পার্বতী মন্দির-সংলগ্ন তরাগের দিকে চলে যায়। কিন্তু পাত্র—পাত্র কোথায়? তবে কি বীরেন্দ্রর তৃষ্ণা-নিবারণ হবে না? হঠাৎ কথাটা মনে হয়, কেন হবে না—উড়নী জলে ভিজিয়ে নিয়ে ফিরে আসে পার্বতী—সিক্ত উড়নী চিপে চিপে মুখে জল দেয় বীরেন্দ্রর।

আঃ। পার্বতী?

বল।

আমরা কি পরাজিত?

না।

জয় আমাদের হয়েছে?

হ্যাঁ—সমস্ত যবন সেনা নিশ্চিহ্ন।

নিশ্চিহ্ন?

হ্যাঁ।

কে—কারা করল?

বহু রাজপুত সৈন্য এসেছে—

মহারাজ—মহারাজ আসেন নি?

বলতে পারি না—

পার্বতীর কথা শেষ হলো না, সহসা শত শত মশালের আলো দেখা গেল ; একটা বিরাট আলোর মালার মত যেন দুলতে দুলতে অন্ধকারে ঐদিকেই আসছে। সমস্ত অন্ধকার যেন সেই আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে।

ওকি—অত আলো কিসের ? যবন সেনারা কি আবার ফিরে এলো। উৎকণ্ঠিত বীরেন্দ্র শুধায়। সেই মুহূর্তে হাজারো নারীকণ্ঠে সংগীত-ধ্বনি শোনা যায়।…

একি—কারা ওরা ? কারা গান গায়—কাদের কণ্ঠে সংগীত ?…

মশালের আলো আরো স্পষ্ট আরো দীপ্ত হয়ে ওঠে। সংগীত আরো স্পষ্ট শোনা যায়। আরো কাছে আসে।

একশত চত্বারিংশ রাজকুমারী মহারাজ সুরজমলের বীরত্বগাথা গাইতে গাইতে মন্দিরপ্রাঙ্গণের দিকে প্রজ্বলিত মশাল হাতে এগিয়ে আসছে।

হে বীর—হে শ্রেষ্ঠ—হে বীরেন্দ্র—তোমায় প্রণাম জানাই। হে নারীলজ্জা-রক্ষাকারী—হে পুরুষসিংহ, তোমার বিক্রম ধন্য—তোমার প্রাণদান ধন্য—তুমি ধন্য—যতদিন মাড়বারের একটি প্রাণীও বেঁচে থাকবে, তোমার আজিকার বিক্রম গাথা-গাইবে—তোমায় প্রণাম জানাবে। ধন্য মাড়বার। ধন্য মাড়বারবাসী—ধন্য সেই রমণী যিনি একদা তোমায় গর্ভে ধরেছিলেন।

ধন্য—ধন্য—

সেই একশত চত্বারিংশ রাজপুত বালা নিজেরা হাতে চিতা প্রস্তুত করে মহারাজের শবদেহ সেই চিতার ওপরে স্থাপন করল। অগ্নি সংযোজিত হলো। সুরজমলের নশ্বর দেহ ভস্মীভূত হলো।…ভট্টকবির কণ্ঠে ধ্বনিত হয় : সকলই অনিত্য ; জীবন, দীপমক্ষিকার স্তিমিত দীপ্তির ন্যায় ; গৃহবাস সকলই ফুরাইবে, কিন্তু একজন মহাপুরুষের সুনাম অনন্তকালের জন্য অক্ষয় থাকিবে।

গাঙ্গ প্রাসাদে ছিল না—রাজকার্যে তাকে মৈরতায় যেতে হয়েছিল। প্রত্যূষে সে দুর্গে প্রত্যাবর্তন করে দুঃসংবাদটা পেল।

পট্টমহাদেবী তখন স্বামীর স্মৃতিতে চিতানল প্রজ্বলিত করে আত্মাহুতি দেবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন। গাঙ্গ ছুটে গেল মহাদেবীর নিকট—মিনতি জানাল মহাদেবীকে প্রাণ বিসর্জন না দেবার জন্য। কিন্তু মহাদেবী স্থিরপ্রতিজ্ঞ।… অচল অটল।

গাঙ্গ হতাশ হয়ে পার্বতীর কক্ষের দিকে অগ্রসর হয়। দাদী তো তার কথা শুনল না, যদি পার্বতীর কথা শোনো। কিন্তু পার্বতীর কক্ষের সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই দাসী বললে, রাজকুমারী তো নেই।

গাঙ্গ দাঁড়াল, নেই—তবে কোথায় ?

দাসী এবারে বিনীত কণ্ঠে বললে, যুবরাজ—রাজকুমারী গতকাল পার্বতী উৎসবে গিয়েছেন ভবানীর পূজা দিতে, এখনো ফেরেন নি—

সেকি—পার্বতী উৎসবে গিয়ে এখনো ফেরে নি ?

না।

সঙ্গে সঙ্গে হাজারো দুশ্চিন্তায় যেন মাথাটা ঘুরে ওঠে যুবরাজের।

পিতামহী ত সে-সব কোন কথা বলেন নি তাকে। তবে কি তার কোন বিপদ হলো? একমাত্র আদরিণী সহোদরার অমঙ্গল চিন্তায় বুকের ভিতরটা যেন কেঁপে ওঠে গাঙ্গর। কিছু কিছু সৈন্যও ত প্রাসাদ-দুর্গে প্রত্যাবর্তন করেছে।

ছুটে গেল নীচে গাঙ্গ। অন্যতম সৈন্যাধ্যক্ষ বিক্রমজিৎকে ডেকে পাঠাল। প্রৌঢ় সৈন্যাধ্যক্ষ বিক্রমজিৎ এসে সামনে দাঁড়াতেই প্রশ্ন করল গাঙ্গ, বিক্রমজিৎ আমার ভগ্নী পার্বতী নাকি উৎসবে গিয়েছিল গতকাল পীপার নগরে।

সেকি—আমি ত কিছু জানি না।

দেখেন নি তাকে আপনি?

না, যুবরাজ।

গাঙ্গর সমস্ত চিন্তাশক্তি তখন যেন কেমন ওলোট-পালোট হয়ে যাচ্ছে। একটা অমঙ্গল আশংকায় বুকের ভিতরটা যেন হিম হয়ে যায়। কুমারীরা সব কি যে যার গৃহে ফিরে গিয়েছে?

যতদূর জানি গিয়েছে।

সত্যিই তাহলে পার্বতীকে আপনি দেখেন নি?

না, যুবরাজ।

গাঙ্গ আর বিলম্ব করে না—দেহরক্ষী সঙ্গে সঙ্গেই ছিল। তখনই তাকে সুসজ্জিত অশ্ব আনতে নির্দেশ দেয়। আকাশে মার্তণ্ডদেব তখন মধ্যগগন থেকে কিছুটা পশ্চিম দিকে হেলে পড়েছে। নিমেষে প্রস্তুত হয়ে এলো গাঙ্গ এবং অশ্ব আসতেই একলাফে অশ্বারূঢ় হয়ে দুর্গদ্বারের দিকে অশ্বকে চালিত করল।

পাথরে বাঁধানো সোপানশ্রেণী—দুর্গ-চত্বর থেকে ক্রমশঃ এঁকে-বেঁকে নেমে গিয়েছে নিচের দিকে। শুধু সোপান নয়, প্রস্তরনির্মিত পথ আরো ঢালু হয়ে দুর্গদ্বারে গিয়ে পৌঁচেছে। শিক্ষিত অশ্ব সেই সোপানশ্রেণী অনায়াসেই অতিক্রম করে ঢালু প্রস্তরনির্মিত পথ ধরে এগিয়ে চলে দ্রুতগতিতে। দুর্গ দ্বাররক্ষক দুর্গদ্বার খুলে দেয়—বিরাট কাষ্ঠ ও লৌহনির্মিত ফটক। দুর্গের সিংদরোয়াজা। সেলাম জানায় দুর্গ-দ্বাররক্ষক রাজকুমারকে।

গাঙ্গ তীরবেগে ছুটে বের হয়ে যায়। বেশী দূর যেতে হলো না—ক্রোশ দুই পথ অতিক্রম করতেই দূরে অপরাহ্ণের ম্লান সূর্যালোকে নজরে পড়ল এক অশ্বারোহী। ধীর মন্থর গতিতে পার্বত্যপথ ধরে যোধপুরের দিকেই এগিয়ে আসছিল। আর একটু কাছাকাছি হতেই গাঙ্গর মনে হলো অশ্বারোহী একা নয়—এবং অশ্বারোহী নয়—অশ্বারোহিনী। এক নারী, আর তার পশ্চাতে তাকে দু-বাহু দিয়ে জড়িয়ে অশ্বোপরি উপবিষ্ট আর একজন—এবং মনে হয় সে [illegible] পুরুষ।

আরো কাছাকাছি হতেই যেন ভূত দেখার মতই চমকে ওঠে গাঙ্গ—অশ্বারোহিনী আর কেউ নয়, তারই সহোদরা—আদরিণী ভগ্নী—পার্বতী।

কিন্তু পার্বতীকে দুবাহু দিয়ে নিবিড়ভাবে আলিঙ্গন করে তার পশ্চাতে

বসে আছে ঐ পুরুষ কে—কে—বীরেন্দ্র সিংহ না—হ্যাঁ—বীরেন্দ্র সিংহই ত। সামান্য একজন সৈনিক রাজকুমারী পার্বতীকে আলিঙ্গন করে বসে আছে।

আভিজাত্যের রক্ত যেন টগবগ করে ফুটে ওঠে। চিৎকার করে ওঠে গাঙ্গ—পার্বতী?

চমকে পার্বতী মুখ তুলে তাকায় এবং সঙ্গে সঙ্গে তার শরীরের রক্ত যেন জল হয়ে যায়—সর্বনাশ—গাঙ্গ—

পার্বতী!

দুজনাই যে যার অশ্ববল্গা তখন আকর্ষণ করে—অশ্বের গতিরোধ করেছে। সামান্য ব্যবধানে মুখোমুখি দুটি অশ্ব। একটি অশ্বের ওপরে গাঙ্গ—অন্য অশ্বটির ওপরে পার্বতী ও বীরেন্দ্র।

পরিশ্রান্ত আহত বীরেন্দ্রকে, অনন্যোপায় হয়েই, বীরেন্দ্রর অশ্বের পৃষ্ঠে আরোহণ করে বীরেন্দ্রকে পশ্চাতে বসিয়ে রাজধানীতে ফিরছিল পার্বতী।

দিগ্বিদিক্-হারা ক্ষিপ্ত গাঙ্গ তার হাতের সুতীক্ষ্ন বর্শাটা তুলে বোধ করি বীরেন্দ্রকেই হত্যা করবার জন্য উদ্যত হয়, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে পার্বতী চিৎকার করে ওঠে, না—না—না—এবং দু-হাতে বীরেন্দ্রকে বক্ষের মাঝে টেনে নেয়।

॥ ৬ ॥

মরিয়মের দিকে থেকে বাবুরের দৃষ্টি যেন আর ফেরে না। বাবুরের মনে হয় যেন জন্ম জন্ম চেয়ে থাকি ঐ প্রস্ফুটিত বসরাই গোলাপের মত মুখখানির দিকে—ঐ দুটি গভীর আঁখিপাতে ঢাকা নীল আঁখি তারার দিকে। তোমাকে আমি জেবেউন্নিসা বলেই ডাকবো, কেমন? বাবুর আবার বলে।

না শাহেনশা—সামান্য নর্তকী আমি—আপনি অনুগ্রহ করে ডাকলে আমায় ঐ নামে আমি না বলতে পারব না—কিন্তু সত্যিই মরিয়ম বলে ডাকলেই আমি বেশী খুশি হবো।

বিচিত্র সাধ ত তোমার—কিন্তু কেন বল ত?

বাবুর স্মিতহাস্যে মরিয়মের মুখের দিকে চেয়ে প্রশ্নটা করে।

মরিয়ম কোন জবাব দিল না। কেবল মাথাটা নীচু করল।

বুঝলাম—সত্যিই তোমার আপত্তি আছে—বেশ তাই হবে—তোমায় আমি মরিয়ম বলেই ডাকব। তারপরই অদূরে দণ্ডায়মান মোল্লা মুরসিদের দিকে তাকিয়ে বাবুর বলে, মোল্লা।

জাঁহাপনা।

এখানে এই কিলকিনে প্রমোদকক্ষে থাকবারই আপাতত এর ব্যবস্থা করে দাও।

তাই হবে জাঁহাপনা।

শোন, আমি এখন প্রাসাদে একবার যাচ্ছি—সম্রাজ্ঞী কেন ডেকেছেন একবার শুনে আসি—হ্যাঁ ভাল কথা—এখানেই আমি এসে আহার করব—তুমি থাকবে

আর বাবুরীকেও সংবাদ দিও।

যো হুকুম খোদাবন্দ্।

বাবুর কক্ষ থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেল।

মোল্লা মুরসিদ এবারে মরিয়মের দিকে ফিরে তাকিয়ে বললে, বিবিসাহেবা—চলুন তা হলে আপনাকে আপনার কক্ষে পৌঁছে দিই।

চলুন।

কিলকিনের প্রমোদ ভবনটি একেবারে একটি পাহাড়ের নিম্নদেশে—একটি মন্থরগতি পার্বত্যনদীর কিনারে। শীত প্রায় এসে পড়ল শীতকালে এত বেশী তুষারপাত হয় যে পাহাড়-ঘেরা কাবুলের একটিমাত্র রাস্তা ছাড়া সব রাস্তাগুলোই তুষার জমে জমে কঠিন হয়ে একেবারে অবরুদ্ধ হয়ে যায়। আর ঠিক সেই সুযোগে কাফের দস্যুরা চারিপাশের পাহাড়ের গুহা থেকে নেমে এসে রাস্তায় পথিকদের ওপরে হামলা করে।

ইতিমধ্যে চারিদিকে আলো জ্বলে উঠেছিল। অল্পদূরেই কিলকিনের বাজার। বিরাট বাজার—কাবুলের বলতে গেলে অন্যতম সেরা বাজার। চীন থেকে, তুর্কীস্থান থেকে ত ব্যবসায়ীরা আসেই—আরো আসে সুদূর হিন্দুস্থান থেকে দলে দলে ব্যবসায়ীরা—নানা পণ্যদ্রব্য আমদানি হয়। শ্বেতবস্ত্র, আখ, ঔষধ ও মশলা থেকে শুরু করে ক্রীতদাস-দাসী প'ন্ত। প্রমোদ ভবনের দিকে এগুতে এগুতে অদূরে বাজারের আলোকমালার দিকে নজর পড়ে মরিয়মের। সঙ্গের মোল্লা মুরসিদকে শুধায়, ঐ যে সব আলো দেখা যাচ্ছে ওখানে কি মোল্লা?

ওখানে কিলকিনের বাজার।

ও—মস্ত বড় বাজার মনে হচ্ছে।

হ্যাঁ—বিরাট বাজার।

আচ্ছা ঐ যে পথের দুপাশে বড় বড় সুন্দর ঝাঁকড়া-মাথা গাছগুলো—ওগুলো কি গাছ?

ওগুলো টিউলিপ গাছ—আর পাশের ছোট ছোট গাছগুলো হচ্ছে খুবান ফুলের গাছ—সম্রাট নিজে সব নানা জায়গা থেকে সংগ্রহ করে করে এনে কাবুলে লাগিয়েছেন—ফুল আর গাছ—নদী—পাহাড়—ঝরনা—সব কিছুর উনি একজন ভক্ত—

মরিয়ম মৃদু হেসে বলে, আপনার সম্রাট তাহলে একজন কবি বলুন।

হ্যাঁ—কবি ত বটেই—উনি কবিতাও রচনা করেন। মোল্লা মুরসিদ মৃদু কণ্ঠে বলে।

বটে—কবি-সম্রাট।

কেবল উনি কবিই নন মরিয়ম বিবি—একজন সত্যিকারের কুশলী যোদ্ধাও।

বিচিত্র মানুষ তো।

কেন—ও কথা বলছো কেন?

অসি, বন্দুক আর লেখনী একই মানুষের হাতে? যে হাতে রক্ত ঝরাচ্ছেন, সেই হাতেই রচনা করছেন কবিতা—বিচিত্র মানুষ নয়!

তাছাড়াও সম্রাটের আরো গুণ আছে বিবিসাহেবা।

সত্যি?

হ্যাঁ, যেমন কষ্টসহিষ্ণু তেমনি স্থিরপ্রতিজ্ঞ ও আশাবাদী!

তা কবি যখন স্বপ্ন তো দেখবেনই!

না, সেরকম খোয়াব উনি দেখেন না—

তবে?—

আপনাদের ধনরত্ন, শস্যসম্পদে ভরা হিন্দুস্থানের একচ্ছত্র সম্রাট—একমাত্র অধীশ্বর হবার খোয়াব উনি দেখেন।

তাই বুঝি?

হ্যাঁ—কিন্তু প্রমোদ ভবনে আমরা এসে গিয়েছি বিবিসাহেবা।

প্রমোদ ভবনের দরজায় সশস্ত্র প্রহরী বন্দুক হাতে প্রহরা দিচ্ছিল—ওদের দেখে এবং মোল্লা মুরসিদকে দেখে সসম্ভ্রমে সেলাম দিল।

দিলোয়ার কোথায় প্রহরী?

অন্দরে।

আনোয়ারা?

অন্দরেই আছে।

এসো বিবিসাহেবা।

মোল্লা মুরসিদ মরিয়মকে নিয়ে অন্দরে প্রবেশ করল।

ওদের সাড়া পেয়ে প্রমোদ ভবনের যুবতী বাঁদী আনোয়ারা ছুটে আসে এবং বান্দা দিলদারও এসে হাজির হয়—

মোল্লা সাহেব, এত দিন পরে? দিলদার প্রশ্ন করে।

মোল্লা সে প্রশ্নের কোন জবাব না দিয়ে বলে, সম্রাটের অতিথি—এই প্রমোদ ভবনেই থাকবেন। এঁর খিৎমদের যেন কোন কসুর না হয়।

দিলদার বলে, শোভানাল্লা—কার ঘাড়ে কটা মাথা আছে যে সম্রাটের অতিথির অমর্যাদা করবে!

আনোয়ারা এগিয়ে এসে বলে, পাধারিয়ে—

সুন্দর পরিচ্ছন্ন সাজানো একটি কক্ষের মধ্যে নিয়ে গেল আনোয়ারা মরিয়মকে।

বিশ্রাম করুন—আমি আপনার জন্য সুরা নিয়ে আসছি।

দাঁড়াও, শোন।

মরিয়মের ডাকে আনোয়ারা ঘুরে দাঁড়াতেই মরিয়ম মুখের উপর থেকে বোরখা উন্মোচন করল।

সুসজ্জিত কক্ষের দুদিকে দীপাধারে চর্বির প্রদীপ জ্বলছিল, তারই আলোয় ঘরটি আলোকিত এবং অন্য এক কোণে ছোট একটি চুল্লীতে ওক কাঠের আগুন—কক্ষটিকে আরামপ্রদ ও ঈষদুষ্ণ করে রেখেছিল।

দীপের আলোয় মরিয়মের অতুলনীয় রূপের দিকে তাকিয়ে স্ত্রীলোক আনোয়ারারও যেন চোখের পলক পড়ে না—সে যেন বোবাদৃষ্টিতে চেয়ে থাকে।

মরিয়ম বলে, কি দেখছো আমার মুখের দিকে চেয়ে অমন করে?

তোমাকে—

আমাকে—

হ্যাঁ—

কেন?

তুমি কি খুবসুরৎ—

মরিয়ম মৃদু হাসে, তোমার নাম কি?

আনোয়ারা।

বড্ড বড় নামটা।

বড় নাম?

হ্যাঁ—আমি তোমাকে যদি আজ থেকে—

কি?

শুধু আনার বলে ডাকি?

আনার—

হ্যাঁ—রাগ করবে নাকি তুমি?

বাঃ, রাগ করবো কেন?

আনার।

বল।

আমি একটু গোসল করব।

এই রাত্রে?

হ্যাঁ—অনেকটা পথ অনেক দিন ধরে এসেছি ত, গায়ে অনেক ধুলোবালি জমেছে—কেমন যেন গা-টা ঘিনঘিন করছে—

বেশ—গোসলখানা এখানে আছে—এখুনি আমি গরম পানির ব্যবস্থা করছি—

না, না—গরম পানি নয়—ঠাণ্ডা পানি—

এখানে এসময় ঠাণ্ডা পানি একেবারে বরফের মত।

তা হোক।

তবে চল গোসলখানায়—পাহাড়ের ঝরনা থেকে একেবারে গোসলখানায় সোজা পানি আসবার ব্যবস্থা আছে—

চল।

অনেকক্ষণ ধরে স্নান করল মরিয়ম। মিথ্যে বলেনি প্রায় দীর্ঘ দুমাস পথে পথে কেটেছে—মাত্র দিন দুই কোনমতে স্নান করেছিল তারপর গায়ে আর জল লাগে নি। ঝরনার ঠাণ্ডা জলে স্নান করে শরীরটা যেন জুড়িয়ে গেল মরিয়মের।

স্নানের পর মরিয়ম যখন আর্শীর সামনে বসে কেশ প্রসাধন করছে আনোয়ারা একটা রৌপ্য থালির ওপরে সুরার পাত্র নিয়ে এসে হাজির হলো।

বিবিসাহেবা—

মরিয়ম ফিরে তাকাল, ওকি এনেছো আনার ?

সুরা।

সুরা তো আমি পান করি না আনার।

তবে ?

কি তবে ?

দ্রাক্ষারস আনব ?

তা না হয় নিয়ে এসো।

চান ত—গাধার গরম দুধও আছে—

না—তুমি দ্রাক্ষারসই নিয়ে এসো।

আনার চলে গেল।

অন্ধকারে খোলা বাতায়নপথে বাইরে প্রবহমান নদীর দিকে চেয়ে নিঃশব্দে কক্ষের মধ্যে দাঁড়িয়ে ছিল মরিয়ম।

পদশব্দ পেয়ে ফিরে তাকাল—কে—

প্রহরী তৎক্ষণে ঘোষণা করেছে—ফারদুস মাকানি জহিরুদ্দীন মহম্মদ বাবুর পাদশা—পাদশা বাবুর কক্ষমধ্যে প্রবেশ করে।

পাদশা সালাজৎ—

তোমার কোন কষ্ট হচ্ছে না ত এখানে মরিয়ম—

সে কি সম্রাট—আপনার অনুগ্রহে আমি ত রাজেন্দ্রাণীর মত আছি—

বেশ—বেশ—কোন সঙ্কোচ করো না—আনোয়ারা দিলদার এখানে আছে—কোন কষ্ট হবে না—যখন যা প্রয়োজন তোমার নিঃসঙ্কোচে হুকুম করবে।

সম্রাট মহানুভব—

সামান্য দু'চারটে কথাবার্তার পরই এক সময় বাবুর বলে, মরিয়ম—মোল্লা বলছিল—

হঠাৎ যেন চমকে ওঠে মরিয়ম—বলে, কি বলছিল জাঁহাপনা।

হিন্দুস্থানের অনেক খবরই নাকি তোমার কাছ থেকে আমি পেতে পারব।

জাঁহাপনা—

জান মরিয়ম—হিন্দুস্থান আমার দীর্ঘদিনের স্বপ্ন—আমার আশা—আমার আকাঙ্ক্ষা—

আমি শুনেছি সম্রাট হিন্দুস্থানের স্বপ্ন আপনার অনেক দিনের—দীর্ঘ দশ বছর আগে সর্বপ্রথম আপনি হিন্দুস্থানে প্রবেশ করেছিলেন বিপুল সৈন্যবাহিনী নিয়ে—

হ্যাঁ—শাবান মাস—সূর্য তখন মীন রাশিতে—আমি প্রথম কাবুল থেকে হিন্দুস্থানের উদ্দেশে যাত্রা করি—বাবুর বলতে লাগল, অনেক ক্লেশ সহ্য করে

আমি আদিনাপুরে পেঁছাই—তার পূর্বে কখনো আমি কোন গ্রীষ্মপ্রধান জায়গা দেখিনি—

তারপর ?

সেখানে পেঁছে মনে হলো যেন বিচিত্র এক নতুন জগৎ দেখছি—সেখানকার গাছপালা—মাটি—তৃণ—বন্য জন্তু—এমন কি পাখীগুলোর গায়ের পালকও যেন অন্য এক রকমের। মনে হলো যেন ঘুমের মধ্যে এক স্বপ্ন দিয়ে ঘেরা দেশের মধ্যে এসে পা ফেলেছি—আমি বিস্মিত—অভিভূত হয়ে পড়লাম—

তারপর ?

তারপর আরো অগ্রসর হয়ে খাইবার গিরিবর্ত্ম অতিক্রম করলাম—সেখান থেকে কোহাটের দিকে—সেখানে পেঁছে মনে হলো যেন এর ঘরে ঘরে অমূল্য রত্নসম্ভার সঞ্চিত আছে যুগ যুগ ধরে—সৈন্যদের হুকুম দিলাম—করো লুঠ—মাঠে মাঠে অসংখ্য গরু-মহিষ চড়ে বেড়াচ্ছিল—সব আমরা অধিকার করে নিলাম—

সেখানকার আফগানরা আপনাকে বাধা দেন নি ?

দিয়েছিল, কিন্তু সবাই প্রায় বন্দী হয়। আমি তাদের ঘরে ঘরে যে প্রচুর খাদ্যশস্য মজুত ছিল—তার বিনিময়ে তাদের মুক্তি দিলাম। দুদিন কোহাটে থেকে সেখান থেকে বান্নু—সেখানে কামারী আমাদের পথপ্রদর্শক হয়—সে আফগানিস্থানের সব জায়গারই সংবাদ রাখত—সেখানে আফগানদের সঙ্গে আমাদের প্রচণ্ড যুদ্ধ হয় কিন্তু তাদের আমরা পর্যুদস্ত করি।—তারপর সামনে পড়ল গোমাল নদী—তারপর সিন্ধু নদী—কিন্তু ডেরাগাজী খাঁ পর্যন্ত গিয়ে আবার তারপর গজনীতে ফিরে এলাম—

তারপর ?

জান মরিয়ম—গোমাল নদীর তীরে যেদিন আমরা পেঁছাই—সেই দিনই ছিল নওরোজের উৎসব। আমরা নদীতীরেই ঈদের নমাজ পড়লাম আর সেরাতে একটি কবিতা রচনা করি আমি—আমার জীবনের একটি শ্রেষ্ঠ কবিতা—

কি কবিতা জাঁহাপনা ?

বাবুর মৃদু কণ্ঠে আবৃত্তি করে ঃ

হে বাবুর।
তোমার প্রিয়ার মুখ
আর নয়া চাঁদে
আছে কি প্রভেদ ?
প্রিয়া দরশনে
মনে কি হয় তব
নওরোজ উৎসবের কথা ?
একথা কি জাগে তব মনে
শত নওরোজের আনন্দেরও বাড়া
ঘটে গেল একদিনে
প্রিয়া দরশনে ?

জান মরিয়ম, তোমাকে দেখে আজ যেন আমার মনের মধ্যে অমনি আর একটি কবিতা উঁকিঝুঁকি দিচ্ছে—

এই সামান্য নর্তকীর প্রতি আপনার এত অনুগ্রহ জাঁহাপনা ?

অনুগ্রহ নয় মরিয়ম—প্রথম দর্শনেই তোমায় আমি ভালবেসেছি—

মরিয়ম দুবার নত হয়ে কুর্নিশ জানায়।

কিন্তু আজ আর নয়—রাত্রি প্রায় তৃতীয় প্রহর হলো—এবারে তুমি বিশ্রাম কর—কাল আবার দেখা হবে—আজ তুমি দীর্ঘ পথশ্রমে ক্লান্ত—পরিশ্রান্ত—বাবুর কক্ষ থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেল।

কিন্তু মরিয়মের চোখে যেন ঘুম ছিল না। সে এসে আবার খোলা বাতায়নটার সামনে দাঁড়াল।

কোথায় হিন্দুস্থান আর কোথায় কাবুল! দীর্ঘ পথ। সহসা ধুপ্ করে একটা শব্দ হতেই চমকে ফিরে তাকায় মরিয়ম।

আগাগোড়া কালো উড়নীতে মুখ ঢাকা দীর্ঘকায় এক পুরুষ—বাতায়ন পথে কক্ষমধ্যে লাফিয়ে তার সামনে এসে পড়ল।

কে—কে—ভয়ে বিস্ময়ে চকিতে কয়েক পা পিছিয়ে যায় মরিয়ম।

চিনতে পারছো না নর্তকী মরিয়ম!

কে ?

আগন্তুক ততক্ষণে মুখ থেকে উড়নী সরিয়ে নিয়েছে।

তু—তুমি—

হ্যাঁ—বিবিসাহেবা—আমি রণবীর সিংহ—

রণবীর ?

হ্যাঁ—ছায়ার মত তোমার পিছনে পিছনে এসেছি—বিশ্বাসঘাতিনী—কুলত্যাগিনী—ধর্মত্যাগিনী—

আর কিছু ?

ইচ্ছা করছে কি জানিস, এ মুহূর্তে স্বৈরিণী—

বলে ফেল—

তোর গলায় পা দিয়ে শ্বাস বন্ধ করে তোকে হত্যা করি।

কিন্তু সে সুযোগ তোমায় আমি দেবো না রণবীর—তার আগেই—

চকিতে রণবীর কটিদেশ থেকে ধারালো ছুরিকা একটা টেনে বের করে—মরিয়মের কথা শেষ হবার আগেই। ঘরের দীপালোকে সেই ছুরির ফলা ঝিলমিল করে ওঠে—এবং চক্ষের পলকে সেই তীক্ষ্ণ ধারালো ছুরিকা রণবীর নিক্ষেপ করে মরিয়মকে লক্ষ্য করে।

॥ ৭ ॥

পার্বতীর নির্লজ্জতায় গাঙ্গ যেন স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল। পার্বতী যে এত বড়

নির্লজ্জ হতে পারে—তার চোখের সামনে রাজকন্যা হয়ে কেবলমাত্র এক পরপুরুষই নয় সামান্য এক সৈনিককে ঐভাবে বুকের মধ্যে টেনে নিতে পারে এ যেন গাঙ্গের চিন্তারও অতীত ছিল। কয়েকটি মুহূর্ত তাই বুঝি বোবা বিস্ময়ে চেয়ে থাকে গাঙ্গ ঐ অশ্বারূঢ় যুগল মূর্তির দিকে। মুখ দিয়ে একটি শব্দ পর্যন্ত নির্গত হয় না।

হাতের উৎক্ষিপ্ত উদ্যত বর্শা হাতের মুঠোর মধ্যেই ধরা থাকে।

কথা বলে বীরেন্দ্রই—

বলে, মহারাজ—অশালীনতা যদি কিছু প্রকাশ পেয়ে থাকে আমাদের ব্যবহারে তা ক্ষমা করবেন। আমি আপনার ভগিনীর পাণিপ্রার্থী—

বীরেন্দ্র!

হ্যাঁ মহারাজ—তাকে আমি ভালবাসি—পার্বতীও আমায় ভালবাসে—

স্পর্ধা—স্পর্ধা তোমার—বীরেন্দ্র—সামান্য বেতনভুক সৈনিক—পথের কুকুর—রাজভোগের দিকে তুমি লোভের জিহ্বা প্রসারিত করেছো—তিক্ত কটু আক্রোশভরা কণ্ঠে কথাগুলো বলে গাঙ্গ।

প্রচণ্ড আক্রোশে তার দেহ ও মন যেন জ্বলছিল। ইচ্ছা হচ্ছিল হাতের তীক্ষ্ণ সূচাগ্র বর্শার ফলকে ঐ লোভী দুর্বিনীত কুকুরটাকে মাটির সঙ্গে গেঁথে ফেলে। কিন্তু উপায় ছিল না তার—নির্লজ্জা পার্বতী তখনো অশ্বপৃষ্ঠে বসে বীরেন্দ্রকে দুহাতে আঁকড়ে ছিল।

কিন্তু কর্কশ আক্রোশভরা কণ্ঠে গালি দিয়ে গাঙ্গ কথা বললেও বীরেন্দ্র সংযম হারায় না। সংযত শান্তকণ্ঠে আবার বলে, মিথ্যা নয় মহারাজ, সামান্য বেতনভুক সৈনিক আমি—কিন্তু বংশপরিচয়ে আমি খুব হীন নই—ছোটও নই—আর আমার আকাঙ্ক্ষার কথা যদি বলেন তো—ভালবাসার অধিকার প্রত্যেক মানুষেরই আছে—সুন্দর প্রস্ফুটিত গোলাপ ফুলটিকে কে না ভালবাসে মহারাজ—

পার্বতী—নেমে এসো ঐ অশ্বপৃষ্ঠ থেকে। গাঙ্গ এবার ভগিনীর দিকে তাকিয়ে কথাগুলো বললো—বীরেন্দ্রর কথার জবাব দেওয়া দূরে থাক তার দিকে তাকাল না পর্যন্ত।

দাদা?

নেমে এসো।

পার্বতী বোধ করি তথাপি ইতস্তত করছিল কিন্তু বীরেন্দ্রই তাকে অশ্বপৃষ্ঠ থেকে নামিয়ে দিল—পার্বতী ভূমিতলে দাঁড়াল।

এবারে গাঙ্গ নিজের অশ্ব থেকে অবতরণ করে পার্বতীর দিকে তাকিয়ে বললে, আমার এই অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করে প্রাসাদে ফিরে যাও।

পার্বতী নড়ে না। স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

বীরেন্দ্র বলে, যাও পার্বতী।

পার্বতী বীরেন্দ্রর দিকে মুখ তুলে তাকায় জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে।

বীরেন্দ্র আবার বলে, যাও।

বীরেন্দ্র।

যাও পার্বতী—যোগ্য সম্মানের সঙ্গেই আমার অধিকার দিয়ে তোমাকে আমি অর্জন করে নিয়ে আসবো—অপেক্ষা করো তুমি আমার জন্য—এবং শেষ অনুরোধ বিশ্বাস হারিও না। পার্বতী আর কোন কথা বললো না, প্রতিবাদ জানাল না—নিঃশব্দে গিয়ে অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করল। ধীরে ধীরে অশ্বারূঢ় হয়ে প্রাসাদ অভিমুখে অশ্ব চালনা করে।

বীরেন্দ্র অতঃপর নিজের অশ্বের লাগামটা টেনে যেতে যাবে—গাঙ্গ তাকে বাধা দিল।

দাঁড়াও বীরেন্দ্র।

মহারাজ দাঁড়াবার আর কোন অতঃপর প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি না আপনার নির্দেশে—

বীরেন্দ্র।

হ্যাঁ মহারাজ গাঙ্গ—আজ থেকে আমি আপনার বেতনভুক সৈনিকের পদে ইস্তফা দিলাম—

বীরেন্দ্র ?

বলল বীরেন্দ্র সিংহ—কারণ আজ আর আমি আপনার বেতনভুক কর্মচারী নই—আভিজাত্যে বংশগৌরবে কেউ আমরা কারো চাইতে ন্যূন নই। বলে বীরেন্দ্র আবার অশ্বচালনার জন্য অশ্বের বল্গা আকর্ষণ করে।

বিদ্যুৎগতিতে মহারাজ গাঙ্গ তার কটিদেশে থেকে তরবারি টেনে বের করে—দাঁড়াও।

বীরেন্দ্র সিংহ অশ্বের গতি রোধ করল।

নেমে এসো অশ্বপৃষ্ঠ থেকে।

আহত ক্লান্ত বীরেন্দ্র আর যেন অশ্বপৃষ্ঠে বসে থাকতে পারছিল না। একটু বিশ্রামের তার একান্ত প্রয়োজন—সর্বাঙ্গ রুধিরাপ্লুত—বেদনায় সর্বদেহ জর্জরিত। তথাপি সঙ্গে সঙ্গে অশ্বপৃষ্ঠ হতে অবতরণ করল বীরেন্দ্র সিংহ।

তোমার অসি উন্মোচন কর বীরেন্দ্র—

বীরেন্দ্র ক্লান্ত অবশ হাতে অসিকোষ থেকে অসি টেনে বের করে। মহারাজ আজ আমি ক্লান্ত—আপনার মুখোমুখি দাঁড়াতে হবে মীমাংসার জন্য সে তো আমি জানতামই—কিন্তু আপনি যে আমাকে সুস্থ হবার সময়টুকুও দেবেন না বুঝতে পারি নি। বিশ্রাম করতে পারি নি—বেশ আমি প্রস্তুত—

পার্বতী চলে যায় নি। পথিপার্শ্বে এক পাহাড়ের আড়ালে আত্মগোপন করে তখনও দাঁড়িয়েছিল কারণ সে জ্যেষ্ঠের চোখের দিকে তাকিয়েই বুঝতে পেরেছিল তার সহোদর বীরেন্দ্রকে সহজে নিষ্কৃতি দেবে না। অন্য সময় হলে পার্বতী চিন্তা করত না। সে জানত বীরেন্দ্রর অসিচালনায় নৈপুণ্যের কথা—বীরেন্দ্রর শক্তিতে তার পরিপূর্ণ বিশ্বাস ছিল—কিন্তু আজ বীরেন্দ্র আহত—রণক্লান্ত—

দুর্ধর্ষ অসিযোদ্ধা তার জ্যেষ্ঠের সঙ্গে অসি হাতে মুখোমুখি দাঁড়াবার মত আজ বীরেন্দ্রর ক্ষমতা দৈহিক শক্তি কোনটাই ছিল না। বিপর্যয় একটা অনিবার্য।

তাই সে দূরে যায় নি—অনতিদূরেই দাঁড়িয়ে ছিল—অপেক্ষায়। অপেক্ষা করছিল শেষ পর্যন্ত কি ঘটে সেটা দেখবার জন্য। এবং তার অনুমান যে মিথ্যা নয় সেটা সত্য প্রমাণিত হতেও দেরি হয় না।

গাঙ্গ বীরেন্দ্রর প্রতি অসি উত্তোলন করবার সঙ্গে সঙ্গেই ছুটে এসে চকিতে অশ্বপৃষ্ঠ থেকে মাটিতে লাফিয়ে পড়ে।

দাঁড়াও—দাঁড়াও দাদা—

গাঙ্গ থমকে দাঁড়ায় ঘটনার দ্রুত আকস্মিকতায়।

বীরেন্দ্র সিংহও থমকে দাঁড়িয়েছিল। হতভম্ব—বিমূঢ়।

পার্বতী ক্ষিপ্রহস্তে বীরেন্দ্রর হাত থেকে অসিটা ছিনিয়ে নিয়ে মুহূর্তে জ্যেষ্ঠের মুখোমুখি এসে দাঁড়াল। দু চোখে পার্বতীর যেন আগুনের শিখা। আলুলায়িত কুন্তল। এসো দাদা আমার স্বামী—

পার্বতী?

হ্যাঁ দাদা, বীরেন্দ্র আমার স্বামী—সে আজ আহত ক্লান্ত—তরবারিমুখেই যদি আজ তোমার মীমাংসার প্রয়োজন হয়ে থাকে তো—এসো আমি প্রস্তুত—

পার্বতী?

দাদা—তুমি তো তোমার ছোট বোনটিকে ভাল করেই চেন—ছোটবেলায় মা-বাবাকে হারিয়েছি—মনেও নেই ভাল করে তাদের কথা—তোমার কাছেই তো সব আমার শিক্ষা—

তাহলে কি এই আমি জানব ঐ রাজদ্রোহী ভৃত্যটা —

রাজদ্রোহী!

নিশ্চয়ই। যে রাজার বিরুদ্ধাচরণ করে সে রাজদ্রোহী ব্যতীত কি?

আশ্চর্য দাদা—জানতাম না যে রাজার বিধানে কাউকে ভালবেসে যাচঞা করাটা রাজদ্রোহিতা—আর ভৃত্য—একদিন আমার স্বামী তোমাদের বেতনভুক থাকলেও আজ তো আর নেই—ওকে তোমার ভৃত্য তুমি বলতে পার না—

ওঃ, এই তাহলে তোর সিদ্ধান্ত?

শুধু সিদ্ধান্তই নয় দাদা—শেষ সিদ্ধান্ত।

বেশ তবে তাই হোক—তবে আমারও শেষ কথা—শেষ সিদ্ধান্ত তুমি শুনে নাও পার্বতী, তুমি যদি ঐ বীরেন্দ্রর গলাতেই মালা দেবে স্থির করে থাক তবে আমার সঙ্গেও তোমার সকল সম্পর্কের এইখানেই শেষ—

সে কি আমি জানতাম না—তুমি না বললেও সেজন্য আমি প্রস্তুতই ছিলাম—শান্ত ধীরকণ্ঠে কথাগুলো বলে পার্বতী।

অতঃপর পার্বতী বীরেন্দ্রর দিকে অগ্রসর হয়ে বলে, চল—

বীরেন্দ্র স্তব্ধ নির্বাক হয়ে মুষ্টিবদ্ধ তরবারি হাতে দাঁড়িয়ে ছিল। অকস্মাৎ যে পার্বতীর রঙ্গভূমিতে আবির্ভাব ঘটবে—পরিস্থিতিটা এমনি দাঁড়াবে—ক্ষণপূর্বে স্বপ্নেরও অতীত ছিল বুঝি তার।

বীরেন্দ্র বলে, পার্বতী—

পার্বতী শান্ত কণ্ঠে বলে, চল আমরা যাই—

পার্বতী আর বীরেন্দ্র এগিয়ে যায় অতঃপর গাঙ্গকে প্রণাম করতে বুঝি, কিন্তু গাঙ্গ সরে দাঁড়ায়।

পার্বতী থমকে দাঁড়ায়।

বলে, প্রণাম নেবে না ?

তোমার সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নেই।

দাদা—প্রণাম তুমি আমার নাই নিলে, কিন্তু যাবার আগে একটা কথা বলে যাই—অর্থ, ঐশ্বর্য ও কুল দিয়েই মানুষের মর্যাদা স্থির করো না—মানুষের সত্যকারের মর্যাদা তার চাইতে অনেক বড়—আর ভালবাসার অধিকার সবারই আছে ; চল বীরেন্দ্র। বীরেন্দ্রর হাত ধরে পার্বতী অগ্রসর হয়। অশ্বটি পর্যন্ত ওরা ব্যবহার করে না। কারণ অশ্বটি রাজার সম্পত্তি।

সূর্য অস্ত গিয়েছে আরাবল্লীর শীর্ষ ছুঁয়ে কিছুক্ষণ পূর্বে। আকাশের পশ্চিম প্রান্তে একটা রক্তিমাভা ছড়িয়ে রয়েছে—যেন বিষণ্ণ বেদনার মত—সন্ধ্যার অত্যাসন্ন অন্ধকার কুয়াশার মত নামছে—বিশ্বচরাচরে ছড়িয়ে পড়বার জন্য। পাহাড়ের উঁচু-নীচু বাঁকে ধীরে ধীরে যুগলমূর্তি মিলিয়ে গেল।

গাঙ্গ তবু দাঁড়িয়ে থাকে। তার সমস্ত শক্তি যেন হরণ করে নিয়ে গিয়েছে পার্বতী।

পার্বতী চলে গেল—সেই পার্বতী। পিতৃমাতৃহারা যে ছোট একমাত্র সহোদরাকে সে এতকাল স্নেহে মমতায় বুক দিয়ে আগলে এসেছে। যে বোনটির একদিন রাত্রে তার গলা ধরে আঁকড়ে না শুলে ঘুম আসত না। যে বোনটি তাকে ছাড়া দুনিয়ায় কাউকে জানত না। সেই পার্বতী চলে গেল। এক তুচ্ছ সৈনিকের হাত ধরে চলে গেল। তার নিজের মর্যাদার দিকে—তার রাজপ্রাসাদের মর্যাদার দিকে—তার জ্যেষ্ঠের মর্যাদার দিকে একটিবার ফিরেও তাকাল না। বললে—ঐ সামান্য বেতনভুক সৈনিক বীরেন্দ্রই তার স্বামী। আজ সেই তার সর্বাপেক্ষা আপনজন।

ক্লান্ত অবসন্ন মন নিয়ে গাঙ্গ যখন প্রাসাদে ফিরে এলো—চিতাগ্নি তখনো নির্বাপিত হয় নি। সুরেজমল-মহিষীর আত্মাহুতির চিতাগ্নি তখনো একেবারে নির্বাপিত হয় নি—অন্ধকার চত্বরে চিতাগ্নির শেষশিখা তখনো ধিকি ধিকি জ্বলছে। অগুরু চন্দনের গন্ধে বাতাস ভরপুর। পুরাঙ্গনারা সব চারিদিকে শ্রদ্ধাবনত শিরে দণ্ডায়মান—

গাঙ্গের সেই চিতাগ্নির দিকে তাকিয়ে কেন যেন মনে হলো—ঐ চিতাগ্নির সঙ্গে সঙ্গে বুঝি তারও সব কিছু আজ পুড়ে ছাই হয়ে গেল।

রাত্রি তার ঘন কালো পক্ষ বিস্তার করে পৃথিবী যেন গ্রাস করেছে—ঘন অন্ধকারে চারিদিক যেন কালো হয়ে গিয়েছে। সেই অন্ধকারের মধ্যে দুর্গম অসমতল পাহাড়ী পথ ধরে দুজনে চলেছিল। পার্বতী আর বীরেন্দ্র সিংহ। ক্লান্ত অবসন্ন বীরেন্দ্র সিংহ চলতে যেন আর পারছিল না। পা যেন আর চলে

না। লোহার মত ভারী মনে হয় পা দুটো।

আর রাজকন্যা—আদরের দুলালী পার্বতী—সেও তো কখনো এত পথ পদব্রজে অতিক্রম করে নি—পায়ে হাঁটায় অভ্যস্তা নয়। তারও পা দুটো যেন ভেঙে আসছিল—পাহাড়ী অসমতল পথ ধরে হাঁপাতে হাঁপাতে সে চলেছিল।

উঃ, কি অন্ধকার। ক্লান্ত অবসন্ন কণ্ঠে এক সময় বলে বীরেন্দ্র।

পার্বতী শুধায়, বড় কি কষ্ট হচ্ছে বীরেন্দ্র?

আমি সৈনিক পার্বতী—তাছাড়া দুঃস্থ ঘরের সন্তান—দুঃখকষ্টের ভিতর দিয়েই তো বড় হয়েছি—এ কষ্ট আমার কাছে কিছুই নয়—কষ্ট হচ্ছে তোমার—ধনীর দুলালী তুমি—চিরদিন ঐশ্বর্যে আরামে আয়েসে পালিতা—

না, না—কে বললে তোমায়, আমার এতটুকু কষ্ট হচ্ছে না—কোন কষ্ট হচ্ছে না বীরেন্দ্র—বরং তুমিই আহত ক্লান্ত—তোমার যে কি কষ্ট হচ্ছে এই পথ চলতে আমি বুঝতে পারছি।

আমার সকল কষ্ট তুচ্ছ হয়ে গিয়েছে পার্বতী—তোমাকে পাশে পেয়ে—

সামনে ডাইনে বাঁয়ে ঊর্ধ্বে কিছুই তো দেখা যাচ্ছে না—রাত্রি কয় প্রহর হলো তাও বুঝতে পারছি না।

ঐ দেখ পার্বতী।

কি?

দেখ—ঐ আকাশের দিকে চেয়ে দেখো। বীরেন্দ্র পার্শ্ববর্তী পার্বতীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

আরাবল্লীর অন্ধকার শীর্ষ ছুঁয়ে এক ফালি চাঁদ দেখা দিয়েছে। অন্ধকারের ভালে যেন একটি সোনার চন্দ্রকলা।

চাঁদ?

হ্যাঁ।

দেখতে দেখতে চাঁদের মৃদু আলোয় দুঃসহ অন্ধকার দূরীভূত হয়। চারিদিকের পাহাড় বন্য গুল্মলতা বৃক্ষাদি সেই আলোর স্পর্শে যেন সহসা চোখ মেলে তাকায়। যেন ঘুম ভেঙে তাকায়। আমরা কোথায় এখন?

জানি না।

কোথায় যাবে?

উদয়পুরে যাবো ভাবছি—মহারাজ গাঙ্গের খুল্লতাত কুমার উদো বহুবার আমাকে উদয়পুরে যেতে বলেছেন, কিন্তু যাই নি আমি—

তুমি পরিশ্রমে হাঁপাচ্ছো, একটু বসবে—একটু বিশ্রাম নাও।

এ জায়গাটা খুব নিরাপদ নয় পার্বতী—

তা হোক, একটু বসে তুমি বিশ্রাম নিয়ে নাও।

শরীরের যে অবস্থা আমার পার্বতী, যতক্ষণ চলবে—চলতে পারবো, কিন্তু একবার বসলে আর হয়ত উঠে দাঁড়াতেই পারবো না।

উদয়পুর কত দূর?

মনে হচ্ছে আরো ক্রোশ দুই পথ হবে।

তাহলে তুমি বোস, একটু বিশ্রাম নিয়ে নাও বীরেন্দ্র—এই অবসন্ন ক্লান্ত আহত অবস্থায় কিছুতেই তুমি একটানা পদব্রজে যেতে পারবে না। ঐ পাথরটার ওপর বোস।

পার্বতী—

বোস।

পার্বতী একপ্রকার জোর করেই বীরেন্দ্রকে পাথরটার উপর বসিয়ে দেয়।

আঃ।

একটা আরামের নিঃশ্বাস নেয় বীরেন্দ্র—সত্যিই সে আর যেন চলতে পারছিল না।

বীরেন্দ্র—

বল পার্বতী।

তুমি আমার কোলে মাথা রেখে একটু ঘুমোও।

না, না—

কেন আমার কথার অবাধ্য হচ্ছো—এসো। সস্নেহে পার্বতী বীরেন্দ্রকে আকর্ষণ করে। বীরেন্দ্র সে অনুরোধ ও আকর্ষণকে উপেক্ষা করতে পারে না—ক্লান্ত দেহটা এলিয়ে দিল পাথরের উপর—মাথাটা ন্যস্ত করলো পার্বতীর ক্রোড়ে।

ঘুমোও—একটু ঘুমোলেই দেখো অনেকটা সুস্থ বোধ করবে।

ঘুমে আমার দু-চোখ জড়িয়ে আসছে পার্বতী—কিন্তু—

কিন্তু আবার কি, ঘুমোও।

একাকিনী তুমি এই দুর্গম জায়গায় জেগে বসে থাকবে আর আমি নিশ্চিন্তে ঘুমাবো।

ভুলে যাচ্ছো আমি রাজপুতের মেয়ে। সে যেমন আত্মরক্ষা করতে জানে তেমনি আত্মরক্ষার ক্ষমতাও রাখে বাহুতে। ভয় নেই, তুমি ঘুমোও—

কেন তুমি এলে পার্বতী—এভাবে কেন আমার সঙ্গে চলে এলে—

জান না কেন এলাম?

কেন?

স্বামীর পথই যে স্ত্রীর পথ—তোমার পথই যে আমার পথ। দ্বিতীয় পথ আমার কোথায়?

কত কষ্ট হয়ত এখন সহ্য করতে হবে।

কষ্ট কি আবার!

কষ্ট বৈকি পার্বতী—রাজার দুলালী তুমি—

আবার ঐ কথা? এককালে ছিলাম, আজ তোমার স্ত্রী—কিন্তু আর কথা বলো না, ঘুমোও।

কথা বলার আর শক্তিও ছিল না বীরেন্দ্রর। পথক্লান্তিতে যেন দু-চোখের পাতা সীসার মত ভারী হয়ে বুজে এসেছে। চোখ মেলে তাকাতেও সে আর পারছে না তখন।

অচিরেই গভীর নিদ্রায় ঢলে পড়ে বীরেন্দ্র। আর নিদ্রিত বীরেন্দ্রর মস্তক কোলে নিয়ে মৃদু চন্দ্রালোকিত রাতে দুর্গম পাহাড়ের নির্জন বুকে জেগে বসে থাকে পার্বতী। চাঁদের আলো ঘুমন্ত বীরেন্দ্রর চোখেমুখে এসে পড়েছে। ক্লান্ত অবসন্ন শুষ্ক মুখখানি। গভীর মমতায় সেই মুখখানির দিকে নির্নিমেষ নয়নে চেয়ে থাকে পার্বতী।

মহারাজ সুরজমলের পাঁচটি পুত্রসন্তান হয়েছিল। সর্বজ্যেষ্ঠ পুত্র কুমার ভাগ অকালে দেহত্যাগ করে—তারই পুত্রকন্যা গাঙ্গ ও পার্বতী।

দ্বিতীয় পুত্র সুরেজমলের উদো—উদাবৎ সম্প্রদায় উদো কর্তৃকই সৃষ্ট হয়—উদো মাড়বার ও মেওয়ারের অনেক ভূসম্পত্তি নিজ অধিকারে পান। এবং তার মধ্যে নিমাজ, জয়তারম, শুদ্দোচি, বীরাতিয়া ও রায়পুর নগর বিশেষ প্রসিদ্ধ।

সুরজমলের তৃতীয় পুত্র শাগ। শাগ ঐ সময় বুরবো-তে অবস্থান করছিলেন।

সুরজমলের মৃত্যুর পর ভাগ-তনয় গাঙ্গ মাড়বারের সিংহাসনে উপবেশন করবে কেন—এবং মহারাজ সুরজমল যে সেই ব্যবস্থাই করে গেছেন শাগ সেটা শুনেছিল এবং শোনা অবধি মনে মনে সে গর্জাচ্ছিল। সুরজমলের সেই অভিলাষ যাতে পূর্ণ না হয় শাগ তলে তলে সেই চক্রান্তই করছিল। গোপন চরমুখে বুরবো-তে ঐ দিনই মহারাজ সুরজমলের মৃত্যুসংবাদটা শাগের কর্ণগোচর হয়—সঙ্গে সঙ্গে সে তার বিশ্বস্ত অনুচর রায়মলকে যোধপুরে প্রেরণ করে। রায়মল দ্রুতগামী অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করে ঐ সময় ঐ পথ ধরেই যোধপুরের দিকে আসছিল।

ক্লান্ত অবসন্ন পার্বতী বীরেন্দ্রর মস্তক কোলে নিয়ে বসে থাকতে থাকতে নিদ্রাভিভূত হয়ে পড়েছিল বুঝি নিজেরই অজ্ঞাতে—সে জানতেও পারে নি কখন ঐ পথ দিয়ে যেতে যেতে রায়মলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে সে।

অপরূপ রূপলাবণ্যবতী এক তরুণীকে এক নিদ্রিত সৈনিকের মস্তক ক্রোড়ে নিদ্রাভিভূতা দেখে অশ্বের বল্গা আকর্ষণ করে দাঁড়ায় রায়মল এবং পার্বতীর রূপে রায়মল আকৃষ্ট হয়—মনের মধ্যে তার দুর্বার এক লোভ জাগে—এবং সঙ্গে সঙ্গে সে স্থির করে ঘুমন্ত ঐ সৈনিককে হত্যা করে ঐ নারীরত্ন সে লাভ করবে।

কোষ হতে তীক্ষ্ন ক্ষুরধার অসি উন্মুক্ত করে নিঃশব্দে অশ্বপৃষ্ঠে হতে অবতরণ করে নিদ্রিত বীরেন্দ্রর দিকে পায়ে পায়ে অগ্রসর হয় রায়মল।

॥ ৮ ॥

রণবীরের নিক্ষিপ্ত তীক্ষ্ন ছুরিকা কিন্তু মরিয়মকে স্পর্শ করতে পারে না। চক্ষের পলকে যেন মরিয়মের পশ্চাতে খোলা বাতায়নপথে সংগে সংগেই প্রায় বলতে গেলে এক পুরুষমূর্তির আবির্ভাব ঘটে ঐ কক্ষমধ্যে এবং তার হাতের নিক্ষিপ্ত তরবারি নিক্ষিপ্ত ছুরিকাকে প্রতিহত করে ছুটে এসে। সমস্ত ঘটনাটা যেন পলকে

ঘটে যায়।···অবিশ্বাস্য ভাবে ঘটে যায়।

যে বাতায়নপথে মুহূর্ত পূর্বে রণবীরের কক্ষমধ্যে আবির্ভাব ঘটেছিল সেই বাতায়নপথেই দ্বিতীয় পুরুষমূর্তি ঐ কক্ষে প্রবেশ করেছিল।

নিক্ষিপ্ত তরবারি ও ছুরিকা পরস্পরের সঙ্গে প্রতিহত হয়ে ঠুং করে একটা শব্দ করে কক্ষের প্রস্তরনির্মিত মেঝের পরে ছিটকে পড়ে।

মরিয়ম ও রণবীর দুজনাই যুগপৎ কক্ষের মধ্যে আবির্ভূত তৃতীয় ঐ আগন্তুকের দিকে তাকিয়েছিল। এক তরুণ মুঘল সৈনিক। পরনে মুঘল সৈন্যের বেশ। কটিদেশে তরবারীর শূন্য খাপটা—মস্তকে মুঘল সৈন্যের শিরস্ত্রাণ। ছোট নুর দাড়ি—মেহেদীর রঙে রাঙানো। অপূর্ব সুন্দর দেখতে আগন্তুক মুঘল সৈনিক—বয়েস খুব বেশী হবে না—পঞ্চবিংশতি বর্ষের মধ্যেই হবে বলে প্রতীয়মান হয়। পাতলা দীঘল চেহারা। টকটকে গৌর গাত্রবর্ণ। লম্বাটে ধরনের মুখখানি।

কথা বললে প্রথমে আগন্তুক ঐ মুঘল সৈনিকই, তাহলে তুমি একজন সত্যি সত্যিই ছদ্মবেশী রাজপুত গুপ্তচর যুবক—আমার অনুমান তাহলে মিথ্যা নয়—তুমি রেশমের ব্যবসায়ী নও—

রণবীরের অঙ্গে মুঘল সৈনিকের বেশ ছিল। সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ জানায় রণবীর, না, তোমার অনুমান মিথ্যা নয়—আমি রেশমের ব্যবসায়ী নই বটে সত্যি—তবে আমি গুপ্তচরও নই কুবলাই খাঁ—

ওয়া-ওয়া—তুমি আমার পরিচয়টাও জান দেখছি। কুবলাই খাঁ বলে ওঠে সঙ্গে সঙ্গে।

জানতে পেরেছি বৈকি। নির্ভীক কণ্ঠে জবাব দেয় রণবীর।

উত্তম। তা গুপ্তচর যদি সত্যিই তুমি নও—ত কে তুমি—কি তোমার সত্য পরিচয় হিন্দু যবক ?

তাতে করে কি তোমার কোন প্রয়োজন আছে খাঁ সাহেব ?

আছে বৈকি, সুদূর হিন্দুস্থান থেকে দুর্গম পথ অতিক্রম করে তুমি আমাদের কাবুলে এসেছ—

তোমার কাবুলই বটে—আমি একা কেন খাঁ সাহেব—তাকি তুমিও আস নি সুদূর রাজস্থান নাগোর থেকে এই দুর্গম কাবুলে ?

রণবীরের প্রশ্নে যেন সহসা চমকে ওঠে কুবলাই খাঁ। তীক্ষ্ন দৃষ্টিতে কুবলাই খাঁ রণবীরের মুখের দিকে তাকায়।

চমকে উঠলে না—কিন্তু আমি তোমায় চিনলেও এখনো ত তুমি আমাকে চিনতেই পার নি কুবলাই খাঁ—

কে—কে তুমি ?

আর যেই হই না কেন আমি—অন্তত জেনো তোমার মত একজন সত্যি-কারের হীন-জঘন্যচরিত্র গুপ্তচর নই।

ইতিমধ্যে একসময় কুবলাই খাঁ ভূপতিত অসিটা হাতে তুলে নিয়ে খাপের মধ্যে ভরেছিল। চকিতে খাপ থেকে সেই সুতীক্ষ্ন তরবারি টেনে বের করে বলে

ওঠে, সাবধান যুবক—

মৃত্যুকে ভয় করে না হিন্দু রাজপুত—একথা নিশ্চয়ই তোমার ভাল জানা আছে কুবলাই খাঁ। রণবীর ব্যঙ্গভরে বলে ওঠে সঙ্গে সঙ্গে ভূপাতিত ছোরাটা ভূমি থেকে তুলে নিয়ে।

মৃত্যুকে ভয় কর না—না ?

না। রণবীর পুনরায় বলে। তারপরই একটু থেমে বলে রণবীর, তাহলে এখন দেখতে পাচ্ছি—হীন চক্রান্তকারী তোমার প্রভু দৌলত খাঁ ষড়যন্ত্রের জাল বেশ ভাল ভাবেই বিছিয়েছে—প্রথমে তুমি কুবলাই খাঁ—পিছনে নর্তকী—কুলটা মরিয়ম—

ঘৃতে যেন অগ্নির স্পর্শ লাগে। দপ্ করে জ্বলে ওঠে কুবলাই খাঁ এবং আবারও অসি উদ্যত করেছিল রণবীরের প্রতি কিন্তু বাধা দিল মরিয়ম এবারে। এতক্ষণ সে এক পাশে প্রস্তর মূর্তির মতই দাঁড়িয়ে ছিল। উভয়ের বাক্যালাপ শুনছিল বোধ করি। নির্বাক—নিশ্চল।

কুবলাই খাঁ অসি কোষমুক্ত করতেই মরিয়ম সঙ্গে সঙ্গে চোখের পলকে ছুটে এসে উভয়ের মধ্যস্থলে দাঁড়ায় দুবাহু প্রসারিত করে এবং ভয়ার্ত মিনতি-করুণ কণ্ঠে বলে ওঠে, না, না—কুবলাই খাঁ—

বিবি সাহেবা। কুবলাই খাঁ পিছিয়ে যায় সসম্ভ্রমে।

না খাঁ সাহেব—মরিয়ম আবার বলে, অস্ত্র সংবরণ করুন—

কুবলাই খাঁ থমকে দাঁড়াল বাধা পেয়ে, তারপরই দুই হাতে তালি দিয়ে সংকেত জানাতেই দুইজন সশস্ত্র মুঘল সৈনিক কক্ষে এসে প্রবেশ করল।

কুবলাই খাঁ তাদের দিকে তাকিয়ে নির্দেশ দিল—

এই যুবককে বন্দী কর।

আশ্চর্য !

মরিয়ম ভেবেছিল হয়ত রণবীর বাধা দেবে—সহজে বন্দিত্ব স্বীকার করে নেবে না—কিন্তু তার কিছুই হলো না। সে যেন হঠাৎ শান্ত হয়ে গেল। সে নিজেকে মোঘল সৈনিকদের হাতে সমর্পণ করল নিঃশব্দে শান্তভাবে।

সৈনিকদ্বয় তাকে বন্দী করে কক্ষ ত্যাগ করে চলে গেল অতঃপর। কুবলাই খাঁ এবারে অসি কোষবদ্ধ করে মরিয়মের দিকে তাকিয়ে বললে, আমি তাহলে এবার আসি বিবিসাহেবা—আপনার বিনা অনুমতিতে আপনার কক্ষে প্রবেশের জন্য ক্ষমা চাইছি—অধীনের গোস্তাকী অনুগ্রহপূর্বক মাপ করে নেবেন।

খাঁ সাহেব। মৃদুকণ্ঠে ডাকে মরিয়ম প্রস্থানোদ্যত কুবলাই খাঁকে সম্বোধন করে।

বলুন। কুবলাই খাঁ ফিরে দাঁড়াল—মরিয়মের দিকে তাকাল।

ওকে কোথায় পাঠালেন বন্দী করে ঐ ভাবে ?

মৃদু হাসে কুবলাই খাঁ। বলে, কারাগারে।

কারাগারে !

হ্যাঁ—কাল সম্রাটের প্রকাশ্য দরবারে ওকে হাজির করা হবে—তারপর হবে

ওর বিচার।

বিচার ?

হ্যাঁ।

সম্রাট বিচার করবেন কেন ?

কারণ ঐ যুবক, আমার ধারণা, আপনার পরিচিত হলেও এক ছদ্মবেশী গুপ্তচর।

তিনি কি খুব গুরুতর শাস্তি দেবেন ?

তাই ত স্বাভাবিক—গুপ্তচর-বৃত্তি নিকৃষ্টতম অপরাধ—যে অপরাধে প্রাণদণ্ড পর্যন্ত—

না, না—

কিন্তু বিবিসাহেবা—স্বয়ং সম্রাটের অনুগৃহীতা মাননীয়া মেহেমান আপনি—আপনি একজন সামান্য হিন্দু রাজপুত গুপ্তচরের প্রাণদণ্ডের জন্য এত কাতরই বা বোধ করছেন কেন ?

আপনি ভুল করছেন খাঁ সাহেব—

ভুল করছি।

হ্যাঁ—ও গুপ্তচর নয়।

কুবলাই খাঁ মৃদু হাসল। তারপর বলে, বেশ ত—তা যদি না হয়—সম্রাট অবিবেচক নন—বিচারে নিশ্চয়ই সে মুক্তি পাবে—আচ্ছা আমি চলি—আপনি নির্ভাবনায় থাকুন। এই প্রমোদভবনের প্রহরায় আমি আছি—

কুবলাই খাঁ অতঃপর কক্ষ হতে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেল। মরিয়ম স্থাণুর মতই যেন একাকিনী ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকে।

রণবীর। রণবীর তাহলে তাকে গোপনে গোপনে অনুসরণ করে সুদূর নাগোর থেকে সুদীর্ঘ পার্বত্যসংকুল দুস্তর পথ অতিক্রম করে এই কাবুল পর্যন্ত এসেছে।

কিন্তু কেন—কেন এসেছো তুমি রণবীর ? কেন আজও এই কুলটা যবন-উচ্ছিষ্টা নারীকে ভুলতে পার নি ? তোমার চন্দনা মরে গিয়েছে। চন্দনা আর নেই—চন্দনা আজ যবনের উচ্ছিষ্টা মরিয়ম—অনেক কাল আগেই সে মরে গিয়েছে—তার কথা আর কেন—তাকে তুমি ভুলে যাও প্রিয়তম—ভুলে যাও।

বাঁদী আনোয়ারা এসে কক্ষে ঢুকল।

বিবিসাহেবা ?

কে—ও আনার!

কি হয়েছে বিবিসাহেবা—তোমার চোখে জল ?

আনার!

বলুন বিবিসাহেবা ?

কোথায় ছিলি তুই এতক্ষণ ?

আমি ত ঘরের বাইরে অলিন্দেই ছিলাম। ভয়ে ভয়ে কোনমতে কথাগুলো বলে আনোয়ারা।

একজনকে বন্দী করে নিয়ে গেল—তুই—

দেখেছি। ওকে তুমি কিন্তু—মনে হচ্ছে খুব ভাল করেই চেনো বিবিসাহেবা।

আনোয়ারা, সম্রাটের কারাগার কোথায় জানিস? এখান থেকে কতদূর?

কারাগার এখান থেকে বেশ কিছুটা দূরে কিন্তু বন্দীকে ত সে কারাগারে নিয়ে যায় নি।

যায় নি?

না।

তবে কোথায় নিয়ে গেল বন্দীকে? ব্যগ্রকণ্ঠে শুধায় মরিয়ম।

এই প্রমোদভবনেরই একটি ঘরে বন্দীকে রাখা হয়েছে।

এই প্রমোদভবনে!

হ্যাঁ, আর দ্বারে প্রহরাতে রয়েছে ইব্রাহিম।

সে—

আনোয়ারা মৃদু হাসে, তুমি যদি বন্দীর সঙ্গে দেখা করতে চাও ত ইব্রাহিমকে বলে এখুনি আমি তার ব্যবস্থা করতে পারি বিবিসাহেবা।

পারবি আনোয়ারা—পারবি? উৎকণ্ঠায় যেন ভেঙে পড়ে মরিয়ম। গলার স্বর বুজে আসে।

কেন পারব না—এ এমন কি একটা কঠিন কাজ—এখুনি এসো না তুমি আমার সঙ্গে—তার কাছে তোমায় এখুনি নিয়ে যাচ্ছি।

বলে, চল। উৎসাহিত হয়ে মরিয়ম তখুনি যাবার জন্য এগিয়ে যায়।

কিন্তু কক্ষ থেকে বেরুতে গিয়ে থমকে দাঁড়ায় হঠাৎ দরজা বরাবর গিয়ে। ইতঃস্তত করে বলে, না—

কি হলো? প্রশ্ন করে আনোয়ারা।

কুবলাই খাঁ—

হেসে ফেলে আনোয়ারা। বলে, ভয় নেই সে প্রাসাদে সম্রাটের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছে।

সম্রাটের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছে? এই রাত্রে?

হ্যাঁ।

তুই ঠিক জানিস?

তাই ত ইব্রাহিমকে বলে গেল—জরুরী কি নাকি সংবাদ আছে সম্রাটের কাছে, এখুনি পেশ করতে হবে—

কতক্ষণ গিয়েছে?

এই ত গেল—

সে যদি ইতিমধ্যে ফিরে আসে আবার?

ভয় নেই বিবিসাহেবা—ছোট সেনাধ্যক্ষের প্রাসাদ থেকে ফিরে আসতে রাত্রি প্রায় শেষ হয়ে যাবে! আপনি চলুন—

কিন্তু ইব্রাহিম যদি বলে দেয়—

না—মধুর হেসে আনোয়ারা বলে, সে বলবে না। সে বিষয়ে আপনি

নিশ্চিন্ত থাকুন বিবিসাহেবা—চলুন—বন্দীর সঙ্গে দেখা করতে চান ত আর দেরি করবেন না।

চল। আনোয়ারার পিছনে পিছনে মরিয়ম কক্ষ থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে এলো।

সম্রাট বাবুরের কিলকিনের প্রমোদভবনটি একেবারে নেহাত ক্ষুদ্র নয়—দুটি পর্বতের মধ্যবর্তী উপত্যকায় অনেকখানি স্থান জুড়ে গড়ে তোলা হয়েছিল সম্রাট বাবুরের প্রমোদভবনটি। সুরক্ষিত। এবং অনেকগুলো কক্ষ তার। তারই একটি নাতিপ্রশস্ত কক্ষে কুবলাই খাঁ রণবীরকে কিছুক্ষণ হলো বন্দী করে রেখে গিয়েছে।

দ্বারে প্রহরারত ভয়াবহ দৈত্যের মত চেহারার মুঘল প্রহরী ইব্রাহিম। চেহারাটা ইব্রাহিমের যেমন লম্বায় তেমনি প্রস্থে এবং শরীরও তেমনি মেদবহুল। হাঁটলে চললে মনে হয় যেন একটা গোদা হাতী থপ্ থপ্ করে চলেছে। কিলকিনের প্রমোদভবনের প্রধান প্রহরী সে। বয়েস চল্লিশের নীচে হবে না। ইতিমধ্যেই চারবার সাদী করেছে—তথাপি নারীর সাধ তার মেটে নি। প্রমোদভবনের প্রধানা বাঁদী আনোয়ারার প্রতি সে অনুরক্ত।

ছিপছিপে গড়ন বিদ্যুৎলতার মত সুন্দরী তরুণী আনোয়ারা—ঐ প্রস্তাব শুনে মনে হাসলেও মুখে কিন্তু কোন দিনই তা আজ পর্যন্ত প্রকাশ করে নি। বরং ঠারে-ঠোরে একটু-আধটু যেন প্রশ্রয়ও দেয় ইব্রাহিমকে। আসলে মজা দেখে সে ঐ বুদ্ধিতে গর্দভ হাতীর মত চেহারা ইব্রাহিমকে নিয়ে। ইব্রাহিমকে নিয়ে সে খেলা করে—কৌতুক করে। ইব্রাহিম তা বুঝতেও পারে না। প্রকৃতপক্ষে অতটা বুদ্ধিই তার নেই যে আনোয়ারার কৌতুক-খেলা সে বুঝবে। সে বরং ভাবে আনোয়ারাও তার প্রেমে পড়েছে।

আনোয়ারা ইব্রাহিম সম্পর্কে স্থিরনিশ্চিত ছিল বলেই মৃদু হেসে মরিয়মকে বলেছিল, তার কাছে তোমায় এখুনি নিয়ে যাচ্ছি।

তালাবন্ধ কক্ষের দ্বারের সামনে থপ্ থপ্ করে পায়চারি করছিল বটে ইব্রাহিম কিন্তু ঘুমে তার দুচোখের পাতা যেন বুজে আসতে চাইছিল। আজ সন্ধ্যায় সিদ্ধি আর ভাঙ্ প্রচুর পান করা হয়েছে। তার উপরে প্রচুর মিষ্টান্ন উদরসাৎ করা হয়েছে। ফলে নেশাটা হয়ে উঠেছিল রীতিমত তীব্র। কোথায় নেশার ঘোরে শয্যার ওপরে চিৎপাত হয়ে শুয়ে পরম নিশ্চিন্তে নাক ডাকিয়ে নিদ্রা দেবে—তা নয় কুবলাই খাঁ এক আপদ ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে গেল।

আনোয়ারা অল্পদূরে মরিয়মকে দাঁড় করিয়ে রেখে বলে, আমি ওকে নিয়ে সরে যাবো তার পর তুমি ঐ কক্ষে গিয়ে ঢুকো।

এগিয়ে আসে ইব্রাহিমের দিকে অতঃপর এবং ধীরে ধীরে পশ্চাৎ দিক থেকে অলক্ষ্যে এসে ডান হাতের অনামিকা দিয়ে প্রহরারত ইব্রাহিমের পৃষ্ঠদেশ স্পর্শ করে আলতো ভাবে।

সঙ্গে সঙ্গে চমকে ফিরে দাঁড়ায় ইব্রাহিম।

ইচ্ছা করেই আগাগোড়া বোরখায় ঢেকে এসেছিল আনোয়ারা নিজেকে। কোন—কোন হো তুম—প্রশ্নটা করে বটে ইব্রাহিম কিন্তু গলা তার তখন শুকিয়ে

এসেছ—ঠক্ ঠক্ করে পা দুটো কাঁপছে—কণ্ঠস্বরও জড়িয়ে যায়। এত রাত্রে আবার সামনে কে এসে দাঁড়াল?

জীন—পরী নয়ত।

আমি গো আমি।

কো—কৌন?

অলিন্দে দেওয়ালের গায়ে একটা মশাল জবলছিল, তার ক্ষীণ আলোয় সমস্ত জায়গাটা আলো-আঁধারিতে যেন কেমন রহস্যময় হয়ে উঠেছিল, কোন কিছুই স্পষ্ট করে দেখা যায় না। ঝাপসা-ঝাপসা—অস্পষ্ট—তার উপরে ভাঙের নেশা। আনোয়ারা তখন বোরখা মুখ থেকে সরিয়ে বলে, দেখ তো মেরে মেহেবুব—আমায় চিনতে পারছো কিনা—তোমার আনার—

এতক্ষণে নেশার মধ্যে খানিকটা উপলব্ধি জাগে বুঝি। আনার নামটা যেন মন্ত্রের মতই কাজ করে।

আনার।

হ্যাঁ।

আও মেরে পিয়ারী—মেরে মহব্বৎ। দু-হাত প্রসারিত করে ইব্রাহিম।

হ্যাঁ, আসি আর ওদিকে কুবলাই খাঁ এসে হাজির হোক আর কি—আনোয়ারা বলে।

জাহান্নামে যাক কুবলাই খাঁ—চল আজ তোমায় নিয়ে পিয়ারী আমি দিওয়ানা হয়ে যাবো।

তবে আমার ঘরে চল।

সেই ভাল—তাই চল।

কিন্তু তোমার বন্দী—

ও ঠিক আছে, দরওয়াজা বাইরে থেকে বন্ধ আছে—বেরুবে কি করে—

ঠিক ত—আমি একবার দেখি তাহলে—তোমার ব্যাপার ত, নেশার ঘোরে বন্ধ করেছো কিনা কে জানে।

বলতে বলতে আনোয়ারা দরোয়াজার কাছে এগিয়ে গিয়ে দেখার ভান করে, দরজাটা খুলে দিয়ে ফিরে এসে বলে, চল—মরিয়মের পাশ দিয়েই চলে যায় আনোয়ারা ইব্রাহিমকে নিয়ে।

মরিয়ম অল্প দূরে দাঁড়িয়ে আবছা আলোছায়ার মধ্যে ওদের সব কথাই শুনেছিল। ওরা চলে যেতে মরিয়ম নির্দিষ্ট কক্ষের দিকে অগ্রসর হয়।

দরজার কপাট ঠেলতেই খুলে যায়। মরিয়ম কক্ষমধ্যে পা দেয়।

॥ ৯ ॥

সুরজমলের তৃতীয় পুত্র শাগ। পার্বতী উৎসবে—যবনদের হাতে তার পিতার নিহত হবার সংবাদটা পীপার নগর থেকে ঐ দিনই গভীর রাত্রে এক দ্রুতগামী অশ্বারোহী মারফৎ তার কর্ণগোচর হয়েছিল।

প্রত্যেক দেশ ও জাতের মধ্যেই একদল মানুষ আছে যারা নিজের স্বার্থের জন্য যে কোন হীন ও জঘন্য কাজ করতে সর্বদাই যে তৎপর—তাই কেবল নয়—ঐ ধরনের কাজের মধ্যে একটা আনন্দও বুঝি তারা পায়। এবং ঐ ধরনের কাজের ভিতর দিয়ে তারা এক-এক সময় সমগ্র দেশ ও জাতের যে কত বড় সর্বনাশ ডেকে আনে সেটা বোধ হয় তাদের উপলব্ধিতেও পৌঁছায় না। নচেৎ ঘৃণায় লজ্জায় অনুশোচনায় হয়ত তারা আত্মঘাতী হতো। সুরজমলের তৃতীয় পুত্র শাগও ঠিক ছিল ঐ শ্রেণীভুক্ত। তাই পীপার নগর থেকে আগত তার প্রিয় অনুচরের মুখ থেকে তার পিতার আকস্মিক মৃত্যুসংবাদটা পেয়ে উৎফুল্ল হয়ে ওঠে।

রাত্রি তখন গভীর। নৃত্যশালায় একদল সুন্দরী নর্তকী ও সুরা নিয়ে মত্ত হয়ে ছিল শাগ।

সেই সময় তার এক অনুচর শোভারাম, যে পীপার নগরে পার্বতী উৎসব দেখতে গিয়েছিল নিজের ভগিনীকে নিয়ে—সে এসে নৃত্যশালার মধ্যে প্রবেশ করল হাঁপাতে হাঁপাতে। সংবাদটা আগেভাগে তার প্রভু শাগকে দেবার জন্য দীর্ঘপথ ঊর্ধ্বশ্বাসে ঘোড়া ছুটিয়ে এসেছে। অথচ হতভাগ্য তার নিজের সহোদরাকে যবনদের হাত থেকে রক্ষা করা দূরে থাক চেষ্টাও করে নি। প্রাণভয়ে পালিয়ে মন্দিরের পশ্চাতে গিয়ে আত্মগোপন করেছিল।

দস্যু যবন সৈন্যরা যখন মুষ্টিমেয় বীরেন্দ্রের সৈন্যদের হত্যা করে যথেচ্ছভাবে রাজপুত কুমারীদের লুণ্ঠন করে নিয়ে চলেছে এদিকওদিক, চারিদিকে রক্তস্রোত, ভয়ার্ত নারীর আর্ত করুণ অসহায় চিৎকারে আকাশবাতাস পীড়িত—তখন যবনদের আক্রমণ থেকে আত্মগোপন করে মন্দির-পশ্চাতে সন্ধ্যার আসন্ন অন্ধকারে এক পাশে থেকে জানতেও পারে না কখন মহারাজ সুরজমল তার সুশিক্ষিত অশ্বারোহীবাহিনী নিয়ে ঘটনাস্থলে এসে হাজির হয়েছেন। তার পর ক্রমশঃ একসময় সমস্ত গোলমাল থেমে গেল এবং করুণ এক স্তব্ধতায় চারিদিক থম থম করতে লাগল। তখনই ধীরে ধীরে গোপন স্থান থেকে বের হয়ে এসে মহারাজের মৃত্যুসংবাদটা পেল। সংবাদটা শোনার সঙ্গে সঙ্গেই কথাটা তার মনে উদয় হয়।

রাজা শাগের পিতা মহারাজ সুরজমল তার পুত্রদের বঞ্চিত করে যে তার জ্যেষ্ঠ দৌহিত্রকেই রাজ্যের ভাবী অধীশ্বর বলে মনোনীত করে রেখেছিল সে সংবাদটা শোভা সিং যেমন জানত তেমনি জানত তার প্রভু শাগ তার পিতার ঐ মনোনয়নকে মনে মনে আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ করে নি এবং রাজকুমার গাঙ্গকে যে শাগ সহজে স্বীকার করে নেবে না, তাও তার অজ্ঞাত ছিল না।

শাগ সুযোগের অপেক্ষাতেই আছে। এখন মুখে কিছু না প্রকাশ করলেও কার্যকালে যে সে নিশ্চিন্ত হয়ে বসে থাকার পাত্র নয় তাও জানত শোভা সিং।

মহারাজ!

কে?

ভ্রূকুটি করে তাকাল শাগ আগন্তুকের দিকে—কি চাও এত রাত্রে এখানে?

মহারাজ, অত্যন্ত মূল্যবান সংবাদ এনেছি।

কি সংবাদ ?

আপনার পিতৃদেব পরমভট্টারক যোধপুরাধিপতি রাজচক্রবর্তী মহারাজ--

কি—কি হয়েছে তার ?

আজ্ঞে, পীপার নগরে পার্বতী উৎসবে যবনদের আক্রমণ রোধ করতে গিয়ে মৃত্যু হয়েছে তাঁর।

না, না—এ কখনো সম্ভব নয়—এ মিথ্যা—

শাগের অজ্ঞাত নয় তাঁর পিতার বীরত্বকথা, তাই সে প্রথমটায় বিশ্বাস করে উঠতে পারে না।

প্রভু, এ মিথ্যা নয়—সত্যিই পাঠানদের সঙ্গে যুদ্ধে তাঁর দেহান্ত হয়েছে।

তুই—তুই কি করে জানলি ?

আমি সেখানে উপস্থিত ছিলাম—স্বচক্ষে দেখে ছুটে আসছি, দশ দণ্ডের পথ দুদণ্ডে অতিক্রম করে এসেছি।

শাগের রঙিন নেশা ততক্ষণে কেটে গিয়েছে। নেশার ঘোর চোখের থেকে মিলিয়ে গিয়েছে। ঠিক আছে—আয় আমার সঙ্গে।

শোভা সিংকে সঙ্গে করে শাগ পাশের কক্ষে এসে প্রবেশ করল এবং আরো নানাভাবে অনেকক্ষণ ধরে প্রশ্নাদি করে পিতার মৃত্যু সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে তখনি তার বিশ্বস্ত সৈনিক রায়মলকে ঐ কক্ষে ডেকে পাঠাল।

শোভা সিং বলে, মহারাজ আমার পুরস্কার ?

শাগ কণ্ঠ থেকে বহু মূল্যবান মণিহার খুলে পারিতোষিক দিল শোভা সিংকে তখনি—এই নে।

রায়মল এসে কক্ষে প্রবেশ করল। মহারাজ, আমায় স্মরণ করেছেন ?

হ্যাঁ, রায়মল—বিশেষ কাজে এখুনি তোমাকে একবার যোধপুর যেতে হবে।

যাবো—কি করতে হবে আদেশ করুন।

এইমাত্র সংবাদ পেলাম পিতার মৃত্যু হয়েছে।

সে কি।

হ্যাঁ—শোভা সিং সংবাদ এনেছে—যাক শোন—তুমি এই মুহূর্তে যোধপুরে রওনা হয়ে যাও। সেখানে গিয়ে কেবল তোমায় জেনে আসতে হবে গাঙ্গের অভিষেক কবে—আর দেরি করো না, তুমি যাত্রা কর।

যে আজ্ঞে। কুর্নিশ করে রায়মল কক্ষ হতে নিষ্ক্রান্ত হয়ে আসে।

রায়মল তরুণ যুবক। উচ্চাভিলাষী তরুণ যুবক। মনে তার অনেক আশা, অনেক স্বপ্ন। দেহে তার যেমন শক্তি, অসিতেও তেমনি সুদক্ষ। আর তাইতেই অল্প দিনের মধ্যে শাগের বিশ্বাসভাজন পাত্র ও প্রিয়পাত্র হয়ে উঠেছিল। রায়মল সেই রাত্রেই প্রস্তুত হয়ে যোধপুরের দিকে অশ্বারূঢ় হয়ে যাত্রা করে।

রাত্রি তখন শেষ হয়ে এসেছে। রাতের আকাশে ঊষার রক্তিম পরশ লেগেছে। বুরবো হতে যোধপুর খুব কম পথ নয়—তাও দুর্গম পর্বত ও বনের মধ্যে দিয়ে পথ। সমস্ত দিন প্রায় একটানা অশ্বচালনা করে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল রায়মল।

এখনো বোধপুর অনেকটা পথ। রাত্রির প্রায় মধ্যযাম হয়ে যাবে বোধপুর পেঁছাতে পেঁছাতে—কথাটা ভাবতে ভাবতেই মন্থর গতিতে অশ্বপৃষ্ঠে বসে এগিয়ে চলেছিল রায়মল।

ক্রমে সূর্য অস্তমিত হলো আরাবল্লীর শীর্ষ ছুঁয়ে। অত্যাসন্ন সন্ধ্যার অন্ধকার চারিদিকে ঘনিয়ে আসে। ক্ষুৎপিপাসায় কাতর রায়মল চিন্তা করতে থাকে, রাত্রির মত কোথাও একটু আশ্রয় নিতে পারলে বোধ হয় ভাল হতো। কিন্তু এই পার্বত্য-পথ ও আশেপাশের বন-জঙ্গলের মধ্যে কোথায় আশ্রয় মিলবে। অন্ধকারে আর অগ্রসর হওয়াও দুষ্কর। ঐ সময় ধীরে ধীরে চাঁদের উদয় হলো আকাশে। মৃদু চন্দ্রালোকে চারিদিক আবার দৃষ্টিগোচর হলো। রায়মল এগিয়ে চলে।

মন্থর গতিতে অশ্বপৃষ্ঠে বসে চলতে চলতে বোধ করি একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল রায়মল--হঠাৎ চমকে ওঠে অনতিদূরে পথপার্শ্বে একটি বৃহৎ প্রস্তরের প্রতি নজর পড়ায়। সঙ্গে সঙ্গে অশ্বের বল্গা নিঃশব্দে আকর্ষণ করে অশ্বের গতি রোধ করে রায়মল। অপূর্ব সুন্দরী ঐ নারী কে পথপার্শ্বে প্রস্তরের উপরে উপবিষ্ট অমন করে—না—

উপবিষ্ট হলেও জাগ্রত নয়—কনুইয়ের উপর চিবুক রেখে মনে হচ্ছে নিদ্রিত। এবং উপবিষ্ট নিদ্রিত নারীর ক্রোড়ে একজন সৈনিক মস্তক রেখে শুয়ে আছে—সেও গভীর নিদ্রায় অভিভূত।

কিন্তু কে ঐ পুরুষ ও রমণী? অমন করে ঐ অবস্থায় এই নির্জন দুর্গম পথপার্শ্বে নিদ্রাভিভূত? কিন্তু আহা রমণীর রূপের যেন অবধি নেই! যৌবন ঢল ঢল। যত দেখে রায়মল, তার তৃষ্ণা যেন বৃদ্ধি পায়। রূপের তৃষ্ণা যেন তাকে ঐ নির্জন মৃদু চন্দ্রালোকিত রাত্রে নেশাগ্রস্ত করে তোলে। বুকের মধ্যে কামনার অগ্নিশিখা জ্বলে ওঠে।

রমণীর ক্রোড়ে মস্তক রেখে মনে হচ্ছে নিদ্রাভিভূত কোন এক ক্লান্ত সৈনিক—কিন্তু ও যেই হোক—ঐ রমণীরত্নকে অধিকার করতে না পারলে বৃথাই জীবন। জীবন মিথ্যা—বেঁচে থাকা মিথ্যা। কিন্তু—না—কোন কিন্তু নেই এর মধ্যে। বীরভোগ্যা নারী চিরদিন।

ঐ নারীরত্নকে সে কোনমতেই ছেড়ে দিতে পারে না—যদি সে কারণে ঐ ঘুমন্ত সৈনিককে নিষ্ঠুরের মত হত্যা করতেও হয় তাও সে করবে। নারীরত্ন লাভের মধ্যে কোন অন্যায় নেই—পাপ নেই।

রায়মল আর দ্বিধা করে না। ইতস্তত করে না। কোমরবন্ধের কোষ হতে তীক্ষ্ন ক্ষুরধার অসি উন্মুক্ত করে নিঃশব্দে অশ্বপৃষ্ঠ হতে রায়মল ভূমিতে অবতরণ করল। তারপর নিঃশব্দে একটা বন্য শিকারী মার্জারের মত পায়ে পায়ে নিদ্রিত ওদের দিকে অগ্রসর হলো।

কিন্তু হায়, বিধি বাম। রায়মলের সামান্য পদশব্দেই সহসা পার্বতীর নিদ্রাভঙ্গ হয়—সে চোখ মেলে তাকায় এবং সঙ্গে সঙ্গে তার অদূরে রায়মলের প্রতি দৃষ্টি পড়ে। পুরুষকে চিনতে নারীর দেরি হয় না। রায়মলকে নিঃশব্দ গতিতে

অগ্রসর হতে দেখেই চকিতে পার্বতীর মনের মধ্যে সন্দেহ জাগে। সঙ্গে সঙ্গে সে নিজের কটিদেশ থেকে তীক্ষ্ণ ছুরিকা টেনে বের করে চাপা তীক্ষ্ণকণ্ঠে প্রশ্ন করে —দাঁড়াও—আর এক পা-ও এগুবার চেষ্টা করো না।

পার্বতীর কণ্ঠে এমন একটা আদেশের কঠিন সুর ছিল যেটা রায়মল লংঘন করতে পারে না এবং নিজের অজ্ঞাতেই সে সঙ্গে সঙ্গে দাঁড়িয়ে পড়ে।

পার্বতী পুনরায় প্রশ্ন করে, কে তুমি—জবাব দাও, নচেৎ এই মুহূর্তে আমার হাতের এই ছুরিকা তোমার বক্ষস্থল বিদ্ধ করবে।

রায়মল যেন মুগ্ধ বিস্ময়ে চেয়েছিল পার্বতীর মুখের দিকে। তার চোখের পলক পড়ে না।

কিন্তু ইতিমধ্যে বীরেন্দ্রের নিদ্রাভঙ্গ হয়েছিল। সে উঠে বসে এবং ততক্ষণে ভারমুক্ত হয়ে পার্বতীও উঠে দাঁড়িয়েছে।

কে—কি ব্যাপার পার্বতী।

ঐ দেখো—

সঙ্গে সঙ্গে অসি উন্মুক্ত করে বীরেন্দ্র, কে তুমি ?

সহসা উচ্চকণ্ঠে হাঃ হাঃ করে হেসে ওঠে রায়মল, কে আমি ? তারপরই অতর্কিতে উন্মুক্ত ধারালো অসি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে রায়মল বীরেন্দ্রর উপরে, আমার অসির অগ্রেই তার পরিচয় পাবে সৈনিক।

চকিতে লাফ দিয়ে সরে গিয়ে সুতীক্ষ্ণ অসির অগ্রভাগ থেকে নিজেকে রক্ষা করে বীরেন্দ্র। তারপরই সে পাল্টা আক্রমণ চালায়।

সেই নির্জন অরণ্যসংকুল পার্বত্য পথপ্রান্তে মৃদু চন্দ্রালোকিত মধ্যরাত্রে দুটি ধারালো অসি পরস্পর পরস্পরকে আঘাত করে। একটা তীক্ষ্ণ ধাতব শব্দ জাগে। দুজনায় অসিযুদ্ধ শুরু হয়।

কিছুক্ষণের নিদ্রায় অনেকটা ক্লান্তি ঘুচেছিল বীরেন্দ্রর। সে শার্দুলের মতই রায়মলকে আক্রমণ করে এবং অল্পক্ষণের মধ্যেই রায়মলের কব্জীর উপরে নিদারুণ এক চকিত আঘাতে তার অসি হস্তচ্যুত হয়ে অদূরে পথপ্রান্তে সশব্দে ছিটকে পড়ে।

বীরেন্দ্র তার অসির সুচালো অগ্রভাগ সঙ্গে সঙ্গে নিরস্ত্র পরাজিত রায়মলের বুকের উপরে স্থাপন করে বলে, কে তুমি বল—সত্য পরিচয় না দিলে এখুনি এই অসির অগ্রভাগ তোমার বক্ষে বিদ্ধ হবে—

আমার পরিচয় তুমি জানতে চাও ?

হ্যাঁ।

তার আগে আমি তোমাদের পরিচয় চাই—কে তোমরা—কোথা থেকে আসছো —এখানেই বা এইভাবে বসে ছিলে কেন ?

বীরেন্দ্র যেন মুহূর্তকাল কি ভাবল মনে মনে, তারপরই বললে, বলবো কিন্তু তার আগে আমি জানতে চাই—মহারাজ গাঙ্গের প্রেরিত গুপ্তঘাতক কিনা তুমি—তবে তোমাকে আমি কোনদিন যোধপুরে দেখেছি বলে মনে পড়ছে না—

তুমি ঠিকই ধরেছো—অনুমান তোমার মিথ্যা নয়। গাঙ্গর সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নেই—বরং বলতে পার আমি তার শত্রুই।

শত্রু!

তাই। এবারে বল তুমি কে?

তার আগে আমি আরো একটা কথা জানতে চাই—কোথা থেকে তুমি আসছো?

বুন্দিবো থেকে। মহারাজের তৃতীয় পুত্র শাগ বুন্দিবোতে—তিনিই আমার প্রভু।

তবে শোন—আমার নাম বীরেন্দ্র সিংহ।

মহারাজ সুরেজমলের অন্যতম দেহরক্ষী বীরেন্দ্র সিংহ কি?

হ্যাঁ—তবে একদা ছিলাম, এখন আর নেই। আমি পদত্যাগ করেছি।

মহারাজের মৃত্যু হয়েছে সত্যিসত্যিই তাহলে?

হ্যাঁ—গত দ্বিপ্রহরে পীপার নগরে যবনের সঙ্গে যুদ্ধে নিদারুণ আহত হয়ে রক্তস্রাবে। কিন্তু আমার কথা পরে হবে, এখন তোমার সত্য পরিচয় দাও—এ সময় তুমি এখানে কেন?

আমি মহারাজ শাগের প্রেরিত দূত—যোধপুরে যাচ্ছিলাম।

মহারাজ শাগ! মহারাজ হবেন ত রাজকুমার গাঙ্গ?

হ্যাঁ, কিন্তু ন্যায়ত ও ধর্মত কি তার সে অধিকার আছে?

মহারাজ সুরেজমল ত সে ব্যবস্থাই করে গিয়েছেন।

অন্যায় অধর্ম করে গিয়েছেন—সিংহাসন প্রাপ্য তার কোন পুত্রেরই—তার কোন পৌত্রের নয়।

সে বিচার তোমার নয় সৈনিক—মহারাজ সম্পর্কে যদি এতটুকু অশ্রদ্ধা প্রকাশ কর ত এই মুহূর্তে তোমায় আমি হত্যা করবো।

রায়মল মৃদু হেসে বললে, মনে হচ্ছে তুমি তাঁর একান্ত অনুরাগী!

দেশের প্রতিটি প্রজার কর্তব্য, তাদের মহারাজ সম্পর্কে অনুরাগ ও শ্রদ্ধা প্রকাশ করা। এবারে বল কে তুমি—কোথা থেকে আসছো, কি তোমার সত্যকারের পরিচয়?

শোন বীরেন্দ্র সিংহ—আমি আমার প্রভু শাগের নির্দেশে বুন্দিবো থেকে যোধপুর যাচ্ছিলাম তোমাদের মহারাজের অভিষেকের দিনটি জানবার জন্য—আমার নাম রায়মল।

সত্য বলছো?

মিথ্যা বলি নি। কিন্তু আমি ভেবে পাচ্ছি না কোনমতেই—মহারাজ সুরেজমলের প্রিয় দেহরক্ষী বীরেন্দ্র সিংহ এমন করে অসহায় নির্জন পথপ্রান্তে নিদ্রিত হয়ে ছিল কেন?

আমি স্বেচ্ছায় যোধপুর ত্যাগ করে চলে এসেছি।

চলে এসেছো!

হ্যাঁ।

কিন্তু—

জানি তোমার কৌতূহল হচ্ছে রায়মল, কিন্তু অধিক কিছু তোমায় আপাততঃ বলতে পারছি না।

আর উনি?

আমার ভাবী পত্নী—মহারাজ সূরজমলের একমাত্র দৌহিত্রী—গাঙ্গের একমাত্র ভগিনী—পার্বতী।

॥ ১০ ॥

সূরজমলের চিতার আগুন ধীরে ধীরে একসময় নির্বাপিত হয়ে এলো। নশ্বর দেহ পড়ে ছাই হয়ে গেল। কাল যে ছিল আজ আর সে নেই। কাল যে ছিল আজ হয়ত সে থাকে না—তবু মানুষের মনে মায়ার অন্ত নেই—বাসনার অন্ত নেই। ভালবাসা প্রেম হিংসা দ্বেষ মমতা—কিছুরই ত এ সংসারে কোন মূল্য নেই। সব কিছুই অনিশ্চিত—সব কিছুরই একদিন অবসান ঘটবে কালের একটি নির্মম ফুৎকারে, তবু মানুষ ভালবাসে—হিংসা দ্বেষ উদ্বেল হয়—মমতা বাসনা কামনার অন্ত নেই।

সমস্ত দুর্গপ্রাসাদটা কি অদ্ভুত স্তব্ধ। রাত্রির অন্ধকারে যেন একটা পরিত্যক্ত শ্মশানের মত মনে হয়। একাকী প্রস্তরমূর্তির মত অন্ধকারে নিজ শয়নকক্ষের উন্মুক্ত বাতায়নের সামনে দাঁড়িয়েছিল গাঙ্গ। পার্বতী এলো না। তার চাইতে আজ আপন হলো তার সামান্য এক সৈনিক বীরেন্দ্র সিংহ। এতদিনকার ভালবাসা—স্নেহ মমতা মুহূর্তে মিথ্যা হয়ে গেল। এত দিন যে সব চাইতে আপনজন ছিল সেই আজ পর থেকেও যেন পর হয়ে গেল। গাঙ্গ তার আর কেউ নয়। বীরেন্দ্র সিংহই আজ পার্বতীর সব—একমাত্র আপনজন।

সেই বীরেন্দ্রর হাত ধরে আজ তাই পার্বতী গাঙ্গর সঙ্গে—এতদিনের সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করে দিয়ে অনায়াসেই চলে গেল রাজপ্রাসাদ ছেড়ে সমস্ত পরিচয়ের গৌরব-মর্যাদা ছেড়ে—সমস্ত আরাম বিলাস ও নিশ্চয়তা ছেড়ে। কেমন করে গেল পার্বতী! এতটুকু দোলাও কি লাগল না তার বুকে! এক ফোঁটা অশ্রুও চোখের কোলে দেখা দিল না? স্বার্থপর—একান্ত স্বার্থপর পার্বতী। ঠিক আছে, সেই যখন সমস্ত সম্পর্ক নিজের হাতে তার সঙ্গে ছিন্ন করে দিয়ে গেল—সেও আর পার্বতীর কথা ভাববে না। মনে করবে গাঙ্গ, পার্বতী তার একমাত্র সহোদরা মৃত। কোনদিন তার তোর কোন সহোদরা ছিল না। আপনার জন—স্নেহের জন কেউ ছিল না।

কিন্তু মনকে যেন কিছুতেই কঠোর করে তুলতে পারছে না গাঙ্গ। কোথায় কোন এক কোমল তন্ত্রীতে যেন মৃদু কম্পন তুলছে। ঐ যে একটিমাত্র বোন। মাত্র যখন দেড় বৎসর ওর বয়েস এবং নিজের বছর চোদ্দ বয়েস, তখনই মা-বাপকে হারিয়েছিল ওরা। বুকোপিঠে করে মানুষ করেছে বোনটিকে গাঙ্গ। আজ এত তাড়াতাড়ি কেমন করে তাকে ভুলবে। এ যে রক্তের টান—নাড়ির টান। অন্তরের

মাঝখানটিতে যে একেবারে টান পড়েছে।

তাছাড়া সংবাদ পেয়েছে সে, মেওয়ারের অধিপতি সংগ্রাম সিংহ পার্বতীর পাণিপ্রার্থী হয়ে নারিকেল, গজ ও অশ্ব প্রেরণ করেছে। দু'একদিনের মধ্যেই হয়ত মেবার থেকে পত্রবাহী দূত মারবাড়ে এসে উপস্থিত হবে। তখন তাদের কি জবাব দেবে গাঙ্গ। কি বলবে তাদের? সত্যি কথাটাও হয়ত চাপা থাকবে না—পার্বতী সামান্য এক সৈনিকের সঙ্গে গৃহত্যাগিনী হয়েছে—দাবানলের মতই হয়ত তখন সংবাদটা সমগ্র রাজস্থানে ছড়িয়ে যাবে। ধিক্কারে চারিদিক মুখরিত হয়ে উঠবে। রাঠোর সর্দারদেরই বা গাঙ্গ কি বলে বোঝাবে?

যে সামান্য গৃহের সম্মান রক্ষা করতে পারে না—সে রাজ্য চালাবে কি করে—রাজ্যচালনার গুরুদায়িত্ব কেমন করে পালন করবে?

আচ্ছা, এক কাজ করলে হয় না? সঙ্গে সঙ্গে কথাটা মনের মধ্যে উদয় হয় গাঙ্গের।

পার্বতী ও বীরেন্দ্র কোন দিন যোধপুরে ফিরে আসবার সাহস পাবে না ঠিকই—যদি রটনা করে দেয় গাঙ্গ—পীপার নগরে পার্বতী উৎসবে তার একমাত্র ভগিনী পার্বতীর মৃত্যু হয়েছে। সহজেই হয়ত কথাটা তারা—সামন্ত সর্দাররা বিশ্বাস করে নেবে।

সবাই ত জানে, শুনেছে—পার্বতী পীপার নগরে গিয়েছিল—এখন সেখানে তার মৃত্যু হয়েছে পাঠানদের সঙ্গে রাজপুতদের যুদ্ধের সময় কথাটা হয়ত কেউ অবিশ্বাস্য বলে মনে করবে না।

হ্যাঁ ঠিক—ঐ পথই তাকে বেছে নিতে হবে। নচেৎ আজ তাদের পিতৃপুরুষের সমস্ত গৌরব ও সম্মান ধূলায় লুটিয়ে যাবে।

কিন্তু বীরেন্দ্র সিং, শৃগাল হয়ে সিংহের গহ্বরে প্রবেশের স্পর্ধা—গাঙ্গ তাকে কিছুতেই ক্ষমা করতে পারে না। ক্ষমা করবে না গাঙ্গ তাকে। তাকে বুঝিয়ে দিতে হবে তার স্পর্ধা কত দূর এগিয়েছে। পার্বতীর প্রতি দৃষ্টি দেওয়া কত বড় অপরাধ।

মহারাজ—

দ্বারের অপর প্রান্তে চণ্ডর কণ্ঠস্বর শোনা গেল।

ঘুরে দাঁড়াল গাঙ্গ। অন্ধকারে দ্বারের দিকে দৃষ্টিপাত করে, কে—চণ্ড?

মহারাজ—

আয় ভিতরে আয়।

চণ্ড নিঃশব্দে এসে কক্ষের মধ্যে প্রবেশ করে। গাঙ্গর প্রধান দেহরক্ষী চণ্ড।

কক্ষের মধ্যে আলো থাকলে দেখা যেত মানুষটার চেহারা। এমন কুৎসিত বুঝি সচরাচর মানুষ হয় না। লম্বায় পাঁচ ফুটেরও কিছু কম বেঁটেই বলা চলে। পেশল গাট্টা-গোট্টা চেহারা—দেহের প্রতিটি পেশী যেন ইস্পাত দিয়ে গড়া। ঘোর কৃষ্ণ গাত্রবর্ণ। নাকটা চ্যাপ্টা—ছোট ছোট বর্তুলাকার দুটি চোখ। মাথায় ঘন কুঞ্চিত কেশদাম। আসুরিক শক্তি ধরে মানুষটার দেহ। এবং যেমন ক্ষিপ্রগতি তেমনি নিঃশব্দ চলাচল। প্রাসাদদুর্গের সর্বত্র ছায়ার মত সর্বক্ষণ নিঃশব্দে ঘুরে

ঘুরে বেড়ায়। মুখে বড় একটা বাক্য নেই। গাঙ্গর জন্য প্রাণ দিতে পারে চন্ড। মরুচারী দস্যুর ছেলে ঐ চন্ড। মরুভূমির মধ্যে দুর্ধর্ষ দস্যু ছিল রঙ্গ—তারই পুত্র চন্ড।

রঙ্গর অত্যাচারে একসময় মরুভূমি ও তার আশপাশ সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছিল। একটা কালো ঘোড়ার পিঠে চেপে সাক্ষাৎ শমনের মত ঘুরে বেড়াত রঙ্গ—আর তার পিঠের সঙ্গে বাঁধা থাকত তার মাতৃহারা একমাত্র পুত্র চন্ড।

রাঠোররা রঙ্গর অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে সুরজমলের কাছে এসে একদা কেঁদে পড়ে—মহারাজ দস্যুর অত্যাচার থেকে রক্ষা করুন—আমাদের ধন, প্রাণ ও নারী সব গেল।

পাশেই দাঁড়িয়ে ছিল যুবক গাঙ্গ। সুরজমলকে চিন্তিত দেখে গাঙ্গ বলে, দাদু—অনুমতি হয় ত আমি যেতে পারি। না, না সে দুর্ধর্ষ—ভয়ঙ্কর—

আমার অসিও কঠিন ইস্পাতে তৈরী দাদু।

কিন্তু—

তাছাড়া রাজপুত আমি, তোমার পৌত্র—মৃত্যুকে কি ভয় করি—তুমি কিছু চিন্তা করো না দাদু, আমায় যেতে দাও—

বেশ—কিছু সৈন্য নিয়ে—

না—একাই আমি যাবো।

একাকী।

হ্যাঁ—কৌশলে তাকে পরাস্ত করতে হবে।

সেই রাত্রেই গাঙ্গ চলে গিয়েছিল। চারিদিকে ধু ধু মরুভূমি—উত্তপ্ত বালুকারাশি—চোখে মরীচিকার সৃষ্টি করে। সেই মরুভূমির মধ্যেই উভয়ের সাক্ষাৎ হলো। বিরাট কৃষ্ণবর্ণ এক দৈত্যের মত রঙ্গনাথ—দস্যু রঙ্গ—তার পৃষ্ঠদেশে বাঁধা সাত বছরের বালক চন্ড।

আমার যদি ভুল না হয়ে থাকে ত তুই বোধ হয় সুরজমলের বেটার বেটা—রঙ্গ বলে।

আর তুমিই বোধ হয় সেই ঘৃণিত দস্যু ?

হাঃ হাঃ করে হেসে ওঠে রঙ্গনাথ। বলে, ঠিক চিনেছিস ত।

ঘৃণ্য দস্যুকে চিনতে কারো কষ্ট হয় না—তার চেহারা ও মুখেই তার পরিচয় স্পষ্ট করে লেখা থাকে।

আবার হাঃ হাঃ করে হেসে ওঠে রঙ্গনাথ।

তুই এসেছিস আমায় খুঁজে বেড়াচ্ছিস কথাটা আমার কানে গিয়েছিল—কিন্তু বিশ্বাস করতে পারি নি—

বলতে বলতে সহসা হাতের ভল্লটা তুলে গাঙ্গর প্রতি সজোরে নিক্ষেপ করে, কিন্তু চোখের পলকে গাঙ্গ সেটা হাত দিয়ে লুফে নেয়।

তার পরই অসি নিয়ে আক্রমণ করেছিল গাঙ্গ রঙ্গনাথকে। রঙ্গনাথ পারে নি লড়তে সেদিন গাঙ্গর সঙ্গে। গাঙ্গর হাতেই তার মৃত্যু হয়। প্রথমটায় নজরে পড়ে নি গাঙ্গর রঙ্গনাথের পৃষ্ঠদেশে বাঁধা চন্ডর প্রতি। রঙ্গনাথের আহত

রক্তাক্ত দেহটা ভূশয্যা নেওয়ার পর চণ্ডর চিৎকারে নজরে পড়ে।

আশ্চর্য—এতক্ষণ অতটুকু একটা বাচ্চা ছেলে একটিবারও শব্দ করে নি—প্রথম শব্দ করে—চিৎকার করে রঙ্গনাথের মৃত্যুর পর।

একান্ত দয়াপরবশ হয়েই অতঃপর সেদিন চণ্ডকে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিল গাঙ্গ প্রাসাদে। এবং সেই থেকে গাঙ্গর সঙ্গে ছায়ার মত থাকে। চণ্ডকে দেখেই কথাটা মনে পড়ে গাঙ্গের।

ঐ চণ্ডকে দিয়েই সে প্রতিশোধ নেবে ঐ বীরেন্দ্র সিংহের ওপরে।

চণ্ড—

মহারাজ—

একটা কাজ তোকে করতে হবে।

চণ্ড কেবল তাকায় গাঙ্গর দিকে।

রাত্রি তখন শেষ হয়ে এসেছে। ভোরের ঝাপসা আলো মুক্ত বাতায়নপথে কক্ষের মধ্যে এসে প্রবেশ করেছে।

বীরেন্দ্র সিংহকে চিনিস?

চিনি।

তাকে আমি যোধপুর থেকে নির্বাসিত করেছি—।

চণ্ড নীরব।

সে আমাদের পার্বতীকে নিয়ে গিয়েছে।

চণ্ড তখনও নীরব।

যেমন করে যে উপায়েই হোক ঐ বীরেন্দ্রর মাথাটা আমি চাই।

চণ্ড নিঃশব্দে কেবল ঘাড় নাড়ল।

পারবি?

আবার চণ্ড নিঃশব্দে ঘাড় নাড়ল।

কিন্তু পার্বতীর যেন কোন ক্ষতি না হয়—যা।

চণ্ড নিঃশব্দে কক্ষে থেকে বের হয়ে গেল। থপ থপ করে যেন একটা মরুভল্লুক কক্ষ থেকে বের হয়ে গেল।

মাথাটার মধ্যে যেন আগুন জ্বলছে গাঙ্গর। কপালের দু'পাশে শির দুটো যেন ফুলে উঠেছে—দপ্ দপ্ করছে। হঠাৎ—হঠাৎই মনে হয় গাঙ্গর এ সে কি করলো—আক্রোশের বসে হঠাৎ সে এ কি করল।

পার্বতী তার একমাত্র সহোদরা—বীরেন্দ্র তার স্বামী—না, না—চিৎকার করে ওঠে গাঙ্গ।

চণ্ড—চণ্ড—

ছুটে কক্ষের বাইরে বের হয়ে আসে গাঙ্গ—চণ্ড—চণ্ড—

॥ ১১ ॥

থমকে দাঁড়ায় মরিয়ম। কক্ষের মধ্যে পা দিয়েই নিজের অজ্ঞাতে থমকে দাঁড়িয়ে

পড়ে মরিয়ম। মৃদু আলোয় স্বল্পালোকিত কক্ষখানি। আলো-আঁধারির একটা রহস্য যেন কক্ষের মধ্যে বিরাজ করছে। এবং প্রথমটায় সেই কারণেই বুঝি মরিয়মের দৃষ্টিপথে বিশেষ কিছু পড়ে নি। শুধু কি তাই, হঠাৎ গা-টাও যেন কি এক অজ্ঞাত ভয়ে আর সংশয়েই ছম্ ছম্ করে উঠেছিল। বুকের ভিতরটা ধক্ করে উঠেছিল।

মনে হয়েছিল সামান্যা পরিচিতা এক দাসীর কথার ওপরে নির্ভর করে নিশ্চিন্ত বিশ্বাসে ঐভাবে ঐ কক্ষমধ্যে পা ফেলে আদৌ সে বুদ্ধির পরিচয় দেয় নি। কতটুকু জানে—কতটুকুই বা জানতে পেরেছে সে সামান্য ঐটুকু সময়ের মধ্যে স্বল্পপরিচিতা ঐ রমণী—বাঁদী আনোয়ারাকে। ওর মনের মধ্যে যে কোন দুরভিসন্ধি নেই তাই বা কে বলতে পারে, কে বলতে পারে কৌশলে ঐ যবনী তাকে কোন বিপদের মধ্যে ঠেলে দিয়ে গেল কিনা। ফিরে যাবে কি?

বোধ হয় ফিরে যাওয়াই উচিত। পশ্চাতের খোলা দ্বারপথে এক ঝলক হিমানীর মত শীতের হাওয়া এসে সর্বাঙ্গ তার কাঁপিয়ে দিয়ে গেল। সামনের দিকে তবু তাকাল মরিয়ম।

কক্ষের পশ্চিম দিককার দেওয়াল-কুলঙ্গিতে একটি চিরাগ মিটি মিটি জ্বলছে—তারই মৃদু আলোকে কক্ষটি স্বল্পালোকিত। আঁধার সম্পূর্ণরূপে অপসারিত হয় নি—আলো-আঁধারের মেশামিশি। আবছায়া রহস্য। প্রথম দৃষ্টিপাতে কাউকেই কক্ষের মধ্যে দেখতে পেল না। কেউই তার দৃষ্টিতে পড়ল না। ঐ মুহূর্তে মনে হয় আবার বোধ হয় এখান থেকে চলে যাওয়াই তার উচিত হবে।

দৈত্যের মত চেহারা ঐ যবন প্রহরী ইব্রাহিমের। আনোয়ারা যদি তাকে ঠেকিয়ে না রাখতে পারে—এখন যদি সে আবার ফিরে আসে? এসে যদি দেখে কক্ষের দ্বার উন্মুক্ত? এবং কক্ষের মধ্যে প্রবেশ করে যদি তাকে দেখতে পায়?

তারপর সম্রাট বাবুর—কি ভাববেন তিনি তার সম্পর্কে? সম্রাট যে তাকে প্রথম মুহূর্তেই দেখে মুগ্ধ হয়েছেন, নারী হয়ে তার ত সে কথাটা বুঝতে দেরি হয় নি।

নারীর প্রতি পুরুষের চোখের মুগ্ধ দৃষ্টি আর যারই চিনতে ভুল হোক, একজন নারীর ভুল হয় না। এখন যদি সেই সম্রাটের মনে তিলমাত্রও সন্দেহের উদয় হয়—তাহলে—তাহলে যে সর্বনাশ হয়ে যাবে। এত ক্লেশ স্বীকার করে দুর বিপদসঙ্কুল পথ দীর্ঘদিন ধরে অতিক্রম করে তার এখানে আসাটাই কি মিথ্যা হয়ে যাবে না?

কে?

হঠাৎ পরিচিত পুরুষ-কণ্ঠে মরিয়মের চিন্তাজাল ছিন্ন হয়ে গেল—দ্বিধা সংকোচ কোথায় চলে গেল। সঙ্গে সঙ্গে যেন পুনরায় সম্বিৎ ফিরে পায় মরিয়ম।

কে—কে ওখানে? রণবীরের কণ্ঠস্বর? নিস্তব্ধ পাথরের মতই যেন দাঁড়িয়ে থাকে মরিয়ম।

কে—সাড়া দিচ্ছ না কেন?

তবু মরিয়ম নির্বাক।

রণবীর তখন দেওয়াল থেকে বাতিটা তুলে নিয়ে এগিয়ে এলো। মরিয়মের মুখের সামনে বাতিটা তুলে ধরল।

অতঃপর স্তব্ধতা কয়েকটা মুহূর্তের জন্য।

নর্তকী মরিয়ম—রণবীরের কণ্ঠ থেকে যেন একটা কঠিন নিষ্ঠুর ব্যঙ্গ ঝরে পড়ল। একটা কঠিন ঘৃণা যেন ঝরে পড়ল।

ধীরে ধীরে মুখ তুলল মরিয়ম।

সামনেই তার দাঁড়িয়ে রণবীর।

ঘৃণা আর আক্রোশে তার দু চোখের তারা দুটো যেন ধক্ ধক্ করে জ্বলছে।

কি চাও এখানে?

মরিয়ম নির্বাক।

কি চাও, কেন এসেছো এখানে?

রণবীর—

চুপ করো—তোমার ঐ কলঙ্কিত ওষ্ঠে আর কখনো আমার নামটা যেন উচ্চারিত না হয়।

জানি, তুমি আজ আর আমার কোন কথাই বিশ্বাস করবে না।

মরিয়মের কথা শেষ হলো না—তার আগেই যেন প্রচণ্ড একটা থাবা দিয়ে মরিয়মের মুখের কথাটা থামিয়ে দিল রুদ্ধ চাপা কণ্ঠে তর্জন করে রণবীর। বিশ্বাসহীন গুপ্তচর নর্তকীকে বিশ্বাস—

কিন্তু তুমি বিশ্বাস কর আর না কর—শুধু জেনে রেখো, যা তুমি ভেবেছো—ভাবছো তা সত্যি নয়—

সত্যি হোক মিথ্যা হোক তোর মুখের দিকে আমার তাকাতেও ঘৃণা হচ্ছে—কুলটা স্বৈরিণী—দূর হয়ে যা আমার সামনে থেকে—

তুমি ত একটু আগে আমার কক্ষে প্রবেশ করেছিলে আমাকে হত্যা করবার জন্য—তবে এখন সামনে পেয়েও কেন হত্যা করছো না?

তোকে হত্যা করলেও আমার ছুরিকার গায়ে কলঙ্ক লাগবে।

শান্ত মৃদু কণ্ঠে বলে মরিয়ম, আমি যাচ্ছি তবে একদিন এ ভুল তোমার ভাঙ্গবে—বাকী কথাগুলো আর মরিয়মের কণ্ঠে উচ্চারিত হয় না—অশ্রু তার কণ্ঠ রোধ করে। এবং সে কোন মতে ছুটে কক্ষ থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে যায়।

কুলটা—স্বৈরিণী—মর—মর, তুই বিষ খেয়ে মর—

মরিয়ম রণবীরের কক্ষ থেকে বের হয়েই একেবারে আনোয়ারার সামনাসামনি পড়ে যায়।

বিবিসাহেবা—

আনোয়ারা ছুটে এসে রীতিমত হাঁপাচ্ছে তখনো।

কী?

সম্রাট—

কোথায়?

প্রমোদভবনে—শিগগিরী আপনি আপনার কক্ষে চলুন—

আনোয়ারা কথাটা বলে মরিয়মের হাত ধরেই যেন একপ্রকার টানতে টানতে তাকে তার পূর্ব কক্ষে নিয়ে যায়। হাঁপাতে হাঁপাতে সে কক্ষের দ্বার ভিতর থেকে বন্ধ করে দেয়।

কয়েক মুহূর্ত পরেই বন্ধ দরজার উপর মৃদু করাঘাত শোনা গেল। আর শোনা গেল সেই সঙ্গে কুবলাই খাঁর কণ্ঠস্বর।

আনোয়ারা—আনোয়ারা—সম্রাট এসেছেন—

আনোয়ারা এগিয়ে গিয়ে দ্বার অর্গলমুক্ত করে।

সামনেই কক্ষের দ্বারে দণ্ডায়মান স্বয়ং সম্রাট এবং তার পশ্চাতে কুবলাই খাঁ।

আনোয়ারা—

সম্রাটের ডাকে আভূমি নত হয়ে কুর্নিশ জানায় আনোয়ারা।

মালেক আলম—

মরিয়ম কি জেগে?

মুহূর্তকাল চুপ করে থেকে আনোয়ারা বলে, হ্যাঁ জাঁহাপনা—

তাকে এই কক্ষে ডেকে নিয়ে আয়—

যো হুকুম খোদাবন্দ। আবার আভূমি নত হয়ে কুর্নিশ জানিয়ে আনোয়ারা পাশের কক্ষে গিয়ে প্রবেশ করল।

এবারে সম্রাট কুবলাই খাঁর দিকে ফিরে তাকিয়ে বলে, কুবলাই খাঁ—বন্দী—

কুবলাই খাঁ আভূমি নত হয়ে কুর্নিশ জানিয়ে কক্ষ ত্যাগ করল।

কুবলাই খাঁর কক্ষত্যাগের সংগে সংগেই প্রায় মরিয়ম এসে ঐ কক্ষে প্রবেশ করল।

জাঁহাপনা—

কুর্নিশ জানাল মরিয়ম।

এসো মরিয়ম—জেগেই ছিলে তুমি শুনলাম? সম্রাট বাবুর মৃদু কণ্ঠে বলে।

হ্যাঁ—সম্রাট—

আমি এই অসময়ে আবার কেন শয্যাত্যাগ করে প্রমোদ ভবনে ফিরে এলাম নিশ্চয়ই তুমি অনুমান করতে পেরেছো?

না জাঁহাপনা।

রণবীর সিংহের বিচার করতে।

রণবীর—

হ্যাঁ—যে এই কক্ষের মধ্যে অতর্কিতে প্রবেশ করে তোমায় নাকি হত্যা করতে উদ্যত হয়েছিল।

মুহূর্তের মধ্যে চিন্তা করে নেয় মরিয়ম। এবং যে কথাটা তার সর্বাগ্রে মনে হয়—যে কারণেই হোক কুবলাই খাঁ সম্রাটের নিকট সমস্ত সত্য ঘটনা পেশ করে নি। কেবলমাত্র রণবীর সম্পর্কেই যে বলেছে—তাতে করে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নেই। তার সঙ্গে রণবীরের সম্পর্কের কথাটা নিশ্চয়ই বলে নি—আর বলোনি

তার অর্থাৎ কুবলাই খাঁর সঙ্গে রণবীরের কি কথা হয়েছিল।

সেক্ষেত্রে এখন তার কি কর্তব্য? সেও কি অজ্ঞতার ভান করবে? কিন্তু তার পর?

সত্য যদি প্রকাশ হয়ে পড়ে? রণবীর যদি আক্রোশের বশে সব সত্য কথা বলে বসে? মরিয়মের চিন্তাস্রোতে বাধা পড়ল।

কুবলাই খাঁ ও ইব্রাহিমের সঙ্গে সঙ্গে রণবীর এসে কক্ষের মধ্যে প্রবেশ করল। এবং কক্ষের মধ্যে প্রবেশ করে উদ্ধত ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে রইল।

সম্রাটের ভ্রুযুগল কুঞ্চিত হয়ে ওঠে ক্রমশঃ রণবীরের উদ্ধত ভঙ্গির দিকে তাকিয়ে। ললাটে ভাঁজ পড়ে।

সম্রাট একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে অদূরে দণ্ডায়মান রণবীরের দিকে চেয়ে—তার পাশেই কুবলাই খাঁ ও ইব্রাহিম।

মরিয়মের বুকের ভিতরটা কাঁপতে থাকে।

সম্রাটকে রণবীর কেন কুর্নিশ জানাচ্ছে না—কেন যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করছে না। এত দুঃসাহস রণবীরের হলো কোথা থেকে। এখুনি হয়ত সম্রাটের সামান্য একটি চোখের ইঙ্গিতে রণবীরের মস্তক স্কন্ধচ্যুত হবে। মৃত্যুকেও কি ভয় করে না রণবীর? না ওর মাথার কোন গোলমাল হয়ে গিয়েছে সত্যি সত্যি?

রণবীরের ঔদ্ধত্যটা কুবলাই খাঁ যেন আর সহ্য করতে পারে না। সে তীক্ষ্ন চাপা কণ্ঠে বলে ওঠে, এই মূর্খ—তোর সামনে দিনদুনিয়ার মালিক মালেক-এ-আলম সম্রাট—কুর্নিশ কর—

বারেকের জন্য রণবীর কুবলাই খাঁর মুখের দিকে তাকাল—তারপর মনে মনে মুহূর্তের জন্য কি সে ভাবল সেই জানে—নত হয়ে কুর্নিশ জানাল।

মৃদুকণ্ঠে বললে, সম্রাট, রণবীরের অভিবাদন গ্রহণ করুন। কথাটা বলেই আবার সোজা হয়ে দাঁড়াল রণবীর।

খাপমুক্ত একটা ধারালো তরবারির মতই যেন মনে হয় ঋজু দেহটা রণবীরের।

কি নাম তোমার? সম্রাট বাবুর প্রশ্ন করে এতক্ষণে।

রণবীর সিংহ।

রাজপুত?

আপনার অনুমান সত্য।

দুর্গম দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে সুদূর রাজস্থান থেকে এই কাবুলে কি করে এলে?

রণবীর মৃদু হাসে।

পায়ে হেঁটে নিশ্চয়ই নয় সম্রাট—

হুঁ—তা কেন এসেছো?

সম্রাটকে সতর্ক করে দিতে।

কি—কি বললে?

সম্রাটকে সতর্ক করে দিতে পূর্বাহ্নে—ভারতবর্ষের কোথায়ও কোথায়ও যদিচ

ভাঙ্গন ধরেছে—তথাপি সেখানে আজো বীরের অভাব হয় নি—হাসতে হাসতে দেশের শত্রু-সংহারে প্রাণ দিতে পারে—

যুবক।

সহসা যেন একটা থাবা দিয়ে সম্রাট বাবুর রণবীরকে থামিয়ে দিল, রসনা সংযত কর—নচেৎ—

রাজপুত মৃত্যুকে ভয় করে না সম্রাট—

কিন্তু যে মৃত্যুর কথা তুমি স্বপ্নেও কল্পনা করতে পারবে না সেই মৃত্যু—

সম্রাট, আমি শিশু নই—যে মুহূর্তে আপনার এলাকায় পা দিয়ে আপনার বেতনভুক সৈনিকের হাতে ধরা পড়েছি সেই মুহূর্ত হতেই রণবীর সব কিছুর জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে—

কুবলাই খাঁ ঐ সময় কথা বলে, সম্রাট—আদেশ করুন ঐ কুত্তাটার—

কুবলাইয়ের কথা শেষ হলো না—রণবীর গর্জন করে ওঠে, কুত্তা আমি না তুমি কুবলাই খাঁ—

চকিতে কুবলাই খাঁ তার কোষস্থিত অসি মুক্ত করে রণবীরকে দ্বিখণ্ডিত করে ফেলতেই বুঝি উদ্যত হয় কিন্তু বাধা দেয় সম্রাট।

খামোশ—চিৎকার করে ওঠে বাবুর।

কুবলাই খাঁ মাথা নীচু করে।

এবারে সম্রাট বাবুর রণবীরের দিকে ফিরে তাকাল, শোন যুবক, তোমার সত্য পরিচয় আমি চাই—

জাঁহাপনাকে সে ত আগেই দিয়েছি।

ইব্রাহিম অতঃপর বাবুরের চোখের ইঙ্গিতে কক্ষ ত্যাগ করল।

এবারে সম্রাট মরিয়মের দিকে ফিরে তাকাল, মরিয়ম—

জাঁহাপনা!

ঐ যুবক সম্পর্কে তোমার কি মত?

জাঁহাপনা—

বলছিলাম—কিজন্য ভারতবর্ষ থেকে এই দুর্গম পথ অতিক্রম করে কাবুলে এসেছে বলে তোমার ধারণা?

কেমন করে জানব সম্রাট? তবে—

বল, থামলে কেন?

যুবকের সামান্য পরিচয় থেকে যা মনে হলো—

কি মনে হলো মরিয়ম?

কোন অসৎ উদ্দেশে হয়ত যুবক এখানে আসে নি—

তীক্ষ্ন দৃষ্টিতে মুহূর্তকাল তাকিয়ে থাকে সম্রাট মরিয়মের মুখের দিকে, তারপর শান্ত মৃদু কণ্ঠে প্রশ্ন করে, কি করে বুঝলে?

মরিয়ম যেন কেমন হঠাৎ থতমত খেয়ে যায়, অতঃপর সম্রাটের প্রশ্নের কি জবাব দেবে যেন বুঝে উঠতে পারে না।

কি হলো, চুপ করে গেলে যে মরিয়ম!

জাঁহাপনা—

কুবলাই খাঁ বলছিল ও তোমারই কক্ষে নাকি ধৃত হয়েছে।

মালেক আলম—

ও তোমার পূর্বপরিচিত নয়ত ?

মরিয়ম চুপ।

আমার ধারণা—। সম্রাট পুনরায় মরিয়মের মুখের দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকায়, মরিয়মও ভীরু দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে সম্রাটের মুখের দিকে।

আমার যেন কেন মনে হচ্ছে মরিয়ম—বন্দী রূপবীর তোমার পূর্বপরিচিত।

সম্রাট—

বল—অনুমান আমার মিথ্যা নয়, তাই না ?

সত্য জাঁহাপনা—

তাহলে ও তোমার পরিচিত ?

হ্যাঁ।

॥ ১২ ॥

বীরেন্দ্র সিংহের মুখোচ্চারিত কথাটা এমনি যে রায়মল যেন প্রথমটায় ঠিক বুঝে উঠতে পারে নি। তাই সঙ্গে সঙ্গেই প্রায় প্রশ্ন করে, কি বললে বীরেন্দ্র—তোমার ভাবী পত্নী কার দৌহিত্রী—

বীরেন্দ্র সিংহ পুনরোচ্চারণ করে কথাটা। আমার ভাবী পত্নী—পার্বতী—স্বর্গীয় মহারাজ সুরজমলের একমাত্র দৌহিত্রী—মহারাজ গাঙ্গের একমাত্র ভগিনী—

দাঁড়াও—দাঁড়াও বীরেন্দ্র, ব্যাপারটা আমাকে একটু ভাল ভাবে অনুধাবন করতে দাও—উনি পার্বতী স্বর্গীয় মহারাজ সুরজমলের একমাত্র দৌহিত্রী—কিন্তু বীরেন্দ্র সিংহ, ব্যাপারটা তো এখনো আমার আদৌ বোধগম্য হচ্ছে না—

কি হচ্ছে না ?

মানে সত্যিই যদি উনি তোমার ভাবী পত্নী গাঙ্গের ভগিনীই হবেন তা হলে—

একটু পূর্বেই তোমায় বলেছি রায়মল, দেহরক্ষীর পদ আমি ত্যাগ করে এসেছি।

ত্যাগ করে এসেছো ?

হ্যাঁ।

কারণটা কি—মহারাজ সুরজমলের দেহরক্ষী যখন এতদিন ছিলে তুমি, তখন গাঙ্গ নিশ্চয়ই তোমাকে ভাল করেই চেনবার অবকাশ পেয়েছেন—তবে কি কোন কারণে পূর্ব হতেই তিনি তোমার ওপরে অসন্তুষ্ট ছিলেন এবং সেই জন্যই—

না।

তবে ? তবে কি উনিই তার কারণ ? ইঙ্গিতে দেখাল রায়মল পার্বতীকে।

মুহূর্তকাল যেন কি ভাবল বীরেন্দ্র সিংহ তার পর মৃদু শান্ত কণ্ঠে বললে, হ্যাঁ—পার্বতীকে ভালবাসাটা তার কাছে অপরাধ বলে মনে হয়েছে—

খুব স্বাভাবিক—দেশের রাজার একমাত্র ভগিনী আর তুমি সামান্য বেতনভুক তারই এক কর্মচারী সৈনিক মাত্র—আক্রোশ তো হবেই। যদি কিছু মনে না কর তো একটা কথা জিজ্ঞাসা করি—

বল।

যোধপুর ছেড়ে যখন চলে এসেছো আর বিশেষ করে সঙ্গে উনি যখন আছেন তোমার কোথাও না কোথাও একটা আশ্রয়ের নিশ্চয়ই আশু প্রয়োজন।

তা প্রয়োজন বৈকি—

কোন জানা আশ্রয় আছে কি ?

আপাতত মনে পড়ছে না তেমন কোন আশ্রয়।

আমি একটা প্রস্তাব করব ?

কি ?

বুরবোতে যাবে ?

বুরবো।

হ্যাঁ—মহারাজ শাগ—সুরজমলের তৃতীয় পুত্র সেখানকার অধিশ্বর।

তুমি—

আমি তার অন্যতম সৈন্যাধক্ষ।

বীরেন্দ্র সিংহ অতঃপর কি জবাব দেবে বুঝতে পারে না।

চুপ করে থাকে।

রায়মল শুধায়, কি ভাবছো বীরেন্দ্র সিংহ ?

বীরেন্দ্র সিংহ মুখ তুলে তাকাল রায়মলের দিকে।

রায়মল বলে, শোন বীরেন্দ্র সিংহ, তোমার সঙ্গে আমার ইতিপূর্বে সাক্ষাৎ কোন পরিচয়ের সৌভাগ্য না হলেও একজন সত্যিকারের সুনিপুণ যোদ্ধা হিসাবে—তোমার নাম আমাদের কানে এসেছে। তুমি যে মহারাজ সুরজমলের সত্যিকারের দেহবর্ম ছিলে তাও আমরা জানি। একমাত্র তোমার ভয়েই ইতিপূর্বে কোন গুপ্তঘাতক বা দুর্ধর্ষ কোন সৈনিক পর্যন্ত মহারাজ সুরজমলের দিকে এগোতে সাহস পায় নি—মহারাজ শাগ তোমার মত একজন বিশ্বাসী—সুনিপুণ অসিযোদ্ধা পেলে সাদরে—সানন্দে তার রাজ্যে যথাযোগ্য সম্মানের সঙ্গে স্থান দেবেন—

রায়মল—তুমি—

হ্যাঁ বীরেন্দ্র, আমি ঠিক তাই বলতে চাই—আশ্রয়ের তোমার যখন সত্যি প্রয়োজন—তখন বুরবোতে মহারাজ শাগের আশ্রয়ে যেতে নিশ্চয়ই তোমার কোন আপত্তি হতে পারে না।

না—তা নয়, কিন্তু—

কিন্তু আবার কি—তুমি আর কালহরণ করো না। মনঃস্থির করে ফেল।

সত্যিই আর যেন ভাবতে পারছিল না বীরেন্দ্র সিংহ। পার্বতী তার সঙ্গে এসেছে। রাজার দুলালী সে। চিরদিন প্রাচুর্যের মধ্যে ও সুখে লালিতপালিত। এমনি করে কখনো কি সে পথের মাঝখানে এসে দাঁড়িয়েছে? আর কিছুর জন্য না হোক অন্তত পার্বতীর জন্যও একটি নিরাপদ নিশ্চিন্ত আশ্রয় তার অবিলম্বে প্রয়োজন। রাজার দুলালীকে নিয়ে এমনি করে সে মরু-পর্বত-কান্তার-অরণ্যে ঘুরে কিছু বেড়াতে পারে না।

তাছাড়া মহারাজ গাঙ্গ—কেবলমাত্র তাকে রাজ্য হতে বিতাড়িত করেই হয়ত নিশ্চিন্ত থাকবেন না, তার আভিজাত্যের অভিমান যে কতখানি সেটা আর কারো অজানা থাকলেও তার অজানা নয়। আভিজাত্যের জন্য সে সব কিছু বিসর্জন দিতে পারে। সেখানে গাঙ্গ কেবল জেদীই নয়, প্রচণ্ডতম নিষ্ঠুর। প্রয়োজন হলে সে হয়ত তার নিজের ভগিনীকে হত্যা করতেও এতটুকু দ্বিধা বোধ করবে না—

কি ভাবছো বীরেন্দ্র—

ঠিক আছে রায়মল—আমি তোমার প্রস্তাবে সম্মত—

বাঃ, এই তো বুদ্ধিমানের কথা—দাও হাত বাড়াও—হাত ধর—

বীরেন্দ্র সিংহ হাত বাড়ায়—রায়মল সেই হাত বলিষ্ঠ মুষ্টিতে ধরে বলে, আজ থেকে আমরা পরস্পরের বন্ধু বীরেন্দ্র।

তাই হোক—মৃদু শান্ত কণ্ঠে বীরেন্দ্র কথাটা উচ্চারণ করে।

তা হলে আর দেরি নয় বন্ধু, চল—বুরবোর দিকে অগ্রসর হওয়া যাক।

চল—

শোন বীরেন্দ্র—তোমার সঙ্গে দেখছি কোন অশ্ব নেই—

না—রাজার সম্পত্তি আমি পদত্যাগ করে আসবার সময়ই ত্যাগ করে এসেছি—শান্ত কণ্ঠে বীরেন্দ্র বলে।

তা বেশ করছো—কিন্তু বন্ধু বুরবো তো এখান থেকে খুব সামান্য পথ নয়—বেশ দীর্ঘ পথ—

তা জানি—জবাবে বলে বীরেন্দ্র।

তুমি হয়ত যেতে পারবে ইচ্ছা করলে পদব্রজে, কিন্তু উনি রাজকন্যা কি তা পারবেন?

কেন পারবো না?

এতক্ষণে কথা বলে সর্বপ্রথম পার্বতী। এতক্ষণ একটি কথাও সে বলে নি। নিঃশব্দে কেবল তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে রায়মলকে দেখছিল ও তার কথা শুনছিল।

পার্বতীর কণ্ঠস্বরে তার দিকে ফিরে তাকিয়ে রায়মল বলে, মাপ করবেন রাজকুমারী—আপনি আমার সদ্যলব্ধ বন্ধুর ভাবী পত্নী সেইভাবেই বলছি—মনের জোরে অনেক দুঃসাধ্য ব্যাপারই সাধন করা যায়—আপনিও হয়ত পারবেন, কিন্তু যে দীর্ঘ পথ আমাদের অতিক্রম করতে হবে এবং তাতে করে যে পরিশ্রম হবে সে আপনার কোমল দেহে—

বীরেন্দ্র এবারে বলে ওঠে, তুমি ঠিকই বলেছো রায়মল—ওর পক্ষে সত্যিই কষ্টকর হবে—কিন্তু উপায়ই বা কি তাছাড়া—

মৃদু হেসে রায়মল বলে, কেন—উপায় নেই তোমাকে কে বললো বন্ধু।

কি উপায় বলো?

আমার এই অশ্ব—, বলতে বলতে পুনরায় মৃদু হেসে রায়মল বীরেন্দ্রর দিকে তাকাল।

এই অশ্ব—

হ্যাঁ—উনি অশ্বপৃষ্ঠে চলুন আমরা দুজনে ওঁর পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে অনায়াসেই তো যেতে পারি।

বীরেন্দ্র বলে ওঠে, না না—তা কি করে হবে, তোমার অশ্ব—

তাতে কি হয়েছে—আমার অশ্ব কি তোমাদের অশ্ব নয় বন্ধু?

না, না—তা বলছি না।

তবে?

মানে—

তার মানে আমাকে তোমরা মুখে বন্ধু বলে স্বীকার করলেও কার্যত স্বীকার করতে এখনো দ্বিধাবোধ করছো—

আমাকে ক্ষমা কর বন্ধু—তাড়াতাড়ি বলে বীরেন্দ্র।

তখন সেই মতই ব্যবস্থা হলো। পার্বতী অশ্বারূঢ় হয়ে পথ অতিক্রম করতে লাগল আর দুপাশে পদব্রজে চলতে লাগল পথ বীরেন্দ্র ও রায়মল।

ক্ষীণ চাঁদের আলো তখন আরো ম্লান হয়ে এসেছে—চাঁদ অস্তগামী। চারিদিকে একটা স্তব্ধতা—কেবল থেকে থেকে সেই স্তব্ধতার মধ্যে ঝিল্লীর শব্দ শোনা যায়—আর শোনা যায় একটানা ক্লান্ত মন্থর অশ্বক্ষুরধ্বনি।

বুরবো—পার্বতী অশ্বারূঢ় হয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত—অপরিচিত এক প্রদেশে চলতে চলতে কত কথাই ভাবছিল। বুরবো চলেছে সে। তার দাদু সুরজমলের তৃতীয় পুত্র—বিদ্রোহী পুত্র শাগের এলাকা।

তাদের পিতার মৃত্যুর পর সুরজমল তার জ্যেষ্ঠ গাঙ্গকে মাড়াবারের সিংহাসনের উত্তরাধিকারী মনোনীত করায় সুরজমলের অন্যান্য পুত্ররা কেউ সুখী হতে পারে নি—মনে মনে সন্তুষ্ট হতে পারে নি। পরোক্ষে বিদ্রোহই করেছে বলতে গেলে। কিন্তু বিদ্রোহ করলেও সুরজমলের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণের সাহস হয় নি কারো। মোকাবিলার জন্য মুখোমুখি দাঁড়াবার সাহস পায় নি।

কিন্তু আজ তার পিতারা পঞ্চভ্রাতা। তাদের স্বর্গীয় পিতা—জ্যেষ্ঠ ভাগ—দ্বিতীয় উদো—তৃতীয় শাগ। চতুর্থ—প্রয়াগ এবং পঞ্চম—বিরাম দেব। এবং ঐ অবশিষ্ট চার ভ্রাতা অর্থাৎ তার চার খুল্লতাতর মধ্যে শাগই সর্বাপেক্ষা কুটচক্রী—বহুবার সে তার জ্যেষ্ঠ গাঙ্গের মুখে শুনেছে। এবং শাগই সর্বাপেক্ষা পুত্রদের মধ্যে তাদের পিতা স্বর্গীয় মহারাজকে ঘৃণা করতেন। তারই আক্রোশটা নাকি সর্বাপেক্ষা বেশী। এবং যুদ্ধবিদ্যায়ও শাগের চাতুর্য সকলকে নাকি হার মানায়।

সেই শাগের কাছেই চলেছে পার্বতী—কে জানে কিভাবে শাগ তার খুল্লতাত মেয়েকে গ্রহণ করবে।

ওদিকে রায়মলকে যোধপুরের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করে শাগ কিন্তু নিশ্চিন্ত বসে ছিল না। বহুদিনের জমানো আক্রোশ—পুঞ্জীভূত ঘৃণা—তার একচোখো পিতার জ্যেষ্ঠের পুত্রের প্রতি দাক্ষিণ্য যার জন্য একমাত্র দায়ী, আজ তারই প্রতিশোধ নেবার সুযোগ এসেছে।

তার দ্বিতীয় ভ্রাতা উদো অপদার্থ—তার কোন সিংহাসনের ওপরে অধিকার নেই—ন্যায্য অধিকার সিংহাসনের ওপরে যদি কারো থাকে ত এখন একমাত্র তারই। সে বীর, শক্তিশালী—বীরভোগ্যা বসুন্ধরা যখন, তখন এ সুযোগের সদ্ব্যবহার সে নাই বা করবে কেন? গাঙ্গ কেন সিংহাসনে বসবে? কোন্ অধিকারে? কোন্ যুক্তিতে। কোন্ দাবীতে।

নিভৃত নৃত্যশালার মধ্যে একাকী পরিক্রমণ করতে করতে এবং ঐ কথাগুলো চিন্তা করতে করতে হঠাৎ মনে পড়ে শাগের একজনের কথা। কণ্টক দিয়ে কণ্টক উদ্ধার করলে কেমন হয়?

রাঠোরদের চিরশত্রু দৌলত খাঁ। দৌলত খাঁ রাঠোরদের হাত থেকে নাগোর কেড়ে নিয়ে সেখানে বসবাস করছে জাঁকিয়ে বসে। দৌলত খাঁ রাঠোরদের চিরশত্রু এবং তারও শত্রু ঠিকই, কিন্তু কূট রাজনীতির জন্য যদি সে সেই রাঠোর কণ্টকেরই সাহায্য নেয় ক্ষতি কি। কণ্টক দিয়ে কণ্টক উদ্ধার করলে ক্ষতি কি?

শোভা সিং—শোভা সিং বেশি দূরে যায় নি—কক্ষের বাইরেই বসে অপেক্ষা করছিল—সে জানত—প্রভুর প্রয়োজন হবে তাকে।

মহারাজ—

শোভা সিং সঙ্গে সঙ্গে জবাব দেয়।

ভিতরে এসো—

শোভা সিং নৃত্যশালার মধ্যে এসে প্রবেশ করল।

শোভা সিং তুমি যাও নি কেন এখনো?

যাই নি মহারাজ—যদি আমাকে আপনার কোন প্রয়োজন হয় তাই—

ভালই করেছো—এখুনি একবার তোমাকে নাগোর যেতে হবে।

নাগোর। একটু যেন বিস্মিত হয়েই শোভা সিং প্রভুর মুখের দিকে তাকাল। সে তো জানত নাগোর—রাঠোরদের চিরশত্রু দৌলত খাঁ কর্তৃক অধিকৃত।

হ্যাঁ নাগোরে—একটা জরুরী পত্র নিয়ে তোমাকে এখুনি দ্রুতগামী অশ্বে নাগোরে দৌলত খাঁর নিকট যেতে হবে।

কিন্তু—

তুমি একটু অপেক্ষা কর—এখুনি আমি আসছি—শাগ পার্শ্বের বিশ্রাম কক্ষে গিয়ে প্রবেশ করল। প্রদীপের সামনে গিয়ে পত্র রচনায় নিজেকে নিযুক্ত করে—

খাঁ সাহেব,

বহুত—বহুত সেলাম। আমি মাড়োবার অধিপতি সুরজমলের তৃতীয় পুত্র শাগ। আমার নাম নিশ্চয়ই আপনার অবিদিত নয়। যদিচ আমাদের পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কে আমরা পরস্পরের শত্রু ছিলাম এতকাল।—কিন্তু আজ থেকে আমি

আপনার বন্ধু হলাম এবং আপনাকেও আমার প্রিয়তম বন্ধু বলে সাদর আহ্বান জানাচ্ছি। আপনি বোধ হয় এখনো জানেন না মাড়াবারাধিপতি আমার পিতৃদেবের সুরজমলের দেহান্ত ঘটেছে—আপনি নিশ্চয়ই জানেন আজ যদি কেউ মাড়াবারের সিংহাসনের সত্যিকারের অধিকারী থাকে ও যোগ্যতা থাকে ত—সে আমারই এবং আমিই সেই একজন। বন্ধু—মাড়াবারের সিংহাসন আমি চাই—এবং সে ব্যাপারে আপনার সক্রিয় সাহায্য আমি প্রার্থনা করছি—পত্রোত্তরে আপনার মতামত জানতে পারলে সুখী হবো।

পত্রের নীচে নিজের নাম স্বাক্ষর করে—পত্রখানি একটি আধারের মধ্যে বন্ধ করে শাগ ফিরে এলো আবার নৃত্যশালায়।

শোভা সিং—

মহারাজ—

এই পত্র নিয়ে এই মুহূর্তে তুমি নাগোর অভিমুখে চলে যাও—যত শীঘ্র পারো পত্রোত্তর নিয়ে তুমি ফিরে আসবে।

শোভা সিং মাথা হেলিয়ে সম্মতি জানিয়ে—অভিবাদন করে কক্ষ ত্যাগ করে গেল।

এদিকে রাত্রি প্রায় শেষ হয়ে এলো।

মহারাজ—

কে?

চকিতে ফিরে তাকায় শাগ।

নর্তকী রম্ভা।

কে, রম্ভা?

হ্যাঁ মহারাজ।

রম্ভার বয়স পঁচিশের উর্ধ্বে নয়—রোগা ছিপ্‌ছিপে দেহের গঠন। চাঁপার কলির মত গাত্রবর্ণ। কিন্তু সর্বাপেক্ষা সুন্দর বুঝি তার মন কেড়ে নেওয়া ওষ্ঠের মৃদু হাসি আর কাজল দুটি চক্ষুর বিলোল মদির চাহনি।

মহারাজ আমি সামান্যা এক নর্তকী—দেহপসারিণী—ঘৃণ্যা নারী।

রম্ভা—

নগণ্যা এই নারীর অপরাধ ক্ষমা করবেন—দুর্ভাগ্যক্রমে পাশের কক্ষ থেকে সব আমি শুনেছি।

রম্ভা—তীক্ষ্ণ কণ্ঠে ডেকে ওঠে শাগ।

মহারাজ রাঠোরদের চিরশত্রু ঐ দৌলত খাঁ—আপনি শেষ পর্যন্ত তারই সঙ্গে হাত মিলাতে চলেছেন!

নর্তকী, তুই তোর অধিকারের সীমা লঙ্ঘন করতে চলেছিস।

নিঃসন্দেহে—তবু বলবো মহারাজ—দেশের যে শত্রু—যে জাতির শত্রু তার সঙ্গে হাত মিলানো—কখনো পরিণাম শুভ হবে না মহারাজ।

নর্তকী রম্ভা—দেখছি আমার অত্যধিক প্রশ্রয়টা তোর মাথাটা বিগড়ে

দিয়েছে।

বললাম তো মহারাজ, অপরাধী যদি হই তো আমাকে শাস্তি দিন যা আপনার খুশি কিন্তু—ওকে ফেরান—দেশের এত বড় সর্বনাশ করবেন না—আমি করতে দেবো না—কিছুতেই না।

রম্ভা—

হ্যাঁ মহারাজ—আপনি যদি ওকে না ফেরান ওর গতিরোধ করে ওকে প্রতিনিবৃত্ত করবো। বলতে বলতে রম্ভা দৃঢ় পদে দুয়ারের দিকে এগিয়ে যায়।

রম্ভা—চিৎকার করে ওঠে শাগ কঠিন কণ্ঠে।

কিন্তু রম্ভা দৃকপাতও করে না সে ডাকে—দুয়ার-পথে বের হয়ে যায় এবং সঙ্গে সঙ্গে শাগ তার কটিদেশ থেকে তীক্ষ্ন ছুরিকাটা চকিতে টেনে বের করে রম্ভাকে লক্ষ্য করে সজোরে নিক্ষেপ করে।

॥ ১৩ ॥

শাগের নিক্ষিপ্ত তীক্ষ্ন ছুরিকা লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়। তীক্ষ্ন ছুরিকাখানি কাষ্ঠনির্মিত কপাটের গায়ে প্রোথিত হয়ে থর থর করে কাঁপতে থাকে।

মুহূর্তের জন্য রম্ভাও ফিরে দাঁড়ায় এবং প্রোথিত ছুরিকাখানি টেনে খুলে নেয় হাতে। শাগের দিকে স্থির দৃষ্টিতে মুহূর্তের জন্য তাকিয়ে সে হেসে ফেলে।

সুন্দর মুখখানি সুন্দর হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে, মহারাজ—আমি চলে যাচ্ছি আপনার এখান থেকে এবং যাবার পূর্বে আবারও শেষবারের মত বলে যাচ্ছি এ করবেন না—এ মহাপাপ। যবনকে নিজ মাতৃভূমিতে কোনমতেই ডেকে আনবেন না। সামান্য জ্ঞাতি-শত্রুতার জন্য এক দেশবৈরীকে আহ্বান করে এনে নিজের ও সমগ্র দেশের সর্বনাশ করবেন না।

কথাগুলো বলে আর নর্তকী রম্ভা দাঁড়ায় না। দ্রুতপদে স্থান ত্যাগ করে চলে যায়।

স্পর্ধা—স্পর্ধা সামান্যা এক নর্তকী—সামান্যা এক রূপোপজীবিনীর—পথের ধুলোকে সে বুকের ওপরে আশ্রয় দিয়েছিলো—তারই প্রতিদান সে দিয়ে গেল। রুদ্ধবিষ সর্পের মতই গর্জাতে লাগল শাগ। অস্থির অশান্ত পায়ে কক্ষের মধ্যে পরিক্রমণ করে বেড়াতে লাগল।

কিন্তু না—রম্ভাকে যেতে দেওয়া হবে না—দেবেন না তিনি তাকে কিছুতেই যেতে। যেমন করে যে ভাবেই হোক ওর গতিরোধ করতেই হবে। করতেই হবে।

মহারাজ শাগ কক্ষ থেকে বের হয়ে এলো। সামনেই প্রশস্ত অলিন্দ—কিছু দূরে দূরে আলোর ব্যবস্থা—দেওয়ালের গায়ে ধাতুনির্মিত আধারে মশাল জ্বলছে। কিন্তু কেউ নেই অলিন্দে। জনপ্রাণীও নেই—দ্বাররক্ষীও নেই একজন সেখানে। দ্রুতপদে অলিন্দ অতিক্রম করে শাগ যখন অন্ধকার বহির্দ্বারে এসে উপস্থিত হলো—দূরে বিলীয়মান অশ্বক্ষুরধ্বনি কেবল একটা তার কানে এলো।

খট্-খট্-খটা-খট্—অশ্বক্ষুরের একটানা একটা শব্দ ক্রমশঃ দূর হতে দূরান্তে মিলিয়ে গেল।

রত্না তা হলে চলে গেল। কিন্তু কোথায় গেল রত্না? কার কাছে গেল? ওরই ভ্রাতুষ্পুত্র গাঙ্গের কাছেই কি গেল? পশ্চিমে যখন গেল মনে হচ্ছে যোধপুরের দিকেই গেল মনে হয়। সম্ভবত তাই, তার শত্রু গাঙ্গের আশ্রয়ই সে নেবে।

মিথ্যা নয়। শাগের অনুমান মিথ্যা নয়। সত্যিই রত্না যোধপুরের দিকেই অশ্ব ছুটিয়েছিল সে রাত্রে।

হয়ত সে শাগের সীমানা থেকে অত দ্রুত অন্যত্র চলে যেতে পারত না যদি না চত্বরের ওধারে একটি অশ্ব প্রস্তুত থাকত।

রত্না জানত সে কথা। সর্বক্ষণের জন্য একটি অশ্ব প্রস্তুত থাকত চত্বরে। শাগের কখন কি প্রয়োজন হয়। কিন্তু অশ্বরক্ষক তেজেন্দ্র সিং রত্নাকে প্রথমে অশ্বটি ছেড়ে দিতে চায় নি।

বলেছে, না—এ মহারাজের ব্যবহারের অশ্ব—

রত্না সঙ্গে সঙ্গে বলেছিল, তেজা সিং, আমি মহারাজের কাজেই যাচ্ছি।

না—মহারাজের অনুমতি ব্যতীত আমি দিতে পারব না।

কিন্তু রত্নার তখন আর বিলম্ব করলে চলবে না। শাগকে সে ভাল করেই চেনে—এখুনি হয়ত শাগ এসে পড়বে—তাকে আবারও বাধা দেবার চেষ্টা করবে।

হাতের ছুরিকাটা উঁচিয়ে ধরে রত্না চাঁকিতে, তেজা সিং—পথ ছাড়ো—

বৃদ্ধ তেজা সিং প্রাণভয়ে দু-পা পিছিয়ে আসে আর সেই মুহূর্তে রত্না জীনের রেকাবের উপর এক পা রেখে লাফিয়ে অশ্বপৃষ্ঠে উঠে বসে—দু-পা দিয়ে সজোরে অশ্বের পেটে আঘাত করে। শিক্ষিত অশ্ব ইঙ্গিত পেয়ে এক লাফে সামনের দিকে এগিয়ে যায়—এবং তেজা সিং কোন রকম বাধা দেবার আগেই অশ্ব রত্নাকে নিয়ে দ্রুত ছুটতে থাকে।

চিৎকার করে ওঠে তেজা সিং, মহারাজ—মহারাজ—

চত্বরের সামনে এসে দাঁড়াবার সঙ্গে সঙ্গেই তেজা সিংয়ের সেই চিৎকার শাগের কর্ণগোচর হয়।

ছুটে আসে শাগ চত্বরে।

মহারাজ নর্তকী অশ্ব নিয়ে চলে গেল।

প্রচণ্ড একটা আক্রোশে মুহূর্তে যেন দপ্ করে জ্বলে ওঠে শাগ। বৃদ্ধ তেজা সিংয়ের গালে প্রচণ্ড একটা চড় বসিয়ে দেয় ঠাস্ করে। অপদার্থ—বের হয়ে যা আমার সামনে থেকে।

কোথায় যাবে রত্না প্রথমটায় ঠিক করতে পারে নি। মনেও হয় নি। এবং অশ্বপৃষ্ঠে বসে ছুটতে ছুটতে প্রথম যার কথা মনে পড়ে—সে গাঙ্গা। গাঙ্গা—যুবরাজ গাঙ্গা—রত্নার মনের পাতায় ভেসে ওঠে এক তেজোদ্দীপ্ত যুবাপুরুষের চেহারাটা।

সুদীর্ঘ তিনটি বৎসর। কিন্তু আজো যেন সেই দীপ্ত চেহারাখানি সমস্ত মনটা জুড়ে রয়েছে তার—সেই কণ্ঠস্বর যেন আজো সে চোখ বুজলেই শুনতে পায়।

ভুলবে কেমন করে—ভুলতে কি পারে রত্না সে কণ্ঠস্বর—সেই চেহারা। এ দেহটা যখন অগ্নিতে পুড়ে ছাই হয়ে যাবে তখনো হয়ত মুছে যাবে না সে চেহারা তার মনের পাতা থেকে।

সামন্ত সর্দার লাল সিংহের কন্যা রত্না। সেই কি তার একমাত্র অপরাধ? না, রাজপুত-বৈর? লাল সিং গাঙ্গর পিতার দিক সমর্থন করে নি—গাঙ্গকে যখন যুবরাজ বলে ঘোষণা করবেন মহারাজ সুরজমল মনস্থির করেছেন সেই সময় রত্নার পিতা সামন্ত সর্দার লাল সিং প্রতিবাদ করেছিল। বলেছিল, এ অন্যায় মহারাজ—কিন্তু সে কি রত্নার অপরাধ? তার জন্য কি অপমান রত্নার প্রাপ্য? তার জন্য কি তিরস্কার রত্নার প্রাপ্য? তাছাড়া ব্যাপারটা তো রত্না স্বপ্নেও জানত না—পিতাকে তার সাহায্য করা বা পরামর্শ দেওয়া দূরে থাক।

অরণ্যে শিকার করতে বের হয়েছিল রাজকুমার গাঙ্গ। সারাটা দিন ছুটো-ছুটি করে ক্লান্ত—সূর্য তখন পাটে বসেছে। বিশ বছরের যুবক। বীর্যবান যুবক—একটা বন্য বরাহকে তাড়া করে চলেছে গভীর অরণ্যের মধ্যে অকস্মাৎ এক অপরূপ তরুণ যুবার সামনাসামনি পড়ে গেল গাঙ্গ।

তরুণ যুবার অঙ্গে ভীলের বেশ। মালকোছা দিয়ে ধুতি পরা—গায়ে কুর্তা —লাল রংয়ের—মাথার চুল ঝুঁটি করে বাঁধা—তাতে পালক গোঁজা হাতে ধনুর্বাণ। এখনো আশ্চর্য ওষ্ঠে গোঁফের রেখা পড়ে নি।

প্রথম মুহূর্তে পরস্পর পরস্পরের দিকে কিছুক্ষণ অপলক তাকিয়ে থাকে। দুজনেই যেন বোবা—কারো মুখে কোন কথা নেই।

কথা বলে প্রথম গাঙ্গই, এদিক দিয়ে একটি ধূসর বর্ণের বন্য বরাহ যেতে দেখেছো যুবক?

গাঙ্গর ঐ প্রশ্নে যুবকের ওষ্ঠপ্রান্তে একটা ক্ষীণ হাসির রেখা জেগে ওঠে।

হাসছো যে—

এবারে যুবক প্রত্যুত্তর দেয়, কারণ আমিও ভাবছিলাম আপনাকে দেখেই ঐ প্রশ্নটিই করব।

কোন পুরুষের কণ্ঠস্বর যে এত মিষ্টি, এত সুরেলা হতে পারে এ যেন রাজকুমার গাঙ্গর চিন্তারও অতীত ছিল।

প্রথমটায় তাই বুঝি ঐ মিষ্টি সুরেলা কণ্ঠস্বর শুনে কেমন চমকে গিয়েছিল গাঙ্গ। ক্ষীণকণ্ঠে বলে, কি, কি বললে?

আপনি একটি ধূসর বর্ণের বরাহকে এই পথে যেতে দেখেছেন?

দেখেছি কিন্তু—

সেই সূর্যোদয়ের ঠিক পর থেকেই তো তার পিছনে পিছনে আমি ছুটে বেড়াচ্ছি।

আমিও তো তাই—সেই বরাহটিকে শিকার করবো বলে—

সঙ্গে সঙ্গে তরুণ যুবক বলে, আপনি শিকার করবেন মানে? সে তো আমার শিকার?

আমি সেই কোন্ সকাল থেকে তার পিছনে পিছনে ঘুরছি শিকারের আশায় আর সে তোমার শিকার হয়ে গেল—গাঙ্গ বলে।

আমার শিকার বৈকি—

গাঙ্গ তীব্রকণ্ঠে প্রতিবাদ জানায়, কখনই না, সে আমার শিকার।

না আমার—

সাবধান যুবক! গাঙ্গ অসিতে হাত দেয়।

কোন্ যুক্তিতে সে শিকার আপনার শুনি—আমি আজ দুদিন ধরে তাকে শিকারের আশায় ঘুরছি—

শোন উদ্ধত যুবক, তুমি হয়ত আমার পরিচয় জান না—আমি রাজকুমার গাঙ্গ।

কি—কি নাম বললেন?

গাঙ্গ—মাড়াবারের রাজকুমার।

তাই বুঝি!

হুঁ—তুমি কে?

আমি—

হুঁ—কে তুমি—কি তোমার পরিচয়?

সে তো আপনি চিনবেন না—আর আমার পরিচয়ের মধ্যে এমন কোন বিশেষত্ব কিছু নেই যা শুনলেই হয়ত আপনি চিনে নেবেন।

রাজপুত?

হ্যাঁ—

ঠিক আছে, পথ ছাড়, তুমি আমার—

পথ তো আপনারই ছাড়বার কথা—আপনিই তো আমার পথ আগলে দাঁড়িয়েছেন—মৃদু হেসে তরুণ যুবক বলে।

তুমি তাহলে পথ ছাড়বে না? কঠিন কণ্ঠে প্রশ্ন করে এবার গাঙ্গ।

যদি না ছাড়ি—

চকিতে হাতের তীরধনুক ফেলে দিয়ে গাঙ্গ কটিদেশ থেকে তীক্ষ্ণ অসি টেনে বের করে।

প্রতিদ্বন্দ্বী যুবকও বিলম্ব করে না—সেও তার কটিদেশ থেকে তরবারি টেনে বের করে। বলে, তবে তাই হোক রাজকুমার—শিকার কার সেটা অসিমুখেই মীমাংসা হয়ে যাক।

সেই বয়সেই গাঙ্গ অসিযুদ্ধে রীতিমত নিপুণ হয়ে উঠেছিল—তার অসির মুখে ঐ তরুণ যুবক শীঘ্রই কোণঠাসা হয়ে পড়ে।

গাঙ্গ বলে, এইবার—!

তখনও সে মৃদু হাস্য সহকারে বলে, হার মানব না—

এখনো না?

না—

গাঙ্গ তখন অপূর্ব কৌশলে তার হস্তস্থিত তরবারির মুখে সেই তরুণের মাথার পাগড়ি স্থানচ্যুত করতেই যেন অপূর্ব এক বিস্ময় তার চোখের সামনে উদ্ঘাটিত হলো।

কালো কুঞ্চিত কেশরাশি যুবকের সর্বাঙ্গে ছড়িয়ে পড়ল।

হাতের উদ্যত অসি হাতেই থাকে গাঙ্গের—সে নির্বাক বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকে যুবকের মুখের দিকে—অন্য পক্ষ তখন মাথা নীচু করেছে—এ তো যুবক নয়—যুবতী—পুরুষের বেশে এক অপরূপ সুন্দরী যুবতী।

কে তুমি ?

যুবতী ততক্ষণে নিজেকে সামলে নিয়েছে এবং স্থানত্যাগ করবার জন্য পা বাড়িয়েছে।

কিন্তু গাঙ্গ তাকে যেতে দেয় না—অসিমুখে তার পথরোধ করে দাঁড়ায়, দাঁড়াও—কে তুমি ?

রাজকুমার, আমি রম্ভা।

রম্ভা—তুমি নারী—

রম্ভা চুপ করে থাকে।

কি তোমার পরিচয় ?

সামন্ত সর্দার লাল সিংয়ের কন্যা আমি, রম্ভা।

কথাটা বলে রম্ভা বুঝি যাবার জন্য পা বাড়ায়। কিন্তু সেই মুহূর্তে গাঙ্গর ডাক তার কর্ণে প্রবেশ করে।

রম্ভা—

রম্ভা সে ডাকে ঘুরে দাঁড়ায়।

শিকারের অধিকার আমি ত্যাগ করলাম।

কৌতুকহাস্যে রম্ভার মুখখানি উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। সে বলে, দয়া করছেন নাকি রাজকুমার ?

না।

তবে ?

নারীর সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা আমি করি না।

রম্ভা আর কোন কথা বললো না—ধীরে ধীরে স্থানত্যাগ করে গেল।

গাঙ্গ আরো কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে যে পথে এসেছিল সেই পথেই ফিরে যায়। কিন্তু কিছুদূর অগ্রসর হবার পরই গাঙ্গ বুঝতে পারে সে পথ ভুল করেছে।

নিবিড় অরণ্যানীর মধ্যে সে পথ ভুল করেছে।

পথ চিনতে পারছে না।

ইতিমধ্যে সূর্য অস্তমিত হয়েছিল—একটু একটু করে আলোর শেষ রেখাটুকুও কখন অরণ্যের মধ্যে অবলুপ্ত হয়ে গিয়েছে।

ক্রমশঃ অন্ধকার চারিদিকে ঘনিয়ে আসছে।

কালো পক্ষ বিস্তার করে অন্ধকার চারিদিকে নেমে আসছে।

গাঙ্গ একবার এদিক একবার ওদিক যায় কিন্তু পথ আর খুঁজে পায় না।

একে পরিশ্রান্ত—তার উপরে অন্ধকার—রাজকুমার গাঙ্গ রীতিমত চিন্তিত হয়ে পড়ে।

হঠাৎ সেই সময় কানে আসে রত্নার কণ্ঠস্বর, রাজকুমার—

কে!

সামনেই আবছা অন্ধকারে দাঁড়িয়ে অস্পষ্ট এক ছায়ামূর্তি।

কে!

ভয় পেয়েছেন রাজকুমার—আমি রত্না।

রত্না!

হ্যাঁ—পথ হারিয়েছেন মনে হচ্ছে—

পথ খুঁজে পাচ্ছি না—

আপনার অশ্ব কোথায়?

পর্বতসানুদেশে অশ্ব রেখে এসেছি—

রাজধানীতে তাহলে প্রত্যাবর্তন করবেন কি করে?

পথটা যদি খুঁজে পেতাম—

পেলেও যেতে পারতেন না—বরাহের পিছনে পিছনে ছুটতে ছুটতে অনেকটা দূরে এসে পড়েছেন—দীর্ঘ পথ অতিক্রম করেছেন কুমার।

তবে—

যদি আপত্তি না থাকে গরীব সামন্ত সর্দারের গৃহে রাতটা কাটাতে পারেন।

কিন্তু—

চিন্তা করবার আর সময় নেই রাজকুমার। যেতে যদি চান তো আসুন আমার সঙ্গে—আপনি পথ খুঁজে পাবেন না জানতাম, তাই আপনার কাছে কাছেই ছিলাম—ফিরে যাইনি। কি বলেন? আসবেন?

কি যেন ভাবল গাঙ্গ—তারপর বললে মৃদু কণ্ঠে, তাই হোক তবে—চল।

আসুন—

অন্ধকার তখন চারিদিকে আরো নিবিড় হয়ে এসেছে।

নিবিড় অরণ্য যেন কালো অন্ধকারে নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে।

রত্না কিন্তু অনায়াসেই পথ দেখিয়ে চলে—গাঙ্গ দ্রুতপদে তাকে অনুসরণ করে চলে।

রত্না—

বলুন রাজকুমার।

আর কত দূর?

আরো কিছুটা পথ অতিক্রম করতে হবে রাজকুমার।

তুমি পথ ভুল কর নি তো?

একটা মৃদু হাসির শব্দ অন্ধকারে মর্মরিত হয়ে উঠলো।

নিরাপদেই সে রাত্রে পর্বতসানুদেশে সামন্ত সর্দার লাল সিংয়ের গৃহে এনে তুলেছিল রত্না গাঙ্গকে। বিশ্রামের সকল ব্যবস্থাই করে দিয়েছিল।

লাল সিং সে রাত্রে গৃহে ছিল না। এক বুড়ী আয়ী ও রত্না ছিল গৃহে। তথাপি আতিথ্যের কোন দিক দিয়েই কোন ত্রুটি হয় নি। পরের দিন প্রত্যুষে রত্না নিজে তাকে যথাস্থানে পৌঁছে দিয়েছিল। তারপর দিন দুইও গেল না—এক দ্বিপ্রহরে গাঙ্গ কিসের টানে যেন পুনরায় সামন্ত সর্দার লাল সিংয়ের গৃহে এসে উপস্থিত হয়েছিল।

লাল সিং সেদিন গৃহেই ছিল—রত্না গিয়েছিল ঝরনায় জল আনতে।

লাল সিং গাঙ্গের পরিচয় পেয়ে তাকে সাদরে আহ্বান জানিয়েছিল। এমনি করেই যাতায়াত শুরু হয় গাঙ্গের লাল সিংয়ের গৃহে এবং ক্রমশঃ রত্নার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা জম্মায়।

কিন্তু অকস্মাৎ বাধা দিল একদিন লাল সিং তাদের ক্রমবর্ধমান ঘনিষ্ঠতায়।

সেদিন রত্না গৃহে ছিল না। একাকী লাল সিং ছিল।

লাল সিং বললে, একটা কথা ছিল রাজকুমার।

কি কথা?

আমার ইচ্ছা নয় আপনি আর এভাবে এখানে আসা-যাওয়া করেন।

কেন?

কারণটা কি আপনি বুঝতে পারেন না!

স্পষ্ট করে বল লাল সিং?

এভাবে যদি যাতায়াত করতেই চান তাহলে—

কি?

রত্নাকে আপনার বিবাহ করতে হবে—

বিবাহ?

হ্যাঁ রাজকুমার।

গাঙ্গর এতটুকুও আপত্তি ছিল না কিন্তু লাল সিংয়ের নামটা শুনেই মহারাজ সুরজমল যেন তেলেবেগুনে জ্বলে উঠল। বললে, কখনও না।

কিন্তু দাদু—

না গাঙ্গ।

সামন্ত সর্দারের কন্যা বলে কি?

না।

তবে?

ঐ রত্না লাল সিংয়ের ভ্রষ্টা নর্তকী স্ত্রীর গর্ভজাত কন্যা।

নর্তকীর গর্ভজাত।

হ্যাঁ—নর্তকী পান্নার কন্যা। চিতোরগড়ের রাজসভায় পান্না ছিল নর্তকী—লাল সিংকে আমিই একবার বিশেষ কাজে চিতোরগড়ে প্রেরণ করেছিলাম—সেখানে ঐ নর্তকীকে দেখে তার রূপে মুগ্ধ হয়ে তাকে নিয়ে একরাত্রে চুপিসাড়ে

পালিয়ে আসে—

লাল সিং কি পান্নাকে বিবাহ করে নি ?

করেছিল কিন্তু তাতেই বা কি এসে গেল—বিবাহের পূর্বে সে ছিল নর্তকী ও বহুজনলভ্যা—

কিন্তু রত্নার দোষ কি ?

দোষ—ঐ মায়ের গর্ভে তার জন্ম—

গাঙ্গ বুঝতে পেরেছিল তার দাদু মহারাজ সুরজমল রত্নাকে কিছুতেই পৌত্রের বধূ বলে মেনে নিতে পারবে না—নেবে না। তাই গাঙ্গ আর কোন তর্ক তোলে নি—স্থান ত্যাগ করেছিল। কিন্তু তাহলেও রত্নাকে সে ভুলতে পারে নি।

সুরজমল বোধ হয় বুঝতে পেরেছিল গাঙ্গ রত্নাকে সহজে ভুলতে পারবে না, তাই সে অন্য পথ নেয়।

লাল সিংকে আদেশ করে সে যেন যত শীঘ্র সম্ভব তার কন্যাকে নিয়ে অন্যত্র চলে যায় কিন্তু লাল সিং সে আদেশ পালন করে নি।

প্রচণ্ড আক্রোশে জ্বলে উঠেছিল সুরজমল লাল সিং তার আদেশ অমান্য করায়। একরাত্রে তার ঘরে আগুন লাগল। এবং সে আগুনে লাল সিং পুড়ে মরল—রত্না যদিও কোনমতে রক্ষা পায়।

রত্না জানত না তার মায়ের সত্যকারের পরিচয়টা—অগ্নিদগ্ধ মৃত্যুপথযাত্রী লাল সিং শেষ মুহূর্তে কন্যাকে সব বলে গেল এবং এও বলে গেল যে অন্যায়-ভাবে তার গৃহ পুড়িয়ে দিল, তাকে হত্যা করলো, তাকে অর্থাৎ সেই সুরজমলকে যেন সে কখনো ক্ষমা না করে।

কিন্তু গাঙ্গ—গাঙ্গকে সে কেমন করে ভুলবে ? রত্না অধীর অপেক্ষায় পথ চেয়ে থাকে গাঙ্গর কিন্তু গাঙ্গ আসে না।

গাঙ্গকে ঐ সময়টা সুরজমল একটা কাজের ভার দিয়ে উদয়পুরে প্রেরণ করেছিল।

এদিকে দীর্ঘ দেড় মাস ধরে অপেক্ষা করেও গাঙ্গ যখন এলো না রত্না গৃহ ভস্মসাৎ হবার পর যে প্রতিবেশীর গৃহে আশ্রয় নিয়েছিল তার সে আশ্রয় ছেড়ে একদিন সহসা এক রাত্রে নিরুদ্দিষ্টা হয়ে গেল।

গাঙ্গর প্রতি প্রচণ্ড একটা অভিমান ও সুরজমলের প্রতি প্রচণ্ড এক আক্রোশে রত্না গৃহ ছেড়ে অজানা পথে পা ফেলেছিল। কিন্তু ঐ বয়েস—ঐ রূপ—যেখানে যায় সেখানেই যেন তাকে ছিঁড়ে খেতে চায়। ঘুরতে ঘুরতে একদিন রত্না চিতোরগড়ে এসে হাজির হলো তার মায়ের দেশে।

চিতোরগড়েই তার দেখা হয় ভাগ্যক্রমে প্রৌঢ়া নর্তকী সম্পর্কে দাদী লক্ষ্মীবাঈয়ের সঙ্গে। লক্ষ্মীবাঈ পান্নারই জননী। রত্না তারই আশ্রয়ে থাকে। এবং লক্ষ্মীবাঈয়েরই ইচ্ছা ও পরামর্শ মত শেষ পর্যন্ত সে তার কাছ থেকে নৃত্যের শিক্ষা নিতে থাকে।

অল্প সময়েই নৃত্যপটিয়সী হয়ে উঠল রত্না। ঐ সময় লক্ষ্মীবাঈয়ের মৃত্যু হয়।

রত্না চলে যায় উদয়পুর। সেখান থেকে আসে বুরবোতে কয়েক মাস আগে। রত্না কিন্তু জানত না—গাঙ্গ উদয়পুর থেকে ফিরে ছদ্মবেশে একদিন গিয়ে হাজির হয়েছিল রত্নার কুটীরের সামনে।

দেখলো একটা পোড়া কুটীরের ভস্মাবশেষ পড়ে আছে—পূর্ব কুটীরের চিহ্নমাত্রও নেই।

আশেপাশের লোকেরাই বললে, কেউ নেই—লাল সিং পুড়ে মরেছে, আর রত্নাও আত্মহত্যা করেছে। গাঙ্গ ফিরে এসেছিল।

যোধপুরের পথে যেতে যেতে রত্না ভাবছিল—সেদিনকার যুবরাজ আজ মহারাজাধিরাজ। মহারাজ গাঙ্গ হয়ত কবে ভুলে গিয়েছে সামন্তকন্যা রত্নাকে। তবু আজ তার সঙ্গে একটিবার তাকে যেভাবেই হোক দেখা করতেই হবে, আজ যে মাড়বারের চরম দুর্দিন সামনে। গৃহবিবাদ আসন্ন।

মাড়বার ধ্বংস হয়ে যাবে—না রত্না তা কিছুতেই হতে দেবে না, কিন্তু কেমন করে মহারাজ গাঙ্গের দর্শন সে পাবে। কেমন করে দুর্গপ্রাসাদে সে প্রবেশ করবে, কোন্ পরিচয়ে?

॥ ১৪ ॥

মরিয়মের মুখনিঃসৃত 'হাঁ' কথাটা বাবুরকে যেন মুহূর্তের জন্য স্তম্ভিত বিমূঢ় করে দেয়। শুধু তাই নয়, সঙ্গে সংগে আরো যা বাবুরের মনে হয়, দেখা যাচ্ছে ওরা বিশেষভাবেই পরস্পরের পরিচিত, এবং যোগসাজস করে পৃথক পৃথক ভাবে গুপ্তচরের বৃত্তি নিয়ে ওরা কাবুলে এসে প্রবেশ করে নি ত তার চোখে ধুলো দেবার জন্য?

কেন যেন বাবুরের মন বলে, খুব সম্ভবত তাই—ওরা দুজনাই হয়ত হিন্দুস্থানী গুপ্তচর। একজন ধরা পড়ে যাওয়ায় অন্যজনও ধরা পড়ে গিয়েছে। একজন ধরা না পড়লে হয়ত অন্যজনও ধরা পড়ত না।

কিন্তু তার বিশ্বস্ত অনুচর মোল্লা মুরসিদ। সে ত বললে, হিন্দুস্থান থেকে ঐ নারী-রত্নকে সে সম্রাটের জন্য উপঢৌকন এনেছে।

সে কি তবে ঐ হিন্দু রমণীর সত্যকারের পরিচয়টা জানে না? না সেও প্রতারিত হয়েছে? ঐ ধূর্ত রমণী তার রূপ, যৌবন ও লাস্য দিয়ে মোল্লা মুরসিদকেও প্রতারণা করেছে। অথবা মোল্লা মুরসিদ সবই জানে—সব কথা তার গোপন করেছে—তাকে প্রতারণা করেছে। না—না, নিশ্চয়ই মোল্লা মুরসিদের এতদূর স্পর্ধা হবে না।

বাবুরের সংগে সে ছলনা করবার সাহস পাবে না। তাকে প্রতারণা করবার স্পর্ধা হবে না। কিন্তু তথাপি মনের মধ্যে কোথায় যেন একটা সন্দেহের বিষ-ধোঁয়া জমাট বাঁধতে থাকে। সন্দেহ জিনিসটা এমনি বটে, একবার মনের মধ্যে উদয় হলে ক্রমশঃ সমস্ত মনটাকেই কখন যেন নিঃশব্দে একেবারে গ্রাস করে বসে।

সম্পূর্ণভাবে বাবুর কয়েকবার মরিয়মের আপাদমস্তক তার তীক্ষ্ণ অনুসন্ধানী দৃষ্টি দিয়ে বুলিয়ে নেয়। ঐ সুন্দরী নারী—নিশ্চয়ই এক ধূর্ত গুপ্তচরী। হিন্দুস্থান আক্রমণের অভিলাষ তার দীর্ঘদিনের, বহুবার সে কথা সে ব্যক্তও করেছে বহুজনের কাছে, কে জানে হয়ত তারই সাম্রাজ্যের কোন গুপ্তচর-মুখে সে সংবাদ হিন্দুস্থানে গিয়ে পেঁীচেছে এবং সে যেমন মোল্লা মুরসিদকে হিন্দুস্থানে প্রেরণ করেছিল তেমনি সুলতান ইব্রাহিম লোদীও হয়ত ওদের এখানে প্রেরণ করেছে—

কয়েক বছর আগে সম্রাট একবার তার মন্ত্রণাদাতাদের অনুরোধে সুলতান ইব্রাহিম লোদীর কাছে প্রেরণ করেছিল মোল্লা মুরসিদকে দূত হিসাবে এক পত্র দিয়ে। পত্রে লেখা ছিল : প্রাচীনকাল থেকে যে দেশ বরাবর তুর্কীদের অধীনে ছিল তা আমার হাতে পুনরায় সমর্পণ করতে হবে। ঐ সঙ্গে দৌলত খাঁর কাছেও পৃথক পত্র প্রেরণ করেছিল বাবুর। দৌলত খাঁ সেবারে তার দূতকে লাহোরে আটক করে রেখেছিল কৌশলে এবং নিজেও তার সঙ্গে দেখা করে নি—তাকে সুলতানের কাছেও ঘেঁষতে দেয় নি—ফিরে এসেছিল সেবারে মোল্লা মুরসিদ ব্যর্থ হয়ে।

বাবুরের ইচ্ছা হয়েছিল—সঙ্গে সঙ্গে সে তার সমগ্র বাহিনী নিয়ে হিন্দুস্থান আক্রমণের জন্য অগ্রসর হবে, কিন্তু সম্ভব হয় নি তা। ঐ সময় এমন প্রচন্ড বর্ষণ শুরু হল যে সমস্ত সমতলভূমি জলে একেবারে ভেসে গেল। 'বোহার' ও পাহারের মধ্যখানে যেখানে তার শিবির ছিল তার কাছাকাছি একটা ছোট নালা ছিল, ঐ প্রচন্ড বর্ষণের ফলে সেই নদী হয়ে উঠল দেখতে দেখতে গর্জনমুখর—ভয়ঙ্করী, সেই সঙ্গে প্রচন্ড বাতাস এলোমেলো আর ধারা-বর্ষণ তো ছিল। কোনমতে প্রাণ নিয়ে বাবুর সেবারে কাবুলে ফিরে আসতে সক্ষম হয়েছিল।

তারপর দীর্ঘকাল হিন্দুস্থানের কথা আর ভাববার সময় পায় নি বাবুর। এ তার নতুন অভিযানের সূচনা। মোল্লা মুরসিদকে বাবুর তাই আবার হিন্দুস্থানে প্রেরণ করেছিল এবং এবারে কোন পত্র কারো কাছে নয়—হিন্দুস্থানে খাদ্যসম্ভার—রত্নসম্ভার ও সেই সঙ্গে তার সেনাবলটা গোপনে কৌশলে জেনে আসবার জন্য।

বাবুর রণবীরের দিকে এবারে তাকাল।

দুজনা দুজনার—ঐ মরিয়ম ও রণবীর শুধু পরিচিতই নয়, রীতিমত পরিচিত বলেই মনে হচ্ছে। এবং যে কোন কারণেই হোক মনে হচ্ছে ঐ যুবক যেন মরিয়মকে প্রচন্ড ঘৃণা করে। কিন্তু কেন ? কিসের এ ঘৃণা ?

কি নাম যেন তোমার বললে রাজপুত ? বাবুর রণবীরকে প্রশ্নটা করে তার দিকে তাকায় আবার।

রণবীর সিংহ।

রাজপুতানার কোন্ অংশে বাস তোমার ?

নাগোরে।

তুমি ঐ স্ত্রীলোকটিকে চেন ? মরিয়মের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে দেখায় সম্রাট।

চিনি।

ও তা হলে একজন রাজপুতানী ?

এককালে ছিল—

এককালে ছিল মানে ?

ও আজ ধর্মভ্রষ্টা—আজ আর ও রাজপুতানী নয়। দৌলত খাঁর পুত্র দিলওয়ার খাঁর অংকশায়িনী ও যে মুহূর্তে হয়েছে—ও আর রাজপুতানী নেই—ও আর হিন্দু নেই।

বাবুর এবারে মরিয়মের মুখের দিকে তাকাল।

মরিয়ম যেন এক প্রস্তরমূর্তির মত দাঁড়িয়ে আছে। নিবাত নিষ্কম্প।

মরিয়ম।

মালেক আলম ?

রণবীর যা বলছে তা সত্য ?

জাঁহাপনা—

তুমি সত্য সত্য তা হলে মুসলমানী নও—তুমি হিন্দুনারী—

না আলমপনা।

তবে—

আমি আজ আর হিন্দুনারী সত্যিই নই—যারা আজ আমায় আশ্রয় দিয়েছে তাদের ধর্মই আজ আমার ধর্ম—

পাপীয়সী ও মুখ তোর খসে যাবে—পোকা পড়বে। চীৎকার করে ওঠে রণবীর যেন উম্মাদের মতই।

খামোশ।

চাপা গর্জন করে ওঠে বাবুর, উদ্ধত যুবক—সম্রাটের সামনে ঔদ্ধত্য প্রকাশের শাস্তি নিশ্চয়ই তোমার অজানা নেই—

তারপরই কুবলাই খাঁর দিকে তাকিয়ে সম্রাট বলে, ওকে এখানকার বন্দীশালায় নিয়ে গিয়ে আপাতত শৃংখলিত করে রেখে দাও—কাল ওর বিচার হবে—আর তোমরাও যাও—

প্রহরীরা রণবীরকে নিয়ে কক্ষত্যাগ করল কুবলাই খাঁর ইঙ্গিতে তার সঙ্গে সঙ্গেই।

কক্ষে এখন কেবল বাবুর ও মরিয়ম।

মরিয়ম।

আলমপনা।

তুমি বলছিলে ঐ যুবক—রণবীর তোমার পরিচিত—

হ্যাঁ জাঁহাপনা।

শুধু পরিচিতই নয়—আমার অনুমান যদি মিথ্যা না হয় তো—মনে হচ্ছে ওকে তুমি পিয়ার করো—তোমাদের পরস্পরের মধ্যে মহব্বৎ আছে।

সম্রাট।

অস্বীকার করবার চেষ্টা করো না মরিয়ম, তোমার দু চোখের দৃষ্টিই বলছে

—তুমি ওকে ভালবাস। বল সত্য কিনা?

মরিয়ম আর কোন জবাব দেয় না। মাথা নীচু করে। দৃষ্টি ভূতলে নিবদ্ধ করে।

মরিয়ম।

জাঁহাপনা।

তোমার সত্য পরিচয়টা আমি জানতে চাই—মরিয়ম নিশ্চয়ই তোমার নাম নয়—কি নাম তোমার?

আজ আমার নাম মরিয়ম জাঁহাপনা, তবে—

বল, থামলে কেন?

একসময় যখন—যখন নাগোরে ছিলাম আমায় সবাই চন্দনবাঈ বলেই জানত।

চন্দনবাঈ।

হ্যাঁ।

বোধ করি সেই সময়ই রণবীরের সঙ্গে তোমার পরিচয়?

জাঁহাপনা—

বল মরিয়ম।

মৃতা চন্দনবাঈ একদিন ঐ রণবীর সিংহের বাগদত্তা বধূ ছিল—

বল কি।

হ্যাঁ, বিবাহের দিন পর্যন্ত আমাদের স্থির হয়ে গিয়েছিল, এমন সময়—

কি?

দৌলত খাঁ যখন নাগোর অধিকার করে তার অধিপতি সেই সময় এক রাত্রে—দৌলত খাঁর পুত্র দিলওয়ার খাঁ জোর করে তার সৈনাদের দ্বারা ঐ রণবীরের চোখের সামনে থেকে তার বাগদত্তা বধূ চন্দনবাঈকে অপহরণ করে নিয়ে গেল—

তার পর?

আপনার প্রশ্ন তো সম্রাট—তার পরও হিন্দু-রমণী—রাজপুতানী চন্দনবাঈ বেঁচে রইল কেন? কেন সে বিষ খেয়ে মরল না বা অগ্নিতে আত্মাহুতি দিল না সতী-সাধ্বী হিন্দু রমণীর মত—তাই নয় কি?

মরিয়ম—

না জাঁহাপনা—চন্দনবাঈ তথাপি আত্মাহুতি দেয় নি—বিষ খেয়েও মরে নি। তারপর যেন একটু হেসে বলে, বিষ খেয়ে মরলে বা আত্মাহুতি দিলে তো সবই শেষ হয়ে গেল। কিছুই তো আর বাকি রইল না। যারা তার এত বড় সর্বনাশ করল তারাই তো তখন হাসবে চন্দনবাঈয়ের মৃতদেহটার দিকে চেয়ে। সে কি চন্দনবাঈ হতে দিতে পারে? না।

দিলওয়ার খাঁই কি তবে—

জাঁহাপনা দিলওয়ার খাঁর দোষ কি—রণবীর যদি তার বাগদত্তা বধূর সম্মান না রাখতে পারে—তার জন্য রণবীরেরই লজ্জা হওয়া উচিত, মৃত্যু তারই বরণ করা উচিত। বলতে বলতে হঠাৎ যেন মরিয়মের কণ্ঠস্বরের পরিবর্তন হয়। তীক্ষ্ন

হয়ে ওঠে কণ্ঠস্বর। ওকে আমি আজ এত ঘৃণা করি যে পৃথিবীতে বোধ হয় কেউ ওকে অতখানি ঘৃণা করে না।

বাবুর ওর মুখের দিকেই তাকিয়েছিল। মৃদু হাসল।

গলার স্বরে তোমার ব্যঙ্গ ও ঘৃণা থাকলেও মরিয়ম—সেই সঙ্গে তোমার কান্নাও শুনতে পাচ্ছি যেন—

না, না জাঁহাপনা, মরিয়ম সেদিনও কাঁদেনি পরেও কাঁদবে না—

কিন্তু মরিয়ম, তুমি কাঁদছ। আর তোমার সেই কান্নাই আমাকে স্পষ্ট করে জানিয়ে দিচ্ছে, ঘৃণা তুমি করতে পার রণবীরকে, কিন্তু—

জাঁহাপনা—

কিন্তু তার চাইতেও ঢের বেশী ভালবাস আজো তাকে।

না, না জাঁহাপনা, আপনি বিশ্বাস করুন—তাকে আমি ঘৃণা করি—ঘৃণা করি—

বাবুর আবার হাসল। তার পর অদ্ভুত শান্তকণ্ঠে বললে, জানো মরিয়ম, এককালে আমি প্রচণ্ড সুরাপান করতাম—দিবারাত্র সর্বক্ষণ সুরাপান করতাম। শুধু কি সুরা—ভাংও খেতাম ঐ সঙ্গে। সুরা না হলে আমার এক মুহূর্তও চলত না। কিন্তু সেই সুরা আমি ত্যাগ করেছি—

জাঁহাপনা।

হ্যাঁ মরিয়ম, কিন্তু সুরার সে নেশা—সে আনন্দ আজও আমি ভুলতে পারি নি। যে ভালবাসা মহব্বতের কথা তুমি বললে সে ঠিক সুরার নেশার মতই—ওকে ভোলা যায় না। তোমার কোন অপরাধ নেই, মহব্বৎ এমনি করেই দেওয়ানি করে মানুষকে। যাক্ এবারে অন্য কতকগুলো কথার তুমি এখন আমার জবাব দাও।

কি কথা জাঁহাপনা ?

তোমার কথা শুনে বুঝতে পেরেছি দৌলত খাঁর পুত্র দিলওয়ার খাঁ—

সে শয়তানের নাম শুনতেও আমার ঘৃণা হয় জাঁহাপনা—

বাবুর আবার হাসল। শান্ত হাসি। দৌলত খাঁর দুই পুত্র শুনছি।

ঠিকই শুনেছেন সম্রাট—গাজী খাঁ ও দিলওয়ার খাঁ।

পিতা ও পুত্রের মধ্যে সদ্ভাব কেমন ?

তিনজনই সুবিধাবাদী সম্রাট এবং নিজ নিজ স্বার্থের জন্য একে অন্যকে অনায়াসেই বর্জন করতে পারে বলেই আমার মনে হয়—

হুঁ—তা তোমার সঙ্গে মোল্লা মুরসিদের কোথায় কেমন করে দেখা হল ?

মরিয়ম চুপ করে থাকে।

কি করে দেখা হলো ? পুনরায় প্রশ্ন করে বাবুর।

॥ ১৫ ॥

চণ্ডকে বীরেন্দ্রর ব্যাপারে নির্দেশ দেওয়া পর্যন্ত মহারাজ গাঙ্গের মনে যেন

এতটুকু শান্তি ছিল না। চণ্ডর প্রভুভক্তি সম্পর্কে তার যেমন এতটুকুও মনের মধ্যে কোন সন্দেহ ছিল না তেমনি গাঙ্গ এও জানত—বীরেন্দ্রকে ধরতে পারলে চণ্ড তাকে নিষ্কৃতি দেবে না। চণ্ড তার প্রভুর কাছ থেকে যে নির্দেশ পেয়েছে প্রাণ দিয়ে সে নির্দেশ সে পালন করবে এবং যতক্ষণ না সে সফল হয় সে ফিরবে না।

পার্বতী তার একমাত্র সহোদরা। কোলেপিঠে করে পার্বতীকে সে মানুষ করেছে—সেই পার্বতীর প্রতি আকস্মিক আক্রোশের বশে হঠাৎ এ সে কি করে বসল। অনুশোচনায় দগ্ধ হতে থাকে সর্বক্ষণ গাঙ্গ। তার মনের সমস্ত শান্তি যেন মুছে গিয়েছে। কিন্তু উপায়ও আর নেই—হাতের তীর নিক্ষিপ্ত হয়ে গিয়েছে—আর তাকে তূণে ফিরিয়ে আনবার কোন পথই দেখতে পায় না। প্রতি মুহূর্তের জন্যই যেন এক ভয়ঙ্কর সংবাদের জন্য ভীত—শঙ্কিত গাঙ্গ।

জাঁকজমকের সঙ্গে অভিষেক হয়ে গেল একদিন। সামন্ত রাজারা এসে একে একে ভেট দিয়ে মহারাজ গাঙ্গের দীর্ঘজীবন কামনা করে গেল।

কিন্তু গাঙ্গের মনে এতটুকু সুখ নেই—শান্তি নেই। তা ছাড়া আর এক দুশ্চিন্তা তাকে সর্বক্ষণ একটা দুঃস্বপ্নের মত তাড়া করে নিয়ে বেড়াচ্ছিল।

রাজ্যাভিষেকের দিন দুই পরেই মেওয়ারের রাণার দূত পার্বতীর সঙ্গে রাণার বিবাহ প্রার্থনা নিয়ে নারিকেল, গজ ও অশ্ব উপঢৌকন দিয়ে গিয়েছে—অনন্যোপায় গাঙ্গ সেই নারিকেল, গজ ও অশ্ব গ্রহণ করেছে।

বিবাহের দিন স্থির হবে শীঘ্রই। তবে রাণা সংগ্রাম সিংহ দূত মারফৎ জানিয়েছেন—বেশী বিলম্ব তিনি করতে চান না—শীঘ্রই দিন স্থির করে তিনি জানাবেন।

গাঙ্গ বলে দিয়েছে—রাণার ইচ্ছামতই কাজ হবে। হয়ত—দু-চার দিনের মধ্যেই পুনরায় মেওয়ার থেকে রাণা সংগ্রাম সিংহের দূত এসে উপস্থিত হবে বিবাহের শুভদিন স্থির করে।

তখন—তখন গাঙ্গ কি করবে? তাছাড়া এখনো পার্বতীর অনুপস্থিতিটা দুর্গপ্রাসাদে গোপন রয়েছে—সেটাই বা কতদিন আর গোপন থাকবে।

দুর্গপ্রাসাদে সবাই জেনেছে—পার্বতীর শরীর সুস্থ নয় তাই সে কিছুদিনের জন্য—তাদের মাতুলালয় মান্দোরে গিয়েছে সূর্য সিংহের ওখানে। শীঘ্রই ফিরে আসবে। কিন্তু ঐ মিথ্যাকেই বা সে কতদিন আর আঁকড়ে ধরে রাখতে পারবে? প্রকাশ হয়ে পড়বেই।

তখন? তখন কি করবে সে? সবচাইতে বড় কথা মেওয়ারের রাণা সংগ্রাম সিংহকে কি বলবে? তিনি যদি এই ইচ্ছাকৃত মিথ্যাচরণের জন্য ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠেন? তার মানেই মেওয়ারকে শত্রু করা।

সত্যিই মহারাজ গাঙ্গ ভেবে পায় না কি করবে। একদিকে প্রাণাধিক—আদরিণী—সহোদরার অমঙ্গল চিন্তা অন্য দিকে—মিথ্যাভাষণের কলঙ্ক—ও শত্রুবৃদ্ধি, বৈরী বৃদ্ধি।

মুহূর্তে যে কোথা থেকে কি হয়ে গেল। অশ্বপৃষ্ঠে বীরেন্দ্র ও পার্বতীকে দেখে অকস্মাৎ যেন ক্রোধে আত্মহারা হয়ে পড়েছিল গাঙ্গ। ও যে তার কল্পনারও অতীত ছিল। মহারাজ সুরজমলের পৌত্রী রাজকুমারী পার্বতী আর সামান্য বেতনভুক সৈনিক বীরেন্দ্র সিংহ। কোথায় পার্বতী আর কোথায় বীরেন্দ্র সিংহ ? পরিচয়ে আভিজাত্যে সর্ব দিক দিয়ে একজন অন্যজন থেকে কত দূরে। দুজনার মধ্যে কত ব্যবধান। কিন্তু আশ্চর্য হয়ে গিয়েছে গাঙ্গ। ব্যাপারটা কি করে ঘটলো ? কোন্ পথে কি ভাবে কখন উভয়ের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় হল। একজন রাজ-অন্তঃপুরচারিণী অন্যজন প্রাসাদ-দুর্গের বাইরে—সৈন্যনিবাসে স্থান। এ অঘটন—এই অত্যাশ্চর্য ব্যাপার ঘটলো কি করে। এবং ঘটেছে তাদের সকলের অজ্ঞাতে।

কিন্তু সত্যিই ভালবাসা কি অপরাধ ? হঠাৎই যেন কথাটা মনের মধ্যে উদয় হয় মহারাজ গাঙ্গের। ভালবাসা তো জাত মানে না—পরিচয় মানে না—আভিজাত্য মানে না—সংস্কার মানে না।

তবে কোথায় তাদের অপরাধ ? বীরেন্দ্র ও পার্বতীর অপরাধ কোথায় ? সঙ্গে সঙ্গে রাজার অভিমান মনের মধ্যে গর্জন করে ওঠে, না, না—এ হতে পারে না। এ অসম্ভব।

বীরেন্দ্র সিংহের স্পর্ধাকে মহারাজ গাঙ্গ ক্ষমা করতে পারে না। প্রাসাদ-অলিন্দে একাকী পায়চারি করছিল মহারাজ গাঙ্গ। রাত্রির মধ্যপ্রহর। রাত্রি নিষুতি। সমস্ত প্রাসাদ ঘুমের ঘোরে তলিয়ে গিয়েছে। অদ্ভুত একটা স্তব্ধতা যেন চারিদিকে থম্ থম্ করছে—কেবল মধ্যে মধ্যে সেই স্তব্ধতার মধ্যে শোনা যায় রাতপ্রহরীর পদচারণার মৃদু শব্দ।

অভিষেক হওয়ার পর—এবং তার সিংহাসনে বসবার পর গাঙ্গের জানা হয় নি প্রজাদের সত্যিকারের মনোভাবটা।

মহামাত্য জেৎ সিং বলছিল—দীর্ঘদিন পূর্বেকার সেই অসন্তোষের ধোঁয়াটা এখনো নাকি প্রজাকুলের মন থেকে একেবারে নিঃশেষ হয়ে যায় নি।

মহারাজ সুরজমল যেদিন তার জ্যেষ্ঠ পুত্রের মৃত্যুর পর তদীয় পুত্র গাঙ্গকে যুবরাজ বলে ঘোষণা করেছিলেন সেই দিন থেকেই ঐ অসন্তোষের সৃষ্টি। গাঙ্গ যে ব্যাপারটা জানত না তা নয়। সবই সে শুনেছিল।

সুরজমলের আর চার পুত্র ও তাদের ঔরসজাত এগারজন রাজকুমারই ঐ অসন্তোষের সৃষ্টির মূলে। এবং সেদিন তারা বিদ্রোহেরও চেষ্টা করেছিল। এমন কি মহারাজ সুরজমলকে হত্যা করবারও চেষ্টা করেছিল কিন্তু সফল হয় নি। লৌহকঠিন হাতে মহারাজ সুরজমল সেদিনকার বিদ্রোহ দমন করেছিলেন।

কিন্তু দমন করলেও সে আগুন একেবারে নিঃশেষ হয়ে নির্বাপিত হয়ে যায় নি। এবং বিশেষ করে স্বর্গত মহারাজের তৃতীয় পুত্র শাগ—যে বুরবো নামে একটি স্বতন্ত্র জনপদ প্রাপ্ত হয়েছিল পিতার উপরে আক্রোশটা যেন তারই সবচাইতে বেশী।

মহামাত্য জেৎ সিং বলছিল, মহারাজ ভয় আমার তাকেই সর্বাপেক্ষা বেশী। আমার দৃঢ় ধারণা আপনার তৃতীয় পিতৃব্য শাগ আবার একটা গোলমালের চেষ্টা

করবে।

আবার যদি চেষ্টা করে তো জেনো মহামাত্য এবারে তার উপযুক্ত শিক্ষাই মিলবে।—গাঙ্গ বলে।

শুধু ঐ ভয়ই নয় মহারাজ। নাগোরের দৌলত খাঁকেও আমি বিশ্বাস করি না।

দৌলত খাঁ! হ্যাঁ—দৌলত খাঁ লোদি বংশেরই একজন। কিন্তু দৌলত খাঁ আমাদের কি করতে পারে মহামাত্য?

দিল্লীশ্বর আজ দুর্বল—চারিদিকে তার শত্রু—এই সময় যদি আবার কোন বহিঃশত্রুর আগমন ঘটে তো ভারতের মানচিত্র বদলে যাবে।

না, না—এ আপনার অমূলক আশঙ্কা মহামাত্য!

অমূলক নয়। রাজজ্যোতিষী কর্ণদেব আপনার পিতামহকে কি বলেছিলেন গণনা করে শোনেন নি?

না তো—কি—কি বলেছিলেন!

মহারাজের জন্মপত্রিকা বিচার করে বলেছিলেন, শুধু মহারাজের জন্মপত্রিকাতেই নয়—সমস্ত মরুস্থলী—কেবলমাত্র মরুস্থলী কেন, সমগ্র ভারতের ভাগ্যাকাশেই অমঙ্গলের কালো ছায়া ঘনিয়ে আসছে। সূর্য মেঘ রাশিতে প্রবেশ করেছে।

এ কথা—এ কথা আপনি কার কাছে শুনলেন?

মহারাজই বলেছিলেন আমায়। তার পর একটু থেমে বলেন, রাজজ্যোতিষী আরো একটা কথা সেদিন বলেছিলেন মহারাজ।

কি?

তুর্কীরা কয়েকবার এদেশে হানা দিয়ে প্রচুর ধনরত্ন লুণ্ঠন করে নিয়ে গিয়ে তাদের লোভ বেড়ে গিয়েছে—তারা আবার সুনিশ্চিত হানা দেবে ভারতভূমিতে—আর এবারে হানা দিলে কেবলমাত্র অন্যান্যবারের মত হাতের কাছে যা ধনরত্ন পাবে তাই লুণ্ঠন করেই সন্তুষ্ট হয়ে যাবে না বলেই তাঁর ধারণা মহারাজ।

কোথায় দিল্লী আর কোথায় মাড়বার—

না মহারাজ—সবই একই মহাদেশের ভিন্ন ভিন্ন অংশ—এক অংশে টান পড়লে অন্য অংশেও টান পড়বে। তাছাড়া—

বলুন মহামাত্য, থামলেন কেন? কি বলতে চান? গাঙ্গ মহামাত্যর মুখের দিকে তাকিয়ে ছিল।

গৃহশত্রুরা এ সুযোগ নেবে—

বিশেষ করে আপনার জ্ঞাতি-শত্রুদেরই আমার বিশেষ ভয় মহারাজ।

সেজন্য আমিও প্রস্তুত মহামাত্য। কিন্তু মহামাত্যকে সেদিন ঐ কথাটা জোর গলায় বললেও গাঙ্গের মনের মধ্যে একটা কিন্তু দেখা দিয়েছিল। যারা আজ তার বন্ধু বলে পাশে দাঁড়িয়ে আছে—তাদের উপরেও যেন কেন একটা সন্দেহ দেখা দিয়েছে। আজ কদিন থেকেই তাই মধ্যরাত্রে গাঙ্গ ছদ্মবেশে নগর পরিভ্রমণে বের হচ্ছে। ঘুরে ঘুরে সর্বত্র কান পেতে শোনবার চেষ্টা করে।

কালো একটা আংরাখায় সর্বাঙ্গ মুড়ে আজও বের হয়ে এলো গাঙ্গ প্রাসাদ-দুর্গ থেকে নিঃশব্দে গোপন সুড়ঙ্গপথে। দুর্গের বাইরে করম সিং গাঙ্গের বিশ্বস্ত অনুচর সুসজ্জিত একটি অশ্ব নিয়ে নীরবে অপেক্ষা করছিল। মহারাজকে দেখতে পেয়ে সে অভিবাদন জানায়।

করম সিং?

মহারাজ!

চন্ডর কোন সংবাদ পেয়েছো?

না মহারাজ।

গাঙ্গ আর কিছু বলল না—অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করে ধীরে ধীরে ঢালু পথ বেয়ে নীচে নামতে লাগল।

রত্না যোধপুরের প্রান্তসীমায় এসে অশ্বটি ছেড়ে দিয়েছিল। শিক্ষিত অশ্ব সে, বুরবোর দিকে চলে গিয়েছে। আজ দুদিন হল পুরুষের ছদ্মবেশে রত্না নগরের সর্বত্র ঘুরে বেড়াচ্ছে। মহারাজের সঙ্গে সাক্ষাৎ হওয়া তার একান্ত প্রয়োজন। কিন্তু তা যে কেমন করে সম্ভব হতে পারে সেটাই যেন কোন মতে ভেবে পাচ্ছিল না। এমনি অবিশ্যি সোজাসুজি গিয়ে মহারাজের সাক্ষাৎ-প্রার্থিনী সে হতে পারত, কিন্তু তা রত্না চায় না।

সে যেমন করেই হোক গোপনে একটিবার মহারাজের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চায়। গাঙ্গ হয়ত আজ তাকে ভুলে গিয়েছে। কয়েকটা দিনের ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের স্মৃতি হয়ত তার মনের কোথাও সামান্যতম অবশিষ্ট নেই। আর থাকবেই বা কেন? কি পরিচয় রত্নার? এক নর্তকী মায়ের কন্যা—আজ সে নর্তকী। অতি সাধারণ এক রূপজীবিনী। নগণ্যা।

আর মহারাজ গাঙ্গ? রাঠোর কুলচূড়ামণি—যোধপুরের অধীশ্বর—ভাগ্য-বিধাতা। কোথায় স্বর্গ আর কোথায় মর্ত্য। দুস্তর ব্যবধান। অলঙ্ঘনীয় ব্যবধান।

ঘুরে বেড়াচ্ছিল অনির্দিষ্টভাবে রত্না এবং ঘুরতে ঘুরতে একসময় দুর্গ-প্রাসাদের সামনে পর্বত-সানুদেশে উপস্থিত হয়।

অন্ধকার রাত্রি। উপরের দিকে সতৃষ্ণ নয়নে তাকাল রত্না। প্রাসাদের কোন এক কক্ষে বোধ করি আলো জ্বলছে—তারই আভাস পাওয়া যায় গবাক্ষ-পথে। চতুর্দিকে সতর্ক প্রহরী। তাদের সতর্ক দৃষ্টি এড়িয়ে প্রাসাদ-দুর্গে একটি মক্ষিকারও বুঝি প্রবেশ দুঃসাধ্য। হঠাৎ কানে এলো রত্নার খট্ খট্ একটা ধাতব শব্দ। দুর্গাপ্রাসাদের ঢালু পথ বেয়ে শব্দটা ক্রমশঃ নীচের দিকে নেমে আসছে মনে হল।

একপাশে বিরাট একটা বৃক্ষ। তারই নীচে সরে দাঁড়াল রত্না আত্মগোপন করে। শব্দটা ক্রমশঃ স্পষ্ট হতে স্পষ্টতর হচ্ছে—বুঝতে পারে রত্না—ঘোড়ার পায়ের শব্দ। হুঁ—তার অনুমান মিথ্যা নয়। একজন অশ্বারোহীই নিঃশব্দে নীচের দিকে নেমে আসছে।

নগরাভিমুখে যাবার রাস্তাটা ঐ বৃক্ষের পাশ ঘেঁষে। কি করবে রত্না বুঝতে পারে না। যদি অশ্বারোহী তাকে দেখতে পায় ? এখান থেকে সরে পড়বে তারও আর এখন উপায় নেই। অশ্বারোহীর নজরে সে পড়বেই—রত্না আরো একটু পিছু হটে যায়। আর ঠিক সেই মুহূর্তে রত্না দেখতে পেল, ঝাপ্‌সা ঝাপ্‌সা অন্ধকারে অশ্বারোহী অশ্বের বল্গা আকর্ষণ করে অশ্বের গতিরোধ করল।

রত্নার বুকের ভিতরে ঢিপ্‌ ঢিপ্‌ করতে থাকে। তাকে দেখতে পায়নি তো অশ্বারোহী ? যদি দেখতে পেয়ে থাকে ?

কে—কে ওখানে ? পুরুষ-কণ্ঠে প্রশ্ন এলো।

রত্না যেন একেবারে পাথর।

অশ্বারোহী আবার প্রশ্ন করে, কে ? কে ওখানে ?

তবু সাড়া দেয় না রত্না।

অশ্বারোহী অশ্বপৃষ্ঠ হতে অবতরণ করল ভূমিতে—দু-পা বৃক্ষের দিকে এগিয়ে এলো, কে—কে ওখানে ?

রত্না চুপ।

সাড়া দিচ্ছ না কেন ? অশ্বারোহী আর কেউ নয় স্বয়ং মহারাজ গাঙ্গ।

কে ?

আরো নিকটে ততক্ষণে এগিয়ে এসেছে গাঙ্গ।

কে ?

রত্নার বুকের ভিতরটা কাঁপছে। থরথর করে কাঁপছে।

কে তুমি ?

॥ ১৬ ॥

শাগ পুনরায় ফিরে এলো তার প্রমোদ-কক্ষে।

নর্তকী রত্না চলে গেল, এবং সে যে যোধপুরের দিকেই গিয়েছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকে না শাগের। নাগোরের দৌলত খাঁর সঙ্গে সে হাত মিলাতে চলেছে, রত্না নিশ্চয়ই সেই সংবাদটা গাঙ্গকে দিতে চলে গেল পুরস্কারের লোভে।

যাক সে। ক্ষতি নেই।

গাঙ্গ যতই ক্ষমতাশালী হোক তার ক্ষমতা নেই শাগ ও দৌলত খাঁর মিলিত শক্তির বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারে। তাকে ধ্বংস হতেই হবে।

কিন্তু তা হলেও তাকে সাবধান হতে হবে।

দৌলত খাঁকে যে পত্র সে প্রেরণ করেছে তার জবাব পাওয়ার পর শাগ স্থির করবে কি ভাবে কোন্‌ পথে আক্রমণ চালাতে হবে।

রাত্রি প্রায় শেষ হয়ে এলো। শাগ তার শয়নকক্ষের দিকে অগ্রসর হলো। দৌলত খাঁ তারও শত্রু। তাদের সবাইকারই শত্রু। সেই শত্রুর সে সাহায্য নেবে স্থির করেছে, কেবল কণ্টক দিয়ে কণ্টক উদ্ধারের জন্য। অন্য কোন উদ্দেশ্য নেই। কার্য-সিদ্ধি হবার পর যখন দৌলত খাঁর ব্যবস্থা করতে শাগ যা করবার তা সে করবে।

মহিষী পদ্মাবতী জেগেই ছিল। শয়নকক্ষে স্বামীকে প্রবেশ করতে দেখে মুখ তুলে তাকাল পদ্মাবতী। একটু বিস্মিতই হয় সে। অন্যান্য দিন যখন স্বামী শয়ন মন্দিরে প্রত্যাবর্তন করে তখন তার দাঁড়াবারও ক্ষমতা থাকে না। নেশায় টলে। কিন্তু আজ সে রকম কিছুই যেন তার দৃষ্টিতে পড়ে না। সহজ—স্বাভাবিক।

চিন্তিতও হয় মহিষী। স্বামীর মুখের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করে, তোমার শরীর কি সুস্থ নয়?

শাগ স্ত্রীর মুখের দিকে তাকাল, কেন?

নচেৎ কিছু হয়েছে নিশ্চয়ই।

কি হবে?

জানি না—তবে মনে হচ্ছে তোমাকে যেন বেশ চিন্তিত—

চিন্তিত? না তা নয়—তবে—

তবে—

একটা সুখবর এসেছে—

সুখবর।

হ্যাঁ—পিতৃদেব যবনের হাতে নিহত হয়েছেন—

সে কি?

হ্যাঁ—আর গাঙ্গ হয়ত এবার সিংহাসনে বসবে।

সেই রকম ব্যবস্থাই তো আছে শুনেছিলাম।

কিন্তু সে ব্যবস্থা আমি উল্টে দেবো।

উল্টে দেবে।

হ্যাঁ। পিতার এ কেবল অন্যায়ই নয়, জুলুম। আমরা জীবিত থাকতে গাঙ্গ কোন্ অধিকারে সিংহাসনে বসে—

মহারাজই যখন তাকে তার উত্তরাধিকারী নিজে নির্বাচিত করে গিয়েছেন—

তিনি যদি একটা ভুল করে থাকেন সেটাই আমাদের মেনে নিতে হবে এমন এমন কোন যুক্তি নেই।

কিন্তু—

এর মধ্যে কোন কিন্তু নেই মহিষী। এ অন্যায় আর যেই নীরবে সহ্য করুক আমি করবো না।

কি করবে, যুদ্ধ?

প্রয়োজন হলে করবো।

কিন্তু সামন্ত-সর্দাররা—

অসিমুখে রণস্থলেই তার মীমাংসা হবে।

কিন্তু আমি বলছিলাম কি প্রয়োজন তার?

মানে?—কি বলতে চাও তুমি মহিষী?

গাঙ্গ—সে তো তোমারই ভ্রাতুষ্পুত্র—তোমারই একান্ত প্রিয়জন।

প্রিয়জনই বটে। এ রাজনীতি তুমি বুঝবে না মহিষী। এ সবের মধ্যে মাথা

গলাতে এসো না।

গাঙ্গের পক্ষে সমস্ত সামন্ত সর্দাররা দাঁড়াবে নিশ্চয়ই—তথাপি মহিষী বলে।

দাঁড়াবে জানি। আমিও তার পাল্টা ব্যবস্থা অবলম্বন করব।

পাল্টা ব্যবস্থা?

নাগোরে দৌলত খাঁর নিকট পত্র প্রেরণ করেছি—

বল কি—যবন তোমাদের চিরশত্রু।

প্রয়োজন হলে শত্রুর সঙ্গেও হাত মেলাতে হয়।

মহিষী আর কোন কথা বলে না। কিন্তু তার মনটা ভারী হয়ে ওঠে। স্বামীর জিদের সঙ্গে তার পরিচয় আছে। তাই স্বামীকে আর বেশী ঘাটায় না। কক্ষান্তরে চলে যায়।

পরদিবস সন্ধ্যার দিকে রায়মল এসে হাজির হলো। এবং কক্ষে প্রবেশ করে শাগকে অভিনন্দন জানাতেই বিস্মিত শাগ প্রশ্ন করে, এ কি, তুমি এত শীঘ্র ফিরে এলে রায়মল?

হ্যাঁ মহারাজ, ফিরে এলাম।

অভিষেকের দিনক্ষণ স্থির হয়ে গেছে—সংবাদ পেয়েছো নাকি?

না মহারাজ—সে সংবাদ আমি সংগ্রহ করতে পারি নি।

সেকি, তোমাকে আমি সেই সংবাদ সংগ্রহ করে আনতেই তো পাঠিয়েছিলাম।

জানি মহারাজ, কিন্তু তার চাইতে বড় সংবাদ একটি আমি সংগ্রহ করে এনেছি—

কি সে সংবাদ?

সে সংবাদ হচ্ছে—স্বর্গীয় মহারাজের প্রধান দেহরক্ষী বীরেন্দ্র সিংহ ও গাঙ্গের একমাত্র সহোদরা পার্বতী।

কি বলছো তুমি রায়মল? তোমার কথা তো আমি কিছুই বুঝে উঠতে পারছি না।

মহারাজ—পার্বতীকে গাঙ্গ তার রাজ্য থেকে বহিষ্কৃত করে দিয়েছে।

সেকি!

হ্যাঁ মহারাজ—সেই সঙ্গে বীরেন্দ্র সিংহকে—

আমাকে সব খুলে বল রায়মল?

বীরেন্দ্র ও পার্বতী তারা পরস্পরকে ভালবাসে—

কি বললে?

হ্যাঁ।

এত স্পর্ধা সামান্য এক সৈনিকের, সে রাজকুমারীকে—

শুনুন মহারাজ। ওসব কথা এখন চিন্তা করবেন না। বীরেন্দ্র সত্যিকারের একজন ক্ষমতাশালী সৈনিক। আমি তার অসি-নৈপুণ্যে মুগ্ধ। সে তো কেবল স্বর্গীয় মহারাজের প্রধান দেহরক্ষীই ছিল না—মহারাজ সুরজমলের অশেষ প্রিয় ও বিশ্বাসের পাত্র ছিল, তাকে হারানো মানে গাঙ্গের পক্ষে অনেক কিছু হারানো—

কিন্তু রায়মল—

আর পার্বতী—আপনি তো জানেন কত প্রিয় ছিল তার ঐ একমাত্র মাতৃহীনা সহোদরা বোনটি—আক্রোশের বশে গাঙ্গ হয়ত পার্বতীকে দূর করে দিয়েছে, কিন্তু কোন দিন কি সে ভুলতে পারবে ঐ প্রিয় বোনটিকে ?

সে অবিশ্যি সত্য—

ঐ পার্বতী আর বীরেন্দ্র যদি আপনার হাতের মুঠোর মধ্যে থাকে, গাঙ্গর সঙ্গে সংগ্রামে আপনার অনেকখানি সহায় হবে—

মন্দ বল নি তুমি কথাটা রায়মল।

তারা যোধপুর ছেড়ে চলে যাচ্ছিল—

কোথায় ?

তা জানি না—তবে তাদের আমি নিয়ে এসেছি।

কোথায় ? কোথায় নিয়ে এসেছো ?

এখানে। আপনার এখানে —

সত্যি বলছো রায়মল।

হ্যাঁ। বাইরে তারা অপেক্ষা করছে।

যাও। যাও শীঘ্র তাদের নিয়ে এসো।

রায়মল চলে গেল বাইরে এবং কিছুক্ষণ পরেই শ্রান্ত-ক্লান্ত পার্বতী ও বীরেন্দ্র সিংহকে নিয়ে কক্ষমধ্যে এসে প্রবেশ করল।

পার্বতী ইতিপূর্বে নামই শুনেছিল শাগের—তাকে কখনো চাক্ষুষ দেখে নি।

রায়মলই পরিচয় করিয়ে দেয়, রাজকুমারী, আপনার চাচাজী—

পার্বতী প্রণাম করে।

থাক মা—থাক।—ওরে কে আছিস, অন্তঃপুর থেকে একজন দাসীকে ডেকে পাঠাত—তারপর পার্বতীর দিকে তাকিয়ে বলে—বসো মা—বসো—তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে তুমি অত্যন্ত ক্লান্ত—

পার্বতী সত্যিই আর দাঁড়াতে পারছিল না। সে একটা আসনের উপরে বসে পড়ে।

বীরেন্দ্র তুমিও বসো—তোমার পরিচয়ও রায়মল আমাকে দিয়েছে—

বীরেন্দ্র কিন্তু বসে না। যেমন সে দাঁড়িয়েছিল তেমনিই দাঁড়ায়ে থাকে। কেন যেন কক্ষে প্রবেশ করে প্রথম দৃষ্টিতেই শাগকে তার ভাল লাগে নি। একটা অজ্ঞাত ভয়ে বুকের ভিতরটা যেন তার ধ্বক করে উঠেছে।

তুমি আমার পিতৃদেবের কাছে যে সম্মান ও মর্যাদা পেয়ে এসেছো এত দিন, শাগ পুনরায় বলে, সেই সম্মান ও মর্যাদা এখানে আমার কাছে তুমি পাবে। আজ থেকে তুমি আমার প্রধান দেহরক্ষী হলে—

মহারাজ। কি যেন বলবার চেষ্টা করে বীরেন্দ্র।

কিন্তু তাকে থামিয়ে দেয় শাগ, আর যে অপমান তোমাকে গাংগ করেছে—

না—না—মহারাজ—প্রতিশোধ আমি চাই না। আমি জানি একদিন তিনি তাঁর ভুল বুঝতে পারবেন। মানুষ হয়ে মানুষের প্রাপ্য সম্মান তাঁকেও দিতে

হবে—

শাগ প্রত্যুত্তরে কিছু বলতে যাচ্ছিল কিন্তু তার আর বলা হলো না অন্তঃপুরের দাসী এসে কক্ষে প্রবেশ করে শাগকে অভিনন্দন জানাল।

দাসী—

মহারাজ—

এ আমার আদরিণী ভ্রাতুষ্পুত্রী পার্বতী—একে মহিষী চন্দ্রাবতীর কাছে নিয়ে যা। মহিষীকে বলবি আজ হতে এ এই প্রাসাদেই থাকবে—এর সমস্ত ব্যবস্থা যেন তিনি করে দেন।

যে আজ্ঞে—

যাও মা—ওর সংগে অন্তঃপুরে যাও।

পার্বতী বীরেন্দ্রর দিকে তাকাল।

যাও মা—

মহারাজ। বীরেন্দ্র এবারে কথা বলে।

কিছু বলবে বীরেন্দ্র ?

হ্যাঁ মহারাজ। পার্বতী আমার বাগ্‌দত্তা বধূ—

চোখ দুটো মুহূর্তের জন্য শাগের যেন জ্বলে উঠেছিল কিন্তু পরক্ষণেই নিভে যায়। সে বলে, জানি—

আগামী পূর্ণিমাতে আমরা বিবাহ করব স্থির করেছি—

বেশ তো, বেশ তো, সে ব্যবস্থা আমিই করব—তুমি যাও মা—

পার্বতী দাসীর সংগে অন্তঃপুরে চলে গেল। তার পদশব্দ অলিন্দে মিলিয়ে যাবার পর শাগ বীরেন্দ্রর দিকে ফিরে তাকাল, বীরেন্দ্র—

বলুন—

তুমিও অত্যন্ত পরিশ্রান্ত। আপাততঃ তোমার বিশ্রামের দরকার। রায়মল তোমাকে সৈন্যাবাসে নিয়ে যাবে। তুমি বিশ্রাম নাও, তারপর তোমার সংগে আমার অনেক পরামর্শ আছে।

পরামর্শ ?

হ্যাঁ—

কিন্তু আমি স্থির করেছি আর সৈন্যবিভাগে থাকব না—কারো অধীনে—

সে কি। কেন ? এত বড় যোদ্ধা তুমি ?

না মহারাজ, যশোল্মীরে আমরা চলে যাবো—মরুভূমিতে আমরা কুটীর বেঁধে থাকব—

পাগল। আচ্ছা—আচ্ছা সে হবে খন, এখন তো তুমি বিশ্রাম নাও গে—যাও রায়মল, ওকে নিয়ে যাও—

চলুন—

রায়মলের সংগে বীরেন্দ্র কক্ষ হতে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেল।

শাগ মনে মনে বলে, এইবার—এইবার গাঙ্গা তোমায় দেখবো আমি। তোমার মৃত্যুবাণ আমি এতদিনে আমার হাতের মুঠোর মধ্যে পেয়েছি।

কেবলমাত্র স্বর্গীয় মহারাজ স্বরূজমলের তৃতীয় পুত্র শাগই নয়, মহারাজের আকস্মিক মৃত্যু সংবাদে তাঁর অন্যান্য তিন পুত্রও উল্লাসিত হয়ে উঠেছিল।

মাড়বার ও মেবারের কিছু ভূসম্পত্তি পিতার কাছ থেকে পেয়ে দ্বিতীয় পুত্র উদো রায়পুরে বসবাস করছিল। সেও তলে তলে শাগের মতই গাঙ্গাকে সিংহাসনচ্যুত করবার যত মতলব করে। পঞ্চম ও কনিষ্ঠ পুত্র বিরাম দেবও সেই ভ্রাতৃবিরোধী ষড়যন্ত্র থেকে বাদ যায় না।

কিন্তু বিরামের পুত্র নরু তার পিতাকে বলে, এভাবে গৃহবিবাদে লিপ্ত হবেন না পিতা—

বল কি—এত বড় সুযোগ!

এতে করে আপনারাই দুর্বল হয়ে পড়বেন পিতা—আর—

বল থামলে কেন? বিরাম দেব পুত্র নরুর মুখের দিকে তাকায়।

শত্রু শক্তিশালী হয়ে উঠবে—

কি বলছো তুমি!

ঠিকই বলছি পিতা। আপনারা প্রত্যেকেই আজ মাড়াবারের সিংহাসনের জন্য লালায়িত—এই যুদ্ধে জানবেন মাড়াবারে প্রচণ্ড এক অন্তর্বিপ্লব দেখা দেবে। আর সেই অন্তর্বিপ্লব বলুন বা বিদ্রোহ বলুন, তাতে করে আপনারাই পরস্পরের সঙ্গে যুদ্ধ করে প্রত্যেকে দুর্বল হয়ে পড়বেন—আর যবন সেই সুবিধা হেলায় নষ্ট হতে দেবে না।

তাই বলে এত বড় অন্যায়!

আপনারাও প্রত্যেকেই নিজ নিজ রাজ্যে—ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত—

কিন্তু মাড়বারের সিংহাসনে আমাদের যে অধিকার আছে—

সে অধিকার সাব্যস্ত করতে আপনারাই যদি শেষ হয়ে যান?

না, না—দেখ না তুমি—কি কৌশলে আমি সিংহাসন অধিকার করি।

রাজ্যাভিষেকের মাসখানেক পরেই গাঙ্গা চরমুখে সংবাদ পেল তার খুল্লতাতেরা তাকে সিংহাসনচ্যুত করবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। । সকলেই বিরাট বাহিনী নিয়ে যোধপুর আক্রমণের জন্য যোধপুরের দিকে এগিয়ে আসছে—

আর ওদিকে যবন দৌলত খাঁ তার খুল্লতাত শাগের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে।

গাঙ্গা সামন্ত সর্দারদের ডেকে পাঠালো মন্ত্রণা-কক্ষে।

সেই সময় বুরবোতে শাগের প্রাসাদে—আজ প্রায় দুই মাস হয়ে গেল বীরেন্দ্র এখানে এসে আশ্রয়ে নিয়েছে এবং সেই যে সেদিন পার্বতী অন্তঃপুরে গিয়ে প্রবেশ করেছে তারপর আর তার সঙ্গে বীরেন্দ্রর সাক্ষাৎ হয় নি।

বীরেন্দ্র বার বার পার্বতীর সঙ্গে দেখা করতে চেয়েও দেখা পায় নি তার। শাগ বলেছে, পার্বতী অসুস্থ। কিন্তু সেদিন মরীয়া হয়ে বীরেন্দ্র শাগের সামনে এসে দাঁড়ায়।

মহারাজ—

কি সংবাদ বীরেন্দ্র ?

পার্বতীর সঙ্গে একবার আমি সাক্ষাৎ করতে চাই—

আমি তো তোমাকে বলেছি বীরেন্দ্র সে অত্যন্ত অসুস্থ—বৈদ্য বলেছে—

যাই বৈদ্য বলুন আমি তার সঙ্গে দেখা করতে চাই।

কিন্তু তা কি করে সম্ভব ?

পার্বতী আমার বাগদত্তা স্ত্রী আপনি জানেন।

কে বললে ?

মহারাজ—

হ্যাঁ—ভুলে যেও না কে পার্বতী—আর কে তুমি—

মুহূর্তমধ্যে বীরেন্দ্র তার কোষ হতে অসি টেনে বের করে, বুরবো-অধিপতি শাগ—

প্রহরী, এই দুর্বিনীতকে বন্দী করো—শৃঙ্খলিত করো।

প্রহরী এগিয়ে আসে। বীরেন্দ্র চিৎকার করে ওঠে, সাবধান।

॥ ১৭ ॥

একেবারে অতি নিকটে তখন এগিয়ে এসেছে মহারাজ গাঙ্গ রম্ভার। রম্ভা যেন গাঙ্গের শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দও শুনতে পায়। দীর্ঘদিন পরে হলেও রম্ভার গাঙ্গের কণ্ঠস্বর চিনতে কষ্ট হয় নি।

কষ্ট হবে কি করে ? সে কণ্ঠস্বর কি রম্ভা আজো ভুলতে পেরেছে না জীবনে কোন দিন সে ভুলতে পারবে ? সেই কণ্ঠস্বর চিনতে পারার সঙ্গে সঙ্গেই রম্ভা যেন একেবার পাথর হয়ে গিয়েছিল।

মহারাজ গাঙ্গ। মহারাজকে সে চেনে না—চেনে সে তার যৌবনের প্রিয়তমকে—রাজকুমার গাঙ্গকে—যে তরুণ রাজকুমার একদিন তার সমস্ত হৃদয়কে জয় করে নিয়েছিল, যে তার হৃদয়ে প্রথম ভালবাসার স্বাদ দিয়েছিল, যার ছবি আজো তার সমস্ত হৃদয় জুড়ে বিরাজ করছে।

কে—কথা বলছো না কেন ?

রম্ভা তথাপি নীরব।

কে তুমি, বল ? শোন আমার প্রশ্নের জবাব যদি না দাও তো তোমাকে আমি বন্দী করে সঙ্গে নিয়ে যাবো।

তথাপি নিরুত্তর থাকে রম্ভা। ভয়ে—লজ্জায় সে তখন পাথর হয়ে গিয়েছে। বুকটা শুকিয়ে গেছে।

তাহলে তুমি আমার প্রশ্নের জবাব দেবে না ?

নীরব রম্ভা।

এসো তবে আমার সঙ্গে—শোন যদি পালাবার বিন্দুমাত্রও চেষ্টা কর আমার তরবারি দিয়ে তোমাকে আমি সঙ্গে সঙ্গে দ্বিখণ্ডিত করে ফেলব—চল—আমার আগে আগে চল—চল—

মহারাজ গাঙ্গ হেঁটে হেঁটে এগিয়ে চলে। অশ্ব তার পিছনে পিছনে আসে।

রম্ভা গাঙ্গের আগে আগে নিঃশব্দে চলতে শুরু করে। রম্ভাও মনে মনে তাই চেয়েছিল। সে তো মহারাজ গাঙ্গের দর্শন কেমন করে কি ভাবে পাবে সেই চিন্তায় ছট্ফট করছিল। কেমন করে সে প্রাসাদে প্রবেশ করবে। আর প্রবেশ করলেই তো হবে না—মহারাজ গঙ্গের দর্শন পাওয়া তো এত সহজ নয়।

কে সে—কি তার পরিচয় ? এক নর্তকী-কন্যা—নর্তকী সে। বহুলভ্যা।

ভগবান তার মনের ব্যাকুল প্রার্থনা বোধ করি শুনেছিলেন তাই গাঙ্গের সামনেই তাকে এনে একবারে দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন।

কিন্তু গাঙ্গ যদি তাকে চিনতে পারে ? চিনতে পেরে নর্তকী বলে যদি আজ ঘৃণায় মুখ ঘুরিয়ে নেয় ? কিন্তু এখন আর ফিরবারও পথ নেই।

তাছাড়া যেজন্য সে এই দীর্ঘপথ ছুটে এসেছে সে কথা না বলেই ফিরে যাবে ? নিক ফিরিয়ে মুখ ঘৃণায়—তবু একবার সে চেষ্টা করবে। একবার অন্তত সে বলবার চেষ্টা করবে।

আগে আগে চলেছে বন্দী আর পিছনে পিছনে চলেছে মহারাজ গাঙ্গ।

গাঙ্গও সত্যি সত্যি একটু যেন বিস্মিতই হয়েছিল। লোকটা বোবা নয়ত ? কিছুতেই কোন কথার জবাব দিল না কেন ? না ইচ্ছা করেই বোবা সেজে রয়েছে ?

নগর পরিদর্শনে আর যাওয়া হলো না গাঙ্গের—তা নাই হোক—কাল না হয় যাওয়া যাবে, কিন্তু এ লোকটা কে।

নিঃশব্দে তার নির্দেশ মেনে আগে আগে চলেছে।

লোকটা মাড়বারেরই কেউ, না কোন বহির্শত্রু—কোন গুপ্তচর ? তার সিংহাসনে আরোহণের ব্যাপার নিয়ে তার শত্রুতাতরা যে কেউই সন্তুষ্ট হয় নি—কিছু কিছু সে সংবাদ গাঙ্গের কানে এসেছে ইতিমধ্যেই।

কিন্তু গাঙ্গ সেজন্য ভীত নয় এতটুকু। মোকাবিলা করবার মত বাহুতে শক্তি রাখে গাঙ্গ।

প্রাসাদ-দুর্গে এসে গাঙ্গ প্রবেশ করল বন্দীকে নিয়ে। সোজা উপরদিকে পাথরে বাঁধানো পথ উঠে গিয়েছে। আগে আগে বন্দী ও পশ্চাতে নির্দেশ দিতে দিতে এগিয়ে চলে গাঙ্গ।

মন্ত্রণাকক্ষের সংলগ্ন আর একটি নাতিপ্রশস্ত কক্ষ। সেই কক্ষের মধ্যেই এসে বন্দীকে নিয়ে প্রবেশ করল গাঙ্গ।

কক্ষে আলো জ্বলছিল। সেই আলোয় গাঙ্গ এতক্ষণে বন্দীর দিকে তাকাল।

এক তরুণ। কি কোমল মুখখানা—ঠিক যেন কোন নারীর মুখ। টানা-টানা দুটি চক্ষু—বন্দীও চেয়ে আছে নিষ্পলক গাঙ্গের মুখের দিকে।

তার অনুমান মিথ্যা নয়। মহারাজ গাঙ্গ।

কণ্ঠস্বর থেকেই মহারাজকে চিনতে রম্ভা ভুল করেনি। প্রিয়তম—তার প্রিয়তম—

কে তুমি—যুবক কি নাম তোমার বল—কোথা থেকে আসছো ?

এতক্ষণে কথা বলে রত্না, মহারাজ—আমি পুরুষ নই, নারী।

নারী!

হ্যাঁ মহারাজ। বলতে বলতে মাথার পাগড়িটা রত্না খুলে ফেলল। সঙ্গে সঙ্গে কৃষ্ণ কেশরাশি তার বক্ষে-পৃষ্ঠে ও স্কন্ধে ছড়িয়ে পড়ল।

নিষ্পলক চেয়ে থাকে গাঙ্গ। অপূর্ব দেহবল্লরী—আর অপূর্ব রূপ।

নির্বাক বিস্ময়ে গাঙ্গেরও কয়েকটা মুহূর্ত যেন গলা দিয়ে কোন স্বর বের হয় না। কিন্তু—অকস্মাৎ—অকস্মাৎই যেন মনে হয় গাঙ্গের—ঐ মুখখানি—যেন তার চেনা—বড় চেনা—কিন্তু সে ত কবেই মারা গিয়েছে।

স্মৃতির পৃষ্ঠাগুলো এলোমেলো ভাবে মনের মধ্যে আসা-যাওয়া করতে থাকে। মৃদু একটা হাসির রেখা রত্নার রক্তিম-বঙ্কিম ওষ্ঠের প্রান্তে জেগে ওঠে।

বলে, কি দেখছেন মহারাজ ?

তুমি—কে তুমি—কোথা থেকে আসছো ?

মহারাজ আমি আসছি বুরবো থেকে।

রত্নার মুখ থেকে বুরবো শব্দটি উচ্চারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই যেন চোখের মণি দুটো তীক্ষ্ন হয়ে ওঠে। ভ্রূযুগল কুঞ্চিত হয়ে ওঠে।

কি বললে ?

বুরবো—শুনুন মহারাজ—দাসী একজন সামান্যা নর্তকী।

নর্তকী!

হ্যাঁ—আপনার খুল্লতাত শাগের প্রমোদশালায় আমি নাচতাম।

তুমি—

ভয় নেই মহারাজ—বুরবো থেকে এলেও আমি গুপ্তচর নই।

গুপ্তচর যে নও কেমন করে তা আমি বিশ্বাস করবো নর্তকী ?

সেটুকু আপনাকে বিশ্বাস করতেই হবে মহারাজ।

নর্তকীকে আমি বিশ্বাস করি না।

সেটা অবিশ্যি মহারাজের অভিরুচি—তবে—

বল থামলে কেন ?

আমি আপনাকে কিছু জরুরী সংবাদ দেবো বলেই এখানে এসেছি।

তাই যদি হবে তো—রাজসভায় আমার সাক্ষাৎপ্রার্থী না হয়ে চোরের মত প্রাসাদদুর্গের বাইরে অমন করে আত্মগোপন করে ঘোরাফেরা করছিলে কেন ?

আপনার রাজসভায় প্রবেশ করব—আপনার সাক্ষাৎপ্রার্থিনী হবো সেরকম পরিচয়-পত্রই তো আমার ছিল না মহারাজ ?

চেষ্টা করলে না কেন একবার ?

জানি আমি কোনো ফল হতো না মহারাজ—তাই এই ছদ্মবেশ নিয়ে ঘুরছিলাম নগরে—

কিন্তু আজ যদি আমার সঙ্গে তোমার দেখা না হতো—যদি কোন রাজ-প্রহরীর নজরে পড়তে তুমি ?

প্রহরী বন্দী করে আপনার কাছেই তো নিয়ে আসত মহারাজ—

হুঁ—তোমার বুদ্ধি আছে দেখছি।

রত্না প্রত্যুত্তরে মৃদু হাসে।

কি নাম তোমার নর্তকী?

নর্তকীর কী কোন নাম থাকে নাকি মহারাজ—নর্তকী নামেই সে পরিচিত।

তবু তোমার কোন নাম নেই?

না মহারাজ। একদিন হয়ত ছিল—কিন্তু আজ—

বল—থামলে কেন?

মহারাজ সামান্যা এক নর্তকীর নাম জেনে আপনার কি হবে, তার চাইতে যে কথা বলবার জন্য বুরবো থেকে এতটা পথ ছুটে এসেছি সেইটাই আপনি শুনুন।

না—তোমার নাম আগে আমি শুনতে চাই।

কেন বলুন তো মহারাজ, এ কৌতূহল আপনার কেন? কি হবে যোধপুরাধিপতি মহারাজ গাঙ্গের সামান্যা এক নর্তকীর নামটা জেনে।

রত্নার আরো কাছে ততক্ষণে এগিয়ে এসেছে গাঙ্গ। একেবারে রত্নার চোখে চোখ রেখেছে। পরস্পরের নিঃশ্বাসও যেন পরস্পরের মুখে লাগছে। আমি—আমি যেন কোথায় তোমাকে দেখেছি।

রত্না হেসে ওঠে খিল খিল করে—

বল কোথায় দেখেছি—বল?

মহারাজ আপনার নিশ্চয়ই কোনরকম ভুল হচ্ছে—

ভুল?

নিশ্চয়ই—নচেৎ আমাকে আপনি কোথায় দেখবেন।

দেখেছি—তোমাকে আমি দেখেছি।

না মহারাজ আপনি—কথাটা রত্নার শেষ হলো না। শেষ করবার সময় পেল না সে।

তুমি। তুমি রত্না—। অকস্মাৎ বলে ওঠে গাঙ্গ।

না, না—মহারাজ—

হ্যাঁ—লাল সিংয়ের কন্যা রত্না তুমি—

না মহারাজ, আপনি ভুল করছেন।

ভুলি আমি করি নি রত্না। সামান্য সংশয় এতক্ষণ যা আমার ছিল এখন আর তার অবশিষ্টমাত্রও নেই—তুমি রত্না—লাল সিংয়ের কন্যা—তুমি মর নি—আজো বেঁচে আছো। আমাকে মিথ্যা বলেছিল তোমার প্রতিবেশীরা।

মহারাজ—আবারও বলছি আপনি ভুল করছেন। আমি অস্বীকার করি না—হয়ত আমার সঙ্গে আপনার কোন পরিচিতা রত্নার কিছুটা সৌসাদৃশ্য—চোখে মুখে চেহারায় কোথায়ও না কোথাও আছে নচেৎ আপনারই বা ভুল হবে কেন। কিন্তু বিশ্বাস করুন মহারাজ আমি রত্না নই। কিন্তু সেকথা যাক্—যেজন্য বুরবো থেকে আপনার সঙ্গে একটিবার দেখা করবার জন্য ছুটে এসেছি সেই

কথাটি আমায় নিবেদন করতে দিন—

শান্ত গলায় গাঙ্গ এবার বলে, কি বলতে চাও বল ?

মহারাজ, সামান্যা নর্তকীর অপরাধ নেবেন না—হয়ত যা বলতে এসেছি তা গুছিয়েও ঠিকভাবে আমি বলতে পারব না—আপনার বিরুদ্ধে একটা ষড়যন্ত্র—জঘন্য চক্রান্ত—

তুমি সেটা না বললেও আমি ঐ রকমই একটা কিছু অনুমান করেছিলাম এবং কিছু কিছু গোপন সংবাদ আমি ইতিপূর্বে পেয়েছিও, কিন্তু—আমার খুল্লতাত—

শুধু মাত্র তিনি হলে কোন ক্ষতি ছিল না মহারাজ।

তবে—

আপনার খুল্লতাত বুরবো অধিপতি শাগ নাগোরে দৌলত খাঁর নিকট সাহায্য চেয়ে পত্র প্রেরণ করেছেন।

কি—কি বললে ?

হ্যাঁ মহারাজ, যবন দৌলত খাঁর নিকট ইতিমধ্যেই পত্রবাহক পত্র নিয়ে হয়ত পেঁাছে গেছে।

তুমি—তুমি কি করে জানলে এ কথা ?

মহারাজ ভুলে যাচ্ছেন কেন আমি আপনার খুল্লতাতর একজন অনুগৃহীতা নর্তকী ছিলাম—

আমাকে সব কথা বল।

রত্না তখন সংক্ষেপে সব কথা বলে।

সব শুনে গাঙ্গ বলে, শোভা সিং পত্র নিয়ে গিয়েছে ?

হ্যাঁ মহারাজ—

মহারাজ গাঙ্গ ত্যর গলা থেকে বহুমূল্য একটি মুক্তার হার খুলে রত্নার দিকে এগিয়ে দিতে দিতে বললে, তোমার সংবাদের জন্য এই নাও পুরস্কার—

না মহারাজ—

রত্না হাত গুটিয়ে নেয়।

ক্ষমা করুন।

নেবে না তুমি ?

তীক্ষ্ন দৃষ্টিতে চেয়ে আছে গাঙ্গ রত্নার মুখের দিকে।

আনতমুখীর দুটি চক্ষু অশ্রু ছলো-ছলো।

ক্ষমা করুন মহারাজ, কোন পুরস্কারের লোভে এ কাজ আমি করি নি।

তবে তুমি কেন এই দুস্তর পথ অতিক্রম করে—শাগের আক্রোশ থেকে আত্মরক্ষা করে এ সংবাদ আমাকে দিতে এসেছো ?

আমি সামান্যা এক নর্তকী হলেও দেশের প্রতি তো আমারও একটা কর্তব্য আছে মহারাজ।

শুধু কি মাত্র তাই ?

তা ছাড়া আর কি হতে পারে মহারাজ—

তাহলে তুমি পুরস্কার নেবে না কেন দেশের রাজার হাত থেকে ?

বললাম ত কোন পুরস্কারের লোভে আমি আসি নি। এবার আমাকে বিদায় দিন মহারাজ।

সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যুত্তরে কথাটা বলে রত্না গাঙ্গকে অভিবাদন জানিয়ে দরজার দিকে এগিয়ে যায়।

রত্না—মহারাজ গাঙ্গ এসে রত্নার পথরোধ করে দাঁড়ায়।

মহারাজ আমি রত্না নই।

হ্যাঁ—তুমি রত্না—দু বাহু প্রসারিত করে গাঙ্গ রত্নাকে ধরবার চেষ্টা করে কিন্তু রত্না যেন তড়িৎস্পৃষ্টার মত সরে দাঁড়ায়।

ছি ছি মহারাজ—স্পর্শ করবেন না—স্পর্শ করবেন না আমায়।

রত্নার দু চোখে জল।

রত্না।

উচ্ছিষ্টা—সামান্যা এক নর্তকী আমি।

না।

গাঙ্গ আবার তার দু বাহু প্রসারিত করে রত্নার স্কন্ধের উপরে দু বাহু স্থাপন করে—রত্না—

মহারাজ !

নারী—ভূমি—আর স্বর্ণ কোন দিন উচ্ছিষ্ট হয় না রত্না—তা ছাড়া আমি জানি তোমাকে উচ্ছিষ্ট করতে পারে এমন কোন পুরুষ আজো জন্মায় নি—তোমাকে আমি আর যেতে দেবো না।

মহারাজ—আমার পথ ছাড়ুন !

না—সেদিন তুমি পালিয়ে গিয়েছিলে—আর তোমায় আমি পালাতে দেবো না।

কি করছেন মহারাজ সামান্যা এক ঘৃণ্য রূপোপজীবিনী—এক নর্তকীকে নিয়ে ?

তুমি ঘৃণ্য নও—রূপোপজীবিনীও নও—নর্তকীও নও—তুমি রত্না—সেদিন দাদুর জন্য যা পারি নি—আজ—

মহারাজ—

হ্যাঁ—আজ তোমায় আমি বিবাহ করবো।

ছি ছি মহারাজ—ছি ভুলে যাবেন না এক নর্তকীর ঔরসজাতা আমি—আর আপনি যোধপুর-কুলতিলক—মহারাজ—মাড়োয়ারের আশা—স্বপ্ন—গৌরব—আমাকে আপনি যেতে দিন।

না।

মহারাজ—

না—যাওয়া তোমার আর হবে না।

মহারাজ, আপনি অবুঝ হবেন না—আপনি বুদ্ধিমান—বিচক্ষণ—আপনি দেশের রাজা—এ দুর্বলতা আপনার শোভা পায় না। কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে রত্না।

শাগ ধারণাও করতে পারে নি যে সামান্য এক সৈনিক বীরেন্দ্র সিংহের এতদূর সাহস বা স্পর্ধা হবে, সে অসিমুখে তার সঙ্গে মীমাংসা করতে এগিয়ে আসবে।

শাগের নির্দেশে প্রহরী মুক্ত অসিহস্তে এগিয়ে এসেছিল, কিন্তু তার পূর্বেই বীরেন্দ্রর হাতের তীক্ষ্ন অসি ঝলসে ওঠে এবং মুহূর্তে প্রহরীকে তীক্ষ্ন অসির আঘাতে আহত করে। তার দক্ষিণ মুষ্টির ওপরে এসে বীরেন্দ্রর অসির আঘাত পড়ে—অসি প্রহরীর হস্তচ্যুত হয়ে ছিটকে পড়ে অদূরে ঝন্‌ঝন্‌ শব্দ তুলে।

শাগ চিৎকার করে আরো প্রহরীকে ডাকে।

বীরেন্দ্র কক্ষ হতে নিষ্ক্রমণের সুযোগ পায় না—চার-পাঁচজন অস্ত্রধারী প্রহরী—যারা আশেপাশে ছিল তারা কক্ষমধ্যে ছুটে আসে মুহূর্তে।

শাগ নির্দেশ দেয় তাদের, বন্দী কর ঐ সৈনিককে—

কয়েকটা মুহূর্ত, প্রহরীরা কি করবে বুঝতে পারে না। কারণ কিছুদিন পূর্বে বীরেন্দ্রকে শাগ অন্যতম সৈন্যাধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত করেছিল। সে তাদের সৈন্যাধ্যক্ষ।

ঐ সুযোগে বীরেন্দ্র কক্ষত্যাগ করবার চেষ্টা করে কিন্তু এবারে স্বয়ং শাগই বাধা দেয় তাকে। প্রথম প্রহরীর ভূপতিত তরবারিটি মুহূর্তমধ্যে তুলে নিয়ে বীরেন্দ্রর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। বীরেন্দ্রও প্রতিরোধ করে।

স্বয়ং শাগকে আক্রমণ করতে দেখে বীরেন্দ্রকে অন্যান্য প্রহরীরাও তখন এগিয়ে আসে। সেই কক্ষমধ্যেই অসিযুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। একদিকে একা বীরেন্দ্র অন্যদিকে শাগ ও তার প্রহরীরা। শাগ নিজেও অসিযুদ্ধে নিপুণ ছিল। কিন্তু সে জানত না—কত বড় কৌশলী অসিযোদ্ধা ঐ বীরেন্দ্র সিংহ। প্রচণ্ড বিক্রমে একাই বীরেন্দ্র চারজনের সঙ্গে অসিহাতে মোকাবিলা করতে থাকে। অসির মুহুর্মুহু ঝন্‌ঝন্‌ শব্দে কক্ষটি মুখরিত হয়ে ওঠে।

কিন্তু একা বীরেন্দ্র—এবং প্রতিপক্ষ চারজন যোদ্ধা। তাদের মধ্যে শাগ অসিযুদ্ধে সত্যিই নিপুণ। দেখতে দেখতে বীরেন্দ্র কোণঠাসা হয়ে পড়ে। কিন্তু তথাপি বীরেন্দ্র নিরস্ত বা নিরুৎসাহ হয় না। প্রাণপণে সে অসিহাতে আত্মরক্ষা করে চলে।

ইতিমধ্যে আহত প্রহরীটি বাইরে ছুটে গিয়ে একফাঁকে আরো কয়েকজন প্রহরীকে ডেকে নিয়ে আসে। তারাও এসে বীরেন্দ্রর উপর অসিহাতে ঝাঁপিয়ে পড়ে। বীরেন্দ্র ক্রমশঃ অবসন্ন ও ক্লান্ত হয়ে পড়ে। এবং শেষ পর্যন্ত প্রহরীদের হাতে ক্ষতবিক্ষত হয়ে ধরা পড়ে।

শাগের নির্দেশে তখন প্রহরীরা বীরেন্দ্র সিংহকে শৃঙ্খলিত করে ফেলে।

অন্ধকার কারাকক্ষে গিয়ে ঐ শয়তানটাকে বন্দী করে রাখ। পরে ওর বিচার হবে—শাগ হাঁপাতে হাঁপাতে বলে।

প্রহরীরা বীরেন্দ্রকে শৃঙ্খলিত করে কক্ষ থেকে বের হয়ে গেল।

শাগ নিজেও আহত হয়েছিল। সারা গায়ে অজস্র ক্ষতচিহ্ন। রক্তক্ষরণ হচ্ছিল। শাগ অন্তঃপুরের দিকে পা বাড়াল।

রাজবৈদ্যের নিকট সংবাদ পাঠান হলো।

ব্যাপারটা কিন্তু চাপা রইল না। রাজঅন্তঃপুরে সর্বত্র দেখতে দেখতে ছড়িয়ে পড়ে সংবাদটা। এবং পার্বতীরও কানে প্রবেশ করে। বীরেন্দ্র সিংহ বন্দী। কারাগারে। প্রকাশ্যে তার বিচার হবে।

দিন দুই পরে নাগোর থেকে শোভা সিং ফিরে এলো। শুভ সংবাদ নিয়ে সে এসেছে।

নাগোরের দৌলত খাঁ তার প্রস্তাবে সম্মত হয়েছে এবং পত্র মারফৎ জানিয়েছে সর্বতোভাবে সে বুরবো অধিপতি শাগকে সাহায্য করতে প্রস্তুত। বুরবো অধিপতি অগ্রসর হোন—দৌলত খাঁ তাঁর পাশে আছে।

প্রকৃতপক্ষে দৌলত খাঁ প্রস্তাবটি পেয়ে খুশিই হয়েছিল। এমন অপূর্ব সুযোগ হাতের মুঠোর মধ্যে এসেছে—কে এমন মূর্খ আছে সে সুযোগ হেলায় হারাবে?

দৌলত খাঁর সম্মত হবার আরো কারণ ছিল বুরবো অধিপতির প্রস্তাবে। সে নিজে লোদী বংশের একজন কিন্তু তার শ্যেনদৃষ্টি ছিল দিল্লীর সিংহাসনের পরে। কিন্তু সে জানত একাকী দিল্লীশ্বর ইব্রাহিম লোদির বিরুদ্ধে অসিহাতে দাঁড়ানো সম্ভবপর নয়। তাই সে ইতিমধ্যেই এক গোপন দূতের হাতে কাবুলে এক পত্র প্রেরণ করেছিল তৈমুর বংশধর বাবুরকে। আসুন আপনি—পরস্পরের সঙ্গে বিবাদে হিন্দুস্থানের সর্বত্র এক গোপন চক্রান্ত চলেছে। এখানকার রাজন্য-বর্গ কেউ কারো বন্ধু নয়। সবাই সবার শত্রু। তা ছাড়া আমি আছি—সর্বতোভাবে আমি আপনাকে সাহায্য করব।

স্বার্থে আঘাত লাগলে মানুষের বোধ করি হিতাহিত জ্ঞানটুকুও লোপ পায়—নচেৎ বুরবো অধিপতি শাগ সেদিন ঐ সর্বনাশা পথই বা বেছে নেবে কেন? কেন সে দৌলত খাঁকে আহ্বান জানাবে?

একদিন যে সমৃদ্ধিশালী বিশাল জনপদ নাগোর তাদেরই পিতৃপুরুষদের অধিকারে ছিল এবং যে নাগোরকে একদিন ঐ দৌলত খাঁ তাদের হাত থেকে কেড়ে নিয়েছে—যার পূর্বপুরুষদের রক্ত আজও যে নাগোরের ধুলায় হয়ত শুকিয়ে আছে—স্বার্থে অন্ধ হয়ে শাগ কিনা আজ তাকেই আহ্বান জানাল।

শুধু শাগ কেন—মহারাজ গাঙ্গের অন্যান্য খুল্লতাত ও তাদেরও সন্তানেরাও গাঙ্গর বিরুদ্ধে আজ অসিহাতে এগিয়ে এলো।

মাড়বারের বীরেরা আজ দুই দলে বিভক্ত হয়ে দুইটি প্রতিদ্বন্দ্বী রাঠোর রাজকুমারের পতাকাতলে এসে সমবেত হলো।

শাগের পাশে নাগোরের যবনরাজ দৌলত খাঁ।

দৌলত খাঁ—ধূর্ত দৌলত খাঁ বুরবো অধিপতিকে বোঝাল, এক কাজ করুন মহারাজ—

কি বলুন খাঁ সাহেব ?

এভাবে যুদ্ধ করে কোন লাভ নেই।

তবে আপনি কি করতে বলেন খাঁ সাহেব।

রাঠোরাধীপ গাঙ্গাকে একটি পত্র লিখুন।

পত্র।

হ্যাঁ।

কিন্তু—

শুনুন—আমি যা বলি।

বলুন—

তাকে লিখে পাঠান—মাড়বার রাজ্যের ওপরে আপনাদের সকলেরই সমান অধিকার আছে—কারণ আপনারা সকলেই স্বর্গত মহারাজ সুরজমলের উত্তরাধিকারী। সুরেজমল অন্যায়ভাবে সমস্ত মাড়বার গাঙ্গাকে দিয়ে গিয়েছেন। তা হতে পারে না—তার চাইতে বরং এক কাজ করা যেতে পারে মাড়বার সকলের মধ্যে সমান ভাগে ভাগ হয়ে যাক।

কিন্তু তাতে কি গাঙ্গা সম্মত হবে।

আমার মনে হয় হবে।

যদি না হয়—

তার তো অন্য পথ যুদ্ধ রইলই—যুদ্ধক্ষেত্রে তার মীমাংসা হবে।

অন্যান্য নরপতিরাও দৌলত খাঁর পরামর্শে সম্মত হলো। তখন অনেক মুসাবিদা করে একটি পত্র রচনা করা হলো এবং সকলে সেই পত্রে স্বাক্ষর দিল। দ্রুতগামী এক অশ্বারোহীর হাতে সেই পত্র প্রেরিত হলো।

রত্নাকে গাঙ্গা যেতে দেয় নি। তাঁকে রাজঅন্তঃপুরেই রেখে দিয়েছিল। কারণ তার মনের মধ্যে আরো একটি সন্দেহ এসে ইতিমধ্যে বাসা বেঁধে ছিল—রত্না সত্যিসত্যিই তার শুভাকাঙ্ক্ষণী কিনা—না সে তার খুল্লতাত শাগের গুপ্তচর।

গাঙ্গা অবিশ্যি চুপ করে বসে থাকে নি। পরের দিনই রাঠোর সর্দারদের মন্ত্রণাকক্ষে মন্ত্রণার জন্য আহ্বান জানায়।

কি সংবাদ মহারাজ ? বৃদ্ধ এক রাঠোর সর্দার প্রশ্ন করেন।

সর্দার, গুপ্তচরমুখে আমি সংবাদ পেয়েছি আমার খুল্লতাত শাগ এবং তাঁর আরো দুই ভ্রাতা আমার মাড়বারের সিংহাসন আরোহণের ব্যাপারটা মেনে নেয় নি। অবিশ্যি এমনটা যে হবে তা আমি অনুমানই করেছিলাম।

একজন রাঠোর সর্দার বলে, সংবাদটা যে আমিও জানি না তা নয় মহারাজ—আমরা অনেকেই ইতিমধ্যে সে সংবাদ পেয়েছি।

পেয়েছেন ?

হ্যাঁ।

এখন কি কর্তব্য বলুন ?

কর্তব্য আবার কি—অন্যায় জবরদস্তিকে মেনে নেবো কেন আমরা।

তবে যুদ্ধ করব আমরা ?
নিশ্চয়ই।
তাহলে আপনারা আমাকে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন।
নিশ্চয়ই—আমরা আপনারই পক্ষে।
তবে আপনারা প্রস্তুত হন—
আমরা প্রস্তুত।

সমগ্র মাড়বার জুড়ে বিরাট এক যুদ্ধের প্রস্তুত চলতে লাগল। যুদ্ধ। যুদ্ধ।—চারিদিকে সাজ সাজ রব। এমন সময় অশ্বারোহী পত্রবাহী এলো নাগোর অধিপতি দৌলত খাঁর পত্র নিয়ে। পত্র পড়ে স্তম্ভিত হয়ে যায় যেন গাঙ্গ।

তাহলে তো রত্না মিথ্যা বলেনি। দৌলত খাঁর সত্যিই শত্রুপক্ষের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে। ক্রোধে গাঙ্গের সর্বশরীর যেন জ্বলতে থাকে।

আবার মন্ত্রণাকক্ষে মন্ত্রণাসভা বসল। সমাগত রাঠোর সর্দারদের সামনে গাঙ্গ দৌলত খাঁর পত্রখানি পাঠ করল।

একজন রাঠোর সর্দার বলে, আশ্চর্য—যবনের স্পর্ধা—

কিন্তু তার চাইতেও বেশী আমি ভাবছি—গাঙ্গ বলে।

কি !

দৌলত খাঁর এই পত্ররচনার মধ্যে রয়েছে একটা প্রকান্ড ষড়যন্ত্র।

ষড়যন্ত্র !

হ্যাঁ—সমগ্র মাড়বারকে সে খন্ড ছিন্ন করে দিতে চায়—দুর্বল করে দিতে চায়, যাতে করে সহজেই সে মাড়বারকে গ্রাস করতে পারে।

ঠিক বলেছেন মহারাজ—আমরা এতটা ভাবি নি—এখন কি কর্তব্য ?

এ পত্রের জবাব আমি ভেবে রেখেছি।

কি ?

একখানি মুক্ত অসি কেবল ঐ পত্রের উত্তর হিসাবে প্রেরণ করবো।

উত্তম ব্যবস্থা।

এবং সেই মতই ব্যবস্থা হলো। নাগোরের অশ্বারোহী দূতকে ডেকে পাঠাল অতঃপর গাঙ্গ।

শোন পত্রবাহী, তোমার প্রভুর জবাব আমার প্রস্তুত।

দিন তবে মহারাজ।

মন্ত্রণাকক্ষের দেওয়াল থেকে ঝুলন্ত একখানা তীক্ষ্নধার তরবারি টেনে নিয়ে দূতের সামনে নিক্ষেপ করে গাঙ্গ বলে, এই জবাব—যাও নিয়ে যাও ঐ তরবারি তোমার প্রভুর কাছে।

দূত কিছুক্ষণ চেয়ে রইল গাঙ্গের মুখের দিকে। সমগ্র মুখখানি তার রক্তবর্ণ।

নাও তোল—

পত্রবাহী অশ্বারোহী তরবারিটা তুলে নিল।

তখন একজন প্রহরীকে গাঙ্গ ইঙ্গিত করে পত্রবাহী অশ্বারোহীকে দুর্গের বাইরে রেখে আসতে। প্রহরী তাকে নিয়ে চলে যায়।

গাঙ্গ অতঃপর সভা ভঙ্গ করে অন্তঃপুরের দিকে পা বাড়ায়। অন্দরের সরু একটা অলিন্দপথ ধরে যেতে যেতে গাঙ্গ দাঁড়ায়। সামনেই একটি কক্ষে রয়েছে রত্না। কয়েকটা মুহূর্ত যেন কি ভাবল গাঙ্গ তার পর দরজার গায়ে মৃদু করাঘাত করল।

একজন নারীপ্রহরী দ্বার খুলে দিল। সামনে মহারাজকে দেখে সসম্ভ্রমে অভিবাদন জানাল।

রত্না কোথায়?

ভিতরের কক্ষে।

গাঙ্গ ভিতরের কক্ষের দিকে পা বাড়াল।

নাতিপ্রশস্ত একটি কক্ষ।

এক কোণে একটি প্রদীপ জ্বলছে প্রদীপাধারে।

একটা আসনের উপর চুপটি করে বসেছিল রত্না।

রত্না!

রত্না পূর্বেই পদশব্দে মুখ তুলে তাকিয়েছিল।

রত্না তাড়াতাড়ি উঠে গাঙ্গকে অভিবাদন জানায়।

রত্না!

আপনি এখনো ভুল করছেন মহারাজ—আমি রত্না নই।

গাঙ্গ মৃদু হাসে।

তার পর শান্ত গলায় বলে, তুমি রত্না আমি জানি—শোন তোমার কথা মিথ্যা নয়—

মিথ্যা নয়।

হ্যাঁ—দৌলত খাঁর কাছ থেকে পত্র এসেছে আজ—

আপনি জবাব দিয়েছেন?

দিয়েছি বৈকি। আর কি জবাব দিয়াছি জান?

কি?

যুদ্ধক্ষেত্রেই আমরা পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হবো।

মহারাজ!

খুশি হও নি?

হয়েছি মহারাজ।

কিন্তু তোমার গলায় যেন দ্বিধার সুর!

॥ ১৯ ॥

যোধরাওর চতুর্দশ পুত্র ছিল।

যোধরাওর চতুর্থ পুত্র দুদো।

মৈরতার বিশাল ভূখণ্ডে দুদো তার আধিপত্য বিস্তার করেছিলেন। এবং মৈরতায়ই তিনি রাজত্ব করছিলেন।

দুদোর বংশধররাই মৈরাতিয়া রাঠোর নামে পরিচিত। দুদো মরুদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বীর। পরবর্তীকালে যে রাজপুত বীরকেশরী জয়মল দিল্লীশ্বর আকবরের প্রকাণ্ড সৈন্যবাহিনীর বিরুদ্ধে দীর্ঘদিন ধরে যুদ্ধ করে অসীম সাহসের পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছিলেন এবং চিতোর নগরীকে রক্ষা করেছিলেন এবং দিল্লীর সিংহদ্বারে যে বীরের পাষাণমূর্তি রক্ষিত হয়েছিল—সে ঐ দুদোরই পৌত্র।

দুদোর একটি পরম বিদুষী—অপরূপ রূপলাবণ্যবতী কন্যারত্ন লাভ করেছিলেন। মীরাবাঈ।

মীরার বিবাহ হয়েছিল মেওয়ারের রানা কুম্ভের সংগে। এবং দুদোর এক পুত্র বীরম সিংহ।

যোধের দ্বিতীয় পুত্র সুরজমল। জ্যেষ্ঠপুত্র শান্তল বা শাতল। শান্তল পোকর্ণ থেকে তিন ক্রোশ দূরবর্তী শাতলনীর ভূসম্পত্তি লাভ করেছিলেন পিতার কাছ থেকে।

মরুভূমির এক প্রান্তে শাহরী নামে একদল যবন বাস করত। মধ্যে মধ্যে ঐ শাহরীদের সংগে শান্তলের বিবাদ লেগেই ছিল—এবং যবনরাজকে শান্তল হত্যা করেছিলেন যুদ্ধে পরাজিত করে।

পঞ্চম পুত্র বীর সিংহ—পিতার কাছ থেকে তিনি মালবের ভূসম্পত্তি পেয়েছিলেন। বীকো ষষ্ঠ পুত্র—তিনি পেয়েছিলেন বিকানীরের স্বাধীন রাজ্য। সপ্তম পুত্র ভরমল—বৈভীলারে বাস করেছিলেন সেখানকার ভূস্বামী হয়ে। অষ্টম শিবরাজ—লুনী নদীর তটে ছোট একটি রাজ্যস্থাপন করে বসবাস করছিলেন।

তা ছাড়া করম সিংহ, রায়মল, সামন্ত সিংহ, বীদা সিংহ, বুনহর সিংহ ও নীমো সিংহ। এরা সামান্য সামান্য ভূসম্পত্তি পেয়েছিলেন পিতার কাছ থেকে।

কিন্তু যোধরাওর দ্বিতীয় পুত্র সুরজমলের পৌত্রের যোধপুরের সিংহাসন লাভে কেউ সন্তুষ্ট হতে পারে নি। ইতিমধ্যে সকলেই সংবাদ পেয়েছিল গাঙ্গ তার পিতামহের সিংহাসনে উপবেশন করেছে।

মহারাজ সুরজমলের জ্যেষ্ঠ পুত্র ভাগ এবং তৃতীয় শাগ সুরো অধিপতি ছাড়াও দ্বিতীয় পুত্র উদোর একাদশটি কুমার জন্মগ্রহণ করে।

উদোর একাদশটি কুমারই উদাবৎ সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করে।

সুরজমল জীবিতাবস্থাতেই ঐ পৌত্রদের নিমাজ, জয়তরাস, ওন্দোচি, বীরবতিয়া ও রায়পুর প্রভৃতি মেওয়ার ও মাড়বারের অনেকগুলো প্রসিদ্ধ নগর ভাগ করে দিয়েছিলেন।

আজ খুল্লতাত শাগের সংগে সংগে উদোর পুত্ররাও গাঙ্গর বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হতে লাগল। যোধপুরের সিংহাসনে তাদেরও সমান অধিকার। গাঙ্গ কোন্ অধিকারে সে সিংহাসন ভোগ করবে আর তারাই বা বঞ্চিত হবে কেন? এ অন্যায়—এ অবিচার।

একদিকে শাগ—শান্তল-পুত্র জয়মল—মালবের বীর সিংহ, বিকানীরের

বাঁকো সিংহ, উদোর পঞ্চপুত্র সকলে এবং তাদের সংগে হাতে হাত মিলিয়েছে দৌলত খাঁ লোদী—অন্যদিকে একা মহারাজ গাঙ্গা, তার পৃষ্ঠপোষক কিছু রাঠোর সর্দার। সকলে এসে শাগের পতাকাতলে সমবেত হয়েছে। সকলেই যুদ্ধক্ষেত্রে অপেক্ষা করছে আক্রমণের জন্য।

দৌলত খাঁর পরামর্শমত পত্র প্রেরিত হয়েছে যোধপুরে মহারাজ গাঙ্গের কাছে। পত্রের জবাবের জন্য সকলে অধীর ভাবে অপেক্ষা করছে। সকাল-সন্ধ্যায় রীতিমত কুচকাওয়াজ চলেছে।

অসংখ্য সৈন্যের সমাবেশ। এমন সময় যোধপুর থেকে অশ্বারোহী দূত ফিরে এলো।

দৌলত খাঁর শিবিরের মধ্যেই সকলে বসে ছিল। নৃত্য, গীত ও সুরা—স্ফূর্তি ও আনন্দের স্রোত বহে চলেছে।

দূত এসে ঐ শিবিরের মধ্যেই প্রবেশ করল।

শাগই প্রশ্ন করে, কি সংবাদ দূত?

দূত সকলের মুখের দিকে একবার তাকিয়ে নিল। তারপর হস্তধৃত বস্ত্রখণ্ডে আবৃত গাঙ্গর দেওয়া তরবারিটা বের করে সকলের সামনে নামিয়ে রাখল নিঃশব্দে।

দৌলত খাঁ অধৈর্য হয়ে প্রশ্ন করে, কি হলো, পত্রের জবাব আন নি? গাঙ্গের সঙ্গে দেখা হয় নি?

দূত বললে, হয়েছে খাঁ সাহেব।

তবে?

ঐ জবাব তিনি দিয়েছেন।

তরবারি।

হ্যাঁ।

দূত পুনরাবৃত্তি করল কথাটার।

শুষ্ক তৃণে যেন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ পড়লো। দপ্‌ করে জ্বলে উঠলো শাগ।

কি—কি বললে?

হ্যাঁ—মহারাজ গাঙ্গ, পত্রের জবাবে আপনাদের ঐ তরবারিই পাঠিয়েছেন।

সকলেই স্তব্ধ। কেউ বুঝি এতটা আশা করে নি।

এত বড় একটা মিলিত শক্তির বিরুদ্ধে একা দাঁড়াবার দুঃসাহস গাঙ্গের হবে, ওরা বুঝি ভাবতেও পারে নি। তাই বুঝি মুহূর্তের জন্য সবাই বিস্ময়ে বোবা হয়ে গিয়েছিল।

ঐ তরবারি পাঠিয়েছে গাঙ্গ। নীরবতা ভঙ্গ করে এবারে কথা বললে দৌলত খাঁ।

হ্যাঁ—খাঁ সাহেব।

দৌলত খাঁ তার মেহেন্দী রাঙানো চাপ দাড়িতে হাত বুলোতে বুলোতে বলে, ভাল—ভাল—তাহলে দেখছি যোধপুরাধিপতির সত্যিসত্যিই সিংহাসনে বসে মস্তিষ্ক-বিকৃতি ঘটেছে। উন্মাদ—

শাগ ততক্ষণে খানিকটা ধাতস্থ হয়েছে। দূতের দিকে চেয়ে বলে, তুমি যাও। দূত শিবির ছেড়ে চলে গেল।

তাহলে খাঁ সাহেব! শাগ প্রশ্ন করে।

কি আর—যুদ্ধ হবে।

কথাটা বলে দৌলত খাঁ চারিদিকে উপবিষ্ট রাজন্যবর্গের দিকে তাকাল।

বোধ হয় দৌলত খাঁ সকলের মনোভাবটা জেনে নেবার চেষ্টা করে।

কিন্তু কারো কোন সাড়া পাওয়া যায় না।

শাগ অধৈর্য হয়ে ওঠে। বলে, নিশ্চয়ই আমরা যুদ্ধ করবো—গাঙের এই ঔদ্ধত্যের সমুচিত শিক্ষা দেবো।

অতঃপর কবে কখন যুদ্ধ শুরু হবে, সেই সম্পর্কে আলোচনা শুরু হয়। যুদ্ধক্ষেত্রে কে কোথায় থাকবে। কার স্থান কোথায় হবে—সেই আলোচনাই চলতে থাকে।

রাত্রি তখন দ্বিতীয় প্রহর। শাগ তার নিজের শিবিরে বিশ্রামের জন্য সবে ফিরে এসেছে—দ্বারী এসে অভিবাদন জানাল।

বুরবো থেকে একজন সংবাদবাহী এসেছে মহারাজ।

বুরবো।

হ্যাঁ।

যাও—এখানে নিয়ে এসো তাকে।

করম সিং এসে শিবিরে প্রবেশ করে অভিবাদন জানাল।

করম সিংহের ওপরেই বুরবোর রাজধানীর ভার দিয়ে এসেছিল শাগ।

এ কি করম, তুমি ?

হ্যাঁ মহারাজ—আমাকেই আসতে হলো।

কি ব্যাপার ?

একটা দুঃসংবাদ আছে মহারাজ।

দুঃসংবাদ !

হ্যাঁ মহারাজ—আপনার ভ্রাতুষ্পুত্রী—

কি—কি হয়েছে ?

পার্বতী দেবীকে প্রাসাদে পাওয়া যাচ্ছে না।

সে কি ?

হ্যাঁ মহারাজ—প্রধানা মহিষীর কাছ থেকে সেই সংবাদ পেয়ে আমি তন্ন তন্ন করে সমস্ত প্রাসাদ অনুসন্ধান করেছি, কিন্তু কোথায়ও তাঁর চিহ্নমাত্রও নেই।

তুমি বলতে চাও করম সিং, পার্বতী—প্রাসাদের অতগুলো সতর্ক প্রহরীর, তোমাদের সকলের দৃষ্টি এড়িয়ে পলায়ন করেছে।

এখন তো তাই মনে হচ্ছে মহারাজ।

অপদার্থ—অকর্মণ্য সব—আর সেই কথা বলবার জন্য আমার কাছে এসেছো —রাগে যেন একেবারে শাগ ফেটে পড়ে।

মহারাজ—আমরাও হতবাক্ হয়ে গেছি—

হতবাক্ হয়ে গিয়েছো। অকর্মণ্য সব। যাও—অশ্ব প্রস্তুত কর—আমি এখ্নি ব্রবো যাত্রা করব।

করম সিং নত মস্তকে শাগের শিবির থেকে বের হয়ে গেল।

কিন্তু কোথায় গেল পার্বতী। সত্যিসত্যিই সে পালাল নাকি? কিন্তু কেমন করে তা সম্ভব। অমন সতর্ক প্রহরার ব্যবস্থা করেছিল সে—

মহিষী চন্দ্রাবতীর কাজ নয়ত। মহিষী চন্দ্রাবতী। প্রথম হতেই চন্দ্রাবতী পার্বতীর প্রতি সহান্ভূতিসম্পন্ন ছিল। দু-তিনবার বলেছিলও, বীরেন্দ্র সিংহের সঙ্গে পার্বতীর বিবাহ দেবার জন্য।

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে শাগ চন্দ্রাবতীকে চুপ করিয়ে দিয়েছিল, থাম তুমি, যা জান না—যা বোঝ না সে ব্যাপারে মতামত প্রকাশ করতে এসো না।

স্বার্থান্বেষী স্বামীকে চন্দ্রাবতী ভাল করেই চিনত। বলেছিল, সম্পর্ক থাক্ বা না থাক্ ও তো তোমাদেরই বংশের মেয়ে। তোমার নিজের দুটি সন্তানের মত পার্বতীও একজন—

সে কথা আমি ভুলি নি বলেই আমাকে ওর সম্পর্কে কঠোর হতে হয়েছে। আমার বংশের সম্মান ও মর্যাদার দিকে তাকিয়েই এ অন্যায় বিবাহে—এ অসবর্ণ বিবাহে আমি মত দিতে পারছি না।

অন্যায়—অসবর্ণ বিবাহ কেন? বীরেন্দ্র তো শিশোদীয় বংশেরই ছেলে শুনেছি?

শিশোদীয় বংশে জন্মগ্রহণ করলেই বুঝি হয়ে গেল!

তবে?

সামান্য এক বেতনভুক সৈনিক মাত্র। কি আছে ঐ বীরেন্দ্রর পরিচয়?

শুনেছি সুশ্রী—কর্মঠ—বুদ্ধিমান ছেলে—

হাঃ হাঃ করে অতঃপর স্ত্রী চন্দ্রাবতীর কথায় হেসে উঠেছিল শাগ।

রাত্রির স্তব্ধ অন্ধকারে ব্রবোর দিকে ক্ষিপ্রবেগে অশ্ব চালাতে চালাতে ঐ সব কথাই ভাবছিল শাগ।

চন্দ্রাবতী তথাপি নিরস্ত হয় নি।

নানাভাবে স্বামীকে অনুরোধ করেছে।

দেখ, পার্বতী সত্যিই বীরেন্দ্রকে ভালবাসে—

ভালবাসে। ওর যদি এখন বামন হয়ে চাঁদে হাত দেবার দুঃসাহস হয়ে থাকে —আমাকে তাতে প্রশ্রয় দিতে হবে?

আহা ও তো তোমার আশ্রয়ে না এসে অনায়াসেই অন্যত্র চলে যেতে পারত।

কি পারত না পারত সে ব্যাপার নিয়ে এখন আমি মাথা ঘামাতে রাজী নই। আমার হাতে এসে যখন ও পড়েছেই—জানতে হবে ঈশ্বরেরই ইচ্ছা সেটা। আমি ওকে অন্যায় প্রশ্রয় দিতে পারব না।

চন্দ্রাবতী তখন আরো স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। বলেছিল, তা নয়—বল—তোমার নিজের স্বার্থেই ওদের ঐ ভালবাসাকে অস্বীকার করছো তুমি—

স্বার্থ।

শাগ যদিও বলেছিল, আমার আবার স্বার্থ কি—

স্বার্থ নেই? শুধিয়েছিল মহিষী চন্দ্রাবতী।

না। সম্পূর্ণ বংশের মর্যাদা রক্ষার জন্যই এ বিবাহে আমি সম্মতি দিতে পারি না। মৃদু হেসে নিরস্ত হয়েছিল অতঃপর মহিষী চন্দ্রাবতী।

কিন্তু মুখে যাই বলুক শাগ—কথাটা তো মিথ্যা নয়।

চন্দ্রাবতীও তো মিথ্যা বলে নি।—পার্বতীকে হাতের মুঠোর মধ্যে রাখতে পারলে ভ্রাতুষ্পুত্র গাঙ্গকে হয়ত জব্দ করা যেতে পারবে—এবং যদি অদূর ভবিষ্যতে কোনদিন গাঙ্গের সঙ্গে যুদ্ধ বাধেই, ঐ পার্বতীই হবে তার অন্যতম অস্ত্র। আর আজকের এই যুদ্ধে কি সেটাই তার সর্বাপেক্ষা বড় অস্ত্র ছিল না!

দৌলত খাঁকে ডেকে আনলেও, শাগের ঐ পার্বতীর উপরেই তো সব চাইতে বড় আশা ছিল। আর সেই কারণেই উদ্ধত বীরেন্দ্র সিংহকে কারাগারে বন্দী করেছে শাগ।

কিন্তু এ কি সংবাদ নিয়ে এল সংবাদবাহী! পার্বতীকে প্রাসাদের কোথায়ও পাওয়া যাচ্ছে না? সে নিরুদ্দিষ্টা?

বলতে গেলে ঝড়ের গতিতে অশ্বচালনা করে শাগ বুরুবো এসে পৌঁছাল। ভোর হতে তখনও বাকী। রাত্রিশেষের তরল অন্ধকারে প্রকৃতি রহস্যময়ী যেন।

অশ্ব হতে অবতরণ করে সোজা শাগ অন্তঃপুরে গিয়ে প্রবেশ করল যেন ঝড়ের মত। সোজা একেবারে চন্দ্রাবতী—প্রধানা মহিষীর শয়নকক্ষের সামনে।

রাতপ্রহরী সন্ত্রস্ত হয়ে অভিবাদন জানায়।

মহিষী কোথায়?

তাঁর কক্ষেই আছেন।

শাগ আর দ্বিতীয় প্রশ্ন করে না—দুয়ার ঠেলে সোজা গিয়ে ভিতরে প্রবেশ করে।

চন্দ্রাবতীর ইতিমধ্যে নিদ্রাভঙ্গ হয়েছিল। স্নান সমাপনান্তে পট্টবস্ত্র পরিধান করে পূজার ঘরে যাবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল মহিষী।

চন্দ্রাবতী!

এ কি তুমি!

হ্যাঁ—আমি।

যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ফিরে এলে যে?

আসতে হলো। পার্বতী কোথায়?

পার্বতী!

হ্যাঁ—হ্যাঁ—পার্বতী কোথায়?

গত কাল থেকে তার কোন সংবাদ পাওয়া যাচ্ছে না।

কেন পাওয়া যাচ্ছে না?

অনেক অনুসন্ধান করেও—

অনেক অনুসন্ধান করেছো বুঝি।

কণ্ঠে যেন শাণের কঠিন চাপা একটা ব্যঙ্গের সুর।

হ্যাঁ।

চন্দ্রাবতীর কণ্ঠস্বর শান্ত—ধীর।

তাহলে তুমিও জান না বলতে চাও—সে কোথায় ?

না।

জান না ?

না।

শোন, ঐ কথা যাকে তুমি বলে বিশ্বাস করাতে চাও করাতে পার, কিন্তু আমি বিশ্বাস করি না।

কেন ?

কারণ আমার ধ্রুব বিশ্বাস, এ ব্যাপারের মধ্যে তোমার হাত আছে।

আমার ?

হ্যাঁ—হ্যাঁ—বল সে কোথায় ?

জানি না বললাম তো একটু আগে—

ঠিক আছে—তুমি যদি ভেবে থাক—পার্বতীকে পালাবার পথ করে দিয়ে তাকে তুমি বীরেন্দ্রর সঙ্গে মেলবার সুযোগ করে দেবে তো জেনো ভুল করেছো—

ভুল করেছি।

হ্যাঁ—আমি এখনি বীরেন্দ্র সিংহকে হত্যা করবার আদেশ দিচ্ছি—, ওরে কে আছিস ?

না, না—না—আর্তকণ্ঠে চিৎকার করে ওঠে চন্দ্রাবতী, এ তুমি করতে পার না।

পারি—আর করব।

না, না—

তবে বল পার্বতী কোথায় ?

জানি না।

॥ ২০ ॥

দৌলত খাঁ তার শিবিরের মধ্যে একাকী পায়চারি করছিল। শিবিরের এক কোণে দীপাধারে দীপ জ্বলছে। শিবিরের ধূসর বর্ণের আবরণের উপর সেই মৃদু প্রদীপের আলো পড়ে কাঁপছে।

যোধপুরাধিপতি গাঙ্গ তাহলে যুদ্ধই চায়। দৌলত খাঁ ভেবেছিল, তার বিপক্ষ দলের সঙ্গে সে হাত মিলিয়েছে জানতে পারলে হয়ত গাঙ্গ শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ নাও করতে পারে। কারণ সতিসত্যিই দৌলত খাঁর এইভাবে যুদ্ধ করে শক্তিক্ষয়ের ইচ্ছা ছিল না। রাজস্থান আর তার মরুভূমি তো তার লক্ষ্য নয়। এমন কি নাগোরও সে চায় না। সে চায় দিল্লীর সিংহাসন।

দিল্লীর সিংহাসনের ভিত আজ দুর্বল হয়ে পড়েছে। জোর তেমন করে একটা

আঘাত হানতে পারলে, দিল্লীশ্বর ইব্রাহিম লোদিকে সিংহাসনচ্যুত করে সেই সিংহাসন অধিকার করা এমন একটা কিছু দুঃসাধ্য ব্যাপার হবে না, আর দৌলত খাঁ সেই উদ্দেশ্যেই ধীরে ধীরে জাল বিছিয়ে এসেছে।

কুবলাই খাঁ আর মরিয়মকে কাবুলে প্রেরণের উদ্দেশ্যও তার তাই। যদি প্রয়োজন হয়, শেষ পর্যন্ত কাঁটা দিয়েই কাঁটা উদ্ধার করতে হবে।

মুঘল সম্রাট বাবুর। তার লোলুপ দৃষ্টি আছে বহুদিন ধরে সোনার ভারতবর্ষের উপরে। শস্যশ্যামলা—সুজলা—সুফলা ভারতভূমি। অফুরন্ত ধনসম্ভার ভারতের।

তাই বাবুর বার বার এসেছে—দীর্ঘ বিপদসঙ্কুল পথ অতিক্রম করে ভারতের ধনরত্ন লুণ্ঠন করতে। ক্ষুধার্ত নেকড়ের মত ঝাঁপিয়ে পড়ে যা পেরেছে লুট করে নিয়ে গিয়েছে।

লোভী—ক্ষুধার্ত বাবুর। তাকে যদি তার আশারও অতীত ধনরত্ন দেওয়া যায়—সে হয়ত সাহায্য করতে রাজী হবে দৌলত খাঁকে।

আর একান্ত যদি তা নাও হয়? সেও ভেবে রেখেছে দৌলত খাঁ।

বন্ধুত্বের মুখোশ মুখে এঁটে কার্য উদ্ধার করে নিয়ে—বাবুরকে আবার ভারতভূমি থেকে তাড়িয়ে দিতে দৌলত খাঁর কোন কষ্টই হবে না।

কিন্তু অনেক দিন হয়ে গেল—কুবলাই খাঁ ও মরিয়মের কোন সন্ধান নেই। তারা কাবুলে পৌঁচেছে—এবং বিশেষ করে কুবলাই খাঁ আজ সম্রাট বাবুরের একজন বিশেষ প্রিয় পাত্র সে সংবাদও পেয়েছে দৌলত খাঁ। কিন্তু কুবলাই খাঁর চাইতেও বেশী আশা দৌলত খাঁর মরিয়মের উপরই। তারই পরামর্শে মোল্লা মুরশিদের সঙ্গে মরিয়ম গিয়েছে কাবুলে।

মরিয়ম কি করছে কে জানে। মরিয়ম—নর্তকী মরিয়ম। শুধু রূপই নয়—শুধু নৃত্য-গীতে পটীয়সীই নয় মরিয়ম—তীক্ষ্ন বুদ্ধিমতী—চতুরা মরিয়ম। মরিয়মকে প্রথম যেদিন দেখতে পায় দৌলত খাঁ সেদিন বিস্মিত হয়েছিল তার রূপ দেখে, পরে মুগ্ধ চমৎকৃত হয়েছিল তার বুদ্ধির প্রাখর্যে।

মরিয়ম যেদিন এসেছিল তার সামনে নালিশ জানাতে সেদিন তার নামটা জানত না দৌলত খাঁ। প্রত্যুষের নামাজ শেষ করে দৌলত খাঁ প্রত্যহ একবার দুর্গটা পরিক্রমণ করত, নিজে ঘুরে দেখত দুর্গের সর্বত্র। সঙ্গে কোন অনুচর বা দেহরক্ষী থাকত না। সেদিনও তেমনি দুর্গ পরিক্রমণে বের হয়েছিল দৌলত খাঁ।

ভোরের আলো তখনো ভালো করে ফুটে ওঠে নি। প্রকৃতি জুড়ে আবছা একটা আলো-আঁধারির পর্দা যেন থির থির করে কাঁপছে। প্রমোদভবনের কাছাকাছি আসতেই একটা হল্লা শুনতে পায় দৌলত খাঁ।

কি ব্যাপার—দাঁড়ায় দৌলত খাঁ। ছেড়ে দাও—ছেড়ে দাও আমায়—নারীকণ্ঠের তীব্র প্রতিবাদ।

দু পা এবারে এগিয়ে যায় দৌলত খাঁ। এবং এগিয়ে যেতেই থমকে দাঁড়ায়।

দুইজন প্রতিহারী এক নারীকে দুহাতে ধরে আছে আর সেই নারী—তাদের

হাত থেকে নিজেকে ছাড়াবার জন্য ছট্‌ফট করছে।

দৌলত খাঁ চিৎকার করে ওঠে, এই—

দৌলত খাঁর কণ্ঠস্বর শুনে তাড়াতাড়ি প্রতিহারী দুজন নারীকে ছেড়ে দিয়ে সসম্ভ্রমে দূরে সরে দাঁড়ায়। আর ঠিক সেই মুহূর্তে নেশায় মত্ত তার পুত্র দিলওয়ার খাঁ টলতে টলতে প্রমোদকক্ষ থেকে বের হয়ে আসে। ধর—ধর—ওকে—

দিলওয়ার এগিয়ে যাচ্ছিল কিন্তু এগুনো তার আর হলো না।

দিলওয়ার—দৌলত খাঁর কণ্ঠস্বরে থমকে দাঁড়াল দিলওয়ার।

ঐ রমণীকে আমি লুণ্ঠন করে এনেছি—দিলওয়ার খাঁ একটা ঢোক গিলে বলল।

আর সেই মুহূর্তে সেই নারী ছুটে এসে দৌলত খাঁর পায়ের সামনে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে—আমি হিন্দু—রাজপুতের মেয়ে—অন্যের বাগ্‌দত্তা—আপনার পুত্র জোর করে কাল আমায় লুণ্ঠন করে এনে আমার ধর্ম নষ্ট করেছে—বিচার করুন—এর বিচার করুন—

ওঠো—উঠে দাঁড়াও—দৌলত খাঁ বলে।

নারী উঠে দাঁড়ায়।

কি নাম তোমার?

চন্দনবাঈ।

কোথায় থাক?

এই নাগোরেই—

তুমি রাজপুতানী?

হ্যাঁ।

এবার দৌলত খাঁ দিলওয়ারের দিকে তাকিয়ে বলে, যাও দিলওয়ার—এখান থেকে যাও—

কিন্তু আব্বাজান—

না—কোন কথা নয়। আর একটা কথা মনে রেখো—এ রাজ্যের তুমি ভাবী অধীশ্বর, এখানকার সকলেই তোমার আশ্রিত—আশ্রিতের ধর্ম নষ্ট করলে আল্লাহর ক্ষমা তুমি পাবে না—যাও—

দিলওয়ার পিতাকে সত্যিই ভয় করত। ধীরে ধীরে স্থানত্যাগ করল।

প্রতিহারী দুজনও ইতিপূর্বে দৌলত খাঁর চোখের ইঙ্গিতে ঐস্থান থেকে চলে গিয়েছিল।

ফিরে তাকাল এবারে দৌলত খাঁ চন্দনবাঈয়ের দিকে।

চন্দনবাঈ—

বলুন—

এখন তুমি কি করবে—কোথায় যেতে চাও—

চন্দনবাঈয়ের দু চোখের কোল জলে ভরে আসে। সে বলে, কোথায় যাবো।

হ্যাঁ—বল—কোথায় যেতে চাও—তোমাকে আমি সেখানেই পাঠিয়ে দেবো—তোমার ঘরে ফিরে যেতে চাও কি ?

ঘরে আজ আর আমার স্থান কোথায় ? আমাকে সবাই আজ জাত ও সমাজ থেকে বের করে দেবে—তাছাড়া ধর্মভ্রষ্টা আজ আমি—পরপুরুষ জোর করে কাল রাত্রে আমার ধর্ম নষ্ট করেছে—

তাহলে কি করবে।

মৃত্যু ছাড়া আজ আর আমার দ্বিতীয় পথ কোথায় খাঁ ?

মৃত্যু—সবিস্ময়ে তাকায় দৌলত খাঁ চন্দনবাঈয়ের মুখের দিকে।

হ্যাঁ—

কিন্তু কেন তুমি মৃত্যুকে বরণ করবে ? সমস্ত জীবন এখনো তোমার সামনে পড়ে আছে—

সে জীবনের আর মূল্য কি—কাল সন্ধ্যায় যখন আপনার পুত্রের সৈন্যরা আমাকে জোর করে লুণ্ঠন করে নিয়ে আসে—জীবনের সেইখানেই তো আমার শেষ হয়ে গিয়েছে—

না চন্দনবাঈ—জীবনটা কি এত সহজে শেষ হয়ে যায় কিন্তু তুমি কি বলছিলে না—একজনের বাগ্‌দত্তা তুমি—

হ্যাঁ।

কি নাম তার ?

রণবীর সিংহ।

তোমরা নিশ্চয়ই পরস্পরের সঙ্গে অনেক দিন ধরে পরিচিত ?

হ্যাঁ—বলতে গেলে আমাদের পরিচয় কৈশোরকাল থেকেই।

সে তোমায় ভালবাসে খুব, তাই না ?

চন্দনবাঈ মাথা নিচু করে।

সেও তোমাকে গ্রহণ করবে না ?

চন্দনবাঈ মাথা নীচু করে, কোন জবাব দেয় না। চোখের কোল দুটি বুঝি জলে ঝাপসা হয়ে যেতে চায়।

কি—জবাব দিচ্ছ না যে—আমার কিন্তু মনে হয় সে নিশ্চয়ই তোমায় গ্রহণ করবে—তোমাদের এতদিনকার ভালবাসা।

চন্দনবাঈ নীরব।

শোন, মরতে তোমাকে আমি দেবো না। তুমি এই দুর্গে থাক—রণবীরকে আমি ডেকে পাঠাচ্ছি—তার সঙ্গেই তুমি যাবে।

চন্দনবাঈ পূর্ববৎ চুপ করে থাকে। চোখের জল গোপন করবার জন্য মুখটা ঘুরিয়ে নেয়।

কিন্তু রণবীর এলো না। যে লোক গিয়েছিল দৌলত খাঁর কাছ থেকে সে ফিরে এলো।

সে এসে বললে, রণবীর এলো না।

এলো না। কেন ?

সে বললে—

কি ?

অন্যের অঙ্কশায়িনী হয়েছে নাকি যে নারী সে আজ জাতিচ্যুত—ধর্মচ্যুত—তার মুখদর্শন করাও পাপ। বলেছে চন্দনবাঈ যেন বিষ খেয়ে বা আগুনে পুড়ে মরে।

দৌলত খাঁ লক্ষ্য করে নি—ইতিমধ্যে কখন একসময় চন্দনবাঈ তার পশ্চাতে এসে দাঁড়িয়েছে। সেই—সেই ব্যবস্থাই করুন—কিছু বিষ আমাকে এনে দিন।

চন্দনবাঈয়ের কথায় তার দিকে ফিরে তাকায় দৌলত খাঁ। বলে, কেন—কেন তুমি বিষ খাবে চন্দনবাঈ। যে পুরুষ তার নিজের বাগ্‌দত্তাকে অন্য পুরুষের আক্রমণ থেকে রক্ষা করতে পারে না—বিষ যদি কারো খেতে হয় তো তারই খাওয়া উচিত। কাপুরুষ, কাপুরুষরাই ঐ ধরনের কথা বলে—

কথাটা তো মিথ্যে নয় মিথ্যে তো বলে নি দৌলত খাঁ।

জীবনকে তুমি নতুন করে গড়ে তোল। পারবে না।

পারবো খাঁ—

তবে কখনো ভুলেও আর মৃত্যুর কথা চিন্তা করবে না ?

চন্দনবাঈ বলে, না। মরব না আমি—

চন্দনবাঈয়ের শান্ত চোখের তারায় যেন আগুনের ফুলকি দেখা দেয়, সত্যিই তো, কেন সে মরবে। কোন্ দুঃখে সে মরবে। তাছাড়া—

যে শয়তান কাল রাত্রে তাকে জোর করে ধরে নিয়ে এসে তার নারীত্বকে তার জীবনের সমস্ত স্বপ্নকে ধুলোয় লুটিয়ে দিয়েছে সেই শয়তানকে সে ছেড়ে দেবে ? প্রতিশোধ নেবে না তার উপর ? দিলওয়ার খাঁ। হ্যাঁ—দিলওয়ার খাঁ—মরবে সে নিশ্চয়ই—কিন্তু মরবার আগে ঐ নরাধমকে সে উচিত শিক্ষা দিয়ে যাবে। একটা ক্রুর প্রতিজ্ঞা তার অন্তরের মধ্যে যেন আগুনের শিখার মত লক লক করে ওঠে।

কি ভাবছো চন্দনবাঈ ?

দৌলত খাঁর প্রশ্নে যেন চমকে ওঠে চন্দনবাঈ, হ্যাঁ—

কি করবে তা হলে এবারে তুমি ? রণবীর যখন তোমাকে গ্রহণ করল না, তোমার আত্মীয়েরা কি—

না—তারাও করবে না জানি আমি।

তাহলে কোথায় যাবে ?

কোথায় যাবো।

হ্যাঁ—

জানি না তো।

ইচ্ছা করলে অবিশ্যি—

বলুন।

তুমি আমার এখানেই থাকতে পার।

আপনার এখানে।

হ্যাঁ—আমি কথা দিচ্ছি কেউ তোমার অসম্মান করবে না—

চন্দনবাঈ মৃদু হাসে। অসম্মান। হায় রে, আর কে তাকে নতুন করে অসম্মান করবে। এক নারীর চরম লাঞ্ছনার পর আর কি বাকী রইলো।৷ তাছাড়া দিলওয়ার খাঁ। তার দু চোখে বুঝি আবার সেই আগুন ঝিলিক দিয়ে ওঠে। সে বলে, তাই হবে, আমি এখানেই থাকবো।

খুব খুশি হলাম—

আর—আজ থেকে আপনাদের ধর্মকেই আমি আশ্রয় করবো।

সত্যি বলছো।

হ্যাঁ।

শোভানাল্লা। তাহলে তোমার ঐ চন্দনবাঈ নাম আর নয়—

তবে কি নাম ?

তোমাকে আজ থেকে আমি মরিয়ম বলে ডাকব।

মরিয়ম।

হ্যাঁ, মরিয়ম।

চন্দনবাঈ শান্ত কঠিন গলায় বলে, বেশ—তাই হোক খাঁ সাহেব—

চন্দনবাঈ মরিয়ম বিবি হলো।

তার জন্য আলাদা মহালের ব্যবস্থা হলো ঐ দুর্গেই।

একদিন অকস্মাৎ মরিয়মের মহলে এসে হাজির দৌলত খাঁ।

মরিয়ম—

বলুন।

তোমার এখানে কোন কষ্ট হচ্ছে না তো ?

না—খুব সুখেই আমি আছি—

কেউ আর বিরক্ত করে নি ?

না।

আচ্ছা একটা কথা আমি শুনলাম তোমার সম্পর্কে—

কি খাঁ সাহেব ?

তুমি নাকি নৃত্য-গীতে অপূর্ব পারদর্শিনী—এবং উদ্যানে একদিন লুকিয়ে আমার পুত্র তোমার নৃত্য-গীত দেখে মুগ্ধ হয়েই তোমাকে লুণ্ঠন করে এনেছিল—

মরিয়ম কোন জবাব দেয় না—চুপ করে থাকে।

কথাটা মিথ্যা মরিয়ম ?

একজনের কাছে আমি নৃত্য-গীত শিক্ষা করেছিলাম—

কে সে ?

সে এক নারী—

একদিন আমাকে তোমার নৃত্য-গীতে পরিতৃপ্ত করবে না ?

আপনার হুকুম হলেই হবে।

না, না—হুকুম নয়—অনুরোধ—

সেই দিনই রাত্রে। দৌলত খাঁর বিশ্রামকক্ষে মরিয়ম দৌলত খাঁর সামনে নৃত্য-গীত পরিবেশন করল। মুগ্ধ হলো দৌলত খাঁ। গলার মণিহার বকশিশ দিল মরিয়মকে দৌলত খাঁ, এই নাও তোমার পুরস্কার।

সেই থেকে মধ্যে মধ্যে দৌলত খাঁ আসত মরিয়মের কক্ষে।

আরো মাস চারেক পরে এক রাত্রে—নৃত্য-গীত পরিবেশন করছিল মরিয়ম দৌলত খাঁর সামনে। কিন্তু দৌলত খাঁ যেন কেমন চিন্তিত।

কি হয়েছে খাঁ সাহেব? আপনাকে যেন অত্যন্ত চিন্তিত দেখছি—

সুদূর কাবুল থেকে আমার এক মেহমান এসেছে মরিয়ম—

মেহমান!

হ্যাঁ—মোল্লা মুরশিদ—কাল তার সম্মানের জন্য খানাপিনার ও প্রমোদের আয়োজন করেছি—ভাবছিলাম—

কি খাঁ সাহেব—

তাকে তুমি—

বুঝতে পেরেছি—আপনি নৃত্য-গীতের ব্যবস্থা করুন।

সত্যি বলছো?

হ্যাঁ—ব্যবস্থা করুন।

॥ ২১ ॥

শাগ তার মহিষীর দিকে পুনরায় ফিরে তাকাল। চন্দ্রাবতী—তুমি সাপ নিয়ে খেলা করছ। এখনো বল পার্বতী কোথায়?

তবে শোন। সত্যি কথাই বলব—পার্বতীকে আমি প্রাসাদের গুপ্তদ্বার দিয়ে বের করে দিয়েছি—মৃদু শান্ত কণ্ঠে কথাটা বলে মহিষী চন্দ্রাবতী।

বের করে দিয়েছ। শাগের যেন তারপর কয়েকটা মুহূর্ত বাক্যস্ফূর্তি হয় না। শুধু চেয়ে থাকে শাগ মহিষীর মুখের দিকে।

চন্দ্রাবতী ধীরে ধীরে তার কথাটার পুনরাবৃত্তি করে, বলে, হাঁ, দিয়েছি।

সত্যিই চন্দ্রাবতী যেদিন জানতে পারল সত্যিকারের ব্যাপারটা, জানতে পারল যেদিন পার্বতী বীরেন্দ্র সিংহকে সমস্ত প্রাণ দিয়ে সত্যিই ভালবাসে—নারী হয়ে আর এক নারীর ভালবাসাকে মিথ্যা হয়ে যেতে দিতে পারে নি সে।

বীরেন্দ্র সিংহকে বন্দী করার পরই অন্দরণে সংবাদটা পৌঁছায়। পার্বতী জানতে পারে তার খুল্লতাতর আক্রোশে পড়ে বীরেন্দ্র আজ কারারুদ্ধ। বন্দী। এবং সঙ্গে সঙ্গে তার খুল্লতাত শাগের মনের সত্যিকারের চেহারাটা যেন পার্বতীর কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

সংবাদটা এনেছিল এক দাসী। পার্বতীর জন্য পৃথক একটি কক্ষের ব্যবস্থা হয়েছিল।

পার্বতী নিজেও কিছুটা নির্জনতা চেয়েছিল। তাই এ নিভৃত কক্ষটি পেয়ে সে খুশিই হয়েছিল। আর তাছাড়া সে মনে মনে ভেবেছিল কয়দিনই বা—

বীরেন্দ্র সিংহ ও সে তো শীঘ্রই এখান থেকে চলে যাবে—এখানে কিছু থাকতে তারা আসে নি। কিন্তু যখন ক্রমে একদিন দুদিন করে মাসাধিক কাল অতিবাহিত হয়ে গেল সে একটিবারের জন্য বীরেন্দ্র সিংহের দেখা পেল না। রীতিমত চিন্তিত হয়ে উঠলো পার্বতী। চেষ্টা করলো নানাভাবে একটিবার বীরেন্দ্রর সঙ্গে দেখা করবার কিন্তু বুঝল উভয়ের দেখা-সাক্ষাতের কোন সম্ভাবনাই নেই। মনটা বুঝি সত্যিসত্যিই তার অস্থির হয়ে ওঠে তখন। এবং ঐ সঙ্গে একটা দুশ্চিন্তাও যেন মনের মধ্যে ধোঁয়ার মত জমে উঠতে থাকে। অথচ কথাটা কাউকে প্রকাশ করতেও পারে না।

বীরেন্দ্র সিংহের সংবাদ পাওয়ার চেষ্টা করে—কিন্তু পায় না। বহির্মহলের কোন সংবাদই যেন অন্দরণে এসে পেঁছায় না—বিশেষ করে বীরেন্দ্র সিংহের কোন সংবাদ যেন আসেই না। অন্দরণের দাসীদের সাহায্যে সংবাদ সংগ্রহের চেষ্টা করে কিন্তু তারাও বীরেন্দ্র সিংহের কোন সংবাদ এনে দিতে পারে না।

অবশেষে খুল্লতাতর যুদ্ধার্থে নাগোর যাত্রার পর হঠাৎ একদিন সংবাদ পেল পার্বতী, বীরেন্দ্র সিংহ বন্দী। শাগ তাকে কারারুদ্ধ করেছে। কেন করেছে কি বৃত্তান্ত আর কিছুই জানতে পারল না পার্বতী।

কিন্তু সংবাদটা শুনেই পার্বতী অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়ে। এবং অনন্যোপায় হয়ে শেষ পর্যন্ত রাজমহিষীর কাছে ছুটে যায়।

রাজ-অন্তঃপুরে একমাত্র মহিষী চন্দ্রাবতীই তাকে স্নেহ করত। চন্দ্রাবতীর নিজের কোন সন্তান ছিল না—যদিও সপত্নীদের সন্তান ছিল। সন্তানহীনা। নারীর মধ্যে তাই একটা অতৃপ্ত অপত্যস্নেহ তাকে সর্বক্ষণ পীড়ন করেছে—পার্বতীর পরিচয় পেয়ে পার্বতীকে দু হাতে বুকের মধ্যে টেনে নিয়েছিল চন্দ্রাবতী।

পার্বতীরও বড় ভাল লেগেছিল মহিষীকে। এবং ক্রমশঃ পার্বতী বুঝতে পেরেছিল এই প্রাসাদে একটি জায়গা আছে যেখানে সে অন্তত অকপটে তার মনকে খুলে ধরতে পারে। যেখানে বিশ্বাস আর আশ্বাস দুই আছে। কিন্তু তথাপি কেন যেন পার্বতী মহিষীর কাছে বীরেন্দ্রর কথা বলতে পারে নি। একটা দুর্নিবার লজ্জা যেন তার কণ্ঠরোধ করেছে।

আর শাগও মহিষীর কাছে বীরেন্দ্র সম্পর্কে কোন কথা বলে নি। সে কেবল চন্দ্রাবতীকে বলেছিল—উদ্ধতপ্রকৃতি গাঙ্গের ব্যবহারে বিরক্ত হয়ে তার একমাত্র ভগিনী পার্বতী যোধপুর ছেড়ে চলে এসেছে।

মহিষী চন্দ্রাবতী কথাটা শুনে একটু যেন বিস্মিতই হয়েছিল। এবং পার্বতীকে চুপ করে থাকতে দেখে সত্য বলেই সেটা চন্দ্রাবতী মেনে নিয়েছিল।

পার্বতী ঐ সময় চুপ করে ছিল সত্য। মনটা তখনো তার সহোদরের ব্যবহারে তিক্ত হয়ে আছে। গাঙ্গের বীরেন্দ্র সিংহকে অপমানটা বুকের মধ্যে তখনো তার জ্বলছে। একমাত্র সহোদরার মনের দিকে তাকাল না গাঙ্গ একবারও—বীরেন্দ্র

সিংহের পদমর্যাদাটাই সে কেবল দেখল—বিচার করল। তার বংশগৌরব—মানুষ হিসাবে তার পরিচয় কিছুই সে বিচার করে দেখল না—দেখতে চাইল না।

কিন্তু তাদের দাদু বেঁচে থাকলে নিশ্চয় তিনি বীরেন্দ্র সিংহকে প্রত্যাখ্যান করতেন না—তার মর্যাদাকে স্বীকার করে নিতে কুণ্ঠা বোধ করতেন না।

কিন্তু আজ বীরেন্দ্র সিংহ কারারুদ্ধ—সংবাদটা শুনে পার্বতী কোন দিকে কোন আশার আলোই যখন দেখতে পাচ্ছে না—সহসা তার মহিষী চন্দ্রাবতীর কথা মনে পড়ে। ছুটে যায় সে সোজা চন্দ্রাবতীর মহালে। একজন দাসী চন্দ্রাবতীর কেশ পরিচর্যা করছিল।

পার্বতী এসে কক্ষমধ্যে প্রবেশ করল—চোখেমুখে তার সুস্পষ্ট উদ্বেগ।

কি—কি রে কি হয়েছে পার্বতী—মুখটা অমন শুকনো কেন মা!

আপনার সঙ্গে আমার কিছু কথা ছিল—নিভৃতে কথাটা বলতে চাই—

চন্দ্রাবতীর ইঙ্গিতে অতঃপর দাসী কক্ষ ছেড়ে চলে যায়।

কি হয়েছে মা?

আর বিলম্ব বা লজ্জার সময় নেই। দ্বিধা বা সংকোচেরও সময় নেই। পার্বতী বীরেন্দ্র সিংহ ও তাদের রাজ্য হতে নির্বাসনের কথা ও এখানে তারা কেমন করে এসে পৌঁছল সব কথাই বলে গেল অকপটে।

সব শুনে মহিষী চন্দ্রাবতী বলে, এ কথা তুমি আমাকে আগে বল নি কেন পার্বতী।

পারি নি - আমি বলতে পারি নি—কিন্তু আজ বীরেন্দ্র কারারুদ্ধ হয়েছে শুনে—

কারারুদ্ধ হয়েছে?

হ্যাঁ।

সে সংবাদ কোথায় তুমি পেলে?

আমি জানি—আপনি সংবাদ নিয়ে দেখুন—

চন্দ্রাবতী আর কালবিলম্ব করে না—সঙ্গে সঙ্গে সংবাদের জন্য লোক পাঠায়। এবং একটুক্ষণ পরেই সংবাদ নিয়ে আসে সে—কথাটা মিথ্যা নয়।

সত্যিই বীরেন্দ্র সিংহ রাজরোষে বন্দী।

আজ প্রায় সাত দিন হলো সে বন্দী।

চন্দ্রাবতী পার্বতীকে সান্ত্বনা দেয়, তুমি কিছু ভেবো না মা—আমাকে একটু তুমি ভাবতে দাও—আর একটা কথা—

বলুন।

তুমি যে ব্যাপারটা জানতে পেরেছো কাউকে একথা বলো না—জানতে দিও না।

না—জানবে না কেউ।

যাও—নিজের ঘরে যাও, আমি ব্যবস্থা করছি।

পার্বতী চলে গেল।

সেই রাত্রেই—মধ্যরাত্রি। সমস্ত প্রাসাদ নিদ্রার ঘোরে আচ্ছন্ন। পার্বতী একা তার কক্ষমধ্যে জেগে বসেছিল। কক্ষের মধ্যে একটি প্রদীপ জ্বলছে—সুদৃশ্য প্রদীপদানে। প্রদীপের মৃদু আলোয় কক্ষটি স্বল্পালোকিত। খোলা বাতায়ন-পথে মৃদু মৃদু নৈশ বায়ু কক্ষমধ্যে প্রবেশ করছে।

মহিষী চন্দ্রাবতী বলেছে—যা হোক একটা সে উপায় করবেই—

কি উপায় করবে সে? একা নারী সে।

তাছাড়া দুদিন চলে গেল। বন্ধ দরজার গায়ে মৃদু করাঘাত শোনা গেল যেন অস্পষ্ট।

চকিতে ফিরে দাঁড়াল পার্বতী—এত রাত্রে কে তার শয়নকক্ষের দরজায় করাঘাত করছে।

পার্বতী দরজা খোলে না—কান পেতে রাখে।

আবার মৃদু করাঘাত। এবং এবারে আর অস্পষ্ট নয়—বেশ স্পষ্ট।

পার্বতী দরজা খোল আমি রাজমহিষী—কে যেন চাপা গলায় তারই নাম ধরে ডাকছে।

পার্বতী এগিয়ে গিয়ে দরজাটা খুলে দেয়।

কক্ষের সামনে অলিন্দ অন্ধকার। সেই অন্ধকারে নজরে পড়ে কে যেন তার কক্ষের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছে।

কে—

চুপ—আমি।

আপনি—

হ্যাঁ—এসো আমার সঙ্গে।

কোথায়?

এসো—

মহিষী চন্দ্রাবতী পার্বতীর একটা হাত চেপে ধরে তার পর অন্ধকার অলিন্দ দিয়ে এগিয়ে চলে—নিঃশব্দ পদসঞ্চারে। এ অলিন্দ থেকে অন্য অলিন্দ—একটার পর একটা পার হয়ে যায় দুজনে তার পরই ছোট একটি দুয়ার।

দুয়ার খুলতেই একঝলক নৈশ বায়ু চোখেমুখে এসে ঝাপটা দেয়। মাথার উপরে রাত্রির নক্ষত্রখচিত আকাশ।

পার্বতী—

বলুন—

সোজা সামনের দিকে এগিয়ে যাও—পাহাড়ী পথ ধরে নীচে নেমে গেলে অর্ধক্রোশ দূরে একটি মন্দির দেখতে পাবে—সেখানে সোজা চলে যাও—আর দেরি করো না।

কিন্তু—

পার্বতী ইতস্ততঃ করে।

মহিষী মৃদু হাসে, কি হলো?

না।

যাবে না?

না।

কেন?

এভাবে আমার একার মুক্তি তো চাই নি।

আবার হাসে রাজমহিষী, ভয় নেই যাও—সেখানে অপেক্ষা করো—বীরেন্দ্র একটু পরেই সেখানে যাচ্ছে।

পার্বতী তাড়াতাড়ি মহিষীর পদধূলি নেয়। তার মাথায় হাত দিয়ে মহিষী আশীর্বাদ করে।

আর জন্মে নিশ্চয়ই তুমি আমার মা ছিলে,পার্বতী বলে।

এজন্মে বুঝি নই?

এজন্মেও—

পাগলী—যা তাড়াতাড়ি—আর দেরি করিস না।

অন্ধকারে পার্বতী মিশে গেল। দরজাটা বন্ধ করে রাজমহিষী দ্রুত ফিরে আসে। এবারে সোজা বহির্মহলের দিকে যায়।

বহির্মহলের দরজায় দাঁড়িয়ে ছিল সুজিৎ সিং।

মহিষীর আপন ভাই—শাগের অন্যতম সৈনাধ্যক্ষ।

সুজিৎ—

দিদি—

সব ব্যবস্থা করেছো?

হ্যাঁ দিদি।

চলো তবে কারাগারে—

দুজনে অতঃপর প্রাসাদের অভ্যন্তরে যে বিশেষ বন্দীদের জন্য সুদৃঢ় কারাকক্ষ—সেখানে গিয়ে উপস্থিত হয়। রাতপ্রহরী অঘোরে ঘুমোচ্ছে অতিরিক্ত সিদ্ধির প্রভাবে। তাকে শরবতের সংগে সিদ্ধি খাওয়ানো হয়েছিল আগে থাকতেই। তার কোমর থেকে কারাকক্ষের চাবি নিয়ে সুজিৎ সিং কক্ষের দরজা খুলে ফেলল।

বীরেন্দ্র জেগেই ছিল। বন্দী হবার পর থেকে তার চোখ থেকে বুঝি ঘুম চলে গিয়েছিল। চকিতে বীরেন্দ্র উঠে দাঁড়ায়।

কে—

বীরেন্দ্র সিংহ—

কে—

রাজমহিষী তোমার সামনে—সুজিৎ সিং বলে।

বীরেন্দ্র ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারে না—কেমন যেন বিহ্বলভাবে তাকায়।

উনি তোমাকে মুক্তি দিচ্ছেন কারাকক্ষ থেকে।

মুক্তি—

হ্যাঁ—যাও—আর দেরি করো না—দক্ষিণে পাহাড়ের সানুদেশে যে ছোট ভাঙ্গা মন্দিরটি আছে পার্বতী সেখানে তোমার জন্য অপেক্ষা করছে—আর

একটি অশ্বও পাবে সেখানে—গাছের ডালে বাঁধা আছে—আর এই নাও তরবারি, যাও—

বীরেন্দ্র যেন আনন্দে নেচে ওঠে। লাফিয়ে ওঠে সে। ছুটে অতঃপর সে বের হয়ে যাচ্ছিল কিন্তু হঠাৎ কি ভেবে ফিরে দাঁড়ায় এবং সহসা নীচু হয়ে মহিষীর পদধূলি নেয়, মা—

রাজমহিষীর চোখে জল।

সুজিৎ সিংহ বলে, যাও আর দেরি করো না—বিলম্বে বিপদ ঘটতে পারে—

বীরেন্দ্র কক্ষ হতে নিষ্ক্রান্ত হয়ে যায়।

পার্বতী একাকিনী ভাঙ্গা মন্দিরের সামনে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে ছিল। ক্ষীণ সতর্ক পদশব্দ প্রথমে শুনতে পেল সে। তার পরই বীরেন্দ্রর কণ্ঠস্বর।

পার্বতী—

আঃ কত দিন—কতদিন পরে বীরেন্দ্রর কণ্ঠস্বর।

বীরেন্দ্র—

ছুটে যায় সামনে পার্বতী।

বীরেন্দ্রর প্রসারিত দু' বাহুর ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে পার্বতী।

বীরেন্দ্র—

পার্বতী —

দুজনারই চোখে জল।

কোথায় যাবো আমরা বীরেন্দ্র ? পার্বতী শুধায়।

চিতোরে।

অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করে অতঃপর দুজনে দেখতে দেখতে অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে যায়। অশ্বক্ষুরধ্বনি অন্ধকারে মিলিয়ে যায়।

॥ ২২ ॥

মেওয়ারের রানা—রায়মলের তিন পুত্র। ঝালী মহিষীর দুই পুত্র—সংঘ বা সংগ্রাম সিংহ—পৃথ্বীরাজ—আর জয়মল অন্য এক মহিষীর সন্তান।

ছোটবেলা হতেই তিন রাজপুত্র—তিন ভাইয়ের মধ্যে একটা বিদ্বেষের ভাব গড়ে উঠেছিল—আর তার জন্য প্রকৃত পক্ষে দায়ী ছিল পরোক্ষে বোধ হয় রায়মল স্বয়ং—ওদের পিতাই। এবং ক্রমে যত তারা বড় হয় সেই বিদ্বেষের বিষ তাদের পরস্পরের প্রতি যেন বুকের মধ্যে ফেনিয়ে ফেনিয়ে উঠতে থাকে।

কথিত আছে—তিন রাজপুত্র প্রত্যেকেই সাহসী—প্রত্যেকেই সুযোদ্ধা। চারণ কবি ওদের তিন ভাইকে নিয়ে ছড়া গেঁথেছিল।

পৃথ্বীরাজের মত সাহসী নাকি হয় না—যার একমাত্র তুলনা হয় দিল্লীর চৌহানের সঙ্গে—শিশোদীয়দের গৌরব—দুঃসাহসী—দুর্মদ।

সিংহাসনের ভাবী উত্তরাধিকারী—সংগ্রাম সিংহ—তার ভাইয়ের সঙ্গে কোন

তুলনাই হয় না। সকলের মুখে বিশেষ করে রাজকবির মুখে ঐ কথা শুনে শুনে দুই ভাই—পৃথ্বীরাজ ও সংগ্রাম সিংহের মধ্যে একটা পরস্পরের প্রতি গোপন ঈর্ষা জন্মেছিল। পৃথ্বীরাজ মনে মনে ভাবত—মেওয়ারের রানা হবার—সিংহাসন পাবার যোগ্যতা একমাত্র তারই। সংগ্রাম সিংহ বয়সে বড় হলেও—যোগ্যতর ব্যক্তি দুজনার মধ্যে সেই পৃথ্বীরাজই।

একদিন তাদের খুল্লতাত রণমলের সঙ্গে বসে বসে তিন ভাই—ঐ বিষয়টি নিয়েই আলোচনা করছিল—কার সিংহাসনে সত্যিকারের অধিকার। কার সিংহাসনে বসা উচিত।

চাচাজী—তুমি বল—কার সত্যিকারের যোগ্যতা আছে মেওয়ারের সিংহাসনে বসবার—তিন ভাইই জিজ্ঞাসা করে।

রণমল চুপ করে মিটি মিটি হাসে—কোন স্পষ্ট জবাব দেয় না। এমনি করেই দিন কাটছিল। এমন সময় একদিন।

কথিত আছে—জ্যেষ্ঠ সংগ্রাম সিংহই একদিন প্রস্তাব করে—উদয়পুর থেকে পঞ্চক্রোশ দূরে নাহারা মগরুতে যে ব্যাঘ্র পর্বতে চারুণী দেবীর মন্দির আছে তার সেবিকার কাছে তারা যাবে।

ত্রিকালজ্ঞ সেই বৃদ্ধা—অদ্ভুত নাকি তার ভবিষ্যদ্বাণী।

সংগ্রামের কথায় অন্য দুই ভ্রাতা সম্মত হয় সঙ্গে সঙ্গে। বলে, তাই হোক, চল। চাচাজী, আপনিও আমাদের সঙ্গে চলুন। রণমল কি আর করেন—ওদের সংগে যেতে স্বীকৃত হন।

এক দ্বিপ্রহরে অশ্বারোহণ করে চারজনে চারুণী দেবীর মন্দিরের দিকে যাত্রা করে। দ্রুত অশ্বধাবন করে প্রথমেই পৃথ্বীরাজ ও জয়মল মন্দিরে গিয়ে পৌঁছায়।

মন্দিরাভ্যন্তরে বৃদ্ধা সেবিকা বসে ছিল। তারা দুই ভাই মন্দিরাভ্যন্তরে প্রবেশ করে বৃদ্ধার সামনে পাশাপাশি উপবেশন করে।

একটু পরে রণমল ও সংগ্রাম সিংহ সেখানে এসে পৌঁছায়। তারা বেদীর এক পাশে উপবেশন করল পাশাপাশি।

আপনার কাছে আমরা এসেছি একটা প্রশ্নের মীমাংসার জন্য—পৃথ্বী বলে।

সেবিকা প্রশ্ন করে, কি প্রশ্ন?

কে আমাদের মধ্যে সিংহাসনের উত্তরাধিকারী গণনা করে বলুন।

বৃদ্ধা প্রশ্নটা শুনে কোন কথা না বলে, তিন ভাইয়ের মুখের দিকে পর পর কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলো, তার পর কোন কথা না বলে আঙুল তুলে অদূরে উপবিষ্ট সংগ্রাম সিংহর দিকে দেখিয়ে দেয়।

ইঙ্গিত করার সঙ্গে সঙ্গে যেন মুহূর্তে দপ্ করে আগুন জ্বলে উঠলো।

অসি কোষমুক্ত করে মুহূর্তে ক্ষুধিত একটা ব্যাঘ্রের মত পৃথ্বী তার জ্যেষ্ঠর উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো।

সংগ্রামের একটা চোখে আঘাত লাগে। সঙ্গে সঙ্গে সেও মুক্ত অসি হাতে

পৃথ্বীর আক্রমণকে প্রতিরোধ করে।

সেই মন্দিরের মধ্যে অসিযুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। আঘাতে আঘাতে দুই ভাই —দুই ভাইকে জর্জরিত করে তোলে।

রণমল সেদিন সেখানে উপস্থিত না থাকলে হয়ত একজনের প্রাণহানি হত—কিন্তু তিনি মাঝখানে পড়ে কোনমতে তাদের প্রতিনিবৃত্ত করেন।

বৃদ্ধা ব্যাপার সঙ্গীন দেখে মন্দির থেকে ছুটে প্রাণভয়ে পালিয়ে গিয়েছিল ইতিমধ্যেই।

বেশী আহত হয়েছিল সংগ্রাম সিংহ। তার আহত চক্ষু দিয়ে রক্ত গড়িয়ে পড়ছিল। সে কোনমতে মন্দির থেকে বের হয়ে অশ্বারোহণে দ্রুত স্থানত্যাগ করে —শুধু স্থানত্যাগই নয়—কোন মতে সে চতুর্ভুজা দেবীর আশ্রমে পেঁছে উদাবৎ সম্প্রদায়ের কাছে নিজেকে সমর্পণ করে।

চতুর্ভুজার পবিত্র মন্দিরের সীমানায় পৃথ্বীর আক্রোশ পেঁছাতে পারে না সংগ্রাম জানত। তবে পৃথ্বীও আহত হয়েছিল। তার ক্ষমতা ছিল না সংগ্রামকে আর অনুসরণ করার।

জয়মল তার জ্যেষ্ঠকে অনুসরণ করে।

কিন্তু চতুর্ভুজার মন্দির সীমানায় তাকে প্রবেশ করতে দেয় না রাঠোর বীরেরা।

রাঠোর সর্দাররা চতুর্ভুজার মন্দির এলাকা পাহারা দিত। তারা তাদের আশ্রিত —আহত অতিথিকে রক্ষা করবার জন্য এগিয়ে আসে সঙ্গে সংগে।

দুজন রাঠোর জয়মলের হাতে প্রাণ দেয় কিন্তু শেষ পর্যন্ত রাঠোরদের মিলিত আক্রমণে জয়মলকে পালাতেই হয়।

পৃথ্বীরাজ আহত অবস্থায় রাজধানীতে ফিরে এল।

আর সংগ্রাম সিংহ আত্মগোপন করেই রইল। একটি চোখ তার কানা হয়ে গিয়েছিল। এবং শেষ পর্যন্ত হৃতসর্বস্ব কানা জ্যেষ্ঠকুমার এক কৃষক পল্লীতে গিয়ে আশ্রয় নিয়ে তাদের মেষ চরিয়ে দিন কাটাতে লাগলো।

দিন যায়। ইতিমধ্যে কয়েকজন রাজপুত আত্মগোপনকারী সংগ্রাম সিংহকে চিনতে পেরে তাকে নিয়ে এসে আশ্রয় দেয়, অস্ত্র—অশ্ব দেয়। এবং শেষ পর্যন্ত তাকে তারা আজমীঢ়ের নিকটবর্তী শ্রীনগরে নীচজাতীয় প্রমারা সর্দার কুমীচাঁদের হাতে তুলে দেয়। কুমীচাঁদ সাগ্রহে সংগ্রাম সিংহকে আশ্রয় দেয়।

কথিত আছে, ঐ সময় একদিন বিচিত্র এক ব্যাপার ঘটে। পরিশ্রান্ত হয়ে একদিন মধ্যাহ্নে সংগ্রাম সিংহ এক বিরাট বটবৃক্ষের নীচে শুয়ে থাকতে থাকতে কখন ঘুমিয়ে পড়েছে।

ঘুমের মধ্যে সূর্য পশ্চিমে হেলে পড়েছে—বৃক্ষের ছায়া সরে গিয়ে রৌদ্র এসে পড়েছে ঘুমন্ত সংগ্রাম সিংহের মুখে। ঐ সময় একজন লোক ছাগল চরাচ্ছিল অদূরে মাঠের মধ্যে।

হঠাৎ তাদের মধ্যে একজনের নজর পড়ল—বিরাট এক গোখরো সাপ ঐ বৃক্ষকোটর থেকে বের হয়ে এসে ঘুমন্ত সংগ্রাম সিংহের মুখের ওপরে ফণা বিস্তার

করে ধরল—যেন সংগ্রাম সিংহের মুখটা রৌদ্রতাপ থেকে আড়াল করে।

গাছের ওপরে ডালে একজোড়া সাদা কালো রংয়ের পাখী বসে ছিল, তারা কিচিরমিচির শব্দ করে ওঠে।

ঐ যারা ছাগল চরাচ্ছিল তাদের মধ্যে একজন ছিল যার নাম মারু—সে নাকি পাখীর ভাষা বুঝত। পাখীরা নাকি বলাবলি করছিল ঐ সংগ্রামই একদিন দেশের রাজা হবে। অর্থাৎ মেওয়ারের রানা হবে।

মারু এসে প্রমারা সর্দারের কাছে গোপনে কথাটা প্রকাশ করল।

কুমীচাঁদ কথাটা শুনে কিছু বললে না। কিন্তু অতঃপর কৌশলে সে তার একমাত্র কন্যার সঙ্গে সংগ্রামের বিবাহ দিয়ে দিল। কুমীচাঁদের কন্যা রম্ভাকে সংগ্রাম বিবাহ করে সেখানেই আত্মগোপন করে থেকে গেল।

ইতিমধ্যে রানা যখন তিন ভাইয়ের বিবাদের কথা শুনলেন—সঙ্গে সংগে পৃথ্বীরাজকে ডেকে পাঠালেন।

পৃথ্বীরাজ মাথা নীচু করে পিতার সামনে এসে দাঁড়াল।

তোমাকে আমি নির্বাসিত করছি এ রাজ্য থেকে—কাল প্রত্যুষেই যেখানে খুশি তোমার চলে যাবে।

পরের দিন রাত্রিশেষের আবছা আলো-আঁধারিতে পৃথ্বীরাজ তার পাঁচজন অনুগামী—জেসা সির্নদিল, সিংগুম, আভো, জুনো ও ভাদিলকে নিয়ে রাজ্য ছেড়ে চ'লে গেল—গোদরের বেলোচের দিকে।

পৃথ্বীরাজ নাদোলে এসে পৌঁছাল তার অনুচরদের নিয়ে। সঙ্গে একটি কপর্দক নেই। এক বণিকের কাছে হাতের মূল্যবান অঙ্গুরীয়টি বিক্রী করে অর্থ সংগ্রহ করল।

বণিক কিন্তু সেই অঙ্গুরীয় দেখেই চিনতে পারে পৃথ্বীরাজকে। চিতোরের রাজকুমার—সসম্ভ্রমে অভিনন্দন জানায় বৃদ্ধ বণিক তাড়াতাড়ি উঠে।

চুপ।

পৃথ্বীরাজ অঙ্গুলি সংকেতে বণিককে চুপ করিয়ে দেয়—আমার পরিচয়—আমার কথা কেউ যেন না এখানে জানতে পারে—

বিস্মিত বণিক শুধায়, কেন?

কারণ আছে—পরে তোমাকে সব বলবো।

বেশ তাই বলবেন কুমার। আমি আপনার কি কাজে লাগতে পারি বলুন?

তুমি আমাকে সাহায্য করতে চাও?

আদেশ করুন কুমার—

পিতা কর্তৃক পিতৃরাজ্য থেকে বিতাড়িত হওয়ায় বুকের মধ্যে যেন দুঃসহ একটা অপমানের আগুন জ্বলছিল পৃথ্বীর। সে যে সত্যিই অনুপযুক্ত নয়—সিংহাসন দাবী করবার তার যোগ্যতা আছে সেকথা সে প্রমাণ করে দেবেই।

আদিবাসী মীনা সম্প্রদায়রাই চিরদিন ওখানকার প্রকৃত বাসিন্দা ছিল—রাজপুতরা মধ্যে মধ্যে তাদের আক্রমণ করে লুটতরাজ করে নিয়ে যেত।

বণিকের নাম ওঝা। ওঝার পরামর্শমত পৃথ্বীরাজ তার অনুগামীদের নিয়ে মীনা সম্প্রদায়ের সঙ্গে মিশে গেল—এবং সময় ও সুযোগের অপেক্ষা করতে লাগল।

শিকার উৎসব—আহেরিয়া—রাজস্থানের বিশেষ জাঁকজমক-পূর্ণ উৎসব—মীনারা সবাই উৎসবের আনন্দে মেতে উঠেছে—নগর ছেড়ে বনের মধ্যে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে।

মীনা সর্দার অনুপস্থিত। সেই সুযোগে পৃথ্বীরাজ নগরে যে সব মীনারা ছিল তাদের নৃশংস ভাবে হত্যা করে—গৃহে গৃহে আগুন ধরিয়ে দিয়ে সমস্ত নগর অধিকার করে নিল। এবং গোটা গোদোয়ারাই জয় করে নিল পৃথ্বীরাজ। সান্দা সোলাংকির পালিতা কন্যাকে বিবাহ করে পৃথ্বীরাজ—এবং ওঝা ও সোলাংকিকে গোদোয়ারার শাসনকর্তা নিযুক্ত করে। গোদোয়ারা জয় করে পৃথ্বীরাজ পুনরায় তাঁর পিতার আস্থাভাজন হয়।

ইতিমধ্যে জয়মল নিহত হয়েছিল—রানা পৃথ্বীরাজকে আবার রাজধানীতে ফিরে আসবার জন্য বলেন।

জয়মল আকস্মিকভাবে নিহত হওয়ার পিছনে ছিল তার অবিমৃষ্যকারিতা। শুরতান তার রাজ্য হারিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিল ঐ সময়, জয়মল তাকে সাহায্য করে—তার হৃতরাজ্য পূর্ণ অধিকার—এবং তার প্রতিদান হিসাবে জয়মল শুরতানের অপরূপ লাবণ্যময়ী কন্যা তারাবাঈয়ের পানিপ্রার্থনা করে। শুরতান সানন্দে সম্মত হয়।

কিন্তু রূপমুগ্ধ কুমার বিবাহের পূর্বেই এক রাত্রে চোরের মত শুরতানের কন্যার শয়নকক্ষে গিয়ে প্রবেশ করে। তারাবাঈ জেগে উঠে জয়মলকে তার শয়নকক্ষে দেখতে পেয়ে চিৎকার করে ওঠে।

শুরতান ছুটে আসে। এবং জয়মলকে তার কন্যার কক্ষে দেখতে পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে তরবারির তীক্ষ্ণ অগ্রভাগ বসিয়ে দেয় জয়মলের বুকের মধ্যে। সেই আঘাতেই জয়মলের মৃত্যু হয় ঘটনাস্থলেই।

ঐ ঘটনা যখন ঘটে তখন সংগ্রাম সিংহ কোথায় আছে এবং জীবিত না মৃত তা কেউ জানে না।

পৃথ্বীরাজ রানা কর্তৃক চিতোর হতে বিতাড়িত।

আক্রোশের বশে শুরতান জয়মলকে হত্যা করবার পর তার খেয়াল হয় এ সে কি করল—রানা তো তার এ অপরাধ ক্ষমা করবে না।

কিন্তু ইতিমধ্যে রানার কানে সংবাদটা পৌঁছে গিয়েছিল। রানা বলে পাঠাল, শুরতান পিতা হিসাবে—তার কন্যার মর্যাদা রক্ষার জন্য যা করেছে—তা প্রত্যেক পিতাই করত—অন্যায় সে কিছু করে নি।

সেও করত তাই। রানা তাকে ক্ষমা তো করলই—সোলাংকিও তাকে অর্পণ করল।

ঐ সময় পৃথ্বীরাজের গোদোয়ারা অধিকারের সংবাদ রানার কর্ণগোচর হলো। রানা নির্বাসিত পুত্রকে আবার ডেকে পাঠাল চিতোরে।

আর এক ষড়যন্ত্র ইতিমধ্যে সিংহাসনকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠছিল। মন্দিরের সেবিকা সেদিন যখন সংগ্রাম সিংহকে ইঙ্গিত করে তার ভবিষ্যদ্বাণী করে—ওদের পিতৃব্য রণমল তখন সংগ্রামের পাশেই বসে ছিল।

আজ সংগ্রাম আহত নিরুদ্দিষ্ট—জয়মল নিহত—রণমল মনে মনে ভাবে তবে হয়ত সেদিন সেই বৃদ্ধা তাকেই আসলে ইঙ্গিত করেছিল। সে-ই চিতোরের ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারী।

লোভ বড় সাংঘাতিক। রণমল গোপনে রানার এক জ্ঞাতি বংশধরের সঙ্গে মিলিত হয়ে মালোয়ার সুলতানের সঙ্গে হাত মিলায় এবং তারা বিরাট এক বাহিনী নিয়ে নারি থেকে নিমুচ অধিকার করে ক্রমশঃ চিতোরের দিকে অগ্রসর হয়। রায়মল বিদ্রোহীদের দমন করবার জন্য এগিয়ে যায়।

গাম্ভোরী নদীতীরে দুই দল মুখোমুখি হয়। যুদ্ধে রানা যখন প্রায় হারতে চলেছে, পৃথ্বীরাজ এগিয়ে আসে পিতার সাহায্যের জন্য। রানা ও রণমল তখনো যুদ্ধ করে চলেছে। কিন্তু সন্ধ্যে হয়ে এসেছিল—কাজেই সে-রাত্রের মত যুদ্ধ স্থগিত থাকে। যে যার শিবিরে প্রত্যাবর্তন করে।

রাত গভীর হয়েছে। রণমল শিবিরে একটা খাটিয়ার উপরে বসে ছিল—সর্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত—নাপিত তার ঘাগুলো পরিষ্কার করে ঔষধ লাগাচ্ছে।

পদশব্দ শোনা গেল।

কে ?

রণমল মুখ তুলে তাকাল। সামনেই দাঁড়িয়ে পৃথ্বীরাজ।

পৃথ্বী—

হ্যাঁ, চাচাজী।

এসো—এসো—দীর্ঘদিন পরে তোমায় দেখলাম।

॥ ২৩ ॥

সাদর অভ্যর্থনা জানালেন রণমল ভ্রাতুষ্পুত্র পৃথ্বীরাজকে। বোস—বোস।

পাশেই যে পরিচারিকা দাঁড়িয়ে ছিল তাকে রণমল বললেন, আসনটা এগিয়ে দেবার জন্য। পরিচারিকা আসনটা এগিয়ে দিল। পৃথ্বীরাজ সেই আসনে উপবেশন করলেন।

নাপিত রণমলের দেহের ক্ষতস্থানগুলো পরিষ্কার করে ঔষধ লাগিয়ে দিচ্ছিল, তার কাজ ইতিমধ্যে শেষ হওয়ায় সে উঠে দাঁড়াল।

পৃথ্বীরাজ ঐ সময় বলে, মনে হচ্ছে আজকের যুদ্ধে তুমি খুব বেশী আহত হয়েছ।

রণমল মৃদু হাসলেন।

এখন কেমন বোধ করছো চাচাজী ?

একটু সামান্য ক্লান্ত—তাছাড়া শরীরে কোন গ্লানি নেই বেটা।

আমি এখনো দেওয়ানজী—আমার পিতার সঙ্গে দেখা করি নি—তোমাকেই দেখতে প্রথমে ছুটে এসেছি।

রাত্রের আহার বোধ হয় এখানো তোমার হয় নি ?

না।

খাবে আমার সঙ্গে ?

পৃথ্বীরাজ হেসে বলে, কেন খাবো না ?

অতঃপর রণমলের নির্দেশে পরিচারিকা দুজনের জন্য আহার্য এনে সামনে সাজিয়ে দিল। গল্প করতে করতে দুজনে খেতে থাকে। আহারের পর পৃথ্বীরাজ উঠে দাঁড়ায়, তাহলে চলি চাচাজী—কাল আবার যুদ্ধক্ষেত্রে দেখা হবে।

এসো বেটা।

পরের দিনের যুদ্ধে রণমলের পরাজয় হলো—তিনি সাদ্রিতে পালিয়ে গেলেন। পৃথ্বীরাজ যুদ্ধে জয়ী হয়ে চিতোরে ফিরে এলো।

তার পরও অবিশ্যি কিছুকাল মধ্যে মধ্যে খুল্লতাত ও ভ্রাতুষ্পুত্রের পরস্পরের সংঘর্ষ বেধেছে কিন্তু পৃথ্বীরাজের হাতে বরাবরই রণমলের পরাজয় ঘটেছে।

রণমল এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় পালিয়ে পালিয়ে বেড়িয়েছেন। শেষ পর্যন্ত নানা বিপর্যয়ের মধ্যে দিয়ে রণমল মেবার ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হন চিরদিনের জন্য।

আর পৃথ্বীরাজ। তাকে তার ভগ্নীপতি বিষপ্রয়োগে কৌশলে হত্যা করে।

ঐ ভগ্নীপতিকে একসময় পৃথ্বীরাজ তার ভগ্নীর উপর দুর্ব্যবহার করবার জন্য শাস্তি দিয়েছিল—সে অপমানের জ্বালা ভগ্নীপতি কোন দিন ভুলতে পারে নি। এবং মনে মনে পৃথ্বীরাজের উপরে একটা আক্রোশ পুষে এসেছে সেই অপমানের দিন থেকেই।

পৃথ্বীরাজের মৃত্যুতে চিতোরের সিংহাসনের আর সঙ্গ বা সংগ্রাম সিংহ ছাড়া আর কেউ উত্তরাধিকারী রইলো না।

এক চোখ কানা সংগ্রাম সিংহ চিতোরের সিংহাসনে বসল। রাণা সংগ্রাম সিংহ বা রাণা সংঘ।

রাণা সংগ্রামের সময় থেকে যেমন মেবারের গৌরব বৃদ্ধি হয়েছিল তেমনি তার সময় থেকেই গৌরব-সূর্য অস্তমিত যেতেও শুরু করে।

মেবার যখন গৌরবের উচ্চ শিখরে ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেছে সংগ্রামের বলিষ্ঠ নেতৃত্বে, দিল্লীর সিংহাসনের ভিত তখন ক্রমশঃ একটু একটু করে শিথিল হয়ে আসতে শুরু করেছে। একদিন যে সিংহাসনে পাণ্ডুর বংশধররা বসেছে—তার পর চৌহানরা—তার পর গজনী ও ঘোর—খিলজী ও সর্বশেষে লোদী—আজ সেই সিংহাসনের ভিত ভেঙ্গে বুঝি চুরমার হয়ে যেতে বসেছে।

মেবারের চোখ যে ঐদিকে ছিল না তা নয়। সে বুঝতে পারছিল লোদী বংশের শেষ সময় ঘনিয়ে এসেছে অন্তর্বিপ্লবের বিষে।

মালোয়ার রাজাও ইতিমধ্যে তলে তলে গুজরাটের সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়েছিল।

দিল্লীর সম্রাট ইব্রাহিম লোদীও বুঝতে পারছিল, মেবারকে—সংগ্রাম সিংহকে সময়মত চূর্ণ করতে না পারলে পরে সেদিক থেকে বিপদের সম্ভাবনা আছে।

মালোয়ার রাজাও সংগ্রাম সিংহের ব্যাপারে শঙ্কিত হয়ে উঠেছিল।

ইব্রাহিম লোদী ও মালোয়ার রাজার সঙ্গে খণ্ড খণ্ড কয়েকটা যুদ্ধ হয় সংগ্রামের—কিন্তু প্রত্যেকবারেই সংগ্রামের হাতে ওদের শোচনীয় ভাবে পরাজয় ঘটে।

তারা কোনমতে প্রাণ নিয়ে পালায়।

বিয়ানার সন্নিকটে পিলা খাল নদী মেবারের উত্তর সীমা। পূর্ব সীমা সিন্ধু নদী মালোয়াকে যেন ছুঁয়ে আছে দক্ষিণে। পশ্চিম সীমানায়—উত্থত—দুর্ভেদ্য পর্বতশ্রেণী। ঐ চতুঃসীমানার মধ্যখানে যে বিরাট ভূখণ্ড রাজস্থানের—ঐ রাণা সংঘের রাজ্য। রাজচক্রবর্তী রাণা সংগ্রাম সিংহ।

চিতোরের পথে ছুটে চলেছে একটি অশ্ব। সেই অশ্বের উপরে দুটি অশ্বারোহী। বীরেন্দ্র আর পার্বতী।

দীর্ঘ পথ। তিন দিন তিন রাত্রি ক্রমাগত বীরেন্দ্র অশ্ব ছুটিয়ে চলে। ক্লান্তি নেই—বিরাম নেই।

তখন একমাত্র চিন্তা যেমন করে হোক শাগের হাত থেকে তাদের রক্ষা পেতেই হবে—একা হলে বীরেন্দ্রর কোন দুশ্চিন্তা ছিল না—কিন্তু সঙ্গে রয়েছে তার পার্বতী। পার্বতীর জন্যই তার যত দুশ্চিন্তা—দুর্ভাবনা। পার্বতীকে যতক্ষণ পর্যন্ত না সে কোন আশ্রয়ে নিয়ে গিয়ে তুলতে পারছে সে নিশ্চিন্ত হতে পারছে না কিছুতেই।

বীরেন্দ্র।

বীরেন্দ্র অন্যমনস্ক হয়ে অশ্বচালনা করছিল। পার্বতীর ডাকে সে যেন সম্বিৎ ফিরে পায়।

পার্বতী—

চিতোর আর কত পথ

মনে হচ্ছে আর বেশী পথ বাকী নেই। কথাগুলো বলে বীরেন্দ্র পার্বতীর দিকে তাকায়।

মাথার উপর মধ্যাহ্নের সূর্য যেন অগ্নিবর্ষণ করছে। বীরেন্দ্রর মনে হলো সেই প্রখর সূর্যতাপে পার্বতীর মুখখানি যেন শুকিয়ে গিয়েছে। ফুল্লনলিনী যেন রৌদ্রতাপে মলিন হয়ে গিয়েছে। তাছাড়া এই দীর্ঘ পথশ্রমের ক্লান্তি—রাজার নন্দিনী—এত পরিশ্রম তো কোনদিন সহ্য করে নি পূর্বে। চোখের পাতা দুটি যেন পার্বতীর বুজে আসছে তখন।

পার্বতী।

উঁ।

কষ্ট হচ্ছে খুব তোমার?

না, বড় পিপাসা পেয়েছে।

বীরেন্দ্র আশেপাশে যতদূর দৃষ্টি যায় তাকাল। কিন্তু কোন লোকালয় বা

কুটিরের চিহ্ন পর্যন্ত চোখে পড়ে না। ধু ধু রুক্ষ প্রান্তর কেবল পথের দুপাশে —আর তারও সীমানা ছাড়িয়ে আরাবল্লীর কালো পাহাড়ের দুর্ভেদ্য প্রাচীর। আর একটু এগিয়ে গেলে, বীরেন্দ্রর মনে হয়, নিশ্চয়ই কোন গ্রাম দেখা যাবে। বীরেন্দ্র অশ্বের গতি আরো একটু দ্রুত করে।

পার্বতী পিপাসার্ত। পার্বতীর তৃষ্ণা নিবারণ প্রয়োজন। বীরেন্দ্রের মনের মধ্যে আর অন্য কোন চিন্তা ছিল না। একটি মাত্রই চিন্তা—পার্বতী পিপাসার্ত।

নচেৎ হয়ত বীরেন্দ্র শুনতে পেত দেখতেও পেত—পশ্চাতের দিকে ঐ সময় তাকালে, দ্বিতীয় এক অশ্বারোহী ওদের পিছনে পিছনে আসছে—বেশ কিছুটা ব্যবধানে।

দ্বিতীয় অশ্বারোহী। কালো একটি অশ্বের উপর এক আরোহী। বেঁটে—পেশল গাঁট্টাগোট্টা চেহারা—অতীব কুৎসিত মানুষটা। মাথায় একটা বিরাট পাগড়ি। লোকটা অশ্বচালনায় কিন্তু রীতিমত দক্ষ।

লোকটা আর কেউ নয়—গাঙ্গের পালিত বিশ্বস্ত অনুচর মরুচারী দস্যুর সন্তান চণ্ড। গাঙ্গের নির্দেশে সেদিন চণ্ড প্রাসাদ থেকে রাত শেষ হবার আগেই বের হয়ে পড়েছিল—অশ্বশালা থেকে একটি অশ্ব নিয়ে। অস্ত্রশস্ত্রের কোন বালাই ছিল না চণ্ডর, একটি মাত্র ধারালো তীক্ষ্ন ছোরা ছাড়া। সেই তীক্ষ্নধার ছোরাটি কটিদেশের চর্মপেটিকার তলায় গুঁজে বের হয়ে পড়েছিল। যেমন করেই হোক বীরেন্দ্র ও পার্বতীকে তাকে খুঁজে বের করতেই হবে। তারপর জীবিত বা মৃত বীরেন্দ্রকে মহারাজের সামনে হাজির করতেই হবে। জীবিত না হলে বীরেন্দ্রর ছিন্ন শিরই দেবে মহারাজাকে উপহার।

দুটো মাস ধরে তার পর চণ্ড রাজস্থানের সর্বত্র বীরেন্দ্র ও পার্বতীর খোঁজে ঘুরে ঘুরে বেড়িয়েছে—কিন্তু বীরেন্দ্র বা পার্বতীর কোন সন্ধানই পায় নি। অবশেষে ঘুরতে ঘুরতে বুরবো শাগের রাজধানীতে এসে উপস্থিত হয়। সেইখানেই এক সৈনিকের কাছে বীরেন্দ্রর সংবাদ পায়। মাত্র কয়েক দিন আগে শাগের রোষে পড়ে বীরেন্দ্র কারারুদ্ধ হয়েছে।

শাগের কারাগারে কেমন করে সে প্রবেশ করবে? একবার ভেবেছিল চণ্ড ফিরে গিয়ে মহারাজ গাঙ্গকে সংবাদটা দেবে কিন্তু পরে আবার একটা কথা তার মনে পড়ে। শাগের সঙ্গে মহারাজ গাঙ্গের সদ্ভাব নেই—এবং সেই শাগ যখন বীরেন্দ্রকে বন্দী করেছে তখন নিশ্চয়ই তার মনে কোন অভিসন্ধি আছে। তাছাড়া পার্বতী —পার্বতী কোথায়?

বীরেন্দ্রর সঙ্গে এক তরুণী ছিল সৈনিকের মুখেই সংবাদটা পেয়েছিল চণ্ড এবং বুঝতে পেরেছিল সেই তরুণী আর কেউ নয়—সে পার্বতীই। কিন্তু পার্বতী এখন কোথায়? পার্বতীর কোন সংবাদই ঐ সৈনিক তাকে দিতে পারে নি। বিশেষভাবে প্রশ্নও করে নি সে, কারণ যদি সৈনিকের মনে কোন প্রকার সন্দেহ জাগে!

তার চাইতে নিঃশব্দে নাগোরেই কিছুদিন অবস্থান করে চারিদিকে নজর রাখা যাক। কান পেতে থাকা যাক। নতুন কোন সংবাদ যদি পাওয়া যায়। নতুন সংবাদ পেতে দেরি হলো না। পাওয়া গেল।

মহারাজ গাঙ্গের যোধপুরের মাড়বারের সিংহাসনে আরোহণ তার খুল্লতাতরা নাকি কেউ সুচক্ষে দেখতে পারে নি। এতদিন মহারাজ সুরজমলের ভয়ে যারা মুখ বুজে ছিল আজ তারা তার মৃত্যুতে তলে তলে অস্ত্র শানাচ্ছে।

একটা যুদ্ধ বোধ হয় অনিবার্য হয়ে উঠেছে। শাগ—শান্তন-পুত্র জয়মল, মালবের বীরসিংহ, বিকানীরের বিকোসিংহ, উদোর পঞ্চপুত্র—সকলে মহারাজ গাঙ্গের বিরুদ্ধে হাত মিলিয়েছে শোনা যাচ্ছে। সকাল সন্ধ্যায় রীতিমত কুচকাওয়াজ চলেছে। নাগোরে যুদ্ধের শিবির পড়েছে। শাগ সৈন্যদের নিয়ে নাগোরে চলে গেল।

আর তার কয়েক দিন পরে এক নিষুতি রাত্রে। রাজপ্রাসাদের চারপাশে ছায়ার মত ঘুরে বেড়াচ্ছিল চণ্ড। প্রতি রাত্রেই ঐভাবে চণ্ড প্রাসাদের চারপাশে ঘুরে বেড়াত। কারণ তার মনে হয়েছিল বীরেন্দ্র অত সহজে তার বন্দীজীবন মেনে নেবে না।

শাগের কারাগার থেকে সে বের হয়ে আসবেই। আর হলোও তাই। এক রাত্রে বীরেন্দ্রকে দেখা গেল প্রাসাদের পশ্চাতের দ্বারপথে বের হয়ে আসতে—তারপর সে তাকে অনুসরণ করে ভাঙ্গামন্দির পর্যন্ত।

মন্দিরের সামনে বীরেন্দ্র যখন অন্ধকারে একা একা দাঁড়িয়ে আছে আর চণ্ড প্রস্তুত হচ্ছে তাকে হত্যা করবার জন্য ঠিক সেই সময় কার পদশব্দ যেন চণ্ডর কর্ণে প্রবেশ করে। কৌতূহলী হয়ে ওঠে সে—তার পরই তার নজরে পড়ে কে এক নারী ঐ ভাঙ্গামন্দিরের দিকেই চলেছে দ্রুত, কে ঐ নারী! বীরেন্দ্র ও পার্বতীর কথাবার্তা থেকেই বুঝতে পারে সব চণ্ড।

অশ্বারূঢ় হয়ে সহসা বীরেন্দ্র পার্বতীকে নিয়ে যেন ঝড়ের বেগে অশ্ব ছুটিয়ে রাজধানীর সীমানা পার হয়ে গেল।

চণ্ডও আর কালবিলম্ব না করে সঙ্গে সঙ্গে অশ্বারূঢ় হয়ে তাদের অনুসরণ করে।

অশ্বের উপর উপবিষ্ট বীরেন্দ্রকে পিছন দিক থেকে দু-হাতে জড়িয়ে বসেছে পার্বতী—নচেৎ ছোরা নিক্ষেপ করেই বীরেন্দ্রকে মুহূর্তে শেষ করে দিতে পারত চণ্ড। কিন্তু তা আর সম্ভব নয়। পার্বতী যেন আগলে রেখেছে দু বাহু দিয়ে তার দয়িতকে।

অতএব সুযোগের অপেক্ষায় চণ্ড ওদের অনুসরণ করে চলে। একদিন দুদিন করে সময় চলে যায়। কিন্তু একি, চিতোরের পথে কেন চলেছে বীরেন্দ্র। তবে কি চিতোরেই আশ্রয় নিতে চলেছে?

দূরে অবশেষে সত্যিই কয়েকটি কুটির দেখা গেল। ঐ যে লোকালয় দেখা যাচ্ছে, বীরেন্দ্র বলে, ওখানে নিশ্চয়ই তৃষ্ণার জল পাওয়া যাবে।

পার্বতী কোন সাড়া দেয় না। তার সর্বাঙ্গ তখন ঝিম্ ঝিম্ করছে ক্লান্তিতে ও তৃষ্ণায়। বুক পর্যন্ত শুকিয়ে কাঠ হয়ে গিয়েছে।

হঠাৎ পার্বতীর মাথাটা টলে বীরেন্দ্রের পিঠের উপর পড়ে গেল।

পার্বতী!

সাড়া নেই।

মুখ ফেরাল বীরেন্দ্র। আর ঠিক সেই মুহূর্তে দূরে নজর পড়ল—এক অশ্বারোহী অদূরে পশ্চাতে!

॥ ২৪ ॥

বীরেন্দ্রর সমস্ত স্নায়ু যেন মুহূর্তে সজাগ হয়ে ওঠে। সমস্ত চেতনা যেন তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে সঙ্গে সঙ্গে। নিজের অজ্ঞাতেই কটিদেশে চর্মপেটিকায় যেখানে কোষবদ্ধ তীক্ষ্ণ অসি ছিল সেই অসির বাঁটে ডান হাতটা চেপে বসে। বাঁ হাতে চেতনাশূন্য পার্বতীর শিথিল দেহটা শক্ত করে আঁকড়ে ধরে বীরেন্দ্র। পার্বতীর যে জ্ঞান নেই তা বুঝতে পারল বীরেন্দ্র।

দীর্ঘ পথশ্রমে ক্লান্ত পিপাসার্ত পার্বতী জ্ঞান হারিয়েছে বুঝতে পেরেছিল বীরেন্দ্র। ডান হাতে অশ্বের বল্গা ধরা ছিল—হাতের মুঠি থেকে সে বল্গা খসে পড়েছিল কিন্তু অশ্ব থামে নি। অশ্ব আপন মনেই এগিয়ে চলেছিল। কিন্তু তার গতিও শিথিল। সেও পরিশ্রান্ত।

সূর্য তখন পশ্চিম আকাশে ঢলে পড়েছে। প্রখর সূর্যের তেজ ঝিমিয়ে এসেছে। বীরেন্দ্র মুখ ফিরিয়ে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকিয়েছিল পশ্চাতে যে অশ্বারোহী তাদের অনুসরণ করছিল সেই অশ্বারোহীর দিকে। সে ক্রমশঃ তখনো কাছে আরো কাছে এগিয়ে আসছে।

কুৎসিত বেঁটেখাটো মানুষটাকে দেখে বীরেন্দ্রর চিনতে কষ্ট হয় নি। সে যে গাঙ্গের প্রিয় অনুচর মরুচারী দস্যুর সন্তান চণ্ড—দেখামাত্রই তাকে চিনতে পেরেছিল বীরেন্দ্র। চণ্ড—চণ্ড—কেন এখানে!

চণ্ডও ধীরে ধীরে এগোচ্ছিল। চণ্ডর দৃষ্টিও ছিল বীরেন্দ্রর উপরেই। স্থির-নিবদ্ধ দৃষ্টি।

ছোট ছোট কুতকুতে দুই চোখ দিয়ে নির্নিমেষে চেয়েছিল চণ্ড বীরেন্দ্রর দিকে। চণ্ডর পুরু ওষ্ঠপ্রান্তে একটুখানি হাসি দেখা দিল। সে হাসি যেমন কুৎসিত তেমনি নিষ্ঠুর।

হঠাৎ বীরেন্দ্রর অশ্ব থেমে গেল। বীরেন্দ্র মুহূর্তে মনস্থির করে ফেলে। সে বল্গাটা ধরে একটু টেনে ডান দিকে আকর্ষণ করে। অশ্ব সঙ্গে সঙ্গে মুখ ফিরিয়ে ঘুরে দাঁড়ায়।

এবারে দুজনে মুখোমুখি। বীরেন্দ্র অশ্বের মুখ ঘোরাতেই চণ্ডও তার অশ্বের গতি রোধ করেছিল। চণ্ডর হাতে ধরা তীক্ষ্ণ ছুরিকা দেখে বীরেন্দ্র বুঝতে পেরেছিল পালাবার চেষ্টা করলে বিপর্যয় ঘটতে পারে।

নিষ্ঠুর চণ্ড হয়ত তাদের লক্ষ্য করে ঐ তীক্ষ্ন ছুরিকা নিক্ষেপ করবে। এবং চণ্ড যে মহারাজ গাঙ্গেরই প্রেরিত—তার নির্দেশেই সুদূর মাড়বার থেকে চিতোর পর্যন্ত তাদের অনুসরণ করে এসেছে তাও বুঝতে বীরেন্দ্রর দেরি হয় নি।

চণ্ড কেমন করে তাদের সন্ধান পেল—কেমন করে এতদূর পর্যন্ত তাদের অনুসরণ করে এসেছে তাদের অজ্ঞাত? তার চাইতেও বড় কথা চণ্ড যখন এতদূর এসেছে, তাদের বিশেষ করে তার সঙ্গেই একটা বোঝাপড়া করতেই চায়।

সেক্ষেত্রে পশ্চাতে ধাবমান শত্রুকে রেখে পালাবার চেষ্টা করা বাতুলতা ছাড়া আর কিছুই নয়, বীরেন্দ্র তা করতেও চায় না।

দুজনে মুখোমুখি। পরস্পর পরস্পরের মুখের দিকে কিছুকাল স্থিরদৃষ্টিতে চেয়ে থাকে। বীরেন্দ্র যেমন পরিশ্রান্ত—চণ্ডও তেমনি পরিশ্রান্ত নিঃসন্দেহে।

ইতিমধ্যে পার্বতীর আবার জ্ঞান ফিরে এসেছিল—সেও ক্লান্ত চোখ মেলে তাকায়।

বীরেন্দ্র বলে ডাকতে গিয়েও হঠাৎ সামনের দিকে দৃষ্টি পড়ায় থেমে যায়। তার পর ফিস্ ফিস্ করে বলে, বীরেন্দ্র, চণ্ড কোথা থেকে এলো!

সম্ভবত তোমার জ্যেষ্ঠের নির্দেশে—বীরেন্দ্র জবাব দেয়।

বীরেন্দ্র সিংহ! চণ্ড ডাকল।

চণ্ড, তুমি নিশ্চয়ই জান৹ আমি জীবিত থাকতে তুমি আমার দেহ স্পর্শ করতেও পারবে না।

চণ্ড আগের মতই হাসল।

বীরেন্দ্র আবার বলে, তার চাইতে শোন আমি একটা প্রস্তাব করি—যুদ্ধের জন্য আমি প্রস্তুত। তুমিও অশ্ব থেকে অবতরণ কর—আমিও করছি, যুদ্ধে যদি তুমি আমায় পরাস্ত করতে পার, তোমার হাতে বন্দিত্ব আমি স্বীকার করে নেবো।

চণ্ড আবার হাসল।

চণ্ড খুব ভাল করেই জানত বীরেন্দ্রর সঙ্গে অসিযুদ্ধে সে মুহূর্তে পরাজিত হবে। তার পর বীরেন্দ্র তাকে নিষ্কৃতি দেবে না। কিন্তু মল্লযুদ্ধে বীরেন্দ্র তার সঙ্গে কিছুতেই যুঝতে পারবে না। কাজেই যুদ্ধ যদি করতেই হয় তো মল্লযুদ্ধ।

চণ্ড ডাকল, বীরেন্দ্র সিংহ!

কি তুমি আমার প্রস্তাবে সম্মত—বল?

যুদ্ধ করতে তোমার সঙ্গে আমার আপত্তি নেই।

তবে মাটিতে নাম।

কিন্তু অসিযুদ্ধ নয়।

তবে?

মল্লযুদ্ধ!

সঙ্গে সঙ্গে অস্ফুট কণ্ঠে প্রতিবাদ জানায় পার্বতী৹ না না—বীরেন্দ্র, চণ্ডর সঙ্গে মল্লযুদ্ধ নয়। পার্বতী জানত কি অসাধারণ শক্তি ধরে ঐ মল্লচারী

দস্যুসন্তান চন্ড তার দেহের পেশীতে পেশীতে। মুহূর্তে চন্ড বীরেন্দ্রকে পরাভূত করবে।

কিন্তু বীরেন্দ্র পার্বতীর কথায় কানও দেয় না। বলে, বেশ—তাই হবে। নাম তুমি।

বীরেন্দ্র, না না—মল্লযুদ্ধ নয়! পার্বতী আবারও প্রতিবাদ জানায়।

কিন্তু বীরেন্দ্র পার্বতীর কথায় কর্ণপাতও করে না। সে লাফ দিয়ে ভূমিতে অবতরণ করে অশ্বপৃষ্ঠ হতে।

চন্ডও ভূমিতে অবতরণ করে।

দুজনে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে সহসা দ্রুত ঐ সময় অশ্বক্ষুরধ্বনি আবার শোনা যায় ; এবং দেখতে দেখতে দীর্ঘদেহী প্রৌঢ় এক অশ্বারোহী ঘটনাস্থলে এসে দাঁড়ায়।

দীর্ঘদেহ পুরুষ। পোশাক দেখে কোন অভিজাত বংশীয়ই বলে মনে হয়। আগন্তুক পুরুষ ইতিমধ্যে অশ্বের গতি রোধ করে ওদের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিল। দুটি পুরুষ, একটি নারী।

কে তোমরা ?

বীরেন্দ্র জবাব দেয়, আমরা বিদেশী।

কিন্তু দেখে রাজপুত বলেই তোমাকে মনে হচ্ছে। অশ্বারোহী বলে।

হ্যাঁ।

কোথা থেকে আসছো ?

আপাততঃ নাগোর থেকে।

হুঁ, ঐ নারী ?

আমার বাগ্‌দত্তা বধূ।

সঙ্গে সঙ্গে চন্ড চিৎকার করে ওঠে, মিথ্যা কথা। উনি মহারাজ গাঙ্গের ভগিনী. ওকে ঐ সৈনিকটি চুরি করে এনেছে।

মিথ্যা কথা। পার্বতী বলে ওঠে, উনি আমার বাগ্‌দত্তা স্বামী, স্বেচ্ছায় আমি ওর সঙ্গে মাড়বার ছেড়ে চলে এসেছি।

দুজনার একজনও বললো না যে গাঙ্গ তাদের মাড়বার থেকে বহিষ্কৃত করে দিয়েছে।

ঐ লোকটার নাম চন্ড—একটা দস্যু, পার্বতী বলে, সম্ভবতঃ আমাদের হত্যা করবার জন্যই আমাদের পিছু নিয়েছে।

অশ্বারোহী এবারে চন্ডর মুখের দিকে তাকাল। চন্ডও সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ জানায়।

অশ্বারোহী পুরুষ আর কেউ নয়, রাণা সংগ্রাম সিংহের অন্যতম সেনাপতি সুচিৎ সিংহ। সুচিৎ সিংহ প্রচন্ড এক ধমক দিয়ে চন্ডকে থামিয়ে দেয়, চুপ।

চন্ড বুঝতে পারে ঐ অশ্বারোহী পুরুষ তার কথা বিশ্বাস করে নি। এবং সেক্ষেত্রে ও বীরেন্দ্রর দিকেই টেনে বলবে।

কিন্তু এমনি করে হাতের মুঠোর মধ্যে এসে শিকার ফসকে যাবে ? সে মরীয়া

হয়ে ওঠে, চোখের পলকে তার হাতের ছুরিকা বীরেন্দ্রকে লক্ষ্য করে সজোরে নিক্ষেপ করে।

কিন্তু সে নিক্ষিপ্ত ছুরিকা বীরেন্দ্রকে স্পর্শ করবার আগেই সুচিৎ সিংহ হাতের তরবারি দিয়ে ছুরিকার গতিরোধ করবার চেষ্টা করে। নিক্ষিপ্ত ছুরিকা বীরেন্দ্রর বদলে বীরেন্দ্রর অশ্বের দেহ এফোঁড়-ওফোঁড় করে দেয়। একটা তীক্ষ্ণ চিৎকার করে উঠে অশ্বটা লাফিয়ে ওঠে। পার্বতী ছিটকে পড়ে যায়—

আর সেই ফাঁকে চণ্ড একলাফে তার অশ্বের ওপরে উঠে ছুটতে শুরু করে। কারণ সে বুঝতে পেরেছিল অতঃপর সেখানে তার পক্ষে থাকা আর নিরাপদ নয়। কিন্তু সে বেশীদূর যেতে পারে না।

বীরেন্দ্র সুচিৎ সিংহের হাতের ছুরিকাটা ছিনিয়ে নিয়ে চণ্ডকে লক্ষ্য করে ছুঁড়ে দেয়। বীরেন্দ্রর হাতের অব্যর্থ লক্ষ্য ব্যর্থ হয় না—ছুরিকা চণ্ডকে বিদ্ধ করে।

অশ্ব লাফিয়ে ওঠে, চণ্ড ছিটকে পড়ে মাটিতে। বীরেন্দ্র চণ্ডর দিকে ছুটে যায়। দু-হাতে জাপটে ধরে চণ্ডকে। চণ্ডও জাপটে ধরে বীরেন্দ্রকে। দুজনে মল্লযুদ্ধ শুরু হয়ে যায়।

আহত চণ্ড যুঝতে পারে না বীরেন্দ্রর সঙ্গে। ক্রমশ কাহিল হয়ে পড়ে। দেখতে দেখতে বীরেন্দ্র চণ্ডকে মাটিতে ফেলে তার ওপর উঠে বসে। তার গলা টিপে ধরে। কিন্তু বীরেন্দ্র শেষ পর্যন্ত চণ্ডকে হত্যা করে না। গলা ছেড়ে দিয়ে বলে, যাও চণ্ড, মাড়বারে ফিরে যাও।

চণ্ড মাটিতেই পড়ে থাকে। তাকে মুক্তি দিলেও, তখন তার নড়বার পর্যন্ত শক্তি নেই।

সুচিৎ সিংহ এতক্ষণ একটু দূরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিল উভয়ের মল্লযুদ্ধ, এবারে বীরেন্দ্রর সামনে এসে দাঁড়ায়। ওকে ছেড়ে দিলে কেন?

ওর মত একটা নোংরা জীবকে হত্যা করে কি হবে? বীরেন্দ্র হাঁপাতে হাঁপাতে বলে।

কিন্তু ও তোমার শত্রু।

জানি।

শত্রুর শেষ রাখলে কেন? রাখতে নেই।

বীরেন্দ্র কোন জবাব দেয় না।

ইতিমধ্যে সন্ধ্যার অন্ধকার একটু একটু করে ঘনিয়ে এসেছে। চারিদিক ঝাপসা হয়ে এসেছে।

বীরেন্দ্র সিংহ?

আপনার পরিচয়টা এখনো পাই নি।

আমার নাম সুচিৎ সিংহ।

আপনি—

আমার অবশ্য অন্য একটা পরিচয়ও আছে, মহারানার একজন সেনাধ্যক্ষ আমি।

তাহলে তো ভালোই হলো, আমরা মহারাণার কাছে আশ্রয় নিতে যাচ্ছিলাম।

মহারাণার কাছে?

হ্যাঁ।

কিন্তু তার পূর্বে তোমাকে মহারাণার সঙ্গে দেখা করতে হবে।

তা হবে।

কিন্তু সে তো একজন বিদেশীর পক্ষে খুব সহজ হবে না। তাছাড়া সবার আগে যা মনে হচ্ছে, তোমাদের দুজনারই আপাততঃ বিশ্রামের প্রয়োজন। আমি যদি তোমাদের আমার গৃহে অতিথি হতে বলি—

কিন্তু আপনি তো আমাকে ভাল করে চেনেন না ভদ্র!

সুচিৎ সিংহ মৃদু হেসে বলে, আগে চিনতাম না ঠিকই, কিন্তু এখন তো পরিচয় হলো। কথাটা বলে সুচিৎ সিংহ আড়চোখে একবার পার্বতীর দিকে তাকায়, তাছাড়া অপরিচিত জায়গা, সঙ্গে তোমার নারী—

পার্বতী ঐ সময় বলে ওঠে, তাই চলো বীরেন্দ্র। আর যাওয়া ছাড়াও তো উপায় ছিল না। ক্ষুধার্ত পথশ্রান্ত দুজনে। একমাত্র সম্বল অশ্বটিও নিহত। তাছাড়া অপরিচিত জায়গায় রাত্রি ঘনিয়ে এসেছে।

সুচিৎ সিংহ আবার বলে, চলো আর দেরি করো না, এখান থেকে চিতোরগড বেশ কিছুটা পথ। যেতেও সময় লাগবে।

বীরেন্দ্র সিংহ আর আপত্তি করে না। বলে, চলুন।

এক কাজ করো, সুচিৎ বলে, উনি অত্যন্ত পরিশ্রান্ত, ওঁকে আমার অশ্বের ওপরে তুলে দাও, আমরা দুজনে হেঁটে চলি।

সেই মতই ব্যবস্থা হলো। পার্বতীকে অশ্বের উপর উঠিয়ে দেওয়া হলো। দুজনে অশ্বের দুপাশে হাঁটতে হাঁটতে চলে। রাত্রির প্রথম প্রহরে ওরা এসে চিতোরগড়ে পেঁছিল।

সুচিৎ সিংহ মিথ্যা বলে নি, সঙ্গে সে না থাকলে সে-রাত্রে ওরা চিতোরগড়ে প্রবেশ করতেই পারত না। গড়ের বাইরে রাত কাটাতে হতো।

নানা চিন্তায় বীরেন্দ্রর মনটা আচ্ছন্ন ছিল। চিতোরে সে তো এসে পেঁছিল, রাণা যদি তাদের আশ্রয় না দেয়—তাহলে কোথায় তারা যাবে? আবার কি কোন আশ্রয়ের সন্ধানে তাদের বেরুতে হবে? একা হলে কোন কথা ছিল না, সঙ্গে পার্বতী রয়েছে।

সুচিৎ সিংহ গৃহে একাকীই থাকে। একজন বৃদ্ধা দাসী রত্নাবাঈ ও ভৃত্য মংলু। ভীল যুবক মংলু।

বিবাহ করেছিল সুচিৎ সিংহ, কিন্তু স্ত্রী বেঁচে নেই। ঘরদুয়ার দেখিয়ে সুচিৎ বলে, এই আমার গৃহ বীরেন্দ্র সিংহ, একা মানুষ আমি, যত দিন খুশি তোমরা থাকতে পারো, কোন অসুবিধা হবে না।

দাসী রত্নাবাঈকে ডেকে তাড়াতাড়ি কিছু আহার্য প্রস্তুতের জন্য বলে সুচিত। পাশাপাশি দুটি কক্ষ ওদের জন্য ছেড়ে দেয় সুচিৎ।

রাত্রি আরো গভীর হয়েছে। আকাশে কৃষ্ণাচতুর্দশীর চাঁদ দেখা দিয়েছে। বীরেন্দ্রের চোখে ঘুম ছিল না। সে কক্ষের বাইরে মুক্ত প্রাঙ্গণে চুপটি করে বসে ছিল।

বীরেন্দ্র!

কে? চমকে ফিরে তাকায় বীরেন্দ্র সিংহ।

সুচিৎ সিংহ।

হ্যাঁ। ঘুমোও নি?

না, ঘুম আসছে না।

কেন বন্ধু, ঘুম আসছে না কেন? তুমি কি আমার এখানে এসে নিশ্চিন্ত হতে পারছো না?

না বন্ধু, তা নয়।

তবে?

আমার বাগদত্তা পত্নী পার্বতীর জন্যই আমার চিন্তা।

কেন, চিন্তা কিসের?

পার্বতী আমার বাগ্‌দত্তা বধূ বটে, তবে—

তবে?

সে মাড়বারাধিপতি মহারাজ গাঙ্গের একমাত্র ভগিনী—

সে তো চন্ডর মুখেই শুনেলাম।

মাড়বারাধিপতি আমাদের এ সম্পর্ককে মেনে নেন নি—

কেন?

কারণ আমি সাধারণ এক সৈনিক, আর—

পার্বতী রাজকন্যা, তাই কি?

হ্যাঁ।

॥ ২৫ ॥

মাড়বারের বর্তমান মহারাজা তাহলে তোমার শত্রু? সুচিৎ সিংহের মুখ থেকে কথাটা উচ্চারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বীরেন্দ্র যেন ঈষৎ চমকে ওর মুখের দিকে তাকাল।

ক্ষীণ চন্দ্রালোকে সুচিৎ সিংহের মুখটা ঠিক স্পষ্ট দেখা যায় না। বোঝা যায় না যেন। চেয়ে রয়েছে সুচিৎ সিংহ বীরেন্দ্রর মুখের দিকেই। সে চোখের দৃষ্টি থেকে কিছু বুঝবার উপায় নেই। কেমন ভাবলেশহীন যেন সে চোখের দৃষ্টি।

কিন্তু বীরেন্দ্র চমকটা যেন মুহূর্তে সামলে নেয়। তাড়াতাড়ি বলে ওঠে, না, না—মহারাজ আমার শত্রু হবেন কেন?

মিত্রও নন নিশ্চয়ই। সুচিৎ সিংহ পুনরায় মৃদু হেসে কথাটা বলে। তারপর একটু থেমে বলে, তাহলেও বলবো তোমার উপরে তার আক্রোশ কোন রকম থাকা

উচিত নয়, বিশেষ করে তার ভগ্নীই যখন স্বেচ্ছায় তোমাকে ভালবেসে রাজপ্রাসাদ ছেড়ে পথে এসে দাঁড়িয়েছেন।

বীরেন্দ্র কোন কথা বলে না। সে বোধ হয় সুচিৎ সিংহকে বোঝবার চেষ্টা করছিল।

ঝোঁকের মুখে সে নাগোর থেকে বের হয়ে সোজা চিতোরগড়ের দিকে পার্বতীকে সঙ্গে নিয়ে ঘোড়া ছুটিয়েছিল। তখন চিতোরগড়ে আসাটা তাদের পক্ষে ভাল হবে কি মন্দ হবে—উচিত কি অনুচিত হবে ভাববারও বুঝি সময় ছিল না। তাছাড়া ঐ সময় নগোর থেকে কোথাও দূরে পার্বতীকে নিয়ে চলে যাওয়াটাই ছিল সবার চাইতে বড় প্রশ্ন। একমাত্র প্রশ্ন।

এই মুহূর্তের প্রশ্নটা তখন ক্ষণেকের জন্যও মনে জাগলে সে কি করত এখন সেটা ভেবেও লাভ নেই। এখন যে প্রশ্নটা মনের মধ্যে জাগছে: চিতোরগড়ে পার্বতীকে নিয়ে এসে কি সে ভাল করল।

একথা ঠিক, মাড়বারের—যোধপুরের সঙ্গে চিতোরের কোন শত্রুতা আজ পর্যন্ত নেই—তাহলেও চিতোরগড়ে এসে আশ্রয় নেওয়া মানেই চিতোরাধিপতি মহারাণা সংঘ বা সংগ্রাম সিংহের আশ্রয়েই নিজেকে সঁপে দেওয়া।

আর একটা কথাও ভাববার আছে—সত্যিকারের বন্ধুত্ব রাজায় রাজায়ই হয়। রাজায় প্রজায় হয় না। সে দিক থেকে আজ তার এখানে আশ্রয় নেওয়ার ব্যাপারে যদি কোন প্রশ্ন ওঠে—নিঃসন্দেহে সে জানে রানা সংঘ মহারাজ গাঙ্গেরই স্বার্থটা বেশী দেখবে। তার মর্যাদাকেই বেশী সম্মান দেবে। সেটাই আভিজাত্যের নীতি। বিশেষ করে ব্যাপারটা হয়ত এতটা জটিল হয়ে উঠতো না যদি না পার্বতী তার সঙ্গে জড়িয়ে থাকত। পার্বতীর প্রশ্নটা তার সঙ্গে না থাকত।

আত্মগত চিন্তায় বীরেন্দ্র একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল—সম্বিৎ ফিরে আসতেই তার নজরে পড়ল সুচিৎ সিংহ তার পাশে নেই। সুচিৎ সিংহ ইতিমধ্যে কখন যেন তার কক্ষে ফিরে গিয়েছিল।

প্রাঙ্গণে একাই দাঁড়িয়েছিল বীরেন্দ্র। ইতিমধ্যে কৃষ্ণা-চতুর্দশীর চাঁদ আকাশের পশ্চিম প্রান্তে অনেকটা হেলে পড়েছে। চাঁদের আলো আরো ম্লান হয়ে গিয়েছে। পূব আকাশে শুকতারাটা দপ্ দপ্ করে জ্বলছে—একক নিঃসঙ্গ যেন। কক্ষের মধ্যে প্রদীপ জ্বলছিল। প্রদীপটা নিভিয়ে শুতে যাবে বলে প্রদীপদানের দিকে এগিয়ে যেতে গিয়েই বীরেন্দ্র দাঁড়াল।

পাশাপাশি দুটি কক্ষ ওদের দুজনের জন্য ব্যবস্থা করেছিল সুচিৎ সিংহ। একটি তার ও অন্যটিতে পার্বতীর থাকার ব্যবস্থা হয়েছিল। দুই কক্ষের মধ্যবর্তী দরজাটা ভেজানো ছিল মাত্র।

পার্বতী বোধ করি নিদ্রা যাবার আগে দরজাটা বন্ধ করতে ভুলে গিয়েছে। দরজাটা বন্ধ আছে কিনা পার্বতীর কক্ষের ওদিক থেকে দেখবার জন্য ঈষৎ ধাক্কা দিতে দরজাটা খুলে যায় এবং উন্মুক্ত দরজা-পথে পার্শ্ববর্তী কক্ষাভ্যন্তরে দৃষ্টি পড়ে এবং সঙ্গে সঙ্গে বীরেন্দ্র যেন নিজের অজ্ঞাতেই থমকে দাঁড়াল।

পাশের কক্ষেও প্রদীপ জ্বলছিল। প্রদীপালোকে কক্ষটি উদ্ভাসিত। সুস্পষ্ট

নয় কিন্তু দুর্বোধ্যও নয়। শয্যার উপরে নিদ্রিতা পার্বতী। গা হতে ওড়নাটা স্খলিত হয়ে শয্যার একপাশে পড়ে আছে—অঘোরে ঘুমোচ্ছে পার্বতী।

কয়দিনের পথশ্রমের ক্লান্তি সমগ্র দেহতট ছাপিয়ে নিদ্রার ঢল নেমেছে যেন, উদ্ধত যৌবনকে কাঁচুলীর বন্ধন ধরে রাখতে পারে নি। সুগভীর নিদ্রার তালে তালে বক্ষ ওঠা-নামা করছে। প্রদীপের স্বল্পালোকে পার্বতীর নিদ্রিত দেহসুষমা যেন অকস্মাৎ বীরেন্দ্রর চোখে কেমন নেশা জাগায়।

ইতিপূর্বে একই অশ্বে আরোহণ করে দীর্ঘ পথ অতিক্রম করবার সময় যথেষ্ট ঘনিষ্ঠতা হবার সুযোগ হয়েছে বীরেন্দ্রর পার্বতীর সঙ্গে, কিন্তু সে সময় মন ছিল তার সম্পূর্ণ অন্য চিন্তায় আবর্তিত। তাছাড়া এমনি করে ইতিপূর্বে কখনো বীরেন্দ্রর পার্বতীকে দেখবার তো সুযোগ হয় নি—এমনি নিভৃতে এত কাছে—এত স্পষ্ট করে। এমন নির্জনতায় এমন নিঃসঙ্গতায়।

ঐ দেখার যেন অন্য একটা আকর্ষণ আছে—যে আকর্ষণ তার মনের মধ্যে মধুর নিবিড় এক আবেশের সৃষ্টি করে মুহূর্তে। নিজের অজ্ঞাতেই বীরেন্দ্র পায়ে পায়ে দরজাটা ঠেলে নিদ্রিতা পার্বতীর কক্ষে প্রবেশ করে। পা দুটো কাঁপছে। বুকটার মধ্যেও কেমন যেন একটা ভীরু সংকোচের থরো থরো কাঁপুনি।

বীরেন্দ্র নিদ্রিতা পার্বতীর শয্যার পাশে এসে দাঁড়াল। দু চোখ তার যেন নিজের অজ্ঞাতেই সেই নিদ্রিত শিথিল দেহের সৌন্দর্যসুধা পান করতে থাকে। মাথাটা হেলে রয়েছে একপাশে উপাধানে পার্বতীর। চক্ষু দুটি মুদ্রিত। একটি বাহু ভেঙ্গে রয়েছে অন্যটি লম্বালম্বি পড়ে আছে শয্যার উপরে।

একটা অন্ধ নেশায় যেন নিজের অজ্ঞাতেই বসে পড়ে বীরেন্দ্র পার্বতীর শয্যার পাশে। পার্বতী! মৃদু অতি মৃদু কোমল কণ্ঠে ডাকে বীরেন্দ্র। পার্বতী! পার্বতী ঘুমোচ্ছে। অঘোরে ঘুমাচ্ছে।

দু হাত বাড়িয়ে এবারে পার্বতীর ঘুমন্ত মুখখানি যেন একটি ফুটন্ত পদ্মের মত ধরে বীরেন্দ্র গভীর মমতায়—ফিসফিসিয়ে ডাকে—পার্বতী!

পার্বতীর ঘুম ভেঙ্গে যায় ঐ ডাকে। কে—কে ? সহসা ঘুম ভেঙ্গে উঠে বসবার চেষ্টা করে পার্বতী।

পার্বতী—আমি, আমি—বীরেন্দ্র—

বীরেন্দ্র—পার্বতী বীরেন্দ্রর গলা জড়িয়ে ধরে মৃণাল দুই বাহু প্রসারিত করে।

বীরেন্দ্রর বিশাল বুকের ওপরে মাথাটা গুঁজে দেয় যেন ভীরু পক্ষীশাবকের মত পার্বতী।

পার্বতী! আবার ফিসফিস করে ডাকে বীরেন্দ্র।

উঁ ?

ভয় পেয়েছো ?

না।

ভয় করছে না ?

না—তুমি তো আমার পাশে আছ। কিন্তু—

কি বল, থামলে কেন ?

চিতোরগড়ে এসে বোধ হয় আমরা ভাল করি নি।

কেন, এ কথা বলছো কেন পার্বতী ?

রাণা দাদার বন্ধু—রাণা যদি বিশ্বাসঘাতকতা করেন ?

কথাটা যে আমারও মনে হয় নি তা নয় পার্বতী—কিন্তু সুচিৎ সিংহ কি আমাদের আশ্রয় দিয়ে আশ্রয়দাতার মর্যাদা নষ্ট করবে ?

তুমি ওকথা বলছো কেন বীরেন্দ্র ?

পার্বতীর গলায় কেমন যেন একটা সংশয়ের সুর, সে আমাদের সত্য পরিচয় তো জানে না।

জানে পার্বতী।

জানে ? কি বলছো তুমি বীরেন্দ্র—কেমন করে জানল ?

বিশ্বাস করে কিছুক্ষণ পূর্বে সব কথা তাকে আমি বলেছি—তোমার সত্য পরিচয়, তুমি—

এ তুমি কি করেছো বীরেন্দ্র, সুচিৎ সিংহকে সব কথা বলতে গেলে কেন ?

এখন বুঝতে পারছি পার্বতী, ভুল হয়ে গিয়েছে আমার। সুচিৎ সিংহকে বিশ্বাস করে এত তাড়াতাড়ি আমাদের সত্য পরিচয়টা দেওয়া উচিত হয়নি—কিন্তু আমি না বললেও চণ্ড সে কথা আগেই বলেছে তুমি তো জান। সুচিৎ সিংহের মনের মধ্যে সেক্ষেত্রে একটা সন্দেহ থেকেই যেতো তাই—

পার্বতী আর কোন জবাব দেয় না।

কি ভাবছো পার্বতী ? বীরেন্দ্র পুনরায় শুধায়।

ভাবছি ঐ চণ্ডকে তোমার ছেড়ে দেওয়া বোধ হয় উচিত হয় নি—

কথাটা যে আমারও মনে হয় নি পার্বতী তা নয়—কিন্তু ঐ পাষণ্ডটাকে হত্যা করে আমার হস্ত কলঙ্কিত করতে ইচ্ছা হলো না।

পার্বতী প্রত্যুত্তরে আর কোন কথা বলে না। চুপ করেই থাকে। নানা ধরনের চিন্তা তখন তার মস্তিষ্কের মধ্যে আবর্তিত হচ্ছিল।

সুচিৎ সিংহও নিদ্রা যায় নি। সে বীরেন্দ্রর কাছে থেকে বিদায় নিয়ে এলেও শয্যায় গিয়ে আশ্রয় নেয় নি। সে তার শয়নকক্ষে খোলা বাতায়নের সামনে দাঁড়িয়ে বহিঃপ্রকৃতির দিকে তাকিয়েছিল। তার মনের মধ্যেও নানা চিন্তা ঘুরপাক খাচ্ছিল। চণ্ডর মুখে পার্বতীর সত্য পরিচয়টা পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই চমকে উঠেছিল সুচিৎ সিংহ। যোধপুরাধিপতি মহারাজ গাঙ্গর ভগিনী ঐ পার্বতী।

সত্য পরিচয়টা পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মনের মধ্যে একটা বিস্ময়ও তার দেখা দিয়েছিল। কারণ সুচিৎ সিংহ ইতিপূর্বেই শুনেছিল চিতোর থেকে মাড়বারে বিবাহের প্রস্তাব গিয়েছে। রাণার দূত গজ নারিকেল নিয়ে মাড়বারে গিয়েছিল এবং মাত্র কয়েকদিন পূর্বে বিবাহের সম্বন্ধ পাকাপাকি করে দূত চিতোরগড়ে প্রত্যাবর্তনও করেছে মাড়বার থেকে।

কিন্তু কেমন করে তা সম্ভব হলো ? বীরেন্দ্রর কাহিনী শুনে মনে হয় পত্রদূত

যখন মাড়বারে বিবাহের প্রস্তাব নিয়ে গিয়েছিল তার পূর্বেই মাড়বাররাজ-ভগিনী বীরেন্দ্র সিংহের সঙ্গে গৃহত্যাগ করেছে। এবং তাই যদি হয়ে থাকে মহারাজ গাঙ্গ বিবাহে সম্মতি দিয়ে গজ ও নারিকেল গ্রহণ করলেন কি করে?

দুর্বোধ্য—সমগ্র ব্যাপারটাই যেন কেমন দুর্বোধ্য মনে হচ্ছে সুচিৎ সিংহের কাছে। মহারাজ গাঙ্গ কি তাহলে মহারাণার সঙ্গে প্রতারণা করলেন? নচেৎ মহারাজ গাঙ্গ একাজ করলেন কেন? বিবাহে সম্মতি দিলেন কি করে?

সত্য ব্যাপারটা যখন রাণা সঙ্গের কর্ণগোচর হবে তার ফলাফলটা কি হবে বা হতে পারে তা কি মহারাজ গাঙ্গ একটিবারও ভেবে দেখেন নি? রাণার সঙ্গে তিনি শত্রুতা করতে সাহসী হবেন। কোন্ বলে বলীয়ান হয়ে—কোন ভরসাতে?

তাছাড়া আজ মাড়বারে গৃহযুদ্ধ আসন্ন। সুরজমলের মৃত্যুর পর তার অন্যান্য পুত্রেরা—গাঙ্গের সিংহাসন-প্রাপ্তিকে হৃষ্টচিত্তে মেনে নেয় নি তাও সুচিৎ সিংহের অজ্ঞাত নয়।

বিশেষ করে শাগ—শাগ একটা চক্রান্ত গড়ে তুলেছে। গাঙ্গকে মাড়বারের উত্তরাধিকারী মেনে নিতে সে কোনমতেই রাজী নয়। সঙ্গে তার হাত মিলিয়েছে দৌলত খাঁ। ধূর্ত খাঁ সাহেব—

সব কথা বিবেচনা করে বোঝা যাচ্ছে মহারাজ গাঙ্গ কোন বিশেষ উদ্দেশ্যেই ব্যাপারটা গোপন রেখেছে এখনো। এত বড় একটা সংবাদ রাণার কর্ণগোচর করলে প্রচুর পারিতোষিক পাবে সুচিৎ সিংহ।

কিন্তু—হ্যাঁ—তার আগে তাকে বিশেষভাবে সাবধান হতে হবে যাতে করে কোনক্রমে পার্বতী ও বীরেন্দ্র সিংহ এখান থেকে না পালাতে পারে।

রাত্রি প্রায় শেষ হয়ে এলো। সুচিৎ সিংহ শয়নকক্ষ হতে নিষ্ক্রান্ত হয়ে মংলুর কক্ষের দিকে অগ্রসর হলো। মংলু—এই মংলু।

মংলু অঘোরে নিদ্রা যাচ্ছিল—প্রভুর ডাকে ধড়মড় করে উঠে বসে।

কে?

আমি।

কিছু বলছিলেন?

হ্যাঁ—শোন্ কথা আছে—

মংলু কেমন যেন বিস্মিত দৃষ্টিতে প্রভুর দিকে তাকায়।

॥ ২৬ ॥

মংলুর চোখের পাতা থেকে তখনো ঘুমের ঘোরটা ভাল করে কাটে নি—ভারী ভারী চোখের পাতা দুটো। সে তার প্রভুর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে।

তার প্রভু ইতিপূর্বে কখনো তার কক্ষে ঢোকে নি। প্রয়োজন হলে হাঁক পেড়ে ডেকেছে—সোজা তার কক্ষে এসে ঢোকে নি।

মংলু?

জী।

আমার ঘরে আয়। কথাটা বলে সুচিৎ সিংহ দরজাপথে বের হয়ে যায়, মংলু তাকে অনুসরণ করে। প্রভুর পিছনে পিছনে এসে তার ঘরে ঢোকে। দরজাটা বন্ধ করে দে।

মংলু প্রভুর মুখের দিকে একবার তাকাল তারপর ভিতর থেকে অর্গল তুলে দরজাটা বন্ধ করে দিল।

ঘরের এক কোণে প্রদীপদানে প্রদীপের শিখাটা মৃদু মৃদু কাঁপছে—জানালা-পথে রাত্রিশেষের বায়ুপ্রবাহের মৃদু আনাগোনায়। জানালার ওপাশে প্রথম ভোরের আলো যেন একটা আবছা কুয়াশার পর্দার মত থির থির করে কাঁপছে।

মংলু—আমাদের বাড়িতে যারা এসেছে—

হ্যাঁ—ওরা তো পাশের ঘরে ঘুমিয়ে আছে। মংলু বলে।

জানি। ওদের উপরে তোর সব সময় কড়া নজর রাখতে হবে।

কড়া নজর।

হ্যাঁ—ওরা যেন এখান থেকে না চলে যেতে পারে।

মংলু প্রভুর আদেশ মানতেই অভ্যস্ত চিরদিন। কেন—কি বৃত্তান্ত সে কখনো আজ পর্যন্ত জিজ্ঞাসা করে নি, করেও না। আজও করল না। মাথা হেলিয়ে কেবল সম্মতি জানাল।

আর দেখিস ওদের যেন কোন রকম এতটুকু কষ্ট না হয়। যখন যা ওদের দরকার সব দিবি।

মংলু আবার মাথা নাড়ল।

তুই যে ওদের ওপরে নজর রেখেছিস সেটা যেন ওরা কিছুতেই না জানতে পারে, বুঝেছিস ?

মংলু আবার মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল।

ব্যাপারটা একটু ভাল করে তলিয়ে দেখা দরকার। আরো একটা দিন ও রাত সুচিৎ সিংহ ভাবল এবং শেষ পর্যন্ত স্থির করলো যে রাণাকে সংবাদটা সে দেবে। তবে কৌশলে সংবাদটা পরিবেশন করতে হবে।

মাড়বারের সঙ্গে একটা কেবল সম্পর্ক গড়ে তোলার জন্যই যে প্রধান অমাত্যর পরামর্শে রাণা সংগ্রাম সিংহ মহারাজ গাঙ্গের কাছে বিবাহের প্রস্তাব দিয়ে দূত প্রেরণ করেছিল তা নয়—ওই প্রস্তাব প্রেরণের মূলে অবশ্য আরো একটি কারণ ছিল। মাড়বার-দুহিতা পার্বতীর অসামান্য রূপের খ্যাতি। লোকমুখে পার্বতীর রূপের বর্ণনা শোনা অবধি রাণা সঙ্গর মনের মধ্যে একটা যেন স্বপ্নের জাল বুনে চলছিল।

রাজ্যের মধ্যে কেবল একজন যার ঐ ব্যাপারে সমর্থন ছিল না সে হচ্ছে রাণার প্রধানা মহিষী কুমারচাঁদ-কন্যা রঞ্জা।

রঞ্জা দেবী।

অবশ্য সে সংবাদটা সুচিৎ সিংহ জানতো না—এবং তার জানবারও কথা নয়।

রাণাও মহিষীর দিক থেকে স্পষ্টত কোন প্রতিবাদ শোনে নি।

তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমতী রঞ্জা। সমস্ত দিক থেকে বিচার করে দেখতে গেলে সে জানত তার এমন কোন রূপ বা গুণ ছিল না যাতে করে মেবারের মহারাণার প্রধানা মহিষীর পদমর্যাদা সে লাভ করতে পারে।

নেহাৎ ভাগ্যবিড়ম্বনায় পলাতক—পর্যুদস্ত রাজকুমারকে তার পিতার আশ্রয় নিতে হয়েছিল বলে এবং তার সামনে সেদিন কোন আশার আলোই ছিল না বলেই কুমীচাঁদের প্রস্তাবকে মাথা পেতে নিয়েছিল সংগ্রাম সিংহ। এবং সে রঞ্জাকে বিবাহ করেছিল।

অবশ্য সংঘ নিমকহারাম নয়—মেবারের সিংহাসনলাভ করার পর কুমীচাঁদের কন্যাকে সে যথাযোগ্য সম্মানই দিয়েছিলো তার পূর্ব প্রতিশ্রুতি মত।

কিন্তু সম্মান আর ভালবাসা তো এক বস্তু নয়। রঞ্জা নারী—সে সম্মানের—মর্যাদার চাইতেও স্বামীর প্রেম-ভালবাসাকেই কামনা করেছিল বেশী। এবং মাড়বারে বিবাহের প্রস্তাব পাঠাবার পর থেকেই রঞ্জাবতী গম্ভীর হয়ে গিয়েছিল'।

ব্যাপারটা আর কারো নজরে না পড়লেও রাণা সংঘের দৃষ্টিতে পড়েছিল। রাণার যে সে কারণে কিছুটা চিন্তা যে ছিল না তাও নয়।

কিন্তু ঐ সব ব্যাপার সুচিৎ সিংহ কিছুই জানত না। সে জানত লোকপরম্পরায় মাড়বার-দুহিতার রূপের খ্যাতি শুনেই প্রায় প্রৌঢ়বয়সে পার্বতীর পাণিপ্রার্থী হয়ে সে মাড়বারে দূত মারফৎ গজ ও নারিকেল প্রেরণ করেছিল বুঝি। এবং এও জানত সুচিত সিংহ মাড়বার-অধিপতি গাঙ্গা সানন্দে সম্মতি দিয়েছে সে প্রস্তাবে।

দূত প্রত্যাবর্তনও করেছে। আগামী বসন্তকালে বিবাহ-উৎসব।

সুচিৎ সিংহ যখন রাজপ্রাসাদে এসে পৌঁছাল এবং বিশেষ প্রয়োজনে সে রাণার দর্শনপ্রার্থী প্রধান দ্বারীকে বললে—দ্বারী সুচিৎ সিংহকে অপেক্ষা করতে বলে অন্দরণে সংবাদ প্রেরণ করল।

দ্বিতলপ্রাসাদ অলিন্দে একাকী দাঁড়িয়েছিল রাণা সংঘ।

মাড়বার থেকে অবিশ্যি দূত ফিরে এসে বলেছে সানন্দে মহারাজ গাঙ্গা তার প্রেরিত বিবাহ প্রস্তাব মেনে নিয়েছে কিন্তু সেই সঙ্গে আরো এক সংবাদ এনেছে পত্রবাহক মাড়বারের সিংহাসনকে কেন্দ্র করে নাকি বহ্নি ধূমায়িত হয়ে উঠেছে।

গৃহবিবাদ। একদিকে মহারাজ গাঙ্গা। অন্যাদিকে মৃত মহারাজ সুরজমলের অন্যান্য পুত্ররা ও দৌলত খাঁ।

ঐ যবন দৌলত খাঁকে খুব ভাল ভাবেই চেনে রাণা সংঘ। সংঘ আদৌ খাঁ সাহেবকে বিশ্বাস করে না। ঐ দৌলত খাঁই রাঠোরদের কাছ থেকে নাগোর—বিশাল এক ভূখণ্ড জোর করে ছিনিয়ে নিয়ে বর্তমানে সেখানে নিজের আধিপত্য বিস্তার করেছে।

অথচ রাণা সংঘ সংবাদ পেয়েছে ঐ দৌলত খাঁর সঙ্গেই হাতে হাত মিলিয়েছে মহারাজ সুরজমলের পুত্র শাগ মাড়বারের সিংহাসনের লোভে। যে দৌলত খাঁ একদিন তার পিতৃপুরুষের জয়লব্ধ প্রাচীন নাগোরকে বলপূর্বক ছিনিয়ে নিয়েছে

আজ তারই শরণাপন্ন হতে শাগের এতটুকু দ্বিধা হয় নি, আশ্চর্য।

আশ্চর্য মহারাজ সুরজমলের সন্তান-সন্ততিরা বুঝতে পারছে না যে তাদের বর্তমান অন্তর্বিপ্লবের সুযোগ নিয়ে দৌলত খাঁ তাদের কতখানি ক্ষতিসাধন করতে পারে।

কাজেই রাণা সংঘ বুঝতে পারছে মাড়াবারের রীতিমত এক দুর্দিন উপস্থিত হয়েছে—এবং মহারাজ গাঙ্গা কোন প্রকার তার কাছে সাহায্য না প্রার্থনা করলেও মনে মনে সে ইতিপূর্বেই স্থির করেছে গাঙ্গাকেই সাহায্য করবে।

দ্বারী এসে অভিবাদন জানাল রাণাকে।

কি খবর?

সেনানায়ক সুচিৎ সিংহ—আপনার দর্শনপ্রার্থী।

সুচিৎ সিংহ?

হ্যাঁ।

যাও মন্ত্রণাকক্ষে তাকে অপেক্ষা করতে বল, আমি আসছি।

সুচিৎ সিংহ আবার এই প্রত্যূষে কি চায়?

চিন্তিত রাণা একটু পরে মন্ত্রণাকক্ষে এসে প্রবেশ করল।

সুচিৎ সিংহ তাড়াতাড়ি উঠে রাণাকে অভিবাদন জানায়।

কি খবর সুচিৎ সিংহ?

রীতিমত একটা চাঞ্চল্যকর সংবাদ আছে মহারাণা।

চাঞ্চল্যকর সংবাদ।

হ্যাঁ।

কি ব্যাপার?

মাড়বার-দুহিতা মেবারে—

সুচিৎ সিংহের কথা শেষ হয় না রাণা তাকে বাধা দিয়ে বলে, মাড়বার-দুহিতা—কি বলছো সুচিৎ?

হ্যাঁ মহারাণা—কুমারী পার্বতী—

কি প্রলাপ বকছো তুমি?

প্রলাপ নয় মহারাণা—মাড়বার-দুহিতা এখন আমারই গৃহে অতিথি—

তোমার গৃহে অতিথি?

অতঃপর সুচিৎ সিংহ গতকালের সমগ্র ঘটনা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিবৃত করে মহারাণার কাছে।

যা বললে তা সত্যি?

অধীনের গৃহে পদার্পণ করলেই সত্যি-মিথ্যা সব জানতে পারবেন মহারাণা।

রাণা সংঘ মুহূর্তকাল যেন কি ভাবে তারপর বলে, ঠিক আছে তুমি অপেক্ষা কর আমি এখনি যাবো।

রাণা সুচিৎ সিংহকে অপেক্ষা করতে বলে বস্ত্র পরিবর্তনের জন্য অন্দরে চলে গেল। বেশ পরিবর্তন করে অল্পকাল মধ্যেই ফিরে এলো রাণা সংঘ।

গড়ে তখনো সকলের নিদ্রাভঙ্গ হয় নি। তখনো কর্মব্যস্ততা দেখা দেয় নি।

পাশাপাশি দুটি অশ্ব সুচিৎ সিংহের গৃহের দিকে ছুটে চলে।

রাণা সংঘ দেহের উপর একটা কালো রেশমী আংরাখা জড়িয়ে নিয়েছিল, কেননা তাকে দেখে যেন কেউ চট্ করে চিনতে না পারে।

স্বয়ং চিতোরের মহারাণা এই প্রত্যূষে তার সামান্য এক সেনানায়কের গৃহে চলেছে লোকের মনে নানারূপ সন্দেহ জাগতে পারে, তা ছাড়া সুচিৎ সিংহের সংবাদ যদি সত্যিই হয় এবং সত্যিই যদি মাড়বার-দুহিতা পার্বতী তার ভ্রাতা মাড়বার-অধিপতি মহারাজ গাঙ্গ কর্তৃক বিতাড়িত হয়েই থাকে, তাহলে মেবারে নানাপ্রকার গুজবের সৃষ্টি হবে।

সর্বাগ্রে জানা দরকার সত্যিই মেয়েটি পার্বতী নাকি ?

অল্পক্ষণমধ্যেই দুজনে সুচিৎ সিংহের গৃহে এসে উপস্থিত হলো।

অশ্ব হতে অবতরণ করে রাণা শুধায়, কোথায় ?

আসুন আমার সঙ্গে। দুজনে এসে বীরেন্দ্রদের কক্ষের দরজার সামনে দাঁড়াল।

কক্ষমধ্যে তখন বীরেন্দ্র ছিল না—একাকী পার্বতীই ছিল।

বন্ধ দরজায় আঘাত করতেই ভিতর থেকে নারীকণ্ঠে প্রশ্ন এলো, কে ?

দরজাটা খুলুন ভদ্রে—আমি সুচিৎ সিংহ।

দরজা খুলে গেল।

প্রথমেই ছিল সুচিৎ সিংহ, তাকে বলতে যায় পার্বতী মৃদু হাস্য সহকারে, বীরেন্দ্র হাতমুখ ধুতে গিয়েছে—

কিন্তু তার কথা শেষ হলো না। সে সহসা মধ্যপথে থেমে গেল—দু পা পিছিয়ে যায় সুচিৎ সিংহের ঠিক পশ্চাতেই অপরিচিত পুরুষ রাণা সংঘকে দেখে।

সুচিৎ সিংহ। রাণা সুচিৎ সিংহের দিকে ফিরে বলে।

আদেশ করুন।

তুমি একটু বাইরে যাও।

সুচিৎ সিংহ সরে গেল। রাণা পশ্চাৎদিকে হাত দিয়ে দরজাটা পুনরায় ভেজিয়ে দেয়।

কে—কে তুমি ?

রাণা তখন দেখছিল নির্নিমেষ দৃষ্টিতে পার্বতীকে। কি অপরূপ সুন্দরী নারী। তুমি আমার চাইতে বয়সে অনেক ছোট তাই তোমাকে তুমি বলেই সম্বোধন করছি—তুমি মাড়বার-অধিপতির ভগ্নী ?

তাতে তোমার কি প্রয়োজন ? তীক্ষ্ণকণ্ঠে দু-পা পিছিয়ে গিয়ে প্রশ্ন করে পার্বতী।

মনে হচ্ছে তুমি ভয় পেয়েছো—কিন্তু ভয় পাবার কিছু নেই।

পার্বতী অত সহজে ভয় পায় না। সে জানে আত্মরক্ষায় সম্পূর্ণ সক্ষম। বল কে তুমি ?

রাণা আবার মৃদু হাসে। বলে, তার আগে আমার প্রশ্নের জবাবটা চাই যে।

যদি না দিই ?

না দিলেও সত্যি কথাটা জানতে কি আমার দেরি হবে ?

বিশ্বাসঘাতক।

কে, আমি ?

না, সুচিৎ সিংহ।

রাণা আবার মৃদু হাসে। তাহলে আমি ধরেই নিচ্ছি যে তুমি পার্বতী।

পার্বতী অতঃপর মুহূর্তের জন্য যেন কি ভাবল আপন মনে তারপর মৃদু কণ্ঠে বলে, হ্যাঁ, আমি পার্বতী।

মাড়বার-দুহিতা—মহারাজ গাঙ্গের—

না—তার সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নেই।

রাণা আবার মৃদু হাসে। তোমাদের ভ্রাতা ও ভগিনীর মনোমালিন্যের কারণ আমি শুনেছি, আমি যদি সে বিবাদ মিটিয়ে দিই ?

সম্ভব নয়—যতক্ষণ তার আভিজাত্যের গর্ব—তাকে অন্ধ করে রাখবে ততক্ষণ।

তবু আমি যদি সে চেষ্টা করি তোমার আপত্তি আছে ?

কোন আপত্তি নেই যদি সে আমার স্বামীকে স্বীকার করে নেয়।

বীরেন্দ্র সিংহ ?

হ্যাঁ।

বীরেন্দ্র সিংহকে তুমি খুব ভালবাস, না ?

পার্বতী কোন জবাব দেয় না। চুপ করে থাকে।

শোন মাড়বার-দুহিতা—মহারাজ গাঙ্গ আমার বন্ধু—

তীক্ষ্ন সন্দেহের দৃষ্টিতে তাকায় পার্বতী রাণার দিকে। কোন কথা বলে না।

তাছাড়া, রাণা আবার বলে, সামান্য এক সেনাধ্যক্ষের গৃহও তোমার উপযুক্ত স্থান নয়—তুমি আমার সঙ্গে চল।

তোমার গৃহে।

হ্যাঁ—আমার প্রাসাদে।

প্রাসাদে।

হ্যাঁ—আমার পরিচয়টা তোমাকে এখনো দেওয়া হয় নি—আমি মেবারের রাণা—রাণা সংঘ—

সঙ্গে সঙ্গে পার্বতী আরো দু পা পিছিয়ে যায়। তার চোখে সংশয়পূর্ণ দৃষ্টি।

ভয় পেয়ো না পার্বতী—বিশ্বাস করো আমার দ্বারা তোমার কোন ক্ষতি হবে না।

মনে পড়ে পার্বতীর শাগের সেদিনকার মিষ্টমধুর আশ্বাসভরা কথাগুলো।

রাণার মনেও হয়ত তেমনি কোন মতলব রয়েছে।

কিন্তু বীরেন্দ্র কি করছে ? এখনো সে আসছে না কেন ?

তোমাকে আর তোমার ভাবী স্বামীকে আমি আমার প্রাসাদে আমন্ত্রণ

জানাচ্ছি পার্বতী। রাণা সংঘ আবার বলে।

পার্বতী বলে, না।

আর ঠিক সেই মুহূর্তে দরজা ঠেলে বীরেন্দ্র কক্ষমধ্যে প্রবেশ করে থমকে দাঁড়াল।

কে তুমি ?

তুমি বোধ হয় বীরেন্দ্র সিংহ ?

হ্যাঁ—কিন্তু তুমি কে ?

জবাব দিল এবারে পার্বতী। বললে, মেবারের মহারাণা সংগ্রাম সিংহ।

॥ ২৭ ॥

বীরেন্দ্রর নিক্ষিপ্ত ধারালো অব্যর্থ ছুরিকা চণ্ডর বাম বাহু ও বাম দিককার পৃষ্ঠদেশে বিদ্ধ হয়ে যে ক্ষত সৃষ্টি করেছিল সেটা নেহাত কম নয়। রক্তপাতও প্রচুর হয়েছে ক্ষতস্থান থেকে। এবং সর্বশেষে তার বক্ষের উপর চেপে বসে গলা টিপে শ্বাসরোধ করায় চণ্ডর দেহের সমস্ত শক্তি ও প্রতিরোধ ক্ষমতা তার নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল।

বীরেন্দ্র কৃপাপরবশ হয়ে তাকে মুক্তি দিলেও সঙ্গে সঙ্গে ভূশয্যা থেকে চণ্ডর মত মানুষও উঠে দাঁড়াতে পারে না। উঠে দাঁড়িয়ে কোনমতে চণ্ড মাড়বারের পথে চলতে শুরু করেছিল বটে কিন্তু বেশীদূর অগ্রসর হতে পারল না। কিছুটা পথ অতিক্রম করার পরই মাথাটা ঝিমঝিম করতে থাকে—চোখের সামনে সব কিছু কেমন যেন ক্রমশঃ ঝাপসা হয়ে যায়। লুপ্ত—অদৃশ্য হয়ে যায়। চণ্ড জ্ঞান হারিয়ে পথের উপরই পড়ে যায়। অনেকক্ষণ পরে চণ্ডর যখন আবার জ্ঞান ফিরে এলো—তখন মধ্যরাত্রি। আকাশে ক্ষীণ জ্যোৎস্না—তারই ঝাপসা-ঝাপসা আলোয় চারিদিক কেমন যেন দেখাচ্ছে। মাথাটার মধ্যে তখনো চণ্ডর যেন ঝিমঝিম করছে। মাথা তোলার চেষ্টা করে চণ্ড, কিন্তু পারে না। ক্ষতস্থান দিয়ে প্রচুর রক্তস্রাব হয়েছে—কোমর থেকে পট্টিটা কোনমতে খুলে ফেলে সর্বাগ্রে চণ্ড পৃষ্ঠদেশের ক্ষতস্থানটা চেপে বেঁধে ফেলে।

নিদারুণ পিপাসায় গলাটা শুকিয়ে যেন মরুভূমি হয়ে গিয়েছে। চারিদিকে তাকায় চণ্ড। কিন্তু যতদূর দৃষ্টি চলে একটি মনুষ্যমূর্তিও চোখে পড়ে না। সামনে পায়ে চলা সড়কটা এঁকেবেঁকে ক্রমশঃ দৃষ্টির বাইরে হারিয়ে গিয়েছে যেন।

অনেক কষ্টে আবার উঠে দাঁড়ায় চণ্ড। এখনো মাথাটা ঘুরছে—এখনো ঝিম-ঝিম করছে—অদূরে রাস্তার উপরে নজরে পড়ে তার ছুরিকাটা পড়ে আছে। এগিয়ে গিয়ে কোনমতে মাটি থেকে ছুরিকাটা তুলে নেয় চণ্ড, তারপর একটু একটু করে এগিয়ে চলে।

এতক্ষণ পরে মনে পড়ে তার নিজের অশ্বের কথা। অশ্বটি আশেপাশে যতদূর দৃষ্টি চলে কোথায়ও নেই। অশ্ব ফিরে যেতেই হবে তাকে। মহারাজের কাছে ফিরে গিয়ে সংবাদটা দিতেই হবে। রাজকুমারীর সন্ধান পাওয়া গিয়েছে

কথাটা তাকে জানাতেই হবে। সংবাদটা মহারাজের কাছে পেশ করবার পর জীবনটা যদি বের হয়ে যায় তো যাক। ক্ষতি নেই।

কিন্তু যতক্ষণ না সংবাদটা যথাস্থানে পেঁছে দিতে পারছে তাকে বেঁচে থাকতেই হবে। এই ক্ষতবিক্ষত পরিশ্রান্ত দেহটা টেনে টেনে যেভাবেই হোক তাকে মাড়বারে পেঁছতেই হবে। কিন্তু পারবে কি সে? চিতোর থেকে মাড়বার দীর্ঘ পথ।

চণ্ড ও বীরেন্দ্রর সংগে যখন মল্লযুদ্ধ হচ্ছিল সে সময় উত্তেজনায় কেউ লক্ষ্য করে নি চণ্ডর অশ্ব ওদের চোখের আড়ালে চলে গিয়েছিল।

চণ্ডর দীর্ঘদিনের সহচর শিক্ষিত অশ্ব প্রভুর বিপদের কথা বুঝতে পেরেছিল বোধ হয় তাই নিঃশব্দে স্থানত্যাগ করে রাস্তার ধারে যে কতকগুলো অর্জুন গাছ ছিল তার আড়ালে আত্মগোপন করেছিল। তারপর ধীরে ধীরে মাড়বারের দিকে চলতে শুরু করে বোধ করি তার প্রভুকে মৃত ভেবেই।

সেই কারণেই সুচিৎ সিংহ যখন বীরেন্দ্র ও পার্বতীকে নিয়ে চিতোরগড়ের দিকে যাত্রা শুরু করে চণ্ডের অশ্বটি ওদের কারো চোখে পড়ে নি।

চণ্ডের অশ্বের কথাটাও ওদের মনে পড়ে নি।

চণ্ড মৃদু চন্দ্রালোকে নির্জন রাস্তা ধরে আহত রক্তাক্ত ক্লান্ত দেহটা কোন মতে যেন টেনে টেনে ধীরে ধীরে এগিয়ে চলে।

দীর্ঘ পথ—শেষ পর্যন্ত চণ্ড পেঁছাতেই পারবে না।

কিন্তু তার অশ্বটা কোথায় গেল? শিক্ষিত অশ্ব—তার দীর্ঘদিনের সহচর—তাকে ফেলে ত সে চলে যাবে না? তবে? না তাকে মৃত ভেবে অশ্ব মারবাড়ের পথে একা-একাই ফিরে গিয়েছে?

মুখে একপ্রকার বিচিত্র শব্দ করে চণ্ড তার অশ্বটিকে ডাকত প্রয়োজন হলে। মরুজীবনে সে তার মরুদস্যু পিতার কাছ থেকেই ঐ বিচিত্র শব্দটি আয়ত্ত করেছিল। তার পিতাও তার প্রিয় সর্বক্ষণের অনুচর অশ্বটিকে ঐভাবে বিচিত্র একটি শব্দ করে ডাকত। দুটো হাতের চেটো গোল করে মুখের সামনে ধরে ঐ শব্দ করত চণ্ড। উঁ—উঁ করে তীক্ষ্ণ শব্দটা ধীরে ধীরে দূর-দূরান্তে ছড়িয়ে যেত—

চণ্ড দাঁড়াল তারপর দুটো হাতের চেটো মুখের সামনে তুলে সেই শব্দ করে। নির্জন নিশীথে সেই শব্দতরঙ্গ দূর-দূরান্তে ছড়িয়ে যায়। বার বার তিনবার। কিন্তু চণ্ড তার অশ্বের কোন হদিস পায় না। কিছুদূর গিয়ে আবার শব্দ করে।

অশ্বের কানে কিন্তু প্রথমবারই সেই শব্দতরঙ্গ প্রবেশ করেছিল। পরিচিত সেই শব্দ শুনেই অশ্বটি থেমে দাঁড়িয়েছিল। কান পেতে শোনে—তারপর যেদিক থেকে অর্থাৎ পশ্চাৎ দিক থেকে শব্দটা ভেসে এসেছিল সেই দিকেই চলতে শুরু করে।

চণ্ড আবার শব্দ করে।

এবং তৃতীয়বার শব্দতরঙ্গ মিলিয়ে যাবার আগেই নজরে পড়ে মৃদু জ্যোৎস্না-লোকে অশ্বটা ঐদিকেই ছুটে আসছে। চণ্ডর সামনে এসে অশ্বটা দাঁড়াল।

চণ্ড কোনমতে অশ্বের পৃষ্ঠে আরোহণ করে—এগিয়ে যাবার জন্য অশ্বের বল্গা ধরে ইঙ্গিত করে।

অশ্ব চলতে শুরু করে চণ্ডকে পৃষ্ঠে নিয়ে। ক্লান্ত অবসন্ন চণ্ডকে পৃষ্ঠে নিয়ে তৃতীয় দিন সন্ধ্যায় অশ্ব যোধপুরে এসে পৌঁছায়। অশ্ব সোজা প্রাসাদ-দুর্গের দিকেই এগিয়ে চলে।

রাত্রির অন্ধকার তখন ক্রমশঃ ঘনিয়ে আসছে—প্রাসাদের কক্ষে কক্ষে দীপাবলি জ্বলে উঠেছে।

চণ্ড কোনমতে অশ্বপৃষ্ঠে এলিয়ে পড়েছিল চোখ বুজে। কথা বলবারও তার কোন ক্ষমতা নেই তখন বলতে গেলে। অশ্বশালারই এক পরিচারকের নজরে পড়ে ব্যাপারটা প্রথমে, অশ্বটি চণ্ডকে নিয়ে প্রাসাদদুর্গের অশ্বশালায় এসে প্রবেশ করতেই। সে প্রথমটায় ভেবেছিল চণ্ড বুঝি মৃত। অস্ফুট একটা চিৎকার করে উঠেছিল।

তাড়াতাড়ি একটা আলো নিয়ে এসে ভাল করে তাকায় চণ্ডের মুখের দিকে।

চণ্ড পিটপিট করে তাকাচ্ছে তখনো।

চণ্ড!

কিন্তু পরিচারকের ডাকে চণ্ড কোন সাড়া দেয় না।

পরিচারক অতঃপর চণ্ডকে কোনমতে অশ্বের পৃষ্ঠদেশ থেকে নামায়: একটা খাটিয়ার উপরে বিস্তৃত শয্যার ওপর শুইয়ে দিতে গিয়ে নজরে পড়ে চণ্ডের পরিধেয় বস্ত্রে রক্তের দাগ সর্বত্র।

একি রে চণ্ড—এত রক্ত কোথা থেকে এলো?

চণ্ড কোনমতে ক্ষীণস্বরে কেবল একটা কথাই বলে, মহারাজ—তারপরই চণ্ড চোখ বোজে।

পরিচারকটা প্রথমে বুঝতে পারে না কি করবে—অতঃপর তার করণীয় কি—কিছুক্ষণ বোবা হয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে চণ্ডর দিকে তাকিয়ে।

একটা ব্যাপার সে বুঝতে পারে অনুমানে—কোথাও একটা কিছু গোলমাল ঘটেছে—এবং সে জানত চণ্ড মহারাজের বিশেষ প্রিয়। শুধু প্রিয় না বিশ্বস্তও।

পরিচারকটির মনে হয় মহারাজকে একটা সংবাদ দেওয়া প্রয়োজন। কেননা গত এক মাসের বেশী প্রাসাদদুর্গে চণ্ড ছিল না। সে যে কোথায় গিয়েছে কেউ তা জানত না।

চণ্ড ফিরে এসেছে সে সংবাদটাও বোধ হয় মহারাজের কর্ণগোচর করা উচিত। হয়ত সংবাদটা মহারাজকে দিতে পারলে মোটা পারিতোষিকও মিলতে পারে।

পরিচারকটি আর বিলম্ব করে না। প্রাসাদদুর্গের অন্দরের দিকে অগ্রসর হয়।

প্রধান দ্বারীর সঙ্গে দেখা করে পরিচারকটি বলে সে মহারাজের সঙ্গে জরুরী একটা ব্যাপারে দেখা করতে চায়।

কি জরুরী ব্যাপার?

সে তোমার কাছে আমি বলতে পারবো না।

কেন? বলতে পারবি না কেন? দ্বারী শুধায়।

যা বললাম তাই কর। মহারাজকে খবরটা দাও।

কি ব্যাপার আমাকে না বললে দেবো না খবর।

দেবে না ?

না।

বেশ—দিও না। আমি চললাম ফিরে—যখন কাল শির যাবে তখন—কথাটা আর শেষ করে না পরিচারক। ফিরবার জন্য ঘুরে দাঁড়ায়।

আরে শোন—শোন—যাচ্ছিস কেন—দাঁড়া আমি খবর দিচ্ছি—কিন্তু ব্যাপারটা কি বল না ?

জেনে তোমার লাভ নেই, যাও খবরটা দাও।

দ্বারী কটমট করে একবার অশ্বশালার নগণ্য ঐ পরিচারকটির দিকে তাকাল, তারপর ভিতরে গিয়ে একজন দুর্গরক্ষীকে মহারাজকে সংবাদটা পাঠাবার জন্য বলে ফিরে এলো।

কি, খবরটা পাঠিয়েছো ? পরিচারক জিজ্ঞাসা করে।

দ্বারী কোন সাড়া দেয় না।

বেশীক্ষণ ঐ পরিচারককে অপেক্ষা করতে হয় না। কিছুক্ষণ পরেই মহারাজের একজন দেহরক্ষী এসে দাঁড়ায় ওদের সামনে।

কে মহারাজের সাক্ষাৎপ্রার্থী ?

দেহরক্ষী প্রশ্ন করে।

অশ্বশালার পরিচারকটিকে দেখিয়ে দেয় প্রধান দ্বারী :

তুই ?

হ্যাঁ।

কেন মহারাজের সঙ্গে দেখা করতে চাস ?

পরিচারকটি তখন দেহরক্ষীকে একপাশে ডেকে নিয়ে গিয়ে ফিসফিস করে যেন কি বললে।

শুনেই দেহরক্ষী বলে, দাঁড়া—আমি এখুনি আসছি।

দেহরক্ষী আবার প্রাসাদ-দুর্গাভ্যন্তরে অদৃশ্য হয়ে গেল। কিছুক্ষণ পরেই আবার দেহরক্ষী ফিরে এসে বললে, আয় আমার সঙ্গে—

অখ্যাত—অজ্ঞাত প্রাসাদদুর্গের অশ্বশালার সামান্য এক পরিচারক, জীবনে আজ পর্যন্ত কোন দিন তার প্রাসাদদুর্গের অভ্যন্তরে পা দেবার সৌভাগ্য হয় নি। সৌভাগ্য কেন স্বপ্নেও হয়ত সে কথা সে কোন দিন ভাবতে পারে নি।

প্রাসাদদুর্গের মধ্যে দিয়ে যেতে যেতে চারিদিক আলো ও সেই আলোয় ঝলমল চারিদিককার ঐশ্বর্য ও প্রাচুর্য দেখতে দেখতে বেচারা যেন কেমন বোবা—বিহ্বল হয়ে পড়তে থাকে। কোথায় যাচ্ছে—কেন যাচ্ছে বেচারা যেন সব ভুলে যায়।

অবশেষে একসময় মন্ত্রণা-কক্ষের পাশে যে মহারাজের ছোট নিজস্ব বিশ্রাম কক্ষটি সেই কক্ষের মধ্যে এসে দেহরক্ষীর সঙ্গে প্রবেশ করে।

গাঙ্গ কক্ষমধ্যে পায়চারি করছিল। দুটি হাত পশ্চাতে নিবদ্ধ। কক্ষের মধ্যে

আলোর একটা খুব প্রাচুর্য নেই।

পদশব্দে ফিরে তাকাল গাঙ্গ।

চণ্ড কোথায়?

আজ্ঞে অশ্বশালায়।

অজ্ঞান হয়ে আছে?

হ্যাঁ।

আমি এখুনি আসছি অশ্বশালায়—তুই সেখানে যা। পরিচারককে বিদায় করে দেয় গাঙ্গ।

একটি কালো আংরাখা সর্বাঙ্গে জড়িয়ে দুর্গের গোপন সুড়ঙ্গপথ ধরে অতঃপর প্রাসাদ থেকে বের হয়ে অশ্বশালায় গিয়ে প্রবেশ করে গাঙ্গ। চণ্ডর অবস্থা দেখে চমকে ওঠে গাঙ্গ। এবং পরীক্ষা করে বুঝতে পারে লোকটা নিদারুণভাবে আহত।

কিন্তু চণ্ডকে এমনভাবে আহত করল কে? কার দেহে এতখানি শক্তি থাকতে পারে?

কিন্তু সে কথা পরে ভাবলেও চলবে—সর্বাগ্রে লোকটার একটা চিকিৎসার প্রয়োজন। ও অজ্ঞান হয়ে আছে। কোনমতে ওর জ্ঞান ফিরিয়ে না আনতে পারলে সব কিছুই হয়ত জানা যাবে না।

গাঙ্গ অজ্ঞান চণ্ডকে প্রাসাদের মধ্যে নিয়ে আসবার ব্যবস্থা করল। কবিরাজকে সংবাদ পাঠান হলো। কবিরাজ এসে চিকিৎসা করলেন—আহত স্থান পরিষ্কার করে ঔষধ লাগিয়ে দেওয়া হলো।

কি রকম বুঝছো কবিরত্ন?

গাঙ্গ প্রশ্ন করে।

বৃদ্ধ কবিরত্ন মাথা নাড়েন। তিনি তখনো চণ্ডর নাড়ি ধরে আছেন।

কোন আশাই নেই?

মহারাজ, অতিরিক্ত রক্তক্ষরণে প্রাণবায়ু নিস্তেজ হয়ে পড়েছে—ক্ষতও কম নয়—আশা খুবই কম।

কবিরত্ন মিথ্যা বলেন নি। চণ্ডর প্রাণরক্ষা করা গেল না। ক্রমশঃ যত রাত্রি বাড়তে থাকে তার প্রাণবায়ু ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হয়ে আসতে থাকে।

রাত্রির শেষযামে চণ্ড চোখ মেলে তাকাল।

চণ্ড!

গাঙ্গ তার দীর্ঘদিনের প্রিয় অনুচরের মুখের সামনে ঝুঁকে পড়ে।

চণ্ড ছল ছল চোখে তার প্রভুর মুখের দিকে কেমন যেন অসহায় বোবা দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে।

চণ্ড, কে তোকে এমন করে আহত করল?

ক্ষীণকণ্ঠে চণ্ড জবাব দেয়, বীরেন্দ্র।

বীরেন্দ্র সিংহ—কোথায়, কোথায় সে? উত্তেজিত গাঙ্গ প্রশ্ন করে।

চিতোরগড়ে।

কি—কি বললি—বীরেন্দ্র চিতোরগড়ে ? পার্বতী—পার্বতী কোথায় ?

চিতোরগড়ে।

চিতোরগড়ে কোথায়—কোথায় ?

কিন্তু আর বাক্যস্ফূর্তি হয় না চণ্ডর কণ্ঠ থেকে। চোখ দুটো তার বুজে যায়। মাথাটা একপাশে হেলে পড়ে। চণ্ডর কণ্ঠস্বর চিরদিনের জন্য বন্ধ হয়ে যায়।

অধীর আগ্রহে তথাপি গাঙ্গ চণ্ডকে ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে বলে চণ্ড, বল, বল—বীরেন্দ্র-পার্বতী কোথায় আছে চিতোরগড়ে—

কবিরত্ন বলেন, ও আর বেঁচে নেই মহারাজ।

হ্যাঁ!

হ্যাঁ মহারাজ, ওর মৃত্যু হয়েছে।

গাঙ্গ চণ্ডকে ছেড়ে দিল। মাথার মধ্যে একটা মাত্রই চিন্তা তখন গাঙ্গের—পার্বতী—বীরেন্দ্র—চিতোরগড়ে—আর কিছুই গাঙ্গ যেন ভাবতে পারে না। ভাবতে পারছে না।

পার্বতী—বীরেন্দ্র—চিতোরগড়ে। কিন্তু কোথায় ? রাণা সংগ্রাম সিংহ কি তাদের সংবাদ পেয়েছে ?

॥ ২৮ ॥

মেওয়ারের মহারাণা সংগ্রাম সিংহ। পার্বতীর মুখ থেকে কথাটা উচ্চারিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই বীরেন্দ্র যেন চমকে আবার রাণার মুখের দিকে তাকায়।

মেওয়ারের সেই একচক্ষু মহারাণা। সেই দুর্ধর্ষ বীর। আর বীরেন্দ্র শুনেছিল এই মহারাণার সঙ্গেই মহারাজ গাঙ্গ মনে মনে তার ভগিনী পার্বতীর বিবাহ দেবার সংকল্প করেছিল এবং মেওয়ারে দূতও প্রেরণ করেছিল। যদিও সে কথা বীরেন্দ্র কখনো পার্বতীকে জানায় নি।

বীরেন্দ্র যেন মুহূর্তে নিজেকে সামলে নেয়—মহারাণাকে অভিবাদন জানায়।

সংগ্রাম সিংহ বীরেন্দ্রর মুখের দিকে তাকিয়ে ছিল। শুধু মুখ কেন বীরেন্দ্রর সর্বাঙ্গে দৃষ্টি বুলিয়ে তাকে দেখছিল। সুগঠিত চেহারার যুবক।

চোখেমুখে আত্মবিশ্বাস ও প্রত্যয়ের চিহ্ন। বুদ্ধিতে উজ্জ্বল।

সংগ্রাম সিংহ আবার পার্বতীর দিকে ফিরে তাকাল, অপরূপ রূপ-লাবণ্যময়ী নারী। যৌবন ঢলঢল দেহ। মিথ্যা শোনে নি সংগ্রাম সিংহ।

বীরেন্দ্র।

বলুন মহারাণা। জবাব দিয়ে সসম্ভ্রমে বীরেন্দ্র রাণার দিকে তাকাল। মনের মধ্যে তখন তার বিশ্রী একটা স্পন্দন চলেছে—একটা চিন্তার ঘূর্ণি বয়ে চলেছে।

কানা সঙ্গ—

ভ্রাতৃকলহে একটি চক্ষু ও হারিয়েছিল। দৈবচক্রে আজ সে মেওয়ারের

সিংহাসনে। কোন পরিচয়ই অবিশ্যি রাণা সংঘ সম্পর্কে ও জানে না। কিন্তু ওর দু চোখের তারায় যে লোভের আগুনটা ঝিলিক দিচ্ছে থেকে থেকে সেটা বীরেন্দ্রর বুঝতে কষ্ট হয় না।

বীরেন্দ্র—আমি সব শুনেছি পার্বতীর মুখে—রাণা বলে, তোমরা দুজনে পরস্পর পরস্পরের কাছে বাগ্‌দত্ত—তোমরা পরস্পর পরস্পরকে ভালবাস।

বীরেন্দ্র রাণার মুখের দিকেই চেয়ে থাকে। লোকটার মনের ভাবটা বুঝবার চেষ্টা করে বুঝি।

কি মতলব ওর—কি করতে চায় ওদের নিয়ে ?

বলছিলাম কি তুমি এখানে সুচিৎ সিংহের আশ্রয়ে থাকতে পার কিন্তু মাড়বার অধিপতির ভগিনী—রাজকুমারীর এটা যে যোগ্য বাসস্থান নয় কথাটা নিশ্চয়ই তুমি বুঝতে পারছো।

আপনি বোধ হয় একটু ভুল করছেন মহারাণা—শান্ত কণ্ঠে কথাটা বলে বীরেন্দ্র।

ভুল করছি।

হ্যাঁ—কারণ পার্বতী সম্পর্কে যোধপুরাধিপতির ভগিনী ঠিকই—কিন্তু আজ তার সে পরিচয়ের আর কোন দাবী নেই।

দাবী নেই ?

মহারাণা বিস্ময়ের সঙ্গে যেন বীরেন্দ্রর দিকে তাকায়। কি বলতে চায় ঐ যুবক ?

বীরেন্দ্র বলে, না—কারণ আপনি যখন আমাদের সব কথা শুনেছেন নিশ্চয়ই এও শুনেছেন মহারাজ গাঙ্গ ওকে ভগিনী বলে আর স্বীকার করেন না এবং রাজ্য হতে বহিষ্কৃত করেছেন।

হ্যাঁ—হ্যাঁ—শুনেছি সব কথা, অভিমানের বশে আকস্মিক ক্রোধের বশে হয়ত মহারাজ গাঙ্গ কথাটা বলেছেন কিন্তু তাই বলে সেটাই তো কিছু আর সত্য নয়, আর তারও শেষ কথা নয়। না, না—সেজন্য তোমরা ভেবো না। সে যা করবার আমিই ব্যবস্থা করবো। মহারাজকে আজই আমি পত্র প্রেরণ করব।

তার কোন প্রয়োজন নেই মহারাণা। এবারে কথাটা বলে পার্বতীই।

প্রয়োজন আছে বৈকি—এ তো আর হতে পারে না—দেখছি অভিমানটা তোমারও কম হয় নি রাজকুমারী।

অভিমান ? না মহারাণা—শান্ত গলায় পার্বতী অতঃপর বলে, অভিমান কারো ওপরই আমার কিছু নেই। মাড়বারের সঙ্গে কোনপ্রকার যোগাযোগের কোন চেষ্টা করবেন না। তাছাড়া মাড়বারের কথা আমি ভুলে গিয়েছি।

ভুলে গিয়েছো ?

হ্যাঁ—বিবাহের পর স্ত্রীলোকের পিতৃগৃহের কথা ভুলে যেতেই তো হয়। স্বামীগৃহই তখন তার একমাত্র গৃহ। একমাত্র আশ্রয়—একমাত্র গৃহ-পরিচয়।

বিবাহের পর—কিন্তু বিবাহ তো তোমাদের এখনো হয় নি।

বীরেন্দ্র যেন কি জবাব দিতে উদ্যত হয়েছিল কিন্তু তার পূর্বেই পার্বতী

বলে ওঠে, কে বললে মহারাণা যে আমাদের বিবাহ হয় নি ? গন্ধর্বমতে আমাদের বিবাহ হয়ে গিয়েছে—ঈশ্বরকে সাক্ষী রেখে আমরা পরস্পরকে পরস্পর গ্রহণ করেছি। আমার জন্য আপনি চিন্তা করবেন না—আমার স্বামী যেখানে থাকবে আমিও সেখানেই থাকব।

না, না—তুমি আমার প্রাসাদে থাকবে চল।

না মহারাণা—আমার স্বামীকে ছেড়ে আমি কোথায়ও যাবো না। পার্বতীর গলার স্বরটা শান্ত হলেও কঠিন।

শোন রাজকুমারী, সুচিৎ সিংহের এ গৃহ সত্যিই তোমার পক্ষে নিরাপদ নয়।

সে তো বুঝতেই পারছি মহারাণা, সঙ্গে সঙ্গে পার্বতী জবাব দেয়, নচেৎ আমাদের নিশ্চিন্ত আশ্রয়ের আশ্বাস দিয়ে গোপনে গিয়ে সুচিৎ সিংহ আপনাকে সংবাদটা দেবে কেন ? আপনি আমাদের কথা চিন্তা করে আমাদের আশ্রয় দেবার জন্য সঙ্গে সঙ্গে ছুটে এসেছেন—সংবাদটা পেয়েই সেজন্য আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই—কিন্তু আমাদের জন্য আপনি কোন চিন্তা করবেন না। আমার স্বামী নিজেকে ও তাঁর ধর্মপত্নীকে রক্ষা করবার মত শক্তি রাখে তার দু বাহুতে।

না, না—রাজকুমারী, তুমি আমকে ভুল বুঝ না। তোমাদের বিশেষ করে তোমার মঙ্গল চিন্তায়ই কথাটা উত্থাপন করেছিলাম।

সেজন্য সহস্র জানাচ্ছি মহারাণা। পার্বতী পূর্ববৎ শান্ত গলায় বলে।

রাণা সংঘ বুঝতে পারে পার্বতীকে সম্মত করানো যাবে না তাই মুহূর্তকাল ভেবে বলে, ঠিক আছে—এখানেই যদি তোমরা থাকতে চাও তো থাক।

কথাটা বলে সংগ্রাম সিংহ আর দাঁড়াল না। কক্ষ হতে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেল।

এতক্ষণ বীরেন্দ্র একপাশে নির্বাক শ্রোতা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। সংগ্রাম সিংহ কক্ষ হতে নিষ্ক্রান্ত হয়ে যেতেই বীরেন্দ্র ডাকে, পার্বতী ?

চল বীরেন্দ্র আমরা বের হয়ে পড়ি—পার্বতী বলে।

কোথায় যাবে ?

মাড়বার আর মেওয়ার ছাড়া কি রাজস্থানে আর মাথা গোঁজবার মত ঠাঁই নেই ? আরাবল্লীর পর্বত রয়েছে—গভীর অরণ্য রয়েছে—দিগন্তবিস্তারী মরুভূমি রয়েছে—আমরা সেখানে গিয়েই ঘর বাঁধবো। সেখানে নিশ্চয়ই মানুষ এত নীচ নয়—বিশ্বাসহন্তা নয়—মানুষকে মানুষ ভালবাসে—শ্রদ্ধা করে—বিশ্বাস করে।

সেই ভাল পার্বতী—চল তাই আমরা যাবো।

কিন্তু সুচিৎ সিংহের গৃহ হতে কিছুক্ষণ পর বেরুতে গিয়ে বীরেন্দ্র ও পার্বতী দুজনাই থমকে দাঁড়ায়। ঐ গৃহ হতে বের হয়ে যাবার দরজাটা খোলা নেই আর। ইতিমধ্যে কখন যেন সেটা বন্ধ হয়ে গিয়েছে। তারা তাহলে পুনরায় বন্দী হলো এখানে।

দরজা খুলতেই বীরেন্দ্রর চোখে পড়ে সশস্ত্র সৈনিক দুজন দ্বারের দুই পাশে।

তারাই বাধা দেয়, ক্ষমা করবেন—সেনাধ্যক্ষর অনুমতি ব্যতীত এ গৃহ থেকে কারুর বাইরে যাওয়া বা আসা—

সৈনিকের কথাটা শেষ হয় না, বীরেন্দ্রর চোখের মণি দুটো ধক্ করে জ্বলে

ওঠে। একটা হাত বুঝি তার অজ্ঞাতেই কোষবদ্ধ অসির বাঁটের উপর গিয়ে পড়ে।

চাপা আক্রোশভরা কণ্ঠে বলে বীরেন্দ্র, কোথায় তোমাদের সেনাধ্যক্ষ ?

তিনি আপাততঃ গৃহে নেই।

বীরেন্দ্র তার কোষবদ্ধ অসি শক্ত মুঠিতে ধরে টেনে বের করতে যাচ্ছিল, কিন্তু পার্বতী তাকে বাধা দেয়, না বীরেন্দ্র।

বীরেন্দ্র পার্বতীর দিকে ফিরে তাকায়।

ওদের প্রতি ক্রুদ্ধ হচ্ছো কেন ? ওদের প্রতি যেমন নির্দেশ আছে তেমনি ওরা বলেছে—চল ভিতরে চল—

পার্বতী বীরেন্দ্রকে একপ্রকার টেনেই ভিতরে নিয়ে আসে।

বীরেন্দ্র বলে, কি ভেবেছে শয়তানটা—আমাদের এখানে কৌশলে বন্দী করে রাখবে ? তুমি বাধা দিলে কেন—ওদের হত্যা করে—

না—

না। কি বলছো তুমি পার্বতী ?

ওদের দুজনকে হত্যা করে আমরা হয়ত এ গৃহের বাইরে এক্ষুনি চলে যেতে পারতাম কিন্তু চিতোরগড় থেকে বেরুতে পারতাম না হয়ত—একা তো সুচিৎ সিংহ নয়—ভুলে যাচ্ছো কেন এ সব কিছুর পশ্চাতে রয়েছে স্বয়ং চিতোরের মহারাণা আর এটা তার রাজ্য।

তাই বলে এমনি নিরুপায়ের মত ওদের অত্যাচার সহ্য করে যাবো ? প্রতিবাদও জানাবো না ?

নিশ্চয়ই সহ্য করবো না।

তবে ?

এখুনি কিছু করা উচিত হবে না, যা করবার ভেবেচিন্তে করতে হবে আমাদের।

কিন্তু, আমি ভেবে পাচ্ছি না পার্বতী—কি করে তা সম্ভব হবে ? একবার যদি ওদের বন্দীত্ব স্বীকার করে নিই—

নিশ্চয়ই আমরা ওদের দেওয়া বন্দীত্ব স্বীকার করে নেবো না—আর এখান থেকে বেরুবার একটা পথও নিশ্চয়ই খুঁজে পাবো আমরা। বের করতেই হবে খুঁজে।

উঃ কি শয়তান ঐ সুচিৎ সিংহ—বন্ধুত্বের মুখোশ মুখে এঁটে—

শোন বীরেন্দ্র, আমাদের মনে যাই থাক আমরা জানতে দেবো না ওদের কোনমতেই। আমরা এখানে সুখেই আছি, আনন্দেই আছি—এটাই ওদের বুঝতে দিতে হবে।

কিন্তু রাণা যদি তোমাকে প্রাসাদে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে জোর করে ?

পার্বতীর ওষ্ঠপ্রান্তে অদ্ভুত একটা হাসির রেখা জেগে ওঠে। সে বলে, জোর করে ? সে চেষ্টা করলে রাণা ভুলই করবে।

ওদের কথা শেষ হলো না। বাইরে পদশব্দ পাওয়া গেল।

চাপা সতর্ক কণ্ঠে বীরেন্দ্রকে সাবধান করে দিয়ে বলে, কে যেন আসছে

এদিকে। লঘু পদশব্দ।

পার্বতীবাঈ। নারীকণ্ঠ শোনা গেল।

দুজনাই পার্বতী ও বীরেন্দ্র যুগপৎ সেই নারীকণ্ঠ শুনে যেন চমকে দরজার দিকে তাকায়, কক্ষের দরজা পুনরায় বীরেন্দ্র ভিতর থেকে বন্ধ করে দিয়েছিল।

পূর্ববৎ আবার নারী-কণ্ঠস্বর শোনা গেল, পার্বতীবাঈ।

বীরেন্দ্রর ইঙ্গিতে পার্বতী এগিয়ে গিয়ে দ্বার অর্গলমুক্ত করে—এবং সামনেই ও দেখতে পায় তার চাইতে বয়সে কিছু বড়ই হবে এক নারী। শ্যামবর্ণ। সুঠাম দেহ।

পার্বতী ওকে দেখামাত্রই বুঝতে পারে—ও রাজপুতানী নয়—অরণ্যবাসিনী কোন ভীলরমণী।

সে তার ভাষাতেই কথা বলে, মংলুটা আমায় সব বলে দিয়েছে—সুচিৎ সিং নাকি তোমাদের এখানে বন্দী করেছে?

ওরা কি বলবে বুঝতে পারে না, বুঝতে পারে না ঐ পার্বত্য নারীর সত্যিকারের মতলবই বা কি।

কিন্তু—, স্ত্রীলোকটি আবার বলে, আমি বলে দিয়েছি—আমি যতক্ষণ আছি কোনরকম শয়তানী চলবে না—তাহলে একেবারে তীর চালিয়ে শেষ করে দেবো।

এতক্ষণে পার্বতী যেন কথা বলবার মত উৎসাহ পায়। বলে, তুমি কে?

আমি?

ও হেসে ফেলে। একঝাঁক সাদা মুক্তোর মত দাঁত ওষ্ঠের ফাঁকে ঝিকিয়ে ওঠে যেন।

আমি?

হ্যাঁ—কে তুমি? কি নাম তোমার?

আমার নাম কুর্চি—

কুর্চি?

হ্যাঁ—তোমার নামই তো পার্বতী?

হ্যাঁ। পার্বতী মাথা হেলিয়ে সম্মতি জানায়।

তুমি বুঝি এই বাড়িতেই থাক? পার্বতী পুনরায় শুধোয়।

না, না—এখানে কেন থাকব?

তবে?

থাকি তো গড়ের বাইরে—

মংলু বুঝি তোমার মরদ?

না।

তবে?

ওর মরদ হবার মত সাহস আছে নাকি—পাঁচ বছর ধরে আমাকে ঘোরাচ্ছে—ওর কথা আর বলো না। তারপরই একটু থেমে বলে, কিছু আগে দেখলাম, মহারাণা এ-বাড়ি থেকে বের হয়ে গেল।

হ্যাঁ—মহারাণা এসেছিল।

মহারাণা পুরুষ আদৌ ভাল নয়।

ভাল নয় ?

না, না।

কেন ?

বাঃ জান না—আমাদেরই রাজার মেয়ে যে রত্না—রত্নাই তো ওই রাণার প্রথম মহিষী। রত্নার মত মেয়ে হয় না—রত্নার মত মহিষী থাকলে কেউ আবার বিয়ে করে নাকি ? ও আরো দুবার বিয়ে করেছে।

পার্বতী মৃদু হাসে। মেয়েটা সত্যিই ভারি সরল।

তুমি কিছু ভেবো না, কুর্চি বলে, পার্বতীবাঈ—আমি আজই প্রাসাদে গিয়ে রাণার মহিষী রত্না দেবীকে সব কথা জানাব। সে নিশ্চয়ই তোমাকে রক্ষা করবে—কোন এক উপায়ে।

কিন্তু যদি না করে ? পার্বতী বলে।

হ্যাঁ—হ্যাঁ—করবে। তুমি তাকে জান না—আর মংলুকেও স্পষ্ট করে আমি জানিয়ে দিয়েছি—তোমাদের এতটুকু ক্ষতি হলে আমি ওকে ছেড়ে কথা বলবো না। ও আমাকে কথা দিয়েছে, তোমাদের কোন অমর্যাদা হবে না।

পার্বতী সত্যিই বড় চিন্তিত হয়ে উঠেছিল—কুর্চির কথায় অনেকটা যেন সাহস মনের মধ্যে খুঁজে পায়।

এখন আমি যাই—কেমন ?

এসো।

তোমরা কিছু ভেবো না। কুর্চি কক্ষ থেকে বের হয়ে গেল।

রাণা সংঘ প্রাসাদে প্রত্যাবর্তন করবার পরই ও'র প্রধান দেহরক্ষী এসে জানায়, প্রধান অমাত্য লক্ষ্মণ সিংহ অনেকক্ষণ ধরে মন্ত্রণাকক্ষে মহারাণার অপেক্ষায় বসে আছে।

লক্ষ্মণ সিংহ—এত সকালে কেন ?

রাণা সংঘ মন্ত্রণাকক্ষে গিয়ে প্রবেশ করে।

প্রৌঢ় লক্ষ্মণ সিংহ সসম্ভ্রমে উঠে দাঁড়িয়ে মহারাণাকে অভিনন্দন জানায়।

কি সংবাদ মহামাত্য ?

দৌলত খাঁর দূত জরুরী এক পত্র নিয়ে এসেছে।

দৌলত খাঁর দূত !

হ্যাঁ—মহারাজ গাঙ্গর মাড়বারের সিংহাসনে উপবেশনকে কেন্দ্র করে স্বর্গীয় মহারাজ যোধের সন্তান-সন্ততিরা আজ পরস্পর পরস্পরের রক্ত-শোণিত পান করবার জন্য উন্মত্ত হয়ে উঠেছে—আপনাকেও সেদিন সে কথা জানিয়েছিলাম —

হ্যাঁ—হ্যাঁ—বলেছিলেন তো।

গাঙ্গের পিতৃব্য শাগই ঐ ব্যাপারে সর্বাপেক্ষা বেশী রুষ্ট বলে মনে হয়, তারই চেষ্টায়—পরামর্শে মাড়বারে আজ ঐ অন্তর্বিপ্লব দেখা দিয়েছে।

কিন্তু দৌলত খাঁ—দৌলত খাঁ শাগের দলে যোগ দিয়েছে।

দৌলত খাঁর পত্র আপনি পড়েছেন ?

পড়েছি। ঐ যবন অত্যন্ত কূটকৌশলী। পত্রের সারমর্ম, যদিও সে ব্যাপারটার আপনার সাহায্যে মধ্যস্থতা করে একটা মীমাংসা করে দিতে চায় কিন্তু আমার মনে হয় তা নয়।

কি তবে ?

এর মূল অনেক দূর পর্যন্ত বিস্তৃত।

কি বললেন আপনি মহামাত্য ?

তাই। আমার অনুমান যদি মিথ্যা না হয় তো—মাড়বারের সিংহাসনই এর শেষ নয়—এর শেষ দিল্লীর সিংহাসন।

॥ ২৯ ॥

রাণা সংঘ তার মহামাত্যর কথাটা শুনে সত্যিই চিন্তিত হয়ে ওঠে। মহামাত্যর বয়স হয়েছে। মাথার কেশ তার পেকে প্রায় সবই সাদা হয়ে গিয়েছে। এবং লোকটি যে সত্যিকারের একজন বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ তাই নয় চিতোরের সত্যিকারের একজন মঙ্গলাকাঙ্ক্ষীও। চিতোরের অনেক দুর্যোগ ইতিপূর্বে তার মাথার উপর দিয়ে গিয়েছে। এবং মহামাত্যর মত একজন মানুষ সর্বক্ষণ পাশে পাশে আছে বলেই না সংগ্রাম সিংহ অনেকটা নিশ্চিন্ত।

মহামাত্য ?

বলুন রাণা ?

আপনি একটু আগে দৌলত খাঁ সম্পর্কে যা বললেন সত্যিই কি তাই আপনার ধারণা ? যবন দৌলত খাঁর মনে অমনি সত্যিই কোন দুরভিসন্ধি আছে ?

দৌলত খাঁকে চিনতে ত আমাদের কারো বাকী নেই রাণা। স্বার্থান্ধ হিতাহিতজ্ঞানশূন্য শাগ আজ ভুলে গেলেও আমরা তো জানি ঐ যবন দৌলত খাঁই ঐ শাগের পিতৃপুরুষদের হাত থেকে নাগোর ছিনিয়ে নিয়ে ভোগদখল করছে। সেই লোকটা একেবারে বিনা স্বার্থে, শাগ আজ তার সঙ্গে এসে হাতে হাত মিলিয়েছে বলেই, তাকে সাহায্য করবার জন্য উদগ্রীব হয়ে উঠেছে আর যেই বিশ্বাস করুক আমি করি না।

তাহলে দৌলত খাঁর প্রেরিত দূতকে কি জবাব দেওয়া যায় ?

শুনুন রাণা, আমার পরামর্শ যদি গ্রহণ করেন তো এই সময় মাড়বারের মহারাজ গাঙ্গের পক্ষ ত্যাগ করা উচিত হবে না। প্রথমতঃ তার ভগিনীর সঙ্গে আপনার বিবাহ স্থির হয়ে আছে এবং দ্বিতীয়তঃ একটা কথা ভুলে যাবেন না মহারাজ, গাঙ্গ সত্যিকারের একজন বীরপুরুষ—তাকে যোগ্য পাত্র বিবেচনা না করলে স্বর্গত মহারাজ সুরজমল তাকেই মাড়বারের সিংহাসন দিয়ে যেতেন না। এখন আপনিই বিবেচনা করে দেখুন দৌলত খাঁর পত্রের কি জবাব দেবেন ?

আপনিই বলুন মহামাত্য। আপনি যেমন বলবেন তাই হবে।

মাড়বারের বীররা আজ দুই দলে বিভক্ত হয়েছে স্পষ্টই বুঝতে পারছি। দুই প্রতিদ্বন্দ্বী রাঠোর রাজকুমারদের ভাগ্য নিজেদেরই ঠিক করে নিতে দিন। দৌলত খাঁর পত্র তো দেখলেন, সে একটা মিটমাটের প্রস্তাব মাড়বারাধিপতির কাছে পাঠিয়েছিল, কিন্তু গাঙ্গ সদর্পে সে প্রস্তাব অগ্রাহ্য করেছে। তিনি তার নিজ বাহুবলে বিশ্বাসী বলেই যবন দৌলত খাঁর প্রস্তাবটি প্রত্যাখ্যান করতে সাহস পেয়েছেন। আমারও মনে হয় মহারাজ গাঙ্গের সঙ্গে তার প্রতিদ্বন্দ্বী দল কিছুতেই পেরে উঠবে না। গাঙ্গকে সাহায্য এ সময় আপনি করেন তো ভালই —আর নাই যদি অতটা করেন অন্তত এ ব্যাপারে আমাদের দূরে থাকাই ভাল— আপনি সেই ভাবেই পত্রের উত্তর দিয়ে দিন।

বেশ। তবে তাই হোক।

মহামাত্যর নির্দেশানুযায়ীই অতঃপর পত্র রচিত হলো এবং সেই পত্রে স্বাক্ষর করে মোহর দিয়ে দৌলত খাঁর প্রেরিত দূতের হাতে তুলে দেওয়া হলো। দৌলত খাঁর দূত প্রস্থান করল।

শাগ ফিরে এলো নাগোর যুদ্ধশিবিরে। গাঙ্গকে মুঠোর মধ্যে আনবার যে পরিকল্পনা করেছিল মনে মনে সেটা যে এমনি করে বানচাল হয়ে যাবে সেটা বুঝি তার স্বপ্নেরও অতীত ছিল। শাগের যেন নিজের হাত নিজেরই চর্বণ করতে ইচ্ছা করছিল। কিন্তু তীর তূণ থেকে বের হয়ে গিয়েছে এখন আর আফসোস করেও লাভ নেই। নিজের সহধর্মিণীই যে তার সঙ্গে এত বড় শত্রুতা করবে এটাই কি কোন দিন ভাবতে পেরেছে?

শাগ যে হঠাৎ যুদ্ধশিবির ছেড়ে চলে গিয়েছে প্রথমটায় জানতে পারে নি। দৌলত খাঁ কথাটা জানবার পর অত্যন্ত চিন্তিত হয়ে ওঠে।

শাগের মতলবটা কি? হঠাৎ সে বুরবোতে ফিরে গেল কেন কাউকে কিছু না জানিয়ে?

প্রকৃতপক্ষে শাগ এসে তার সঙ্গে মিলিত হতেই দৌলত খাঁ এতটা অগ্রসর হয়েছিল, এমন কি চিতোরের রাণা সংঘের কাছেও পত্র প্রেরণ করেছে। কিন্তু এখন যদি শাগই সরে দাঁড়ায় গাঙ্গের অন্যান্য খুল্লভ্রাতরা যারা এসে শাগের সঙ্গে আজ মিলিত হয়েছে তারা কেউই হয়ত থাকবে না। এবং তার অনুমানটা যে মিথ্যা নয় সেটা পরের দিন প্রত্যুষেই জানা গেল—যুদ্ধশিবিরে যে শাগ নেই সে কথাটা অন্যান্য রাজন্যবর্গের কাছে চাপা নেই জানা গেল। সবাই জানতে পেরে গিয়েছে কথাটা।

দৌলত খাঁ শিবিরে প্রবেশ করতেই মালবের বীর সিংহই প্রথমে কথাটা উত্থাপন করে, খাঁ, বুরবোঅধিপতি শাগকে দেখছি না কেন?

দৌলত খাঁ ব্যাপারটা যেন কিছুই জানে না এমনি ভান করে বলে, কেন, তিনি কি তাঁর শিবিরে নেই?

না।

কে বললে নেই ?

আমরা জেনেছি—, এবারে কথা বলে বিকানীরের বিকো সিংহ, কাল রাত থেকেই তিনি তাঁর শিবিরে নেই।

কিন্তু তিনি যাবেন কোথায় ? যুদ্ধের সব প্রস্তুত—

তাই ত জিজ্ঞাসা করছি, বীর সিংহ বলে, এ সময় তিনি গেলেন কোথায় ?

উদোর জ্যেষ্ঠপুত্র সুজন সিংহ বলে, তিনি বুরবোয় ফিরে গেছেন—

না, না—তা কি করে হবে ?

তাই—গতকাল গভীর রাত্রে তিনি শিবির ত্যাগ করে গেছেন। অশ্বারূঢ় হয়ে যখন তিনি যাচ্ছেন আমার একজন প্রহরী তাঁকে দেখতে পেয়েছিল।

বীর সিংহ আর নিজের ক্রোধ সংবরণ করতে পারে না। বলে, বিশ্বাসঘাতক—

বীর সিংহের কথা শেষ হয় না—অশ্বক্ষুরধ্বনি কানে এলো।

দৌলত খাঁ বলে, মনে হচ্ছে কোন অশ্বারোহী এই দিকেই আসছে।

একজন প্রহরীকে ডেকে ব্যাপারটা খোঁজ নিতে বলে দৌলত খাঁ। প্রহরী আজ্ঞা পালনের জন্য বেরুতে যাবে এমন সময় ধূলি-ধূসরিত, অশ্ব পরিচালনা ও রাত্রি জাগরণে ক্লান্ত শাগ এসে শিবিরের মধ্যে প্রবেশ করল।

দৌলত খাঁই সর্বাগ্রে আহ্বান জানায়, বুরবোধিপতি, এই যে কোথায় গিয়েছিলেন।

বিশেষ একটা প্রয়োজনে বুরবোয় যেতে হয়েছিল আমাকে কাল রাত্রে, শাগ বলে।

সকলেই পরস্পর পরস্পরের মুখ চাওয়াচাওয়ি করে।

খাঁ!

শাগের ডাকে দৌলত খাঁ ওর মুখের দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকায়।

আমাকে কিছু বলছিলেন ?

হ্যাঁ—চিতোরে যে পত্রবাহী দূত প্রেরণ করেছিলেন রাণার কাছে সে ফিরে আসে নি এখনো ?

না—এখনো আসে নি।

বিকো সিংহ মৃদু ব্যঙ্গের হাসি হেসে বলে, চিতোরের প্রেরিত পত্রবাহী দূত রাণা সংগ্রর কাছ থেকে যে কি জবাব নিয়ে আসবে সে কি এখনো আপনি বুঝতে পারছেন না বুরবোঅধিপতি। মাড়বার থেকে যেমন খোলা তরবারি এসেছে চিতোর থেকেও ঠিক তেমনিই একখানি খোলা তরবারি আসবে জেনে রাখুন।

খাঁ বলে, চিতোরাধিপতি এত বড় ভুল করবেন ?

ভুল নয় ?

তবে ?

মেওয়ার ও মাড়বার চিরদিন পরস্পর পরস্পরের বন্ধু বিবাহসূত্রে—কাজেই আমার পরামর্শ যদি গ্রহণ করেন তো বলবো মেওয়ারে প্রেরিত আমাদের পত্রবাহী দূতের অপেক্ষায় বৃথা আর কালক্ষেপ না করাই বোধ হয় বুদ্ধিমানের কাজ হবে।

বিকো সিংহ কথাগুলো বলে সকলের মুখের দিকে তাকায়।

মালবরাজ বীর সিংহ বলে, আমারও মনে হয় খাঁ বিকো সিংহ ঠিকই বলেছেন। আমাদের রাজ্যের মীমাংসা আমাদের বাহুবলের দ্বারাই করে নিতে হবে যখন, তখন বৃথা কালক্ষেপ না করে মাড়বারকে আক্রমণ করাই আমাদের উচিত ছিল অবিলম্বে।

তা হয়ত ছিল বীর সিংহ, দৌলত খাঁ বলে, তাহলেও আমি চেয়েছিলাম একেবারে যুদ্ধ শুরু না করে আলাপ-আলোচনার দ্বারা যদি একটা মীমাংসায় আমরা পেঁছাতে পারি—আর সেই কারণেই মহারাজ গাঙ্গাকে পত্র প্রেরণ করেছিলাম। এবং চিতোরাধিপতিকেও সেই কারণেই পত্র প্রেরণ করেছি—দূত হয়ত আজকের মধ্যেই চিতোর থেকে এসে পড়বে, যদি আপনার অনুমানই সত্য হয় কালই প্রত্যুষে আমরা যুদ্ধযাত্রা করব—আমরা তো প্রস্তুত হয়েই আছি।

দ্বারী এসে কুর্নিশ করল দৌলত খাঁকে ঐ সময়।

কি সংবাদ?

চিতোর থেকে দূত ফিরে এসেছে।

যাও—শীঘ্র এখানে তাকে পাঠিয়ে দাও।

একটু পরেই দ্বারীর সঙ্গে চিতোরে প্রেরিত পত্রবাহী দূত শিবিরের মধ্যে এসে প্রবেশ করে সকলকে অভিবাদন জানাল।

রাণা পত্রের জবাব দিয়েছেন?

হ্যাঁ।

দূত একখানি ভাঁজকরা পত্র সসম্ভ্রমে দৌলত খাঁর দিকে এগিয়ে দেয়।

পত্র পড়তে পড়তে দৌলত খাঁর মুখ গম্ভীর হয়ে ওঠে।

শাগ শুধায়, কি জবাব দিয়েছেন রাণা।

মাড়বার অধিপতির বিরুদ্ধাচরণের কোন ব্যাপারে তিনি থাকতে সম্মত নন।

সম্মত নন। বিকো সিংহ প্রশ্ন করে।

না। তিনি লিখেছেন, এ মাড়বারের ঘরোয়া ব্যাপার—তিনি সম্পূর্ণ তৃতীয় পক্ষ—মাড়বারের এ ব্যাপারে কোন স্বার্থ থাকতে পারে না—কোন সম্পর্ক থাকতে পারে না।

হুঁ। শাগের কপালে ভ্রূকুটি দেখা দেয়।

বিকো সিংহ বলে, এবারে তাহলে?

দৌলত খাঁ মৃদু কণ্ঠে বলে, আর কি—এবারে তাহলে যুদ্ধ।

যুদ্ধ। যুদ্ধের ভেরী বেজে উঠলো। মাড়বারের বীর রাজপুতরা আজ দুই দলে বিভক্ত হয়ে দুইজন প্রতিদ্বন্দ্বী রাঠোর রাজকুমারের পতাকাতলে এসে দাঁড়াল। একদিকে শাগ—অন্যদিকে গাঙ্গ।

দৌলত খাঁ পূর্বেই শাগকে বলেছিল, সে আপাততঃ প্রকাশ্যে ওদের সঙ্গে হাত মিলাবে না—তবে সে তার সৈন্যবাহিনী নিয়ে ওদের পশ্চাতে রইলো। প্রয়োজন হলেই সে তাদের সঙ্গে যোগ দেবে।

সুরজমলের অন্যান্য বংশধরেরা ভুল করেছিল একটু। মহারাজ গাঙ্গ যে কত বড় রণকৌশলী ও কত বড় দুর্ধর্ষ বীর ওরা ঠিক বুঝে উঠতে পারে নি। মরুস্থলীর শ্রেষ্ঠ বীররা গাঙ্গর পতাকাতলে এসে সমবেত হয়।

যুদ্ধ শুরু হবার পর তৃতীয় দিনেই দেখা গেল বিকো সিংহ, বীর সিংহ প্রভৃতি অন্যান্য তাদের দলের সকলের সমবেত প্রচেষ্টাতেও তারা ক্রমশই মার খেয়ে পিছু হটে আসছে। গাঙ্গর প্রচণ্ড আক্রমণের সামনে তারা যেন দাঁড়াতেই পারছে না কোনমতে। ফলে তাদের সৈন্যবাহিনীর মধ্যে বিশৃঙ্খলতা দেখা দেয়।

দৌলত খাঁ পশ্চাতে তার সৈন্যবাহিনী নিয়ে প্রস্তুতই ছিল, সে এবারে এগিয়ে আসে—কিন্তু তাতে করেও গাঙ্গর সৈন্যবাহিনীর সংগে ওরা পেরে ওঠে না। মার খেয়ে পিছু হটতে থাকে।

চতুর্থ দিনের যুদ্ধে আকস্মিক ভাবে এক নিক্ষিপ্ত তীরের আঘাতে যুদ্ধস্থলেই শাগের মৃত্যু হলো—বিষাক্ত তীরে বিদ্ধ হয়ে শাগ অশ্বপৃষ্ঠ হতে ভূতলে পতিত হলো।

বিকো সিংহও মারা গেল ঐ দিনই।

আর দৌলত খাঁ ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে কোনমতে প্রাণ হাতে করে পালিয়ে রক্ষা পেল। গাঙ্গের অন্যান্য প্রতিদ্বন্দ্বীরা যুদ্ধক্ষেত্র হতে পালাল।

যুদ্ধে গাঙ্গেরই জয় হলো অতঃপর। সগৌরবে যুদ্ধে জয়ী হয়ে গাঙ্গ যোধপুরে ফিরে এলো।

দুর্গপ্রাসাদ আলোয় সাজানো হলো। রাজ্যে উৎসব শুরু হয়ে যায়। যুদ্ধ-জয়ের উৎসবে যখন সমগ্র যোধপুর মত্ত—চিতোর থেকে এক দ্রুতগামী অশ্বারোহী রাণার নিকট হতে এক জরুরী পত্র নিয়ে এলো।

মহারাজের সাক্ষাৎপ্রার্থী সে।

মন্ত্রণাকক্ষে গাঙ্গ দূতের হাত থেকে পত্র নিল। এবং প্রদীপের আলোর সামনে রাণার পত্রখানি মেলে ধরল।

মহারাজ গাঙ্গ,

আশা করি আপনার ভগ্নীর সংগে আমার বিবাহের কথাটা ভুলে যান নি। বিবাহের ব্যাপারে আমি আর কালহরণ করতে চাই না বৃথা। সামনের পূর্ণিমাতেই যদি মহারাজের কোন আপত্তি না থাকে শুভ কাজ সম্পন্ন করতে চাই। আপনার পত্রের জবাব পেলেই আমরা বিবাহের জন্য যাত্রা করবো।

কুশল কামনা করি—

রাণা সংঘ।

পত্রটা বার বার দুবার পড়ে গাঙ্গ দূতকে বলে, তুমি আজ বিশ্রাম কর—কাল প্রত্যূষে জবাব দেবো—

দূত অভিবাদন জানিয়ে কক্ষ ত্যাগ করে।

কিন্তু অতঃপর? কি ব্যবস্থা হবে? কি ব্যবস্থা গাঙ্গ করবে? রাণার পত্রের কি জবাব সে দেবে? অস্থির পায়ে মন্ত্রণাকক্ষের মধ্যে পায়চারি করতে থাকে গাঙ্গ।

চণ্ডর মুখ থেকে যে সংবাদ পাওয়া গিয়েছে তা হচ্ছে পার্বতী এখন চিতোরে। অবিশ্যি চণ্ড বলতে পারে নি—বলবার সুযোগ পায় নি পার্বতী চিতোরের কোথায়। হয়ত এমনও হতে পারে রাণা সংগ্র পার্বতীর বর্তমানে চিতোরে অবস্থানের কথা জানে।

আর জেনেশুনেই হয়ত এই পত্র প্রেরণ করেছে তাকে। মন্ত্রণাকক্ষের মধ্যে প্রহরের পর প্রহর উত্তীর্ণ হয়ে যায়—গাঙ্গের যেন কোন চেতনা নেই। সেই যে পায়চারি শুরু করেছে এখনো করে চলেছে।

সহসা মন্ত্রণাকক্ষের দেওয়ালে যেন একটা ছায়া পড়লো। কে?

মহারাজ আমি—নর্তকী রম্ভা।

রম্ভা!

হাঁ মহারাজ!

কি চাও?

আর কতদিন এভাবে প্রাসাদদুর্গে আমাকে বন্দিনী করে রাখবেন?

বন্দিনী তো তুমি নও রম্ভা—, তারপরই একটু থেমে বলে, একটা প্রশ্নের জবাব দেবে রম্ভা?

বলুন?

মুক্তি যে তুমি চাও তা কোথায় তুমি যাবে? কোথায় যেতে চাও?

তা জানি না।

তবে? যাবার জন্য তুমি অধীর হয়েছো কেন?

এখানে এভাবে থাকবার আমার কোন অধিকার নেই বলে। কিন্তু মহারাজ আপনাকে যেন বিশেষ চিন্তিত মনে হচ্ছে।

রম্ভা!

মহারাজ—

না থাক—তোমাকে বলে কি হবে?

মহারাজ, প্রাণ দিয়েও যদি আপনার কোন কাজে আসতে পারি তো জানবেন এই নর্তকী সর্বদাই সেজন্য প্রস্তুত।

রম্ভার মুখের দিকে চেয়ে মৃদু হাসে গাঙ্গ।

তুমি আমার জন্য প্রাণ দিতেও প্রস্তুত—কিন্তু কেন বল তো? আমি তোমার কে যে তুমি আমার জন্য প্রাণ দেবে?

হঠাৎ যেন রম্ভা গাঙ্গের কথায় কেমন থতমত খেয়ে যায় তারপর মৃদু শান্ত কণ্ঠে বলে, দেশের যিনি রাজা—তার জন্য তারই কোন দীন প্রজা প্রাণ দেবে এর চাইতে আর কি বড় সৌভাগ্য হতে পারে—সেখানে তো কোন স্বার্থের প্রশ্নই আসে না মহারাজ!

মৃদু হেসে গাঙ্গ বলে, তর্কে তোমাকে পরাজিত করতে পারব না—কিন্তু আমি যে কাজের কথা ভাবছি সে কাজ তোমার দ্বারা হয়ত হবে না।

কাজটা কি খুবই কঠিন মহারাজ?

হ্যাঁ রম্ভা।

শুনেতে পাই না কাজটা কি ?
তুমি হয়ত জান না আমার একটি ভগিনী ছিল।
ভগিনী ?
হ্যাঁ—পার্বতী।

॥ ৩০ ॥

রত্না মহারাজ গাঙ্গের মুখের দিকে তাকিয়ে পুনরায় প্রশ্ন করে, আপনার ভগিনী —এই প্রাসাদদুর্গেই বোধ হয় তিনি আছেন।

ছিল কিন্তু এখন আর নেই।

নেই ?

না।

বিবাহ হয়ে গিয়েছে বুঝি ? শ্বশুরালয়ে—

না।

তবে অন্যত্র কোথাও গিয়েছেন বুঝি ?

মাড়বার থেকে তাকে আমি বহিষ্কৃত করে দিয়েছি। কথাটা বলতে বলতে গাঙ্গের স্বর যেন রুদ্ধ হয়ে আসে। চোখে জলও বুঝি আসে। গাঙ্গ অন্য দিকে মুখ ফেরায়।

বিস্ময়ের যেন অবধি নেই রত্নার। সে কেমন যেন বিস্ময়-বিহ্বল দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে গাঙ্গের মুখের দিকে।

গাঙ্গের কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হয়ে আসায় ও তার মুখখানা ফিরিয়ে নেওয়ায় রত্না বুঝতে পেরেছিল ব্যাপারটা তার কাছে সত্যিই দুঃখের।

রত্না মৃদু কণ্ঠে বলে, মহারাজ।

গাঙ্গ বলে, বড় আদরিণী—আমার একমাত্র সহোদরা আজ সে আমার কাছে মৃত। সে জীবিত থেকেও আজ আমার কাছে মৃত।

বুঝতে পারছি মহারাজ, ভগিনীর দিক থেকে কোন আঘাত পেয়েই আপনি—

আঘাত। কোন মায়ের পেটের বোন যে তার ভাইকে এত বড় আঘাত দিতে পারে আমার স্বপ্নেরও বুঝি অগোচর ছিল রত্না।

জানি না মহারাজ, সে আপনাকে কি আঘাত দিয়েছে—কতখানি আঘাত দিয়েছে তবে আমার মনে হয় কোন সহোদরাই তার সহোদরকে ইচ্ছাকৃত ভাবে কোন নিদারুণ আঘাত দিতে পারে না।

জান না তুমি রত্না, জান না। সে যে কোন দিন অত বড় নিষ্ঠুর হতে পারে—

মহারাজ আপনি উত্তেজিত হচ্ছেন—

উত্তেজিত ? যখনই তার কথা ভাবি আমার সর্বদেহে যেন বিষক্রিয়া শুরু হয়। একজন সামান্য অজ্ঞাতনামা বেতনভুক্ত সৈনিক সে কিনা তারই মোহে—মাড়বারের

রাজ-পরিবারের মুখে কালি লেপে দিল অনায়াসেই—

এতক্ষণে যেন অন্ধকারে আলো দেখতে পায় রত্না।

বুঝতে পারে গাঙ্গের ভগিনী কোন এক সৈনিককে ভালবেসে বরণ করেছে।

মহারাজ, একটা কথা বলবো ?

কি ?

কথাটা কিন্তু আমার নয় আপনারই—

আমার ?

হ্যাঁ—একদিন আপনার মুখ থেকেই উচ্চারিত হয়েছিল। হয়ত আপনার মনেও নেই বিস্মৃত হয়েছেন কিন্তু আমি ভুলি নি—

রত্না ?

হ্যাঁ মহারাজ—একজনকে আপনি বলেছিলেন কথাটা।

কি কথা—কাকে আমি কি বলেছিলাম ?

সামান্য এক সামন্তর নর্তকী স্ত্রীর গর্ভজাত এক কন্যাকে—

রত্না।

আপনি বলেছিলেন, প্রেম অন্ধ—তার কোন জাতি নেই বর্ণ নেই—ভগবান নারী-পুরুষের বুকে ভালবাসা দেন—সে ভালবাসা যদি সত্যিকারের হয় তা কখনো অপবিত্র হতে পারে না—কোন পাপই তাকে কোন দিন স্পর্শ করতে পারে না।

রত্না।

মহারাজ, অশিক্ষিতা—সামান্যা নর্তকী আমি—আপনি মাড়বারাধিপতি—স্বয়ং দেবতার প্রতিভূ—আপনাকে উপদেশ দেবার বা আপনার কাজের বিচারের ধৃষ্টতা আমার কোন দিনই হবে না, কিন্তু এও বলবো মহারাজ সত্যিই আপনার সহোদরা যদি ভালবেসে কোন সৈনিককে বিবাহ করেই থাকে—সে কি খুব অন্যায় করেছে—তাতে কি ক্ষমা করা যায় না তার স্বর্গীয় প্রেমের জন্য ?

না।

যায় না ?

না।

কেন মহারাজ ?

কারণ আমি দেশের রাজা—আর সে এই রাজ্যেরই আমার ভগিনী—

মহারাজ—অপরাধ নেবেন না। আমি কিন্তু বলবো অন্ধ আপনি।

অন্ধ ?

হ্যাঁ। আভিজাত্যের অহমিকা আপনার সত্যকারের দৃষ্টি আজ অন্ধ করে দিয়েছে—আপনি একজন সাধারণ মানুষের মন নিয়ে মানুষের চোখ দিয়ে বিচার করবার চেষ্টা করে দেখুন, দেখবেন তাকে ক্ষমা করা আপনার পক্ষে আদৌ কষ্টকর হবে না। আমার সানুনয় অনুরোধ মহারাজ, এত বড় ভুল করবেন না—পবিত্র ভালবাসাকে এক নারী ও এক পুরুষের ভালবাসাকে এমন করে অস্বীকার করবেন না, তাদের বুকে তুলে নিন—তাদের আশীর্বাদ করুন।

তা যদি পারতাম—তা যদি পারতাম রত্না—

কেন পারবেন না ? সামান্য এক নর্তকী-কন্যার প্রতি যাঁর এত স্নেহ তাঁর হৃদয় তো ছোট নয়—তাঁর ভালবাসা—তাঁর প্রীতি তো এত ক্ষুদ্র নয়—

তুমি—তুমি আমাকে দুর্বল করে দিচ্ছ রত্না।

ক্ষমা দুর্বলতা নয় মহারাজ। দুর্বল যে সে কি ক্ষমা করতে পারে—ক্ষমার আড়ালে সেটা তার ভয় ছাড়া আর কিছুই নয়।

তুমি জান না তার জন্য আজ কি বিপদে আমি পড়েছি। অসম্মান আর লজ্জার হাত এড়াতে হয়ত আজ আমাকে আত্মহত্যাও করতে হতে পারে।

কি বলছেন আপনি ?

সে গোপনে গোপনে আমার অজ্ঞাতে যখন বীরেন্দ্রর সংগে মিলিত হচ্ছে, সেই সময় আমি মেবারের রাণার সঙ্গে তার বিবাহের প্রস্তাব করে পাঠিয়েছিলাম—

তারপর ?

তারপর একদিন রাণার দূত এলো আমার প্রস্তাবে সম্মত হয়ে বিবাহের প্রস্তাব নিয়ে। তখন অনন্যোপায় হয়ে তাকে জানিয়েছি—পার্বতীর শরীর সুস্থ নয়, তাই সে কিছুকালের জন্য মান্দোরে মাতুলালয়ে সূর্য সিংহের ওখানে গিয়েছে—

সত্যি কথাটা জানালেন না কেন মহারাজ ?

লজ্জায়।

কিসের লজ্জা মহারাজ। সত্যি বলবেন তাতে লজ্জার কি—তাছাড়া রাজপুতানীর তো ঐ ধরনের বিবাহের নজিরের অভাব ছিল না। ভালবেসে কত ক্ষত্রিয় রমণীই তো ইতিপূর্বে তাদের আপনজন—পিতা ও ভ্রাতার অমতে ও অনিচ্ছায় পতিবরণ করেছে। আপনি এক কাজ করুন মহারাজ—

কি ?

অকপটে মেবারের রাণাকে সব পত্রে লিখে জানান।

আজ আর তার উপায় নেই।

উপায় নেই ?

না।

কেন ?

কিছুক্ষণ পূর্বে সংবাদ পেয়েছি—

কি ?

পার্বতী এখন তার স্বামী বীরেন্দ্রর সঙ্গে মেবারেই—চিতোরগড়েই অবস্থান করছে।

পার্বতী এখন চিতোরগড়ে ?

হ্যাঁ—বুঝে উঠতে পারছি না এখন কি কর্তব্য। অথচ সম্মান আমাকে বাঁচাতেই হবে মাড়বারের—তাই একটা কথা ভাবছিলাম—

কি মহারাজ ?

কাউকে যদি এমন বিশ্বস্ত পেতাম—যাকে চিতোরগড়ে প্রেরণ করতে পারতাম।

আজ যদি চণ্ড জীবিত থাকত—

মহারাজ—একটা কথা বলবো ?

কি কথা রত্না ?

আপনার অনুমতি পেলে আমিই চিতোরগড়ে যেতে পারতাম।

যাবে—যাবে তুমি ?

যদি আপনার অনুমতি পাই।

কিন্তু সে যে দীর্ঘ পথ—তুমি নারী—

রাজপুত রমণী আমি।

কিন্তু কাজটা খুব দুরূহ।

বলুন কি করতে হবে আমায় ?

না থাক। তুমি পারবে না—

পারবো মহারাজ, বলুন আপনি।

প্রতিজ্ঞা কর তা হলে আমি যা আদেশ করবো তুমি পালন করতে দ্বিধা করবে না ?

দ্বিধা করবো না।

তবে শোন—চিতোরগড়ে পৌঁছে যেমন করে হোক তাদের খুঁজে বের করে—তাদের হত্যা করতে হবে।

মহারাজ!

অস্ফুট চিৎকার করে ওঠে রত্না।

তুমি প্রতিজ্ঞা করেছো রত্না—

না, না—পারবো না—আমি পারবো না।

পারবে না ?

না—আদেশ আপনার ফিরিয়ে নিন।

দেশের রাজার কাছে তুমি প্রতিজ্ঞা করেছো রত্না—বল, আমার আদেশ তুমি পালন করবে।

মহারাজ ?

বলো!

বেশ মহারাজ—প্রতিজ্ঞা যখন আপনার কাছে আমি করেছি—বীরেন্দ্র ও পার্বতীর নাম জীবনে আর কোন দিনই আপনি শুনতে পাবেন না।

আঃ রত্না—তুমি আমায় সত্যিই বাঁচালে—তোমার এ উপকারের কথা জীবনে আমি কখনো বিস্মৃত হবো না।

রত্না কোন কথা বলে না আর, মাথা নীচু করে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে থাকে।

কালই তোমার যাবার ব্যবস্থা আমি করবো—

না মহারাজ—আমার যাবার ব্যবস্থা আমিই করবো—আপনাকে কোন চিন্তা করতে হবে না।

কিন্তু—

আপনি কেবল আমাকে এই প্রাসাদদুর্গ থেকে বাইরে পাঠিয়ে দিন।

ঠিক আছে কাল মধ্যরাত্রে—

না—এখুনি।

এখুনি!

এই মুহূর্তে।

গাঙ্গ যেন ক্ষণকাল কি ভাবল আপন মনে। তারপর মৃদুকণ্ঠে বললে, বেশ, এসো আমার সঙ্গে—

আগে আগে গাঙ্গ ও তার পশ্চাতে রত্না মন্ত্রণাকক্ষ থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে এলো। রাত্রির তৃতীয় প্রহরও উত্তীর্ণপ্রায়। সমগ্র প্রাসাদদুর্গ যেন সুষুপ্তির কোলে ঢলে পড়েছে। কেবল এখানে ওখানে অলিন্দে সতর্ক রাতপ্রহরীরা কটিদেশে তীক্ষ্ন তরবারি সতর্ক দৃষ্টি মেলে জেগে জেগে প্রহরা দিচ্ছে। নিঃশব্দে সতর্ক পদসঞ্চারে ছায়ার মতই যেন এখানে ওখানে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

মহারাজ, আপনি একটু অপেক্ষা করুন আমি এখুনি আসছি—

রত্না দ্রুতপদে তার কক্ষে গিয়ে প্রবেশ করল—এই কয়দিন যে কক্ষের মধ্যে সে ছিল।

অন্ধকার অলিন্দপথে মহারাজ গাঙ্গ দাঁড়িয়ে রইল।

কে যেন এই দিকেই আসছে—

কোন রাতপ্রহরী নিশ্চয়ই।

কে ওখানে? রাতপ্রহরীর কণ্ঠস্বর শোনা যায়।

উন্মুক্ত তরবারি হাতে রাতপ্রহরী এগিয়ে আসে, কে?

লক্ষ্মণসিংহ!

কণ্ঠস্বরে মুহূর্তে চিনতে পারে রাতপ্রহরী, মহারাজ!

সব ঠিক আছে?

হ্যাঁ মহারাজ!

শোন, দুর্গরক্ষককে বলো গিয়ে অবিলম্বে একটি অশ্ব নিয়ে সে যেন দুর্গ-প্রাসাদের বাইরে বড় গাছটার নীচে অপেক্ষা করে—একজন সেখানে যাবে—তাকে যেন অশ্বটি দেয়—বুঝলে—

হ্যাঁ মহারাজ।

যাও।

রাতপ্রহরী চলে গেল। অন্ধকারে অলিন্দপথে মিলিয়ে গেল।

একটু পরে রত্না ফিরে এলো, চলুন মহারাজ—আমি প্রস্তুত।

অলিন্দপথে একটু এগিয়ে যেতেই দুজনে একটি আলোকের সম্মুখীন হয়। গাঙ্গ সবিস্ময়ে দেখলো রত্না তার স্ত্রী-বেশ পরিত্যাগ করেছে ইতিমধ্যে। তার দেহে সেই প্রথম রাত্রির মত পুরুষের পোশাক। মাথায় পাগড়ি। চলুন মহারাজ—

চেয়েছিল বুঝি গাঙ্গ রত্নার দিকে আত্মবিস্মৃত হয়ে। হঠাৎ রত্নার কণ্ঠস্বরে যেন সম্বিৎ ফিরে পায়।

একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস বুঝি গাঙ্গের বুকখানা কাঁপিয়ে বের হয়ে যায়।

বলে, হ্যাঁ চল—

প্রাসাদদুর্গের গোপন সুড়ঙ্গপথ দিয়েই অন্ধকারে রত্নাকে নিয়ে গাঙ্গ অগ্রসর হয়।

গাঙ্গের বহুদিনের ব্যবহৃত অভ্যস্ত সুড়ঙ্গপথ—অন্ধকার হলেও অনায়াসেই গাঙ্গ এগিয়ে চলে কিন্তু রত্না সহজ ভাবে চলতে পারে না।

থামল গাঙ্গ। বুঝতে পারছিল সে রত্নার অনভ্যস্ত—অপরিচিত ঐ সুড়ঙ্গপথে অন্ধকারে চলতে কষ্ট হচ্ছে।

অন্ধকারেই নিঃশব্দে হাত বাড়িয়ে রত্নার একটা হাত চেপে ধরে গাঙ্গ, এসো—চলতে তোমার অন্ধকারে কষ্ট হচ্ছে বুঝতে পারছি, একটা মশাল জেবলে নিলেই হতো কিন্তু তাড়াতাড়িতে ভুলে গেলাম।

রত্না কোন কথা বলে না।

যে পুরুষের কাছ থেকে সে নারীজীবনে প্রথম প্রেমের স্বাদ পেয়েছিল একদিন—যে তার নারীমনের ঘুমন্ত পাপড়িগুলো একদিন সোনার কাঠির ছোঁয়ায় রাঙিয়ে তুলেছিলে—যে পুরুষকে পেলে তার জীবন একদিন সার্থক—পূর্ণ—ধন্য হয়ে উঠতো এবং যে পুরুষকে সে পেয়েও পায় নি, নিষ্ঠুর ভাগ্য-বিধাতা—যে সুধার পাত্র তার ঠোঁটের কাছে এনেও দূরে সরিয়ে নিয়ে গিয়েছিল চিরজন্মের মত—যার দেখা ইহজীবনে সে আর কোন দিনও পাবে না জানত—আজ তারই অভাবিত আকস্মিক স্পর্শে—রত্না যেন কেমন অবশ—বিহ্বল হয়ে পড়ে। দাঁড়িয়ে পড়ে সে বুঝি নিজের অজ্ঞাতেই।

গাঙ্গ অন্ধকারেই ঈষৎ আকর্ষণ করে বলে, এসো—

বাকী সুড়ঙ্গপথটা কেমন করে যে তারপর রত্না অতিক্রম করে এসেছিল—অতঃপর তা সে নিজেই জানে না।

অনুভূতির একটা চরম পুলক কেবল থেকে থেকে তাকে শিহরিত করছিল। বিবশ—বেপথু তনু মন।

তারপর কখন একসময় সুড়ঙ্গপথ উত্তীর্ণ হয়ে বাইরের উন্মুক্ত আকাশের তলায় এসে উভয়ে দাঁড়িয়েছে জানতেও পারে নি। হাতটা তখনো গাঙ্গের হাতের মধ্যেই ধরা ছিল। হঠাৎ যেন সম্বিৎ ফিরে আসে রত্নার—সে হাতটা গাঙ্গের মুষ্টি থেকে ছাড়িয়ে নেয়, আমি তাহলে চলি মহারাজ—মৃদু কণ্ঠে অনেকক্ষণ চুপচাপ পাশাপাশি দাঁড়িয়ে থাকার পর বলে রত্না।

যাবে—কিন্তু তোমার অশ্বের একটি প্রয়োজন, শোন—

বলুন।

কিছু দূরে বৃক্ষমূলে একজন দেখবে তোমার জন্য একটি অশ্ব নিয়ে অপেক্ষা করছে—সেই অশ্বই তুমি নিও।

তাই হবে মহারাজ—রত্না অন্ধকারে মিলিয়ে গেল।

রাত্রি শেষ হয়ে আসছিল। রাত্রির অন্ধকার পরিক্রমা সমাপ্তির পথে। শুকতারাটা আকাশের এক প্রান্তে জবলজবল করছে।

বৃক্ষমূলে পেঁছে দেখে একজন একটি অশ্ব নিয়ে অপেক্ষা করছে—সে প্রশ্ন

করে, আপনি মহারাজের কাছ থেকে আসছেন ?

হ্যাঁ—

এই অশ্ব আপনার জন্য—

অশ্বের পৃষ্ঠে লাফিয়ে ওঠে রত্না—দু পা দিয়ে অশ্বের উদরে দু পাশে চাপ দিতেই অশ্ব ছুটতে শুরু করে। রাত্রিশেষের আলোছায়ায় মাড়বার থেকে চিতোরের পথে ছুটে চললো অশ্ব।

একসময় মহারাজ গাঙ্গ প্রাসাদদুর্গে আবার ফিরে এলো। রত্নার কথাগুলোই মনের মধ্যে তার আনাগোনা করছিল—প্রেম অন্ধ—তার কোন জাতি নেই বর্ণ নেই—ভগবানই নারী-পুরুষের বুকে ভালবাসা দেন। তা কোন দিনই অপবিত্র হতে পারে না—কোন পাপই তাকে স্পর্শ করতে পারে না।

॥ ৩১ ॥

মোল্লা মুরসিদের সঙ্গে দেখা হলো কোথায় ? বাবুর মরিয়মকে দ্বিতীয়বার আবার প্রশ্নটা করে।

মরিয়ম কি জবাব দেবে বুঝতে পারে না। সত্যি কথা বলতে হলে অনেক কথাই তাকে প্রকাশ করতে হয়। সেই সঙ্গে প্রকাশ হয়ে যাবে যে যদি স্বেচ্ছায় দৌলত খাঁর নির্দেশে এখানে সুদূর কাবুলে না আসতো মোল্লা মুরসিদের সঙ্গে কারো সাধ্য ছিল না তাকে এখানে নিয়ে আসে। কিন্তু শুধু কি দৌলত খাঁর নির্দেশেই এখানে সে এসেছে ?

দৌলত খাঁর স্বার্থ সিদ্ধির জন্যই এখানে এসেছে নারী হয়েও দুস্তর বিপদ-সঙ্কুল পথ দীর্ঘ দিনের পর দিন রাতের পর রাত অতিক্রম করে। দিলোয়ার খাঁ তার যে সর্বনাশ করেছে তার জ্বালা নিভাবার জন্যই কি দৌলত খাঁর নির্দেশ সে স্বেচ্ছায় মাথা পেতে নেয় নি ?

মরিয়ম—

আলমপনাহ।

কৈ বললে না কি করে মোল্লা মুরসিদের সঙ্গে তোমার দেখা হলো! কোথায় দেখা হলো ?

নাগোরে—মৃদু কণ্ঠে জবাব দেয় মরিয়ম।

নাগোরে—তাহলে কি নাগোরাধিপতি দৌলত খাঁর ইচ্ছাতেই তুমি—বাবুরের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে।

মৃদুকণ্ঠে জবাব দেয় মরিয়ম, হ্যাঁ তা বলতে পারেন।

হুঁ, এখন মনে হচ্ছে এখানে তাহলে দৌলত খাঁই হয়ত মোল্লা মুরসিদের সঙ্গে তোমাকে কৌশলে প্রেরণ করেছে ?

বাবুর আবার প্রশ্নটা করে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকায় মরিয়মের মুখের দিকে।

না সম্রাট ঠিক তা নয়—

তবে ?

এটা অবিশ্যি কতকটা মিথ্যা নয় যে দৌলত খাঁর নির্দেশেই আমি কাবুলে এসেছি আপনার গুপ্তচরের সঙ্গে সঙ্গে—

গুপ্তচর—কার কথা বলছো ?

কেন সম্রাট—আমি বলছি আপনার প্রেরিত গুপ্তচর মোল্লা মুর্সিদের কথা—

বাবুরের যেন সত্যিই বিস্ময়ের অবধি থাকে না—মরিয়মের তীক্ষ্ন বুদ্ধির পরিচয় পেয়ে। সত্যিই তীক্ষ্ন বুদ্ধিমতী মেয়েটি।

মরিয়ম পুনরায় বলে, দৌলত খাঁও জানে এবং মোল্লা মুর্সিদও জানে—দৌলত খাঁর নির্দেশে মোল্লা মুর্সিদের সঙ্গে কাবুল এলেও অন্ততঃ মোল্লামুর্সি জানে আমিই স্বইচ্ছায় তার সঙ্গে কাবুলে এসেছি—

ইচ্ছা করে তুমি কাবুলে এসেছো ?

হ্যাঁ সম্রাট।

কিন্তু কেন বল তো ?

সম্রাট—নারী যেমন তার সর্বস্ব দিয়ে ভালবাসতে পারে তেমনি সর্বস্ব দিয়ে ঘৃণাও করতে পারে। বিশেষ করে তার ইজ্জৎ নারীত্ব যখন ধুলোয় লুণ্ঠিত হয় তখন সে দলিত সর্পিণীর চাইতেও হিংস্র কুটিল হয়ে ওঠে।

কেমন যেন অবাক বিস্ময়ে চেয়ে থাকে বাবুর চন্দনবাঈয়ের মুখের দিকে মরিয়মের সমস্ত মুখখানা যেন আক্রোশে রক্তিম হয়ে উঠেছে।

শুধুম দিলোয়ার খাঁই নয়, তার যে যেখানে আছে সকলের ধ্বংস চাই আমি সম্রাট—

দৌলত খাঁরও ?

হ্যাঁ।

কিন্তু দৌলত খাঁ তো তোমার ওপর কোন অত্যাচার করে নি। লুণ্ঠন তো তোমাকে করে এনেছিল তার পুত্র দিলোয়ার খাঁই—

হয়ত আপনার কথাই সত্য—তথাপি—ওদের কাউকেই আমি কোন দিন ক্ষমা করতে পারব না।

তারপর একটু থেমে বলে, আমার সমস্ত সুখের আশায় যারা আগুন জেলে দিয়েছে—পুড়িয়ে ছাই করে দিয়েছে, যতক্ষণ এ দেহে একবিন্দু রক্ত থাকবে ততক্ষণ তাদের কাউকেই আমি ক্ষমা করতে পারব না।

তোমার সব কথা আমার জানতে ইচ্ছে হচ্ছে চন্দনবাঈ।

না, না সম্রাট, ও নাম নয়—বলুন মরিয়ম। চন্দনবাঈয়ের অনেক দিন আগে মৃত্যু হয়েছে—চন্দনবাঈ নয়—এ মরিয়ম—একটা বুকভরা আক্রোশ—প্রচণ্ড ঘৃণা—প্রতিহিংসার একটা প্রতিজ্ঞা নিয়ে ধর্মচ্যুতা এক নারী—

মরিয়ম সেদিন বাবুরকে বলেছিল। দিলোয়ারের সৈন্যরা চন্দনবাঈকে ধরে এনে যখন দিলোয়ারের প্রমোদকক্ষে তোলে—প্রচুর মদ্যপান করে দিলোয়ারের অবস্থা তখন টলটলায়মান।

কয়েকটা মুহূর্ত নেশায় ঢুলু ঢুলু চক্ষে চন্দনবাঈয়ের দিকে তাকিয়ে থেকে দিলোয়ার বলে ওঠে,—শোভনাল্লা—বাঃ সুন্দরী—এসো—

টলতে টলতে দিলোয়ার উঠে দাঁড়ায়, চন্দনবাঈ দু পা পিছিয়ে যায়।

ভয় কি—তোমার রূপে নৃত্যে গীতে আমি তোমাকে যে মুহূর্তে দূর থেকে দেখেছি শুনেছি আমি তোমাতেই মজেছি সুন্দরী। তোমায় আমি প্রধানা বেগম করব আল্লার কসম।

চন্দনবাঈ আরও দু পা পিছিয়ে যায় ঐ সময়।

এসো—কাছে এসো—নাচো লায়লী আমার—

চন্দনবাঈ ভয়ে যেন বোবা কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

কি হলো নাচো—

তবু নড়ে না চন্দনবাঈ।

বেত মেরে পিঠের ছাল তুলে দেবো যদি কথা না শোন—

চন্দনবাঈয়ের বুকের মধ্যে যদিও তখনো কাঁপছে তথাপি সে নৃত্য শুরু করে এবং বাকী রাতটুকু সে নেচেছিল।

ভেবেছিল মদ্যপান করতে করতে যদি একসময় নেশায় জ্ঞান হারায় দিলোয়ার খাঁ সে পালাবে।

কিন্তু সে যে কত বড় মিথ্যা আশা বুঝতে চন্দনবাঈয়ের বেশী দেরি হলো না—কামোন্মত্ত দিলোয়ার সহসা চন্দনবাঈয়ের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে।

বহু কষ্টে দিলোয়ারের আলিঙ্গন থেকে নিজেকে মুক্ত করে সে প্রাসাদকক্ষ থেকে বের হয়ে ছুটতে থাকে অলিন্দ ধরে যেন দিকবিদিক জ্ঞানহারা হয়ে।

ধর—ধর ওকে—কোই হ্যায়—

দিলোয়ারের দেহরক্ষীরা দিলোয়ারের নির্দেশে তখন থেকে ধরবার জন্য তার পিছনে পিছনে ছুটে যায়।

ভোরের নমাজ পড়ে ঐ সময় দৌলত খাঁ নিজের মহলে অলিন্দপথে ফিরে যাচ্ছিল।

বাঁচাও—বাঁচাও—চন্দনবাঈয়ের আর্তকণ্ঠের চিৎকার দৌলত খাঁর কানে যায়।

দৌলত খাঁ এগিয়ে যায় এবং তার ধমক খেয়ে দিলোয়ারের অনুচরেরা পালায়। দৌলত খাঁই চন্দনবাঈকে আশ্রয় দেয়—রণবীর তাকে প্রত্যাখ্যান করবার পর।

তারপর? বাবুর প্রশ্নটা করে মরিয়মের মুখের দিকে তাকায়।

কিন্তু দৌলত খাঁ শেষ পর্যন্ত আমাকে তার দুশ্চরিত্র পুত্রের লোলুপ দৃষ্টি থেকে বাঁচাতে পারে নি জাঁহাপনা—

পারে নি, কিন্তু—

আমি তখন আমার নির্দিষ্ট মহলে বাস করি—এবং দৌলত খাঁ আমাকে আশ্রয় দেবার মাস দুই পরে এক রাত্রে আমার দাসীকে উৎকোচ দিয়ে হাত করে—চন্দনবাঈ থেমে যায়। তার গলা যেন বুজে আসে।

বাবুর প্রশ্ন করে, বল থামলে কেন?

কৌশলে পানীয়ের সঙ্গে ভাং খাইয়ে শয়তান দিলোয়ার আমার চরম সর্বনাশ

করলো এক রাত্রে। এবং জ্ঞান হবার পর যখন বুঝতে পারলাম কৌশলে শয়তানটা আমার সর্বস্ব ছিনিয়ে নিয়েছে ঘৃণায় লজ্জায় আমি প্রথমটায় আত্মহত্যা করতে উদ্যত হয়েছিলাম, কোমরে আমার সর্বদাই গোপনে বিষাক্ত ছুরিকা গোঁজা থাকত সেই ছুরিকা দিয়েই—আর ঠিক সেই মুহূর্তে হাসতে হাসতে দিলোয়ার এসে আমার কক্ষে প্রবেশ করল। বললে, কি বিবিজান, ঘুম ভাঙ্গল?

কয়েকটা মুহূর্ত ওর মুখের দিকে আমি চেয়ে রইলাম তারপর বললাম, হ্যাঁ ভাঙ্গল।

আর সেই মুহূর্তেই মনে মনে আমি এবারে সত্যিই প্রতিজ্ঞা নিলাম জাঁহাপনা—মরব আমি নিশ্চয়ই কিন্তু তার আগে দিলোয়ার খাঁকে মরতে হবে—হাতের মুঠোয় তখনো আমার সেই ছুরিকাটা ধরা।

হঠাৎ বোধ হয় দিলোয়ারের সেই ছুরিকাটার প্রতি নজর পড়ে।

ওকি বিবিজান—হাতে তোমার—

ভয় পেলেন নাকি নবাবজাদা?

না, না—

সত্যিই তো সামান্য একটা ছুরিকা—তাতে কি দিলোয়ার খাঁর ভয় পাওয়া শোভা পায়? কথাটা বলে হাসতে হাসতে ছুরিকাটা আমি পুনরায় কোমরে গুঁজে রাখলাম।

কিন্তু দাঁড়িয়ে কেন খাঁ সাহেব—বসুন—

বসবো।

দিলোয়ার যেন সত্যিই একটু বিস্ময়ের সঙ্গে আমার মুখের দিকে তাকায়।

হ্যাঁ, বসুন।

সত্যি তুমি আমায় বসতে বলছো?

সত্যিই বসতে বলছি।

তারপর? সম্রাট বাবুর আবার প্রশ্ন করে।

তারপর মরিয়মের জন্মবৃত্তান্ত তো আপনি জানেন সম্রাট—

কিন্তু একটা কথা বুঝে উঠতে পারছি না মরিয়ম—সব কথা তুমি খাঁ-কে জানাও নি কেন?

কি হবে আর জানিয়ে জাঁহাপনা—হাজার হোক দিলওয়ারও তো তারই পুত্র—সে কি আর আমার জন্য নিজের সন্তানকে সত্যিকারের শাস্তি দিত।

দেওয়াই উচিত—

উচিত তো এ দুনিয়ায় অনেক কিছুই জাঁহাপনা কিন্তু সবই কি পালিত হয় না মানুষ করে?

হুঁ—তা এখানে কেন এলে তা তো এখনো বলো নি?

মরিয়ম বলে, মোল্লা মুরসিদ যখন নাগোরে গিয়ে উপস্থিত হলো—দৌলত খাঁর অতিথি হলো, তাকে আনন্দদানের জন্য দৌলত খাঁ আমাকে নৃত্যগীত করতে বলে—

বল থামলে কেন?

নৃত্যগীতের পর একসময় আসর ভাঙ্গল, রাত্রি তখন গভীর। দৌলত খাঁ তার মহলে চলে গেল। তার মেহেমানও তার নির্দিষ্ট মহলে বিশ্রাম নিতে গেল—ক্লান্ত মরিয়মও গিয়ে তার ঘরে ঢুকল।

অত্যন্ত পরিশ্রান্ত লাগছিল নিজেকে মরিয়মের। শয্যার উপরই সে দেহটা এলিয়ে দেয়।

দাসী এসে ঘরে ঢুকল।

বিবি সাহেবা।

কিরে?

মোল্লা মুরসিদ আপনার সঙ্গে একবার দেখা করতে চায়।

মোল্লা মুরসিদ?

হ্যাঁ।

মোল্লা মুরসিদ তার সঙ্গে দেখা করতে চায় কেন? কি তার প্রয়োজন? তার রূপে মুগ্ধ হয়ে বোধ হয়—কিন্তু পরক্ষণেই মরিয়মের মনে হয় প্রৌঢ় মোল্লা মুরসিদকে দেখে ঠিক তা মনে হয় নি তো তার।

আর তার চোখের দৃষ্টিতে সেরকম কিছু থাকলে মরিয়মের অন্তত বুঝতে কষ্ট হতো না।

মরিয়ম শয্যার উপর উঠে বসে। বলে, চল আমি যাবো।

আপনি যাবেন?

হ্যাঁ চল—জানিস তুই মোল্লা মুরসিদ কোন্ কক্ষে আছে?

জানি।

তবে চল।

একটা কালো বোরখায় সর্বাঙ্গ ঢেকে দাসীর সঙ্গে মরিয়ম এসে মোল্লা মুরসিদের কক্ষে সেই রাত্রে প্রবেশ করে।

এসো, এসো বিবি সাহেবা—কি সৌভাগ্য আমার—

বোরখা মুখের উপর থেকে সরিয়ে মরিয়ম প্রশ্ন করে, আপনি আমার সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছিলেন?

হ্যাঁ।

কেন বলুন তো?

অভয় দাও তো বলি কথাটা।

বলুন।

তুমি আমার সঙ্গে কাবুলে যাবে বিবি সাহেবা?

কাবুল?

হ্যাঁ—যেখানে গেলে তুমি তোমার যোগ্য সম্মান পাবে।

কিন্তু দৌলত খাঁ আমাকে ছাড়বেন কেন?

সে ব্যবস্থা আমি করবো।

বেশ—দেখুন যদি তিনি যেতে দেন।

সম্মতি পেলে তুমি যাবে ?

যাবো।

মরিয়ম ফিরে এলো তার কক্ষে। রাত্রি তখন প্রায় শেষ হতে চলেছে। গবাক্ষপথে রাত্রিশেষের আকাশ চোখে পড়ে। সেখানে আলোছায়ার খেলা চলেছে। গবাক্ষর সামনে দাঁড়িয়েছিল মরিয়ম। ভাবছিল হয়ত এতদিন পরে তার প্রতিহিংসার সুযোগ আসছে। কাবুলে গিয়ে যদি সম্রাট বাবুরের আশ্রয় পায়— তার আশা হয়ত একদিন সফলও হতে পারে।

বিবি সাহেবা—

দাসীর কণ্ঠস্বরে মরিয়ম ফিরে তাকাল।

জাঁহাপনা—

কোথায় ?

বাইরে দাঁড়িয়ে।

মরিয়ম এগিয়ে গিয়ে দৌলত খাঁকে সসম্মানে আহ্বান জানায়, বন্দেগী জাঁহাপনা।

মরিয়ম ?

বলুন জাঁহাপনা।

মোল্লা মুরসিদ কাল বাদ পরশু এখান থেকে চলে যাচ্ছে—আমার ইচ্ছা—

বলুন।

তাঁর সঙ্গে তুমি কাবুল যাও।

কাবুল।

হ্যাঁ—বাবুরের মনোগত বাসনাটা কি আমার জানা প্রয়োজন—কৌশলে সম্রাটের কাছ থেকে সব তোমায় জেনে নিতে হবে।

কিন্তু জাঁহাপনা—

আমি জানি তুমি তা পারবে। আরো একটা কাজ তোমায় করতে হবে—

বলুন।

সেখানে আরো একজন আছে—তার সমস্ত সংবাদও তোমাকে সংগ্রহ করতে হবে।

কে সে ?

লক্ষ্মণ সিংহ। সে আমারই লোক—তাকে আমি, তোমাকে যে কারণে যেতে বলছি কাবুলে, সেই কারণেই একদিন সেখানে পাঠিয়েছিলাম। কিন্তু আজ পর্যন্ত তার কোন সংবাদ নেই—সে জীবিত না মৃত তাও জানি না।

মোল্লা মুরসিদকে আর চেষ্টা করতে হলো না—দৌলত খাঁ নিজে থেকেই মরিয়মকে মোল্লা মুরসিদের সঙ্গে দিয়ে দিল।

চন্দনবাঈ—মরিয়ম থামল। তার কাহিনী সমাপ্ত করলো সে। বাবুর তখনো তার মুখের দিকে চেয়ে।

বাবুর ভাবছিল—তীক্ষ্ন বুদ্ধিমতী এই নারী। এ নারী অনন্যা।

নিজের দুর্ভাগ্যের কোন কথাই মরিয়ম বাবুরের কাছে গোপন করে নি। অকপটে সবই সে বলে গিয়েছে কেবল একটা কথা বলে নি যে দৌলত খাঁ তারও আগে কাবুলে প্রেরণ করেছে কুবলাই খাঁকে।

আজ যে কুবলাই খাঁ সম্রাটের একান্ত অনুগত—বিশ্বস্ত একজন সৈন্যাধ্যক্ষ। যে কুবলাই খাঁর উপরে এই কিলকিনের প্রমোদগৃহের সমস্ত ভার অর্পণ করে সম্রাট নিশ্চিন্ত—সেই কুবলাই খাঁ যে দৌলত খাঁরই প্রেরিত একজন চর এবং যে কথাটা রাজস্থান ত্যাগ করবার পূর্বে দৌলত খাঁর মুখ থেকে শুনে এসেছে মরিয়ম সেই কথাটাই বলে না।

প্রকাশ করে না কথাটা।

জাঁহাপনা, আমার সত্য পরিচয় অকপটে আপনার কাছে দিলাম—এবারে আপনার যা খুশি তাই করতে পারেন আমাকে নিয়ে। সর্বশেষে মরিয়ম বললে।

বাবুর মরিয়মের শেষ কথার কোন জবাব দেয় না। নিঃশব্দে মৃদু হাসে মাত্র। বাবুর তখন অন্য কথা ভাবছিল।

ঐ মরিয়ম সামান্য নর্তকী বা সামান্য এক ভ্রষ্টা রাজপুতানী নারী নয়। দেহের অতুলনীয় রূপই নয় কেবল, যেমন তীক্ষ্নবুদ্ধি তেমনি দুঃসাহসিকা। ঐ নারীকে হাতের মুঠোর মধ্যে রাখতে পারলে হিন্দুস্থান অভিযানের সময় তার অনেক সাহায্যই হবে। কিন্তু মুখে সেটা বিচক্ষণ বাবুর প্রকাশ করে না।

মরিয়ম। মৃদুকণ্ঠে একসময় ডাকে বাবুর।

আলমপনা—

এ কথা তাহলে মিথ্যা নয় যে আসলে তুমি একজন নাগোর অধিপতি দৌলত খাঁর গুপ্তচরই—

শাহানশা, আমার যা বলবার ছিল সবই অকপটে কোন কিছু গোপন না করে আপনাকে জানিয়েছি—আর কিছুই আমার বলবার নেই। মৃদু শান্ত গলায় মরিয়ম কথাগুলো বলে।

গুপ্তচরের শাস্তি কি জান?

জানি জাঁহাপনা।

কি বল তো?

মৃত্যু।

তোমার প্রতি যদি কাল সেই আদেশই আমি দিই?

আলমপনার যেমন অভিরুচি।

বাবুর আবার মৃদু হাসে। তার পর শান্ত কণ্ঠে বলে, কিন্তু আমি কি স্থির করলাম জান?

নিঃশব্দে মরিয়ম বাবুরের মুখের দিকে তাকাল। কোন প্রত্যুত্তর দেয় না।

আপাততঃ তোমার বিচার স্থগিত রাখব।

এবারেও মরিয়ম কোন জবাব দেয় না।

নিঃশব্দে একবার বাবুরের মুখের দিকে তাকিয়ে মাথা নীচু করে।

কিন্তু কেন জান?

বুঝতে পারছি না জাঁহাপনা, মৃদু কণ্ঠে এবারে জবাব দেয় মরিয়ম।

তোমাকে আমার প্রয়োজন আছে বলে।

আমাকে সম্রাটের প্রয়োজন?

হ্যাঁ—যথাসময়ে তুমি জানতে পারবে।

জানি না সামান্যা এক ভ্রষ্টা নর্তকীর প্রতি সম্রাটের কেন এ অনুগ্রহ।

অনুগ্রহ নয়—ওটা আমার প্রয়োজন—শোন মরিয়ম, একটা বা বড় জোর আর দেড়টা মাস এই শীতের প্রকোপ আছে। সর্বক্ষণ তুষারপাতের ফলে কাবুল থেকে এখন বেরুবার প্রায় সমস্ত পথই দুর্গম—এই শীত শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আমি তোমাদের হিন্দুস্থান অভিমুখে যাত্রা করব।

হিন্দুস্থান?

কথাটা যেন নতুন শুনেছে এমনি ভাব দেখাল মরিয়ম—সে যে সম্রাটের মনোগত বাসনাটা পূর্বাহ্নেই জানতে পেরে গিয়েছে সে কথা জানতেও দেয় না সম্রাটকে।

এর আগেও আমি হিন্দুস্থানের দিকে অভিযান করেছি কিন্তু সে কেবল হিন্দুস্থানের সম্পদকে লুঠ করবার জন্য। লুঠ করে আবার তাই একদিন কাবুলে ফিরে এসেছি আমার সৈন্যবাহিনী নিয়ে। কিন্তু এবারে আর ফিরব না।

ফিরবেন না?

না।

কেন সম্রাট?

নতুন করে হিন্দুস্থানে রাজ্যস্থাপনা করব। আর—

বলুন সম্রাট।

সেই অভিযানে আমার অনেক কিছু প্রয়োজন—তোমাকেও প্রয়োজন হবে—তবে হ্যাঁ তোমার ঐ দেলোয়ার খাঁর কথা আমার মনে থাকবে।

জাঁহাপনা—আর—আর আমি কিছু চাই না—দেলোয়ার খাঁ যে আগুন আমার বুকের মধ্যে জ্বেলে দিয়েছে সে আগুন একমাত্র নিভবে ঐ দেলোয়ারের রক্তে—অন্য কিছুতে নয়—

মরিয়ম?

সম্রাট।

হিন্দুস্থানের নারী কি সব তোমারই মত?

আমার মত?

হ্যাঁ—অমনি কমনীয় তনু—অমনি কোমল, অমনি কঠোর—অমনি একনিষ্ঠ—অমনি অসাধারণ বুদ্ধিমতী—

না, না জাঁহাপনা, এই নগণ্য নারীর সঙ্গে তাদের তুলনা করবেন না।

তাদের পদধূলির যোগ্যও নই আমি। তবে জানবেন, বাহ্যিক যে রূপে পুরুষ মুগ্ধ হয় সে রূপের হয়ত অভাব সত্যিই নেই সম্রাট হিন্দুস্থানের নারীদের মধ্যে। কিন্তু সে রূপটুকুই তাদের একমাত্র পরিচয় নয়—তাদের—হিন্দুস্থানে তো আপনি যাচ্ছেন, জানি না ভাগ্য আপনার অনুকূল হবে কিনা, যদি হয়—যদি সত্যিই সেখানে আপনি রাজ্য স্থাপন করতে পারেন তাহলে একটা কথাই আপনাকে বলবো—

কি মরিয়ম ?

হিন্দুস্থানের নারীকে অবহেলার দৃষ্টিতে দেখবেন না। তারা শুধু প্রেয়সী ও সন্তানের জননীই নয়, বিশ্বাসে স্নেহে ভালবাসায় যেমন তারা নিজেদের সর্বস্ব বিলিয়ে দিতে পারে তেমনি তারা প্রয়োজনে পুরুষের পাশে এসে দাঁড়াতেও জানে এবং তার জন্য হাসতে হাসতে জ্বলন্ত অগ্নিতে ঝাঁপও দিতে পারে।

বাবুরের চোখের মণি দুটো জ্বল জ্বল করতে থাকে।

কথা বলতে বলতে ইতিমধ্যে কখন রাত্রি শেষ হয়ে গিয়েছিল ওরা জানতেও পারে নি। বাতায়ন-পথে প্রভাতের আলোর ইশারা জেগেছিল।

মনে থাকবে তোমার কথা আমার মরিয়ম—আমি এখন প্রাসাদে ফিরে যাচ্ছি—নির্ভয়ে তুমি এখানে থাক—

কক্ষ ত্যাগ করবার জন্য বাবুর পা বাড়ায়। ঐ সময় মৃদু কণ্ঠে মরিয়ম ডাকে, জাঁহাপনা—এ অধীনার গোস্তাকি মাপ করবেন—

কিছু বলছিলে ?

সম্রাট—রণবীর সিংহ—

মৃদু হাসে বাবুর, ভয় নেই তোমার—রণবীরকে আমি মুক্তি দেবো।

সম্রাট মহানুভব। চন্দনবাঈয়ের দুই চক্ষু জলে ভরে যায়।

কিন্তু তার তোমার প্রতি যে আক্রোশ দেখলাম এবং যে আক্রোশের বশে এই দুর্গম দীর্ঘ পথ তোমার পিছনে পিছনে সে এসেছে—

তার হাতে মরতেও আমার কোন দুঃখ নেই সম্রাট।

কিন্তু তোমার মৃত্যু যে আমি চাই না মরিয়ম !

সে যদি নিজের হাতে আমায় হত্যা করত সম্রাট তবে তো সত্যিকারের মুক্তিই আমার হতো, কিন্তু আমি তো জানি সে তা পারবে না—কোনদিনই পারবে না—কথাগুলো বলতে বলতে শেষের দিকে মরিয়মের গলার স্বর রুদ্ধ হয়ে আসে—অশ্রুতে চোখের দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে যায় আবার।

কি করে বুঝলে পারবে না ?

আমি যে জানি সম্রাট—হতভাগিনী চন্দনাকে আজো সে ভুলতে পারে নি—কোনদিন পারবেও না।

বাবুর আর কোন কথা বলে না। নিঃশব্দে ঘর থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে যায়। কিন্তু কিলাকিনের প্রমোদভবন ত্যাগ করে না বাবুর। তার নিজস্ব বিশ্রামকক্ষে গিয়ে প্রবেশ করে।

মরিয়মকে তার জানা হয়েছে, এবারে রণবীরের কথা তাকে জানতে হবে।

প্যারীকে বলে বাবুর দাসী আনোয়ারাকে ডেকে দিতে।

দাসী আনোয়ারা এসে সামনে দাঁড়ায়।

আনোয়ারা?

জাঁহাপনা!

ইব্রাহিমকে বল বন্দী রণবীরকে এখানে নিয়ে আসতে।

আনোয়ারা কুর্নিশ জানিয়ে কক্ষ হতে বের হয়ে গেল।

একটু পরেই রণবীরকে নিয়ে এল ইব্রাহিম।

ওর হাতের বাঁধন খুলে দিয়ে তুই এখান থেকে যা।

ইব্রাহিম নিঃশব্দে আদেশ পালন করে—রণবীরকে বন্ধন থেকে মুক্তি দিয়ে কক্ষ হতে বের হয়ে গেল।

রণবীর?

সম্রাট!

তুমি নিশ্চয়ই জান তোমার অপরাধ গুরুতর?

গুরুতর কিনা জানি না সম্রাট, তবে এ জানি আপনার বিচারই আমার জন্য শেষ বিচার।

সে কথা পরে হবে কিন্তু তার আগে একটা সত্যি কথা বল তো রণবীর—কেন তুমি এই দীর্ঘ দুর্গম পথ অতিক্রম করে কাবুলে এসেছ?

রণবীর কোন জবাব দেয় না—চুপ করে থাকে।

তুমি না বললেও আমি কিন্তু বুঝতে পেরেছি।

বাবুরের মুখের দিকে তাকাল রণবীর।

কিন্তু আর একটা কথার জবাব দেবে রণবীর?

আজ্ঞা করুন।

চন্দনবাঈয়ের ওপর তোমার এ মিথ্যা আক্রোশ কেন?

মিথ্যা আক্রোশ.!

নয়? সে তো ইচ্ছা করে দেলোয়ার খাঁর হাতে ধরা দেয় নি। বাগদত্তা, তুমি তো ভালই জান—বধূ ছিল সে তোমার—তোমারই উচিত ছিল না কি তাকে সেদিন রক্ষা করা? তার নারীত্বের মর্যাদাকে অক্ষুণ্ণ রাখা?

রণবীর মাথাটা নীচু করে। সত্যিই অভিযোগটা তো মিথ্যা নয়। সত্যিই তো সে সেদিন তার ভাবী বধূকে—বাগদত্তাকে যবনের কবল থেকে রক্ষা করতে পারে নি। দেলোয়ার খাঁর সৈন্যরা যখন চন্দনবাঈকে ধরে নিয়ে গেল, পারে নি তো সে তাদের হাত থেকে তাকে ছিনিয়ে নিতে। পারে নি তো সেদিন সে তার ভাবী স্ত্রীর ইজ্জত-মর্যাদা-ধর্মকে রক্ষা করতে।

বল যুবক, আমি কি মিথ্যা বলেছি? সে কি সেদিন আশা করে নি যে তারই ভালবাসার জন তাকে রক্ষা করবে? সে যদি স্বেচ্ছায় তাদের হাতে আত্মসমর্পণ করতো তোমার আক্রোশের কারণ থাকত। কিন্তু—

কিন্তু সম্রাট, সে বিষ খেলো না কেন? ধর্ম নষ্ট হবার আগে কোমরের ছুরিটা নিজের বুকে বসিয়ে দিল না কেন?

না—তা সে করে নি—পারে নি করতে।

কিন্তু কেন, কেন পারল না—কেন করল না ?

হয়ত তোমার ভালবাসাই তার মৃত্যুর পথ রোধ করে দাঁড়িয়েছিল !

ভালবাসা ?

হ্যাঁ, ভালবাসা।

না সম্রাট—সে ভালবাসে নি সত্যিকারের কোনদিন আমায়—তাহলে সে আজো এমনি করে কলঙ্কের বোঝা বয়ে বেড়াতে পারত না। ওর মধ্যে ভালবাসা কোনদিন ছিল না, আজো নেই। অন্ধ আমি—মূর্খ আমি—ঐ কালসাপিনীকে বিশ্বাস করেছিলাম।

সে না হয় পারে নি আত্মহত্যা করতে, কিন্তু যুবক—তোমার হাতে তো তীক্ষ্ন অসি ছিল, কটিদেশে তীক্ষ্ন ছুরিকা ছিল এবং তুমি বহু সুযোগ পেয়েছো তাকে হত্যা করবার—তবে তুমিই বা তাকে এতদিন হত্যা কর নি কেন আর কেনই বা তুমি তাকে ধর্মত্যাগিনী বিধর্মী জেনেও আজো তার পিছনে পিছনে অন্ধের মত এমনি করে ছুটতে ছুটতে এই কাবুল পর্যন্ত এসেছো ? কি যুবক—নীরব কেন ? জবাব দাও ?

সত্যিই রণবীর নির্বাক।

ঠিক ঐ একই কারণে—বুঝলে যুবক—যে কারণে তুমি তাকে হত্যা করতে পার নি ঠিক সেই কারণেই সে নিজের হাতে নিজের প্রাণ নষ্ট করতে পারে নি আজো। আর পারবেও না কোনদিন।

রণবীর পূর্ববৎ নীরব।

শোন যুবক—তোমরা দুজনেই দুজনকে ভালবাস—আজো—তোমাদের ঐ ভালবাসা কোনদিনই নষ্ট হবে না, তবে কেন মিথ্যা কষ্ট নিজে পাচ্ছো তাকেও দিচ্ছো।

সম্রাট!

হ্যাঁ—তাকে তুমি গ্রহণ করো।

না, না—তা আজ আর সম্ভব নয় সম্রাট।

কেন সম্ভব নয় ? সামান্য তার যেটুকু পরিচয় আমি পেয়েছি তার ঐ দেহটার উপরে যে যাই অত্যাচার করে থাকুক না কেন—তাতে তাকে এতটুকু দাগও দিতে পারে নি—সে আজো পবিত্র, সুন্দর—

না, না—নরকের কীট!

ভুল করো না রণবীর—এত বড় ভালবাসাকে অপমান করে না—অস্বীকার করবার চেষ্টা করো না।

অকস্মাৎ বলে ওঠে রণবীর আবেগ-আকুল কণ্ঠে, তা যদি পারতাম সম্রাট, তা যদি পারতাম—চন্দনাকে যদি আবার গ্রহণ করতে পারতাম—

পারবে—আমি বলছি তুমি পারবে—ক্ষমা করবার চেষ্টা করো ওকে।

ক্ষমা! ক্ষমা তো তাকে আমি করেছি সম্রাট— অনেকদিন আগেই করেছি।

রণবীর ?

হ্যাঁ সম্রাট—কিন্তু বুকের এ জ্বালা এ তো নিভছে না। চিতার আগুনের মত দিবারাত্র পোড়াচ্ছে—

যুবক ?

সম্রাট।

তুমি আমার সৈন্যদলে কাজ করবে ?

আপনার সৈন্যদলে ?

হ্যাঁ—তোমার মত সাহসী বীর যুবকদের সত্যিই আমি পছন্দ করি—ভালবাসি।

কিন্তু সম্রাট—

ভেবে দেখো—তোমাকে আমি আমার একজন সেনাধ্যক্ষ করে দেবো।

কিন্তু আমি যদি বিশ্বাসঘাতকতা করি সম্রাট ?

না। তা তুমি করবে না কোনদিনই আমি জানি।

বিধর্মী আমি—শুধু তাই নয় যে হিন্দুস্থান জয় করবার জন্য আপনি ছুটে চলেছেন আমি সেই হিন্দুস্থানেরই একজন—আর আমার জন্মভূমি আমার হিন্দুস্থানকে আমি ভালবাসি—

জানি।

তবে জেনেশুনে আপনি—

তোমায় কেন সেনাধ্যক্ষ করতে চাইছি তাই না ? সে তুমি বুঝবে না। আর সে কথা তোমায় আমি বলবোও না—এখন তুমি আমার প্রস্তাবে রাজী কিনা বল ? এখুনি তোমায় বলতে হবে না। দুদিন তোমায় ভাববার সময় দিলাম। ভেবে বলো। যেতে পারো তুমি এখন। তুমি আর বন্দী নও—তুমি মুক্ত—স্বাধীন।

রণবীর সম্রাটকে অভিবাদন জানিয়ে কক্ষ হতে বের হয়ে গেল।

বাবুর—সম্রাট বাবুর—তৈমুরের বংশধর বাবুর—রণবীরের গমনপথের দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসে।

একেও ছাড়া হবে না।

একেও চাই তার।

হিন্দুস্থান বিজয়ের পথে এরা হবে সত্যিকারের অস্ত্র।

মোল্লা মুরসিদের কথাগুলো মনে পড়ে—হিন্দুস্থানের মধ্যে বিশেষ যে স্থান সে রাজপুতানা।

মরু-পর্বতবেষ্টিত রাজপুতানা।

মেবার—মাড়োয়ার—বিকানীর, কোটা—অম্বর—যশল্মীর—এবং ঐ রাজপুতানার রাজপুতরাই হচ্ছে প্রকৃত যোদ্ধা।

প্রকৃত মুকাবিলা করতে হবে ঐ রাজপুতদের সঙ্গেই বাবুরকে :

মেবারের রাণা—সংগ্রাম সিংহ, মাড়বারের সুরজমল ও তার পৌত্র গাঙ্গ।

প্রহরী এসে কুর্নিশ দিল।

মালেকআলম।

কি সংবাদ ?

মোল্লা মুরসিদ শাহেনশার দর্শনপ্রার্থী ।

নিয়ে আয় এইখানেই—

॥ ৩৩ ॥

মোল্লা মুরসিদ হিন্দুস্থান থেকে ফেরবার পর সামান্য দু'চারটে কথাবার্তার পরই বাবুর তাকে আপাততঃ বিশ্রাম নিতে বলেছিল কারণ বাবুরের ইচ্ছা ছিল মোল্লা মুরসিদের কাছ থেকে সব কিছু জানবার পর ধীরে সুস্থে বিবেচনা করে যা করবার করা যাবে। অবস্থা বুঝে সেইমত ব্যবস্থা।

কিন্তু একটি রাত্রির মধ্যেই কিলাকিন প্রাসাদে যা ঘটে গেল অতঃপর আর ভারত অভিযানের ব্যাপারে বোধ হয় বেশী বিলম্ব করা সমীচীন হবে না--সেই কথাটাই যখন ভাবছে বাবুর, প্রহরী এসে কুর্নিশ করে জানাল—মোল্লা মুরসিদ তার দর্শনপ্রার্থী।

বাবুর একজন প্রকৃত যোদ্ধা ও একজন কবি হলেও ভাগ্য ও নিয়তিকে সে খুব বেশী বিশ্বাস করতো, বিশ্বাস করতো অলক্ষ্যে এক শক্তিই সকলকে চালিত করে। বুঝতে পারছিল অতঃপর তার নিয়তি তাকে পঞ্চমবার শেষ ভারত অভিযানের দিকেই নিয়ে যাচ্ছে তাই বাবুর তার রোজনামচার পাতায় লিখেছিল, হিন্দুস্থানে তাকে যেতেই হবে। এবং এবারে আর লুট নয় সেখানে রাজ্যস্থাপনা। পূর্বের চারবারের অভিযানের উদ্দেশ্য ছিল স্বর্ণপ্রসূ হিন্দুস্থানকে কেবল লুণ্ঠন, কিন্তু এবারে আর লুণ্ঠন নয়।

নদী-পর্বত-মেরু বেষ্টিত হিন্দুস্থান—কেবল মাটিই নয়—বাবুর বুঝেছিল সে এক সত্যিকারের সোনার দেশ। মাঠে মাঠে তার ফসলের সম্ভার—নদীতে মিষ্টি জল, খাদ্যের সেখানে কোনদিনই অভাব হবে না। ধরিত্রী সেখানে অকৃপণ হাতে যেন আপনাকে বিলিয়ে দিয়েছে। খাদ্য শস্য পশু তো আছেই আরো আছে অফুরন্ত রত্নভাণ্ডার।

অথচ সেই অফুরন্ত ঐশ্বর্যকে রক্ষা করবার মত মানুষ নেই। ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি লাভের যুদ্ধে সেখানে একটা অরাজকতা চলেছে। সম্রাট ইব্রাহিম—দিল্লীর সিংহাসনে বসে আছে নামে মাত্রই। একটা বিরাট সাম্রাজ্য কি করে সুশাসনে-সুবিচারে বুদ্ধি ও শক্তি দিয়ে করায়ত্ত রাখতে হয় সে বুদ্ধি বা শক্তি কোনটাই তার নেই। এবং যার ফলে চারিদিকে কেবল বিদ্রোহ আর বিদ্রোহ চলেছে। আফগান দস্যু ও লুণ্ঠনকারীরা ভারতের বহু অংশ নিজেদের করায়ত্ত করে নিয়েছে। দুর্বল সম্রাট ইব্রাহিম তাদের বাধা দিতে পারে নি। তাদের দমন করতে পারে নি তার রাজ্যশাসনের ব্যর্থতার জন্যই।

আর তার সেই ব্যর্থতার জন্যই তার চারপাশে সে সব সত্যিকারের বন্ধু আফগান আমীররা ছিল তারা তার প্রতি বিরূপ। তাদের আনুগত্য থেকে সম্রাট ইব্রাহিম বঞ্চিত আজ। এবং ক্রমশঃ ঐ সব শক্তিশালী আফগান আমীররা তাকে

ত্যাগ করে গঙ্গার অপর পারে চলে গিয়েছে। তাদেরই কবলিত আজ বিহার থেকে বাদাউন পর্যন্ত বিস্তৃত বিরাট হিন্দুস্থানের ভূখণ্ড।

কেবল বঙ্গদেশ, মালব ও গুজরাট স্বাধীন।

হিন্দু রাজপুত রাজারা রাণা সংঘকে তাদের দলের প্রধান করে সঙ্ঘবদ্ধ।

পাঞ্জাব দৌলত খাঁর অধীনে।

মোল্লা মুরসিদ কক্ষে এসে প্রবেশ করে কুর্নিশ জানাল। বন্দেগী জাঁহাপনা—

এসো মোল্লা—তোমার কথাই আমি ভাবছিলাম—হিন্দুস্থানের সব খবর বল।

আপনার প্রশ্নের উত্তরে বোধ হয় একটা কথাই বলতে পারি মালেক আলম—হিন্দুস্থান অভিযানের বাসনা যদি সত্যিই আপনার মনের মধ্যে থাকে তাহলে বোধ হয় আর অধিক কালহরণ করা সমীচীন হবে না। রাস্তাঘাটের তুষার গলার সঙ্গে সঙ্গেই অভিযান শুরু না করলে ঠকতে হবে শেষ পর্যন্ত আপনাকে।

আমিও একটু পূর্বে মনে মনে সেই কথাই ভাবছিলাম, বাবুর মৃদু কণ্ঠে বলে। এখন কি দেখে এলে বল।

মোল্লা মুরসিদ তখন সংক্ষেপে তার হিন্দুস্থান ভ্রমণের কথা বিবৃত করে বললে, হিন্দু রাজারা অতীব শক্তিশালী—শুধু তাই নয় মরু পর্বত অরণ্য বেষ্টিত রাজস্থান সত্যিই দুর্ভেদ্য—যদিও রাজপুত রাজাদের পরস্পরের মধ্যে মতের অমিল মনোমালিন্য ও শত্রুতা আছে, তাহলেও রাণা সংঘকে কেন্দ্র করে তারা মোটামুটি সঙ্ঘবদ্ধ। এবং সঙ্ঘবদ্ধ সেই শক্তি এক বিরাট শক্তি।

পাঞ্জাব তো দৌলত খাঁর অধীনে এখন।

হ্যাঁ—কিন্তু তার দুই পুত্র দিলওয়ার ও গাজি খাঁ নিজেরা আফগান হওয়ায় এবং ভারত সাম্রাজ্যের অন্যান্য অংশের আফগান আমীরদের অদৃষ্ট দেখে সম্রাট ইব্রাহিমের আয়ত্তের বাইরে চলে যাবার জন্য ভিতরে ভিতরে উৎসুক—

হুঁ—

আরো একটা সংবাদ আছে শাহেনশা—

কি ?

তারা আবারও আমার কাছে আপনার প্রতি আনুগত্য জানিয়েছে—

সত্যি !

হাঁ, তারা প্রতিশ্রুতি দিয়েছে আপনি যদি ভারত আক্রমণ করেন তারা তাদের সমস্ত শক্তি দিয়ে আপনার মদৎ করবে যেমন পূর্বে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। বাবুরের চোখের পিঙ্গল তারা দুটো যেন নেচে ওঠে।

বাবুর ক্ষণকাল চুপ করে থেকে বলে, মোল্লা—আমিও প্রস্তুত। বরফ গলা দু-চারদিনের মধ্যেই শুরু হবে—তারপরই আমাদের যাত্রা শুরু।

সত্যি সত্যিই তার পর দিন থেকেই আসন্ন ভারত অভিযানের তোড়জোড় শুরু হয়ে গেল। সৈন্যদের প্রস্তুতির সঙ্গে সঙ্গে খাদ্য সংগ্রহও শুরু হয়ে যায়।

তারপর এলো সেই শুভদিন। শুক্রবার রবি তখন ধনুরাশিতে। বারো হাজার

লোকের এক বিরাট বাহিনী। সেই বিরাট বাহিনীর মধ্যে বহু সুশিক্ষিত সৈন্য তো ছিলই—আরো ছিল সম্ভ্রান্ত বা সাধারণ, ভাল বা মন্দ, ভৃত্য বা ভৃত্য নয় সব প্রকারের লোকই।

উজ্জ্বল প্রভাত। বিরাট ঐ বাহিনী নিয়ে বাবুর হিন্দুস্থান অভিযানে অগ্রসর হলো। পুত্র হুমায়ুন তখনো দলে এসে যোগ দেয় নি।

কান্দাহারের শাসনকর্তা তখন তার একমাত্র পুত্র শাহাজাদা হুমায়ুন। তরুণ হুমায়ুন। বাগ-ই-ওয়াফাতে এসে বাবুরের বিরাট বাহিনী থামল প্রথম।

অপূর্ব স্থান ঐ বাগ-ই-ওয়াফাত।

অদ্ভুত নৈসর্গিক সৌন্দর্য চারিদিকে—নয়নাভিরাম।

চারিদিকে পাহাড়—

পাহাড়ের গায়ে কোথায়ও সবুজ আস্তরণ—কোথায়ও রুপালী ঝর্না নেমে এসেছে যেন কালো মেঘের বুকে বিদ্যুতের ইশারার মত। কোথায়ও বা রং-বেরংয়ের পাহাড়ী ফুলের বৈচিত্র্যের সমারোহ। চারিদিকে বিরাট সমতল ভূমি জুড়ে সারি সারি সব তাঁবু পড়েছে সৈন্যদের।

অখণ্ড অবসর—বিশ্রাম।

সুরার যেন স্রোত বয়ে চলেছে সকাল থেকে শুরু করে গভীর রাত পর্যন্ত।

কেবল কি সুরা—সেই সঙ্গে চলেছে ভাং।

মরিয়ম আর রণবীরও চলেছে হিন্দুস্থানাভিমুখে সম্রাট বাবুরের বিরাট বাহিনীর সঙ্গে সঙ্গে, মরিয়মের সঙ্গে তার দাসী আনোয়ারা।

রণবীর শেষ পর্যন্ত বাবুরের প্রস্তাবে সম্মত হয়েছে। সম্রাট তাকে তার সৈন্যদলে ভর্তি করে নিয়েছে। কেবল সৈন্যদলে ভর্তিই নয় আজ রণবীর বাবুরের অন্যতম সৈন্যাধ্যক্ষ। তার অধীনে পাঁচশত সুশিক্ষিত সৈন্য।

কটা দিন অনেক ভেবেছিল রণবীর। সম্রাট বাবুরের প্রস্তাবে রাজী হবে কি হবে না। তার এতকালের সংস্কার দেশপ্রীতি তাকে বার বার যেন পশ্চাৎ দিক থেকে টেনেছে। কিন্তু আবার মনে হয়েছে—তার সংস্কার এতকালের—তার দেশ-প্রীতি তো কোনদিনই সে ত্যাগ করতে পারবে না—সে কথাটা সে বাবুরকে স্পষ্ট করে জানিয়েও দিয়েছে, তবু সম্রাট তাকে সৈন্যাধ্যক্ষ করেছে।

আর দেশে ফিরে করবেই বা কি? সুখের ঘর বাঁধবার আশা তো চিরদিনের মতই তার শেষ হয়ে গিয়েছে। আশাহীন—আকাঙ্ক্ষাহীন এক জীবন।

সম্রাটের সৈন্যবাহিনীতে থেকে যুদ্ধ করতে করতে হয়ত একদিন তার এ জীবনটা শেষ হয়ে যাবে। যুদ্ধক্ষেত্রে কোন সৈনিকের অস্ত্রাঘাতে রক্তাপ্লুত সে লুটিয়ে পড়বে মাটিতে—ধীরে ধীরে চোখের আলো চিরতরে নিভে আসবে—তাই আসুক—যত তাড়াতাড়ি আসে ততই মঙ্গল।

আরো একটা কথা রণবীরের মনে হয়েছে, সম্রাটের সৈন্যবাহিনীতে থাকলে সম্রাটের মনের সত্যিকারের খবরটাও হয়ত সে পাবে। তেমন যদি বোঝে—তার ব্যবস্থাও তো তার হাতেই রইল।

মধ্যরাত্রি প্রায়—কালো আকাশের পটে হীরার কুচির মত অসংখ্য নক্ষত্র ছড়িয়ে আছে। মিটি মিটি জ্বলছে নক্ষত্রগুলো।

তাঁবুতে তাঁবুতে হৈ-হল্লা আর সুরার স্রোত বয়ে চলেছে। সারাটা রাতই প্রায় এমনি চলে। আজো হয়ত চলবে।

রণবীর একাকী তার তাঁবুর মধ্যে বসে ছিল—তাঁবুর খোলা প্রবেশপথে মধ্যরাত্রির শীতল বায়ু মধ্যে মধ্যে এসে প্রবেশ করছে। ভিতরে একটা মশাল জ্বলছে।

তাঁবুর বাইরে শুকনো পাতায় মৃদু মর্মর জাগল। রণবীরের শ্রবণেন্দ্রিয় সংগে সংগে সতর্ক হয়ে ওঠে। হয়ত পাহাড় অরণ্য থেকে কোন রক্তলোভী হায়না রাত্রির অন্ধকারে নেমে এসেছে। পাশেই শয্যার উপরে ছিল তরবারিটা—হাত বাড়িয়ে তরবারির বাঁটটা মুঠো করে চেপে ধরে রণবীর।

দীর্ঘ এক ছায়ামূর্তি তাঁবুর প্রবেশপথের সামনে আবছা আলো-আঁধারিতে দেখা গেল।

কে ?

ছায়ামূর্তি এগিয়ে আসে তাঁবুর প্রবেশপথের একেবারে অতি সন্নিকটে। রণবীর ততক্ষণে উঠে দাঁড়িয়েছে।

কে ?

রণবীর সিংহ।

ছায়ামূর্তি তাঁবুর মধ্যে এসে প্রবেশ করল। রণবীর ততক্ষণে আগন্তুককে চিনতে পেরেছে।

কুবলাই খাঁ তুমি ? এত রাত্রে ?

হ্যাঁ রণবীর, কুবলাই খাঁই আমি।

ক্ষণকাল স্থিরদৃষ্টিতে চেয়ে থাকে রণবীর সম্মুখে দন্ডায়মান কুবলাই খাঁর মুখের দিকে—তারপর মৃদুকণ্ঠে বলে, জানতাম তোমার সংগে একদিন আমায় মুখোমুখি দাঁড়াতে হবে কুবলাই খাঁ। কিন্তু সেটা যে এত শীঘ্রই—

বুঝতে পার নি রণবীর তাই না ? শোন রণবীর—আমাদের দুজনার এক সঙ্গে পাশাপাশি বাবুরের সৈন্যবাহিনীতে থাকা সম্ভবপর নয়—তাই—

কি ?

একজনকে সরে যেতে হবে।

রণবীর কুবলাই খাঁর কথার কোন জবাব দেয় না। কেবল নিষ্পলক ওর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে।

কুবলাই খাঁ আবার বলে, আর সরে যাওয়া ছাড়া কোন পথ নেই।

বোধ হয় দ্বন্দ্বযুদ্ধ চাও তুমি আমার সংগে করতে ?

তুমি ঠিকই অনুমান করেছো। দুজনাই আমরা যোদ্ধা—কাজেই যোদ্ধার মতই পরস্পর পরস্পরের সংগে মীমাংসা করে নেবো—বল কি যুদ্ধ চাও রণবীর। অসি-যুদ্ধ না মল্ল-যুদ্ধ ?

তুমিই বল না কুবলাই খাঁ—কি যুদ্ধ তুমি চাও। পাল্টা প্রশ্ন করে রণবীর।

আসিষ্যুখে আপত্তি আছে তোমার ?

বিন্দুমাত্রও আপত্তি নেই।

তবে চল।

এখনই ?

হ্যাঁ—এই মুহূর্তে।

রণবীর মুহূর্তের জন্য যেন কি ভাবল তারপর শান্ত গলায় বললে, বেশ চল।

কুবলাই খাঁ জানতে পারে নি ঘূণাক্ষরেও সে যখন তার তাঁবু থেকে বের হয়ে রণবীরের তাঁবুর দিকে আসছিল তখন সর্বাঙ্গে আর একজনও কৃষ্ণবর্ণ এক আংরাখায় ঢেকে রণবীরের তাঁবুর দিকেই আসছিল। কুবলাই খাঁকে রণবীরের তাঁবুর দিকে এগুতে দেখে সে হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল।

কে ঐ দীর্ঘকায় মূর্তি এই মধ্যরাত্রে রণবীরের তাঁবুর দিকে চলেছে ? কোন শত্রু নয় তো ?

আংরাখা-ঢাকা মূর্তির হাতটা নিঃশব্দে আংরাখার তলে কোমরে গোঁজা সুতীক্ষ্ন ছোরাটার বাঁটের উপর মুষ্টিবদ্ধ হয়ে চেপে বসে। চোখের দৃষ্টি তীক্ষ্ন হয়।

আংরাখা-ঢাকা মূর্তি তাকে অনুসরণ করে চলে।

আগের মূর্তি রণবীরের তাঁবুর মধ্যে গিয়ে প্রবেশ করল। দূর থেকে সব দেখতে পেল আংরাখা-ঢাকা মূর্তি। সে আর একটু এগিয়ে যায় তারপরই ওদের কথাবার্তা শুনে বুঝতে পারে যে ক্ষণপূর্বে তাঁবুর মধ্যে গিয়ে প্রবেশ করেছে সে আর কেউ নয়—সৈন্যাধ্যক্ষ কুবলাই খাঁ।

দৌলত খাঁর প্রেরিত চর লক্ষ্মণ সিংহই আজ কুবলাই খাঁ নামে পরিচিত। আজ যে সম্রাটের আনুগত্য স্বীকার করে তার কর্তব্য-কর্ম ভুলে পুরোপুরি এক যবনে রূপান্তরিত হয়েছে। নাম পর্যন্ত বদলেছে কুবলাই খাঁ।

কিন্তু কি চায় কুবলাই খাঁ—এত রাত্রে কেন সে রণবীরের তাঁবুতে। কি প্রয়োজন তার রণবীরের সঙ্গে ? সব কথাই শুনতে পায় সে ওদের।

বাইরের আকাশে ইতিমধ্যে একফালি বাঁকা চাঁদ দূর পাহাড়ের শীর্ষ ছুঁয়ে দেখা দিয়েছিল। ক্ষীণ চাঁদের আলো চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল।

রণবীর আর কুবলাই খাঁ দুজনে তাঁবু থেকে বের হয়ে আসে।

অল্প দূরে একটা পার্বত্য-নদী আছে। শীতের শেষে ক্ষীণস্রোতা। দুইজনে সেইদিকেই এগিয়ে চলল আবছা চন্দ্রালোকে।

আংরাখা-ঢাকা মূর্তিও দূর থেকে নিঃশব্দে তাদের অনুসরণ করে চলে পূর্ববর্তীদের অজ্ঞাতে—অলক্ষ্যে।

দুজনে নির্জন নদীতীরে এসে দাঁড়াল। হাত দশেক ব্যবধানে একটা বৃক্ষের আড়ালে নিজেকে আত্মগোপন করে দাঁড়াল ওদের পশ্চাদ্বর্তী সেই আংরাখা-ঢাকা মূর্তি।

ক্ষীণস্রোতা নদী তির তির করে বহে চলেছে।

রণবীর।

আমি প্রস্তুত কুবলাই খাঁ।

একটা কথা রণবীর—

কি ?

আমাদের মধ্যে যার মৃত্যু হবে—তাকে অন্যজন এই নদীতীরেই সমাধি দিয়ে যাবে।

বেশ তাই হবে।

আর একটা কথা।

কি ?

যেই বেঁচে থাকুক সে জীবনে কখনো অন্যজনের কথা কারো কাছে প্রকাশ করবে না।

বেশ।

তবে এসো।

চকিতে দুখানা তীক্ষ্নধার অসি কোষমুক্ত হয়ে ক্ষীণ চন্দ্রালোকে শূন্যে ঝিলিক দিয়ে উঠলো। পায়ে পায়ে দুজনে দুজনকে আক্রমণ করবার জন্য এগিয়ে যায়।

সুনিপুণ যোদ্ধা দুজনাই। দুজনাই সুদক্ষ অসিযোদ্ধা। নিস্তব্ধ নদীতীর মধ্যরাত্রির দুটি ইস্পাত ফলার পরস্পরের আঘাতে আঘাতে ঠুং ঠুং করে বারংবার উচ্চকিত হতে থাকে।

কেউ কাউকে চরম আঘাত হানতে পারে না—যদিও দুজনাই অল্পবিস্তর আহত হয়—দেহের নানাস্থান থেকে রক্তক্ষরণ হতে থাকে।

ঘর্মাক্ত কলেবর দুজনাই। হঠাৎ একটি মুহূর্তের যেন আক্রমণের বেগ প্রতিরোধ না করতে পেরে ভারসাম্য হারায় কুবলাই খাঁ আর ঠিক সেই মুহূর্তে রণবীরের অসির তীক্ষ্ন অগ্রভাগ কুবলাই খাঁর বুকের বাম দিকে বসে যায়। ফিনকি দিয়ে রক্ত ছোটে।

হাতের অসি খসে পড়ে—কুবলাই খাঁ টলে পড়ে। সঙ্গে সঙ্গে ছুটে এসে রণবীর কুবলাই খাঁকে ধরে, লক্ষ্মণ সিং।

না, না—ও নাম নয় আর রণবীর—লক্ষ্মণ সিংহ নেই—তার মৃত্যু হয়েছে—কুবলাই খাঁ, কুবলাই খাঁ বলো—একটু জল—

তাড়াতাড়ি ছুটে যায় রণবীর—নদীর জলে শিরস্ত্রাণ ভিজিয়ে নিয়ে আসে।

কিন্তু তখন আর কুবলাই খাঁ বেঁচে নেই। থমকে দাঁড়াল রণবীর, আর ঠিক সেই সময় পশ্চাৎ হতে শোনা গেল মৃদু ডাক। রণবীর।

॥ ৩৪ ॥

রত্নার অশ্ব মেওয়ারের পথে ছুটে চলেছিল। মাড়বার থেকে মেওয়ার দূরত্ব বড় কম নয়—দীর্ঘ পথ। কখনো গভীর অরণ্য—কখনো বন্ধুর পর্বত—আবার কখনো

বা সমতলভূমির ভিতর দিয়ে পথ চলে গিয়েছে মাড়বার থেকে মেওয়ারে। কোথাও সে পথ সরল কোথাও বক্র রীতিমত দুর্গম। অশ্ব খুব দ্রুত চললেও আগামীকাল সন্ধ্যার আগে সে মেওয়ারে পেঁছাতে পারবে না। তাকে যেতে হবে চিতোরগড়ে।

পার্বতী বর্তমানে চিতোরগড়েই আছে এবং গড়ের মধ্যে যে কোথায় আছে বীরেন্দ্র আর পার্বতী সেটা তাকে সেখানে পেঁছে কৌশলে খুঁজে বের করতে হবে।

নিজের প্রাণাপেক্ষা প্রিয় সহোদরা পার্বতীকে গাঙ্গ রাজ্য হতে তার বিতাড়িত করেছে। অপরাধ তার রাজার ঘরে জন্মে সে সাধারণ ঘরের এক যুবককে যে কিনা তাদেরই বেতনভুক এক সৈনিক মাত্র তাকে ভালবেসেছে। অসম ভালবাসার অপরাধে সে অপরাধিনী। গাঙ্গ তার সে অপরাধ ক্ষমার চোখে দেখতে পারে নি। হায় রে আভিজাত্যের গর্ব।

ঘটনাচক্রে দুর্ভাগ্য তার দেহের রাজরক্ত আজ পার্বতীর ভালবাসার পথ রোধ করে দাঁড়িয়েছে।

এই যে মানুষে মানুষে ভেদাভেদ এ তো আর কারো নয়, এ মানুষেরই সৃষ্টি। কোথাও আভিজাত্যের অহংকারে, কোথাও কুলমর্যাদার একটা অর্থহীন দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীর সৃষ্টি করে পরস্পরের মধ্যে—কোথাও বা অর্থের কৌলীন্যে—কোথাও ধর্মের গোঁড়ামিতে—বিচিত্র এক সমাজব্যবস্থার সৃষ্টি করে রেখেছে। নচেৎ পার্বতীকেই বা আজ এমনি করে তার ভালবাসার জন্য তার জন্মভূমি থেকে বহিষ্কৃত হতে হবে কেন—সহোদরের অমনি বুকভরা স্নেহ হতে বঞ্চিত হতেই বা হবে কেন, আর কেনই বা আজ এক জীবনব্যাপী দুঃখের—লজ্জার বোঝা বহন করে বেড়াতে হবে এমনি করে ভালবাসার মূল্য দিতে?

সহসা বুঝি পার্বতীর কথা ভাবতে ভাবতে নিজের কথাটাই মনে পড়ে যায়। তাকেও কি ঐ পার্বতীর মতই একদিন ঠিক অমনি দুর্ভাগ্যের বোঝা মাথা পেতে নিতে হয় নি, সেই একই প্রশ্ন—তাদেরও ভালবাসার মধ্যে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে ছিল? অথচ কি তার অপরাধ? লাল সিংয়ের নর্তকী স্ত্রী পান্নার গর্ভজাত সে—এই কি তার অপরাধ? কিন্তু তার জন্মের জন্য তো সে দায়ী নয়?

চিতোরগড়ের রাজসভায় নর্তকী পান্না নাচত। কোথা থেকে যে পান্না—নর্তকী পান্নাকে মেওয়ারের রাণা রায়মল এনেছিলেন চিতোরগড়ে কেউ তা জানে না। নানা কথা শোনা যায় সে সম্পর্কে।

চিরদিন নৃত্যগীতে প্রচণ্ড আকর্ষণ রাণা রায়মলের। এবং শেষের দিকে তার ছোট ভাইয়ের হাতেই বলতে গেলে রাজত্বের বেশীর ভাগ দায়িত্ব তুলে দিয়ে নৃত্যগীত নিয়েই থাকতেন রাণা।

পান্না—অষ্টাদশী অপরূপ সুন্দরী পান্না—যৌবন-ছলছল পান্না এসেছিলো চিতোরগড়ে। নারীর এক ধরনের রূপ আছে যা পুরুষের বুকে আগুন জেলে দেয়। পুরুষকে পতঙ্গের মত আকর্ষণ করে পুড়িয়ে মারে। পান্নারও ছিল সেই রূপ।

তরুণ লাল সিং ছিল রাণা রায়মলের প্রধান দেহরক্ষী—সৈনিক। যেমন বলিষ্ঠ

চেহারা তেমনি সুনিপুণ অসিযোদ্ধা লাল সিং। লাল সিং পান্নার রূপে যেন পাগল হয়ে গেল।

নৃত্যশালার পাশেই একটি পৃথক মহলে নর্তকী পান্নার থাকবার ব্যবস্থা হয়েছিল—সর্বক্ষণ প্রহরারও ব্যবস্থা ছিল। এক গভীর রাত্রে প্রাচীর ডিঙিয়ে লাল সিং এসে পান্নার মহলে প্রবেশ করল।

রাত তখন গভীর। সবে কিছুক্ষণ পূর্বে নাচের আসর থেকে ক্লান্ত পান্না ফিরে এসেছে। তখনো সাজপোশাক ছাড়ে নি। কক্ষের মধ্যে দীপাধারে দীপ জ্বলছিল। তারই মৃদু আলোকে কক্ষটি স্বল্পালোকিত। শয্যার উপর গা এলিয়ে দিয়ে পান্না শ্রান্তি বিনোদন করছিল।

দাসী একটি পাত্রে শরবৎ রেখে গিয়েছে, তখনো সেটা শয্যার পার্শ্বেই রাখা।

কক্ষের মধ্যে মৃদু পদশব্দ পাওয়া গেল। পান্না ভেবেছিল বুঝি তার দাসীই—তাই চোখ বুজেই কি বলে তার সাড়া না পেয়ে চোখ মেলতেই সে যেন চমকে তড়িৎবেগে শয্যার উপর উঠে বসে।

কে—কে তুমি।

একটা কালো আংরাখায় সর্বাঙ্গ আবৃত এমন কি চিবুকের অর্ধেকটা পর্যন্ত—দীর্ঘকায় এক পুরুষমূর্তি।

পান্না ততক্ষণে সোজা উঠে দাঁড়িয়েছে, বিস্ময়ে এবং ভয়ে হতচকিত ও বিমূঢ়। বোবা। কে ? কে তুমি ? পান্না পুনরায় প্রশ্ন করে।

আগন্তুক আরো দু-পা এগিয়ে এসে বলে, শোন পান্না, তোমার দাসী ও প্রহরী সকলকেই আমি হত্যা করেছি—কাজেই হাজার চেঁচালেও কেউ তোমার চিৎকার শুনতে পাবে না—আর সারা চিতোরগড়ে লাল সিংয়ের অসির সামনে এসে দাঁড়াবে এমন বুকের পাটাও কারো নেই।

লাল সিং। অস্ফুটকণ্ঠে কথাটা উচ্চারণ করে পান্না।

হ্যাঁ—আমি লাল সিং।

কি—কি চাও তুমি ?

বুঝতে পারছো না ? লাল সিংয়ের চোখের দৃষ্টিতে যেন একটা কৌতুক।

ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে আছে পান্না তখনো লাল সিংয়ের মুখের দিকে।

তোমাকেই আমি চাই।

আশ্চর্য স্পর্ধা তোমার।

স্পর্ধা। যা খুশি তোমার তুমি বলতে পার—তবে তোমাকে আমি নিতে এসেছি নিয়ে যাবো। বলতে বলতে এগিয়ে যায় লাল সিং পান্নার দিকে।

পান্না বুঝি নিজের অজ্ঞাতেই দু-পা পিছিয়ে যায়। কিন্তু সহসা হাত বাড়িয়ে প্রথমেই মুখটা চেপে ধরে ওরই ওড়না দিয়ে ওর মুখটা ও হাত দুটো শক্ত করে বেঁধে ফেলে লাল সিং, তারপর অনায়াসেই পান্নাকে কাঁধের উপর ফেলে শিকারী মার্জারের মত নিঃশব্দে কক্ষ থেকে বের হয়ে যায়।

প্রাচীরের অপর পার্শ্বে লাল সিংয়ের শিক্ষিত অশ্ব দাঁড়িয়েছিল—প্রাচীর টপকে পান্নাকে কাঁধে করেই লাল সিং অশ্বপৃষ্ঠে আরূঢ় হলো। সঙ্গে সঙ্গে

সুশিক্ষিত অশ্ব ঝড়ের বেগে চলতে শুরু করে।

দ্বারের প্রধান প্রহরী লাল সিংয়ের বন্ধু—সেরাত্রে সে-ই গড়ের দ্বার খুলে দিয়েছিল। লাল সিং সোজা চিতোরগড়ের বাইরে চলে যায়।

ঢালু পাহাড়ের গা বেয়ে পথ—সেই পথ বেয়ে নেমে আসে অশ্ব। সমতলভূমিতে পেঁছে অশ্বের গতি আরো বাড়িয়ে দেয় লাল সিং। নক্ষত্রবেগে যেন অশ্ব ছুটে চলে।

চিতোরগড় থেকে দূরে চলে যেতে হবে। অনেক দূরে—রাণা রায়মলের নাগালের বাইরে—তার আক্রোশের বাইরে। সোজা অতঃপর লাল সিং মাড়বারের পথেই অশ্ব ছুটিয়েছিল।

মায়ের মুখেই শোনা ঐ কাহিনী রত্নার। নর্তকী পান্না শেষ পর্যন্ত কিন্তু ক্রুদ্ধ হয়ে থাকে নি। লাল সিংয়ের বীরত্বে দুর্ধর্ষতায় মুগ্ধ হয়ে তাকেই বরণ করে নিয়েছিল। সেই লাল সিং আর পান্নারই কন্যা সে।

ভাগ্যের কি বিচিত্র খেলা। এতকাল পরে সে আজ আবার তার মাতৃভূমিতেই ফিরে চলেছে।

লাল সিং আর ফিরে যায় নি কোনদিন চিতোরগড়ে। ফিরে যাবার কথা ভাবেও নি কোনদিন।

অথচ আজ তারই কন্যা সেখানে এত বৎসর পরে সেখানেই চলেছে যেখান থেকে প্রাণের ভয়ে একদিন লাল সিংকে গভীর রাত্রের অন্ধকারে পালিয়ে আসতে হয়েছিল তার মাকে অশ্বপৃষ্ঠে তুলে নিয়ে।

কি বিচিত্র পরিহাস। একদিন যে দুর্ভাগ্যের জন্য সে এতটুকুও দায়ী নয় অথচ যে দুর্ভাগ্যের বোঝা বহে পিতৃহত্যার প্রতিশোধ না নিয়ে ভস্মীভূত ঘরবাড়ি ফেলে তাকে চোরের মত পালিয়ে যেতে হয়েছিল আজ ঠিক অনুরূপ দুর্ভাগ্যে জন্মভূমি ও স্বজনচ্যুত হয়ে যে নারী চিতোরে গিয়ে শেষ পর্যন্ত আশ্রয় নিয়েছে রাজরোষে তাকেই খুঁজে বের করতে হবে তাকে।

রাজরোষ—আভিজাত্যের অহঙ্কার তাকে নিষ্কৃতি দেবে না। পার্বতী আর বীরেন্দ্র। খুঁজে কি তাদের পাবে না?

নিশ্চয়ই পাবে। কিন্তু তারপর? তারপর রত্না কি করবে? কি বলবে পার্বতীকে?

বলবে পালাও পার্বতী। যদি বাঁচতে চাও—যত দূরে পারো যত শীঘ্র পারো পালিয়ে যাও বীরেন্দ্রকে নিয়ে। মাড়বার ও মেওয়ার ছাড়াও রাজস্থানে অনেক জায়গা আছে। চিতোরগড়ে আর একটা দিনও থেকো না।

গায় রাণা সংঘের সঙ্গেই তোমার বিবাহের স্থির করেছিল। রাণা সংঘ তোমাকে শীঘ্রই বিবাহ করতে যাবে মাড়বারে। তারই তোড়জোড় চলেছে।

রাণা সংঘ এখনো জানতে পেরেছে কিনা কে জানে। কিন্তু যদি সে জেনে থাকে তুমি আজ তারই আশ্রয়ে এসে উঠেছো সে নিশ্চয়ই তোমাদের বাধা দেবে যাতে তোমরা এই চিতোরগড় থেকে কোনমতেই না বের হয়ে যেতে পারো। রত্না চিতোরগড়ের দিকে ছুটে চলতে চলতে ঐ সব কথাই ভাবতে থাকে।

যে প্রেমের প্রদীপশিখাটি জ্বলে উঠেছে রত্না কিছুতেই সে শিখাটি নির্বাপিত হতে দেবে না। সে তার প্রাণ পর্যন্ত দিয়ে সেই শিখাটি জ্বালিয়ে রাখার চেষ্টাই করবে। পার্বতী বীরেন্দ্ররই—তার উপরে কারো কোন অধিকারই খাটবে না।

সন্ধ্যার আবছায়া আলো-আঁধারি তখন চিতোরগড়ের উপরে নেমে আসছে একটু একটু করে। দিনের শেষ আলোটুকু আকাশের পশ্চিম প্রান্ত থেকে মুছে গিয়েছে। পাখীর দল ডানা মেলে দিয়েছে গোধূলি আকাশে নীড়ের আশায়। সন্ধ্যা হওয়ার আগেই তাকে চিতোরগড়ে প্রবেশ করতে হবে। নচেৎ প্রধান দ্বারে অর্গল পড়ে গেলে আজ আর রত্না গড়ে প্রবেশ করতে পারবে না। সারাটা রাত গড়ের বাইরেই তাকে থাকতে হবে।

প্রাণপণে চড়াই পথটা অতিক্রম করে ঠিক গড়ের প্রধান দ্বারটিতে অর্গল পড়বার আগেই রত্না এসে দ্বারের সামনে পৌঁছাল। দ্বারী বাধা দিল, দাঁড়াও—কে তুমি—কোথা থেকে আসছো ?

রত্না পূর্ব হতেই স্থির করে রেখেছিল কি পরিচয় দেবে তার।

বলে, মাড়বার—যোধপুর থেকে আসছি আমি।

যোধপুর ?

কেমন যেন সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তাকায় দ্বারী রত্নার দিকে।

বয়েসে তরুণ—কিন্তু গলার স্বরটা যেন কেমন কোমল—নারীসুলভ।

হ্যাঁ—হ্যাঁ, যোধপুর থেকে আসছি মহারাজ গাঙ্গের বিশেষ একটি জরুরী পত্র নিয়ে।

জরুরী পত্র।

হ্যাঁ।

কার নামে জরুরী পত্র ?

মহারাণার।

তবু বুঝি সন্দেহ যেতে চায় না দ্বারীর মন থেকে। সে পুনরায় শুধায়, দেখি কি পত্র।

রত্না মৃদু হাসে, মহারাণার পত্র—তার হাতেই আমি পেঁৗছে দেবো—আর কারো হাতে নয়। আর তুমি যদি ভিতরে আমাকে প্রবেশ করতে না দাও আমি ফিরেই যাই—

রত্না তার অশ্বের লাগাম টেনে অশ্বের মুখ ফেরায়—যেন ফিরে যাবারই ভান করে। দ্বারী তাড়াতাড়ি বলে ওঠে, না, না—তুমি যাও। দ্বারী পথ ছেড়ে দিল।

রত্না ভিতরে প্রবেশ করল। সন্ধ্যার অন্ধকার তখন আরো ঘন হয়ে এসেছে। গড়ের এখানে ওখানে আলো জ্বলে উঠেছে।

মন্থর গতিতে এগিয়ে চলে রত্না। সম্পূর্ণ অপরিচিত জায়গা। নামই শুনেছে চিতোরগড়ের কিন্তু ইতিপূর্বে কখনো এখানে সে আসে নি। গড়ের কিছুই সে

জানে না। কিন্তু এবারে সে কোথায় যাবে।

দীর্ঘপথ অশ্বপৃষ্ঠে একটানা অতিক্রম করে ক্ষুধায় তৃষ্ণায় রত্না ক্লান্ত। আহার না জোটে জুটুক—রাত্রির মত একটু বিশ্রামের নিশ্চিন্ত আশ্রয় অন্তত চাই-ই। কিন্তু কোথায় যে সে আশ্রয় মিলতে পারে কিছুই বুঝতে পারে না রত্না।

এদিক ওদিকে নানা লোক যাতায়াত করছে। কেউ কেউ রত্নার দিকে তাকায়।

অশ্বারোহী কে এই অপরিচিত ব্যক্তি? রত্না অশ্ব থেকে একসময় অবতরণ করল, তারপর অশ্বের বল্গাটা হাতে ধরে মন্থর পায়ে এগিয়ে চলে চারিদিকে তাকাতে তাকাতে।

রত্না যখন রাতের মত একটু আশ্রয়ের জন্য গড়ের মধ্যে অনির্দিষ্ট ভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছে—সেই সময়—প্রাসাদে মহিষী রঙ্গাবতীর মহলে—রঙ্গাবতী একটি পালঙ্কের উপর উপবিষ্ট—প্রসাধনকারিণী তার কেশ প্রসাধন করছে।

সামনে দাঁড়িয়ে কুর্চি। রঙ্গা শুধায়, তা কি বলতে এসেছিস তা বলবি তো।

কুর্চি তথাপি কোন জবাব দেয় না। নীরবে যেমন দাঁড়িয়েছিল তেমনিই দাঁড়িয়ে থাকে।

রঙ্গাবতী বোধ হয় ব্যাপারটা অনুমান করতে পারে।

কেশ প্রসাধন ইতিমধ্যে সমাপ্ত হয়ে গিয়েছিল, প্রসাধনকারিণীকে ইঙ্গিতে রঙ্গাবতী কক্ষ ত্যাগ করতে আদেশ দেয়।

প্রসাধনকারিণী কক্ষ হতে বের হয়ে গেল। বল্ এবারে কি বলছিলি?

রাণীমা—একটা বিশেষ অনুরোধ নিয়ে এসেছি।

তা তো বুঝতেই পারছি। কি বল্ শুনি?

একটি মেয়েকে তোমায় রক্ষা করতে হবে—ঐ শয়তান সুচিৎ সিংহটার হাত থেকে।

সুচিৎ সিংহ। নামটা শুনেই রঙ্গাবতী ভ্রূদুটো কুঁচকায়। ঐ মানুষটাকে রঙ্গাবতী আদৌ পছন্দ করে না, অথচ সে জানে সুচিৎ সিংহ আবার মহারাণার প্রিয়পাত্র। কাজেই সঙ্গে সঙ্গে রঙ্গাবতী বুঝতে পারে ব্যাপারটা একটু কঠিনই।

তবু রঙ্গাবতী প্রশ্ন করে, কে আবার মেয়ে এলো। কি নাম তার—কি পরিচয়।

পার্বতী।

পার্বতী?

হ্যাঁ—আর সে একজনকে ভালবাসে। বীরেন্দ্র—তরুণ যুবক—বেচারী ঐ ভালবাসার জন্য গৃহ—আত্মীয়স্বজন সব ছেড়ে চলে এসেছে।

বলিস কি।

হ্যাঁ—কুর্চি তখন ধীরে ধীরে পার্বতী ও বীরেন্দ্রর কাহিনী যতটুকু জেনেছিল সব বলে গেল রঙ্গাবতীর কাছে। তারপর একটু থেমে কুর্চি বলে, ওদের আর একটা পরিচয় আছে রাণীমা—মানে পার্বতীর—

কি পরিচয়? মৃদু হেসে প্রশ্ন করে রঙ্গাবতী।

পার্বতী কার ভগ্নী জান রাণীমা ?

কার ? সকৌতুকে তাকায় রঞ্জাবতী কুর্চির দিকে।

যোধপুরাধিপতি মহারাজ গাঙ্গর ভগ্নী।

কি—কি বললি, কার ভগ্নী ? হঠাৎ যেন চমকে ওঠে নামটা শুনেই রঞ্জাবতী।

যোধপুরাধিপতির ভগ্নী।

কি বলছিস তুই কুর্চি, আমি তো কিছুই বুঝে উঠতে পারছি না।

না বুঝতে পারারই কথা। কারণ যোধপুরাধিপতি গাঙ্গর একমাত্র ভগিনীর সঙ্গে যে মহারাণার বিবাহের সব কথা পাকা হয়ে গিয়েছে রঞ্জাবতী তা শুনেছিল।

কেবল কি একটা যুদ্ধের ব্যাপারে বিবাহটা কটা দিন পিছিয়ে গিয়েছিল—কিন্তু যুদ্ধে গাঙ্গের জয় হয়েছে এবং বিবাহের দিন আসন্ন।

সত্যি—সত্যি বলছিস কুচি ?

সত্যিই বলেছি—মিথ্যা বলি নি।

হুঁ—মহারাণা জানেন কথাটা ?

মনে হচ্ছে জানেন।

কি করে বুঝলি ?

তা নাহলে সুচিৎ সিংহ তাদের তার বাড়িতে নজরবন্দী করে রাখতে সাহস পেত না।

রঞ্জাবতী অতঃপর কিছুক্ষণ চুপচাপ থাকে। মনে হয় গভীর ভাবে সে যেন কি ভাবছে।

ধীরে ধীরে একসময় মুখ তুলে ডাকল রঞ্জাবতী, কুর্চি ?

রাণীমা ?

তুই সত্যি বলছিস পার্বতী বীরেন্দ্রকে ভালবাসে ?

নাহলে তোমার কাছে ছুটে আসব কেন রাণীমা। আহা মেয়েটাকে তুমি বাঁচাও রাণীমা।

ঠিক আছে, শোন্—একটা কাজ করতে পারবি ?

কি ?

রাত্রি দ্বিতীয় প্রহরে তুই এখানে আসতে পারবি গোপনে ?

দ্বিতীয় প্রহরে, কেন পারব না, খুব পারবো।

আমি নিজে যাবো—

কোথায় রাণীমা ?

সুচিৎ সিংহর গৃহে।

সে কি।

হ্যাঁ—কুর্চি তুই আমাকে সুচিৎ সিংহের গৃহে নিয়ে যেতে পারবি না ?

কেন পারব না ? কিন্তু—

কি ?

যদি কেউ দেখে ফেলে ?

ছদ্মবেশে যাব। হ্যাঁ আর শোন একটি অশ্ব প্রস্তুত রাখবি !

বেশ।

যা বললাম পারবি তো।

পারব। কুর্চি ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

এই প্রৌঢ় বয়েসে রাণা আবার চতুর্থবার পাণিগ্রহণ করতে চলেছে এক তরুণীকে কথাটা শোনা অবধি রত্নাবতীর ভাল লাগে নি। কিন্তু নিরুপায় বলেই সে চুপ করে ছিল।

কিন্তু সে কন্যা যদি একজনকে ভালোবাসে তাহলে কোনমতেই এ বিবাহ হতে পারে না।

॥ ৩৫ ॥

অকস্মাৎ নারীকণ্ঠের সেই ডাক, রণবীর—শোনার সঙ্গে সঙ্গেই রণবীর ঘুরে তাকিয়েছিল পশ্চাতের দিকে।

সামনে মৃদু জ্যোৎস্নালোকে দাঁড়িয়ে এক আংরাখা ঢাকা মূর্তি। আশেপাশে আর তৃতীয় কোন উপস্থিতি নেই।

রাত্রির তৃতীয় যাম উত্তীর্ণপ্রায়—জ্যোৎস্না ক্রমশঃ ম্লান হয়ে আসছে। দূরে পাহাড়ের শীর্ষে শীর্ষে শেষ আলোর পরশ যেন লেগেছে। একটানা নদীর মৃদু কল্লোলধ্বনি বাতাসে ভেসে আসে।

রণবীর !

মরিয়ম ? রণবীরের মৃদু কণ্ঠে নামটা উচ্চারিত হয়।

আংরাখাটা মরিয়ম মুখের উপর থেকে সরিয়ে দেয়—মরিয়মের মুখটা আবছা চাঁদের আলোয় স্পষ্ট হয়ে ওঠে। মরিয়ম চেয়ে আছে রণবীরের মুখের দিকে।

কুবলাই খাঁর মৃত্যু হয়েছে ? মরিয়ম প্রশ্ন করে।

হ্যাঁ—লক্ষ্মণ সিংহ মৃত।

ঐ নামটা আর উচ্চারণ নাই বা করলে, মরিয়ম যেন রণবীরকে বাধা দিল। মরিয়ম তারপর একটু যেন থেমে আবার বলে, এখন ঐ মৃতদেহটার ব্যবস্থা কি করবে ?

কিন্তু তুমি আমাদের অনুসরণ করেছিলে কেন ?

মরিয়ম রণবীরের প্রশ্নের কোন উত্তর দেয় না—নিঃশব্দে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে।

না রণবীরের মৃত্যুটা স্বচক্ষে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে উপভোগ করবার জন্যই চোরের মত গোপনে আমাদের অনুসরণ করে এসেছিলে ?

মরিয়মের মুখের দিকে স্থিরদৃষ্টি রেখে দ্বিতীয়বার প্রশ্নটা করে রণবীর। রণবীরের কণ্ঠস্বরে যেন একটা তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গ ফুটে ওঠে।

মরিয়ম পূর্ববৎ নীরব। তেমনি স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে মরিয়ম রণবীরের

মুখের দিকে নির্বাক প্রস্তরমূর্তির মত যেন।

খুব হতাশ হলে না মরিয়ম বিবি ?

মরিয়মের ওষ্ঠপ্রান্তে এবার মৃদু হাসির রেখা জেগে উঠল। শান্তকণ্ঠে সে বললে, আমার কথা থাক। সামান্য এক বাইজী সম্পর্কে নাই বা চিন্তা করলে। ঐ মৃতদেহটার কি ব্যবস্থা করবে তাই এখন ভাব—কারণ ভোর হবার আর বেশী দেরি নেই। তাছাড়া—

তাছাড়া কি বল, থামলে কেন মরিয়ম বিবি ?

সম্রাট যখন তার সেনাধ্যক্ষের খোঁজ করবেন তখনই বা কি জবাব দেবে তাকে ?

বলবো সে আমার হাতে দ্বন্দ্বযুদ্ধে নিহত।

কিন্তু সম্রাট যখন শুধাবেন দ্বন্দ্বযুদ্ধটা কেন ?

প্রয়োজন হলে সে প্রশ্নেরও জবাব দেবো।

তাই যদি তবে আর বিলম্ব করছো কেন ? মৃতদেহটার একটা ব্যবস্থা কর।

সেজন্য তোমায় ভাবতে হবে না—তুমি তোমার শিবিরে ফিরে যাও।

একা তো ব্যবস্থা করা তোমার পক্ষে সম্ভবপর হবে না।

তুমি সাহায্য করবে ?

যদি সাহায্য চাও।

রণবীর অতঃপর কি যেন চিন্তা করলো কয়েকটা মুহূর্ত—তারপর বলল, বেশ—থাক এখানে—প্রয়োজন হলে তোমার সাহায্য নেবো।

রণবীর অতঃপর নদীতীরে এগিয়ে গিয়ে উপযুক্ত স্থান দেখে ক্ষিপ্রহাতে তরবারির সাহায্যে নদীতীরবর্তী একটা জায়গায় নরম মাটি দেখে খুঁড়তে শুরু করল। প্রায় ঘণ্টাখানেক সময় লাগলো একটা গর্ত খুঁড়তে।

গুরু পরিশ্রমে রণবীর তখন রীতিমত হাঁপাচ্ছে। সারাটা কপাল জুড়ে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমে উঠেছে। দ্রুততালে নিঃশ্বাস নিচ্ছে। পূবের আকাশে তখন আলোর ছোপ ধরেছে। রাত্রি অবসানপ্রায়।

মরিয়মের সাহায্যেই কোনমতে ধরাধরি করে মৃতদেহটা এনে সেই অপরিসর গর্তের মধ্যে শুইয়ে দিল রণবীর।

লক্ষ্মণ সিংহের তরবারিটা—ওর বুকের উপরে রাখল—সর্বশেষে নিজের উষ্ণীষটা খুলে সেটা বিছিয়ে দিল ওর দেহের পরে। নতজানু হয়ে প্রার্থনা জানাল। অতঃপর মাটি দিয়ে চাপা দিয়ে দিল শবদেহ।

গুরু পরিশ্রমে রণবীরের সমস্ত দেহ তখন অবসন্ন—ক্লান্তিতে সে ভেঙ্গে পড়ছে। অতঃপর নদীর দিকে এগিয়ে গেল রণবীর।

পার্বতী নদী শীতের শেষে মন্দস্রোতা, এখানে ওখানে কতকগুলো বড় বড় পাথর পড়ে আছে। পাথরের চতুষ্পার্শে ক্ষীণ স্রোতের আবর্ত একটা গুঞ্জন তুলেছে। হিমশীতল জল—সেই জলেই হাত পা মুখ প্রক্ষালিত করে নিল রণবীর। অনেকটা তখন আরাম বোধ হয়। মরিয়ম তখনো অনতিদূরে নদীতীরে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে।

পাহাড়ের শীর্ষে শীর্ষে প্রথম সূর্যের রঙিন আভা তখন অত্যাসন্ন সূর্যোদয়ের

ইশারা জানাচ্ছে।

জল থেকে উঠে এল রণবীর। মরিয়ম ওর মুখের দিকে স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে।

কয়েক পলক নিঃশব্দে মরিয়মের মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে শিবিরের দিকে চলতে শুরু করল রণবীর। মরিয়ম তাকে নিঃশব্দে স্বল্প ব্যবধানে অনুসরণ করে।

রণবীর!

মরিয়মের ডাকে ফিরে তাকাল রণবীর।

মরিয়ম বলে, আমি জানি আমাকে তুমি কি প্রচণ্ড ঘৃণা করো—অবিশ্যি তার জন্য আমার কোন ক্ষোভ বা নালিশ নেই, কিন্তু—বলতে বলতে মরিয়ম থামে—রণবীর মরিয়মের মুখের দিকে নিঃশব্দে তাকায়।

দুজনে তখন পাশাপাশি হেঁটে চলেছে। মরিয়ম বলে, কিন্তু তুমি একাজ করলে কেন?

কি?

সম্রাটের কাছে সেনাধ্যক্ষের নোকরি নিলে কেন?

কেন, কারো তাতে কিছু ক্ষতি হয়েছে কি? রণবীর প্রশ্নটা করে ওর মুখের দিকে তাকায়।

ক্ষতি!

হ্যাঁ—অন্তত তোমার তাতে নিশ্চয়ই কোন ক্ষতি হয় নি মরিয়ম বিবি।

আমার—সর্বস্ব হারিয়ে যে দেউলিয়া হয়ে গিয়েছে—সমস্ত জীবনটাই যার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত একটা ক্ষতি—যার অস্তিত্বটাই একটা বিরাট মিথ্যার উপর দাঁড়িয়ে আছে—তার আর নতুন করে কি ক্ষতি হবে রণবীর—তা নয়—

তবে?

আমি তোমার কথাই বলছিলাম।

আমার কথা?

হ্যাঁ—তুমি এমনি করে পরাধীনতার শৃংখল ইচ্ছা করে নিজের পায়ে জড়ালে কেন?

আর একবার ঘুরে তাকাল রণবীর মরিয়মের দিকে। কোন জবাব দিল না।

উঁচুনীচু অসমতল পথ—পাথর আর কাঁকর। মরিয়ম বলতে থাকে, কে আমি—অতি তুচ্ছ নগণ্য এক নর্তকী—রূপোপজীবিনী দেহপসারিনী—আমার প্রতি আক্রোশে নিজের ওপরে এমন প্রতিশোধ নিলে কেন রণবীর। এর চাইতে আমাকে তুমি হত্যা করলে না কেন।

তোমার প্রতি প্রতিশোধ নিতেই আমি বাবুরের সৈন্যাধ্যক্ষের কাজ নিয়েছি কে তোমাকে বললে মরিয়ম বিবি?

আমি জানি।

তাহলে বলবো তোমার ভুল।

সহসা মরিয়ম দু-পা এগিয়ে একেবারে রণবীরের মুখোমুখি দাঁড়াল—দু-

বলে বাবুরের মনে হয় না।

মনুষ্যচরিত্র সম্বন্ধে বতটুকু তার জ্ঞান তাতে মনে হয় না কুবলাই খাঁ শেষ পর্যন্ত বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারে।

বাবুর—নুরউল্লা ও মোল্লা মুরশিদ তিনজনই সম্রাটের শিবিরের মধ্যে উপস্থিত।

মোল্লা মুরশিদ।

জাঁহাপনা।

তোমার কি মনে হয় ?

সে যদি পালিয়েও থাকে রাত্রির মধ্যে আর কতদূর যেতে পারবে—আমাদের প্রেরিত অশ্বারোহী চররা নিশ্চয়ই তার সন্ধান পাবে। তবে আমার মনে হয়—

কি !

কোথাও একটা গোলযোগ হয়েছে।

গোলযোগ ?

হ্যাঁ—জাঁহাপনা।

কিন্তু—

দ্বারী এসে ঐ সময় কুর্নিশ করে বললে, সেনানায়ক রণবীর সম্রাটের দর্শনপ্রার্থী।

যাও তাকে পাঠিয়ে দাও।

রণবীর এসে সম্রাটের শিবিরে প্রবেশ করল—কুর্নিশ জানাল।

কি সংবাদ রণবীর ?

আমি জানি কুবলাই খাঁ কোথায় জাঁহাপনা।

জান ? কোথায় সে ?

গত রাত্রে—

কি বল। থামলে কেন ?

তার মৃত্যু হয়েছে সম্রাট।

মৃত্যু। কি বলছো তুমি রণবীর ?

হ্যাঁ সম্রাট—কাল রাত্রে যার সঙ্গে সে দ্বন্দ্বযুদ্ধ করেছিল তারই হাতে তার মৃত্যু হয়েছে—নদীতীরে তার মৃতদেহ প্রোথিত আছে।

রণবীর, এসব তুমি কি বলছো ? আমি যে কিছুই তোমার কথা বুঝতে পারছি না ?

সম্রাট কাল রাত্রে সে একজনকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করে—

তারপর ?

তারই হাতে শেষ পর্যন্ত তার মৃত্যু হয়েছে।

কে সে ?

রণবীর নীরব।

বল—কে সে ? বল কে সে বীর যে কুবলাই খাঁকে হত্যা করতে পারে ?

এই মুহূর্তে সে আপনার সামনেই দাঁড়িয়ে সম্রাট।

তুমি ?

রণবীর নীরব।

তোমার হাতেই তার মৃত্যু হয়েছে ?

হ্যাঁ।

কিন্তু কেন—কিসের জন্য যুদ্ধ ?

রণবীর তখন সমস্ত ঘটনা আনুপূর্বিক বিবৃত করে।

সম্রাট বাবুর স্তব্ধ। অনেকক্ষণ পরে ধীরে ধীরে মৃদু হেসে বাবুর বলে, ঠিক আছে, তুমি যাও রণবীর।

রণবীর নিঃশব্দে শিবির থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেল।

॥ ৩৬ ॥

রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর। সারা চিতোরগড়ের উপর যেন নিদ্রার প্রশান্তি নেমে এসেছে। নিষুতি রাত, স্তব্ধ চারিদিক। মধ্যে মধ্যে কেবল দু-একটা রাতজাগা পাখীর ডানা ঝাড়ার শব্দ মধ্য নিশীথের স্তব্ধতা ভঙ্গ করছে। মনে হয় বুঝিবা রাত্রির দীর্ঘশ্বাস পড়ছে।

রাজপ্রাসাদেও সবাই নিদ্রার কোলে ঢলে পড়েছে—কেবল ঘুম নেই রাত-প্রহরীদের চোখে। রাতজাগা প্রহরীর দলকে মুক্ত কৃপাণ হাতে নিঃশব্দে প্রাসাদের স্বল্প আলোছায়ার মধ্যে বিচরণ করতে দেখা যাচ্ছে।

রত্নাবতীর ঘরে প্রদীপ জ্বলছিল বটে তবে তার শিখাটি কমানো—মৃদু আলোছায়ার একটা খেলা ঘরের মধ্যে। প্রস্তুত হয়েই ছিল রত্নাবতী। কুর্চি এসে তাকে সুচিৎ সিংয়ের গৃহে নিয়ে যাবে। ছদ্মবেশ ধারণ করেছিল রাণী রত্নাবতী। কিন্তু রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর তো উত্তীর্ণ হয়ে গেল এখনো কুর্চি এলো না কেন। তবে কি সে ভুলে গেল ?

কিন্তু কুর্চিকে রত্নাবতী খুব ভাল করেই জানে—সে নিশ্চয়ই আসবে। তার কথার অন্যথা হবে না।

আরো কিছুক্ষণ অতিবাহিত হয়ে গেল কুর্চি এলো না। এতক্ষণে কিন্তু সত্যিই চিন্তা হয় রত্নাবতীর। মনে হয় তবে কি তাদের অভিসন্ধির কথাটা কেউ জেনে ফেলেছে ? আশ্চর্য কিছু নয়। প্রাসাদের সকলেই জানে আজ আর রাণী রত্নাবতী মহারাণার সর্বাপেক্ষা প্রিয় মহিষী নন। নিত্য নতুনের অভিলাষী রাণার মন আজ অন্যত্র বাঁধা পড়েছে। কদাচিৎ কখনো আজকাল রত্নাবতীর মহালে মহারাণা পদার্পণ করে।

নিঃসন্তান রত্নাবতীর যদিও আজ বয়েস হয়েছে তথাপি তাকে দেখলে তা বোঝা যায় না। এখনো তার দেহে যেন যৌবন অটুট হয়ে আছে। বিবাহের পূর্ব পর্যন্ত রত্নাবতী—পাহাড়ে বনে জঙ্গলে অবাধে খেলাধুলা করে বেড়িয়েছে। বাপের আদরিণী কন্যা সে। অশ্বচালনা—তীরধনুক ছোঁড়া ও বর্শা চালনায় সে

সুদক্ষ—এবং প্রকৃতির মধ্যে সে পালিতা হয়েছিল বলেই তার দেহের বাঁধুনীও সেই রকমই হয়ে উঠেছিল। চিরদিনই দুঃসাহসী। এবং আজও সে স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য তার সর্বদেহ যেন ছাপিয়ে যায়।

রঞ্জাবতী যতই দুঃসাহসিকা হোক না কেন কুর্চি সত্যিই প্রথমটায় রঞ্জাবতীর প্রস্তাবে সাড়া দিতে পারে নি। কারণ কোনক্রমে ব্যাপারটা মহারাণার কর্ণগোচর হলে মহারাণার আক্রোশ থেকে কেউ তাকে বাঁচাতে পারবে না। রঞ্জাবতীরও সাধ্য নেই আজ তাকে সে রক্ষা করে। তবু রঞ্জাবতীকে সে সত্যিই ভালবাসে বলে তার কথায় সম্মত হয়েছিল। রঞ্জাবতীর অজ্ঞাত কিছুই নেই।

সহসা বন্ধ দরজার গায়ে মৃদু সংকেত ধ্বনি শোনা গেল। রঞ্জাবতী সঙ্গে সঙ্গে উৎকর্ণ হয়ে ওঠে।

কে? চাপা কণ্ঠে রঞ্জাবতী প্রশ্ন করে।

আবার সংকেত ধ্বনি শোনা গেল।

দরজার কাছে এগিয়ে গিয়ে চাপা সতর্ক কণ্ঠে প্রশ্ন করে রঞ্জাবতী, কে?

আমি কুর্চি—দরজাটা খুলুন রাণীমা।

সন্তর্পণে কক্ষের অর্গল মুক্ত করে রঞ্জাবতী। কুর্চি এসে কক্ষে প্রবেশ করল। এবং স্বল্পালোকে রঞ্জাবতীর দিকে দৃষ্টিপাত করে থমকে দাঁড়াল কুর্চি।

পুরুষের ছদ্মবেশ নিয়েছে রঞ্জাবতী। মালকোছা এঁটে শাড়ি পরিধান করেছে—মাথায় পাগড়ি।

অমন করে হাঁ হয়ে কি দেখছিস। এত দেরি করলি কেন?

এত রাত্রে তোমার মহালে প্রবেশ করা কি সহজ বিশেষ করে অন্দরমহলের খাস প্রহরী কালু সিংয়ের চোখে ধুলো দিয়ে—ভাগ্যে আজ কালু সিং মন্ত্রণা-কক্ষের বাইরে প্রহরা দিচ্ছে—

কালু সিং মন্ত্রণাকক্ষের বাইরে প্রহরা দিচ্ছে এত রাত্রে?

হ্যাঁ—দূর থেকে তো তাই দেখলাম। মনে হলো মহারাণা মন্ত্রণাকক্ষেই আছেন।

এত রাত্রে মহারাণা মন্ত্রণাকক্ষে?

সেইরকমই তো মনে হলো, নচেৎ কালু সিং মন্ত্রণাকক্ষের দরজার বাইরে এসময় পাহারা দেবে কেন!

রঞ্জাবতী যেন মুহূর্তকাল কি ভাবল তারপর বলল, ঠিক আছে চল—অশ্ব প্রস্তুত?

হাঁ রাণীমা।

চল। দুজনে অতঃপর কক্ষ থেকে বের হয়ে আসে।

প্রশস্ত অলিন্দ। অলিন্দে রাত-বাতির ব্যবস্থা থাকলেও আলো পর্যাপ্ত নয়। আলোছায়ায় কেমন যেন একটা ছমছমে ভাব।

ঐ প্রশস্ত অলিন্দের পরই এদিক ওদিক সংকীর্ণ সব অলিন্দপথ চলে গিয়েছে। অন্দরের এদিকটায় প্রহরী খুব বেশী থাকে না। একজন প্রহরীই ঘুরে ঘুরে সর্বত্র পাহারা দিয়ে বেড়ায়। তাছাড়া ঐসব সংকীর্ণ অলিন্দর সঙ্গে অনেক

গুপ্তপথের যোগাযোগ আছে—রত্নাবতীর সে গুপ্তপথগুলো অজানা নয়। তারই একটা গুপ্তপথে রত্নাবতী কুর্চিকে নিয়ে প্রবেশ করল। এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই তারা প্রাসাদের বাইরে চলে এলো।

অন্ধকার রাত্রি। কালো আকাশের বুকে কেবল নক্ষত্রগুলো মিটমিটি জ্বলছে—তারই মৃদু আলোয় চিতোরগড় তখন ঘুমিয়ে আছে নিশ্চিন্তে যেন মনে হয়। এদিক ওদিক তাকালে সেই অন্ধকারের মধ্যে হেথা-হোথা দু-একটা গবাক্ষপথে মৃদু আলোর ইশারা পাওয়া যায়। একটা বৃক্ষের নীচে একটা অশ্ব বাঁধা ছিল। কুর্চি রত্নাবতীকে নিয়ে বৃক্ষের নীচে এসে দাঁড়াল।

প্রথমে রত্নাবতী অশ্বের উপর আরোহণ করল, তার পর কুর্চিকে তার পিছনে তুলে নিল। সুশিক্ষিত অশ্ব বল্গার সামান্য ইঙ্গিত পেয়ে চলতে শুরু করে দক্ষিণ মুখে।

কিছুদূরে যে জলাধার—যে জলাধার থেকে সমগ্র চিতোরগড় তৃষ্ণা মেটায় ও অন্যান্য কর্ম সমাধান করে—পাহাড়ের মধ্যস্থিত এক গুপ্ত ঝর্ণা থেকে সেই জল দিবারাত্র ঝর ঝর করে ঝরে জলাধার পূর্ণ করছে। তারই শব্দ শোনা যায়। এবং তারই পাশ দিয়ে ওরা এগিয়ে যায়। ওরা এসে একসময় সুচিৎ সিংহের গৃহদ্বারে পেঁছাল।

মংলুকে আগে থাকতেই বলে রেখেছিল কুর্চি রাত্রে সে তার কাছে আসবে।

কথাটা শুনে মংলু তো আনন্দে একেবারে দিশেহারা। সে যেন বিশ্বাসই করতে পারে না। কুর্চি আসবে তার ঘরে রাত্রে—তাছাড়া রাণার জরুরী ডাক পেয়ে সুচিৎ সিংহও প্রাসাদে গিয়েছে—এত বড় একটা সুযোগ যে আসবে সে কি স্বপ্নেও ভেবেছিল। এত করেও সে আজ পর্যন্ত কুর্চির মন পেল না। সে আজও ধরাছোঁয়ার বাইরে রয়ে গেল। সে কিনা ইচ্ছা করে আসবে আজ রাত্রে তারই ঘরে। যে তাকে ক্লীব—ভীরু—অপদার্থ ছাড়া কিছু ভাবে না। হাজার সাধ্যসাধনা করেও যার মন সে পেল না সে-ই কিনা তার ঘরে আসছে রাত্রে স্বেচ্ছায়।

জেগে অধীর অপেক্ষায় প্রহর গুনছিল মংলু আর মনে মনে ভাবছিল—কুর্চি তাকে স্রেফ ধাপ্পা দিয়ে যায় নি তো। তাকে নিয়ে খেলছে—চিরদিন যেমন সে খেলে আসছে। বোকা সে তাই কুর্চির কথায় বিশ্বাস করে রাত জেগে বসে আছে তার প্রতীক্ষায় এখনো।

বড় রকমের একটা দীর্ঘশ্বাস চেপে শুতে যাবে কিনা এবারে ভাবছিল মংলু ঐ সময় দরজার গায়ে মৃদু সংকেতধ্বনি শোনা গেল।

মহারাণার নির্দেশে যে দুজন প্রহরীকে বীরেন্দ্র ও পার্বতীর উপর প্রহরা দেবার জন্য সুচিৎ সিংহের গৃহে নিযুক্ত করা হয়েছিল তাদের দুটোকেই আজ সন্ধ্যায় প্রচুর সিদ্ধি ও ভাং খাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে দিয়েছে মংলু। নচেৎ কুর্চির আগমন তার প্রভু জেনে ফেলবে। দুটোই ঘোঁতঘোঁত করে নাক ডাকিয়ে ঘুমাচ্ছে। কানের সামনে এখন দামামা পিটলেও ওদের ঘুম ভাঙবে না।

আবার বন্ধ দরজার গায়ে মৃদু সংকেত-শব্দ শোনা গেল। এ নিশ্চয়ই কুর্চি

আর কেউ নয়। আর কেউ হতে পারে না।

এগিয়ে গিয়ে সদরের দরজা খুলে দিল মংলু।

কুর্চি এলি।

কিন্তু মংলুর মুখের কথা শেষ হলো না—সঙ্গে সঙ্গে একটা তীক্ষ্ণধার ছুরি ওর বুক স্পর্শ করে। টুঁ শব্দ করেছিস কি এ ছুরি তোর বুকে বসে যাবে।

ভারী চাপা গলায় রঞ্জাবতী কথাগুলো ফিস্ ফিস্ করে বলে ওঠে।

মংলু শব্দ করবে কি। সে তখন বোবা—পাথর।

রঞ্জাবতীর নির্দেশ আবার শোনা যায়ঃ ওর মুখটা আগে বেঁধে ফেল—তার পর হাত দুটো পিছন দিকে নিয়ে বেঁধে ফেল। কুর্চি রঞ্জার আদেশ পালন করতে এতটুকু দেরি করে না। নিষ্প্রাণ একটা পুতুলের মত যেন দাঁড়িয়ে থাকে মংলু। বাধা দেওয়ার ও কথা বলার সমস্ত শক্তিই যেন তার তখন লোপ পেয়েছে একেবারে।

হাত ও মুখ বাঁধা মংলুকে তখন রঞ্জাবতী ও কুর্চি ঠেলতে ঠেলতে তারই ঘরে নিয়ে গিয়ে ঢুকিয়ে দেয়।

এতক্ষণে ঘরের আলোয় মংলু কুর্চিকে চিনতে পারে। তার যেন বিস্ময়ের অবধি নেই তখন। মুখ ও হাত শক্ত করে বাঁধা কিন্তু চোখ দুটো খোলা—ফ্যাল-ফ্যাল করে বোবাদৃষ্টিতে চেয়ে থাকে মংলু তার প্রণয়িনীর দিকে। ছদ্মবেশিনী রানী রঞ্জাবতীকে সে চিনতেই পারে না—তাছাড়া জীবনে মংলু তো কখনো তাকে দেখেওনি ইতিপূর্বে।

চল—এবারে তাড়াতাড়ি—রঞ্জাবতী কুর্চির দিকে তাকিয়ে বলে।

কুর্চি রঞ্জাবতীর দিকে চেয়ে মৃদু হেসে বলে, আপনি যান আমি আসছি।

রঞ্জাবতী কক্ষ থেকে বের হয়ে গেল।

কুর্চি এবারে মুখ ও হাত বাঁধা অসহায় মংলুর বোবা দুটো ড্যাবড্যাবে চোখের দিকে তাকিয়ে বলে, বসে থাক্—ঠিক সময়ে আমি আসবো—বুঝলি! তারপর একটু হেসে কথাটা শেষ করে, কি রে, বোকার মত চেয়ে রইলি কেন? বুঝতে পারছিস না? আসবো রে আসবো—এখন চলি—কেমন।

কুর্চি এগিয়ে গিয়ে অতঃপর ফুঁ দিয়ে আলোটা কক্ষের নির্বাপিত করে কক্ষ থেকে বের হয়ে ঘরের দরজা বাইরে থেকে আটকে দিল।

রঞ্জাবতী বাইরেই দাঁড়িয়ে ছিল ছায়া-ছায়া অন্ধকারে।

ঐ যে ঐ দিককার ঘরে—কুর্চি বলে।

দুজনে এগিয়ে যায়—পার্বতী যে কক্ষে বন্দিনী ছিল সেই কক্ষের দিকে। কুর্চি তো আগেই জানত কোন্ কক্ষে পার্বতী আছে—মাড়বার রাজকন্যা।

কুর্চিই বন্ধ দরজার গায়ে ধাক্কা দিল। বার দুই ধাক্কা দিতেই সাড়া এলো ঘরের ভিতর থেকে, কে?

আমি কুর্চি—ভয় নেই দরজাটা খুলুন।

পার্বতী জেগেই ছিল। এখানে আসা অবধি তার চোখে ঘুম ছিল না—বিশেষ করে যে মুহূর্তে সে জানতে পেরেছিল রাণা সংঘের নজরবন্দিনী সে।

কুর্চির গলার সাড়া পেয়েও কিন্তু পার্বতী দরজা খোলে না। সাহস হয় না তার এত রাত্রে দরজা খুলতে এই শত্রুপুরীতে।

কুর্চি আবার দরজায় ধাক্কা দেয় ও বলে, দরজা খুলুন রাজকুমারী, ভয় নেই।

পার্বতী এবার দরজা খুলে দেয়—বীরেন্দ্র সিংহেরই চোখের ইশারায়। সেও ঐ ঘরের মধ্যে উপস্থিত ছিল এবং জাগ্রতই ছিল। দরজা খুলতেই প্রথমে কুর্চি ও তার পশ্চাতে ছদ্মবেশিনী রত্নাবতী ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে।

রাজকুমারী—আপনার সামনে রাণার প্রধানা মহিষী রত্নাবতী।

পার্বতী ও বীরেন্দ্র দুজনেই তখন তাকিয়ে আছে ওদের মুখের দিকে।

তোমারই নাম পার্বতী? রত্নাবতী প্রশ্ন করে।

পার্বতী মাথা হেলিয়ে জবাব দেয়।

আর তুমি বীরেন্দ্র সিংহ?

বীরেন্দ্র মৃদু কণ্ঠে জবাব দেয়, হ্যাঁ।

তোমরা বোধ হয় বুঝতে পেরেছ রাণার বন্দী তোমরা আজ? রত্নাবতী আবার বলে।

বীরেন্দ্র বা পার্বতী কোন জবাব দেয় না।

রাণা তোমাদের কেন বন্দী করেছে জান?

না—, বীরেন্দ্র বলে।

পার্বতী বলে, বোধ হয় মাড়বার রাজের নির্দেশেই।

না।

তবে?

তার নিজের স্বার্থে।

নিজের স্বার্থে? বীরেন্দ্র শুধায়।

মৃদু হেসে রত্নাবতী বলে, হ্যাঁ।

অতঃপর পার্বতীর দিকে তাকিয়ে রত্নাবতী বলে, কেন তুমিও কি কিছুই জান না?

কি?

তোমার সহোদর মহারাজ গাঙ্গ রাণার সঙ্গে তোমার বিবাহের প্রস্তাব দিয়ে পাঠিয়েছিলেন দূত মারফৎ? এবং সে প্রস্তাবে রাণা সম্মত হয়েছে—বিবাহের দিন স্থির শীঘ্রই হবে।

রত্নাবতীর কথাগুলো পার্বতীকে কেবল চমকিতই নয় যেন অভিভূতও করে ফেলে। কয়েকটা মুহূর্ত যেন তার বাক্যস্ফূর্তিও হয় না। মনে হয় সহসা তবে কি তার জ্যেষ্ঠর মনে মনে সেই বাসনা ছিল বা পোষণ করছিল বলেই বীরেন্দ্রর প্রতি সে সহসা অমন বিরূপ হয়ে উঠেছিল?

হয়ত তাই।

ভগ্নীকে চিতোরাধিপতির হাতে তুলে দিয়ে তার জ্যেষ্ঠ হয়ত মেওয়ার ও মাড়বারের মধ্যে এক সখ্যতা গড়ে তুলে নিজেকে শক্তিশালী করে তুলতে চেয়েছিল।

রাজনীতি ও স্বার্থসিদ্ধির এক কূট চাল। হ্যাঁ, রাজনীতি বৈকি। নিষ্ঠুর রাজনীতি—যেখানে মাতা-পিতা-ভ্রাতা-ভগিনী—স্নেহ ভালবাসা মমতা কিছুই নেই। বিবেক সেখানে অর্থহীন। উচিত অনুচিত সেখানে একটা কথার কথা মাত্র।

কি ভাবছো পার্বতী?

রত্নাবতীর প্রশ্নে যেন চমকে ওঠে পার্বতী। সে রাণী রত্নাবতীর মুখের দিকে তাকায়।

মনে হচ্ছে কথাটা বোধ হয় সত্যিই তুমি জানতে না, তাই নয় কি?

পার্বতী তথাপি নিরুত্তর।

বীরেন্দ্র সিংহ।

রত্নাবতী এবার বীরেন্দ্রর দিকে তাকাল।

তুমিও বোধ হয় জানতে না কথাটা?

জানতাম। বীরেন্দ্র মৃদু কণ্ঠে জবাব দেয়।

জানতে?

হ্যাঁ—

রত্নাবতী এবারে একটু থেমে বলে, যাক—তোমরা বোধ হয় বুঝতে পারছো রাণার মুঠির মধ্যে একবার যখন তোমরা এসে ঘটনাচক্রে পড়েছো এখান থেকে মুক্তি তোমরা সহজে পাবে না। বিশেষ করে আমার স্বামীর চোখ যখন একবার পার্বতীর উপরে পড়েছে—

বুঝতে পারছি রাণীমা। বীরেন্দ্র মৃদু কণ্ঠে জবাব দেয়।

এখন কি করবে?

জানি না রাণীমা।

আমার পরামর্শ নেবে?

বীরেন্দ্র সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকাল রত্নাবতীর মুখের দিকে।

জানি না কতদূর কৃতকার্য আমি হতে পারব তবু যদি তোমরা সম্মত থাক তো আমি একবার চেষ্টা করে দেখতে পারি।

বলুন?

পার্বতীকে আপাততঃ আমি আমার আশ্রয়ে নিয়ে যেতে চাই।

আপনার আশ্রয়ে?

হ্যাঁ।

কিন্তু—

জানি বীরেন্দ্র তুমি কি ভাবছো, কিন্তু এখানে এভাবে থাকার অর্থটাও নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো—

বীরেন্দ্র পার্বতীর মুখের দিকে তাকাল।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গিয়েছে। রাত্রির অন্ধকার ক্রমশঃ গাঢ় হয়ে উঠছে। চারিদিকে গৃহগুলো অন্ধকারে যেন স্তূপীকৃত ছায়ার মত মনে হয়। সেই স্তূপীকৃত ছায়ার মধ্যে এখানে-ওখানে আলোর শিখাগুলো অন্ধকারের প্রাণবিন্দুর মত প্রতীয়মান হয়।

গড়ে প্রবেশ করেই রত্না অশ্বপৃষ্ঠ হতে অবতরণ করে অশ্বটিকে একটি বৃক্ষ-মূলে দাঁড় করিয়ে রেখে পদব্রজে চলেছিল। ঘুরতে ঘুরতে একটা চত্বরের মত জায়গায় এসে উপস্থিত হয় রত্না। চত্বরের আশপাশে কয়েকটি বিপণি—বেচাকেনা চলেছে। অনেক পুরুষ ও রমণীর ভিড়।

ক্ষুধার্ত—তৃষ্ণার্ত রত্না এদিক-ওদিক তাকায়। সঙ্গে সামান্য যে অর্থ অবশিষ্ট আছে তার দ্বারা ক্ষুন্নিবৃত্তি হতে পারে কিন্তু রত্নার ঠিক সাহস হয় না কোন কিছু ক্রয় করে ক্ষুন্নিবৃত্তি করবার। প্রথমতঃ সে পুরুষের ছদ্মবেশে থাকলেও স্ত্রীলোক—দ্বিতীয়তঃ বিদেশী। এ সময় কোথাও কিছু ক্রয় করতে গেলে বিক্রেতার সন্দেহ জাগতে পারে।

গড়ের প্রহরীরা এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়াচ্ছে। বিশেষ করে এ সময়টা তারা একটু বেশী সতর্ক থাকে। কোনক্রমে তাদের সন্দেহ হলে এবং তাদের হাতে পড়লে সঙ্গে সঙ্গে হয়ত তারা তাকে কারাগারে নিক্ষেপ করবে। তা'তে করে তার এখানে এই কষ্টস্বীকার করে আসার সমস্ত উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়ে যাবে। না। তা সে হতে দিতে পারে না।

রত্না এগিয়ে চলে—এবং হাঁটতে হাঁটতেই একসময় সে গোবিন্দজীর মন্দিরের সামনে এসে উপস্থিত হয়। প্রশস্ত মন্দির-চত্বর। সন্ধ্যারতি অনেকক্ষণ শেষ হয়ে গিয়েছে। মন্দিরের দরজায় অর্গল পড়ে গিয়েছে। চত্বরের একপাশে সহসা তার দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। একটি বৃক্ষের নীচে ধুনি জ্বলছে।

প্রজ্বলিত সেই অগ্নিকুণ্ডের আলোয় আবছা-আবছা নজরে পড়ে কয়েকটি মনুষ্যমূর্তি—চারিদিকে গোল হয়ে বসে আছে। পায়ে পায়ে সেই দিকে এগিয়ে যায় রত্না। কাছে যেতে তার নজরে পড়ে পাঁচ-সাতজন লোক এক জটাজুটধারী ব্যক্তিকে ঘিরে বসে আছে।

লোকগুলো সবাই নিম্নশ্রেণীর কৃষক বলেই রত্নার মনে হয়। রত্না কয়েকটা মুহূর্ত যেন কি ভাবে, তারপর কিছুটা ব্যবধান রেখে ওদের একপাশে বসে পড়ে।

ক্লান্ত ক্ষুধার্ত সত্যিই আর সে যেন চলতে পারছিল না। মাথাটার মধ্যে ঝিমঝিম্ করছিল।

পৌষ মাস প্রায় শেষ হয়ে এলো। তাহলেও প্রচণ্ড শীত। লোকগুলো অগ্নিকুণ্ডকে কেন্দ্র করে যেন একটা উত্তপ্ত মণ্ডলী রচনা করেছে।

রত্না তার কোমরবন্ধের কালো রেশমী কাপড়টা খুলে আগেই মাথা ও মুখ ঢেকে নিয়েছিল। চট্ করে যাতে তার মুখটা কারো নজরে না পড়ে এবং পড়লেও ঠিক না বুঝে উঠতে পারে যে সে একজন নারী—এবং বিদেশী হলেও তাকে যাতে সহসা কেউ না সন্দেহ করে।

অগ্নিকুণ্ডের চারদিকে যারা বসেছিল তারা কেউই রত্নার দিকে তাকাল না। তাদের সকলেরই দৃষ্টি জটাজুটধারী ব্যক্তির প্রতি নিবদ্ধ।

রত্নাও তারই দিকে তাকিয়ে দেখছিল। জটাজুটধারী সন্ন্যাসীর বয়স ঠিক কত হবে অনুমান করা শক্ত। ঊর্ধ্বাঙ্গ সম্পূর্ণ নগ্ন। নিম্নাঙ্গে সামান্য কটিবাস। সর্বাঙ্গে যদিও একটা ভস্মের প্রলেপ রয়েছে, তা সত্ত্বেও লোকটির গাত্রবর্ণ যে কোন একসময় রীতিমত উজ্জ্বল ছিল বুঝতে কষ্ট হয় না।

চক্ষু দুটি মুদ্রিত। ধ্যানস্থ হয়ে আছে। প্রশস্ত ললাট। লম্বাটে ধরনের মুখ—খড়্গের মত উদ্ধত নাসা। পেশীবহুল বলিষ্ঠ গঠন।

মন্দিরের বৃদ্ধ পুরোহিত একটা পাতায় কিছু ফলমূল এনে ধ্যানস্থ জটাজুটধারী সন্ন্যাসীর সামনে রেখে দিয়ে বললে, স্বামীজী—গোবিন্দজীর কিছু প্রসাদ এনেছিলাম—

ধ্যানস্থ সন্ন্যাসীর কোন সাড়া পাওয়া গেল না। পুরোহিত চলে গেল।

সবাই পূর্বের মত চুপচাপ বসে সন্ন্যাসীকে ঘিরে।

থেকে থেকে কনকনে বাতাস বয়ে যাচ্ছে। হাড় পর্যন্ত যেন কাঁপিয়ে তোলে। নিকটবর্তী অগ্নিকুণ্ডের তাপে রত্না যেন কিছুটা সুস্থ বোধ করে।

সহসা ঐ সময় মন্দিরের পাষাণ-চত্বরে কার যেন পাদুকার মৃদু শব্দ পাওয়া গেল। পাদুকার শব্দ ঐদিকেই এগিয়ে আসছে মনে হয়।

পাদুকার শব্দ অগ্নিকুণ্ডের কাছাকাছি এসে থামতেই সকলেই ফিরে তাকাল—যারা সেখানে বসেছিল—রত্নাও ফিরে তাকাল। আগন্তুকের দিকে তাকালেই বুঝতে কষ্ট হয় না, তিনি একজন উচ্চপদস্থ রাজপুরুষ। দীর্ঘকায়। অঙ্গে মূল্যবান পরিচ্ছদ, মাথায় উষ্ণীষ। কটিদেশে তরবারি।

উপবিষ্ট সকলের মধ্যেই যেন একটা চঞ্চলতা প্রকাশ পায় আগন্তুকের আবির্ভাবে। তাড়াতাড়ি একটু যেন ব্যস্ত হয়েই উপবিষ্ট সকলে এদিক-ওদিক সরে গিয়ে আগন্তুকের জন্য স্থান করে দেয়। আগন্তুক যে কোন বিশেষ প্রয়োজনেই ঐ সময় ঐ স্থানে এসেছেন রত্নার বুঝতে কষ্ট হয় না।

আগন্তুক রাজপুরুষ একধারে উপবেশন করলেন।

ধ্যানস্থ সন্ন্যাসী বারেকের জন্য ঐ সময় চক্ষু উন্মীলন করলেন—এবং আগন্তুকের দিকে দৃষ্টিপাত করলেন।

রতন সিং। সন্ন্যাসী মৃদু কণ্ঠে বললেন এতক্ষণে।

প্রভু?

কেন তুমি এসেছো?

প্রভু আপনি তো অন্তর্যামী—আপনার অবিদিত তো কিছুই নেই। রতন সিং মৃদু কণ্ঠে বলে।

জটাজুটধারী ব্যক্তির ওষ্ঠপ্রান্তে মৃদু হাস্যরেখা দেখা দিল। শান্ত স্নিগ্ধ মধুর সে হাসি।

মানুষ কি অন্তর্যামী হতে পারে রতন সিং। অন্তর্যামী একমাত্র সেই ঈশ্বর।

রতন সিংহ তাঁর কথার কোন জবাব না দিয়ে উপবিষ্ট সকলের দিকে একবার তাকাল। সঙ্গে সঙ্গে সকলে উঠে দাঁড়ায়।

রত্না বুঝতে পারে তাদের ঐ রাজপুরুষ স্থানত্যাগেরই নির্দেশ দিয়েছে।

রত্না কি করবে বুঝতে পারে না—সে বসেই থাকে। এবং তাকে বসে থাকতে দেখেই বোধ হয় রতন সিং তার দিকে এবারে তাকায় একটু যেন বিরক্তভরা দৃষ্টিতেই। কিছু বলতেও বুঝি উদ্যত হয়।

কিন্তু তার কিছু বলার আগেই জটাজুটধারী সন্ন্যাসী বলে ওঠেন, ও থাক্ রতন সিং—ওর দ্বারা তোমার কোন ক্ষতি হবে না।

রত্না কথাটা শুনে সন্ন্যাসীর দিকে তাকায়, কিছুটা যেন বিস্ময়েই।

পুনরায় রত্নার মুখের দিকে তাকিয়েই স্মিত কণ্ঠে সন্ন্যাসী বলেন, তোমার মুখের দিকে তাকিয়ে মনে হচ্ছে তুমি ক্ষুধার্ত—তৃষ্ণার্ত, এক কাজ কর, ঐ ফল-মূলগুলো খেয়ে ক্ষুন্নিবৃত্তি নিবারণ কর।

এ লোকটা কে প্রভু? চন্দন সিং সন্ন্যাসীকে প্রশ্ন করলে।

জটাজুটধারী সন্ন্যাসী আবার মৃদু হাসলেন।

রতন সিং এবার রত্নার মুখের দিকে তাকিয়েই প্রশ্ন করলে, কে তুমি? কি নাম তোমার? তোমাকে চিতোরগড়ে পূর্বে কখনো দেখেছি বলেতো মনে হচ্ছে না—

রত্না অত্যন্ত বিব্রত বোধ করে। কি বলবে বুঝে উঠতে পারে না।

ওর পরিচয় তোমাকে আমিই দেবো রতন সিং—ব্যস্ত হয়ো না। সন্ন্যাসী আবার বললেন।

রত্না যেন দ্বিগুণতর বিস্ময়ে সন্ন্যাসীর কথায় তাঁর মুখের দিকে তাকায় এবারে—সন্ন্যাসী কি সত্যিই তার পরিচয় জানেন নাকি।

রত্নার চিন্তাজাল ছিন্ন হয়ে যায় পরক্ষণেই আবার সন্ন্যাসীর কথা শুনে।

সন্ন্যাসী তখন চন্দন সিংকে লক্ষ্য করে বলছেন, যে যবনবাহিনী দুর্গম পার্বত্য পথ অতিক্রম করে ধীরে ধীরে ভারতবর্ষের দিকে এগিয়ে আসছে তাকে প্রতিরোধ করতে তোমরা পারবে না।

প্রভু!

সন্ন্যাসী বলতে লাগলেন, পাঠানের আধিপত্য শেষ হয়েছে—এবার মুঘলের আধিপত্য শুরু হবে।

এর কি কোন প্রতিকারই নেই প্রভু?

আপাতত দেখতে পাচ্ছি না। ধীরে ধীরে ঐ মুঘলেরা সমস্ত ভারতবর্ষ গ্রাস করবে বলেই মনে হচ্ছে।

তবে কি আপনি বলতে চান প্রভু—বিস্তীর্ণ এই ভূখণ্ড—মেবার মাড়ওয়ার কশল্মীর বিকানীর—এসবের কোন অস্তিত্বই থাকবে না?

থাকবে তবে ঐ মুঘলেরই পদানত হয়ে।

রতন সিং মাথা নীচু করে বসে থাকে। তার মুখ থেকে আর কোন শব্দ বের হয় না। বোঝা যায় সে অনেক আশা নিয়ে এসেছিল সন্ন্যাসীর কাছে কিন্তু

সন্ন্যাসীর কথা শুনে সে রীতিমত হতাশ হয়েছে।

সন্ন্যাসী বোধ করি রতন সিংয়ের মনের অবস্থা বুঝতে পেরেই তাকে সান্ত্বনা দেন। বলেন, দুঃখ করো না রতন সিং—এ দেশ এমনিই এক বিচিত্র দেশ—এর ভৌগোলিক সীমানা—এখানকার মানুষ—তাদের আচার নীতি ও কৃষ্টি মিলিয়ে যে কোন বিদেশী শক্তিই চিরদিনের মত এখানে এসে আধিপত্য বিস্তার করে থাকতে পারবে না। একদিন না একদিন আবার তাদের রাজ্যপাট ফেলে পালাতেই হবে—সামনে অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে ঠিকই কিন্তু সে অন্ধকার চিরস্থায়ী নয়—আবার একদিন অন্ধকার কেটে যাবে—অন্ধকারে সূর্যোদয় হবে।

রতন সিং কোন জবাবই দেয় না। পূর্ববৎ নীরব থাকে।

রম্ভাও একপাশে চুপটি করে বসেছিল। সেও শুনছিল সন্ন্যাসীর কথা।

এবারে সন্ন্যাসী রম্ভার দিকে তাকিয়ে বললেন, কিন্তু তুমি তো কিছুই খেলে না মা—কিছু মুখে দাও।

সন্ন্যাসীর কথায় রতন সিং যেন চমকে রম্ভার দিকে তাকাল।

পুরুষের বেশধারী ঐ ব্যক্তি তাহলে পুরুষ নয়, আসলে এক নারী।

রতন সিং? সন্ন্যাসী রতন সিংয়ের দিকে তাকিয়ে ডাকলেন।

প্রভু!

প্রত্যূষেই আমি এখান থেকে যাত্রা করব।

আবার কবে দেখা হবে প্রভু?

শীঘ্র কোন সম্ভাবনা নেই। রতন সিংয়ের প্রশ্নের জবাব দিয়ে পুনরায় সন্ন্যাসী রম্ভার মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করলেন, কি নাম তোমার মা?

রম্ভাবাঈ। মৃদুকণ্ঠে জবাব দেয় রম্ভা।

মনে হচ্ছে তুমি মেওয়ারবাসিনী নও।

না প্রভু,—আমি মাড়ওয়ার থেকে আসছি।

কোন সংবাদ সংগ্রহের আশায় নিশ্চয়ই?

রতন সিং আবার রম্ভার মুখের দিকে তাকালেন।

রম্ভা নীরব।

কি সংবাদ বল তো।

একজনকে খুঁজতে এসেছি প্রভু!

মৃদু কণ্ঠে জবাব দেয় রম্ভা।

কে সে?

রম্ভা একটু ইতস্ততঃ করে—বলবে কি বলবে না—ঠিক যেন বুঝে উঠতে পারে না।

সন্ন্যাসী বোধ হয় রম্ভার দ্বিধাটুকু বুঝতে পারেন। মৃদু হেসে বলেন, সংকোচ করো না মা, বল। রতন সিং ক্ষমতাসম্পন্ন একজন রাজপুরুষ—প্রয়োজন হলে উনি তোমার সাহায্য করবেন।

রম্ভা একবার রতন সিংয়ের মুখের দিকে তাকাল, তারপর সন্ন্যাসীর দিকে

তাকিয়ে মৃদু কণ্ঠে বললে, মাড়বারের রাজকুমারী—

মাড়বার রাজদুহিতা। কথাটা রতন সিংয়ের মুখ থেকেই নির্গত হয়।

মাড়বার রাজদুহিতার খোঁজে তুমি এখানে এসেছো মা—তোমার কথাটা তো ঠিক হৃদয়ঙ্গম করতে পারছি না।

রত্না তখন সংক্ষেপে পার্বতী ও বীরেন্দ্রকাহিনী বিবৃত করে।

সমস্ত শুনে সন্ন্যাসী মৃদু হাসলেন। তারপর মৃদু স্মিতকণ্ঠে বললেন, পার্বতীকে তুমি ফিরিয়ে নিয়ে যেতে এসেছো তা হলে?

হ্যাঁ, প্রভু।

কিন্তু তুমি কি মনে করো সে আর ফিরে যাবে?

না, যাবে না তা আমি জানি। আর তিনি ফিরে যান তাও আমি চাই না—

তবে? সন্ন্যাসী মৃদু হাস্যে প্রশ্নটা করে তাকালেন রত্নার মুখের দিকে। তবে তুমি এত শ্রম স্বীকার করে এত দূরপথে এসেছো কেন মা?

তাকে সাবধান করে দিতে।

সাবধান করে দিতে!

হ্যাঁ। মহারাণা যদি কোনক্রমে জানতে পারেন যে মাড়বার-দুহিতার সঙ্গে তার বিবাহের কথা পাকা হয়ে গিয়েছে আদৌ তিনি মাড়বারে নেই এবং বিবাহের কথাবার্তা যখন চলেছে তার আগেই তিনি তার প্রণয়ীর গলায় মাল্যদান করেছেন এবং বর্তমানে তিনি তারই গড়ে এসে আশ্রয় নিয়েছেন, তাহলে হয়ত মহারাণার রোষ থেকে তারা বাঁচতে পারবে না।

বুঝতে পারছি মা, তুমি অসাধারণ বুদ্ধিমতী। সন্ন্যাসী বললেন।

প্রভু আমি সামান্যা নর্তকী মাত্র।

না মা—বৃত্তিতে তুমি নর্তকী হতে পারো কিন্তু সামান্য তুমি নও। তাছাড়া তোমার কথাবার্তা শুনে আমি যে এও বুঝতে পারছি মা, প্রেমের—অনুরাগের অগ্নিতে তুমিও দগ্ধ হচ্ছো নিশিদিন!

না প্রভু, না—

সংসার-ত্যাগী সন্ন্যাসী আমি বটে মা, কিন্তু তাই বলে তো মানুষের সহজ অনুভূতির বাইরে নই আমি মা। তোমার প্রত্যেকটি কথা—তোমার কণ্ঠস্বরই যে সে-কথা স্পষ্ট করে প্রকাশ করে দিয়েছে!

রত্না মাথা নীচু করে।

লজ্জার কিছু তো নেই মা ওতে। অমন করে ভাল না বাসতে পারলে কি এত বড় ভালবাসার মর্যাদা তুমি বুঝতে? কিন্তু যাক সে কথা—বিদেশিনী তুমি, কেমন করে তুমি তাদের সন্ধান পাবে? বিশেষ করে যারা আত্মগোপন করতে চায়?

সন্ধান তাদের যেমন করেই হোক করতে হবে আমায়।

রতন সিং? সন্ন্যাসী এবারে রতন সিংয়ের দিকে তাকালেন।

প্রভু!

ওকে তুমি সাহায্য করতে পারবে ?

কিন্তু প্রভু, আপনি তো সব কিছু শুনলেন। মহারাণার কর্মচারী আমি—, দ্বিধাগ্রস্ত কণ্ঠে প্রত্যুত্তর দেন চন্দন সিং।

সক্রিয়ভাবে কোনরকম সাহায্য করবার জন্য ওকে আমি তোমায় অনুরোধ করছি না চন্দন সিং। কেবল ওর জীবন যাতে করে না বিপন্ন হয় সেটুকু তুমি দেখো।

তা হয়ত আমি পারব, চন্দন সিং জবাব দেন।

সেইটুকু দেখো। তার বেশী ওর বোধ হয় কিছু প্রয়োজনও হবে না।

অতঃপর সন্ন্যাসী রত্নার দিকে ফিরে তাকিয়ে বললেন, যাও মা—চন্দন সিংয়ের সঙ্গে তুমি যাও। রাত্রির দ্বিতীয় প্রহর উত্তীর্ণপ্রায়, আমারও যাত্রার সময় হলো।

কিন্তু প্রভু, দ্বারের প্রধান প্রহরী বোধ হয় এসময় আপনাকে দুর্গের বাইরে যেতে দেবে না। চন্দন সিং বলেন।

আমার জন্য তুমি চিন্তা করো না—ওকে নিয়ে তুমি যাও।

রতন সিং আর কোন প্রতিবাদ জানালেন না। নিঃশব্দে সন্ন্যাসীকে প্রণাম করে উঠে দাঁড়ালেন।

রত্নার দিকে তাকিয়ে বলেন, চল বহিন।

যাও মা।

রত্নাও সন্ন্যাসীকে প্রণাম করে উঠে দাঁড়াল।

দুজনে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল। ক্রমশঃ তাদের পদশব্দ মন্দির-চত্বরে মিলিয়ে গেল।

মন্দির-চত্বরের বাইরে এসে দুজনে পাশাপাশি হেঁটে চলে—রতন সিংয়ের শিক্ষিত অশ্ব ওদের পিছনে পিছনে চলে।

ওদিকে সুচিৎ সিংহের গৃহমধ্যে—শেষ পর্যন্ত বীরেন্দ্র রাণী রত্নাবতীর প্রস্তাবে সম্মত হওয়ায়, পার্বতী রত্নাবতীর সঙ্গে যাবার জন্য প্রস্তুত হয়েছে।

রত্নাবতী পরামর্শ দিয়েছে, আপাততঃ কিছুদিন পার্বতীকে সে তার নিজের মহলে গোপন করে রাখবে। এবং পরে সময়মত ওদের মুক্তির ব্যবস্থা করবে।

রত্নাবতী ও পার্বতীকে বিদায় দিয়ে কুর্চি এসে, মংলুকে যে ঘরে হাত-পা-মুখ বেঁধে বন্দী করে রেখেছিল, সেই ঘরে এসে প্রবেশ করল।

কুর্চিকে ঘরে প্রবেশ করতে দেখে মংলু কুর্চির মুখের দিকে তাকাল।

কুর্চি ওর মুখের দিকে চেয়ে মিটিমিটি হাসে। তারপর এগিয়ে এসে ওর বাঁধন খুলে দেয়। মংলুকে মুক্তি দেয়।

সঙ্গে সঙ্গে মংলু গর্জন করে ওঠে, শয়তানী।

চুপ। দস্যুর দল এখনো বেশী দূর যায় নি—আস্তে কথা বল।

সঙ্গে সঙ্গে মংলুর গলার স্বর যেন চুপসে যায়, দ-স্যু।

হ্যাঁ গো—অনেক কষ্টে তাদের ভুলিয়ে বের করে দিয়েছি। তারা যদি জানতে

পারে কোনক্রমে যে তুমি আমার নাগর—পীরিতের মানুষ, তাহলে ভাববে তারা, তাদের সঙ্গে এতক্ষণ আমি অভিনয় করেছি—

কোথায় তারা ?

চলে গেছে।

স্-সত্যি বলছিস—

হ্যাঁ—

॥ ৩৮ ॥

কিন্তু পরক্ষণেই মংলুর যেন আবার কি মনে হয়—কারণ মংলুর বুদ্ধিটা যতই মোটা হোক তবু সে ঐ মুহূর্তে কুর্চির কথা যে বিশ্বাস করে নি আদৌ কুর্চি বুঝতে পারে যখন মংলু বলে, তুই আমাকে এতই বোকা ঠাউরেছিস, তাই না কুর্চি ?

তুই আমার কথা বিশ্বাস করছিস না ?

না—একটুও না।

বেশ, করিস না। আর করবিই বা কেন বিশ্বাস আমার কথা তুই ? আমি তোর কে ? কুর্চির গলার স্বরে অভিমান পরিস্ফুট হয়ে ওঠে।

কুর্চির গলায় অভিমানের সুর কিন্তু মংলুকে বিচলিত করে তোলে। সংগে সংগে সে বলে, তাই বলে তুই আমাকে অমন করে বেঁধে রাখবি ?

বেঁধেছি কি সাধে। ওদের বুঝতে দিয়েছি আমি তাদেরই দলে, তাই না শেষ পর্যন্ত তারা তোকে হত্যা না করে চলে গিয়েছে। যাক গে তুই যখন আমাকে বিশ্বাসই করছিস না এখানে থেকে আর আমার কি হবে—আমি চললাম। আর কখনো আসবে না।

কথাগুলো বলে কুর্চি যাবার জন্য দরজার দিকে এগিয়ে যায়।

এই কুর্চি।

কুর্চি সাড়া দেয় না। এগিয়ে যায়।

এই—, মংলু এগিয়ে এসে কুর্চির পথরোধ করে দাঁড়ায়, আমি কি তাই বলেছি নাকি যে তোকে আমি বিশ্বাস করি না।

করিসই না তো আর তাই তো একটু আগে বললি—সর—আমার পথ ছাড় —যেতে দে আমাকে।

রাগ করিস না কুর্চি। তুই চলে গেলে আর আমি বাঁচবো না।

মিথ্যে কথা। তুই আমাকে একটুও ভালবাসিস না।

বিশ্বাস কর তোর জন্য আমি প্রাণ দিতে পারি।

থাক, থাক—ও কেবল তোর মুখেরই কথা। মুখেই কেবল তোর ভালবাসা। আসলে তুই একটুও আমায় ভালবাসিস না। সর—পথ ছাড় আমার। যেতে দে আমাকে—

আমার ঘাট হয়েছে—এই নাক-কানমলা খাচ্ছি—মংলু তার নাক-কান মলে।

না—সর পথ ছাড়—

দোহাই তোর, চলে যাস নি। তুই চলে গেলে সত্যিই আমি মরে যাবো—

ঠিক বলছিস তো ?

হ্যাঁ—সত্যি—সত্যি—সত্যি।

তবে পথ ছাড়, এখন আমি যাই।

তবু চলে যাবি ?

হাঁদারাম, রাত শেষ হয়ে আসছে না ? সুচিৎ সিংহ হঠাৎ যদি এসে পড়ে তোর ঘরে আমাকে দেখে, সর্বনাশ হয়ে যাবে।

কেন ? সর্বনাশ হবে কেন ? তাছাড়া সে এখন আসবেই না—রাণার প্রাসাদে গেছে।

কেন ? রাণার প্রাসাদে এত রাত্রে গেছে কেন ?

শুনিস নি কিছু ?

না তো।

শীগ্‌গিরী যে ভয়ানক একটা যুদ্ধ বাধবে।

যুদ্ধ।

হ্যাঁ।

কার সঙ্গে যুদ্ধ ?

যবনদের সঙ্গে শুনেছি।

যাঃ।

হ্যাঁ রে—ভয়ানক যুদ্ধ হবে।

তুইও তাহলে নিশ্চয়ই যুদ্ধে যাবি মংলু ?

তা তো যেতেই হবে।

না, না—তুই যুদ্ধে যাস না।

তা কি হয় ! আমাদের সবাইকেই যুদ্ধ করতে হবে।

যুদ্ধে যদি তুই মরে যাস ?

তা আর কি করা যাবে।

বাইরে ঐ সময় অশ্বক্ষুরধ্বনি শোনা গেল।

মংলু। ঐ শোন্—কোন অশ্বারোহী বোধ হয় এইদিকেই আসছে—তোর প্রভু সুচিৎ সিংহ বোধ হয়—

তাই তো—, চল্ তাড়াতাড়ি তোকে পিছনের দ্বারপথে বের করে দিই—আয়।

মংলু আগে আগে ও পশ্চাতে কুর্চি ঘর থেকে বের হয়ে যায়। এবং পিছনের দ্বারপথে মংলু কুর্চিকে বের করে দেয় গৃহ হতে।

কুর্চি দ্রুত এগিয়ে যায়।

মংলুও তাকে অনুসরণ করে।

ও কি, তুই আবার আমার সঙ্গে সঙ্গে কোথায় আসছিস ?

তোকে একা ছেড়ে দেবো কি করে ? মংলু বলে।

না, না—আমি একাই যেতে পারব।

না, তুই যদি ভয় পাস ?

না রে, ভয় পাবো না। গজা সিংয়ের ভাঙ্গা বাড়িটার পাশ দিয়ে চলে যাবো। ঐ যে সেই বাড়িটি। ওর পাশ দিয়ে প্রাসাদে যাবার একটা সোজা রাস্তা আছে।

দাঁড়া—যাস নি ও পথে!

সহসা মংলু কুচির্র একটা হাত চেপে ধরে।

কি হলো ? হাত ছাড়।

না—জানিস না তুই—

কি ?

ঐ বাড়িতে গজা সিংয়ের প্রেত থাকে—রোজ রাত্রে বাড়ির চারপাশে সে ঘুরে বেড়ায়।

কুচির্ তখন মনে মনে রত্নাবতীর কাছে যাবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেছে।

রত্নাবতী হয়তো এখনো তার জন্য সেই বৃক্ষতলে অপেক্ষা করছে। মংলুটাকে সঙ্গে করে কোনমতেই কুচির্ রত্নাবতীর সামনে যেতে পারে না।

ব্যাপারটা সে কাউকে জানতে দিতে চায় না। কিন্তু মংলুর হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়াও কষ্ট।

মংলু!

কি ?

ওটা কি রে ?

কি ? কোথায় কি ?

ঐ যে দেখতে পাচ্ছিস না ?

অন্ধকারে আঙ্গুল তুলে দেখায় কুচির্।

মংলু ভীত ত্রস্ত বড় বড় চোখ মেলে কুচির্র অঙ্গুলি-নির্দিষ্ট দিকে তাকায়, কই ? কি ?

ঐ যে—কালো মত বিরাট—বড় বড় দুটো হাত—

কু—কু—কু—, তোতলাতে শুরু করে ভয়ে মংলু। সর্বশরীরে তখন তার কাঁপুনি ধরেছে।

ওটা যে এদিকেই এগিয়ে আসছে রে!

আর বলতে হলো না কুচির্কে—মংলুর সমস্ত সাহস তখন নিঃশেষে উবে গিয়েছে—সে আর এক মুহূর্ত দেরি করে না। কুচির্কে ফেলে ঊর্ধ্বশ্বাসে গৃহের দিকে ছুটতে শুরু করে এবং দেখতে দেখতে অন্ধকারে মিলিয়ে যায়।

কুচির্ প্রাণভরে হাসে কিছুক্ষণ। ইচ্ছা করেই সে মংলুকে নিয়ে ঐ পথে এসেছিল কারণ মংলুর ভূতের ভয়ের কথাটা তার অবিদিত ছিল না। যাক্! মংলুর হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া গিয়েছে।

কুচির্ এবারে ঘুরে অন্যপথে অগ্রসর হয় এবং দ্রুত চলতে থাকে। নির্দিষ্ট জায়গাটার কাছাকাছি এসে হঠাৎ দূরে দৃষ্টি পড়ায় কুচির্ দাঁড়িয়ে যায়। বৃক্ষতলে

আবছা আলো-আঁধারে ওরা কারা ? চারটি প্রাণী। রঞ্জাবতী ও পার্বতীর থাকার কথা। তবে চারজন ওখানে কে এবং কারা ?

কর্চি আর অগ্রসর হওয়া হয় না। দূর থেকেই ও লক্ষ্য করতে থাকে।

সুচিৎ সিংহের গৃহ হতে নিষ্ক্রান্ত হয়ে রঞ্জাবতী ও পার্বতী মধ্যরাত্রির স্তব্ধ নির্জন পথ ধরে পাশাপাশি দুজনে হেঁটে চলে যেখানে অশ্বটিকে বেঁধে রেখে এসেছিল সেই বৃক্ষতলের দিকে। কিন্তু কিছুদূর অগ্রসর হবার পরই সহসা রঞ্জাবতীর গতি রুদ্ধ হয়।

আবছা আবছা আলোয় রঞ্জাবতীর চোখে পড়ে বৃক্ষতলে দুটি মনুষ্যমূর্তি দাঁড়িয়ে আছে। কারা ওরা ওখানে ? তবে কি তার এই রাত্রে সুচিৎ সিংহের গৃহে আগমনের ব্যাপারটা কেউ জানতে পেরেছে ? মহারাণা কি জানতে পেরে গিয়েছেন ইতিমধ্যে প্রাসাদে তাঁর অনুপস্থিতির ব্যাপারটা ?

সর্বনাশ। তাই যদি হয়ে থাকে তো সে পার্বতীকে মহারাণার হাত থেকে রক্ষা করতে পারবে না।

হঠাৎ রঞ্জাবতী চলতে চলতে ঐভাবে দাঁড়িয়ে পড়ায় পার্বতী মৃদু কণ্ঠ শুধায়, কি হলো, এখানে দাঁড়ালেন যে ?

চুপ। আস্তে—কথা বলো না। চাপাকণ্ঠে রঞ্জাবতী পার্বতীকে সতর্ক করে দেয়।

পার্বতীও সভয়ে এদিক ওদিক তাকায়।

ঐ দূরের গাছতলায় দুজন মানুষ দেখতে পাচ্ছো ? চাপা কণ্ঠে রঞ্জাবতী বলে।

কোথায় ?

ঐ যে—ভালো করে চেয়ে দেখো।

এতক্ষণে পার্বতীরও নজরে পড়ে। সত্যিই দুটো মূর্তি।

রঞ্জাবতী বৃক্ষতলে আলোছায়ায় যে দুটি মনুষ্যমূর্তি দেখতে পেয়েছিল তারা আর কেউ নয় চন্দন সিং আর রম্ভা। রম্ভাকে সঙ্গে নিয়ে নিজ গৃহের দিকে চলতে চলতে হঠাৎ বৃক্ষতলে স্বল্প আলোছায়ায় অশ্বের হ্রেষাধ্বনি শুনে রতন সিং দাঁড়িয়ে গিয়েছিলেন।

তারপর সন্দিগ্ধ হয়ে তিনি আরো একটু এগিয়ে যান।

বৃক্ষতলে পৌঁছে দেখেন বৃক্ষমূলে একটি অশ্ব বাঁধা রয়েছে, আশেপাশে কেউ নেই।

এখানে এত রাত্রে অশ্ব কোথা থেকে এলো। কার অশ্ব। নানা প্রশ্ন চন্দন সিংয়ের চিন্তাকে আচ্ছন্ন করে। কিন্তু অশ্বের আরো নিকটে এসে রতন সিং যেন চমকে ওঠেন। অশ্বটি তাঁর পরিচিত। চিতোরগড়ে অপরিচিত নয় কারো। কালো কুচকুচে গাত্রবর্ণ—গায়ে ঘন কালো রেশমের মত চকচকে রোমরাজি।

মহিষী রঞ্জাবতীর প্রিয় অশ্ব—রোহিণী। রোহিণী অশ্বিনী এখানে কেন এ

সময় ? কেউ কি তবে মাহষী রঞ্জাবতীর আম্বনীকে অশ্বশালা থেকে চুরি করে নিয়ে এলো ? এত দুঃসাহস এই চিতোরগড়ে কার হবে ?

ঠিক ঐ সময় রতন সিংয়ের কর্ণে প্রবেশ করে অস্পষ্ট পদশব্দ। চকিতে চন্দন সিং পদশব্দ লক্ষ্য করে সেই দিকে তাকান এবং তার নজরে পড়ে দুটি আবছা মনুষ্যমূর্তি ঐদিকেই—বৃক্ষতলের দিকে এগিয়ে আসছে।

কারা ওরা ? কারা আসছে ?

এতক্ষণে দূরবর্তী রঞ্জাবতীরও রতন সিং ও রত্নার প্রতি দৃষ্টি পড়েছিল। তারাও থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছিল।

রতন সিং চাপাকণ্ঠে বলেন, তাড়াতাড়ি এসো, আমরা এই বৃক্ষের আড়ালে আত্মগোপন করি, কারা যেন এইদিকে আসছে।

দুজনে তাড়াতাড়ি বৃক্ষের আড়ালে আত্মগোপন করে। ওদিকে বৃক্ষের তলায় আবছা আলো-অন্ধকারে ক্ষণপূর্বে দৃষ্ট মনুষ্যমূর্তি দুটি অদৃশ্য হওয়ায় রঞ্জাবতী চিন্তিত হয়ে পড়েছিল।

এইমাত্র যে মনুষ্যমূর্তি দুটি সে দেখলো তারা কোথা গেল ? তবে কি তার দেখার ভুল ? সত্যি সত্যি কাউকে সে বৃক্ষতলে দেখে নি ? দেখতে পায় নি ? হয়ত কোন ছায়া বা ঐ রকম কিছু তথাপি মন থেকে সন্দেহ যায় না রঞ্জাবতীর। সে আর অগ্রসর না হয়ে ঐখানেই দাঁড়িয়ে থাকে। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ভাল করে দেখবার চেষ্টা করে। কিন্তু আর কাউকেই দেখতে পায় না।

কেবল তার অশ্বই দাঁড়িয়ে রয়েছে সেখানে।

পার্বতী।

রাণীমা।

কাউকে দেখতে পাচ্ছো ঐ বৃক্ষতলে ?

না তো।

কিন্তু একটু আগেও দেখেছি স্পষ্ট—

আমিও দেখেছি !

তবে তারা কোথায় গেল ?

হয়ত আমরা ভুল দেখেছি রাণীমা।

না। ভুল দেখি নি।

তবে বোধ হয় আমাদের দেখতে পেয়ে তারা বৃক্ষের ঐদিকে আত্মগোপন করেছে রাণীমা।

আমারও তাই ধারণা। শোন—তোমার সঙ্গে অস্ত্র আছে তো ?

আছে।

ঠিক আছে, চল এগোনো যাক।

কিন্তু রাণীমা—এগোনো উচিত হবে কি ?

ভয় পাচ্ছো ?

মৃদু হাসলো পার্বতী। বললে, না।

তবে ?

ওখানে যদি আরো বেশী লোক থাকে ঐ দুজন ছাড়াও, সেক্ষেত্রে আমাদের ঐখানে এই মুহূর্তে যাওয়া হয়ত যুক্তিযুক্ত হবে না। তাছাড়া ওরা যদি কোন দস্যু হয় ?

তাহলেও যেতে হবে। নচেৎ পায়ে হেঁটে প্রাসাদে পৌঁছাতে অনেক সময় লাগবে। তাছাড়া ইতিমধ্যে সময় অনেকটা অতিবাহিত হয়ে গিয়েছে।

বেশ তবে চলুন।

হ্যাঁ—চল।

দুজনে অতঃপর সতর্ক দৃষ্টিতে তাকাতে তাকাতে বৃক্ষতলের দিকে অগ্রসর হয়। এবং কাউকেই আর দেখতে পায় না। তাহলেও মনের সন্দেহ যায় না রত্নাবতীর।

যে মুহূর্তে রত্নাবতী বৃক্ষতলে উপস্থিত হয়ে পার্বতীকে নিয়ে, চকিতে উন্মুক্ত অসিহস্তে রতন সিং ওদের সামনে এসে লাফিয়ে পড়েন।

দাঁড়াও।

রত্নাবতী থমকে দাঁড়িয়ে যায়। পার্বতীও।

কে তোমরা ?

রত্নাবতীকে রতন সিং চিনতে পারেন না। প্রথমতঃ তার পরনে পুরুষের বেশ, দ্বিতীয় রত্নাবতীকে একবার মাত্র পূর্বে দেখেছিলেন।

রত্নাবতীও রতন সিংকে ঠিক চিনে উঠতে পারে না, তবে তার বেশভূষা দেখে বুঝতে পারে সে কোন উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী।

রত্নাবতীকে আবার সম্বোধন করে বললেন রতন সিং, বল তোমার সঙ্গে ঐ নারী কে ? আর এই অশ্বই বা কোথা থেকে কেমন করে তুমি পেলে ?

রত্নাবতী কথা বলে না, গলার স্বরে পাছে সে নারী বলে তাকে চিনতে পারে। সে পার্শ্ববর্তী পার্বতীর গা টিপে কথা বলার জন্য নির্দেশ দেয়।

পার্বতীই তখন প্রশ্ন করে; তুমি কে ?

আমার পরিচয় দেওয়ার আগে নিজেদের পরিচয় দাও কে তোমরা ?

না। আগে তোমার পরিচয় দেবে তারপর আমাদের পরিচয় দেবো। পার্বতী বলে।

না পরিচয় দিলে এখুনি দুজনকে তোমাদের বন্দী করে কারাগারে নিয়ে যাবো।

কেন ? কোন্ অপরাধে ?

এই অশ্বচুরির অপরাধে।

অশ্বচুরি করেছি আমরা তোমার মনে হচ্ছে কেন।

তাছাড়া ঐ অশ্ব এখানে এ সময় কি করে এলো ? রতন সিং ক্রুদ্ধ গলায় বলেন।

অশ্বটি তুমি চেনো ?

চিনি বৈকি। মহিষী রত্নাবতীর প্রিয় অশ্বিনী রোহিণী!

তোমার পরিচয় না পাওয়া পর্যন্ত বলবো না। পার্বতী তার কথার পুনরাবৃত্তি করে।

আমি সৈন্যাধ্যক্ষ রতন সিংহ।

রঙ্গাবতী এতক্ষণে কথা বলে, রতন সিং। আমি মহিষী রঙ্গাবতী।

রতন সিংহ তাড়াতাড়ি সসম্ভ্রমে অভিবাদন জানায় রাজমহিষী রঙ্গাবতীকে। বলে, মা—আপনি?

হ্যাঁ রতন সিং, আমি।

রতন সিংয়ের যেন বিস্ময়ের অবধি নেই। এবং বিস্ময়াভিভূত কণ্ঠেই আবার তিনি প্রশ্ন করেন, এ সময়ে ঐ বেশে আপনি এখানে কেন মা?

প্রয়োজনে ছদ্মবেশ নিতে হয়েছে আমাকে।

প্রয়োজন!

হ্যাঁ।

কি সে প্রয়োজন জানতে পারি কি মা?

এখন আমার সময় সেই—এখুনি আমাকে প্রাসাদে প্রত্যাবর্তন করতে হবে—নচেৎ মহারাজার অগোচর কিছুই আর থাকবে না। যাক সে কথা, কালই হয়ত তোমার কাছে আমি কুর্চিকে পাঠাতাম।

আমার কাছে? কিন্তু কেন মা?

রতন সিং—

বলুন?

একজনকে কটা দিনের জন্য আশ্রয় দিতে পারবে?

কেন পারব না মা কিন্তু কাকে?

তোমার কাছে গোপন করব না রতন সিং—যোধপুর-কুমারীকে।

যোধপুর-কুমারী?

বিস্ময়ের উপর যেন বিস্ময়। রতন সিংহ যেন কেমন থতমত খেয়ে যায়।

আমার সঙ্গে যাকে তুমি দেখছো রতন সিং, এই ইনিই যোধপুর-কুমারী—পার্বতী—

রত্না ওদের পরস্পরের কথা এতক্ষণ নিঃশব্দে শুনছিল। পার্বতীর পরিচয় পেয়ে সে চুপ করে শোনে।

যার সন্ধানে সে এত দূরে এসেছে তার সঙ্গে যে আজই রাত্রে এমনি ভাবে সাক্ষাৎ হয়ে যাবে এ যে তার স্বপ্নেরও অগোচর ছিল।

কি রতন সিং? চুপ করে রইলে কেন? তবে কি তুমি আমার অনুরোধ পালনে সম্মত নও বুঝবো?

না মা—আপনার আদেশ নিশ্চয়ই আমি শিরোধার্য করবো। কিন্তু—

কি বল?

আপনি নিশ্চয়ই সব জানেন—

কি বল তো?

ঐ কুমারী মহারাণার বাগদত্তা বধূ।

কিন্তু ও তো বিবাহিতা।

বিবাহিতা ?

হ্যাঁ—ভালবেসে একজনের গলায় ও অনেক আগেই মালা দিয়েছে হিন্দুনারীর কি দুবার বিবাহ হয় ?

না—তা হয় না।

কিন্তু মা, মহারাণা যদি ঘুণাক্ষরেও জানতে পারেন—

তবে আর তোমার সাহায্য চাইবো কেন রতন সিং ?

॥ ৩১ ॥

রতন সিং চুপ করে থাকেন। মহারাণীর প্রস্তাবে সম্মত হওয়া মানেই মহারাণার বিরুদ্ধাচরণ করা। রতন সিং যে কেবল সৈন্যাধ্যক্ষই তাই নন তিনি মহারাণার অতীব বিশ্বাসভাজনদের একজন। সেক্ষেত্রে কেমন করে তিনি মহারাণার বিরুদ্ধাচরণ করবেন ?

অথচ মহারাণীর অনুরোধটুকুও তাঁর পক্ষে প্রত্যাখ্যান করা একপ্রকার অসম্ভব।

তবে কি জানব রতন সিং এ রাজ্যের প্রধানা মহিষীর সামান্য একটা অনুরোধ রক্ষার্থে অসমর্থ ? প্রশ্নটা করে রত্নাবতী পুনরায় রতন সিংয়ের মুখের দিকে তাকাল।

রতন সিং তথাপি নীরব।

বুঝেছি রতন সিং। বিপদগ্রস্তা একা অসহায় নারীকে আশ্রয় দিতেও আজ তুমি অক্ষম। বুঝতে পারলাম মেওয়ার আজ পুরুষহীন—সব ক্লীব—শুধু তাই নয় অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার মত সাহসটুকুও আজ আর তাদের নেই। এক নারী বিবাহিতা জেনেও—

সহসা রত্নাবতীকে বাধা দিয়ে পার্বতী ঐ সময় বলে ওঠে, থাক রাণীমা—ওঁকে আর অনুরোধ করবেন না। পার্বতীও রাজপুতানী—সে তার নিজের সতীত্ব রক্ষা করতে সক্ষম। কারো সাহায্যেরই তার প্রয়োজন হবে না।

না ভগ্নী। আপনি চলুন আমার গৃহে—, রতন সিং তাড়াতাড়ি বলে ওঠেন, আমি আপনাকে আশ্রয় দেবো।

আঃ, তুমি আমাকে নিশ্চিন্ত করলে রতন সিং—রত্নাবতী বলে ওঠে, সত্যি কি বলে যে তোমাকে আমি ধন্যবাদ জানাব—

ভগ্নীকে ভাই আশ্রয় দেবে তার মধ্যে ধন্যবাদের কথা কোথা থেকে আসছে, রতন সিং বলেন, চলুন আর দেরি করবেন না—রাত্রি প্রায় শেষ হয়ে এলো।

যাও পার্বতী—রতন সিংয়ের গৃহে তুমি যাও—রত্নাবতী বলে।

ইতিমধ্যে কুর্চি বৃক্ষতলে এসে হাজির হয়েছিল হাঁপাতে হাঁপাতে। রত্নাবতী কুর্চির দিকে তাকিয়ে বলে, তোর আসতে এত দেরি হলো যে কুর্চি ?

একটু কাজ ছিল রাণীমা।

অতঃপর রত্নাবতী কর্চিকে নিয়ে বিদায় নিল। অশ্বপৃষ্ঠে আরূঢ় হয়ে রত্নাবতী প্রাসাদাভিমুখে অশ্ব ছোটায়।

রতন সিং ফিরে তাকালেন পার্বতীর দিকে, বললেন, চলুন ভগ্নী—মাড়বার-রাজনন্দিনী আপনি—আর আমি সামান্য এক সৈন্যাধ্যক্ষ—আমার গৃহে আপনার যোগ্য সম্মান আমি দিতে পারব না হয়ত—

ও কথা বলছেন কেন ? পার্বতী বলে ওঠে, ভগ্নী বলে আমাকে গ্রহণ করেছেন যখন তখন সে প্রশ্ন তো আসে না। ভ্রাতার গৃহ তা পর্ণকুটীর হলেও বোনের কাছে যে তা স্বর্গ।

রত্না এতক্ষণ একটি কথাও বলে নি। নিঃশব্দে এক পাশে দাঁড়িয়ে সকলের কথোপকথন শুনছিল, সে এবারে বলে, তুমি ঠিকই বলেছো রাজকুমারী—পৃথিবীতে নারীর স্বামীর গৃহের পরে একমাত্র নিশ্চিন্ত আশ্রয় তার ভাইয়ের গৃহেই।

পার্বতী রত্নার দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করে, তোমাকে তো চিনলাম না ভাই—তোমার অঙ্গে দেখছি পুরুষের বেশ, অথচ—

আমার পরিচয় দেবার মত কিছুই নেই রাজকুমারী। রত্না বলে, সামান্য এক নর্তকী মাত্র—

নর্তকী।

রত্নার পরিচয় আপনাকে আমি পরে দেবো রাজকুমারী—এখন চলুন—রাত্রি প্রায় শেষ হয়ে এলো। অনেকটা পথ যেতে হবে আমাদের,—রতন সিং বলেন।

সকলে অতঃপর রতন সিংয়ের গৃহের দিকে অগ্রসর হয়। অশ্বের বল্গা ধরে আগে আগে হেঁটে চলেন রতন সিং, তাঁর পশ্চাতে ওরা দুজনে পাশাপাশি হেঁটে চলে। ত্রিযামা রাত্রির শেষ পরিক্রমা তখন চলেছে।

পূর্বাশার প্রান্তে ক্রমশঃ লাগছে যেন একটা আলোর প্রলেপ। নিশি অবসানে চিতোরগড়ের জাগরণ আসন্নপ্রায়। গাছের ডালে ডালে ঘুমভাঙ্গা পাখীর ডানা ঝাপটানি শোনা যায়।

ভোরের শীতল বায়ু ওদের চোখেমুখে লাগে। শীত রাত্রিশেষের হিমশীতল বায়ু।

চিতোরগড়ের পশ্চিম প্রান্তে রতন সিংয়ের আবাস। আজো অকৃতদার রতন সিং। গৃহে লোকজনের মধ্যে বৃদ্ধা মা শঙ্করীবাঈ ও প্রৌঢ় এক ভৃত্য বুধা সিং।

সামান্য সৈনিক হয়ে একদিন রাণার সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়েছিলেন রতন সিং, তারপর ক্রমশঃ নিজ বুদ্ধি, সাহস ও কর্মদক্ষতায় সৈন্যাধ্যক্ষের পদে উন্নীত হয়েছেন।

ওরা যখন রতন সিংয়ের গৃহদ্বারে এসে উপস্থিত হলো, ভোরের আলো তখন আরো স্পষ্ট হয়ে উঠছে। রুদ্ধ দ্বারে বার দুই করাঘাত করতেই দ্বার খুলে গেল।

সামনেই দাঁড়িয়ে রতন সিংহের বৃদ্ধা মাতা শঙ্করীবাঈ। রতন এত দেরি হলো

যে ফিরতে—

কিন্তু শংকরীবাঈ তার কথা শেষ করতে পারেন না—পুত্রের সঙ্গে এক নারী ও এক পুরুষকে দেখে সবিস্ময়ে পুত্রের মুখের দিকে তাকান জননী।

এ'রা কারা রতন ?

মা—এরা আমাদের অতিথি—, রতন সিং বলেন।

জননী পথ ছেড়ে দাঁড়ালেন। সকলে ভিতরে প্রবেশ করে। এবং ভিতরে প্রবেশ করে ভিতর থেকে দ্বারে অর্গল তুলে দেন রতন সিং।

ওঁরা দুজনাই পরিশ্রান্ত—ওদের দুজনারই বিশ্রামের প্রয়োজন মা। পশ্চিমের যে ঘরটা খালি পড়ে আছে সেই ঘরেই ওদের থাকবার ব্যবস্থা করে দাও মা।

শংকরীবাঈ কেমন যেন একটু সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতেই একবার রত্না ও পার্বতীর দিকে তাকিয়ে পুত্রের মুখের দিকে দৃষ্টি ফেরালেন।

রতন বুঝতে পারেন কেন মার মনে দ্বিধা জেগেছে। তিনি মৃদু হেসে বলেন, ভয় নেই মা—ওঁরা দুজনই নারী।

নারী!

হ্যাঁ—উনি মাড়বার রাজকুমারী—

মাড়বার রাজকুমারী—কি বলছিস রতন ?

হ্যাঁ মা—আর উনি রত্না, ওর সহচরী।

বৃদ্ধা শংকরীবাঈ যেন পুত্রের কথাটি ঠিক হৃদয়ঙ্গম করে উঠতে পারেন না। মাড়বার রাজকুমারী তাঁদের পর্ণকুটীরে—আর পুত্রের সঙ্গেই বা কি করে এলো।

যাও মা—আর দেরি করো না। ওঁদের ঘর দেখিয়ে দাও।

পার্বতীর দিকে তাকিয়ে শংকরীবাঈ বলেন, এসো মা—চল—

ওরা শংকরীবাঈকে অনুসরণ করে।

ছোট বাড়ি—ছোট ছোট চারটি কক্ষ। তারই পশ্চিমের কক্ষে ওদের নিয়ে যান শংকরীবাঈ। কক্ষ অন্ধকার।

একটু দাঁড়াও মা—আমি একটা আলোর ব্যবস্থা করি।

পার্বতী বলে ওঠে, না না—আপনি ব্যস্ত হচ্ছেন কেন ? রাতও প্রায় শেষ হয়ে গিয়েছে—এখুনি চারিদিকে আলো হবে—

শংকরীবাঈ শুনলেন না—চলে গেলেন।

খোলা জানালা-পথে প্রথম ভোরের আলো কক্ষমধ্যে সামান্য যা প্রবেশ করেছে, তাতেই কক্ষমধ্যে একটা আলো-আঁধারির সৃষ্টি হয়েছে।

রত্না গিয়ে খোলা জানালার সামনে দাঁড়াল। রত্না তখন থেকেই একটা কথা ভাবছিল—কি বিচিত্র যোগাযোগ। যার সন্ধানে সে দীর্ঘপথ ছুটে এসেছে—এবং যার সন্ধান চিতোরগড়ের মত এত বড় জায়গায় কি করে পাবে ভেবে চিন্তিত হয়েছিল, তারই সঙ্গে যে এমন এক পরিস্থিতিতে সাক্ষাৎ হয়ে যাবে ভাবতেও কি পেরেছিল রত্না।

গাঙ্গকে সে প্রতিশ্রুতি দিয়ে এসেছিল, যেমন করেই হোক পার্বতীকে সে খুঁজে বের করবেই।

কিন্তু তার পরের ব্যাপারটা সে প্রতিশ্রুতি দিলেও মনের মধ্যে যেন কিছুতেই সায় পায় নি। পার্বতী বীরেন্দ্রকে ভালবাসে। আর সেই ভালবাসার জন্যই সে ভ্রাতার দেওয়া নির্বাসন স্বেচ্ছায় মাথা পেতে নিয়েছিল। ভ্রাতার ভ্রুকুটিকে সে গ্রাহ্য করে নি।

মহারাজ গাঙ্গের নিষ্ঠুর আভিজাত্য পার্বতীর অসবর্ণ প্রেমকে স্বীকৃতি দেয় নি—দিতে পারে নি—কিন্তু তারই ভগ্নী হয়ে পার্বতী—রাজনন্দিনী পার্বতী কেমন করে বীরেন্দ্রের মত সামান্য এক নাগরিককে ভালবেসে সবাইকে ত্যাগ করে হাসতে হাসতে চলে এলো! একই রক্তধারা তো ভ্রাতা ও ভগিনীর মধ্যে প্রবাহিত।

শঙ্করীবাঈ একটি আলো নিয়ে কক্ষমধ্যে এসে প্রবেশ করলেন। তোমরা বিশ্রাম কর মা—বাইরের প্রাঙ্গণে কুয়া আছে—হাত-মুখ সেখানে ধুতে পারো—তোমাদের আহার্যের ব্যবস্থা করি আমি—শঙ্করীবাঈ কক্ষ ছেড়ে চলে গেলেন।

কক্ষমধ্যে একটি পালঙ্ক—তাতে সাধারণ শয্যা বিছানো। ক্লান্ত পার্বতী সেই শয্যার উপরেই চুপচাপ বসেছিল।

রত্না সামনে এসে দাঁড়াল।

রাজকুমারী।

ও নামে তুমি আমাকে সম্বোধন করো না রত্না।

কেন?

সে আভিজাত্যের বন্ধন আমি ছেড়ে চলে এসেছি চিরদিনের মতই। তুমি আমাকে পার্বতী বলেই ডেকো।

বেশ—আপনার যদি তাই ইচ্ছা তো তাই হবে—কিন্তু আপনার সঙ্গে আমার কিছু জরুরী কথা ছিল।

আমার সঙ্গে জরুরী কথা!

কেমন যেন বিস্ময়ের সঙ্গেই পার্বতী রত্নার মুখের দিকে তাকায়।

হ্যাঁ।

কিন্তু—

সব শুনলেই বুঝতে পারবেন।

একটু থেমে রত্না বলে, আমার যে পরিচয় কিছুক্ষণ আগে গাছতলায় দাঁড়িয়ে আপনাদের দিয়েছিলাম—সেইটে আমার পরিচয়ের সব নয়।

পার্বতী যেন কেমন একটু বিস্মিত হয়েই রত্নার মুখের দিকে তাকাল। সত্যি কথা বলতে কি, রত্না যখন নিজের পরিচয়প্রসঙ্গে নিজেই বলেছিল সে একজন নর্তকী—পার্বতী কোনরকম বিস্ময়বোধ করে নি।

কিন্তু যখন গৃহে এসে রতন সিং তার পরিচয় জানা সত্ত্বেও এক নর্তকীর সঙ্গে তাকে একই কক্ষে থাকবার জন্য নির্দেশ দিয়ে গেলেন, তখন ব্যাপারটা তার খুব ভাল লাগে নি। তার নিজের পরিচয় জানা সত্ত্বেও রতন সিং কেন রত্নাকে তারই সঙ্গে একই কক্ষে থাকবার ব্যবস্থা করলেন?

অবিশ্যি প্রতিবাদ সে জানায় নি—কারণ সেও রতন সিংয়েরই আশ্রিতা।

পার্বতী ওর মুখের দিকে তাকিয়ে থেকেই বলে, তুমি কি তাহলে, যে পরিচয়

তোমায় দিয়েছো—

হ্যাঁ—নর্তকীই আমি।

তবে ?

আমিও মাড়বার থেকেই আজ মাত্র সন্ধ্যায় চিতোরগড়ে এসে পেঁছেছি।

মাড়বার থেকে ?

তাই নয় কেবল, এখানে এই চিতোরগড়ে আমি আপনার জ্যেষ্ঠ মহারাজ গাঙ্গ কর্তৃক প্রেরিত হয়েই এসেছি,—কিন্তু কেন জানেন ?

কেন ?

আপনারই সন্ধানে এসেছি আমি।

আমার সন্ধানে ?

কথাটা আপনাকে তাহলে স্পষ্ট করে খুলেই বলি,—রত্না অতঃপর কেন সে চিতোরগড়ে এসেছে সংক্ষেপে বলে গেল।

পার্বতী নিঃশব্দে শোনে রত্নার কথা।

ইতিমধ্যে ভোরের আলোয় কক্ষটি আরো স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। এবং তখনো যে কক্ষের মধ্যে আলোটা জ্বলছে কারোরই যেন খেয়াল হয় না।

রত্নাই অতঃপর আলোটা নিভিয়ে দেয়।

রত্নার কথা শুনতে শুনতে পার্বতীর যে কথাটা কেবলই মনে হচ্ছিল—রত্না সামান্যা নর্তকী নয়, না হলে গাঙ্গ তাকে ঐ কাজের জন্য বিশ্বাস করে চিতোরগড়ে প্রেরণ করত না।

রত্না, তুমি কি—

কি ?

মাড়বারেরই মেয়ে ?

না।

তবে তোমার সঙ্গে মহারাজের, আমার সহোদরের পরিচয় হলো কেমন করে ?

সে কথাটা নাই বা জানলেন।

তোমার আপত্তি থাকলে নিশ্চয়ই আমি ও সম্পর্কে আর কোন প্রশ্ন করব না। তবে আমার মনে হচ্ছে—

কি মনে হচ্ছে রাজকুমারী ?

তুমি সামান্যা নর্তকী নও।

সত্যিই আমি সামান্যা নর্তকী রাজকুমারী। পার্বতী মৃদু হাসে। তারপর শান্ত গলায় বলে, কিন্তু আমার সন্ধানে তুমি এসেছিলে কেন ? কেন মহারাজ তোমাকে এখানে প্রেরণ করেছেন তা বলতে নিশ্চয়ই তোমার আপত্তি নেই ?

যে ভাবে হোক আপনাকে এখান থেকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবার জন্যই তাঁর আমার প্রতি নির্দেশ আছে—

কিন্তু আমি তো সেখানে যাবো না আর কোন দিন ফিরে।

সেটাও বুঝতে পারছি।

তাহলে তুমি এখন কি করবে রত্না ?

একাই হয়ত ফিরে যাবো।

হ্যাঁ—ফিরে গিয়ে তাকে বলো, যদি কোন দিন সে আভিজাত্যের ভুয়ো মর্যাদাকে ভুলে সহজ সরল দৃষ্টিতে আমাদের সম্পর্কটাকে বিচার করতে পারে, সেদিন নিজেই আমি আবার মাড়বারে ফিরে যাবো।

রাজকুমারী আমার একটা প্রশ্নের জবাব দেবেন ?

কি ?

সত্যিই কি আপনার ও বীরেন্দ্রর বিবাহ হয়ে গিয়েছে ?

হ্যাঁ।

বীরেন্দ্র কোথায় ?

সেও এই চিতোরগড়েই আছে।

সে আপনাকে একা এভাবে ছেড়ে দিল ?

মহিষীর ইচ্ছাতেই সে আমাকে তাঁর সঙ্গে আসতে দিয়েছে—এবং আমিও সব দিক বিবেচনা করেই আর অমত করি নি—বিশেষ করে যখন আরো জানতে পারলাম মহিষীর মুখে, আমার সহোদর চিতোরের রাণার সঙ্গেই আমার বিবাহের ব্যবস্থা করেছে।

মহারাণাও তো আপনাদের চিতোরগড়ে অবস্থিতির কথা জানতে পেরেছেন !

হ্যাঁ।

এবং আপনি যে সুচিৎ সিংহের আশ্রয় থেকে চলে এসেছেন, তাও হয়ত আজই জানতে পারবেন।

সেটাই তো স্বাভাবিক।

তখন কি হবে ?

রাজমহিষীই হয়ত একটা ব্যবস্থা করবেন।

কিই বা ব্যবস্থা করা তার পক্ষে সম্ভব। প্রথমত অন্তঃপুরচারিণী এক নারী তিনি এবং বিশেষ করে মহারাণারই মহিষী তিনি—

কথাটা যে আমারও মনে হয় নি রত্না তা নয়। তবু—, ওখানে থাকতেও যেন আর সাহস হলো না।

ঠিক আছে রাজকুমারী—চিন্তা করবেন না—ভেবে নিশ্চয়ই ভবিষ্যতের একটা পথ আমরা বের করতে পারবো।

পারবে ? পারবে রত্না ?

আমাকে ভাবতে দিন। অন্তত আপাতত তো আপনি রতন সিংয়ের আশ্রয়ে নিরাপদ।

কিন্তু রতন সিংকে কি আমরা সত্যিই বিশ্বাস করতে পারি ?

তা পারি।

কি করে বুঝলে ?

আর যাই করুন রতন সিং যে বিশ্বাসঘাতকতা করবেন না আমি তা জানি—

কিন্তু ওদের কথা শেষ হলো না—শঙ্করীবাঈ এসে কক্ষে প্রবেশ করলেন।
এ কি—এখনো তোমরা বসে আছো মা—হাত-মুখ ধোবে না ?
রতন সিং কোথায় মা ?
রাণার প্রাসাদে গিয়েছে।
কখন ?
একটু আগে জরুরী বার্তাবহ এসেছিল তাকে ডাকতে।

॥ ৪০ ॥

চন্দনা—মরিয়মের একটা ভয় ছিল সম্রাট বাবুর হয়ত তার বিশ্বস্ত, প্রিয় সৈন্যাধ্যক্ষ কুবলাই খাঁর রণবীরের হাতে নিহত হওয়ার ব্যাপারটা ক্ষমার চোখে দেখবে না। হয়ত তাকে কোন কঠিন শাস্তি দেবে। সেই কারণেই বাবুর যখন সর্বত্র কুবলাই খাঁর অনুসন্ধান করছে—তার গুপ্তচরেরা তৎপর হয়ে উঠেছে, মরিয়ম ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছিল। এবং যখন সে তার তাঁবু থেকে লক্ষ্য করলো রণবীর সম্রাটের শিবিরের দিকে চলেছে তখন তার ইচ্ছা হয়েছিল ছুটে গিয়ে রণবীরের পথ রোধ করে তাকে বলে, এমন কাজও করো না রণবীর। যবন সম্রাট হয়ত ব্যাপারটা ক্ষমার চোখে দেখবে না।

কিন্তু বলবার কোন অবকাশই হলো না। শেষ পর্যন্ত দিনের আলোয় সকলের দৃষ্টির সামনে নিজের তাঁবু থেকে বের হয়ে রণবীরের সামনে গিয়ে দাঁড়াতে পারল না মরিয়ম কিছুতেই।

রণবীর সম্রাটের শিবিরের দিকে যাচ্ছে।

শঙ্কিত অসহায় দৃষ্টিতে সে তাকিয়ে রইলো রণবীরের গমনপথের দিকে। রণবীর মুখে যাই বলুক না কেন, সম্রাটবাহিনীতে তার যোগ দেওয়ার ব্যাপারটা সে তখনো ঠিক বুঝে উঠতে পারে নি। রণবীরের ঈদৃশ আচরণের যেন কোন তাৎপর্যই খুঁজে পাচ্ছিল না। সে তো ভাল করেই জানে আর বিশ্বাসও করে মনেপ্রাণে রণবীর দেশদ্রোহী নয়—সত্যিই সে নিজের দেশকে ভালবাসে। সেক্ষেত্রে যে শত্রু আজ বিরাট সৈন্যবাহিনী সাজিয়ে তাদের মাতৃভূমিকে আক্রমণ করতে চলেছে তার সঙ্গে হাতে হাত মিলানোর ব্যাপারটা চন্দনার কাছে যেন সত্যিই কেমন রহস্যময় মনে হচ্ছিল। দুর্বোধ্য ঠেকছিল। একসময় চন্দনা লক্ষ্য করলো রণবীর মাথা নীচু করে সম্রাটের তাঁবু থেকে বের হয়ে এলো।

ধীর মন্থর পদে সে তার তাঁবুর দিকে চলে গেল। এবং যাতে করে আর যাই হোক সে যে বন্দী হয় নি, সম্রাট তাকে বন্দী করে নি, সেটা বুঝতে মরিয়মের কষ্ট হয় না।

তবে কি রণবীর বলে নি সে কুবলাই খাঁকে হত্যা করেছে ? তাই যদি না হবে তো সে এ-সময় সম্রাটের কাছে গিয়েছিল কেন ?

রণবীরকে কেমন যেন চিন্তিত মনে হলো। রণবীরের সঙ্গে পুনরায় দেখা না হওয়া পর্যন্ত কিছুই জানা সম্ভব নয়—অথচ রণবীরের সঙ্গে দেখা হওয়াটাও

একটা রীতিমত দুঃসাধ্য ব্যাপার।

একবার কি বাঁদী আনোয়ারাকে পাঠাবে রণবীরকে সন্ধ্যার সময় নদীতীরে তার সঙ্গে দেখা করবার জন্য—কিন্তু আবার পরক্ষণেই মরিয়মের মনে হয়, তাতে করে বাঁদীর মনে সন্দেহ জাগতে পারে—প্রয়োজন নেই—আর একটা কাজ করা যেতে পারে—সে যদি নিজেই রণবীরের সঙ্গে গিয়ে দেখা করে—কিন্তু তাও দিনের বেলা সম্ভব নয় কোনক্রমেই—একমাত্র গভীর রাত্রে—কিন্তু রণবীরের তাঁবুতে যাওয়াটা কি বিবেচনার কাজ হবে।

দুশ্চিন্তায় মরিয়মের মনটা ছট্‌ফট করতে থাকে।

এদিকে রণবীরকে বিদায় দেবার পর বাবুর একাকী তার তাঁবুর মধ্যে বসে সুরাপান করছিল। বাগ-ই-ওয়াফতে এমনি করে তার সৈন্যবাহিনী নিয়ে আর কতদিন বাবুর বসে থাকবে নিষ্ক্রিয় হয়ে পুত্র হুমায়ুনের প্রতীক্ষায় ?

পুত্র হুমায়ুন এখনো এসে পেঁছাল না।

কয়েকদিন আগে দ্রুতগামী অশ্বারোহী মারফৎ হুমায়ুনের কাছে এক পত্র প্রেরিত হয়েছে। পত্রে তীব্র কটু ভাষায় অনেক গালমন্দ করে তার কর্তব্যচ্যুতির জন্য কৈফিয়ৎ তলব করা হয়েছে।—কেন সে বাবুরের নির্দেশ এখনো পালন করলো না? কিন্তু সে-পত্রেরও কোন জবাব আজ পর্যন্ত এলো না। অথচ হুমায়ুনকে সঙ্গে না নিয়ে বাবুরের আর এক পাও অগ্রসর হবার ইচ্ছা নেই। এদিকে বসন্তও প্রায় ফুরিয়ে এলো। ঝরা পাতার উৎসব। সারাটা দিন হাওয়া চলেছে—আর ঝরা পাতা উড়ে উড়ে চলেছে।

শিবিরের প্রবেশদ্বারের ভারী পর্দাটা হাওয়ায় উড়ে উড়ে পত পত শব্দ করছে, বাইরে একটা গোলমাল শোনা গেল। বহু কণ্ঠের মিশ্রিত শব্দ।

হয়ত ভাং খেয়ে সৈন্যরা চেঁচামেচি শুরু করেছে নেশায়। ব্যাপারটা কি জানবার জন্য বাবুর দ্বারীকে ডাকতে যাচ্ছিল কিন্তু তার আগেই একজন বান্দা শিবিরের মধ্যে প্রবেশ করে কুর্নিশ জানাল।

কি ব্যাপার—বাইরে অত গোলমাল কিসের ? বাবুর বান্দাকে প্রশ্ন করে।

আলমপনা—শাহাজাদা এসেছেন।

কে হুমায়ুন ?

হ্যাঁ।

যা—তাড়াতাড়ি তাকে আমার কাছে ডেকে নিয়ে আয়।

বান্দা শিবির থেকে বের হয়ে যাবার কিছুক্ষণ পরেই হুমায়ুন এসে শিবিরের মধ্যে প্রবেশ করল।

দীর্ঘদেহী যুবক। উজ্জ্বল দুটি স্বপ্নালু চোখ কিন্তু প্রদীপ্ত। হুমায়ুন বাবুরকে অভিবাদন জানায়।

তুমি আমার পত্র পেয়েছিলে হুমায়ুন ?

জী!

তবে তোমার এখানে আসতে এত বিলম্ব হবার কারণ কি ?

পথ দুর্গম আপনি তো জানেন।

দুর্গম হলেও এতদিন লাগতে পারে না—আসলে তোমার কর্তব্যজ্ঞান নেই—চারিত্রিক নিষ্ঠা নেই—

হুমায়ুন কোন জবাব দেয় না—বাবুর তাঁকে যথেষ্ট স্নেহ করে তা সে জানে তথাপি বাবুরকে সে ভয় করে। আজো বাবুরের সামনে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারে না হুমায়ুন।

ভুলো না—তুমি আমার বংশধরই নও কেবল—উত্তরাধিকারী—সব কিছুতে আরো তৎপর হতে হবে তোমাকে নচেৎ কিছুই রাখতে পারবে না।

হুমায়ুন নীরব।

যাক্—দীর্ঘ পথশ্রমে তুমি নিশ্চয়ই পরিশ্রান্ত—শিবিরে গিয়ে বিশ্রাম নাও—সৈন্যাধ্যক্ষকে বলে দিও কালই আমরা এখান থেকে যাত্রা করবো।

এত তাড়াতাড়ি কি সব গোছগাছ করা হয়ে উঠবে?

কেন হবে না। খুব হবে। একেই অনেক বিলম্ব হয়ে গিয়েছে আর বিলম্ব করতে আমি রাজী নই।

হাঁটাপথেই তো যাওয়া হবে?

না—নদীপথেই আমরা আপাতত অগ্রসর হবো। ভেলার ব্যবস্থা আমি করে রাখতে বলেছি—যাও। যা বললাম ব্যবস্থা করো গিয়ে।

হুমায়ুন আর দ্বিরুক্তি করে না। পিতাকে কুর্নিশ জানিয়ে শিবির ত্যাগ করে।

একটু পরেই শিবিরে শিবিরে সাজ সাজ রব পড়ে যায়—যাত্রার প্রস্তুতি। ছোটখাটো ব্যাপার তো নয়—বিরাট বাহিনী।

অনেক হাতে গুটিয়ে নিতেও রাত প্রায় শেষ হয়ে আসে। তার মধ্যেই মদ্যপান ও হৈ-হল্লা চলতে থাকে তুর্কী সেনাদের মধ্যে।

বুধবার প্রত্যূষে যাত্রা শুরু হলো বাগ-ই-ওয়াফৎ থেকে বাবুরের সৈন্যবাহিনীর। পর পর সব ভেলা নদীর স্রোতে ভেসে চলল। ভেলায় ভাসতে ভাসতেই সর্বক্ষণ সুরাপান চলতে থাকে।

পরের দিন বিকাল নাগাদ কোস-গুমবেজে এসে বাবুর তার বাহিনীকে থামবার আদেশ দেয়। এখানে একটা দিন বিশ্রাম।

বিশ্রামের পর পরের দিন সন্ধ্যা নাগাদ আবার ভেলা ভাসল নদীতে। আবার ভেসে চলা। সকাল থেকেই বাবুরের গা-টা ম্যাজ্-ম্যাজ্ করছিল—মাথার দু'পাশে রগ দুটো টিপটিপ করছে—মাথাটাও ভারী। বাবুরের প্রথমটায় মনে হয়েছিল কয়েকদিন ধরে দিবারাত্র মদ্যপান ও ভাং খেয়ে খেয়ে বোধ হয় শরীরটা খারাপ হয়েছে, মাথার মধ্যে দপ্দপ্ করছে—কেমন যেন বিশ্রী ভারী। কিন্তু বোঝা গেল ভাং বা মদ্যপান নয়—সন্ধ্যার দিকে কাঁপিয়ে জ্বর হলো—বাবুর একেবারে বেহুঁশ হয়ে পড়ে।

জ্বর ও সেই সঙ্গে প্রবল কাশি। সবাই সম্রাটের শরীরের অবস্থা দেখে কেমন যেন ভীত হয়ে পড়ে। ভেলা ঐ সময় বেকরামে পৌঁছেছে। হুমায়ুনের

নির্দেশে যাত্রা স্থাগিত করা হলো। সম্রাট সম্পূর্ণ সুস্থ না হয়ে ওঠা পর্যন্ত ঐখানেই বিশ্রাম। সঙ্গে হাকিম ছিল—সে চিকিৎসার ব্যবস্থা করে। কিন্তু ঔষধের দ্বারা খুব একটা যে উপকার হয়েছে তা মনে হলো না কারণ কাশির সঙ্গে বাবুরের গলা দিয়ে রক্তও পড়তে শুরু করে।

বেশ কিছুদিন ভোগে বাবুর। এবং যত সে সুস্থ হয়ে উঠতে থাকে মনের মধ্যে তার একটা বিচিত্র ভাব দেখা দেয়, সমস্ত চিন্তা-ভাবনা যেন কেমন ওলোটপালট হয়ে গিয়েছে। বাবুরের কেন যেন কেবলই মনে হতে থাকে—তার ঐ অসুস্থতা তার নানাবিধ পাপ ও উচ্ছৃংখলতারই পরিণাম। কেমন একটা অনুশোচনা যেন দেখা দেয়। মনে হয় অনেক পাপ করেছে সে, এ তারই মূল্যশোধ।

এতদিন যে সব কবিতা লিখেছে সে সব মনে হয় কুরুচিপূর্ণ। অসংযমীর প্রলাপ মাত্র। না। এখনো সময় আছে। এখনো যদি সে প্রায়শ্চিত্ত না করে তাহলে আল্লাহর ক্ষমা সে কোন দিনই পাবে না। যত অনুশোচনায় দগ্ধ হয় ততই যেন সংকল্প দৃঢ় হতে থাকে। আর এ পথ নয়। আর অসংযম নয়।

বাবুর যেন ভিতরে ভিতরে এক নতুন মানুষ হয়ে ওঠে। শরীর তখনো ভাল করে সুস্থ হয় নি তথাপি পুনরায় যাত্রা শুরু করে বাবুর। কোস-গুমবেজ থেকে বাবুর তার বিরাট সৈন্যবাহিনী নিয়ে আলী মসজিদের কাছে এসে শিবির স্থাপনার নির্দেশ জারী করল।

ঐ বিরাট বাহিনীর শিবির স্থাপনের পক্ষে জায়গাটি খুবই সংকীর্ণ। হুমায়ুন বলেছিল, আর একটু এগিয়ে গেলে হতো না আব্বাজান?

না। এখানেই—

কাছাকাছি একটা উঁচু টিলার পরে সম্রাটের শিবির পড়লো আর সৈন্যবাহিনীর শিবির পড়লো সামনের সমতলভূমিতে।

রাত্রির অন্ধকার নামে। একাকী বাবুর তাঁবুর খোলা দ্বারপথে সামনের সমতলভূমির দিকে কেমন যেন অন্যমনস্ক ভাবে চেয়ে থাকে। বসন্তকাল প্রায় শেষ হতে চলল। বাতাসে ঠান্ডার আমেজ আর নেই। ভারতবর্ষ গ্রীষ্মপ্রধান দেশ। মোল্লা মুরাসিদ বলেছিল বসন্ত সমাগমে ঐ দেশ নাকি পত্রে-পুষ্পে অপূর্ব শ্রীময়ী হয়ে ওঠে। বিচিত্র সব পাখীর কলকাকলীতে বনতল মুখরিত হতে থাকে বসন্ত ঋতুতে সর্বক্ষণ।

পাহাড়ের উপর থেকে নজরে পড়ে—নীচের সমতলভূমিতে সৈন্যদের শিবিরে শিবিরে আগুন জ্বলছে—আগুনের রক্তাভা অন্ধকার যেন একটা জ্যোতি ছড়িয়ে দিচ্ছে।

মৃদু পদশব্দ শোনা গেল।

কে?

ফিরে তাকাল বাবুর, আইষা সুলতানা বেগম।

বেগম?

এমন চুপচাপ করে বসে যে?

দেখছিলাম—

কি ?

চেয়ে দেখ ঐ সামনের সমতলভূমিতে—

সুলতানা বেগম স্বামীর পার্শ্বে এসে উপবেশন করে। সামনে সুরার আধার ও পাত্র—বাবুর সুরা স্পর্শও করে নি তখনো।

কি ব্যাপার ? সুরা অবহেলিত—

বেগমের দিকে সস্নেহ কৌতুকে তাকিয়ে বাবুর বলে, মিষ্টি হাতে পরিবেশনের জন্য অপেক্ষা করছিলাম।

তাই বুঝি ?

হ্যাঁ—দাও পাত্রে ঢেলে দাও সুরা—

সুলতানা বেগম মৃদু হাসে।

হাসলে যে বেগম ?

তুমি জান ও বিষ কোন দিনই নিজ হাতে তোমায় পরিবেশন করবো না।

দেবে না ?

না।

তবে থাক—

সুলতানা বেগমের ওষ্ঠপ্রান্তে আবার মৃদু হাসি জেগে ওঠে।

সুরাকে তুমি বিষ বল বেগম ? ও তো অমৃত—

না, বিষ।

বেশ। একটু বিষপানই করা যাক,—কথাটা বলে বাবুর হাত বাড়িয়ে পাত্রে সুরা ঢেলে পান শুরু করে।

হুমায়ুন এসে ঐ সময় সম্রাটের শিবিরে প্রবেশ করে।

কি সংবাদ হুমায়ুন ?

লাহোরে আমাদের অগ্রবর্তী সৈন্যবাহিনী পেঁছে গিয়েছে।

আর কোন সংবাদ আছে ?

হ্যাঁ—গাজি খাঁ যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে।

তার সৈন্যসংখ্যা কত ?

তা প্রায় ত্রিশ-চাল্লিশ হাজার হবে শুনলাম।

হুঁ—আর দৌলত খাঁ ?

সেও শুনলাম কোমরের দুই ধারে দুটো তলোয়ার ঝুলিয়ে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে—

বাবুর কিছুক্ষণ চুপ করে কি ভাবে ও মধ্যে মধ্যে সুরার পাত্রে মৃদু মৃদু চুমুক দেয়।

শাহজাদা ?

বলুন।

নয়জন বন্ধুর চেয়ে দশজন বন্ধু ভাল না খারাপ ?

আপনার কথাটা ঠিক আমি বুঝতে পারলাম না জাঁহাপনা।

বাবুর প্রত্যুত্তরে মৃদু হাসে কেবল। তারপর মৃদু গলায় হুমায়ুনকে সম্বোধন করে বলে, শোন শাহজাদা—এবারে আমরা হিন্দুস্থানে অভিযান করছি—ফিরবার জন্য নয়—

আব্বাজান—

হ্যাঁ—হিন্দুস্থানেই পত্তন হবে আমার নতুন রাজ্য।—শোন। আমি ভেবে দেখলাম কোন সুবিধাজনক অবস্থাকেই হাতছাড়া করতে নেই। কিন্তু যুদ্ধে অবতীর্ণ হবার আগে আমাদের একটি কাজ করতে হবে—

বলুন ?

লাহোরে যে আমার সৈন্যবাহিনী এগিয়ে আছে তাদের সঙ্গে সর্বাগ্রে আমাদের যোগাযোগ করতে হবে। তুমি এক কাজ কর এখুনি।

বলুন কি করতে হবে ?

দ্রুতগামী অশ্বারোহী দূত মারফৎ লাহোরের আমীরদের কাছে সংবাদ পাঠাও এখুনি—আমরা এগিয়ে আসছি—লাহোরে আমার সৈন্যরা তাদের সাহায্য করবে—

তাই হবে।

হুমায়ুন উঠছিল, কিন্তু তাকে বাধা দিল বাবুর আবার, শোন—কালই প্রত্যুষে আমাদের পুনরায় যাত্রা শুরু—চেনাব নদীর তীর আমাদের লক্ষ্য।

হুমায়ুন কুর্নিশ করে বের হয়ে গেল।

দ্বারী এসে কুর্নিশ জানাল একটু পরে।

শাহানশা—

কি খবর ?

সৈন্যাধ্যক্ষ রণবীর।

যাও—নিয়ে এসো।

॥ ৪১ ॥

আগামী কল্য প্রত্যুষেই যাত্রা। সম্রাটের শিবির থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে নিজের শিবিরের দিকে যেতে যেতে শাহজাদা হুমায়ুন ভাবছিল রেজা খাঁকে হুকুম দিতে হবে এখুনি শিবিরে ফিরে কল্য প্রত্যুষে যাত্রার প্রস্তুতির জন্য।

এত দ্রুত এই বিরাট বাহিনীকে প্রস্তুত করে কি করে আর সামান্য কয়েক ঘণ্টার মধ্যে যাত্রা সম্ভব হবে হুমায়ুন ভেবেই পাচ্ছিল না। কিন্তু সম্রাটের আদেশ।

রাত্রির প্রথম প্রহরও তো প্রায় উত্তীর্ণ হতে চললো। অন্ধকার রাত্রি। ঊর্ধ্বে নিঃসীম আকাশ নক্ষত্রালোকে কেমন যেন ঝাপসা-ঝাপসা। অন্ধকারের মধ্যে তারকাগুলো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বর্ণবিন্দুর মত জ্বলছে। ভারী অদ্ভুত মনে হয় হুমায়ুনের—রাত্রির আকাশে ঐ নক্ষত্রপুঞ্জ। ও যেন কিসের এক বিচিত্র দুর্জ্ঞেয় রহস্য। লক্ষ্য যোজন পথ দূরে ঐ বিচিত্র আলোর রহস্য মনের মধ্যে যেন

কেমন এক অনুভূতি জাগায়। বিস্তীর্ণ প্রান্তর জুড়ে বিরাট সৈন্যবাহিনী বিক্ষিপ্ত ভাবে এখানে ওখানে ছড়িয়ে ছড়িয়ে রয়েছে। স্থানে স্থানে মশালের আগুন অন্ধকারে দপ্ দপ্ করে জ্বলছে। আলোছায়ার মধ্যে মানুষগুলোকে মনে হয় যেন বিচিত্র সঞ্চরণশীল খণ্ড খণ্ড স্তূপ বাঁধা ছায়ার মতই প্রতীয়মান হয়।

মদমত্ত সৈন্যদের হৈ-হল্লা শোনা যায়। নেশা করে মানুষগুলো হৈ-হল্লা করছে, স্ফূর্তিতেই আছে ওরা। জানেও না ওরা এখনো যে আর ওরা স্বদেশে ফিরে যাবে না। নতুন এক দেশে নতুন মাটিতে ওরা চিরদিনের জন্য ঘর বাঁধতে চলেছে। এত কালের পরিচিত মাটি—আকাশ—পাহাড়—ঘরবাড়ি ওরা এ জন্মের মতই ছেড়ে এসেছে। আর ফিরবে না সেখানে কোন দিনই হয়ত।

সহসা মৃদু এক সংগীতধ্বনি হুমায়ুনের কর্ণকুহরে প্রবেশ করে, অন্যমনস্ক ভাবে পথ অতিক্রম করতে করতে সেই অস্পষ্ট সংগীতধ্বনি কর্ণে প্রবেশ করতেই যেন নিজের অজ্ঞাতেই থমকে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল হুমায়ুন অন্ধকার প্রান্তরের মধ্যে। কি অপূর্ব মিষ্টি সেই সংগীতধ্বনি।

কোথা থেকে আসছে সংগীতের সুর! দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই কিছুক্ষণ শোনে হুমায়ুন সেই সংগীতধ্বনি—খুব স্পষ্ট নয় সব সময়। খোলা প্রান্তরের হাওয়া মধ্যে মধ্যে সেই ধ্বনিকে স্পষ্ট করে তুলছে, আবার কেমন যেন অস্পষ্ট করে দিচ্ছে।

প্রধান শিবিরের কিছু দূরে জেনানাদের তাঁবুগুলো সার সার পড়েছে। অন্যান্য বেগম—আত্মীয়া ও পরিচারিকাদের তাঁবুগুলি। হুমায়ুনের মনে হলো যেন ঐদিক থেকেই বাতাসে ভেসে আসছে অস্পষ্ট সংগীতধ্বনি। নিজের অজ্ঞাতেই কয়েক পা সেই দিকে এগিয়ে যায়। সংগীতধ্বনি স্পষ্ট—আরো স্পষ্ট হয়ে ওঠে কিন্তু সংগীতের কথাগুলো হুমায়ুন ঠিক যেন বুঝে উঠতে পারে না। তার পরিচিত শব্দ নয়। কৌতূহলে আরো কিছুটা এগিয়ে যায় হুমায়ুন। শেষ প্রান্তের যে তাঁবুটি সে তাঁবুর মধ্যে থেকেই সংগীতধ্বনি আসছে।

কে গায়! কে অমন মিষ্ট সুরে গান গায়। ঝাপসা নক্ষত্রের আলোয় সহসা নজরে পড়ে হুমায়ুনের একটি অস্পষ্ট ছায়ামূর্তি। তাঁবুর সামনে একটি প্রস্তর-খণ্ডের উপর বসে সেই ছায়ামূর্তি। সেই গাইছে। কোন বেগম বা দাসদাসী নিশ্চয়ই নয়। তাঁবুর বাইরে ঐ ভাবে এসে আব্রু বিসর্জন দেবে না—তাছাড়া অত বড় দুঃসাহসও হবে না। হুমায়ুনের কৌতূহলটা তাই আরো বৃদ্ধি পায়। আরো খানিকটা সে এগিয়ে যায়।

কণ্ঠস্বরেই বুঝেছিল ইতিপূর্বে হুমায়ুন যে সে নারী—এবারে ছায়ামূর্তি আরো স্পষ্ট হয়ে ওঠায় বুঝতে পারে কোন নারীই। নারী অথচ বোরখা নেই মুখের উপরে। মন্ত্রমুগ্ধের মত দাঁড়িয়ে ছিল নিঃশব্দে হুমায়ুন।

তাঁবুর মধ্যে একা একা ভাল লাগছিল না মরিয়মের, তাই একসময় তাঁবুর আলো নির্বাপিত করে তাঁবুর বাইরে এসে খোলা হাওয়ার ঝাপসা-ঝাপসা অন্ধকারে ঐ প্রস্তরখণ্ডটির উপর উপবেশন করেছিল।

কখন যে গুনগুন করে অন্যমনে গান গাইতে শুরু করেছে নিজেও জানে

না। সহসা একসময় চমকে ওঠে অল্পদূরে দণ্ডায়মান হুমায়ুনকে দেখে। ত্রস্তে উঠে দাঁড়ায় মরিয়ম। এবং তাঁবুর মধ্যে ফিরে যাবার জন্য পা বাড়াতেই বাধা পেল।

দাঁড়াও—

মরিয়ম দাঁড়াল।

হুমায়ুন আরো কয়েক পা এগিয়ে আসে মরিয়মের সামনে। দুজনে একেবারে কাছাকাছি। আবছা নক্ষত্রের আলোতেও এবারে যেন স্পষ্ট হুমায়ুন দেখতে পায় মরিয়মের মুখটা, মুখের ওপর কোন বোরখার আবরণ না থাকায়।

কে তুমি? হুমায়ুন প্রশ্ন করে।

পাল্টা প্রশ্ন করতে যাচ্ছিল মরিয়ম হুমায়ুনকে কিন্তু হুমায়ুনের মহার্ঘ বেশ ভূষার দিকে তাকিয়ে সে বুঝতে পেরেছিল ঐ ব্যক্তি আর যেই হোক সামান্য কোন সৈন্য নয়। তাছাড়া ঐ সময় জেনানাদের তাঁবুর সামনে কোন সাধারণ সৈন্য বা সৈন্যাধ্যক্ষ নিশ্চয়ই আসবার দুঃসাহস করবে না। সম্রাট বাবুর তাকে কোতল করবেন।

মরিয়ম কি করবে অতঃপর ঠিক যেন বুঝে উঠতে পারে না।

হুমায়ুন আবার প্রশ্ন করে, কি? কথার জবাব দিচ্ছ না কেন? কে তুমি? তারপরই একটু থেমে হুমায়ুন বলে, বুঝতে পারছি তুমি আমায় চিনতে পারছো না। আমি হুমায়ুন।

হুমায়ুন। সম্রাটের একমাত্র বংশধর—শাহ্জাদা হুমায়ুন!

শাহ্জাদা হুমায়ুনের নামটাই শুনেছিল কেবল মরিয়ম ইতিপূর্বে—তাকে চাক্ষুষ দেখবার সৌভাগ্য হয় নি। সসম্ভ্রমে মরিয়ম শাহ্জাদাকে কুর্নিশ জানায়, বন্দেগী শাহ্জাদা।

তুমি তো এখনো বললে না কে তুমি?

আমি একজন সম্রাটের আশ্রিত নগণ্যা নর্তকী—নাম মরিয়ম।

মরিয়ম!

জী।

পূর্বে ঐ নাম কখনো শুনেছি বলে তো মনে পড়ছে না? কতদিন সম্রাটের কাছে আছো তুমি?

কয়েক মাস।

কাবুলের বাসিন্দা তুমি?

না শাহ্জাদা—কাবুল আমার মাতৃভূমি নয়।

তবে?

আমি একজন রাজস্থানী।

রাজস্থানী!

জী।

রাজস্থান তো শুনেছি ভারতেরই এক অংশ—

ঠিকই শুনেছেন শাহ্জাদা।

সুদূর রাজস্থান থেকে নারী হয়ে তুমি কাবুলে এলে কি করে মরিয়ম ?

ভাগ্য আমায় টেনে এনেছে শাহ্‌জাদা।

ভাগ্য ?

তাছাড়া আর কি বলব। কথাটা বলে পুনরায় হুমায়ুনকে সসম্ভ্রমে কুর্নিশ জানিয়ে বলে, অনুমতি করেন তো আমি আমার তাঁবুতে ফিরে যাই—

মরিয়ম ?

মুখ তুলল চন্দনা।

একটা অনুরোধ যদি করি তুমি শুনবে না ?

অনুরোধ কেন শাহ্‌জাদা—আদেশ করুন—

না, না—আদেশ নয়। অনুরোধ। তোমার গান শুনে আমার তৃপ্তি হয় নি, আর একটা গান গাইবে ?

চন্দনা চুপ করে থাকে। বুঝতে পারে না ঠিক সেটা উচিত হবে কিনা।

অসুবিধে আছে বোধ হয় ?

না, না—শাহ্‌জাদা অসুবিধা কি—কিন্তু—

তবে ?

আপনি যদি আপত্তি না থাকে, আমার তাঁবুর মধ্যে আসেন।

না, না—আপত্তি কিসের চলো।

হুমায়ুন মরিয়মের পিছনে পিছনে তার তাঁবুর মধ্যে গিয়ে প্রবেশ করল।

ওদের তাঁবুর মধ্যে প্রবেশ করতে দেখেই দাসী আনোয়ারা তাড়াতাড়ি এগিয়ে আসে এবং হুমায়ুনকে চিনতে পেরে সঙ্গে সঙ্গে আভূমি নত হয়ে কুর্নিশ জানায়, বন্দেগী শাহ্‌জাদা—

মরিয়মই শাহ্‌জাদাকে বসবার জন্য একটি আসন এগিয়ে দেয় সসম্ভ্রমে।

দীপাধারে দীপ জ্বলছিল এবং সেই দীপের মৃদু আলোকে তাঁবুর অভ্যন্তর মৃদু আলোকিত। ছোট তাঁবুটি কিন্তু পরিচ্ছন্ন। হুমায়ুন মরিয়মের এগিয়ে দেওয়া কাষ্ঠাসনে উপবেশন করল।

প্রদীপালোকে মরিয়মের মুখের দিকে তাকাল হুমায়ুন। অপূর্ব সুন্দরী নারী। সারা দেহে যৌবন যেন টলমল করছে।

তাঁবুর পর্দাটা ফেলে দিয়েছিল আনোয়ারা, মরিয়ম হুমায়ুনের দিকে তাকিয়ে বলে, শাহ্‌জাদা, আমার পরম সৌভাগ্য আপনি অনুগ্রহ করে সামান্যা এক নর্তকীর আবাসে পদার্পণ করেছেন। বহু সম্মানিত অতিথি আপনি আমার। আমাদের রেওয়াজ আছে অতিথিকে আপ্যায়ন করা—কিন্তু আমার এখানে একমাত্র মিষ্টি শরবৎ ছাড়া তো আর অন্য কোন পানীয় নেই শাহ্‌জাদা।

না, না—কোন পানীয়ের প্রয়োজন নেই—তুমি গাও আমি শুনি।

মরিয়ম হুমায়ুনের অল্প দূরে ভূমিতলে বিস্তৃত গালিচার উপরেই উপবেশন করল হাঁটু দুটি ভাঁজ করে।

মরিয়ম।

বলুন শাহজাদা।

একটু আগে তুমি যে গানটি গাইছিলে—

আমাদের রাজস্থানের দেশীয় সংগীত।

তাই শব্দগুলো আমার কানের অপরিচিত মনে হচ্ছিল। কিন্তু তাহলেও সুরটি বড় মর্মস্পর্শী। ঐ গানটির অর্থ কি মরিয়ম?

মরিয়ম মৃদু কণ্ঠে বলে, আমার দেশ—আমার জন্মভূমি—তোমার মাটি—তোমার পাহাড়—তোমার অরণ্যানী—ধূ ধূ মরুপ্রান্তর—তোমার নদী—তোমার ঝরণা—সে যে আমার রক্তে রক্তে মিশে আছে। যেখানে যত দূরেই যাই না কেন তোমাকে ভুলবো কেমন করে! তুমি আমার কল্পনা—আমার স্বপ্ন—আমার আশা আকাঙ্ক্ষা ভালবাসা—আমার সাধনার স্বর্গ—

সুন্দর ভাবটি—ঐ গানটিই আবার গাও শুনি!

মরিয়ম মৃদু কণ্ঠে গান ধরে।

একটি দুটি—পর পর তিনটি গান গাইলো মরিয়ম হুমায়ুনের অনুরোধে। একের পর এক সুরের মধ্যে যেন তন্ময় হয়ে গিয়েছিল হুমায়ুন। খেয়াল ছিল না সম্রাটের জরুরী আদেশ সে এখনো রেজা খাঁকে জানায় নি। আজ রাত্রেই সব গুটিয়ে প্রত্যুষে যাত্রা করতে হবে। খেয়াল হতেই তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়াল হুমায়ুন। বড় মিষ্টি গলাটি তোমার মরিয়ম কিন্তু তার মধ্যে মনে হলো তোমার কণ্ঠে কোথায় যেন একটা করুণ বিষাদের সুর জড়িয়ে আছে।

মরিয়ম কোন জবাব দেয় না। মাথা নীচু করে থাকে।

একটা কথা জিজ্ঞাসা করবো মরিয়ম?

কি কথা শাহ্‌জাদা?

এখানে কি তুমি সুখী নও?

সম্রাট আমাকে অত্যন্ত স্নেহ করেন শাহ্‌জাদা।

হুমায়ুন প্রত্যুত্তরে নিঃশব্দে মৃদু হাসলো, তারপর বললে, আচ্ছা—আজ তাহলে আমি চলি,—কথাটা বলে অগ্রসর হতে গিয়েও আবার থমকে দাঁড়াল হুমায়ুন। একটু যেন ইতস্তঃ করলো, তারপর তার নিজের অঙ্গুলী থেকে নিজের নামাংকিত একটি অঙ্গুরীয় খুলে বললে, মরিয়ম—আমার নামাঙ্কিত এই অঙ্গুরীয়টি তুমি রাখ।

কেমন যেন বিস্ময়ে মরিয়ম হুমায়ুনের দিকে তাকায় নিঃশব্দে।

রাখ এটি—সম্রাটের ও আমার অধীনস্থ যে কোন লোককে এই অঙ্গুরী দেখিয়ে তাকে তুমি যা নির্দেশ করবে তাই সে পালন করবে।

কিন্তু শাহ্‌জাদা—

রাখ। হয়ত কখনো কোন কাজ দিতে পারে এটা তোমায়।

সসম্ভ্রমে হাত পেতে অঙ্গুরীয়টি নিয়ে শাহ্‌জাদাকে কুর্নিশ জানায় মরিয়ম।

হুমায়ুন আর দাঁড়াল না—মরিয়মের তাঁবু থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেল। তাঁবুর খোলা দ্বারপথে একঝলক নৈশ বায়ু এসে তাঁবুর মধ্যস্থিত দীপশিখাটি বারেকের জন্য কাঁপিয়ে দিয়ে গেল।

হুমায়ুন তার শিবিরে প্রত্যাবর্তন করে তখনি শিবিরাধ্যক্ষকে ডেকে পাঠাল। রেজা খাঁর বয়স হয়েছে—কিন্তু এখনো সে রীতিমত কর্মঠ। রেজা খাঁ হুমায়ুনের শিবিরে প্রবেশ করে কুর্নিশ জানায়, শাহজাদা আমাকে স্মরণ করেছেন ?

হ্যাঁ—সম্রাট আদেশ দিয়েছেন আজ রাত্রির মধ্যেই সব তাঁবু গুটিয়ে ফেলতে।

আজ রাত্রেই ?

হ্যাঁ।

কিন্তু শাহজাদা তা কি সম্ভব ?

প্রত্যূষেই যাত্রা করবো আমরা। যাও যা বললাম ব্যবস্থা করো গে।

রেজা খাঁ আর দ্বিরুক্তি করে না, সম্রাটের আদেশ—আদেশ এবং তা পালন করতেই হবে।

কিছুক্ষণের মধ্যে সর্বত্র সাড়া পড়ে যায়। খট্‌খট শব্দ রাত্রির স্তব্ধতায় ছড়িয়ে পড়ে—লোকজনের ছুটাছুটি ও কর্মব্যস্ততা।

হুমায়ুন তাঁবুর বাইরে এসে দাঁড়ায়। রাত্রির তৃতীয় প্রহর। মাথার উপর অগণিত নক্ষত্র জ্বলজ্বল করছে। নৈশ রাত্রির একটা বিচিত্র রূপ আছে নিজস্ব। গাঢ় স্তব্ধতার মধ্যে সেই রূপ যেন মৌন এক বিস্ময়ে থম থম করে। বহু মানুষের কর্মব্যস্ততার কোলাহল শোনা যাচ্ছে।

নতুন এক দেশে চলেছে তারা। ভারত—হিন্দুস্থান। সেখানকার মাটি পাহাড় অরণ্য নদনদী কত কাহিনীই না আজ পর্যন্ত হুমায়ুন শুনেছে। সেখানকার মানুষজন, তাদের আচার-আচরণ সবই অজানা।

আব্বাজীর ইচ্ছা সেখানেই নতুন করে রাজ্যের পত্তন করা হবে। তা কি সম্ভব হবে ? কে জানে ? আল্লাহর ইচ্ছা কি কে জানে।

ক্রমশঃ অন্ধকার ঝাপসা হয়ে আসছে। পূর্ব দিগন্তে একটা চাপা আলোর আভাস ফুটে উঠছে ক্রমশঃ যেন। হঠাৎ আবার মরিয়মের কথা মনে পড়ে হুমায়ুনের। রাজস্থানী। কিন্তু মরিয়ম নাম। মুসলমানী। মরিয়ম চমৎকার গান গায়। কি মিষ্টি কণ্ঠস্বর। কিন্তু কণ্ঠে যেন কোথায় একটা বিষাদের সুর। নিশ্চয়ই কোন দুঃখ আছে তার মনে। কিসের দুঃখ মরিয়মের ?

যাত্রা শুরু হলো আবার। বিরাট বাহিনী চলেছে। দুটো দিন ও দুটো রাত ক্রমাগত চলে চলে বাবুরের বিরাট বাহিনী এসে পৌঁছালো চেনাব নদীর তীরে। চেনাব—ভারি মিষ্টি নামটি, যেন দুরন্ত যৌবনবতী এক নারী। আপন রূপের গরিমায় যেন সর্বক্ষণ টলমল করছে। নেচে নেচে চলেছে।

বাবুর আদেশ দিল আপাততঃ এখানেই শিবির স্থাপনা করা হোক। দুটো দিন বিশ্রাম এখানে।

চেনাব নদীর তীর থেকে কিছু দূরে বিরাট এক দুর্গ। সেই দুর্গের দিকে চেয়ে চেয়ে বাবুর ভাবে—ঐ দুর্গটি সর্বপ্রথম অধিকার করতে হবে।

শিবির স্থাপনার চারিদিকে তোড়জোড় চলেছে—বাবুর অশ্বারূঢ় হয়ে জায়গাটার আশপাশ দেখবার জন্য বের হয়ে পড়ে। সঙ্গে চলেছে প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষ।

জায়গাটি বড় চমৎকার তাই না ? সৈন্যাধ্যক্ষের দিকে তাকিয়ে বলে বাবুর।

হাঁ জাঁহাপনা।

আমি ভাবছি কি জান ?

কি ?

শিয়ালকোটের জনসাধারণকে ভাবছি এইখানেই নিয়ে আসবো।

সে খুব ভাল হবে আলমপনাহ।

কিন্তু রৌদ্রের তেজ কি প্রচন্ড দেখেছো ?

রৌদ্রের তেজ তো এদেশে একটু বেশীই শাহেনশা। তাছাড়া এখনো তো শীতের আমেজ আছে। গ্রীষ্মে শুনেছি এমন প্রচন্ড তাপ যে—গা হাত পা মুখ যেন জ্বলে যায়।

তুমি কি কাবুলেই আবার ফিরে যেতে চাও ?

সে কি জাঁহাপনা!

সেই রকমই মনে হচ্ছে যেন।

সম্রাট আমাকে ভুল বুঝবেন না।

॥ ৪২ ॥

চতুর্থবার যখন যবনসম্রাট বাবুর ভারত লুণ্ঠন করতে আসে, সে সময় আফগান দৌলত খাঁর দুই পুত্র গাজি খাঁ ও দিলওয়ার খাঁ গোপন পত্র মারফৎ যবন সম্রাটের প্রতি তাদের আনুগত্য জানায়। এবং যবনসম্রাটকে ভারত আক্রমণের প্ররোচনা দেয়।

বাবুর লাহোরে পেঁাছাবার পর সেখানে তাঁর বাহিনী নিয়ে দিল্লীর সম্রাট ইব্রাহিম লোদীর সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে তার যুদ্ধ হলো।

যেসব আফগান আমীররা তখনো ইব্রাহিমের পক্ষে ছিল তারা ইব্রাহিমের স্বার্থে বাবুরের সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে প্রাণ দিয়ে যুদ্ধ করল কিন্তু দুর্ভাগ্য তারা বাবুরের দুর্ধর্ষ তাতার বাহিনীর হাতে পর্যুদস্ত হলো। প্রচন্ড আক্রমণকে তারা প্রতিরোধ করতে না পেরে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে গেল। বাবুরের সৈন্য লাহোর শহর অধিকার করে সমগ্র বাজার ভস্মীভূত করল।

ঐ যুদ্ধে দৌলত খাঁ ও তার দুই পুত্র গাজি খাঁ ও দিলওয়ার খাঁ যবনসম্রাটের সহায়তা করায় তাদের ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।

কিন্তু মনে মনে দৌলত খাঁ ও তার পুত্রদের মতলব ছিল অন্য। কাঁটা দিয়ে কাঁটা উদ্ধার করা। কাজেই কাজটুকু হাসিল হবার পরই তারা মতলব আঁটতে থাকে কি করে যবনসম্রাটের আধিপত্য নষ্ট করা যায়।

কিন্তু হতভাগ্যরা জানত না বিশ্বাসঘাতকতা এমনি এক দুমুখো অস্ত্র যে শেষ পর্যন্ত সেই অস্ত্রে নিজেকেও বিপন্ন হতে হয়—বিশ্বাসঘাতকতার চরম মূল্য দিতে হয়।

দৌলত খাঁ শঠতা করে যবনসম্রাট বাবুরকে জানায় যে একদল সৈন্য তার

অগ্রগতিকে রোধ করবার জন্য অপেক্ষা করছে—তাদের অবিলম্বে ছত্রভঙ্গ করবার জন্য যবনসম্রাট যদি অবিলম্বে একদল সৈন্য আগেভাগে পাঠিয়ে দেন তো ভাল হয়।

সরল বিশ্বাসেই বাবুর দৌলত খাঁর পরামর্শ মত কাজ করবার জন্য যখন প্রস্তুত হচ্ছে সেই সময় দৌলত খাঁর পুত্র দিলওয়ার খাঁর কাছ থেকে এক গোপন পত্র এলো। সে জানিয়েছে—মহামান্য সম্রাট—আপনি আমার পিতার কথায় বিশ্বাস করবেন না। আপনাকে বিপদে ফেলার ওটা একটা চক্রান্ত মাত্র।

পত্র পেয়ে বাবুরের মনে সঙ্গে সঙ্গে সন্দেহ জাগে। ওরা দেশদ্রোহী—বিশ্বাসঘাতক—দৌলত খাঁ ও তাঁর দুই পুত্র। কাজেই বাবুর আর কালবিলম্ব না করে অবিলম্বে দৌলত খাঁ ও গাজি খাঁকে বন্দী করল।

পরে অবিশ্যি তারা যখন জানায় তারা বিশ্বাসঘাতক নয় আসলে দিলওয়ারই বিশ্বাসঘাতক ও চক্রান্তকারী—বাবুর ওদের মুক্তি দেয়। মুক্তি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দৌলত খাঁ ও গাজি খাঁ পালায়।

ঐ ব্যাপারের পর বাবুর সব দিক বিবেচনা করে সেবার আর দিল্লীর দিকে অগ্রসর হওয়া যুক্তিসঙ্গত মনে করে নি। লাহোরেই কিছুকাল অবস্থান করে বাবুর। তারপর একদিন লাহোর থেকে শতদ্রু নদী অতিক্রম করে কাবুলে ফিরে এসেছিল। কিন্তু তৎসত্ত্বেও সিন্ধুনদের অপর দিকে একটা স্থায়ী ঘাঁটি গড়ে তুলেছিল বাবুর।

ঐবারের অভিযানে সম্রাট ইব্রাহিমের ভ্রাতা সুলতান আলাউদ্দীনও তার সঙ্গে গোপনে চুক্তি করে হাত মিলিয়েছিল সম্ভবত হিন্দুস্থানের সম্রাট হবার লোভে।

এদিকে বাবুর সিন্ধুনদের ওপার পৌঁছাবার সঙ্গে সঙ্গেই গোপন পার্বত্য অঞ্চল থেকে দৌলত খাঁ ও গাজি খাঁ যারা তখন মুক্তি পেয়ে পালিয়ে এসে ঐ খানেই গোপনে অবস্থান করছিল কিছু সৈন্য নিয়ে এসে দিলওয়ারকে বন্দী করল। তারপর দ্রুতগতিতে এগিয়ে গিয়ে আলাউদ্দীনকেও যুদ্ধে পরাস্ত করল। বেগতিক দেখে আলাউদ্দীন কাবুলে একেবারে পালিয়ে গেল।

বাবুর আলাউদ্দীনকে আশ্রয় দিল এবং শীঘ্রই সৈন্যসামন্ত দিয়ে আলাউদ্দীনকে পুনরায় হিন্দুস্থানের দিকে পাঠিয়ে দিল এবং তার সেনাধ্যক্ষদের নির্দেশ দিল যাতে তারা আলাউদ্দীনকে সাহায্য করে দিল্লী অভিযানে।

চতুর দৌলত খাঁ গুপ্তচর-মুখে ঐ সংবাদ পূর্বাহ্নেই পেয়ে বিলম্ব না করে আলাউদ্দীনকে এক পত্র দিল—তাকে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়ে দিল্লীর অভিযানে। উভয়ের মধ্যে তখন এক সন্ধি হয়। এবং সেই সন্ধির অন্যতম চুক্তি অনুযায়ী বাবুরের অধিকৃত সমগ্র পাঞ্জাব অঞ্চল পড়লো দৌলত খাঁর অধীনে।

বাবুর ঐ সংবাদ পেয়ে রীতিমত ক্রুদ্ধ হয়ে আলাউদ্দীনকে সাহায্যের যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল সেটা নাকচ করে দিল।

মহারাণা সংগ্রাম সিংহের মন্ত্রণাকক্ষে যখন রতন সিং এসে প্রবেশ করল তখন মহারাণা ঐ ঘটনারই বিবৃতি দিচ্ছিল। জরুরী বার্তাবহের কাছে অবিলম্বে মহারাণা তাকে স্মরণ করেছে জেনে রতন সিং খুব বিস্মিত হয় নি—কারণটা অনুমান করতে পেরেছিল।

গুপ্তচরেরা কয়েকদিন আগেই সংবাদ এনেছে যবনসম্রাট বাবুর আবার তার বিরাট বাহিনী নিয়ে—দুর্গম গিরিপথ অতিক্রম করে হিন্দুস্থানের দিকে এগিয়ে আসছে। এবং এবারের অভিযান নাকি আর লুণ্ঠন নয়—ভারতের মাটিতে চিরস্থায়ী বসবাস ও রাজত্ব বিস্তার। তার লোভের থাবা সুদূরপ্রসারী। সমগ্র হিন্দুস্থানকেই এবারে সে গ্রাস করতে বদ্ধপরিকর। দিল্লী ও পাঞ্জাব যদি গ্রাস করতে পারে যবনসম্রাট তাহলে বঙ্গদেশ, মালব ও গুজরাটে তার আধিপত্য বিস্তার করতে দেরি হবে না। তারপর মরুস্থলী—রাজস্থানকেও নিষ্কৃতি দেবে না।

গুরুদেব বলেছেন, যবনের ঐ অগ্রগতিকে এবারে আর কেউ রোধ করতে পারবে না। হিন্দুস্থান এবারে যবনের পদানত হবে।

মন্ত্রণাকক্ষের মধ্যস্থলে একটি উ'চু আসনে মহারাণা উপবিষ্ট—তাকে ঘিরে রয়েছে—চিতোরগড়ের প্রধানরা—সেনাধ্যক্ষ—নগরাধ্যক্ষ—অস্ত্রাগার-রক্ষক সকলেই। কক্ষমধ্যস্থিত দীপালোকে রতন সিং একবার চারিদিকে দৃষ্টিপাত করল তারপর এক পাশে গিয়ে উপবেশন করল।

মহারাণা সমবেত সেনাধ্যক্ষদের সম্বোধন করে বলে, যবনসম্রাট বাবুর যতদূর সংবাদ পেয়েছি গুপ্তচরদের মুখে তার বিপুল সৈন্যবাহিনী নিয়ে শিয়ালকোট পর্যন্ত এসে পেঁাচেছে। দু-একদিনের মধ্যেই হয়ত যবনসম্রাট পার-সার-উরে এসে পেঁাছাবে।

একজন সেনাধ্যক্ষ ঐ সময় প্রশ্ন করে, দৌলত খাঁ ও ইব্রাহিম লোদী কি নিষ্ক্রিয় হয়ে বসে আছে নাকি? তারা বাধা দেবে না যবনদের?

অবশ্য সংবাদ পেয়েছি লাহোরের রাভী নদীর তীরে—দৌলত খাঁ যবন সম্রাটকে বাধা দেবার জন্য তার সৈন্যবাহিনী নিয়ে শিবির স্থাপন করেছে তবে বাবুরকে তারা বাধা দিতে পারবে বলে আমার মনে হয় না। আর তা যদি হয় তো পাঞ্জাব—দিল্লী—আগ্রা ও গোয়ালিয়র জয় করে নিতে বাবুরের কোন বেগই পেতে হবে না। তার মানেই নিশ্চয়ই আপনারা বুঝতে পারছেন বাবুর হিন্দুস্থানে কায়েমী হয়েই বসবে এবারে তারপর এই রাজস্থান—আমরাও বিপন্ন হবো—আমাদের তাই এখনই ঐ যবনবাহিনীর অগ্রগতিকে সমস্ত শক্তি দিয়ে বাধা দিতে হবে। মহারাজ গাঙ্গও তাই জানিয়েছেন আমাকে, তিনিও প্রস্তুত—

সকলে একসঙ্গে বলে ওঠে, আমরাও প্রস্তুত মহারাণা।

সংগ্রাম সিংহ বলে, আমিও জানতাম—আপনারা আমার মতেই সায় দিবেন। তাহলে আপনারা আর বিলম্ব করবেন না—প্রস্তুত হন।

রাজস্থানের অন্যান্য রাজারা? তাঁরা কি বলেছেন? অপর এক সৈন্যাধ্যক্ষ প্রশ্ন করে।

সবাই প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন আমার পতাকাতলে সমবেত হবেন।

সেরাত্রের মত মন্ত্রণা শেষ করে মহারাণা সংঘ যখন নিজের বিশ্রামকক্ষে ফিরে এলো রত্নাবতীর সঙ্গে তার দেখা হলো। রত্নাবতী তখন মহারাণার বিশ্রামকক্ষেই তার অপেক্ষায় বসে ছিল।

রত্নাবতী, কি সংবাদ ?

তোমার সঙ্গে আমার কিছু কথা ছিল।

কি কথা ?

তুমি নিশ্চয়ই একটা সংবাদ পেয়েছো রাঠোর রাজকুমারী চিতোরগড়ে এসে আশ্রয় নিয়েছে।

জানি।

একটা কথা জিজ্ঞাসা করবো ?

কি কথা ?

সত্যিই কি তুমি তাকে বিবাহ করতে চাও ?

রাণা সংঘ মৃদু হাসলো।

তারপর বললে, তার ভাই মহারাজ গাঙ্গের তাই ইচ্ছা ছিল এবং আমারও যে খুব অনিচ্ছা ছিল তাও নয়, কিন্তু—

কিন্তু কি ?

কিন্তু সে ইচ্ছা এখন আর আমার নেই।

কেন ?

প্রথমতঃ আমার বয়েস হয়েছে—দ্বিতীয়তঃ পার্বতী একেবারে কিশোরী—

তাই কি ?

তাই কেবল নয়—

তবে ?

সে ইতিপূর্বেই বীরেন্দ্র সিংহ নামে এক সৈনিককে স্বেচ্ছায় স্বামীত্বে বরণ করেছে—কিন্তু তুমি জানতে পারলে কি করে মহিষী যে রাঠোর রাজকুমারী পার্বতী বর্তমানে চিতোরগড়ে।

জেনেছি—

কেমন করে জানলে তাই তো জিজ্ঞাসা করছি—

মেবারের মহিষীকে যে সব কিছুই জানতে হয়—, যাক সে কথা, এখন তাহলে পার্বতীর কি ব্যবস্থা করবে—স্থির করেছো কিছু ?

না—ওসব তুচ্ছ ছোটখাটো ব্যাপার চিন্তা করবার মত বর্তমানে সময় ও সুযোগ কোনটাই আমার নেই—সমগ্র ভারত আজ বিপন্ন সেই চিন্তাই এখন আমার সবার বড় চিন্তা—

ভারত বিপন্ন।

হ্যাঁ মহিষী, যবনসম্রাট বাবর আবার ভারতভূমিতে পদার্পণ করেছে তার বিরাট তাতার বাহিনী নিয়ে এবং যতদূর সংবাদ পেয়েছি এবারে আর লুণ্ঠন নয়—

তবে ?

ভারত অধিকারের স্বপ্ন দেখছে সে।

বাতুল—যবনসম্রাট বাতুল !

বাতুল নয় মহিষী—কারণ এই বিশাল ভারতভূমি তো কোন একটি শক্তিরই হাতে নয়—খণ্ড ছিন্ন বিক্ষিপ্ত—রাজস্থানেই দেখ না কত রাজা মহারাজা—তারপর পাঞ্জাব—দিল্লী—গুর্জর—বঙ্গদেশ—এক-এক স্থানে এক-একজনের আধিপত্য ! কাজেই দিল্লী ও পাঞ্জাব যদি যবনসম্রাটের কবলিত হয়—অন্যান্য ভূখণ্ডও তার কবলিত হতে দেরি হবে না।

ভারতের এই দুঃসময়েও সব পৃথক পৃথক হয়ে থাকবে ?

অন্য রাজ্যের কথা বলতে পারি না তবে সমগ্র রাজস্থান আমার পতাকাতলে এসে মিলিত হবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে।

তাহলে যুদ্ধ !

যুদ্ধ ছাড়া আর দ্বিতীয় পথ নেই মহিষী।

শঙ্করের কৃপায় নিশ্চয়ই আমরা জয়ী হবো প্রভু। তুমি কিছু চিন্তা করো না।

আমাদের মধ্যে যদি কেউ বিশ্বাসঘাতকতা না করে তো রাজস্থান বিপন্ন হবে না কিন্তু সেইখানেই আমার ভয়—

রাণা সংঘ মিথ্যা শঙ্কা করে নি। সেই বিশ্বাসঘাতকতা—দেশদ্রোহিতাই সমগ্র ভারতভূমিকে একদিন যবন সম্রাটের হাতে তুলে দিয়েছিল। ভারতের স্বাধীনতাকে দূর দেশাগত লুণ্ঠনকারী তাতার যবনদের হাতে তুলে দিয়েছিল।

যবনসম্রাট বাবুরের বিপুল বাহিনী এগিয়ে চলেছে। হিন্দুস্থানের মাটি তাদের পদভারে কাঁপছে।

শিয়ালকোট। শিয়ালকোটে পেঁছাবার পরই আগেরবারের মত আশপাশের পাহাড় ও বনাঞ্চল থেকে অসংখ্য জাঠ ও গুর্জর লুঠেরা অতর্কিতে যবনবাহিনীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে লুঠতরাজ শুরু করে দিল। বাবুর একেবারে যেন ক্ষেপে গেল। তার সৈন্যাধ্যক্ষ আহামেদি পারওয়ানচিকে ও মহম্মদ গোকুলতাসকে হুকুম দিল, যেমন করেই হোক ঐ লুঠেরা জাঠ ও গুর্জরদের উপযুক্ত শিক্ষা দিতে হবে।

আহামেদি পারওয়ানচি বহুসংখ্যক সৈন্য নিয়ে আশপাশের বনাঞ্চল ও পাহাড়গুলো ঘিরে ফেলল—ফলে বহুসংখ্যক জাঠ ও গুর্জর সৈন্যদের হাতে ধরা পড়লো। যারা বাবুরের সৈন্যদের হাতে ধরা পড়েছিল বাবুর নির্দেশ দিল প্রকাশ্য কোন স্থানে নিয়ে তাদের তরবারি দিয়ে টুকরো টুকরো করে কেটে ফেলতে।

জাঠ ও গুর্জরদের দমন করে সম্রাট বাবুর এবারে শিয়ালকোট থেকে যাত্রা করে পার-সার-উরে শিবির স্থাপন করলো।

চারিদিকে সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে আসছে। বাবুরের বিরাট তাতার বাহিনী চারিদিকে ছড়িয়ে—এখানে ওখানে আগুন জ্বলছে—সুরা ও ভাঙ্গ পান চলেছে—হৈ-হল্লা—চীৎকার।

বাবুর একাকী তার শিবিরের মধ্যে বসে ছিল। এতদুর পর্যন্ত নির্বিঘ্নেই অগ্রসর হয়ে এসেছে সে সকল বাধা অতিক্রম করে।

শিবিররক্ষী এসে কুর্নিশ করে দাঁড়াল।

কি সংবাদ?

আলমপনা—সেনাধ্যক্ষ গোকুলতাস জাঁহাপনার দর্শনপ্রার্থী।

যাও নিয়ে এসো।

একটু পরে গোকুলতাস এসে কুর্নিশ করলো।

কি সংবাদ গোকুলতাস?

শত্রুপক্ষের কয়েকজন লোক সম্রাটের দর্শনপ্রার্থী।

কি চায় তারা?

আপনাকে কিছু গোপন সংবাদ দিতে চায়।

কয়জন?

তিনজন।

যাও নিয়ে এসো তাদের এখানে।

সম্রাট বাবুর বিস্মিত হয় নি। দৌলত খাঁর পরিচয় থেকেই বাবুর বুঝতে পেরেছিল—দৌলত খাঁ ও দিলওয়ার খাঁর অভাব হবে না ভারতে এবং তারাই হবে তার অন্যতম শ্রেষ্ঠ গোপন ও মোক্ষম হাতিয়ার ভারতবিজয়ে।

তিনটি লোক এসে গোকুলতাসের সঙ্গে সম্রাটের শিবিরে প্রবেশ করলো।

সম্রাটকে অভিবাদন জানাল।

কি তোমার নাম? প্রথমজনকে প্রশ্ন করে বাবুর।

জাঁহাপনা বান্দার নাম মহম্মদ আলি—সম্রাটকে কিছু গোপন সংবাদ আমরা দিতে পারি—আপনার শত্রুপক্ষের—

কোনরকম ছলনা বা মিথ্যার আশ্রয় নিলে আমি তোমাদের তিন জনেরই শির নেবো জেনো—

নিশ্চয়ই নেবেন।

বেশ জানো যদি বলো, তারা যুদ্ধের জন্য ও আমার সৈন্যবাহিনীকে বাধা দেবার জন্য কতখানি প্রস্তুত হয়েছে?

লাহোরের দিকে রাভী নদীর তীরে তারা শিবির স্থাপনা করেছে।

সংবাদ সত্য তো?

আপনি কোন চর পাঠিয়ে সংবাদটা সত্য মিথ্যা যাচাই করে নিতে পারেন জাঁহাপনা।

ঠিক আছে—গোকুলতাস—তুমি আপাততঃ এদের বন্দীশিবিরে আটক করে রাখ আর অবিলম্বে ছোট একটি সৈন্যবাহিনী ওস্তাদ আলির অধীনে রাভী নদীর তীরে পাঠাও।

মহম্মদ গোকুলতাস সম্রাটকে কুর্নিশ জানিয়ে লোক তিনটিকে নিয়ে শিবির থেকে বের হয়ে গেল।

বিনিদ্র সম্রাট ওস্তাদ আলির প্রত্যাবর্তনের সংবাদের অপেক্ষায় নিজের শিবিরের মধ্যে অস্থিরভাবে পায়চারি করছিল। চারিদিক স্তব্ধ নিঝুম। রাত্রির তৃতীয় প্রহরে ওস্তাদ আলির কাছ থেকে সংবাদ এলো।

সম্রাটের বিরাট বাহিনীর আগমনের সংবাদ পেয়ে শত্রুপক্ষের সৈন্যরা আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে ছত্রভঙ্গ হয়ে পলায়ন করেছে। রাভী নদীর তীরে আশেপাশে কোথায়ও নেই তারা।

বাবুর নিশ্চিন্তে এবারে গিয়ে শয্যাগ্রহণ করে। পরের দিন প্রত্যুষেই আর এক সংবাদ। দৌলত খাঁর চর এসেছে।

বাবুর অবিলম্বে তাকে তার শিবিরে ডেকে পাঠাল।

জাঁহাপনা আমি দৌলত খাঁর বার্তাবহ—

কি সংবাদ?

আমার প্রভু জানিয়েছেন—গাজি খাঁ পালিয়ে পাহাড়ে আশ্রয় নিয়েছে এবং তিনি জানাতে বলেছেন—সম্রাট যদি তাকে ক্ষমা করেন ও প্রতিশ্রুতি দেন তার প্রতি আর কোন রোষ রাখবেন না—তাহলে তিনি তার রাজ্য সম্রাটের হাতে তো তুলে দেবেনই সেই সঙ্গে চিরদিন সম্রাটের ক্রীতদাস হয়ে থাকবেন।

বাবুর কিছুক্ষণ চুপ করে রইলো তারপর লোকটিকে আপাততঃ নজরবন্দী করে শিবিরে রাখবার আদেশ দিয়ে তার অন্যতম সেনাধ্যক্ষ মির-মিরানকে একবার ডেকে আনার জন্য আদেশ দিল।

একটু পরে মির-মিরান সম্রাটের শিবিরে প্রবেশ করে কুর্নিশ জানাল, জাঁহাপনা—অধীনকে স্মরণ করেছেন?

হ্যাঁ মির-মিরান—তোমাকে অবিলম্বে গিয়ে একবার দৌলত খাঁর সঙ্গে দেখা করতে হবে—, বলে সংক্ষেপে বাবুর ব্যাপারটা বলে গেল।

মির-মিরান শুধায়, কিছু বলতে হবে তাকে?

॥ ৪৩ ॥

বাবুর বলে, ঐ শকুন লোভী বিশ্বাসঘাতক বুড়ো দৌলত খাঁকে এতটুকুও আর আমি বিশ্বাস করি না। হয়ত ও এবারে আবার আমার সঙ্গে নতুন কোন চাল চালবার ফন্দি এঁটেছে মনে মনে। শোন মির-মিরান, তুমি তোমার পুত্র আলি খাঁকেও সঙ্গে নেবে। ঐ বুড়ো শকুনটাকে এবারে আমি শায়েস্তা করবো স্থির করেছি।

সম্রাটের আদেশ নিশ্চয়ই প্রতিপালিত হবে।

একটু থেমে বাবুর বলতে লাগল, দৌলত খাঁর সঙ্গে দেখা করে বলবে, লোক মরফৎ যা সে বলে পাঠিয়েছে তা যদি সত্যিই তার মনের ইচ্ছা হয় তাহলে যে

দুটো তরবারি কোমরে ঝুলিয়ে সে আমার সঙ্গে যুদ্ধ করবে স্থির করেছিল—সেই তরবারি দুটো গলায় ঝুলিয়ে তাকে আমার কাছে এসে মাথা নীচু করে দাঁড়াতে হবে সর্বপ্রথম, তারপর অন্য আলোচনা এবং তোমার ঐ প্রস্তাবে যদি সে সম্মত না হয় তাহলে তাকে গুপ্তঘাতকের দ্বারা হত্যা করে তবে ফিরবে।

মির-মিরান কুর্নিশ জানিয়ে শিবির ত্যাগ করলো।

আর পার-সার-উরে অপেক্ষা করা সুবিবেচনার কাজ হবে না।

এবারে দ্রুতগতিতে এগিয়ে শত্রুসৈন্যার উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে শত্রুবাহিনীকে বিপর্যস্ত করতে হবে।

বাবুর তার সেনাধ্যক্ষদের ডেকে তখুনি শিবির তোলার আদেশ দিয়ে বললো, লাহোরের দিকে অগ্রসর হবো এবারে আমরা।

সাজ-সাজ রব পড়ে গেল। গত রাত্রি থেকেই যে নানা ধরনের শলা-পরামর্শ চলেছে সম্রাটের শিবিরে তার প্রধান প্রধান সেনধ্যক্ষদের নিয়ে ব্যাপারটা রণবীরের নজর এড়ায় নি। নজর এড়ায় নি তার সন্ধ্যার কিছু পরে মহম্মদ আলির সম্রাট-শিবিরে যাওয়া ও তারপর তাকে বন্দীশিবিরের মধ্যে তার অন্য দুজন সঙ্গীর সঙ্গে বন্দী করে রাখা। কে এরা, কি সংবাদ নিয়ে এসেছিল, আর কেনই বা সম্রাট এদের বন্দীশিবিরে বন্দী করে রাখল?

নিশ্চয়ই হিন্দুস্থানের কোন গুপ্তচর। কি সংবাদ এনেছে ওরা? রাজস্থানের কোন সংবাদ কি? সম্রাটের শিবিরে প্রধান প্রধান সেনাধ্যক্ষদের যেরকম ঘন ঘন আনাগোনা চলেছে তাতে করে মনে হয় রণবীরের বিশেষ কোন গুরুত্বপূর্ণ শলাপরামর্শই চলেছে।

ছোট একদল সৈন্যও সৈন্যাধ্যক্ষ ওস্তাদ আলির নেতৃত্বে চলে গেল রাতের অন্ধকারেই তীরবেগে অশ্ব ছুটিয়ে, তাও দেখল রণবীর। সম্রাট নিজেও লাহোরের দিকে অগ্রসর হচ্ছেন তাও জেনেছে।

বন্দীশিবিরের ভার সম্রাটের একজন সৈন্যাধ্যক্ষ মুনিম খাঁর উপর অর্পিত। ইতিমধ্যেই রণবীরের সঙ্গে মুনিম খাঁর সৌহার্দ্য গড়ে উঠেছিল। লোকটি তারই বয়েসী একজন রণনিপুণ তাতার।

চারিদিকে যাত্রার আয়োজন চলেছে—চারিদিকেই একটা ব্যস্ততা:

রণবীর একসময় মুনিম খাঁর সামনে গিয়ে উপস্থিত হলো।

রণবীর যে, কি খবর?

আমরা তাহলে রাত্রি পোহাবার আগেই রওনা হচ্ছি? রণবীর প্রশ্ন করে।

হ্যাঁ—সম্রাট সেই রকমই নির্দেশ দিয়েছেন। ভাল কথা রণবীর—

বলুন খাঁ সাহেব।

তুমি কিছুক্ষণের জন্য এখানে একটু থাকবে?

রণবীর বুঝতে পারে ব্যাপারটা—কারণ সে জানত ওস্তাদ আলির কন্যা জুলেখা তরুণ মুনিম খাঁর প্রণয়িনী। গোপনে দুজনার প্রণয়লীলা চলেছে কিছুদিন ধরে। সৈন্যাধ্যক্ষ ওস্তাদ আলি ব্যাপারটা এখনো কিছুই জানে না। রণবীর হেসে বলে, জুলেখার সঙ্গে দেখা করবেন বোধ হয়!

হ্যাঁ দোস্ত—দুদিন দেখা হয় না—মুনিম খাঁ বলে।

বেশ তো আমি এখানে রইলাম বন্দীশিবিরের প্রহরায়, আপনি যান।

বন্দীশিবিরে কিন্তু বিশেষ তিনজন বন্দী আছে।

ভয় নেই আপনার, আপনি যান।

মুনিম খাঁ সানন্দে তার প্রণয়িনীর সঙ্গে দেখা করবার জন্য তখুনি জেনানা শিবিরের দিকে পা চালাল।

চারিদিকে যাত্রার আয়োজন ও তোড়জোড় চলেছে—সবাই ব্যস্ত। জুলেখার সঙ্গে দেখা করার এই প্রকৃষ্ট সময়, তাছাড়া জুলেখার বাবা ওস্তাদ আলিও এখানে নেই।

রণবীর রীতিমত খুশিই হয়। না চাইতেই যে সুযোগটা এমনি করে তার হাতের মুঠোর মধ্যে এসে যাবে সে স্বপ্নেও ভাবে নি। রণবীর বিলম্ব করে না। তাড়াতাড়ি বন্দীশিবিরের মধ্যে গিয়ে প্রবেশ করে।

মহম্মদ আলির দুই সঙ্গী তখন নিশ্চিন্তে নিদ্রা দিলেও মহম্মদ আলি জেগেই ছিল। তার চোখে ঘুম ছিল না। তাতারসম্রাটকে বিশ্বাস নেই।

তাদের কথা সত্য প্রমাণিত হলেও যে বাবুর তাদের ছেড়ে দেবে তারই বা বিশ্বাস কি। অমন জরুরী সংবাদ নিয়ে এলো তারা তবু তাদের বন্দী করে রাখা হলো যখন। কে জানে সম্রাটের সত্যিকারের অভিপ্রায়টা কি?

রণবীরকে তাঁবুর মধ্যে প্রবেশ করতে দেখে মহম্মদ আলি ওর দিকে তাকাল ভয়ে ভয়ে। বেশভূষা দেখে মনে হয় কোন সৈন্যাধ্যক্ষই হবে।

রণবীরই প্রশ্ন করে, তোমরা লাহোর থেকে আসছো?

হ্যাঁ—কিন্তু আপনি কে!

আমি সম্রাটের একজন সৈন্যাধ্যক্ষ। মনে হচ্ছে কোন জরুরী সংবাদ নিয়ে সম্রাটের কাছে এসেছো তোমরা। অন্ধকারেই ঢিল ছোঁড়ে রণবীর।

এসেছিলাম তো—কিন্তু এখন দেখতে পাচ্ছি না এলেই বোধ হয় ভাল হতো।

কেন? রণবীর হাসল।

কোথায় ভেবেছিলাম প্রচুর পুরস্কার মিলবে তা নয় সোজা একেবারে বন্দী-শালায়।

পুরস্কার যে মিলবেই না বুঝলে কি করে?

সে কি আর বুঝতে পারছি না!

সম্রাট অবিবেচক নন।

কে জানে—বন্দী করেছে যখন—

সেটা হয়ত সত্যিই তোমরা সত্য সংবাদ এনেছো কিনা যাচাই করে দেখবার জন্য।

মিথ্যা সংবাদ আনবো কেন? সত্যিই রাভী নদীর তীরে দৌলত খাঁ সৈন্য সমাবেশ করেছে।

কত সৈন্য?

তা অনেক।

শোন—তোমাদের মুক্তির জন্য সম্রাটকে আমি অনুরোধ করতে পারি—

সত্যি বলছেন।

হ্যাঁ—তবে একটি শর্তে—

কি শর্ত?

রাজস্থানের কোন সংবাদ জানো?

কি সংবাদ জানতে চান?

রাজস্থানের রাজন্যবর্গও নিশ্চয়ই শুনেছে সম্রাট হিন্দুস্থান অভিযানে চলেছে—

শুনেছে বৈকি।

তা তারা কি করছে?

যতদূর জানি তারাও প্রস্তুত হচ্ছে।

ঠিক বলছো?

বললাম তো ঐ রকমই সংবাদ পেয়েছি।

দৌলত খাঁর পুত্র গাজি খাঁ কোথায় জান?

দৌলত খাঁর সঙ্গে দুর্গেই আছে।

কিন্তু রণবীর আর বেশী প্রশ্ন করবার সময় পেল না। বাইরে পদশব্দ শুনে ও তাড়াতাড়ি বন্দীশিবিরের বাইরে চলে এলো।

অনুমান তার মিথ্যা নয়—মুনিম খাঁই ফিরে আসছে।

কি হলো খাঁ সাহেব, জুলেখার সঙ্গে দেখা হলো।

হ্যাঁ হয়েছে—কিন্তু বেশী কথা হলো না, সে এখন খুব ব্যস্ত—

তাহলে এবারে আমি যাই?

বন্দীরা ঠিক আছে তো?

হ্যাঁ, শিবিরের মধ্যে গিয়ে দেখলাম ঠিকই আছে।

•

লাহোর দুর্গের অনতিদূরে সম্রাট বাবুরের বিরাট সৈন্যবাহিনীর শিবির পড়েছে।

কিন্তু দৌলত খাঁ এখনো দুর্গ থেকে আসে নি সম্রাটের ইচ্ছামত তার সঙ্গে দেখা করতে—তবে সে-কারণে সম্রাট তেমন চিন্তিত নয় কারণ তার বিরাট বাহিনী দুর্গ একপ্রকার ঘিরেই ফেলেছে। পলায়নের কোন পথই নেই খোলা দৌলত খাঁর সামনে।

তার দৃষ্টি এড়িয়ে দৌলত খাঁ কোথায়ও পালাবে তার কোন উপায়ই নেই।

একদিন দুদিন তিনদিন গেল কিন্তু দৌলত খাঁ বাবুরের সামনে এলো না।

আহমেদি পারওয়ানচি বললে, জাঁহাপনা, দৌলত খাঁর মতলবটা ঠিক আমি ভাল বুঝছি না। সে নিশ্চয়ই তার মতলব বদলেছে ইতিমধ্যে। মনে হচ্ছে শয়তানটা আমাদের অগ্রগতিকে আপাতত আত্মসমর্পণের টোপ ফেলে থামিয়ে রেখে অন্য মতলব মনে মনে করছে।

বাবুরের মনে হলো আহমেদির কথাটা যুক্তিসঙ্গত। বিশ্বাসঘাতক দৌলত

খাঁকে বিশ্বাস নেই।

তুমি কি করতে তাহলে পরামর্শ দাও আহমেদি। বাবুর প্রশ্ন করল।

কিছু সৈন্য নিয়ে আমরা দুর্গমধ্যে প্রবেশ করি।

তারপর ?

দুর্গ জয় করে ঐ শয়তানটাকে বেঁধে জাঁহাপনার কাছে নিয়ে আসবো শৃঙ্খলে।

তাই যাও—রণবীরকে তুমি সঙ্গে নাও।

সেটা কি যুক্তিসঙ্গত হবে আলমপনা ? হাজার হোক রণবীর একজন ভারত-বাসী—রাজপুত।

বাবুর মৃদু হাসলো, তারপর বললে, যতদূর সংবাদ আমি পেয়েছি হিন্দুস্থানে সত্যিকারের যারা বীর, দেশপ্রেমী ও যোদ্ধা, তারা ঐ রাজপুতই আহমেদি। আমাদের সবচাইতে বড় প্রতিদ্বন্দ্বী যদি কেউ হয় তো ঐ রাজ-পুতরাই—ওদের যদি আমরা পাশে পাই তো জেনো হিন্দুস্থানের মাটিতে অধিকার আমাদের কায়েমী ও দীর্ঘস্থায়ী হবে।

বিচক্ষণ তাতার সম্রাট বাবুর সেদিন ঠিক অনুমান করতে পেরেছিল মরুস্থলী রাজস্থানকে সর্বাগ্রে ছলে বলে কৌশলে—যেমন করেই হোক পাশে টেনে নিতে হবে নচেৎ তার হিন্দুস্থানের মাটিতে সাম্রাজ্য স্থাপনের স্বপ্ন দুদিনেই মিলিয়ে যাবে।

যা হোক আহমেদি আর প্রতিবাদ জানায় না। স্থির হয় রণবীর ও সে কিছুসংখ্যক সুদক্ষ তাতার সৈন্য নিয়ে পরের দিন সূর্য উদয়ের পূর্বেই দুর্গাভি-মুখে যাত্রা করবে।

মির-মিরান সম্রাটের পরিকল্পনাকে সমর্থনই করে।

আহমেদি পারওয়ানচি ভেবেছিল দৌলত খাঁ সহজে আত্মসমর্পণ করবে না বা খুব সহজে তাকে সম্রাটের কাছে আনা যাবে না ; কিন্তু তেমন কোন প্রতি-বন্ধকই এলো না দৌলত খাঁর দিক থেকে। দুর্গের সৈন্যরা কোনরূপ বাধা দিল না। দৌলত খাঁ বললো, আমি আজই উপযুক্ত সম্মান ও উপঢৌকন নিয়ে সম্রাট সমীপে উপস্থিত হচ্ছিলাম—চলুন আমি প্রস্তুত।

কিন্তু আপনার পুত্র গাজি খাঁকে দেখছি না ? আহমেদি বলে।

সে খুব অসুস্থ কদিন হতে—বলতে গেলে শয্যাগত, সেই কারণেই সম্রাটের সামনে আমি হাজির হতে পারি নি এ কয়দিন।

শয্যাগত !

হ্যাঁ—তাছাড়া আমিই তো যাচ্ছি সম্রাটের কাছে।

আহমেদি আর প্রতিবাদ জানাল না। দৌলত খাঁকে নিয়ে সম্রাটের শিবিরের দিকে অগ্রসর হলো।

সম্রাট বাবুর তার প্রধান পরিজন দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে বসেছিল, দৌলত খাঁকে সেখানে নিয়ে আসা হলো এবং সম্রাটের পূর্ব নির্দেশমত দুটি তরবারি

তার কোষ থেকে মুক্ত করে আহমেদি তার গলায় পূর্বেই ঝুলিয়ে দিয়েছিল।

একজন সৈন্যাধ্যক্ষ বললে, মহামান্য সম্রাট—দীন দুনিয়ার মালিক তোমার সামনে উপবিষ্ট দৌলত খাঁ, তাঁকে কুর্নিশ কর—নতজানু হয়ে।

দৌলত খাঁ নতজানু না হয়েই কুর্নিশ করল।

আহমেদি তখন দৌলত খাঁর পায়ে ধাক্কা দিয়ে তাকে হাটু গেড়ে বসিয়ে দিল কতকটা বলপ্রয়োগ করেই ভূমিতে।

কুর্নিশ কর! কঠোর কণ্ঠে আবার আদেশ দিল সৈন্যাধ্যক্ষ।

দৌলত খাঁ এবারে নতজানু অবস্থাতেই কুর্নিশ জানাল।

পূর্ব থেকেই বাবুর একজন হিন্দুস্থানী দোভাষীকে তার পাশে রেখেছিল। তাতার সম্রাটের বক্তব্যকে সেই হিন্দুস্থানী দোভাষীই হিন্দুস্থানী ভাষায় তর্জমা করে সম্রাটের সঙ্গে বলে যেতে লাগল।

বাবুর বললে, দৌলত খাঁ, তুমি আমার পিতার বয়সী বলে তোমাকে পিতৃস্থানীয়ের মতই বরাবর সম্মান জানিয়েছি, তোমাকে ও তোমার পরিবারবর্গ—জেনানাদের বেলুচিদের অত্যাচার ও অসম্মানের হাত থেকে ও দিল্লীর সম্রাট ইব্রাহিমের দাসত্বের হাত থেকে একদিন বাঁচিয়েছিলাম বলেই কি তুমি আমারই নিযুক্ত লোক ইব্রাহিম-ভ্রাতা আলাউদ্দীনের সঙ্গে আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছিলে। মূর্খ বিশ্বাসঘাতক আলাউদ্দীন তার কাজের উপযুক্ত ফলই পেয়েছে—

এ সংবাদ সম্পূর্ণ মিথ্যা সম্রাট।

মিথ্যা! এখনো নিজের অপরাধ ও বিশ্বাসঘাতকতাকে গোপন করবার চেষ্টা করছো? তুমি অত্যন্ত অকৃতজ্ঞ—নচেৎ সেবারে আমি যে দেশগুলো অধিকার করে—যার রাজস্ব সাত লক্ষের উপর, তোমার হাতে তুলে দিয়ে গিয়েছিলাম, তুমি সেই সব দেশের লোকদের মধ্যে বিশৃংখলা সৃষ্টি করে আমার বিরুদ্ধাচরণ করতে দুঃসাহসী হতে না?

দৌলত খাঁ এবারে মাথা নীচু করে থাকে। সে বুঝতে পেরেছিল বাবুরের কিছুই আর জানতে বাকী নেই। তার সব কিছুই ইতিমধ্যে বাবুর যেমন করেই হোক জানতে পেরেছে।

আমাকে এবারের মত ক্ষমা করুন সম্রাট। আর এমন ভুল আমার দ্বারা কখনো হবে না।

নানাভাবে দৌলত খাঁ অনুনয়-বিনয় করতে লাগল, কিন্তু বাবুরের মন গলল না।

বাবুর বললে, ঠিক আছে, তোমাকে প্রাণেও আমি মারব না এবং তোমার পরিবারবর্গকেও আমি মুক্তি দিচ্ছি। কিন্তু যে ভূ-সম্পত্তি তোমার হাতে আমি তুলে দিয়েছিলাম তা আর তোমার অধিকারে থাকবে না।

দয়া করুন সম্রাট—আমাকে তাহলে ভিক্ষা করতে হবে—সপরিবারে।

ভিক্ষা করবে কেন—তোমার অধীনে যে তোমার উপজাতি প্রজারা আছে, তারা ও তাদের গ্রামগুলো তোমার অধিকারে থাকবে—তবে মির-মিরানের শিবিরের

কাছাকাছি তোমাকে বাস করতে হবে এখন থেকে।

সম্রাট কি আমাকে তাহলে আমার দুর্গ থেকেও বঞ্চিত করছেন ?

হ্যাঁ—আজ ১৬ই রবিয়ল মাসের—সামনের ২২শে শনিবারের মধ্যে তোমাকে তোমার সমস্ত পরিবারবর্গ ও জেনানাদের নিয়ে লাহোর দুর্গ ত্যাগ করে চলে যেতে হবে—সংগে কোন ধনদৌলত আনতে পারবে না। যাও, আমার হুকুম যদি অক্ষরে অক্ষরে না পালিত হয় তো জেনো তোমার শিরশ্ছেদের আদেশ আমি দেবো—ঐ লাহোর দুর্গে কামান দাগিয়ে আমি ধূলিসাৎ করে দেবো।

মাথা নীচু করে দৌলত খাঁ সম্রাটের শিবির ত্যাগ করে চলে গেল।

প্রথম রবিয়ল মাসের ২২শে শনিবার। সম্রাট বাবুর দুর্গের নিকটবর্তী মিলওয়াত দুর্গ ফটকের বিপরীত দিকে একটা পাহাড়ের উপর দাঁড়িয়ে দেখছিল, দৌলত খাঁর দল তাদের আশ্রিত আত্মীয়-পরিজন ও পরিবারবর্গকে লাহোর দুর্গের বাইরে একে একে নিয়ে আসছিল।

দুর্গ-ফটকের সামনে বাবুরের সৈন্যাধ্যক্ষ আহমেদি পারওয়ানচি দাঁড়িয়ে ছিল সম্রাটের নির্দেশে, যেন দৌলত খাঁর পরিজনদের প্রতি কোন রকম অত্যাচার না হয় সেটা দেখবার জন্য। সারাটা দিন ধরে সকলে দুর্গ থেকে একে একে বের হয়ে এলো।

কিন্তু একজনকে দুর্গ থেকে বের হয়ে আসতে দেখা গেল না—দৌলত খাঁর পুত্র গাজি খাঁ।

সম্রাট অতঃপর নির্দেশ দিল আহমেদিকে দুর্গে প্রবেশ করে গাজি খাঁর সন্ধান করতে ও দৌলত খাঁর ধনদৌলতের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে।

আহমেদি কিন্তু সন্দেহ করেছিল, গাজি খাঁর কোন এক ফাঁকে পালিয়েছে সকলের চোখে ধুলো দিয়ে এবং তার সন্দেহ যে মিথ্যা নয় সেটা প্রমাণিত হলো যখন সারাটা দুর্গ তন্ন তন্ন করে অনুসন্ধান চালিয়েও গাজি খাঁর সন্ধান কোথায়ও পাওয়া গেল না দুর্গের মধ্যে।

সেই সঙ্গে এও জানা গেল দৌলত খাঁ বহু মূল্যবান হীরাজহরৎ সরিয়ে ফেলেছে তাদের চোখকে ফাঁকি দিয়ে।

দুর্গ অধিকৃত হলো বটে কিন্তু সাবধানী বাবুর সঙ্গে সঙ্গে দুর্গে প্রবেশ করল না। পাহাড়ের উপরেই শিবির স্থাপনা করে রইলো।

হঠাৎ সন্ধ্যার দিকে দুর্গ-ফটকের সামনে একটা দাঙ্গা বেধে যায়। বাবুরের ও দৌলত খাঁর সৈন্যদের পরস্পরের মধ্যে—সাঁ-সাঁ করে বিষাক্ত তীর চারিদিকে ছুটতে লাগল। একটা বিষাক্ত তীর এসে সহসা হুমায়ুনের শিক্ষককে বিদ্ধ করে। সঙ্গে সঙ্গে তার মৃত্যু হয়। শেষ পর্যন্ত আহমেদি সে দাঙ্গাকে থামায়।

দুদিন পরে সম্রাট বাবুর, অর্থাৎ সোমবার সদলবলে দুর্গমধ্যে প্রবেশ করল। শূন্য দুর্গ। কক্ষগুলো তার খাঁ খাঁ করছে।

ঘুরতে ঘুরতে একসময় বাবুর গাজি খাঁর বিরাট গ্রন্থশালার মধ্যে এসে প্রবেশ

রল হ্মায়ূন সমভিব্যাহারে। দেখা গেল সেই গ্রন্থশালায় বহু মূল্যবান সব পুস্তক রয়েছে।

হুমায়ূন গ্রন্থ প্রিয় মানুষ ; সে পুস্তকগুলো দেখে ভারি খুশি হয়।

বাবুর তখন গ্রন্থশালার কিছু পুস্তক কামরাজের কাছে পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করে বাকী সব পুস্তক হুমায়ূনকে দিয়ে দিল।

সারাটা রাত বাবুর তার দলবল নিয়ে দুর্গমধ্যেই রইলো—খানাপিনা ও ভাঙ্গ ও সুরার নেশায় সারাটা রাত হৈ-চৈ করলো।

পরদিন প্রত্যূষে বাবুর শিবিরে ফিরে এলো। সেই সময়ই সংবাদ পেল বাবুর, ভীরু বিশ্বাসঘাতক গাজি খাঁর তার মা বাবা ও বোনেদের ফেলে নাকি দুর্গম পাহাড়ে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে।

খাজা কালানের বাসস্থান ছিল দুর্গ ও শিবিরের মুখোমুখি একটা উঁচু টিলার উপর। খাজা কালান গজনি থেকে উটের পিঠে চাপিয়ে কিছু গজনির তৈরী সুরা সঙ্গে নিয়ে এসেছিল। সে-রাত্রে ঐ সুরা পান করলো সকলে মিলে প্রথম জয়ের আনন্দে।

পরের দিন প্রত্যূষে বাবুর আবার যাত্রা শুরু করল। মিলওয়াতের পাশ দিয়ে আলকান্দর ছোট ছোট পাহাড় অতিক্রম করে সম্রাটের বাহিনী এক সময় দুনে এসে পৌঁছাল। মনোরম উপত্যকা দুন। চারিদিকে অপরূপ নৈসর্গিক দৃশ্য।

॥ ৪৪ ॥

হিন্দুস্থানী ভাষায় উপত্যকাকে 'দুন' বলে। উপত্যকাটির প্রাকৃতিক সৌন্দর্য চারিদিকে সত্যিই সুন্দর। বাবুরের কবি মনকে উপত্যকাটি মুগ্ধ করে। উপত্যকার মধ্য দিয়ে মনোরম এক প্রবাহিণী কল কল ছল ছল শব্দে বহে চলেছে—কিছুদূরের এক পর্বতগাত্র হতে ঝরণার আকারে প্রবাহিণীটি সমতলভূমিতে নেমে এসেছে—বড় বড় শিলাখণ্ডের গাত্রে আঘাত খেয়ে খেয়ে স্রোতস্বিনীর গতি তীব্র হয়ে উঠেছে ক্রমশঃ যেন। প্রবাহিণীর দুই পার্শ্বে সবুজ শস্যের অফুরন্ত সমারোহ। গম—জোয়ার—ভুট্টা—কোথাও কোথাও ধানও রোপণ করেছে কৃষকেরা। নদীর স্রোতের বেগ এত তীব্র যে তিন-চারটি জাঁতাকল অনায়াসেই চালানো যায়।

আশেপাশের পাহাড়গুলো খুব উঁচু নয়, ছোট ছোট।

উপত্যকাটি তিন ক্রোশ—কোন কোন স্থানে পাঁচ ক্রোশ বিস্তৃত।

পাহাড়ের ধারে ধারে গ্রামগুলি যেন পটে আঁকা ছবির মত মনে হয় দূর থেকে। অসংখ্য ময়ূর আর বাঁদর—মোরগও চারিদিকে নজরে পড়ে।

পলাতক গাজি খাঁকে যেমন করেই হোক ধরতে হবে—বাবুরের অনুচরেরা গাজি খাঁয়ের সন্ধানে চারিদিকে ঘুরে বেড়ায়। বাবুর আদেশ দেয় যেমন করেই হোক ঐ গাজি খাঁকে বন্দী করতেই হবে।

উপত্যকার চারিদিকে পাহাড়গুলোতে ছোট ছোট সব দুর্গ আছে—বাবুরের কেন যেন ধারণা হয়েছিল এদিকে পলাতক আলিম খাঁও কোন একটি দুর্গেই আশ্রয় নিয়েছে এবং সেই দুর্গ থেকে তাদের গতিবিধির উপর গোপনে নজর রেখেছে।

অনেকগুলো দুর্গ তন্নতন্ন করে অনুসন্ধান চালিয়েও আলিম খাঁর কোন সংবাদ বা পাত্তা পাওয়া গেল না।

অবশেষে বাবুরের নজর পড়ল উত্তর-পূর্ব দিকে অবস্থিত অপেক্ষাকৃত একটি বড় দুর্গের উপরে। দুর্গটির নাম কোটিলা, দুর্গটির অবস্থান দেখে বাবুরের সন্দেহ হয় হয়ত ঐ কোটিলা দুর্গেই আলিম খাঁ আশ্রয় নিয়েছে। প্রায় দেড়শত ফুট উঁচু খাড়াই পাহাড় দিয়ে চতুর্দিকে ঘেরা কোটিলা দুর্গটি, রীতিমত সুরক্ষিত যাকে বলে।

দুর্গের কাছাকাছি এগিয়ে দেখা গেল দুর্গের প্রধান ফটকের সামনে ষোল ফুট পরিসর একটি জায়গা আছে—যেটা দুর্গে প্রবেশ ও বহির্গমনের ব্যাপারে টানা সেতুর কাজে ব্যবহার করা হয়। সেতুটা আগাগোড়া লম্বা লম্বা তক্তা দিয়ে তৈরী—মজবুত।

বাবুরের নির্দেশে আহমেদি পারওয়ানচি একটি সৈন্যবাহিনী নিয়ে ঐ সেতু পার হয়ে দুর্গটি অবরোধ করে ফেলল। এবং বাবুরের অনুমান যে মিথ্যা নয় সেটা প্রমাণিত হতেও দেরি হয় না—তার সৈন্যরা কোটিলা দুর্গের কাছাকাছি যেতেই দুর্গের অধিবাসী সৈন্যরা যুদ্ধ শুরু করে দেয়। অনেকক্ষণ ধরে দুই পক্ষে যুদ্ধ চলে।

অবশেষে একসময় দুর্গটি যখন বাবুরের সৈন্যরা জয় করতে সমর্থ হলো দেখা গেল দুর্গমধ্যে কোথাও আলিম খাঁ নেই। সে ইতিমধ্যে সবার অলক্ষ্যে কখন যেন দুর্গ ত্যাগ করে চলে গিয়েছে।

ওদিকে ততক্ষণে সন্ধ্যা নেমে এসেছে। ঘোর-ঘোর অন্ধকার চারিদিকে।

দুর্গ জয় হয়েছে বটে, বাবুরের বহু তুর্কী সৈন্য যুদ্ধে মারা গেছে। এই-ভাবে অযথা সৈন্যক্ষয় করা আদৌ বুদ্ধিমানের কাজ হবে না, কারণ বাবুরের প্রধান লক্ষ্য তখন দিল্লী।

লোদি আফগান বংশের সুলতান বাহললের পৌত্র ও সুলতান ইসকানদারের পুত্র সুলতান ইব্রাহিম লোদি তখন দিল্লীর সিংহাসনে।

তার প্রতিপত্তি ও সৈন্যবল কম নয়। তার নিজের এক লক্ষ সৈন্য ও তার আমীরদের মোট এক হাজার হাতি ছিল। তার মুখোমুখি দাঁড়াবার পূর্বেই দুর্বল হয়ে পড়লে বাবুর হয়ত ইব্রাহিম লোদিকে পরাস্ত করতে পারবে না—তাই বিচক্ষণ বাবুর আর সেখানে অপেক্ষা না করে একদল সৈন্য গাজি খাঁর সন্ধানে প্রেরণ করে মিলওয়াত দুর্গ থেকে যে সব স্বর্ণ ও মূল্যবান জিনিসপত্র পাওয়া গিয়েছিল সেগুলো অধিকাংশই বীলথ ও কাবুলে পাঠিয়ে দিয়ে আবার সৈন্যদল নিয়ে এগিয়ে চলল।

একদিনের পথ অগ্রসর হবার পর একটা পাহাড়-ঘেরা উপত্যকায় বাবুর তার তাঁবু ফেলে বিশ্রামের জন্য।

রাত্রি গভীর। বাবুর একাকী তার তাঁবুর মধ্যে জেগে বসেছিল। সম্মুখে স্বর্ণপাত্রে সুরা। মাথার মধ্যে বাবুরের অসংখ্য চিন্তার ঝড় যেন বয়ে চলেছিল। ইব্রাহিম লোদিকে পরাস্ত করা হয়ত খুব সহজ হবে না আর তাকে পরাস্ত না করতে পারলে ও দিল্লী হস্তগত না করতে পারলে এ অভিযানই তো ব্যর্থ।

দ্বারী এসে কুর্নিশ জানাল।

কি সংবাদ?

আলমপনা রণবীর আপনার দর্শনপ্রার্থী।

এত রাত্রে রণবীর। কি চায় সে—সম্রাট একটু ভেবে আদেশ দেয়, যাও তাকে এখানে পাঠিয়ে দাও।

একটু পরেই রণবীর সম্রাটের তাঁবুতে এসে তাকে অভিবাদন জানাল। কিন্তু রণবীর একা নয়—তার সঙ্গে হাত বাঁধা একজন রয়েছে।

কি ব্যাপার রণবীর, এ লোকটি কে?

জাঁহাপনা, এ লোকটি তাঁবুর চারপাশে ঘোরাফেরা করছিল।

গুপ্তচর?

আমারও সেই রকম সন্দেহ তাই লোকটাকে ধরে নিয়ে এসেছি।

হুঁ—ওর হাতের বাঁধন খুলে দাও।

কিন্তু জাঁহাপনা—, রণবীর ইতস্ততঃ করে।

দাও বাঁধন খুলে।

রণবীর আর দ্বিরুক্তি না করে সম্রাট বাবুরের আদেশ পালন করে।

লোকটির চেহারা ও পোশাক দেখে বুঝবার উপায় নেই—সে কি জাতের বা কোন্ জায়গার লোক। বয়স অনুসারে চল্লিশ-বিয়াল্লিশ হবে—কৃশ লম্বা—মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি। চোখের দৃষ্টি তীক্ষ্ন। গায়ে একটা ফকিরের মত আলখাল্লা—মাথায় পাগড়ী।

কে তুই—কি নাম তোর?

হুজুর—আমার নাম আলতামাস।

মুসলমান!

হুজুর।

এখানে রাতের অন্ধকারে তাঁবুর আশেপাশে ঘোরাফেরা করছিলি কেন—সত্যি বল্।

আমি হুজুরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার সুযোগ খুঁজছিলাম একটিবার।

তা সোজা এসে আমার সঙ্গে দেখা করিস নি কেন?

হুজুরের সৈন্যাধ্যক্ষেরা তাহলে আপনার সঙ্গে আমাকে দেখা করতে দিত না। হুজুর আমি দিল্লী থেকে আসছি।

দিল্লী!

হ্যাঁ—আপনি আপনার সৈন্যবাহিনী নিয়ে দিল্লী অধিকার করতে চলেছেন আমি জানি—

হুঁ। তা আমার সঙ্গে দেখা করতে চাইছিলে কেন তুমি?

হুজুর যদি অভয় দেন তো নির্ভয়ে বলি।

বাবুর মৃদু হাসল, তারপর বললে, বল।

হুজুর সুলতানের সব খবর আপনাকে আমি দিতে পারি।

বাবুরের চোখের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হয়। আর একবার নিঃশব্দে লোকটার আপাদ-মস্তক দেখে নেয়। মরে মনে বিচার করে বাবুর লোকটাকে, তাকে কতটুকু এবং কি সংবাদ দিতে পারে!

লোকটার কথা আদৌ বিশ্বাসযোগ্য কিনা। লোকটা ইব্রাহিম লোদির কোন গুপ্তচর কিনা। সমস্ত চিন্তাগুলো পর পর বাবুরের মাথার মধ্যে আসে—

লোকটা জাতে মুসলমান। অবিশ্যি যদি সে এইমাত্র ওর নিজের যে পরিচয় দিয়েছে তা সত্য হয়।

রণবীরও একপাশে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে লোকটাকে দেখছিল।

সাধারণ মধ্যবিত্ত দরিদ্র শ্রেণীরই লোক বলে মনে হয়। অর্থের জন্যই হয়ত দেশদ্রোহিতা করতে এসেছে। কিন্তু কেন?

দেশের প্রতি কি লোকটার কোন মমতা নেই?

আলতামাস।

হঠাৎ বাবুর ডাকে।

হুজুর।

তুমি যে সংবাদ আমাকে দেবে তার বিনিময়ে তুমি কি চাও?

হুজুর যা মেহেরবাণী করে দেবেন।

ঠিক আছে—বল এখন কি সংবাদ তুমি জান?

হুজুর সুলতান ইব্রাহিম দিল্লীর একদিক থেকে তার বিরাট সৈন্যবাহিনী নিয়ে এগিয়ে আসছে আপনাকে পথের মধ্যেই বাধা দেবার জন্য—আর—

আর?

আর এক দিক থেকে হিসার-ফিরেদের শিকদার তার নিজের ও পার্শ্ববর্তী দেশের সৈন্যদের নিয়ে—

কত দূরে এখন সে সৈন্যবাহিনী?

তা প্রায় মাইল ত্রিশেক হবে।

বাবুর ক্ষণকাল যেন মনে মনে কি ভাবল, তারপর রণবীরের দিকে তাকিয়ে শুধায়, রণবীর, ওর কথা তুমি বিশ্বাস করো?

রণবীর মৃদু কণ্ঠে বলে, সম্ভবত ও মিথ্যা বলছে না।

ঠিক আছে, আপাততঃ ওকে বন্দীশিবিরে প্রহরাধীন রাখ—সংবাদ যদি সত্য হয় কোষাধ্যক্ষকে বলে দেবে ওকে আমি একশত স্বর্ণমুদ্রা দিতে বলেছি—যাও—ওকে নিয়ে যাও। কিস্তেবেগকে আমার শিবিরে অবিলম্বে একবার আসতে বলো।

রণবীর অভিবাদন জানিয়ে সম্রাটকে, আলতামাসকে নিয়ে তাঁবুর বাইরে চলে গেল। বাইরে কৃষ্ণপক্ষের অন্ধকার যেন চারিদিকে চাপ বেধে আছে, মধ্যে মধ্যে তাঁবুর সামনে দাউ দাউ করে মশাল জ্বলছে। মশালের আলোয় স্থানে স্থানে আলোকিত।

আলতামাস ও রণবীর পাশাপাশি চলছিল। হঠাৎ একসময় রণবীর আলতামাসের দিকে তাকিয়ে বলে, আলতামাস, তুমি তো হিন্দুস্থানেরই লোক।

আলতামাস বলে, হ্যাঁ।

নিজের দেশকে ভালবাস না ?

বাসব না কেন ?

তবে এ কাজ করলে কেন, কটা স্বর্ণমুদ্রার লোভে ?

আমার যে সব গেছে—ক্ষেতখামার—বাড়িঘর—জেনানা—বেটা—

কি করে গেল ?

একজন আমীর সব লুট করে নিয়ে গিয়েছে।

সুলতানের কাছে তুমি নালিশ করলে না কেন ?

করে কি হবে—সুলতানই তো আমার জেনানাকে নিয়ে গিয়ে তার হারেমে রেখেছে—তাকে বলে কি করবো।

রণবীর বুঝতে পারে আলতামাসের আক্রোশের মূলটা কোথায়।

তোমার জেনানা বুঝি খুব খুপসুরৎ ?

মিথ্যা বলবো কেন—সত্যিই সে খুব সুন্দরী।

বয়স কত তোমার জেনানার ?

পনের-ষোল হবে।

বল কি, তোমার তো অনেক বয়েস—

ও আমার তৃতীয় পক্ষ—কিন্তু জনাব, একটা কথা জিজ্ঞাসা করবো ?

কি বল তো ?

আপনি আমাদের দেশের ভাষায় এত সুন্দর কথা বলছেন কি করে একজন তুর্কী হয়ে ?

আমি তো তুর্কী নই আলতামাস।

তুর্কী নন।

আলতামাসের বিস্ময়ের যেন অবধি থাকে না। চলতে চলতে ও ততক্ষণে থমকে দাঁড়িয়েছে।

না—আমি তুর্কী নই। আমি হিন্দুস্থানের লোক—হিন্দু।

হিন্দু—তবে—

কি তবে ?

যবন সম্রাটের সেনাদলে কি করে এলেন আপনি ?

সে অনেক কথা।

আপনিও তো সুলতানের সঙ্গে যুদ্ধ করতে চলেছেন ?

তা যাচ্ছি।

বুঝছি—

কি বুঝেছো ?

সুলতান বোধ হয় আপনার জেনানাকেও কেড়ে নিয়ে গিয়েছে।

রণবীর মৃদু হাসে। বলে, না—

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গিয়েছে। রাত্রির অন্ধকার ক্রমশঃ গাঢ় হয়ে উঠছে। চারিদিকে গৃহগুলো অন্ধকারে যেন স্তূপীকৃত ছায়ার মত মনে হয়। সেই স্তূপীকৃত ছায়ার মধ্যে এখানে-ওখানে আলোর শিখাগুলো অন্ধকারের প্রাণবিন্দুর মত প্রতীয়মান হয়।

গড়ে প্রবেশ করেই রত্না অশ্বপৃষ্ঠ হতে অবতরণ করে অশ্বটিকে একটি বৃক্ষ-মূলে দাঁড় করিয়ে রেখে পদব্রজে চলেছিল। ঘুরতে ঘুরতে একটা চত্বরের মত জায়গায় এসে উপস্থিত হয় রত্না। চত্বরের আশপাশে কয়েকটি বিপণি—বেচাকেনা চলেছে। অনেক পুরুষ ও রমণীর ভিড়।

ক্ষুধার্ত—তৃষ্ণার্ত রত্না এদিক-ওদিক তাকায়। সঙ্গে সামান্য যে অর্থ অবশিষ্ট আছে তার দ্বারা ক্ষুন্নিবৃত্তি হতে পারে কিন্তু রত্নার ঠিক সাহস হয় না কোন কিছু ক্রয় করে ক্ষুন্নিবৃত্তি করবার। প্রথমতঃ সে পুরুষের ছদ্মবেশে থাকলেও স্ত্রীলোক—দ্বিতীয়তঃ বিদেশী। এ সময় কোথাও কিছু ক্রয় করতে গেলে বিক্রেতার সন্দেহ জাগতে পারে।

গড়ের প্রহরীরা এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়াচ্ছে। বিশেষ করে এ সময়টা তারা একটু বেশী সতর্ক থাকে। কোনক্রমে তাদের সন্দেহ হলে এবং তাদের হাতে পড়লে সঙ্গে সঙ্গে হয়ত তারা তাকে কারাগারে নিক্ষেপ করবে। তা'ত করে তার এখানে এই কষ্টস্বীকার করে আসার সমস্ত উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়ে যাবে। না। তা সে হতে দিতে পারে না।

রত্না এগিয়ে চলে—এবং হাঁটতে হাঁটতেই একসময় সে গোবিন্দজীর মন্দিরের সামনে এসে উপস্থিত হয়। প্রশস্ত মন্দির-চত্বর। সন্ধ্যারতি অনেকক্ষণ শেষ হয়ে গিয়েছে। মন্দিরের দরজায় অর্গল পড়ে গিয়েছে। চত্বরের একপাশে সহসা তার দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। একটি বৃক্ষের নীচে ধুনি জ্বলছে।

প্রজ্বলিত সেই অগ্নিকুণ্ডের আলোয় আবছা-আবছা নজরে পড়ে কয়েকটি মনুষ্যমূর্তি—চারিদিকে গোল হয়ে বসে আছে। পায়ে পায়ে সেই দিকে এগিয়ে যায় রত্না। কাছে যেতে তার নজরে পড়ে পাঁচ-সাতজন লোক এক জটাজুটধারী ব্যক্তিকে ঘিরে বসে আছে।

লোকগুলো সবাই নিম্নশ্রেণীর কৃষক বলেই রত্নার মনে হয়। রত্না কয়েকটা মুহূর্ত যেন কি ভাবে, তারপর কিছুটা ব্যবধান রেখে ওদের একপাশে বসে পড়ে।

ক্লান্ত ক্ষুধার্ত সত্যিই আর সে যেন চলতে পারছিল না। মাথাটার মধ্যে ঝিমঝিম্ করছিল।

পৌষ মাস প্রায় শেষ হয়ে এলো। তাহলেও প্রচণ্ড শীত। লোকগুলো অগ্নিকুণ্ডকে কেন্দ্র করে যেন একটা উত্তপ্ত মণ্ডলী রচনা করেছে।

রত্না তার কোমরবন্ধের কালো রেশমী কাপড়টা খুলে আগেই মাথা ও মুখ ঢেকে নিয়েছিল। চট্ করে যাতে তার মুখটা কারো নজরে না পড়ে এবং পড়লেও ঠিক না বুঝে উঠতে পারে যে সে একজন নারী—এবং বিদেশী হলেও তাকে যাতে সহসা কেউ না সন্দেহ করে।

অগ্নিকুণ্ডের চারদিকে যারা বসেছিল তারা কেউই রত্নার দিকে তাকাল না। তাদের সকলেরই দৃষ্টি জটাজুটধারী ব্যক্তির প্রতি নিবদ্ধ।

রত্নাও তারই দিকে তাকিয়ে দেখছিল। জটাজুটধারী সন্ন্যাসীর বয়স ঠিক কত হবে অনুমান করা শক্ত। উর্ধ্বাঙ্গ সম্পূর্ণ নগ্ন। নিম্নাঙ্গে সামান্য কটিবাস। সর্বাঙ্গে যদিও একটা ভস্মের প্রলেপ রয়েছে, তা সত্ত্বেও লোকটির গাত্রবর্ণ যে কোন একসময় রীতিমত উজ্জ্বল ছিল বুঝতে কষ্ট হয় না।

চক্ষু দুটি মুদ্রিত। ধ্যানস্থ হয়ে আছে। প্রশস্ত ললাট। লম্বাটে ধরনের মুখ—খড়্গের মত উদ্ধত নাসা। পেশীবহুল বলিষ্ঠ গঠন।

মন্দিরের বৃদ্ধ পুরোহিত একটা পাতায় কিছু ফলমূল এনে ধ্যানস্থ জটাজুটধারী সন্ন্যাসীর সামনে রেখে দিয়ে বললে, স্বামীজী—গোবিন্দজীর কিছু প্রসাদ এনেছিলাম—

ধ্যানস্থ সন্ন্যাসীর কোন সাড়া পাওয়া গেল না। পুরোহিত চলে গেল।

সবাই পূর্বের মত চুপচাপ বসে সন্ন্যাসীকে ঘিরে।

থেকে থেকে কনকনে বাতাস বয়ে যাচ্ছে। হাড় পর্যন্ত যেন কাঁপিয়ে তোলে। নিকটবর্তী অগ্নিকুণ্ডের তাপে রত্না যেন কিছুটা সুস্থ বোধ করে।

সহসা ঐ সময় মন্দিরের পাষাণ-চত্বরে কার যেন পাদুকার মৃদু শব্দ পাওয়া গেল। পাদুকার শব্দ ঐদিকেই এগিয়ে আসছে মনে হয়।

পাদুকার শব্দ অগ্নিকুণ্ডের কাছাকাছি এসে থামতেই সকলেই ফিরে তাকাল—যারা সেখানে বসেছিল—রত্নাও ফিরে তাকাল। আগন্তুকের দিকে তাকালেই বুঝতে কষ্ট হয় না, তিনি একজন উচ্চপদস্থ রাজপুরুষ। দীর্ঘকায়। অঙ্গে মূল্যবান পরিচ্ছদ, মাথায় উষ্ণীষ। কটিদেশে তরবারি।

উপবিষ্ট সকলের মধ্যেই যেন একটা চঞ্চলতা প্রকাশ পায় আগন্তুকের আবির্ভাবে। তাড়াতাড়ি একটু যেন ব্যস্ত হয়েই উপবিষ্ট সকলে এদিক-ওদিক সরে গিয়ে আগন্তুকের জন্য স্থান করে দেয়। আগন্তুক যে কোন বিশেষ প্রয়োজনেই ঐ সময় ঐ স্থানে এসেছেন রত্নার বুঝতে কষ্ট হয় না।

আগন্তুক রাজপুরুষ একধারে উপবেশন করলেন।

ধ্যানস্থ সন্ন্যাসী বারেকের জন্য ঐ সময় চক্ষু উন্মীলন করলেন—এবং আগন্তুকের দিকে দৃষ্টিপাত করলেন।

রতন সিং। সন্ন্যাসী মৃদু কণ্ঠে বললেন এতক্ষণে।

প্রভু ?

কেন তুমি এসেছো ?

প্রভু আপনি তো অন্তর্যামী—আপনার অবিদিত তো কিছুই নেই। রতন সিং মৃদু কণ্ঠে বলে।

জটাজুটধারী ব্যক্তির ওষ্ঠপ্রান্তে মৃদু হাস্যরেখা দেখা দিল। শান্ত স্নিগ্ধ মধুর সে হাসি।

মানুষ কি অন্তর্যামী হতে পারে রতন সিং। অন্তর্যামী একমাত্র সেই ঈশ্বর।

রতন সিংহ তাঁর কথার কোন জবাব না দিয়ে উপবিষ্ট সকলের দিকে একবার তাকাল। সঙ্গে সঙ্গে সকলে উঠে দাঁড়ায়।

রত্না বুঝতে পারে তাদের ঐ রাজপুরুষ স্থানত্যাগেরই নির্দেশ দিয়েছে।

রত্না কি করবে বুঝতে পারে না—সে বসেই থাকে। এবং তাকে বসে থাকতে দেখেই বোধ হয় রতন সিং তার দিকে এবারে তাকায় একটু যেন বিরক্তভরা দৃষ্টিতেই। কিছু বলতেও বুঝি উদ্যত হয়।

কিন্তু তার কিছু বলার আগেই জটাজুটধারী সন্ন্যাসী বলে ওঠেন, ও থাক্ রতন সিং—ওর দ্বারা তোমার কোন ক্ষতি হবে না।

রত্না কথাটা শুনে সন্ন্যাসীর দিকে তাকায়, কিছুটা যেন বিস্ময়েই।

পুনরায় রত্নার মুখের দিকে তাকিয়েই স্মিত কণ্ঠে সন্ন্যাসী বলেন, তোমার মুখের দিকে তাকিয়ে মনে হচ্ছে তুমি ক্ষুধার্ত—তৃষ্ণার্ত, এক কাজ কর, ঐ ফল-মূলগুলো খেয়ে ক্ষুন্নিবৃত্তি নিবারণ কর।

এ লোকটা কে প্রভু? চন্দন সিং সন্ন্যাসীকে প্রশ্ন করলে।

জটাজুটধারী সন্ন্যাসী আবার মৃদু হাসলেন।

রতন সিং এবার রত্নার মুখের দিকে তাকিয়েই প্রশ্ন করলে, কে তুমি? কি নাম তোমার? তোমাকে চিতোরগড়ে পূর্বে কখনো দেখেছি বলেতো মনে হচ্ছে না—

রত্না অত্যন্ত বিব্রত বোধ করে। কি বলবে বুঝে উঠতে পারে না।

ওর পরিচয় তোমাকে আমিই দেবো রতন সিং—ব্যস্ত হয়ো না। সন্ন্যাসী আবার বললেন।

রত্না যেন দ্বিগুণতর বিস্ময়ে সন্ন্যাসীর কথায় তাঁর মুখের দিকে তাকায় এবারে—সন্ন্যাসী কি সত্যিই তার পরিচয় জানেন নাকি।

রত্নার চিন্তাজাল ছিন্ন হয়ে যায় পরক্ষণেই আবার সন্ন্যাসীর কথা শুনে।

সন্ন্যাসী তখন চন্দন সিংকে লক্ষ্য করে বলছেন, যে যবনবাহিনী দুর্গম পার্বত্য পথ অতিক্রম করে ধীরে ধীরে ভারতবর্ষের দিকে এগিয়ে আসছে তাকে প্রতিরোধ করতে তোমরা পারবে না।

প্রভু!

সন্ন্যাসী বলতে লাগলেন, পাঠানের আধিপত্য শেষ হয়েছে—এবার মুঘলের আধিপত্য শুরু হবে।

এর কি কোন প্রতিকারই নেই প্রভু?

আপাতত দেখতে পাচ্ছি না। ধীরে ধীরে ঐ মুঘলেরা সমস্ত ভারতবর্ষ গ্রাস করবে বলেই মনে হচ্ছে।

তবে কি আপনি বলতে চান প্রভু—বিস্তীর্ণ এই ভূখন্ড—মেবার মাড়ওয়ার যশল্মীর বিকানীর—এসবের কোন অস্তিত্বই থাকবে না?

থাকবে তবে ঐ মুঘলেরই পদানত হয়ে।

রতন সিং মাথা নীচু করে বসে থাকে। তার মুখ থেকে আর কোন শব্দ বের হয় না। বোঝা যায় সে অনেক আশা নিয়ে এসেছিল সন্ন্যাসীর কাছে কিন্তু

সন্ন্যাসীর কথা শুনে সে রীতিমত হতাশ হয়েছে।

সন্ন্যাসী বোধ করি রতন সিংয়ের মনের অবস্থা বুঝতে পেরেই তাকে সান্ত্বনা দেন। বলেন, দুঃখ করো না রতন সিং—এ দেশ এমনিই এক বিচিত্র দেশ—এর ভৌগোলিক সীমানা—এখানকার মানুষ—তাদের আচার নীতি ও কৃষ্টি মিলিয়ে যে কোন বিদেশী শক্তিই চিরদিনের মত এখানে এসে আধিপত্য বিস্তার করে থাকতে পারবে না। একদিন না একদিন আবার তাদের রাজ্যপাট ফেলে পালাতেই হবে—সামনে অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে ঠিকই কিন্তু সে অন্ধকার চিরস্থায়ী নয়—আবার একদিন অন্ধকার কেটে যাবে—অন্ধকারে সূর্যোদয় হবে।

রতন সিং কোন জবাবই দেয় না। পূর্ববৎ নীরব থাকে।

রত্মাও একপাশে চুপটি করে বসেছিল। সেও শুনছিল সন্ন্যাসীর কথা।

এবারে সন্ন্যাসী রত্মার দিকে তাকিয়ে বললেন, কিন্তু তুমি তো কিছুই খেলে না মা—কিছু মুখে দাও।

সন্ন্যাসীর কথায় রতন সিং যেন চমকে রত্মার দিকে তাকাল।

পুরুষের বেশধারী ঐ ব্যক্তি তাহলে পুরুষ নয়, আসলে এক নারী।

রতন সিং? সন্ন্যাসী রতন সিংয়ের দিকে তাকিয়ে ডাকলেন।

প্রভু!

প্রত্যুষেই আমি এখান থেকে যাত্রা করব।

আবার কবে দেখা হবে প্রভু?

শীঘ্র কোন সম্ভাবনা নেই। রতন সিংয়ের প্রশ্নের জবাব দিয়ে পুনরায় সন্ন্যাসী রত্মার মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করলেন, কি নাম তোমার মা?

রত্মাবাঈ। মৃদুকণ্ঠে জবাব দেয় রত্মা।

মনে হচ্ছে তুমি মেওয়ারবাসিনী নও।

না প্রভু,—আমি মাড়ওয়ার থেকে আসছি।

কোন সংবাদ সংগ্রহের আশায় নিশ্চয়ই?

রতন সিং আবার রত্মার মুখের দিকে তাকালেন।

রত্মা নীরব।

কি সংবাদ বল তো।

একজনকে খুঁজতে এসেছি প্রভু।

মৃদু কণ্ঠে জবাব দেয় রত্মা।

কে সে?

রত্মা একটু ইতস্ততঃ করে—বলবে কি বলবে না—ঠিক যেন বুঝে উঠতে পারে না।

সন্ন্যাসী বোধ হয় রত্মার দ্বিধাটুকু বুঝতে পারেন। মৃদু হেসে বলেন, সংকোচ করো না মা, বল। রতন সিং ক্ষমতাসম্পন্ন একজন রাজপুরুষ—প্রয়োজন হলে উনি তোমার সাহায্য করবেন।

রত্মা একবার রতন সিংয়ের মুখের দিকে তাকাল, তারপর সন্ন্যাসীর দিকে

তাকিয়ে মৃদু কণ্ঠে বললে, মাড়বারের রাজকুমারী—

মাড়বার রাজদুহিতা। কথাটা রতন সিংয়ের মুখ থেকেই নির্গত হয়।

মাড়বার রাজদুহিতার খোঁজে তুমি এখানে এসেছো মা—তোমার কথাটা তো ঠিক হৃদয়ঙ্গম করতে পারছি না।

রত্না তখন সংক্ষেপে পার্বতী ও বীরেন্দ্রকাহিনী বিবৃত করে।

সমস্ত শুনে সন্ন্যাসী মৃদু হাসলেন। তারপর মৃদু স্মিতকণ্ঠে বললেন, পার্বতীকে তুমি ফিরিয়ে নিয়ে যেতে এসেছো তা হলে?

হ্যাঁ, প্রভু।

কিন্তু তুমি কি মনে করো সে আর ফিরে যাবে?

না, যাবে না তা আমি জানি। আর তিনি ফিরে যান তাও আমি চাই না—

তবে? সন্ন্যাসী মৃদু হাস্যে প্রশ্নটা করে তাকালেন রত্নার মুখের দিকে। তবে তুমি এত শ্রম স্বীকার করে এত দূরপথে এসেছো কেন মা?

তাকে সাবধান করে দিতে।

সাবধান করে দিতে।

হ্যাঁ। মহারাণা যদি কোনক্রমে জানতে পারেন যে মাড়বার-দুহিতার সঙ্গে তার বিবাহের কথা পাকা হয়ে গিয়েছে আদৌ তিনি মাড়বারে নেই এবং বিবাহের কথাবার্তা যখন চলেছে তার আগেই তিনি তার প্রণয়ীর গলায় মাল্যদান করেছেন এবং বর্তমানে তিনি তারই গড়ে এসে আশ্রয় নিয়েছেন, তাহলে হয়ত মহারাণার রোষ থেকে তারা বাঁচতে পারবে না।

বুঝতে পারছি মা, তুমি অসাধারণ বুদ্ধিমতী। সন্ন্যাসী বললেন।

প্রভু আমি সামান্যা নর্তকী মাত্র।

না মা—বৃত্তিতে তুমি নর্তকী হতে পারো কিন্তু সামান্য তুমি নও। তাছাড়া তোমার কথাবার্তা শুনে আমি যে এও বুঝতে পারছি মা, প্রেমের—অনুরাগের অগ্নিতে তুমিও দগ্ধ হচ্ছো নিশিদিন!

না প্রভু, না—

সংসার-ত্যাগী সন্ন্যাসী আমি বটে মা, কিন্তু তাই বলে তো মানুষের সহজ অনুভূতির বাইরে নই আমি মা। তোমার প্রত্যেকটি কথা—তোমার কণ্ঠস্বরই যে সে-কথা স্পষ্ট করে প্রকাশ করে দিয়েছে!

রত্না মাথা নীচু করে।

লজ্জার কিছু তো নেই মা ওতে। অমন করে ভাল না বাসতে পারলে কি এত বড় ভালবাসার মর্যাদা তুমি বুঝতে? কিন্তু যাক সে কথা—বিদেশিনী তুমি, কেমন করে তুমি তাদের সন্ধান পাবে? বিশেষ করে যারা আত্মগোপন করতে চায়?

সন্ধান তাদের যেমন করেই হোক করতে হবে আমায়।

রতন সিং? সন্ন্যাসী এবারে রতন সিংয়ের দিকে তাকালেন।

প্রভু।

ওকে তুমি সাহায্য করতে পারবে ?

কিন্তু প্রভু, আপনি তো সব কিছু শুনলেন। মহারাণার কর্মচারী আমি—, দ্বিধাগ্রস্ত কণ্ঠে প্রত্যুত্তর দেন চন্দন সিং।

সক্রিয়ভাবে কোনরকম সাহায্য করবার জন্য ওকে আমি তোমায় অনুরোধ করছি না চন্দন সিং। কেবল ওর জীবন যাতে করে না বিপন্ন হয় সেটুকু তুমি দেখো।

তা হয়ত আমি পারব, চন্দন সিং জবাব দেন।

সেইটুকু দেখো। তার বেশী ওর বোধ হয় কিছু প্রয়োজনও হবে না।

অতঃপর সন্ন্যাসী রত্নার দিকে ফিরে তাকিয়ে বললেন, যাও মা—চন্দন সিংয়ের সঙ্গে তুমি যাও। রাত্রির দ্বিতীয় প্রহর উত্তীর্ণপ্রায়, আমারও যাত্রার সময় হলো।

কিন্তু প্রভু, দ্বারের প্রধান প্রহরী বোধ হয় এসময় আপনাকে দুর্গের বাইরে যেতে দেবে না। চন্দন সিং বলেন।

আমার জন্য তুমি চিন্তা করো না—ওকে নিয়ে তুমি যাও।

রতন সিং আর কোন প্রতিবাদ জানালেন না। নিঃশব্দে সন্ন্যাসীকে প্রণাম করে উঠে দাঁড়ালেন।

রত্নার দিকে তাকিয়ে বলেন, চল বহিন।

যাও মা।

রত্নাও সন্ন্যাসীকে প্রণাম করে উঠে দাঁড়াল।

দুজনে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল। ক্রমশঃ তাদের পদশব্দ মন্দির-চত্বরে মিলিয়ে গেল।

মন্দির-চত্বরের বাইরে এসে দুজনে পাশাপাশি হেঁটে চলে—রতন সিংয়ের শিক্ষিত অশ্ব ওদের পিছনে পিছনে চলে।

ওদিকে সুচিৎ সিংহের গৃহমধ্যে—শেষ পর্যন্ত বীরেন্দ্র রাণী রঞ্জাবতীর প্রস্তাবে সম্মত হওয়ায়, পার্বতী রঞ্জাবতীর সঙ্গে যাবার জন্য প্রস্তুত হয়েছে।

রঞ্জাবতী পরামর্শ দিয়েছে, আপাততঃ কিছুদিন পার্বতীকে সে তার নিজের মহলে গোপন করে রাখবে। এবং পরে সময়মত ওদের মুক্তির ব্যবস্থা করবে।

রঞ্জাবতী ও পার্বতীকে বিদায় দিয়ে কুর্চি এসে, মংলুকে যে ঘরে হাত-পা-মুখ বেঁধে বন্দী করে রেখেছিল, সেই ঘরে এসে প্রবেশ করল।

কুর্চিকে ঘরে প্রবেশ করতে দেখে মংলু কুর্চির মুখের দিকে তাকাল।

কুর্চি ওর মুখের দিকে চেয়ে মিটিমিটি হাসে। তারপর এগিয়ে এসে ওর বাঁধন খুলে দেয়। মংলুকে মুক্তি দেয়।

সঙ্গে সঙ্গে মংলু গর্জন করে ওঠে, শয়তানী।

চুপ। দস্যুর দল এখনো বেশী দূরে যায় নি—আস্তে কথা বল।

সঙ্গে সঙ্গে মংলুর গলার স্বর যেন চুপসে যায়, দ-স্যু।

হ্যাঁ গো—অনেক কষ্টে তাদের ভুলিয়ে বের করে দিয়েছি। তারা যদি জানতে

পারে কোনক্রমে যে তুমি আমার নাগর—পীরিতের মানুষ, তাহলে ভাববে তারা, তাদের সঙ্গে এতক্ষণ আমি অভিনয় করেছি—

কোথায় তারা ?

চলে গেছে।

স্-সত্যি বলছিস—

হ্যাঁ—

॥ ৩৮ ॥

কিন্তু পরক্ষণেই মংলুর যেন আবার কি মনে হয়—কারণ মংলুর বুদ্ধিটা যতই মোটা হোক তবু সে ঐ মুহূর্তে কুর্চির কথা যে বিশ্বাস করে নি আদৌ কুর্চি বুঝতে পারে যখন মংলু বলে, তুই আমাকে এতই বোকা ঠাউরেছিস, তাই না কুর্চি ?

তুই আমার কথা বিশ্বাস করছিস না ?

না—একটুও না।

বেশ, করিস না। আর করবিই বা কেন বিশ্বাস আমার কথা তুই ? আমি তোর কে ? কুর্চির গলার স্বরে অভিমান পরিস্ফুট হয়ে ওঠে।

কুর্চির গলায় অভিমানের সুর কিন্তু মংলুকে বিচলিত করে তোলে। সঙ্গে সঙ্গে সে বলে, তাই বলে তুই আমাকে অমন করে বেঁধে রাখবি ?

বেঁধেছি কি সাধে। ওদের বুঝতে দিয়েছি আমি তাদেরই দলে, তাই না শেষ পর্যন্ত তারা তোকে হত্যা না করে চলে গিয়েছে। যাক গে তুই যখন আমাকে বিশ্বাসই করছিস না এখানে থেকে আর আমার কি হবে—আমি চললাম। আর কখনো আসবে না।

কথাগুলো বলে কুর্চি যাবার জন্য দরজার দিকে এগিয়ে যায়।

এই কুর্চি।

কুর্চি সাড়া দেয় না। এগিয়ে যায়।

এই—, মংলু এগিয়ে এসে কুর্চির পথরোধ করে দাঁড়ায়, আমি কি তাই বলেছি নাকি যে তোকে আমি বিশ্বাস করি না।

করিসই না তো আর তাই তো একটু আগে বললি—সর—আমার পথ ছাড় —যেতে দে আমাকে।

রাগ করিস না কুর্চি। তুই চলে গেলে আর আমি বাঁচবো না।

মিথ্যে কথা। তুই আমাকে একটুও ভালবাসিস না।

বিশ্বাস কর তোর জন্য আমি প্রাণ দিতে পারি।

থাক, থাক—ও কেবল তোর মুখেরই কথা। মুখেই কেবল তোর ভালবাসা। আসলে তুই একটুও আমায় ভালবাসিস না। সর—পথ ছাড় আমার। যেতে দে আমাকে—

আমার ঘাট হয়েছে—এই নাক-কানমলা খাচ্ছি—মংলু তার নাক-কান মলে।

না—সর পথ ছাড়—

দোহাই তোর, চলে যাস নি। তুই চলে গেলে সত্যিই আমি মরে যাবো—

ঠিক বলছিস তো?

হ্যাঁ—সত্যি—সত্যি—সত্যি।

তবে পথ ছাড়, এখন আমি যাই।

তবু চলে যাবি?

হাঁদারাম, রাত শেষ হয়ে আসছে না? সুচিৎ সিংহ হঠাৎ যদি এসে পড়ে তোর ঘরে আমাকে দেখে, সর্বনাশ হয়ে যাবে।

কেন? সর্বনাশ হবে কেন? তাছাড়া সে এখন আসবেই না—রাণার প্রাসাদে গেছে।

কেন? রাণার প্রাসাদে এত রাত্রে গেছে কেন?

শুনিস নি কিছু?

না তো!

শীগ্‌গিরী যে ভয়ানক একটা যুদ্ধ বাধবে।

যুদ্ধ!

হ্যাঁ।

কার সঙ্গে যুদ্ধ?

যবনদের সঙ্গে শুনেছি।

যাঃ!

হ্যাঁ রে—ভয়ানক যুদ্ধ হবে।

তুইও তাহলে নিশ্চয়ই যুদ্ধে যাবি মংলু?

তা তো যেতেই হবে।

না, না—তুই যুদ্ধে যাস না।

তা কি হয়! আমাদের সবাইকেই যুদ্ধ করতে হবে।

যুদ্ধে যদি তুই মরে যাস?

তা আর কি করা যাবে!

বাইরে ঐ সময় অশ্বক্ষুরধ্বনি শোনা গেল।

মংলু। ঐ শোন্—কোন অশ্বারোহী বোধ হয় এইদিকেই আসছে—তোর প্রভু সুচিৎ সিংহ বোধ হয়—

তাই তো—, চল্ তাড়াতাড়ি তোকে পিছনের দ্বারপথে বের করে দিই—আয়।

মংলু আগে আগে ও পশ্চাতে কুর্চি ঘর থেকে বের হয়ে যায়। এবং পিছনের দ্বারপথে মংলু কুর্চিকে বের করে দেয় গৃহ হতে।

কুর্চি দ্রুত এগিয়ে যায়।

মংলুও তাকে অনুসরণ করে।

ও কি, তুই আবার আমার সঙ্গে সঙ্গে কোথায় আসছিস?

তোকে একা ছেড়ে দেবো কি করে? মংলু বলে।

না, না—আমি একাই যেতে পারব।

না, তুই যদি ভয় পাস ?

না রে, ভয় পাবো না। গজা সিংয়ের ভাঙ্গা বাড়িটার পাশ দিয়ে চলে যাবো। ঐ যে সেই বাড়িটি। ওর পাশ দিয়ে প্রাসাদে যাবার একটা সোজা রাস্তা আছে।

দাঁড়া—যাস নি ও পথে !

সহসা মংলু কুর্চির একটা হাত চেপে ধরে।

কি হলো ? হাত ছাড়।

না—জানিস না তুই—

কি ?

ঐ বাড়িতে গজা সিংয়ের প্রেত থাকে—রোজ রাত্রে বাড়ির চারপাশে সে ঘুরে বেড়ায়।

কুর্চি তখন মনে মনে রঞ্জাবতীর কাছে যাবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেছে।

রঞ্জাবতী হয়তো এখনো তার জন্য সেই বৃক্ষতলে অপেক্ষা করছে। মংলুটাকে সঙ্গে করে কোনমতেই কুর্চি রঞ্জাবতীর সামনে যেতে পারে না।

ব্যাপারটা সে কাউকে জানতে দিতে চায় না। কিন্তু মংলুর হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়াও কষ্ট।

মংলু !

কি ?

ওটা কি রে ?

কি ? কোথায় কি ?

ঐ যে দেখতে পাচ্ছিস না ?

অন্ধকারে আঙ্গুল তুলে দেখায় কুর্চি।

মংলু ভীত ত্রস্ত বড় বড় চোখ মেলে কুর্চির অঙ্গুলি-নির্দিষ্ট দিকে তাকায়, কই ? কি ?

ঐ যে—কালো মত বিরাট—বড় বড় দুটো হাত—

কু—কু—কু—, তোতলাতে শুরু করে ভয়ে মংলু। সর্বশরীরে তখন তার কাঁপুনি ধরেছে।

ওটা যে এদিকেই এগিয়ে আসছে রে !

আর বলতে হলো না কুর্চিকে—মংলুর সমস্ত সাহস তখন নিঃশেষে উবে গিয়েছে—সে আর এক মুহূর্ত দেরি করে না। কুর্চিকে ফেলে উর্ধ্বশ্বাসে গৃহের দিকে ছুটতে শুরু করে এবং দেখতে দেখতে অন্ধকারে মিলিয়ে যায়।

কুর্চি প্রাণভরে হাসে কিছুক্ষণ। ইচ্ছা করেই সে মংলুকে নিয়ে ঐ পথে এসেছিল কারণ মংলুর ভূতের ভয়ের কথাটা তার অবিদিত ছিল না। যাক্। মংলুর হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া গিয়েছে।

কুর্চি এবারে ঘুরে অন্যপথে অগ্রসর হয় এবং দ্রুত চলতে থাকে। নির্দিষ্ট জায়গাটার কাছাকাছি এসে হঠাৎ দূরে দৃষ্টি পড়ায় কুর্চি দাঁড়িয়ে যায়। বৃক্ষতলে

আবছা আলো-আঁধারে ওরা কারা ? চারটি প্রাণী। রঞ্জাবতী ও পার্বতীর থাকার কথা। তবে চারজন ওখানে কে এবং কারা ?

কুর্চি আর অগ্রসর হওয়া হয় না। দূরে থেকেই ও লক্ষ্য করতে থাকে।

সুচিৎ সিংহের গৃহ হতে নিষ্ক্রান্ত হয়ে রঞ্জাবতী ও পার্বতী মধ্যরাত্রির স্তব্ধ নির্জন পথ ধরে পাশাপাশি দুজনে হেঁটে চলে যেখানে অশ্বটিকে বেঁধে রেখে এসেছিল সেই বৃক্ষতলের দিকে। কিন্তু কিছুদূর অগ্রসর হবার পরই সহসা রঞ্জাবতীর গতি রুদ্ধ হয়।

আবছা আবছা আলোয় রঞ্জাবতীর চোখে পড়ে বৃক্ষতলে দুটি মনুষ্যমূর্তি দাঁড়িয়ে আছে। কারা ওরা ওখানে ? তবে কি তার এই রাত্রে সুচিৎ সিংহের গৃহে আগমনের ব্যাপারটা কেউ জানতে পেরেছে ? মহারাণা কি জানতে পে:র গিয়েছেন ইতিমধ্যে প্রাসাদে তাঁর অনুপস্থিতির ব্যাপারটা ?

সর্বনাশ। তাই যদি হয়ে থাকে তো সে পার্বতীকে মহারাণার হাত থেকে রক্ষা করতে পারবে না।

হঠাৎ রঞ্জাবতী চলতে চলতে ঐভাবে দাঁড়িয়ে পড়ায় পার্বতী মৃদু কণ্ঠ শুধায়, কি হলো, এখানে দাঁড়ালেন যে ?

চুপ। আস্তে—কথা বলো না। চাপাকণ্ঠে রঞ্জাবতী পার্বতীকে সতর্ক করে দেয়।

পার্বতীও সভয়ে এদিক ওদিক তাকায়।

ঐ দূরের গাছতলায় দুজন মানুষ দেখতে পাচ্ছো ? চাপা কণ্ঠে রঞ্জাবতী বলে।

কোথায় ?

ঐ যে—ভালো করে চেয়ে দেখো।

এতক্ষণে পার্বতীরও নজরে পড়ে। সত্যিই দুটো মূর্তি।

রঞ্জাবতী বৃক্ষতলে আলোছায়ায় যে দুটি মনুষ্যমূর্তি দেখতে পেয়েছিল তারা আর কেউ নয় চন্দন সিং আর রত্না। রত্নাকে সঙ্গে নিয়ে নিজ গৃহের দিকে চলতে চলতে হঠাৎ বৃক্ষতলে স্বল্প আলোছায়ায় অশ্বের হ্রেষাধ্বনি শুনে রতন সিং দাঁড়িয়ে গিয়েছিলেন।

তারপর সন্দিগ্ধ হয়ে তিনি আরো একটু এগিয়ে যান।

বৃক্ষতলে পেঁছে দেখেন বৃক্ষমূলে একটি অশ্ব বাঁধা রয়েছে, আশেপাশে কেউ নেই।

এখানে এত রাত্রে অশ্ব কোথা থেকে এলো। কার অশ্ব। নানা প্রশ্ন চন্দন সিংয়ের চিন্তাকে আচ্ছন্ন করে। কিন্তু অশ্বের আরো নিকটে এসে রতন সিং যেন চমকে ওঠেন। অশ্বটি তাঁর পরিচিত। চিতোরগড়ে অপরিচিত নয় কারো। কালো কুচকুচে গাত্রবর্ণ—গায়ে ঘন কালো রেশমের মত চকচকে রোমরাজি।

মহিষী রঞ্জাবতীর প্রিয় অশ্ব—রোহিণী। রোহিণী অশ্বিনী এখানে কেন এ

সময় ? কেউ কি তবে মহিষী রঞ্জাবতীর অশ্বিনীকে অশ্বশালা থেকে চুরি করে নিয়ে এলো ? এত দুঃসাহস এই চিতোরগড়ে কার হবে ?

ঠিক ঐ সময় রতন সিংয়ের কর্ণে প্রবেশ করে অস্পষ্ট পদশব্দ। চকিতে চন্দন সিং পদশব্দ লক্ষ্য করে সেই দিকে তাকান এবং তার নজরে পড়ে দুটি আবছা মনুষ্যমূর্তি ঐদিকেই—বৃক্ষতলের দিকে এগিয়ে আসছে।

কারা ওরা ? কারা আসছে ?

এতক্ষণে দূরবর্তী রঞ্জাবতীরও রতন সিং ও রত্নার প্রতি দৃষ্টি পড়েছিল। তারাও থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছিল।

রতন সিং চাপাকণ্ঠে বলেন, তাড়াতাড়ি এসো, আমরা এই বৃক্ষের আড়ালে আত্মগোপন করি, কারা যেন এইদিকে আসছে।

দুজনে তাড়াতাড়ি বৃক্ষের আড়ালে আত্মগোপন করে। ওদিকে বৃক্ষের তলায় আবছা আলো-অন্ধকারে ক্ষণপূর্বে দৃষ্ট মনুষ্যমূর্তি দুটি অদৃশ্য হওয়ায় রঞ্জাবতী চিন্তিত হয়ে পড়েছিল।

এইমাত্র যে মনুষ্যমূর্তি দুটি সে দেখলো তারা কোথা গেল ? তবে কি তার দেখার ভুল ? সত্যি সত্যি কাউকে সে বৃক্ষতলে দেখে নি ? দেখতে পায় নি ? হয়ত কোন ছায়া বা ঐ রকম কিছু তথাপি মন থেকে সন্দেহ যায় না রঞ্জাবতীর। সে আর অগ্রসর না হয়ে ঐখানেই দাঁড়িয়ে থাকে। তীক্ষ্ন দৃষ্টিতে ভাল করে দেখবার চেষ্টা করে। কিন্তু আর কাউকেই দেখতে পায় না।

কেবল তার অশ্বই দাঁড়িয়ে রয়েছে সেখানে।

পার্বতী।

রাণীমা।

কাউকে দেখতে পাচ্ছো ঐ বৃক্ষতলে ?

না তো !

কিন্তু একটু আগেও দেখেছি স্পষ্ট—

আমিও দেখেছি !

তবে তারা কোথায় গেল ?

হয়ত আমরা ভুল দেখেছি রাণীমা।

না। ভুল দেখি নি।

তবে বোধ হয় আমাদের দেখতে পেয়ে তারা বৃক্ষের ঐদিকে আত্মগোপন করেছে রাণীমা।

আমারও তাই ধারণা। শোন—তোমার সঙ্গে অস্ত্র আছে তো ?

আছে।

ঠিক আছে, চল এগোনো যাক।

কিন্তু রাণীমা—এগোনো উচিত হবে কি ?

ভয় পাচ্ছো ?

মৃদু হাসলো পার্বতী। বললে, না।

তবে ?

ওখানে যদি আরো বেশী লোক থাকে ঐ দুজন ছাড়াও, সেক্ষেত্রে আমাদের ঐখানে এই মুহূর্তে যাওয়া হয়ত যুক্তিযুক্ত হবে না। তাছাড়া ওরা যদি কোন দস্যু হয়?

তাহলেও যেতে হবে। নচেৎ পায়ে হেঁটে প্রাসাদে পেঁছাতে অনেক সময় লাগবে। তাছাড়া ইতিমধ্যে সময় অনেকটা অতিবাহিত হয়ে গিয়েছে।

বেশ তবে চলুন।

হ্যাঁ—চল।

দুজনে অতঃপর সতর্ক দৃষ্টিতে তাকাতে তাকাতে বৃক্ষতলের দিকে অগ্রসর হয়। এবং কাউকেই আর দেখতে পায় না। তাহলেও মনের সন্দেহ যায় না রত্নাবতীর।

যে মুহূর্তে রত্নাবতী বৃক্ষতলে উপস্থিত হয়ে পার্বতীকে নিয়ে, চকিতে উন্মুক্ত অসিহস্তে রতন সিং ওদের সামনে এসে লাফিয়ে পড়েন।

দাঁড়াও।

রত্নাবতী থমকে দাঁড়িয়ে যায়। পার্বতীও।

কে তোমরা?

রত্নাবতীকে রতন সিং চিনতে পারেন না। প্রথমতঃ তার পরনে পুরুষের বেশ, দ্বিতীয় রত্নাবতীকে একবার মাত্র পূর্বে দেখেছিলেন।

রত্নাবতীও রতন সিংকে ঠিক চিনে উঠতে পারে না, তবে তার বেশভুষা দেখে বুঝতে পারে সে কোন উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী।

রত্নাবতীকে আবার সম্বোধন করে বল্লেন রতন সিং, বল তোমার সঙ্গে ঐ নারী কে? আর এই অশ্বই বা কোথা থেকে কেমন করে তুমি পেলে?

রত্নাবতী কথা বলে না, গলার স্বরে পাছে সে নারী বলে তাকে চিনতে পারে। সে পার্শ্ববর্তী পার্বতীর গা টিপে কথা বলার জন্য নির্দেশ দেয়।

পার্বতীই তখন প্রশ্ন করে, তুমি কে?

আমার পরিচয় দেওয়ার আগে নিজেদের পরিচয় দাও কে তোমরা?

না। আগে তোমার পরিচয় দেবে তারপর আমাদের পরিচয় দেবো। পার্বতী বলে।

না পরিচয় দিলে এখুনি দুজনকে তোমাদের বন্দী করে কারাগারে নিয়ে যাবো।

কেন? কোন্ অপরাধে?

এই অশ্বচুরির অপরাধে।

অশ্বচুরি করেছি আমরা তোমার মনে হচ্ছে কেন।

তাছাড়া ঐ অশ্ব এখানে এ সময় কি করে এলো? রতন সিং ক্রুদ্ধ গলায় বলেন।

অশ্বটি তুমি চেনো?

চিনি বৈকি। মহিষী রত্নাবতীর প্রিয় অশ্বিনী রোহিণী!

তোমার পরিচয় না পাওয়া পর্যন্ত বলবো না। পার্বতী তার কথার পুনরাবৃত্তি করে।

আমি সৈন্যাধ্যক্ষ রতন সিংহ।

রত্নাবতী এতক্ষণে কথা বলে, রতন সিং! আমি মহিষী রত্নাবতী।

রতন সিংহ তাড়াতাড়ি সসম্ভ্রমে অভিবাদন জানায় রাজমহিষী রত্নাবতীকে। বলে, মা—আপনি?

হ্যাঁ রতন সিং, আমি।

রতন সিংয়ের যেন বিস্ময়ের অবধি নেই। এবং বিস্ময়াভিভূত কণ্ঠেই আবার তিনি প্রশ্ন করেন, এ সময়ে ঐ বেশে আপনি এখানে কেন মা?

প্রয়োজনে ছদ্মবেশ নিতে হয়েছে আমাকে।

প্রয়োজন।

হ্যাঁ।

কি সে প্রয়োজন জানতে পারি কি মা?

এখন আমার সময় সেই—এখুনি আমাকে প্রাসাদে প্রত্যাবর্তন করতে হবে—নচেৎ মহারাজার অগোচর কিছুই আর থাকবে না। যাক সে কথা, কালই হয়ত তোমার কাছে আমি কুর্চিকে পাঠাতাম।

আমার কাছে? কিন্তু কেন মা?

রতন সিং—

বলুন?

একজনকে কটা দিনের জন্য আশ্রয় দিতে পারবে?

কেন পারব না মা কিন্তু কাকে?

তোমার কাছে গোপন করব না রতন সিং—যোধপুর-কুমারীকে।

যোধপুর-কুমারী?

বিস্ময়ের উপর যেন বিস্ময়। রতন সিংহ যেন কেমন থতমত খেয়ে যায়।

আমার সঙ্গে যাকে তুমি দেখছো রতন সিং, এই ইনিই যোধপুর-কুমারী—পার্বতী—

রত্না ওদের পরস্পরের কথা এতক্ষণ নিঃশব্দে শুনছিল। পার্বতীর পরিচয় পেয়ে সে চুপ করে শোনে।

যার সন্ধানে সে এত দূরে এসেছে তার সঙ্গে যে আজই রাত্রে এমনি ভাবে সাক্ষাৎ হয়ে যাবে এ যে তার স্বপ্নেরও অগোচর ছিল।

কি রতন সিং? চুপ করে রইলে কেন? তবে কি তুমি আমার অনুরোধ পালনে সম্মত নও বুঝবো?

না মা—আপনার আদেশ নিশ্চয়ই আমি শিরোধার্য করবো। কিন্তু—

কি বল?

আপনি নিশ্চয়ই সব জানেন—

কি বল তো?

ঐ কুমারী মহারাণার বাগদত্তা বধূ।

কিন্তু ও তো বিবাহিতা।

বিবাহিতা ?

হ্যাঁ—ভালবেসে একজনের গলায় ও অনেক আগেই মালা দিয়েছে। হিন্দুনারীর কি দুবার বিবাহ হয় ?

না—তা হয় না।

কিন্তু মা, মহারাণা যদি ঘূণাক্ষরেও জানতে পারেন—

তবে আর তোমার সাহায্য চাইবো কেন রতন সিং ?

॥ ৩৯ ॥

রতন সিং চুপ করে থাকেন। মহারাণীর প্রস্তাবে সম্মত হওয়া মানেই মহারাণার বিরুদ্ধাচরণ করা। রতন সিং যে কেবল সৈন্যাধ্যক্ষই তাই নন তিনি মহারাণার অতীব বিশ্বাসভাজনদের একজন। সেক্ষেত্রে কেমন করে তিনি মহারাণার বিরুদ্ধাচরণ করবেন ?

অথচ মহারাণীর অনুরোধটুকুও তাঁর পক্ষে প্রত্যাখ্যান করা একপ্রকার অসম্ভব।

তবে কি জানব রতন সিং এ রাজ্যের প্রধানা মহিষীর সামান্য একটা অনুরোধ রক্ষার্থে অসমর্থ ? প্রশ্নটা করে রঙ্গাবতী পুনরায় রতন সিংয়ের মুখের দিকে তাকাল।

রতন সিং তথাপি নীরব।

বুঝেছি রতন সিং। বিপদগ্রস্তা একা অসহায় নারীকে আশ্রয় দিতেও আজ তুমি অক্ষম। বুঝতে পারলাম মেওয়ার আজ পুরুষহীন—সব ক্লীব—শুধু তাই নয় অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার মত সাহসটুকুও আজ আর তাদের নেই। এক নারী বিবাহিতা জেনেও—

সহসা রঙ্গাবতীকে বাধা দিয়ে পার্বতী ঐ সময় বলে ওঠে, থাক রাণীমা—ওঁকে আর অনুরোধ করবেন না। পার্বতীও রাজপুতানী—সে তার নিজের সতীত্ব রক্ষা করতে সক্ষম। কারো সাহায্যেরই তার প্রয়োজন হবে না।

না ভগ্নী। আপনি চলুন আমার গৃহে—, রতন সিং তাড়াতাড়ি বলে ওঠেন, আমি আপনাকে আশ্রয় দেবো।

আঃ, তুমি আমাকে নিশ্চিন্ত করলে রতন সিং—রঙ্গাবতী বলে ওঠে, সত্যি কি বলে যে তোমাকে আমি ধন্যবাদ জানাব—

ভগ্নীকে ভাই আশ্রয় দেবে তার মধ্যে ধন্যবাদের কথা কোথা থেকে আসছে, রতন সিং বলেন, চলুন আর দেরি করবেন না—রাত্রি প্রায় শেষ হয়ে এলো।

যাও পার্বতী—রতন সিংয়ের গৃহে তুমি যাও—রঙ্গাবতী বলে।

ইতিমধ্যে কুর্চি বৃক্ষতলে এসে হাজির হয়েছিল হাঁপাতে হাঁপাতে। রঙ্গাবতী কুর্চির দিকে তাকিয়ে বলে, তোর আসতে এত দেরি হলো যে কুর্চি ?

একটু কাজ ছিল রাণীমা।

অতঃপর রঞ্জাবতী কুর্চিকে নিয়ে বিদায় নিল। অশ্বপৃষ্ঠে আরূঢ় হয়ে রঞ্জাবতী প্রাসাদাভিমুখে অশ্ব ছোটায়।

রতন সিং ফিরে তাকালেন পার্বতীর দিকে, বললেন, চলুন ভগ্নী—মাড়বার-রাজনন্দিনী আপনি—আর আমি সামান্য এক সৈন্যাধ্যক্ষ—আমার গৃহে আপনার যোগ্য সম্মান আমি দিতে পারব না হয়ত—

ও কথা বলছেন কেন ? পার্বতী বলে ওঠে, ভগ্নী বলে আমাকে গ্রহণ করেছেন যখন তখন সে প্রশ্ন তো আসে না। ভ্রাতার গৃহ তা পর্ণকুটীর হলেও বোনের কাছে যে তা স্বর্গ।

রত্না এতক্ষণ একটি কথাও বলে নি। নিঃশব্দে এক পাশে দাঁড়িয়ে সকলের কথোপকথন শুনছিল, সে এবারে বলে, তুমি ঠিকই বলেছো রাজকুমারী—পৃথিবীতে নারীর স্বামীর গৃহের পরে একমাত্র নিশ্চিন্ত আশ্রয় তার ভাইয়ের গৃহেই।

পার্বতী রত্নার দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করে, তোমাকে তো চিনলাম না ভাই—তোমার অঙ্গে দেখছি পুরুষের বেশ, অথচ—

আমার পরিচয় দেবার মত কিছুই নেই রাজকুমারী। রত্না বলে, সামান্য এক নর্তকী মাত্র—

নর্তকী।

রত্নার পরিচয় আপনাকে আমি পরে দেবো রাজকুমারী—এখন চলুন—রাত্রি প্রায় শেষ হয়ে এলো। অনেকটা পথ যেতে হবে আমাদের,—রতন সিং বলেন।

সকলে অতঃপর রতন সিংয়ের গৃহের দিকে অগ্রসর হয়। অশ্বের বল্গা ধরে আগে আগে হেঁটে চলেন রতন সিং, তাঁর পশ্চাতে ওরা দুজনে পাশাপাশি হেঁটে চলে। ত্রিযামা রাত্রির শেষ পরিক্রমা তখন চলেছে।

পূর্বাশার প্রান্তে ক্রমশঃ লাগছে যেন একটা আলোর প্রলেপ। নিশি অবসানে চিতোরগড়ের জাগরণ আসন্নপ্রায়। গাছের ডালে ডালে ঘুমভাঙ্গা পাখীর ডানা ঝাপটানি শোনা যায়।

ভোরের শীতল বায়ু ওদের চোখেমুখে লাগে। শীত রাত্রিশেষের হিমশীতল বায়ু।

চিতোরগড়ের পশ্চিম প্রান্তে রতন সিংয়ের আবাস। আজো অকৃতদার রতন সিং। গৃহে লোকজনের মধ্যে বৃদ্ধা মা শঙ্করীবাঈ ও প্রৌঢ় এক ভৃত্য বুধা সিং।

সামান্য সৈনিক হয়ে একদিন রাণার সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়েছিলেন রতন সিং, তারপর ক্রমশঃ নিজ বুদ্ধি, সাহস ও কর্মদক্ষতায় সৈন্যাধ্যক্ষের পদে উন্নীত হয়েছেন।

ওরা যখন রতন সিংয়ের গৃহদ্বারে এসে উপস্থিত হলো, ভোরের আলো তখন আরো স্পষ্ট হয়ে উঠছে। রুদ্ধ দ্বারে বার দুই করাঘাত করতেই দ্বার খুলে গেল।

সামনেই দাঁড়িয়ে রতন সিংহর বৃদ্ধা মাতা শঙ্করীবাঈ। রতন এত দেরি হলো

যে ফিরতে—

কিন্তু শংকরীবাঈ তার কথা শেষ করতে পারেন না—পুত্রের সঙ্গে এক নারী ও এক পুরুষকে দেখে সবিস্ময়ে পুত্রের মুখের দিকে তাকান জননী।

এঁরা কারা রতন ?

মা—এরা আমাদের অতিথি—, রতন সিং বলেন।

জননী পথ ছেড়ে দাঁড়ালেন। সকলে ভিতরে প্রবেশ করে। এবং ভিতরে প্রবেশ করে ভিতর থেকে দ্বারে অর্গল তুলে দেন রতন সিং।

ওঁরা দুজনাই পরিশ্রান্ত—ওদের দুজনারই বিশ্রামের প্রয়োজন মা। পশ্চিমের যে ঘরটা খালি পড়ে আছে সেই ঘরেই ওদের থাকবার ব্যবস্থা করে দাও মা।

শংকরীবাঈ কেমন যেন একটু সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতেই একবার রত্না ও পার্বতীর দিকে তাকিয়ে পুত্রের মুখের দিকে দৃষ্টি ফেরালেন।

রতন বুঝতে পারেন কেন মার মনে দ্বিধা জেগেছে। তিনি মৃদু হেসে বলেন, ভয় নেই মা—ওঁরা দুজনই নারী।

নারী !

হ্যাঁ—উনি মাড়বার রাজকুমারী—

মাড়বার রাজকুমারী—কি বলছিস রতন ?

হ্যাঁ মা—আর উনি রত্না, ওর সহচরী।

বৃদ্ধা শংকরীবাঈ যেন পুত্রের কথাটি ঠিক হৃদয়ঙ্গম করে উঠতে পারেন না। মাড়বার রাজকুমারী তাঁদের পর্ণকুটীরে—আর পুত্রের সঙ্গেই বা কি করে এলো।

যাও মা—আর দেরি করো না। ওঁদের ঘর দেখিয়ে দাও।

পার্বতীর দিকে তাকিয়ে শংকরীবাঈ বলেন, এসো মা—চল—

ওরা শংকরীবাঈকে অনুসরণ করে।

ছোট বাড়ি—ছোট ছোট চারটি কক্ষ। তারই পশ্চিমের কক্ষে ওদের নিয়ে যান শংকরীবাঈ। কক্ষ অন্ধকার।

একটু দাঁড়াও মা—আমি একটা আলোর ব্যবস্থা করি।

পার্বতী বলে ওঠে, না না—আপনি ব্যস্ত হচ্ছেন কেন ? রাতও প্রায় শেষ হয়ে গিয়েছে—এখুনি চারিদিকে আলো হবে—

শংকরীবাঈ শুনলেন না—চলে গেলেন।

খোলা জানালা-পথে প্রথম ভোরের আলো কক্ষমধ্যে সামান্য যা প্রবেশ করেছে, তাতেই কক্ষমধ্যে একটা আলো-আঁধারির সৃষ্টি হয়েছে।

রত্না গিয়ে খোলা জানালার সামনে দাঁড়াল। রত্না তখন থেকেই একটা কথা ভাবছিল—কি বিচিত্র যোগাযোগ। যার সন্ধানে সে দীর্ঘপথ ছুটে এসেছে—এবং যার সন্ধান চিতোরগড়ের মত এত বড় জায়গায় কি করে পাবে ভেবে চিন্তিত হয়েছিল, তারই সঙ্গে যে এমন এক পরিস্থিতিতে সাক্ষাৎ হয়ে যাবে ভাবতেও কি পেরেছিল রত্না।

গাঙ্গকে সে প্রতিশ্রুতি দিয়ে এসেছিল, যেমন করেই হোক পার্বতীকে সে খুঁজে বের করবেই।

রাজকুমারী তুমি প্রস্তুত থেকো, রাত্রির দ্বিতীয় প্রহরে আমি আসবো।

কথাটা বলেই রত্না কক্ষ ত্যাগ করেছিল। পার্বতী রত্নাকে দ্বিতীয় প্রশ্ন করবার আর সুযোগ পায় নি। তবে এইটুকু সে অনুমানেই বুঝে নিয়েছিল মহারাণী রত্নাবতীর সাহায্যে সে তার বীরেন্দ্রর সঙ্গে সাক্ষাতের কোন ব্যবস্থা করেছে ঐ দিনই রাত্রির দ্বিতীয় প্রহরে কোথায়ও।

পার্বতী অধীর অপেক্ষায় প্রতীক্ষা করছিল। চোখে তার ঘুম ছিল না। প্রাসাদের চারিদিক ক্রমশঃ নিস্তব্ধ নিঝুম হয়ে আসে। সকলেই রাত্রির মত যে যার শয্যায় আশ্রয় নিয়েছে—কেবল অলিন্দে অলিন্দে এখানে ওখানে রাতবাতি জ্বলছে—সতর্ক প্রহরীদের সন্তর্পণে চলাফেরা।

সমস্ত চিতোরগড়ের উপরে যেন রাত্রি নিদ্রার পরশ কাঠি বুলিয়ে দিয়েছে। দণ্ডের পর দণ্ড অতিবাহিত হয় কিন্তু রত্নার কোন সাড়া পাওয়া যায় না। অপেক্ষা করতে করতে বুঝি পার্বতী ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল।

রত্না এলো রাত্রির তৃতীয় প্রহরে। বন্ধ দরজার গায়ে মৃদু শব্দ শোনা গেল। পার্বতী চকিত হয়ে ওঠে, কান পেতে শব্দটা ভাল করে শোনবার চেষ্টা করে। আবারও বন্ধ দরজার গায়ে মৃদু শব্দ হলো।

পার্বতী সন্তর্পণে এগিয়ে গিয়ে বন্ধ দরজা খুলে দিল। সর্বাঙ্গে এক সূক্ষ্ম কালো রেশমী ওড়না জড়ানো এক নারীমূর্তি দরজার সামনে দাঁড়িয়ে।

কে?

চুপ। চাপা গলায় নারী বললে, এসো আমার সঙ্গে—

কথাটা বলে নারীমূর্তি আর দাঁড়াল না—এগিয়ে চলল। মুহূর্তের জন্য বুঝি পার্বতী ইতস্ততঃ করেছিল, তারপরই নারীমূর্তিকে সে অনুসরণ করে।

স্বল্পালোক অলিন্দপথে একটা আলো-আঁধারির সৃষ্টি করেছে—নির্জন অলিন্দপথ—আগে আগে সেই নারীমূর্তি, পশ্চাতে পার্বতী লঘু সতর্ক পদবিক্ষেপে পূর্ববর্তিনীকে অনুসরণ করে চলে।

অলিন্দও সরু পথ অতিক্রম করে দুজনে এসে এক বন্ধ দরজরে সামনে দাঁড়ালো। চাপা সতর্ক কণ্ঠে নারীমূর্তি বললে, তুমি এখানেই অপেক্ষা কর, আমি দেখে নিই আগে বাইরেটা।

সন্তর্পণে দরজা খুলে নারীমূর্তি বাইরে চলে গেল। পার্বতী অন্ধকারে দাঁড়িয়ে রইলো।

এক-একটা প্রতীক্ষার মুহূর্ত যেন এক-একটা যুগ বলে মনে হয়।

পার্বতী ভাবছিল, কাকে অনুসরণ করে সে এলো। রত্নাই তো না অন্য কেউ? যদি অন্য কেউ হয়—ওদিকে কোন বিপদ থাকে।

প্রাসাদের ভিতর ও বাইরে সতর্ক প্রহরীরা প্রহরা দিচ্ছে। ধরা পড়লে আর রক্ষা নেই। কোনক্রমে যদি মহারাণা জানতে পারেন ব্যাপারটা, তিনি কাউকেই নিষ্কৃতি দেবেন না। স্বয়ং রাজমহিষীও নিষ্কৃতি পাবেন না। অদূরে একটা পদশব্দ শোনা গেল। সম্ভবত কোন প্রহরীর পদশব্দ। কটিদেশে গোঁজা তীক্ষ্ন ছুরিকাটা ডান হাতের মুঠি দিয়ে নিজের অজ্ঞাতেই একবার চেপে ধরল পার্বতী।

কিন্তু ক্রমশঃ পদশব্দটা মিলিয়ে গেল অন্যদিকে।

ঠিক সেই মুহূর্তে নারীমূর্তি ফিরে এলো। চাপাকণ্ঠে ফিস্‌ফিস্‌ করে বললে, এসো রাজকুমারী—

রত্না। রত্নাকে এবারে সঠিকভাবে চিনতে পেরেছে পার্বতী। নারী আর কেউ নয়, রত্নাই।

রত্না পূর্ববৎ সতর্ক চাপাকণ্ঠে বলে, চুপ। কথা বোল না। এসো আমার সঙ্গে—

পার্বতীর আর দ্বিধা নেই তখন, সে তাকে নিঃশব্দে অনুসরণ করে। রাণার প্রাসাদের পশ্চাৎ দিক।

অন্ধকার রাত্রি। দূরাগত নক্ষত্রালোকে সব কিছুই যেন কেমন ঝাপসা-ঝাপসা, ভাল করে কিছুই দৃষ্টিগোচর হয় না। অপ্রশস্ত একটি প্রাঙ্গণ দ্রুত অতিক্রম করে দুজনে এসে আর একটি দ্বার অতিক্রম করলো। সে দ্বারটি খোলাই ছিল। সামনেই পথ। এসো তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে। রত্না আবার বললে।

দুজনে দ্রুত এগিয়ে চলে। পথের ধারে একটি ঝাঁকড়া বৃক্ষতলে অন্ধকারে এক ছায়ামূর্তি দাঁড়িয়েছিল, সে এবারে ওদের দেখে এগিয়ে এলো।

বীরেন্দ্র।

রত্নার ডাকে বীরেন্দ্র সাড়া দেয়।

এই নাও তোমার পার্বতী। গড়ের প্রধান ফটকের দ্বারীকে নির্দেশ দেওয়া আছে—সে দ্বার খুলে দেবে। ফটকের বাইরে দুটি অশ্ব তোমাদের জন্য প্রস্তুত আছে—যত তাড়াতাড়ি পার চিতোরের সীমানা অতিক্রম করে যাও—যাও রাজকুমারী আর বিলম্ব করো না।

তুমিও আমাদের সঙ্গে চল রত্না, পার্বতী বলে।

আমি ? আমি কোথায় যাবো ?

কেন—আমাদের সঙ্গে—

না। আমি তো তোমাকে বলেছিই, আমি আর চিতোর ছেড়ে যাবো না। যাও দেরি করো না—বিলম্বে বিপদ ঘটতে পারে।

সত্যিই তুমি যাবে না রত্না ?

না। যাও তোমরা।

এসো পার্বতী, বীরেন্দ্র পার্বতীর হাত ধরে আকর্ষণ করে। তারপর দুজনে অন্ধকারে মিলিয়ে যায়।

রত্না তারপরও কিছুক্ষণ বৃক্ষতলে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে থাকে। বার বার মনে মনে ওদের জন্য ঈশ্বরের কাছে মঙ্গল প্রার্থনা জানায়।

ওদের রক্ষা করো দেবতা। ওদের রক্ষা করো। অমন সুন্দর দুটি জীবনকে ব্যর্থ করে দিও না—ওদের বাঁচতে দাও।

ফিরে এলো রত্না প্রাসাদে ক্লান্ত পায়ে। নিজের নির্দিষ্ট কক্ষেই খোলা বাতায়নের সামনে রত্না দাঁড়িয়েছিল। রাত্রির তৃতীয় প্রহরও উত্তীর্ণ হতে চললো

প্রায়। বাইরের অন্ধকার ক্রমে ঝাপসা হয়ে আসছে।

কক্ষের বাইরে পদশব্দ শোনা গেল। কক্ষের দ্বার বন্ধ ছিল—বন্ধ দ্বারের দিকে তাকাল রত্না। বন্ধ দ্বারে করাঘাত শোনা গেল।

কে?

এগিয়ে গেল রত্না—কপাটের গায়ে আবার করাঘাত।

কক্ষের দ্বার উন্মুক্ত করেই সভয়ে দু'পা পিছিয়ে এলো রত্না। কক্ষের আলোয় উন্মুক্ত দরজার সামনে দাঁড়িয়ে স্বয়ং মহারাণা।

রত্না তাড়াতাড়ি অভিবাদন জানায় মহারাণাকে।

রত্না—পার্বতী কোথায়?

সর্বনাশ। তবে কি মহারাণা সব কিছু জেনে ফেলেছেন? অজ্ঞাত একটা ভয়ে রত্নার বুকের ভিতরটা দুরু দুরু করে কেঁপে ওঠে, কিন্তু নিজেকে যথাসাধ্য সংযত করে সে জবাব দেয়, কেন—তিনি তাঁর কক্ষে।

না। সে তার কক্ষে নেই। কোথায় সে?

আমি—আমি কেমন করে জানব প্রভু, রাজকুমারী কোথায়।

তুমি তার সর্বক্ষণের সহচরী—তুমি জান না সে কোথায়?

সত্যিই আমি জানি না।

আমি বুঝতে পেরেছি সে প্রাসাদ থেকে পালিয়েছে আর তুমিই তাকে পলায়নে সাহায্য করেছো। বল কোথায় সে—নচেৎ জেনো তোমাকে জীবন্ত দগ্ধ হতে হবে—

রত্না চুপ করে থাকে।

আমি সর্বত্র অনুসন্ধানকারী প্রেরণ করেছি—কোথায় যাবে সে—কতদূর যাবে—ধরা সে পড়বেই—এখনো বল কখন সে প্রাসাদ ত্যাগ করেছে।

রত্না তথাপি নীরব। নিঃশব্দে মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে থাকে সে।

একটা নিরুপায় আক্রোশে ফুঁসতে থাকে মহারাণা।

শোন রত্না, আমি মিথ্যা ভীতিপ্রদর্শন করি নি তোমাকে। তোমাকে আমি একটা দিন ও একটা রাত ভাববার সময় দিলাম—যদি তুমি বল কোথায় সে গিয়েছে—কার সঙ্গে গিয়েছে তাহলেই তোমাকে আমি মুক্তি দেবো নচেৎ জেনো জীবন্ত অগ্নিতে দগ্ধ হতে হবে তোমাকে। কথাগুলো বলে মহারাণা দ্বারীকে ডাকল।

দ্বারী এসে অভিবাদন জানাল রাণাকে।

মাহাঙ্গু সর্দার।

দ্বারী চলে গেল।

রত্না যেমন মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে ছিল তেমনিই দাঁড়িয়ে থাকল পাষাণ-প্রতিমার মত।

কি, জবাব দেবে, না দেবে না? রাণা আবার প্রশ্ন করে।

এবারে মুখ তুলে তাকাল রত্না মহারাণার দিকে—স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো মহারাণার চোখের দিকে কয়েকটা মুহূর্ত, তারপর ধীর শান্ত কণ্ঠে বললে,

না, মহারাণা।

জবাব দেবে না ?

না।

স্পর্ধা—সামান্যা নর্তকী। ঠিক আছে তবে জ্বলন্ত অগ্নিতেই দগ্ধে মর—

রাজপুত আপনি মহারাণা, আপনি কি চেনেন না রাজপুতানী নারীকে।

চরিত্রহীনা নর্তকী। ক্রুদ্ধ একটা সাপের মতই যেন হিস্‌হিস্‌ করে ওঠে রাণা সংঘ।

দপ্‌ করে যেন সহসা দুটি চোখের তারা জ্বলে ওঠে রত্নার। তারপর চাপা গলায় বলে ওঠে, হ্যাঁ, মহারাণার নর্তকী আমি—নর্তকী মায়ের গর্ভজাত কন্যা, নর্তকীই হতে হয়েছে—আপনাদেরই অপূর্ব সমাজব্যবস্থায়—যেহেতু এক নর্তকী-কন্যাকে গৃহে স্থান দিলে আপনাদের আভিজাত্যের সকল গরিমা ধুলোয় লুটিয়ে পড়বে, কিন্তু সেই কন্যাকে নাচমহলে, প্রমোদকক্ষে বক্ষে টেনে নিতে এতটুকু বাধে নি আপনাদের—তখন আভিজাত্যের কথা মনে থাকে নি, আর চরিত্রহীনা—, কে তাকে চরিত্রহীনা করেছে মহারাণা—সে আপনাদেরই পুরুষের লালসা নয় কি। চরিত্রহীনা আমি, না যে পুরুষ এক অসহায় নারীর দেহকে জোর করে ভোগ করেছে—তার উপরে বলাৎকার করেছে সেই পুরুষ।

রত্না। সরোষে চিৎকার করে ওঠে রাণা সংঘ।

রাজপুতানী নারী মৃত্যুকে ভয় করে না মহারাণা—ভুলে যাবেন না এই চিতোরগড়েরই জহরব্রতের কথা। কিন্তু মহারাণা জিজ্ঞাসা করতে পারি কি, কোন্‌ যুক্তি কোন্‌ বিচারে কোন্‌ নীতিতে আপনি অন্যের স্ত্রীকে কামনা করছেন!

কি নিদারুণ স্পর্ধা ঐ নারীর, সঙ্গে সঙ্গে মহারাণার কটিদেশে হাত চলে গিয়েছিল—সেখানে গোঁজা ছুরিকাটার বাটটা শক্তমুঠিতে চেপেও ধরেছিল, কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তে দ্বারী এসে জানালো, মাহাঙ্গু সর্দার এসেছে—

মাহাঙ্গু!

মাহাঙ্গু কক্ষমধ্যে এসে প্রবেশ করে মহারাণাকে সসম্ভ্রমে অভিবাদন জানাল।

লোকটার বিরাট দেহ—মানুষ তো নয়, মনে হয় যেন একটা হস্তীশিশু—ঘাড়-গর্দানের মেদবাহুল্যে সব যেন একাকার হয়ে গিয়েছে। ছোট ছোট দুটি বর্তুলাকার অক্ষিগোলক রক্তাভ। মাথাটা দেহের অনুপাতে ছোট।

মাহাঙ্গু!

হুকুম—মহারাণা।

ওকে নিয়ে গিয়ে কারাকক্ষে বন্দী করে রাখ। কাল সন্ধ্যায় ওকে জ্বলন্ত অগ্নিতে দগ্ধ করবি—আর তার পূর্বে তীক্ষ্ন ছুরিকা দিয়ে ওর জিহ্বা কর্তন করবি—যা—নিয়ে যা।

যাও রাজপুতানী—

রত্না মৃদু হাসলো, তারপর শান্ত ধীর কণ্ঠে বললে, চললাম মহারাণা, আপনি জানেন না, জানতেও কোনদিন পারবেন না হতভাগিনী রত্নাকে মৃত্যু নয়—কত

বড় আশীর্বাদ আপনি করলেন মৃত্যুদণ্ডাদেশ দিয়ে। যাবার আগে শেষ একটি অনুরোধ জানিয়ে যাই—যোধপুরকুমারী পার্বতীকে ভুলে যান—সে অন্যের স্ত্রী—আপনার কন্যার বয়সী। কথাগুলো বলে আর দাঁড়াল না রত্না, ধীর শান্ত পদবিক্ষেপে কক্ষ ত্যাগ করে চলে গেল। মাহাঙ্গু তাকে অনুসরণ করল।

মহিষী রত্নাবতীর নির্দেশমত কোন ব্যবস্থারই ত্রুটি ছিল না। গড়ের প্রধান ফটকরক্ষী শক্তি সিংহ বীরেন্দ্র ও পার্বতীকে ফটক খুলে গড়ের বাইরে বের করে দিতে দিতে বলে, বাইরে এক রশি পথ গেলেই কেশরী সিংহের দেখা পাবেন—সে আপনাদের জন্য দুটি দ্রুতগামী অশ্ব নিয়ে প্রস্তুত হয়ে আছে—তাকে সাংকেতিক শব্দ বলবেন—'নিশি', তাহলেই সে অশ্ব দুটি আপনাদের দেবে।

শক্তি সিংহকে ধন্যবাদ জানিয়ে বীরেন্দ্র পার্বতীর হাত ধরে দ্রুত এগিয়ে চলে। শক্তি সিংহ মিথ্যা বলে নি, কেশরী সিংহ দুটি অশ্ব নিয়ে পথের ধারে একটি বৃক্ষমূলে ওদের জন্য অপেক্ষা করছিল, ওদের দেখতে পেয়ে শুধায়, কে?

সঙ্গে সঙ্গে বীরেন্দ্র জবাব দেয়, নিশি।

কেশরী সিংহ বীরেন্দ্রর হাতে অশ্বের লাগাম তুলে দেয়। বীরেন্দ্রও আর বিলম্ব করে না দুজনে দুটি অশ্বে আরোহণ করে খুব দ্রুত ঢালু পথ বেয়ে নীচের দিকে নেমে যায়। চিতোর সীমানা যখন ওরা অতিক্রম করছে রাত্রি তখন শেষ হয়ে আসছে।

পূর্বাশার প্রান্তে আলো-আঁধারির লুকোচুরি চলেছে। তীরবেগে দুজনে পাশাপাশি অশ্বচালনা করছিল—দুজনাই ঘর্মাক্ত-কলেবর এবং গুরু পরিশ্রমে অশ্ব দুটির মুখ দিয়েও ফেনা গড়িয়ে পড়ছিল। ক্রমশঃ প্রভাতের আলো স্পষ্ট হয়ে ওঠে আরো।

কোন্ দিকে যাচ্ছি আমরা বীরেন্দ্র? পার্বতী শুধায়।

চিনতে পারছো না বোধ হয় এই পথ। বীরেন্দ্র বলে।

না।

আমরা যাচ্ছি মাড়বারের দিকে। বীরেন্দ্র জবাব দেয়। সঙ্গে সঙ্গে পার্বতী তার অশ্বের রাশ আকর্ষণ করে অশ্বের গতি রোধ করে। কয়েক কদম এগিয়ে গিয়েছিল বীরেন্দ্র—পার্বতী অশ্ব থামাতেই সেও অশ্বের বল্গা টেনে ঘুরে দাঁড়ায়।

কি হলো—অশ্বের গতিরোধ করলে কেন পার্বতী?

তুমি মাড়বারে যাচ্ছো।

হ্যাঁ।

তাহলেই তুমি একাই যাও।

কি বলছো তুমি পার্বতী? তুমি যাবে না?

না।

কেন?

ভুলে গেলে ? সেখান থেকে আমি বিতাড়িত ?

না, তুমি নও পার্বতী—আমি।

তুমি আমি কি পৃথক বীরেন্দ্র।

পার্বতী।

হ্যাঁ, যেখানে তোমার স্থান নেই সেখানে জেনো আমারও স্থান নেই।

শোন পার্বতী—আমি স্থির করেছি—

কি স্থির করেছো ?

মহারাজ গাঙ্গের হাতেই তোমাকে আমি সমর্পণ করবো।

কথাটা শেষ হলো না বীরেন্দ্রর, একটা অস্ফুট চিৎকার করে ওঠে পার্বতী, বীরেন্দ্র।

শোন পার্বতী, আমি বুঝতে পেরেছি একমাত্র ভগিনী তোমাকে ত্যাগ করে কি নিদারুণ মর্মপীড়ায় মহারাজ আজ সর্বক্ষণ ছটফট করছেন—

মহারাজ গাঙ্গকে তুমি জান না বীরেন্দ্র, সে আমার আপন সহোদর তাকে আমি চিনি—আজ পার্বতী তার কাছে মৃত।

তাই যদি হতো তো সর্বত্র তিনি তোমার অনুসন্ধানে লোকের পর লোক প্রেরণ করতেন না।

ভুল। তোমার ভুল বীরেন্দ্র। গাঙ্গ আমার জন্য এতটুকুও ব্যাকুল নয়—তার আভিজাত্য, মিথ্যা অহংকারই তাকে আজ অস্থির করে তুলেছে। সে ভুলতে পারছে না কিছুতেই পার্বতী সাধারণ এক সৈনিককে বিবাহ করেছে। সে তোমায় পেলে জেনো হত্যা করবে।

হয়ত করবে—হয়ত নাও করতে পারে, কিন্তু তাহলেও আমাকে আজ মাড়বারে ফিরে যেতেই হবে।

যেতেই হবে ?

হ্যাঁ।

কিন্তু কেন ?

মাড়বার আমার জন্মভূমি—সমগ্র রাজস্থান আজ বিপন্ন—তুমি হয়ত জান না তাতারসম্রাট তার বিপুল বাহিনী নিয়ে ভারতভূমিতে প্রবেশ করেছে। এবারে আর লুণ্ঠন নয়—ভারতে মুঘলের রাজ্যস্থাপন। দেশের আজ এত বড় দুর্দিনে—এই বিপদের মুহূর্তে কেমন করে আমি দূরে থাকবো। আমার জ্ঞাতিভাই ও স্বজাতিদের পাশে আজ যদি গিয়ে না দাঁড়াতে পারি, তবে কেন অস্ত্রশিক্ষা করলাম—কেন সৈনিকব্রত জীবনে নিলাম ? না—পার্বতী না—তুমি আমাকে বাধা দিও না। মাড়বারে আজ আমাকে ফিরে যেতেই হবে। যুদ্ধ যদি করতেই হয় তো তাদেরই পাশে দাঁড়িয়ে করবো—মৃত্যু যদি আসে তো তাদের সঙ্গেই আসুক—

বেশ চল, তাই হোক, তবে—

বল পার্বতী, কি ?

রাজপ্রাসাদে আমি ফিরে যাবো না।

কিন্তু আমার সামান্য পর্ণকুটিরে তুমি থাকবে কি করে ?

বিবাহের পর মেয়েদের যে স্বামীর গৃহই একমাত্র জায়গা তাও কি তোমার জানা নেই—তা সে রাজপ্রাসাদই হোক, পর্ণকুটিরই হোক বা গাছতলাই হোক। তুমি যেখানে থাকবে আমিও সেখানেই থাকবো। চল—যদি মাড়বারেই যাওয়া তুমি মনস্থ করে থাকে তো সেইখানেই চলো।

বীরেন্দ্র বুঝতে পেরেছিল পার্বতীকে সে নিবৃত্ত করতে পারবে না। যেখানেই সে যাবে পার্বতী সেখানেই তার অনুগামিনী হবে। বীরেন্দ্র মুগ্ধদৃষ্টিতে পার্বতীর মুখের দিকে তাকিয়ে ওর কথাগুলি শুনছিল, আর মনে মনে ভাবছিল, সত্যিই ধন্য সে—পার্বতীর মত নারীরত্ন সে লাভ করেছে, পার্বতীর মত নারীর অকুণ্ঠ ভালবাসা সে লাভ করেছে। পার্বতী তার জীবনে বিধাতার সর্বাপেক্ষা বড় আশীর্বাদ বুঝি।

কি দেখছো অমন করে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে ? পার্বতী বলে।

না। ভাবছিলাম—

কি ভাবছিলে ?

আমার কোন্ পুণ্যফলে তোমাকে লাভ করেছি জানি না।

লজ্জায় সহসা পার্বতীর সমগ্র মুখখানি যেন রক্তিম হয়ে ওঠে। আকাশও তখন রক্তাভ অরুণালোকে রঙিন হয়ে উঠেছে। সেই প্রথম সূর্যালোকে পার্বতীর লাজরক্তিম মুখখানি যেন বীরেন্দ্রর মনের মধ্যে অপূর্ব একটা মোহের সঞ্চার করে।

থাক্। হয়েছে—চল এবারে—দীর্ঘ পথ এখনো অতিক্রম করতে হবে। তাছাড়া এতক্ষণে হয়ত মহারাণা সব জানতে পেরে গিয়েছেন—

ঠিক বলেছো। চল।

দুজনে আবার অশ্বের বল্গা আকর্ষণ করে পাশাপাশি চলতে শুরু করে মাড়বারের পথের দিকে। অশ্বের গতি দ্রুত হতে দ্রুততর হয়।

দীর্ঘ দুই দিন ও এক রাত্রি ধরে দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে সন্ধ্যার প্রাক্কালে বীরেন্দ্র ও পার্বতী যোধপুরে এসে পৌঁছায়। আর একটু দেরি হলেই নগর প্রবেশের ফটক বন্ধ হয়ে যেতো। নগরে যখন ওরা প্রবেশ করল, ঘরে ঘরে তখন বাতি জ্বলে উঠেছে। বিপণিতে বিপণিতে তখনো খরিদ্দারদের কেনাকাটা চলেছে। দীর্ঘ পথশ্রমে দুজনাই ক্লান্ত। বেশভূষা ধূলিধূসর।

বীরেন্দ্র অশ্বের রাশ টেনে অশ্বের গতি রোধ করে বললে, এবারে আমরা পায়ে হেঁটে যাবো পার্বতী—নচেৎ নগরবাসীর মনে সন্দেহ জাগতে পারে আমাদের দেখে।

বীরেন্দ্রর কথায় যুক্তি আছে—পার্বতী বললে, তাই হোক।

অশ্ব হতে অবতরণ করে দুজনে পদব্রজে অতঃপর অগ্রসর হলো নগরের পশ্চিম প্রান্তে বীরেন্দ্রর গৃহের দিকে।

সাধারণ গরীব ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকেরা যেখানে বাস করে বীরেন্দ্রর গৃহ সেখানেই। বীরেন্দ্রর আপনার জন বলতে বিশেষ কেউই ছিল না—এক বৃদ্ধ পিতামহ লক্ষ্মণ সিংহ ছাড়া। ছোটবেলায় মা-বাপকে হারিয়ে লক্ষ্মণ সিংহের

কাছেই মানুষ হয়েছে বীরেন্দ্র। লক্ষ্মণ সিংহ একজন প্রাক্তন সৈনিক। নামকরা যোদ্ধা ছিল সে। বহু যুদ্ধ সে করেছে—সারা দেহে তার অসংখ্য ক্ষতচিহ্ন আজও বর্তমান।

যথেষ্ট বয়স হয়েছে লক্ষ্মণ সিংহের কিন্তু শরীরে আজও যেন বার্ধক্য তার দাঁত বসাতে পারে নি। দীর্ঘ ঋজু বলিষ্ঠ চেহারা। মাথার চুল সব পেকে সাদা হয়ে গিয়েছে। চোখের দৃষ্টিও ইদানীং কিছুটা কমে এসেছে। একটা চারপায়ার ওপর বসে লক্ষ্মণ সিংহ তামাকু সেবন করছিল অন্ধকার কুটিরপ্রাঙ্গণে—

হঠাৎ তার কানে এলো বহুকাল পরে যেন পরিচিত একটি প্রিয়কণ্ঠের ডাক—দাদু।

কে ?

দাদু! এগিয়ে এলো বীরেন্দ্র—সঙ্গে পার্বতী।

লক্ষ্মণ সিংহ উত্তেজনায় উঠে দাঁড়ায়, কে দাদুভাই—দাদুভাই এলি।

দু-বাহু প্রসারিত করে দেয় বৃদ্ধ—সম্মুখে দণ্ডায়মান বীরেন্দ্রকে দু-বাহু দিয়ে পরম স্নেহে বক্ষের ওপরে টেনে নেয়।

॥ ৪৮ ॥

বাবুর রবিবারই তার বিরাট সৈন্যবাহিনী নিয়ে এগিয়ে যাওয়া মনস্থ করলেও শেষ পর্যন্ত সোমবার প্রত্যুষের পূর্বে যাত্রা করা সম্ভবপর হলো না তার।

বাবুরের বিরাট সৈন্যবাহিনী লোক-লস্কর আত্মীয়-পরিজন আম্বালা থেকে যাত্রা করে এগিয়ে চলল ধীরে ধীরে। প্রথমে অশ্বারোহী সৈন্যর দল—তার পশ্চাতে পদাতিক বাহিনী—তার পশ্চাতে উষ্ট্রবাহিনী—তার পশ্চাতে হস্তীপৃষ্ঠে সম্রাট ও তার বেগমরা। ইতিমধ্যে যুদ্ধে কয়েকটি হস্তী হস্তগত হয়েছিল, ডুলীবাহিত হয়েও অনেকে চলেছিল—বিশেষ করে সম্রাটের আত্মীয়া ও জেনানা-মহলের স্ত্রীলোকেরা, সকলের পশ্চাতে বাদশাজাদা হুমায়ুন।

জেনানামহলের ডুলীগুলোর মধ্যেই একটা ডুলীতে চলেছিল মরিয়ম।

ডুলীর পর্দার ফাঁক দিয়ে মধ্যে মধ্যে তাকাচ্ছিল মরিয়ম।

সেই যে গভীর নিশীথে মরিয়মের রণবীরের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছিল, তারপর আর মরিয়ম রণবীরের কোন সংবাদ জানে না।

খাসদাসী আনোয়ারাও রণবীরের বিশেষ কোন সংবাদ সংগ্রহ করতে পারে নি। রণবীর সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে সঙ্গেই চলেছিল কেবলমাত্র ঐ সংবাদটুকুই আনোয়ারা জানতে পেরেছিল। কিন্তু সৈন্যবাহিনীর মধ্যে গিয়ে তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার কোন উপায় ছিল না। হয়ত আম্বালায় পৌঁছাবার পর সাক্ষাৎ হতে পারে।

আম্বালা থেকে যাত্রা করে বাবুর তার বিরাট সৈন্যবাহিনী নিয়ে সারাটা দিন পথ চলার পর একটা দীঘির পাড়ে এসে শিবির স্থাপনা করলেন। বিশ্রামের আর সময় নেই, এবারে সত্যিকারের যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতিপর্ব শেষ করতে হবে—

বাবুর তার সৈন্যাধ্যক্ষদের ও হুমায়ুনকে তার শিবিরে ডেকে পাঠাল। অতঃপর কিভাবে অগ্রসর হবে সকলে তারই পরামর্শের জন্য।

বাবুর তার সৈন্যবাহিনীর সামান্য অংশ শিবিরপ্রহরায় রেখে বাকী অংশকে বাম ও দক্ষিণ দুই ভাগে ভাগ করবার পরামর্শ দিল। শত্রুর আক্রমণ কখন কোন্ দিক থেকে আসে বলা তো যায় না, তাই পূর্ব হতে সতর্ক থাকাই কর্তব্য। দক্ষিণ ভাগের অধিনায়ক নিযুক্ত হলো বাদশাজাদা হুমায়ুন।

বাবুর হুমায়ুনকে নির্দেশ দিল সে তার অধীনস্থ বাহিনীর এক অংশকে নিয়ে যেন অবিলম্বে শত্রুপক্ষের হামিদা খাঁ ও তার বাহিনীকে আক্রমণ করে।

হুমায়ুন ইতিপূর্বে কখনো যুদ্ধ করে নি—ঐ তার প্রথম যুদ্ধযাত্রা। শত্রুর সঙ্গে প্রথম মোকাবিলা।

হুমায়ুন বাবুরের ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারী—তার মৃত্যুর পর হুমায়ুনই সিংহাসনে উপবেশন করবে—কাজেই বাবুর মনস্থ করেছিল হুমায়ুনকে সে তার নিজের মত করে গড়ে দিয়ে যাবে।

হুমায়ুন বরাবরই একটু শান্ত প্রকৃতির। পিতার মতই সে খানিকটা কবি-ভাবাপন্ন। কিন্তু সিংহাসন ও রাজত্ব রাখতে হলে কঠোর হওয়া প্রয়োজন, কুট-বুদ্ধির প্রয়োজন। সম্রাট-বাদশাদের জীবনটা যে কেবল কবিতা ও বিলাস নয় হুমায়ুনের সেটা জানা প্রয়োজন। হুমায়ুনকে একাকী তার সৈন্যবাহিনী নিয়ে যুদ্ধে প্রেরণের মধ্যে বাবুরের সেটাও একটা বড় উদ্দেশ্য ছিল।

সম্রাটের আদেশ শিরোধার্য করে হুমায়ুন বাবুরের শিবির থেকে বের হয়ে এলো। নিজের শিবিরে এসেই সে তার অধীনস্থ সৈন্যাধ্যক্ষদের ডেকে পাঠাল—রণবীর তাদের মধ্যে অন্যতম।

হুমায়ুন বললে, আলম খাঁ—রণবীর—কাল প্রত্যূষেই আমি যুদ্ধযাত্রা করব, তোমরা তোমাদের অধীনস্থ সৈন্যবাহিনী নিয়ে আমার সঙ্গে যাবে।

রণবীর প্রশ্ন করে, কখন যাত্রা করবেন ?

রাত্রির শেষ প্রহর উত্তীর্ণ হবার পূর্বেই।

রণবীর আর কোন কথা বলে না।

আপনারা তাহলে যান প্রস্তুত হোন—মনে থাকে যেন রাত্রির শেষ প্রহর উত্তীর্ণ হবার পূর্বেই আমরা যাত্রা শুরু করবো।

রণবীর তার শিবিরে ফিরে এলো।

যুদ্ধ। তাহলে সত্যিসত্যিই শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ শুরু হতে চললো তার দেশবাসীর সঙ্গে। দেশের শত্রুর সঙ্গে আজ সে হাত মিলিয়েছে।

দেশের শত্রু আজ সে। যেদিন কৈশোরে প্রথম অসি মুঠি করে ধরেছিল, সেদিন কে ভাবতে পেরেছিল রণবীর তার সেই অসি তার নিজের জন্মভূমি—দেশবাসীর বিরুদ্ধে চালনা করবে। কোথা থেকে কি হয়ে গেল।

জীবনটা যেন একেবারে উলটপালট হয়ে গেল মুহূর্তে। সুখের নীড় এক গড়ে তুলবে স্বপ্ন দেখেছিল চন্দনাকে নিয়ে, নির্মম নিষ্ঠুর ভাগ্য তার সে স্বপ্নকে ভেঙে চুরমার করে দিল। যবনের হাতে নিগৃহীতা হলো তার চন্দনা।

একদল সশস্ত্র সৈনিক লুঠ করে নিয়ে গেল তার চন্দনাকে। কোন বাধা দেবারই অবকাশ পেল না। কত রাত—তার পর কত বিনিদ্র রাত সে সেই যবনের দুর্ভেদ্য মহালের চারপাশে তৃষিত প্রেতের মত ঘুরে ঘুরে বেড়িয়েছে।

নিদ্রাহীন দুটি চক্ষু একসময় জ্বালা করেছে। তবু নিদ্রা নামে নি চোখে। কানে এসেছে নুপুরের নিক্কণ। রাত্রির ক্লান্ত বাতাসে ভেসে এসেছে ক্লান্ত নুপুরের ধ্বনি, নিরুপায় এক আক্রোশে বুকের ভিতরটা জ্বলে পুড়ে যেন খাক হয়ে গিয়েছে।

তবু—তবু ফিরে যেতে পারে নি। নাগোরে দৌলত খাঁর প্রাসাদের চতুষ্পার্শ্বে এক অভিশপ্ত প্রেতের মতো যেন বুক ভরা তৃষ্ণা নিয়ে ঘুরে ঘুরে বেড়িয়েছে।

ঐ প্রাসাদেরই কোন এক কক্ষে দিলোয়ার খাঁ তার চন্দনাকে অবরোধ করে রেখেছে। হয়ত বন্দিনী এক পাখীর মত দিবারাত্রি বন্ধ পিঞ্জরের দেওয়ালে মাথা কুটে কুটে মরছে চন্দনা। কিম্বা হয়ত আজ আর চন্দনা বেঁচেই নেই। বক্ষের মধ্যে আমূল ছুরিকাবিদ্ধ করে অথবা বিষপান করে তার সকল জ্বালা, সকল অপমানের অবসান ঘটিয়েছে। চন্দনা তার আজ আর ইহজগতেই নেই। তবু—তবু ফিরে আসতে পারে নি সেদিন রণবীর। আশায় আশায় প্রতীক্ষায় প্রতীক্ষায় হয়ত রণবীর একদিন পাগল হয়েই যেতো, যদি না হঠাৎ এক রাত্রে দূর থেকে সে চন্দনাকে শিবিকারোহণের সময় দেখতে পেত।

দৌলত খাঁর গৃহে কোথা থেকে কে জানে এক সম্মানিত মেহমান এসেছিল। দুটো দিন দুটো রাত দৌলত খাঁর প্রাসাদে খানাপিনা নৃত্যগীত।

তৃতীয় রাত্রির মধ্যযামে হঠাৎ রণবীরের নজরে পড়লো চারজন বাহক দ্বারা বাহিত হয়ে একটি শিবিকা এসে দাঁড়ালো প্রাসাদের পশ্চাৎ দিককার দ্বারের সামনে। কয়েকজন সশস্ত্র সৈনিক—একজন মশালবাহী—হাতে তার জ্বলন্ত মশাল। মশালের রক্তাভ আলোয় রাত্রির অন্ধকার যেন কেমন অস্বচ্ছ পাণ্ডুর মনে হয়। অস্বচ্ছ হলেও সব দৃষ্টিতে পড়ে।

প্রাসাদের পশ্চাতের দ্বার একসময় খুলে গেল—প্রথমে একজন পরিচারিকা বোরখা ঢাকা—তারপরই কে—কে ও—রণবীরের দু-চোখের অনুসন্ধানী দৃষ্টি তীক্ষ্ন সজাগ হয়ে ওঠে যেন মুহূর্তে। এক নারীমূর্তি।

এক নারীমূর্তি পরিচারিকাদের পশ্চাতে প্রাসাদ-অভ্যন্তর থেকে বের হয়ে এলো। তার পূর্বেই শিবিকাবাহকেরা ও সৈন্যরা অল্পদূরে সরে গিয়েছে পরিচারিকাদের নির্দেশে। নারীমূর্তির মুখখানি ঢাকা সূক্ষ্ম এক রেশমী জালিকায়। তার মুখটা দেখবার উপায় নেই।

রণবীর ভাবে, হয়ত দৌলত খাঁরই কোন বেগম কোথায়ও চলেছে তাই এত সাবধানতা। কিন্তু পরক্ষণেই আবার মনে হয়, তাই যদি হবে তো মধ্যরাত্রে কেন? আর সামান্য ঐ শিবিকার ব্যবস্থাই বা কেন। সামান্য দু-চারজন দেহরক্ষী সৈন্য মাত্রই বা কেন?

রণবীরের মনের সেই সংশয় ও ভুল ভাঙতে বেশী দেরি হয় না। রণবীর তখন অল্প দূরে এক বৃক্ষের অন্তরালে নিজেকে গোপন করে দাঁড়িয়ে আছে।

ব্যবধান মাত্র কয়েক হস্তের। সেই নারীমূর্তি পরিচারিকার সঙ্গে সঙ্গে শিবিকার সামনে এসে দাঁড়াল, তারপরই সহসা মুখের জালিকার আবরণ তুলে পরিচারিকার মুখের দিকে তাকাতেই রণবীর যেন ভূত দেখার মতই চমকে ওঠে।

মশালের পাণ্ডুর আলোতেও নারীকে চিনে নিতে কষ্ট হয় না রণবীরের।

চন্দনা। তার চন্দনা। চন্দনা তাহলে মরে নি আজো। বেঁচেই আছে। কিন্তু এই মধ্যরাত্রে শিবিকারোহণে সে কোথায় চলেছে? বলপূর্বক যে তাকে কোথায়ও নিয়ে যাওয়া হচ্ছে না তা সুস্পষ্ট। প্রহরীবেষ্টিত হয়ে সে স্বেচ্ছায়ই চলেছে কোথাও। কিন্তু কোথায়?

চন্দনা যেন সঙ্গের পরিচারিকাকে কি কয়েকটা কথা বললো। কথাগুলো শুনতে পেলেও বুঝতে পারল না রণবীর, কি কথা বললে চন্দনা পরিচারিকাকে। কথাগুলো বলেই চন্দনা আবার সেই সূক্ষ্ম রেশমী জালিকায় মুখ আচ্ছাদন করে শিবিকায় আরোহণ করল।

পরিচারিকা শিবিকার পর্দা ফেলে দিয়ে সৈন্যদের ও বাহকদের ডাকল। বাহকরা এগিয়ে এসে শিবিকা তুলে নিয়ে চলতে শুরু করে। তাদের সঙ্গে সঙ্গে সৈনিকরা। পরিচারিকা তখনো যায় নি প্রাসাদ-অভ্যন্তরে, অতর্কিতে শাণিত কৃপাণ মুঠিতে ধরে সামনে ঝাঁপিয়ে এসে পড়ল রণবীর, চমকে ওঠে পরিচারিকা—কে, কে তুমি?

চুপ। একটি কথা বলেছো কি এই তরবারির সবটা তোমার বুকে প্রবেশ করবে এখুনি।

কে। কে তুমি। পরিচারিকা আবার প্রশ্ন করে।

মশালবাহী লোকটা থতমত খেয়ে ইতিমধ্যে মশালটা হাত থেকে ফেলে দিয়েই প্রাণ ভয়ে প্রাসাদ-অভ্যন্তরে ছুটে পালিয়ে গিয়েছিল।

আমি যেই হই তোমার তাতে কোন প্রয়োজন নেই জেনো। বল চন্দনা শিবিকারোহণে কোথায় গেল?

তুমিই কি রণবীর?

পরিচারিকার মুখে নিজের নাম শুনে রণবীর যেন হঠাৎ কেমন থমকে যায়। ঐ পরিচারিকা তার নাম জানল কি করে?

শোন—বুঝতে পারছি তুমি আর কেউ নও রণবীরই—

হ্যাঁ—আমি।

বললাম তো বুঝতে পেরেছি। তোমার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল ভালই হলো—নচেৎ হয়ত কাল আমি নিজেই তোমার কাছে যেতাম।

আমার কাছে যেতে।

হ্যাঁ।

কেন?

চন্দনা একটা কথা যাবার সময় আমাকে বলে গিয়েছে, তোমাকে বলবার জন্য।

আমাকে? কি কথা?

চন্দনা বলেছে তাকে ভুলে যেতে।

ভুলে যেতে ?

হ্যাঁ—বিধর্মী-স্পর্শে তার সব গিয়েছে—সে আজ মৃতা।

মৃতা ?

হ্যাঁ।

কিন্তু আমি তো দেখলাম একটু আগে মৃতা নয়। আজো সে জীবিতা। দেহে মনে—কিন্তু কোথায় গেল সে ? কার কক্ষ আলো করতে ?

কাবুলে ?

কোথায় ? কোথায় বললে ?

কাবুলে। কাবুল-সম্রাটের এক প্রতিনিধি এসেছিল আমাদের হুজুরের মেহমান হয়ে, তারই সঙ্গে সম্রাটের দরবারে উপঢৌকন তাকে পাঠানো হলো!

রণবীর তারপর আর দাঁড়ায় নি। সেখান থেকে ছুটে চলে এসেছিল। তারপর সেই রাত্রেই মোল্লা মুরসিদকে অনুসরণ করেছিল রণবীর।

দিনের পর দিন রাতের পর রাত ছায়ার মত দীর্ঘ দুস্তর দুর্গম পথ রণবীর মোল্লা মুরসিদকে অনুসরণ করেছে। বুকের মধ্যে এক অসহ্য জ্বালা নিয়ে অনুসরণ করেছে মোল্লা মুরসিদকে।

মনে হয়েছে স্বেচ্ছায়ই চলেছে সুদূর কাবুলে চন্দনা। দিলোয়ার খাঁর চাইতেও অর্থ ও প্রতিপত্তিতে অনেক বড় এক যবনের আশ্রয়ে চলেছে চন্দনা। চন্দনা সত্যিই আজ মরেছে। যবনের অংকশায়িনী আজ সে। রণবীরকে হারিয়ে আজ তার কোন দুঃখ নেই, কোন বেদনাই নেই। সে সুখী। সে তৃপ্ত। কেবল বিষের জ্বালায় জ্বলছে দিবারাত্র সে।

স্বৈরিণী। ভ্রষ্টা—চন্দনা। উঃ, যদি আজ ঐ নারীকে সে তার নিজের হাতে হত্যা করতে পারত হয়ত তার এ দহন প্রশমিত হতো। দীর্ঘপথ অনুসরণ করে এসেছে রণবীর ঐ একই কথা ভাবতে ভাবতে কিন্তু কই—তবু তো শেষ পর্যন্ত চন্দনাকে সে হত্যা করতে পারে নি। চন্দনাকে হত্যা করবার সুযোগ কি সে পায় নি ? পেয়েছিল বৈকি। তবে ? তবে কেন সে চন্দনাকে হত্যা করতে পারল না ? কেন তার হাত উঠলো না ?

তারপর কিলকিনের সেই প্রাসাদকক্ষে। সেরাত্রেই বা কেন সে হত্যা করতে পারল না চন্দনাকে ? পারে নি। শেষ পর্যন্ত চন্দনার দৃষ্টিকে সে ফাঁকি দিতে পারে নি। সে ধরা পড়ে গিয়েছে। চন্দনা ঠিকই বুঝতে পেরেছে, আজো সে চন্দনাকে ভুলতে পারে নি।

রাত্রি প্রায় শেষ হয়ে এলো। যুদ্ধযাত্রার আর বেশী দেরি নেই। প্রস্তুত হতে হবে রণবীরকে। রণবীর যুদ্ধসাজে প্রস্তুত করে নিজেকে।

রাত্রির শেষ যাম। ত্রিযামা রাত্রি অবসানের পথে। পূবের আকাশে শুকতারাটা জ্বলজ্বল করছে। হুমায়ুন হস্তীপৃষ্ঠে আগে আগে চলেছে, পশ্চাতে তার সৈন্যবাহিনী। বেশী নয়, মাত্র শ'দেড়েক বাছাই করা সৈন্য। নিঃশব্দে তারা

এগিয়ে চলে। শত্রুপক্ষ যেখানে অবস্থান করছিল রাত্রিপ্রভাতের কিছু পরেই হুমায়ুন তার সৈন্যবাহিনী নিয়ে সেখানে পেঁছে যায়। হামিদ খাঁ কিন্তু বুঝতে পারে নি সঠিক ভাবে ব্যাপারটা।

সে ভেবেছিল হুমায়ুনের পশ্চাতে বিরাট এক সৈন্যবাহিনী আছে। দূরে শত্রুদের দেখে হুমায়ুন রণবীরকে আদেশ দেয় আক্রমণ করার জন্য। সঙ্গে সঙ্গে রণবীর তার সৈন্যদের নিয়ে হামিদ খাঁর সৈন্যবাহিনীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে।

হামিদ খাঁর সৈন্যদের মধ্যে একটা বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়—অতর্কিত আক্রমণে। তারা ছত্রভঙ্গ হয়ে এদিক ওদিক পালাতে শুরু করে।

হুমায়ুনের সৈন্যরা বীরবিক্রমে হামিদ খাঁর সৈন্যদের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে তাদের অর্ধেকেরও বেশী শিরশ্ছেদ করে—বহুলোককে বন্দী করে ফেলে দেখতে দেখতে। বাকীরা সব পলায়ন করল।

যুদ্ধজয়ের পর হুমায়ুন বেগ মিরাককে দ্রুতগামী অশ্বে পিতার কাছে প্রেরণ করে যুদ্ধের সংবাদ দেবার জন্য। আর কিছু বাছাইকরা সৈন্যকে পলায়নপর হামিদ খাঁর সৈন্যদের অনুসরণ করতে বলে। তারা ছুটে যায়। হুমায়ুনের জীবনে বলতে গেলে ঐ প্রথম যুদ্ধযাত্রা। ঐ প্রথম যুদ্ধ ও যুদ্ধজয়।

বিজয়ী হুমায়ুন ফিরে এলো সন্ধ্যায় শিবিরে বন্দীদের নিয়ে। বাবুর পুত্রের বিজয়ে মহা উল্লসিত হয়ে হুমায়ুন ও তার সৈন্যদের প্রচুর পুরস্কার দেয়। শিবিরে উৎসব শুরু হয়ে যায়।

এদিকে পরের দিন হুমায়ুনের যেসব সৈন্যরা তার নির্দেশে শত্রুদের পশ্চাৎ-ধাবন করেছিল—তারা হিসার ফিরোজে দখল করে লুঠতরাজ করে ফিরে এলো। হিসার ফিরোজ এবং তার অধীনস্থ জেলাগুলোর রাজস্বর পরিমাণ নেহাৎ কম নয়—প্রায় দুই লক্ষ পঁচিশ হাজার টাকা।

বাবুর হিসার ফিরোজ হুমায়ুনকে দান করে।

পরের দিন বাবুর আবার তার সৈন্যবাহিনী নিয়ে চলা শুরু করে সন্ধ্যার দিকে শাহাবাদে পেঁছাল। দিন দুই সেখানে বিশ্রাম করে বাবুর কয়েকজন লোক বাছাই করে তাদের সুলতান ইব্রাহিমের শিবিরে প্রেরণ করল। হয় আত্মসমর্পণ করো না হয় যুদ্ধ।

কিন্তু কয়েকদিন সংবাদের জন্য অপেক্ষা করার পরও যখন কেউ ফিরে এলো না বাবুর মনে মনে সংকল্প করে. আর কালবিলম্ব নয়। ইতিমধ্যে গুপ্তচরমুখে সংবাদ পাওয়া গিয়েছিল সুলতান ইব্রাহিম তার বিরাট সৈন্যবাহিনী নিয়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে।

বাবুর আরো এগিয়ে গিয়ে অবশেষে যমুনার তীরে শিবির স্থাপনা করল।

॥ ৪৯ ॥

প্রথমটায় বৃদ্ধ লক্ষ্মণ সিংহের পার্বতীর প্রতি দৃষ্টি পড়ে নি। ইদানীং কিছুকাল ধরেই তার চোখের দৃষ্টি ক্ষীণ হয়ে আসছিল। চোখে ছানি পড়ছে। পৌত্রকে

দীর্ঘদিন পরে কাছে পাওয়ার আনন্দের বেগটা কিছুটা প্রশমিত হলে সে বললে, চল ভাই ঘরে চল। পৌত্রের একটা হাত ধরে আকর্ষণ করে এগুতে গিয়েই লক্ষ্মণ সিংহের নজরে পড়ল পার্বতী।

পার্বতী এতক্ষণ একটি পাশে চুপ করে দাঁড়িয়ে ছিল।

দাঁড়িয়ে পড়েছিল লক্ষ্মণ সিংহ। প্রশ্ন করলে, এ কে দাদা? তোর সঙ্গে এই মেয়েটি কে?

বীরেন্দ্র মৃদু হেসে বলে, বল তো কে?

তা কেমন করে জানব।

ঘরে চল, সব বলছি। বীরেন্দ্র বললে।

তাই চল।

সকলে এসে ছোট অপরিসর একটি কক্ষমধ্যে প্রবেশ করল। কক্ষ অন্ধকার। তখনো দীপ জ্বালানো হয় নি।

দাঁড়া, প্রদীপটা জ্বালি—

বৃদ্ধ প্রদীপটা জ্বালালো। কক্ষের অন্ধকার দূরীভূত হলো মৃদু আলোকে। কক্ষের মধ্যে বিশেষ কিছুই নেই। একধারে একটি খাটিয়া পাতা—তার উপরে শয্যা বিস্তৃত। এককোণে একটা মাটির পাত্রে বোধ হয় পানীয় জল রক্ষিত। দেওয়ালের গায়ে ঝোলানো একটা ঢাল, গোটা দুই বর্শা ও একটা তরবারি। একটা দড়ির আলনায় কিছু জামাকাপড়।

নিজে খাটিয়ার ওপর উপবেশন করে লক্ষ্মণ সিংহ ওদেরও ডাকে, আয় বোস। কি নাম তোমার মা?

মৃদুকণ্ঠে পার্বতী জবাব দেয়, পার্বতী।

দাদু!

কি রে?

ও তোমার নাতবৌ।

কি—কি বললি?

নাতবৌ!

দেখি—দেখি নাতবৌয়ের মুখটা দেখি। কথাগুলো বলতে বলতে ত্রস্ত লক্ষ্মণ সিংহ উঠে পড়ে খাটিয়া থেকে। এগিয়ে গিয়ে জ্বলন্ত প্রদীপটা প্রদীপদান থেকে তুলে নিয়ে পার্বতীর সামনে এসে দাঁড়ায়।

দেখি। দেখি ভাল করে মুখটা দেখি। আহা। এ যে লক্ষ্মী প্রতিমা রে ভাই। কোথা থেকে আনলি, কোথায় পেলি একে—কার মেয়ে? দেশ কোথায়?

বীরেন্দ্র হেসে ফেলে, একসঙ্গে যে অনেকগুলো প্রশ্ন করে বসলে। কোনটার জবাব দিই!

কার মেয়ে?

অনেক উঁচু ঘরাণা।

তাই বল্। নচেৎ এত সুন্দর দেখতে হয়? তা কোথা থেকে একে পেলি?

কেন? মাড়বারে কি মেয়ের অভাব?

তা কেন হবে—তবে—

তবে ? কি তবে ?

কার মেয়ে ?

বললাম তো মস্ত বড় উঁচু ঘরাণা !…কিন্তু এখন আর নয় দাদা—পথশ্রমে ক্লান্ত, বড্ড ক্ষুধা পেয়েছে—

আহা তা তো পাবেই । দাঁড়া—খাবার যোগাড় করি ।

পার্বতী ইতিমধ্যে উঠে দাঁড়িয়েছিল । সে বললে, তুমি ব্যস্ত হয়ো না দাদা। আমাকে দেখিয়ে দাও সব কোথায় কি আছে—

ওরে না, না—আজ আমি তোদের সব প্রস্তুত করে খাওয়াবো ।

সে কি দাদা ? আমি থাকতে তুমি কেন রন্ধনশালায় যাবে ? পার্বতী বাধা দেয় ।

না রে না, আজ আমিই সব তৈরী করবো ।

না আমি—চল, তোমার কোথায় কি আছে আমাকে দেখিয়ে দেবে চল ।

শেষ পর্যন্ত পার্বতী কোন কথাই শোনে না। সব দেখেশুনে নিজেই রন্ধনে প্রবৃত্ত হয় । বৃদ্ধ পার্বতীকে সাহায্য করতে থাকে ।

আহারাদির পর সকলে শয্যায় আশ্রয় নিয়েছিল ।

দীর্ঘ পথশ্রমে ক্লান্ত পার্বতী শয্যায় শুতে না শুতেই নিদ্রার কোলে ঢলে পড়ে । কিন্তু বীরেন্দ্রর চোখে ঘুম ছিল না। চিতোরগড় থেকে যোধপুর দীর্ঘ পথ। আসতে আসতেই সে মনে মনে স্থির করেছিল মহারাজ গাঙ্গর সঙ্গে সে দেখা করবে। তাকে সে বলবে, ইচ্ছা করলে তিনি পার্বতীকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারেন। আজ পর্যন্ত রাজকুমারীর কোন মর্যাদাহানিই তার দ্বারা হয় নি। পার্বতীকে সে ভালবাসে কিন্তু তাই বলে সে তার সেই ভালবাসা ভ্রাতা ও ভগ্নীর চিরদিনের মধুর সম্পর্কের বিচ্ছেদ ঘটাক তা সে চায় না ।

সে দূরে চলে গেলে যদি বিবাদের অবসান ঘটে তো তার জন্য সে প্রস্তুত। সে চলেই যাবে। সে কোন পাপ করে নি বা অন্যায় করে নি তবু যদি মহারাজ তাকে ক্ষমা না করতে পারেন তাহলে সে সানন্দেই চিরবিচ্ছেদ মেনে নেবে প্রিয়তমার কাছ থেকে ।

উন্মুক্ত বাতায়ন-পথে কক্ষমধ্যে চন্দ্রকিরণ এসে পড়েছে পার্বতীর শান্ত ঘুমন্ত মুখখানির উপর ।

অনেকক্ষণ নির্নিমেষে তাকিয়ে রইলো বীরেন্দ্র পার্বতীর মুখখানির দিকে। তারপর নিঃশব্দে শয্যাত্যাগ করে কক্ষ হতে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেল। দ্রুত পদক্ষেপে এগিয়ে চললো দুর্গপ্রাসাদের দিকে ।

আর দেরি নয়। আজই তাকে মহারাজের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে হবে। দুর্গপ্রাসাদে প্রবেশের গোপন দ্বার তার জানা। সেই দ্বার দিয়েই সে দুর্গপ্রাসাদে প্রবেশ করবে। কিন্তু প্রাসাদে প্রবেশ করলেই যে মহারাজের সঙ্গে তার সাক্ষাৎ হবে তার তো কোন স্থিরতা নেই। তা ছাড়া দুর্গপ্রাসাদে সদাসতর্ক রাতপ্রহরীরা

আছে—তাদের দৃষ্টি এড়িয়ে যাওয়াও শক্ত।

সে যাই হোক। যা হবার হবে। তবু তাকে যেতেই হবে।

বীরেন্দ্র যা ভয় করেছিল শেষ পর্যন্ত তাই হলো। গোপন সুড়ঙ্গপথেই প্রহরীর হাতে ধরা পড়ে গেল সে।

প্রহরী তার হস্তস্থিত তরবারির সাহায্যে প্রথম দর্শনেই বীরেন্দ্রকে আঘাত করবার চেষ্টা করেছিল কিন্তু বীরেন্দ্র তার তরবারি দিয়ে সে আঘাতকে প্রতিহত করে মুহূর্তে প্রহরীকে তরবারিচ্যুত করল। তারপর বলে, তোমাকে আমি হত্যা করতে চাই না। আমাকে তুমি মহারাজের কাছে নিয়ে চল।

প্রহরী একটু বিস্মিতই হয়। ইতস্ততঃ করে।

ব্যাপারটা বুঝতে পেরে বীরেন্দ্র বলে, ভয়ের কোন কারণ নেই তোমার। আমি এদেশের বা মহারাজের শত্রু নই।

কে তুমি?

একদা আমি স্বর্গীয় মহারাজের অন্যতম প্রধান দেহরক্ষী ছিলাম।

দেহরক্ষী।

হ্যাঁ—আমার নাম বীরেন্দ্র সিংহ।

বীরেন্দ্র সিংহ?

হ্যাঁ।

এতদিন কোথায় ছিলে!

সে সব কথা পরে হবে—আগে আমাকে মহারাজার কাছে নিয়ে চল। তার কাছে আমার জরুরী প্রয়োজন আছে।

চল।

মহারাজ গাঙ্গ মন্ত্রণাকক্ষেই ছিল। সামন্ত সর্দারদের সঙ্গে দেশের আসন্ন পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা-চক্র বসেছিল।

দ্বাররক্ষীকে সংবাদ দিল রাতপ্রহরী। দ্বাররক্ষী মন্ত্রণাকক্ষে সংবাদ পাঠাল। এবং একটু পরেই বীরেন্দ্রর ডাক পড়ল।

বীরেন্দ্র কক্ষে প্রবেশ করে মহারাজকে অভিবাদন জানাতেই রুদ্ধকণ্ঠে গাঙ্গ বলে, স্পর্ধা তোমার বীরেন্দ্র সিংহ, আবার তুমি এ রাজ্যে প্রবেশ করেছো।

মহারাজ, আপনার সঙ্গে আমার কিছু কথা ছিল একান্ত গোপনে।

তোমার সঙ্গে আমার কোন কথা থাকতে পারে না। সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যুত্তর দেয় গাঙ্গ।

মহারাজ—বেশী কথা নেই—সামান্য দুটো কথা বলেই আমি চলে যাবো।

একজন সামন্ত সর্দার বলে, শুনুনই না মহারাজ ও কি বলতে চায়। বল তুমি বীরেন্দ্র—

ক্ষমা করবেন সামন্ত সর্দার। আমার যা বক্তব্য আমি একান্তেই মহারাজার কাছে পেশ করতে চাই।

ঠিক আছে মহারাজ, আমরা কক্ষের বাইরে অপেক্ষা করছি—আপনি শুনুন ও কি বলতে চায়, হয়ত কোন বিশেষ জরুরী বার্তাই ও এনেছে।

বৃদ্ধ সামন্ত সর্দার তখন অন্যান্য সর্দারদের নিয়ে কক্ষের বাইরে চলে গেলেন। মহারাজ গাঙ্গ এবারে বীরেন্দ্রর দিকে তাকালেন, তার দু-চোখের দৃষ্টিতে আক্রোশ ও ঘৃণা। বীরেন্দ্র তোমার যদি কিছু বলবার থাকে তো বল কারণ তোমার দিকে তাকাতেও আমার ঘৃণা হচ্ছে—

জানি মহারাজ। আপনি আমাকে ক্ষমা করতে পারেন নি, পারবেনও না। ক্ষমা প্রার্থনা করতেও আমি আসি নি আপনার কাছে।

তবে কি জন্য এসেছো?

আপনার ভগিনীর কথাই বলতে এসেছি—

আমার কোন ভগ্নী নেই। একদিন ছিল—কিন্তু আজ সে মৃতা।

অভয় দেন তো একটা কথা জিজ্ঞাসা করতাম মহারাজ আপনাকে।

কি কথা?

আপনি জ্ঞানী, বুদ্ধিমান, বিচক্ষণ। তবু জিজ্ঞাসা করি, জন্মসূত্রে আমি একজন সামান্য সৈনিকের ঘরে জন্মেছি বলেই কি আমার ভালবাসারও অধিকার নেই কাউকে?

যে মূর্খ তার সামাজিক পরিচয় ও যোগ্যতা ভুলে দুর্লভের দিকে হাত বাড়ায়—

মহারাজ ভালবাসা কি কোনদিন সকল কিছু বিবেচনা করে আত্মপ্রকাশ করে? তাই যদি হতো রাজকুলতিলক পরম ভট্টারক সামান্যা এক নর্তকীকন্যাকে কি ভালবাসতে পারতেন—যার কোন পরিচয় বা কোন স্বীকৃতিই নেই?

বীরেন্দ্র সিংহ। অস্ফুট গর্জন করে ওঠে গাঙ্গ।

বলুন মহারাজ, আপনিই বলুন ভুলতে কি পেরেছেন আজো আপনি নর্তকী-কন্যা রত্নাকে? জীবনে কোনদিন কি তাকে ভুলতে পারবেন? না। পারবেন না। কারণ সে যে ভালবাসা—সে যে অন্ধ। কোন যুক্তি কোন বাধাই যে তার পথরোধ করতে পারে নি—কারণ সেই যে তার ধর্ম।

থামো। থামো তুমি—গাঙ্গ আবার গর্জন করে ওঠে; কিন্তু তার কণ্ঠস্বরটা যেন কেমন ম্লান, কেমন স্তিমিত।

আমাকে নিশ্চুপ করাতে পারলেই কি আপনার বুকের মধ্যে যে কথা অনুক্ষণ আজো অনুরণিত হচ্ছে তাকে চাপা দিয়ে রাখতে পারবেন—পারবেন না তো! কোনদিনই তা সম্ভব নয়। যাক সে কথা—যা বলতে এসেছি তাই বলি। পার্বতীকে আপনি ফিরিয়ে নিতে চান তো চলুন তাকে নিয়ে আসবেন। আপনি বিশ্বাস করতে পারেন তার এতটুকু অমর্যাদা আমার দ্বারা হয় নি। সে স্বেচ্ছায় আসতে চাইবে না তবে যাতে সে আসে সেজন্য যদি প্রয়োজন হয় তো জানাবেন আমি প্রাণ দিতেও প্রস্তুত।

পার্বতী কোথায়?

আমার গৃহে।

এই যোধপুরে?

হ্যাঁ মহারাজ। তাকে নিরাপত্তাযুক্ত রেখে আমি আপনার কাছে এসেছি—তাকে

ফিরিয়ে আনতে চান তো আর বিলম্ব করবেন না, চলুন—তারপর একটু থেমে বলে, মহারাজ, আপনি বিশ্বাস করবেন কিনা জানি না,পার্বতীকে আমি ভালবাসি সত্য কিন্তু তাকে জোর করে আমি অধিকার করতে চাই না।

কিন্তু একদিন তাই তো করেছিলে।

না মহারাজ। সেটা আপনার সম্পূর্ণ ভুল ধারণা। ভালবাসা কি জবরদস্তি দিয়ে বাঁচিয়ে রাখা যায়? তা যায় না। সে চেষ্টাও কোনদিন আমি করি নি। আপনা হতেই যা সর্বতোভাবে আপনাকে সমর্পণ করে তাকে ধরে রাখবার জন্য কোন বন্ধনেরই তো প্রয়োজন হয় না। কিন্তু আর না, এবারে চলুন—আমার কর্তব্যটুকু আমাকে পালন করতে দিন।

বীরেন্দ্রর কথাগুলো যেন সহসা গাঙ্গের মনটাকে অদ্ভুত ভাবে নাড়া দেয়। কেন যেন ক্ষণপূর্বের প্রচণ্ড আক্রোশ ও ঘৃণা কেমন থিতিয়ে আসে। কে জানে কেন বীরেন্দ্রর কথাগুলো যেন তাকে কেমন দুর্বল করে ফেলে। মৃদু কণ্ঠে গাঙ্গ বলে, চল—

দুজনে, মহারাজ গাঙ্গ ও বীরেন্দ্র সিংহ যখন পার্বতীর কক্ষে এসে প্রবেশ করল পার্বতী তখন ঘোর নিদ্রাভিভূতা। গাঙ্গ চেয়ে থাকে নির্নিমেষে পার্বতীর ঘুমন্ত মুখখানির দিকে। তার বড় আদরের সহোদরা। প্রাণের চাইতেও প্রিয়। পিতার সঙ্গে জননীর সহমৃত্যুর পর থেকে বুকে পিঠে করে মানুষ করেছে গাঙ্গ ঐ পার্বতীকে। ও তো সহোদরাই নয়—ও যে তার আত্মার আত্মা। গাঙ্গর দুটি চক্ষু জলে ভরে ওঠে। দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে যায়। সামান্য শয্যার শুয়ে আজ রাজনন্দিনী। অথচ মুখে কি এক গভীর পরিতৃপ্তির আনন্দ। ঘুমিয়ে ঘুমিয়েও ও যেন হাসছে।

মহারাজ।

বীরেন্দ্রর ডাকে ফিরে তাকাল গাঙ্গ ওর দিকে।

আমি কক্ষের বাইরে যাচ্ছি, আপনি ডেকে তুলুন। আমার সামনে হয়ত ও যেতে চাইবে না। ওকে আপনি বুঝিয়ে নিয়ে যান। রাজনন্দিনী, চিরদিন বিলাস ও প্রাচুর্যের মধ্যে লালিতা—ওর এ কৃচ্ছ্রসাধন আমি আর সহ্য করতে পারছি না মহারাজ। সত্যিই আমি অন্যায় করেছি—রাজোদ্যানের পুষ্পকে আমি ছিনিয়ে এনেছি। এই জীর্ণ কুটির, এই জীর্ণ পরিবেশ—ওকে আমি বাঁচাতে পারবো না। ওকে আপনি নিয়ে যান মহারাজ, নিয়ে যান—, বলতে বলতে বীরেন্দ্রর কণ্ঠস্বর অশ্রুতে ভারী হয়ে আসে।

বীরেন্দ্র দ্রুত কক্ষ হতে নিষ্ক্রান্ত হয়ে যায়।

গাঙ্গ কিছুক্ষণ বীরেন্দ্রর গমনপথের দিকে তাকিয়ে থাকে, তারপর ধীরে ধীরে এগিয়ে যায় শয্যায় শায়িতা, নিদ্রাভিভূতা পার্বতীর সন্নিকটে।

পার্বতী। ডাকে গাঙ্গ।

কিন্তু পার্বতীর কোন সাড়া নেই।

পার্বতী? এবারে আরো কাছে গিয়ে ডাকে গাঙ্গ।

দ্বিতীয় ডাকে পার্বতীর নিদ্রাভঙ্গ হয়। সে চোখ মেলে তাকায়। নিদ্রাজড়িত দৃষ্টিতে প্রথমটায় সে ঠিক বুঝতে পারে না। এদিক ওদিক তাকায়।

গাঙ্গ আবার ডাকে, পার্বতী।

কে?

পার্বতী—আমি—

দাদা! বলতে বলতে পার্বতী শয্যা ছেড়ে উঠে সঙ্গে সঙ্গে দুবাহু দিয়ে গাঙ্গকে জড়িয়ে ধরে, সত্যিই তুমি, আমি বিশ্বাস করতে পারছি না এখনো—

পার্বতী—চল, আমার সঙ্গে।

পার্বতী নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে নেয় গাঙ্গের আলিঙ্গন থেকে। বলে, কোথায়?

প্রাসাদে।

বীরেন্দ্র কোথায়? আমার স্বামী?

সে আছে বাইরে।

তাকে না জিজ্ঞাসা করে তো আমি কোথায়ও যেতে পারি না দাদা।

বীরেন্দ্রই তো বলেছে তোকে যেতে।

সে আমাকে যেতে বলেছে!

হ্যাঁ পার্বতী, মহারাজার সঙ্গে তুমি প্রাসাদে যাও।

বীরেন্দ্রর কণ্ঠস্বরে দুজনাই ফিরে তাকায়। ওরা কেউ জানতে পারে নি ইতিমধ্যে কখন একসময় বীরেন্দ্র নিঃশব্দে ওদের পশ্চাতে এসে দাঁড়িয়েছে।

যাও পার্বতী।

না।

পার্বতী শোন—

বাধা দিয়ে পার্বতী বলে, না—কোন কথাই আমি শুনতে চাই না।

কিন্তু যেতে যে তোকে হবেই পার্বতী; গাঙ্গ বলে।

না। আমি যাবো না।

শোন, তোদের বিবাহ আমি অস্বীকার করছি না—

দাদা!

হ্যাঁ। কিন্তু এভাবে তো বিবাহ হতে পারে না। যোগ্য মর্যাদায় সর্বসমক্ষে তোর বিবাহ আমি দেবো বীরেন্দ্রর সঙ্গে।

সত্যি—সত্যি বলছো দাদা!

হ্যাঁ রে—মিথ্যা বলবো কেন? রাজকীয় মর্যাদায় শুভকাজ সম্পন্ন হবে।

পার্বতীর চোখে জল এসে যায়, কিন্তু তবু বুঝি মন থেকে সন্দেহের কাঁটাটা দূর হয় না, সে মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে থাকে।

চল বোন, প্রাসাদে চল। তারপর বীরেন্দ্রর দিকে তাকিয়ে গাঙ্গ বলে, বীরেন্দ্র, শীঘ্রই তোমার দাদু লক্ষ্মণ সিংহের সঙ্গে আমি দেখা করব—বিবাহের দিন স্থির করবো তার সঙ্গে। কি? আমার কথা বিশ্বাস হচ্ছে না। বীরেন্দ্র?

হচ্ছে মহারাজ।

আমি তাহলে পার্বতীকে প্রাসাদে নিয়ে যেতে পারি ?

নিয়ে যান মহারাজ।

না দাদা।

এখনো তোর জ্যেষ্ঠকে বিশ্বাস করতে পারছিস না পার্বতী ?

তা নয় দাদা।

তবে ?

বীরেন্দ্রর দাদুকে সব কথা জানিয়ে আমাকে নিয়ে চল। দাদু এসবের কিছুই জানে না।

লক্ষ্মণ সিংহকে ডাকতে হলো না আর—বীরেন্দ্র পূর্বাহ্ণেই লক্ষ্মণ সিংহের নিদ্রাভঙ্গ করে তাদের কুটিরে মহারাজের আগমন সংবাদ দিয়েছিল। লক্ষ্মণ সিংহ দ্বারপ্রান্তেই উপস্থিত ছিল, আড়ালে আত্মগোপন করে। এবার লক্ষ্মণ সিংহ কক্ষমধ্যে এসে পদার্পণ করল, না মহারাজ, তা হবে না।

লক্ষ্মণ সিংহের কণ্ঠস্বরে গাঙ্গ ফিরে তাকায়।

অধীনের অভিবাদন গ্রহণ করুন মহারাজ। সত্যিই সৌভাগ্য আমার যে পরম ভট্টারক শ্রীল শ্রীযুক্ত শ্রীমন মহারাজ এই দীনহীনের কুটিরে পদধূলি দিয়েছেন। আমার শত সহস্র অভিবাদন গ্রহণ করুন দেবতা—

লক্ষ্মণ সিংহ।

মহারাজ ?

তুমি কি আমার প্রস্তাবে সম্মত নও ?

শতাধিকবার সম্মত মহারাজ। আমি সেকথা বলি নি—

তবে ?

বীরেন্দ্রর বিচার করে আগে শাস্তি দেবেন, তারপর বিবাহ। কেন ও আমার কাছে সব গোপন করেছে ?

তাই হবে লক্ষ্মণ সিংহ। এবারে তাহলে তোমার ভাবী নাতবৌকে আমি নিয়ে যাই ?

নিশ্চয়ই মহারাজ, নিশ্চয়ই—

পার্বতীকে নিয়ে মহারাজ গাঙ্গ প্রস্থান করল।

বীরেন্দ্র তখনো নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে। তার দিকে তাকিয়ে লক্ষ্মণ সিংহ বলে, সাবাস ভাই সাবাস—এ নাহলে রাজপুত।

দাদু।

লক্ষ্মণ সিংহ পরম স্নেহে বীরেন্দ্রকে বক্ষে টেনে নেয়। তার দুই চোখে অশ্রু।

॥ ৫০ ॥

শাহাবাদে অবস্থান করার সময়ই সূর্য মেষ রাশিতে প্রবেশ করে।

সুলতান ইব্রাহিমের সংবাদ সংগ্রহের জন্য প্রেরিত দূত ফিরে এলো। সে

সংবাদ দিল সুলতান ইব্রাহিম তার বিরাট সৈন্যবাহিনী নিয়ে ধীরে ধীরে দু-এক মাইল এগুচ্ছে—তারপর শিবির স্থাপনা করে বিশ্রাম নিয়ে আবার এগুচ্ছে। বাবুরও শাহাবাদে বসে থাকা যুক্তিসঙ্গত মনে করে না। সেও তার সৈন্যবাহিনী নিয়ে ধীরে ধীরে অগ্রসর হতে থাকে। অবশেষে যমুনার তীরে এসে বাবুর শিবির স্থাপনার নির্দেশ জারী করলো।

নীল যমুনা তর তর করে বহে চলেছে। গভীর স্রোত—জল কত গভীর কে জানে। যমুনা পার হতে হবে।

যমুনার তীরে তীরে লোক প্রেরণ করে বাবুর, কোথায় যমুনার জল সংকীর্ণ সেইখানেই পার হতে হবে যমুনা।

হায়দার কুলী খাঁ সংবাদ নিয়ে এলো—আরো উত্তরে মাইলখানেক দূরে যমুনার জল সংকীর্ণ, সেখানেই অনায়াসে যমুনা পার হওয়া যাবে।

বাবুর তার বিরাট সৈন্যবাহিনী নিয়ে যমুনা পার হয়ে সিরসাতে এলো। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে সিরসা অতীব মনোরম। সুন্দর একটি প্রস্রবণ সামনেই। প্রস্রবণ একটি নদীর সৃষ্টি করেছে।

সম্রাট বাবুর সেই নদীর বক্ষে একটি নাও ভাসিয়ে, চাঁদোয়া খাটিয়ে পাল তুলে ভাসতে ভাসতে অনুকূল বাতাসে এগিয়ে চলল।

দুদিন পরে হায়দার কুলী খাঁ আবার সংবাদ নিয়ে এলো।

নদীর অপর পারে দাউদ খাঁ ও হাতিম খাঁ তাদের ছয়-সাত হাজার সৈন্য নিয়ে সুলতান ইব্রাহিমের ঘাঁটি থেকে পাঁচ-ছয় মাইল দূরে এগিয়ে এসেছে। তারা সম্রাট বাবুরের দিকেই এগিয়ে আসছে আক্রমণের উদ্দেশ্যে।

বাবুর সঙ্গে সঙ্গে নির্দেশ দেয় তার অধীনস্থ সৈন্যবাহিনীর বাম বাহু ও মধ্যবর্তী সৈন্যদলের কতকাংশ নিয়ে ইউনুস আলীকে এগিয়ে গিয়ে শত্রুসৈন্যের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে আক্রমণ চালাবার জন্য।

ইউনুস আলী সম্রাটের নির্দেশে সন্ধ্যার পরই তার সৈন্যবাহিনী নিয়ে এগিয়ে চললো এবং পরদিন প্রত্যূষে তারা দাউদ খাঁ ও হাতিম খাঁর সৈন্যদের মুখোমুখি হয়। দাউদ ও হাতিম খাঁর সৈন্যরা ইউনুস আলীর সৈন্যদের অগ্রসর হতে দেখে কেমন যেন বিশৃঙ্খল হয়ে পড়ে। সহসা তাদের মনোবল ভেঙ্গে যায়। তারা পশ্চাদ্ধাবন শুরু করে।

ইউনুস আলীর সৈন্যরা ওদের পশ্চাদ্ধাবন করে ওদের একজন সৈন্যাধ্যক্ষ—সত্তর আশি-জন সৈনিক ও সাত-আটটি হাতি বন্দী করে ফেলে।

বাবুরের শিবিরে আনন্দের সাড়া পড়ে যায় যেন। প্রথম যুদ্ধে তাদের জয় হয়েছে। আল্লাহ বাবুরের উপর প্রসন্ন। ভাগ্যদেবতার করুণ প্রসন্ন দৃষ্টি তাদের পরে। জয় অবশ্যম্ভাবী।

বাবুর পুনরায় যাত্রা শুরু করে। এবং যাত্রার পূর্বে তার সমগ্র সৈন্যবাহিনী অভিযানের উপযোগী করে সাজিয়ে দক্ষিণ, বাম ও মধ্যবর্তী ব্যূহ রচনা করে ভীষ উদ্‌যাপন করে—এবং রুমের নীতি অনুসারে কামানবাহী শকটগুলো একটির সঙ্গে আর একটি ষাঁড়ের চামড়া দিয়ে শক্ত করে বাঁধা হয়।

প্রতি দুইটি কামানবাহী শকটের মধ্যবর্তী জায়গায় ছয়-সাতটি রক্ষণস্তম্ভ। গোলন্দাজ বাহিনী কামান দাগবে, রক্ষণস্তম্ভ পশ্চাতে দাঁড়িয়ে গোলাবর্ষণ করবে। পাঁচ-ছয় দিন লাগে সব সাজাতে।

বাবুর অতঃপর আমীরদের সঙ্গে পরামর্শ করে স্থির করে, অল্পদূরেই পাণিপথ শহর। পাণিপথ শহরটি বেশ বড়। শহরে অনেক দালান কোঠা আছে। পাণিপথই হবে যুদ্ধের উপযুক্ত স্থান। পরদিনই বাবুরের সজ্জিত বিরাট বাহিনী পাণিপথের দিকে অগ্রসর হয়।

পাণিপথে পেঁছে একটি প্রশস্ত জায়গায় বাবুর তার সৈন্যবাহিনী সাজায়। দক্ষিণে শহর ও শহরতলী, সম্মুখে কামান ও রক্ষণস্তম্ভ। বামে ও অন্যান্য দিকে পরিখা খনন করা হয় এবং সেই পরিখা ঢেকে দেওয়া হয় গাছের ডালপালা দিয়ে।

দূরে দেখা যায় সুলতান ইব্রাহিমের বিরাট সৈন্যবাহিনী। অগণিত সৈন্য আর সারি সারি শিবির।

বাবুরের মনে হয় সৈন্যসংখ্যা লক্ষাধিক হবে। তার কর্মচারীর সংখ্যাও হাজারখানেক হবে। কিন্তু বাবুর আগেই সংবাদ পেয়েছিল সুলতান ইব্রাহিমের বেশীর ভাগ সৈন্যই ভাড়াটে সৈন্য। এবং সুলতান ইব্রাহিম নিজে যুদ্ধব্যাপারে একজন সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ যুবক—

দুই পক্ষ তাদের পরস্পরের বিরাট বাহিনী নিয়ে মুখোমুখি দাঁড়িয়েই থাকে। কটা দিন মধ্যে মধ্যে বাবুরের সৈন্যরা এগিয়ে গিয়ে সুলতানের অগণিত শিবিরের উপর বিষাক্ত তীর নিক্ষেপ করে এলো রাত্রির অন্ধকারে, কিন্তু অপর পক্ষ থেকে কোন সাড়া পাওয়া গেল না আক্রমণের।

সুলতান ইব্রাহিম লোদির ধনভাণ্ডারে প্রচুর ধনরত্ন সঞ্চিত ছিল পূর্ব-পুরুষদের। ইচ্ছা করলে সুলতান সেই অর্থ দিয়ে আরো বহু সৈন্য সংগ্রহ করতে পারত—বাবুরের তাতারবাহিনী তাহলে বন্যার জলে কুটোর মতই হয়ত ভেসে যেতো।

হিন্দুস্থানের মাটিতে মুঘলের রাজ্য স্থাপনার স্বপ্ন হয়ত তাহলে ধুলোতেই মিশিয়ে যেতো। কিন্তু বিধাতার ইচ্ছা বুঝি ছিল অন্যরূপ। তাই সামর্থ থাকা সত্ত্বেও সুলতান—কণ্ঠুষ সুলতানের বুঝি মতিভ্রম হয়েছিল শেষ মুহূর্তে।

তার উপরে অপূর্ব বিশৃঙ্খল ভাবে সৈন্যচালনা ও যুদ্ধের ব্যাপারে অনভিজ্ঞতাই সুলতানের পরাজয়কে অবশ্যম্ভাবী করে তুলেছিল। যুদ্ধের ব্যাপারে সুলতান যদি এতটুকুও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিত তাহলে কখনই সে তাতারসম্রাটকে গড়খাই খনন করে কামান ও সৈন্য স্থাপনার অবকাশ দিত না।

পাণিপথে অবশেষে পঞ্চম রাত্রি প্রভাত হলো। আর ঐভাবে নিষ্ক্রিয় হয়ে বসে থাকা যুক্তিসঙ্গত নয়—তাছাড়া বাবুরের দলের কয়েকজন হিন্দুস্থানী আমীর সুলতানকে আক্রমণ করবার জন্য বারংবার উত্তেজিত করতে লাগল। বললে তারা, আমরা রাত্রির অন্ধকারে ওদের আক্রমণ করব।

বাবুর সম্মত হলো।

কিন্তু বাবুরের নৈশ অভিযান সফল হলো না। দুপক্ষের সৈন্যাই হতাহত হলো কিছু।

বাবুর তখন নির্দেশ দেয়, না, যুদ্ধ আপাতত বন্ধ কর—প্রভাতে আমরা আবার আক্রমণ চালাবো।

কিন্তু বাবুর সে অবকাশ পেল না। সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে সুলতানের বিরাট সৈন্যবাহিনী রণদামামা বাজাতে বাজাতে হস্তীবাহিনীকে সামনে রেখে বাবুরের সৈন্যবাহিনীর দিকে এগিয়ে আসতে লাগল। বাবুর পিছু হটে আসতে বাধ্য হলো অনেকটা।

পরের দিন আবার যুদ্ধ। বাবুর পুত্র হুমায়ুনকে নির্দেশ দিল তার সৈন্যবাহিনী নিয়ে এগিয়ে যেতে। কিন্তু হুমায়ুন বিশেষ সুবিধা করতে পারল না—সে সন্ধ্যার দিকে আবার পিছু হটে এলো।

বাবুর বুঝতে পারে যেভাবে যুদ্ধ চলেছে ঠিক সেই ভাবে যুদ্ধ চলতে পারে না—যুদ্ধজয় সম্ভবপর নয়। এবং নিজেকেও তাকে সৈন্যবাহিনীর মধ্যে থেকে ওদের উৎসাহ দান করতে হবে—তাতে তার সৈন্যরা বেশী সাহস পাবে, মনে বল পাবে। বাবুর যখন তার সৈন্যাধ্যক্ষদের ডেকে আগামী কাল কিভাবে যুদ্ধ হবে পরামর্শ করতে থাকে—গুপ্তচর-মুখে সংবাদ পাওয়া গেল সুলতানের সৈন্যবাহিনী এগিয়ে আসছে তাদের দিকে।

বাবুরের সৈন্যবাহিনী সজ্জিত ও প্রস্তুতই ছিল। বাবুর তার অধানস্থ সৈন্যাধ্যক্ষদের দিকে তাকিয়ে বললে, রাত্রি প্রভাত হতে আর মাত্র দণ্ডখানেক বাকী আছে—সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই আমরা যুদ্ধ শুরু করব। হুমায়ুন?

আলমপনা! হুমায়ুন পিতার মুখের দিকে তাকাল।

আমি স্থির করেছি, তুমি ও রণবীর সেনাবাহিনীর দক্ষিণভাগে থাকবে।

মহম্মদ সুলতান?

জাহাপনা! সৈন্যাধ্যক্ষ মহম্মদ সুলতান তাকাল সম্রাটের দিকে।

তুমি থাকবে সেনাবাহিনীর বামভাগে। আর চিন তাইমুর সুলতান, তুমি মধ্যবর্তী সৈন্যবাহিনীর বামাংশ পরিচালনা করবে—খলিফা তুমি করবে দক্ষিণাংশ—

তাই হবে সম্রাট।

এবারে বাবুর অশ্বশালার অধিনায়ক আব্দুল আজিজের দিকে তাকাল, আব্দুল?

আলমপনা।

সংরক্ষিত সৈন্যদলের ভার রইলো তোমার পরে। ওয়ালি কাজিল?

জনাবআলি।

তুমি দক্ষিণবাহু সৈন্যদলের পার্শ্বরক্ষী হিসাবে অবস্থান করবে। আহমেদি পারওয়ানচি আর গোকুলতাস তোমরা আমার সঙ্গে থাকবে—যাও সব প্রস্তুত হও।

পূবের আকাশে তখন রক্তিম ছোপ লেগেছে। বাবুরের পূর্ব পরিকল্পনা মত তার সৈন্যবাহিনী সুশৃংখল ভাবে এগিয়ে গেল।

সুলতান ইব্রাহিমের সৈন্যবাহিনীও এগিয়ে আসছে। মন হয় তারা ঝাঁপিয়ে পড়বে—কিন্তু তারা কাছাকাছি এসে তাতার বাহিনীর সম্মুখে হঠাৎ থমকে দাঁড়াল।

বাবুর বুঝতে পারে ওরা বিচলিত—দ্বিধাগ্রস্ত। এই সুবর্ণ সুযোগ। আক্রমণের এই উপযুক্ত মুহূর্ত। বাবুর সঙ্গে সঙ্গে আর কালবিলম্ব না করে মহম্মদ সুলতান ও হুমায়ুনকে নির্দেশ দেয় তাদের সৈন্যবাহিনী নিয়ে সুলতানের সৈন্যবাহিনীকে চক্রাকারে এগিয়ে অতি দ্রুত ওদের পশ্চাৎ দিক থেকে আক্রমণ চালাতে এবং আহমেদি পারওয়ানাচিকে বামবাহুর সৈন্যদের সাহায্য করতে তার অধীনস্থ বাহিনী নিয়ে। ঐ সঙ্গে গোকুলতাসকে ও ওস্তাদ আলিকে নির্দেশ দেয় মুহুর্মুহু কামান দাগতে।

আল্লাহো আকবর—সৈন্যদের মিলিত চিৎকার। কামানের মুহুর্মুহু গর্জন চারিদিক কাঁপিয়ে তোলে।

সুলতানের বিরাট সৈন্যবাহিনী তাতারবাহিনী কর্তৃক চারিদিক থেকে ঘেরাও হয়ে পড়ে।

হস্তীর বৃংহধ্বনি, অশ্বের হ্রেষারব, সৈন্যদের উল্লসিত চিৎকার ও কামানের কর্ণপটাহ বিদারী গর্জন সব কিছু একত্রে যেন এক ভয়াবহ পরিস্থিতি গড়ে তুলল।

সুলতানের ভাড়া করা সৈন্যরা ক্রমশঃ দুদিক থেকে চাপের চোটে কয়েকবার আক্রমণ চালাবার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়ে এদিক ওদিক পালাতে শুরু করল প্রাণভয়ে।

যুদ্ধ ব্যাপারে একান্ত অনভিজ্ঞ সুলতান দিশেহারা হয়ে পড়ল। সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে যে যুদ্ধ শুরু হয়েছিল মধ্যাহ্নের কিছু পরে সেই যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটতে চলল।

রণবীর বীরবিক্রমে যুদ্ধ করছিল। যবন বাবুরের প্রতি হিন্দু রণবীর বিশ্বাস-ঘাতকতা করে নি। সর্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত—রক্ত ও ঘাম একসঙ্গে ঝরছিল। কিন্তু রণবীর সেদিন জানত না মুঘল সাম্রাজ্য স্থাপনের জন্য রাজপুতের রক্তদান সেই শেষ নয়। মাত্র শুরু।

আর এও বুঝতে পেরেছিল, মুঘলকে প্রতিরোধ করা যাবে না। হিন্দুস্থানের পরাজয় অবশ্যম্ভাবী। ইব্রাহিমের সৈন্যবাহিনীর মনোবল ভেঙ্গে গিয়েছে। চারিদিকে বিশৃংখলা। পরাজিত পর্যুদস্ত হয়ে তারা রণে ভঙ্গ দিতে শুরু করেছে তখন।

মধ্যাহ্ন-সূর্য মাথার উপরে অগ্নিবর্ষণ করছে। বারুদের ধোঁয়ায় চারিদিকে যেন একটা কুজ্ঝটিকা জাল বিস্তার করেছে। আর সেই জমাট বেঁধে ওঠা কুজ্ঝটিকায় মধ্যে বহুকণ্ঠের মিশ্রিত একটা যন্ত্রণার, একটা আর্তনাদের শব্দ যেন পাক খেয়ে খেয়ে ফিরছে।

হিন্দুস্থানের মাটি কাঁদছে। শুধু মৃতদেহ আর মৃতদেহ যেদিকে তাকানো যায়। হিন্দুস্থান যেন আবার নতুন করে শবভূমি রচনা করলো।

নতুন করে শবভূমি রচনা করলো।

রণবীরের, যুদ্ধরত রণবীরের কেবল একটিমাত্র চিন্তা, এই যুদ্ধই যেন তার জীবনের শেষ যুদ্ধ হয়। তার ঋণ শোধ হোক সেই সঙ্গে তার প্রায়শ্চিত্তও হোক।

উন্মাদের মতই যেন রণবীর তরবারি চালনা করছিল চারিদিকে ইব্রাহিমের সৈন্যকর্তৃক পরিবেষ্টিত হয়ে, সহসা একটা বিষাক্ত তীর ছুটে এলো রণবীরের দিকে এবং আর একটু হলেই হয়ত সেই তীর তার বক্ষ ভেদ করতো, যদি না চক্ষের পলকে পার্শ্ববর্তী এক তরুণ সৈনিক তাকে মুহূর্তে প্রবল এক ধাক্কা দিয়ে অশ্বপৃষ্ঠ হতে ভূতলে নিক্ষেপ করত।

একটা অস্ফুট আর্তনাদ করে রণবীর ভূপৃষ্ঠে নিক্ষিপ্ত হলো বটে কিন্তু নিক্ষিপ্ত সেই তীর তার পার্শ্ববর্তী তরুণ সৈনিকের বক্ষ বিদীর্ণ করেছে ততক্ষণে। তরুণ সৈনিক ভূমিতলে পতিত হয় অশ্বপৃষ্ঠ হতে।

যুদ্ধ তখন প্রায় সমাপ্ত বললেই হয়। যুদ্ধের শেষ পর্ব। সুলতান ইব্রাহিমকে আর যুদ্ধক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছিল না—হয়ত সে পালিয়েছে এবং তার ফলে সুলতানের অনুগৃহীত আমীর ও আফগানরা অনেকেই যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালাতে শুরু করেছে—তাদের পশ্চাতে সৈন্যরাও।

অতর্কিতে একটা প্রবল ধাক্কা খেয়ে ভূতলে পতিত হয়ে রণবীরের কিছুটা সময় লাগে আবার উঠে বসতে। কোনমতে ধীরে ধীরে উঠে বসতেই নজরে পড়ে তীরবিদ্ধ রক্তাক্ত কলেবর সেই তরুণ সৈনিক যে ক্ষণপূর্বে নিজের প্রাণ তুচ্ছ করে তাকে সাক্ষাৎ মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচিয়েছে। রণবীর দেখতে পেল সে ভূশয্যা থেকে উঠে বসে একটু একটু করে রণবীরের দিকে এগিয়ে আসবার চেষ্টা করছে তখন।

যুদ্ধের প্রথম থেকেই রণবীর ঐ তরুণ সৈনিককে লক্ষ্য করেছিল। সে তার পাশেপাশেই ছিল বলতে গেলে সর্বক্ষণ। ছায়ার মত যেন একেবারে লেপটে ছিল তার সঙ্গে।

কিন্তু আহত তরুণ সৈনিক বেশীদূর এগুতে পারে না। টলে পড়ে যায়। রণবীর তাড়াতাড়ি গিয়ে ভূপতিত তরুণ সৈনিককে তুলে ধরবার চেষ্টা করতেই তার মস্তকের শিরস্ত্রাণটা খুলে পড়ে যায় আর সঙ্গে সঙ্গে একরাশ মেঘের মত কালো কুঞ্চিত কেশ সৈনিকের বক্ষে ও পৃষ্ঠে লুটিয়ে পড়ে। বিস্ময়ে রণবীর

চম্‌কে ওঠে, একি ! এ তো কোন পুরুষ নয় ! এ যে নারী !

এবং সেই মুহূর্তেই সেই নারীর সত্য পরিচয় রণবীরের কাছে দিবালোকের মত স্পষ্ট হয়ে ওঠে ।

নারী আর কেউ নয়—চন্দনা । অস্ফুট কণ্ঠ হতে একটা আর্তনাদ যেন নির্গত হয় রণবীরের, চন্দনা ।

চন্দনার দেহে তখন বিষের ক্রিয়া শুরু হয়ে গিয়েছে । অতিরিক্ত রক্তস্রাবেও ক্লান্ত অবসন্ন চন্দনা ।

দুহাতে চন্দনার মুখটা তুলে ধরে চিৎকার করে ওঠে এবারে রণবীর, চন্দনা ?

ধীরে ধীরে চন্দনা চক্ষুরুন্মীলন করল ।

চন্দনা !

রণবীর—ক্লান্ত কণ্ঠ—নিস্তেজ কণ্ঠ কিন্তু ওষ্ঠ প্রান্তে ক্ষীণ হাসির রেখা ।

একি করলে তুমি চন্দনা, একি করলে—

রণবীর ।

এভাবে কেন প্রাণ দিলে চন্দনা ! চন্দনা—

রণবীর—আমি চললাম—

চন্দনা—

তুমি দেশে ফিরে যাও রণবীর । দেশ আমাদের আজ বিপন্ন । যবন সব গ্রাস করবে ।

চন্দনা—

বল রণবীর যাবে ?

যাবো চন্দনা । যাবো ।

গলা ভারী হয়ে আসে রণবীরের । অশ্রুতে দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে যায় ।

আঃ—

চন্দনা । আমার চন্দনা—

ছিঃ রণবীর—তুমি না বীর যোদ্ধা, সৈনিক । তোমার চোখে জল ।

ব্যাগ্র-ব্যাকুল দু বাহু দিয়ে চন্দনার নেতিয়ে পড়া কোমল দেহটা রণবীর আপন বক্ষের ওপরে চেপে ধরে । তার রক্তাক্ত বক্ষে মুখ গুজে কেঁদে ওঠে, না, না—তোমাকে আমি মরতে দেবো না চন্দনা । মরতে দেবো না । না, না—না—

রণবীর, কম্পিত শিথিল দক্ষিণ হস্তটি কোনমতে তুলে চন্দনা রণবীরের চোখের প্রবাহমান অশ্রু মুছিয়ে দেবার চেষ্টা করে, দুঃখ করো না রণবীর, মৃত্যুও আমাকে আর তোমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিতে পারবে না আজ—

একি হলো চন্দনা, একি হলো !

এর চাইতে আর কি ভাল হতে পারত রণবীর । এই অপবিত্র দেহটা দেবতার স্পর্শে আবার শেষ মুহূর্তে পবিত্র ধন্য হয়ে গেল । ভালই হলো । ভালই হলো ! আঃ—আমি যা-ই—

চন্দনার বাক্ রোধ হলো। চন্দনা ঘুমিয়ে পড়ল।

কোথায় যেন জয়ভেরী বাজছে। যুদ্ধ কি তবে শেষ হলো।

যুদ্ধ শেষ।

অপরাহ্ণের ম্লান বিষণ্ণ আলোকে পাণিপথের আকাশ বিষণ্ণ। বাবুরের সৈন্যবাহিনী জয়ভেরী বাজাচ্ছে। বিজয়বার্তা ঘোষিত হচ্ছে। যেদিকে যতদূর দৃষ্টি চলে পাণিপথের যুদ্ধক্ষেত্র জুড়ে সংখ্যাতীত আহত আর হাজার হাজার মৃতদেহ।

রণবীরের কাজও শেষ হয়েছে। চন্দনার মৃতদেহটা পৃষ্ঠে নিয়ে কোনমতে উঠে দাঁড়াল রণবীর। একপাশে তখনো তার অশ্বটি দাঁড়িয়ে। মৃতদেহটি অশ্বপৃষ্ঠ-পরে স্থাপন করে নিজে উঠে বসল অশ্বপৃষ্ঠে রণবীর, তারপর অশ্বের লাগাম ধরে আকর্ষণ করলো।

শিক্ষিত অশ্ব ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত মৃতদেহের উপর দিয়েই ছুটে বের হয়ে গেল।

ফারদুস মাকানি জাহিরুদ্দিন মহম্মদ বাবুর পাদশার ভারতের পঞ্চম ও শেষ অভিযান সফল হয়েছে। জয়ী আজ পাদশা বাবুর।

হিন্দুস্থানের মাটিতে পা রেখে আজ সে দৃঢ়ভাবে দণ্ডায়মান। বীরভোগ্যা বসুন্ধরা—ভারত আজ তার পদানত। বিজয় উল্লাস চারিদিকে।

বাবুরের শিবির পড়েছে সিহাব নদীর তীরে। হুমায়ুন প্রেরিত হয়েছে আগ্রায়—আর মেহেদী খাজা দিল্লীর পথে। তার উপরে নির্দেশ জারী হয়েছে দিল্লীর কোষাগার ও দুর্গ দখল করতে।

সুলতান ইব্রাহিম পালাতে পারে নি। ঐ পাণিপথের যুদ্ধেই তার মৃত্যু হয়েছিল। সন্ধ্যার কিছু পূর্বে নামাজের আগে খলিফার ছোট ভাই তাহির তাবেরি যুদ্ধক্ষেত্র হতে ইব্রাহিমের কর্তিত শির এনে পাদশাকে উপঢৌকন দিল।

এ কার শির। পাদশা প্রশ্ন করে।

আলমপনা, এ সুলতান ইব্রাহিমের ছিন্ন শির।

মাসেল্লা। আনন্দে চিৎকার করে ওঠে পাদশা বাবুর, আলতামাস ?

শাহেনশা—

ওকে লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা পারিতোষিক দাও।

দিল্লী।

ভারতের ইতিবৃত্তের পাতায় আবার নতুন আখর পড়ল। লোদি বংশের শেষ সমাধি।

সমাধির উপর স্থাপিত হলো মুঘলের স্বর্ণ-সিংহাসন। একদা সুদূর কাবুল-কান্দাহারের এক তাতার মেষপালকের উত্তরপুরুষ আজ দিল্লীর মসনদে। ইতিহাস কি বিচিত্র। জহিরুদ্দিন মহম্মদ বাবুর পাদশা।

পাদশা সালামত—বহুকণ্ঠের তূর্যনাদ। একে একে চারিদিক থেকে বিজয়বার্তা আসতে থাকে।

দিল্লী করায়ত্ত—বহু ধনরত্নপূর্ণ কোষাগার করায়ত্ত।

গোয়ালিয়রের হিন্দুরাজা বিক্রমাজিতের পাণিপথের যুদ্ধেই মৃত্যু হয়েছিল—তার আশ্রিত ও পরিবারবর্গ ছিল আগ্রায়। হুমায়ুন তাদের বন্দী করে—বিক্রমাজিতের ধনরত্ন নিয়ে নিয়েছে। তারই মধ্যে ছিল প্রসিদ্ধ হীরকখণ্ড কোহিনুর। সুলতান আলাউদ্দীন একদা ঐ কোহিনুর সংগ্রহ করেছিল—বর্তমানে ছিল বিক্রমাজিতের ধনভাণ্ডারে।

রজব মাসের আঠাশ তারিখে বৃহস্পতিবার বৈকালে নামাজের সময় জহিরুদ্দীন মহম্মদ বাবুর পাদশা আগ্রায় প্রবেশ করল। বাবুর পুত্র হুমায়ুনকে কোহিনুর হীরা পুরস্কার দিল।

যুদ্ধ তখনো একেবারে শেষ হয় নি।

মরুপ্রান্তের রাজন্যবর্গের সঙ্গে বাবুরের মোকাবিলা তখনো হয় নি—তখনো বাকী।

কিন্তু সেও আর এক দীপ নির্বাণের ইতিহাস। মুঘলের রচিত এক নয়া ইতিহাস।

কর্ণদেব একদা মাড়বার অধিপতি রাঠোর কুলচূড়ামণি সুরজমলকে ঠিকই বলেছিলেন, মিথ্যা গণনা করেন নি, লোদি বংশের আধিপত্য শেষ হলো—সামনে এগিয়ে আসছে যবনের আর এক শাখা—তুর্কী। তাদের প্রতিরোধ করা যাবে না। যায়ও নি। মরুস্থলীর সমস্ত বীর রাজারা মহাবীর সংগ্রাম সিংহের পতাকাতলে সমবেত হয়েও শেষ পর্যন্ত দাঁড়াতে পারে নি। পরাজিত হয়েছিল।

কিন্তু পরাজয়ের গ্লানি হয়ত তাদের বহন করতে হতো না সেদিন যদি না বিশ্বাসঘাতক, দেশদ্রোহী তুয়ার শিলাদিত্য গোপনে গিয়ে মুঘলের সঙ্গে হাত মিলাত। ভারতের ইতিহাসও হয়ত অন্যভাবে লেখা হতো।

কিন্তু তা হলো না। বিশ্বাসঘাতকতা ও মুঘলের অনুগ্রহে পরিতুষ্ট হবার ঘৃণিত প্রয়াসে রাজস্থানই নয় কেবল, ক্রমশঃ সমগ্র ভারতের কপালেই আঁকা হয়ে গেল এক দুরপনেয় কলঙ্কের রেখা।

জহিরুদ্দীন মহম্মদ বাবুর পাদশার চরণে, মুঘলের চরণে ভারত লিখে দিল দাসখৎ।

অনেক, অনেক বছরের জন্য ভারতের ভাগ্য-সূর্য অস্তমিত গেল পাণিপথে।